বিজিত ঘোষ সম্পাদিত

নকশাল আন্দোলনের গল্প



নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে

বিজিত ঘোষ সম্পাদিত

[illegible] সংকলন

নকশাল আন্দোলনের গল্প

NAKSHAL ANDOLONER GALPO

A Collection of stories on Nakshal Movment

Edited By

Bijit Ghosh

ISBN 81-7332-258-6

প্রচ্ছদ

সত্রং গঙ্গোপাধ্যায়

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডাঃ এস সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন, ডাঃ এস সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

সত্তরের শহিদদের স্মৃতিতে

'...যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে...'

প্রাসঙ্গিকে কিছু কথা

নকশাল-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সমকালে ও পরবর্তীকালেও অসংখ্য বাংলা ছোটোগল্প রচিত হয়েছে। কোনও আন্দোলন ইত্যাদিকে মাথায় রেখেই লেখা গল্প অনেকসময় তেমন শিল্প-সফল হয় না। উদ্দেশ্যমূলকতা, প্রচারধর্মিতা গল্পের শিল্প-রসকে ক্ষুণ্ণ করে কখনও-কখনও।

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই শ্রেণীর গল্প-সন্ধান ও পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অসংখ্য ভালো গল্প বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছে। ঐ বিশেষ প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেও শিল্পোত্তীর্ণ বেশ কিছু ভালো গল্প লিখেছেন খ্যাত, কমখ্যাত ও অখ্যাত-জনও।

সত্তরের স্বপ্ন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ঘরে ফেরা-না-ফেরার সেই উথাল-পাথাল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলির জীবন্ত ছবি উঠে এসেছে এই গল্পগুলিতে।

এই সঙ্কলনে নির্বাচিত গল্পগুলি গল্প হিসেবে কতখানি সার্থক এবং তা নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই লেখা কিনা, সেটাই ছিল আমার একমাত্র বিচার্য বিষয়। ফলে স্বভাবতই ঐ আন্দোলনের নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়দিকই গল্পগুলিতে এসেছে। এই দুই মলাটের মধ্যেকার গল্পগুলোর গাঁথা মালা থেকে সেই উত্তাল সময়ের সামগ্রিক, পরিপূর্ণ একটা ছবি এখানে তুলে ধরতে পেরেছি বলে মনে করি।

তবু ব্যক্তি-মানুষের পঠন-পরিধিরও তো একটা সীমা থাকেই। সেই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, এই সঙ্কলনের বাইরেও এ-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প নিশ্চয়ই রয়ে গেল। তেমন লেখকগণ সম্পাদকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এ-গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তাঁরাও সাদরে গৃহীত হতে পারেন; স্রেফ তাঁদের গল্পটির গুণে বা জোরেই।

সঙ্কলনটিতে গল্পগুলি সাজিয়েছি গল্পকারদের বয়সের ক্রম মেনেই।

এক মাস উনিশ দিন হাজতবাসের পর পুনরায় বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুবোধ হালদারকে নিয়ে আসা হয় বিশিষ্ট এক পুলিশ অফিসারের কাছে। কমরেড সুবোধর নাড়িনক্ষত্র সেই পুলিশ অফিসারের নখদর্পণে। পুলিশের জেরার মুখে সুবোধ আসল সত্য গোপন করলেও তার বাঁ-জাংয়ের বিশেষ দাগ ও সেই পায়ের কড়ে আঙুল না-থাকাটা যে সুবোধের বোমা বানানো সংক্রান্ত কাজেরই অনিবার্য ফল; সে-সম্পর্কে পুলিশ-অফিসার নিঃসন্দেহ। **বিমল করের 'নিগ্রহ'** গল্পের এই কাহিনীটি পরিণতিতে এসে পাঠকদের একঅন্য অনুভূতিতে পৌঁছে দেয়।

বিংশ শতাব্দীর এক কার্ল মার্কসের সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার উমেশ সরখেলের কথোপকথনে কৌতুকের ছলে সত্তরের কিছু অন্য সত্য উঠে এসেছে **টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের 'শ্রুতিলিপি (১)'** গল্পটিতে।

নরেশ মহাজন তথা নরেশ মহাজনদের খতম করতে আসা বিপ্লবী তরুণদের আশ্রয় দিয়েছিলেন সুমতি। কেবল তাকে বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাবোধেই নয়, গভীর শ্রদ্ধাতেও। তাদের কাজকেই যথার্থ দেশের কাজ বলে মনে করেছিলেন সুমতি। শ্মশানে সরোজিনী দেবীর চোখ দিয়ে সুমতিকে দেখিয়েছেন **ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়** তাঁর **'দেওয়ালের লিখন'** গল্পে।

১৮ বছরের কমরেড বাদলকে পিটিয়ে মেরেছিল অন্য পার্টির লোকেরা। সেই অকুস্থলে শহিদ-স্তম্ভ বানিয়েছিল বাদলের দলের ছেলেরা। একদা বাদলের মা, অধুনা শহিদের মা বিমলা তার মাতৃত্ববোধের যন্ত্রণা দিয়ে স্বামী হরপ্রসাদ ও আর দুই পুত্র কৃপাল-দয়ালকে কখনই ক্ষমা করতে পারে না। কারণ, তারা তিনজনই ভিন্ন-ভিন্ন তিন পার্টির লোক। আর বিমলা বোঝে, কোনও-না-কোনও পার্টির হাতেই তার বাদলের রক্ত লেগে। সেই যন্ত্রণাকাতর ক্ষমাহীনার গল্প **সমরেশ বসুর 'শহিদের মা'**।

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা **মহাশ্বেতা দেবীর** এক অগ্নিগর্ভ রচনা **'দ্রৌপদী'**। ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে সাঁওতালদের নেতৃত্বে নকশাল অভ্যুত্থানের সূত্র ধরে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন, নকশাল-কর্মী দ্রৌপদী মেঝেনের উপর প্রশাসনের পাশবিক অত্যাচার। আর সেই অত্যাচারী প্রশাসকের বিরুদ্ধে দ্রৌপদীর গর্জে ওঠা প্রতিরোধের জ্বলন্ত দলিল এই গল্পটি।

পিওন মহাদেব সাঁতরার বড়ো ছেলে নকশাল অনিল বোমা বাঁধতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু পুত্রশোকেও প্রকাশ্যে কাঁদতে পারে না অনিলের মা। স্বামীর চাকরি, অবশিষ্ট পুত্র শিবনাথের ভবিষ্যৎ ভেবে। মায়ের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা ভাষারূপ পেয়েছে **মানবেন্দ্র পালের 'অভিনয়'** গল্পে।

চিন্তিত পিতাকে পুত্র বার বার বোঝাতে চেয়েছিল, চাকরি-বাকরির দিকে তাকে ঝুঁকতে দেবে না তারই পার্টির ছেলেরা। মরতে তাকে হবেই। হয় পুলিশের হাতে। নয়তো অন্য পার্টির হাতে। খুব কাছ থেকেই কমরেড অনির্বাণ মুখার্জিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার এ ভবিতব্যের কথা অনি নিজেই সব থেকে ভালো করে জানত। এ গল্প শুনিয়েছেন **অসীম রায়** তাঁর **'অনি'**-তে।

নিরপরাধ রঞ্জুকে কারারুদ্ধ করে অমানুষিক নির্যাতন চালায় পুলিশ। সত্তরের সন্ত্রাসের সময় এ-ঘটনা ঘটেছে বার বার। সেই অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে আদালত-কক্ষেই ক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনিয়েছেন **কৃষ্ণ চক্রবর্তী** তাঁর **'আসামী এবং তার বিচার'** গল্পটিতে।

অপরাজিতা-রমেনের একমাত্র পুত্র সুধীরকে হত্যা করে পুলিশ। কার্জন পার্কে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক প্রদর্শনের অপরাধে। আসলে পুলিশও যে কতখানি অসহায়, নিরূপায়; নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের গলা টিপে সিস্টেমের দাস হয়ে কাজ করার যন্ত্রণাও যে কত তীব্র; সেই সূক্ষ্ম ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন **মিহির আচার্য** তাঁর **'লোহার খুর'** গল্পটিতে।

সেই আগুন-ঝরা রাতে তপুর মা ও খোকনের মা উভয়েই এক ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠা নিয়ে, নিজ-নিজ সন্তান সন্ধানে পথে বার হন। দু-জনেই প্রাণ হারান পুলিশের গুলিতে। **'আলোয় শুধু'** গল্পে এই মর্মন্তুদ কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন **মিহির সেন**।

'রৌদ্রদীপ্ত' গল্পে মৃত্যুহীন বিপ্লবে মৃত বিপ্লবীর সহযোদ্ধার বজ্রকঠিন দৃঢ়তা, তাঁর প্রতিবাদী মনোভাব, প্রশাসকের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ কাহিনী আমাদের উপহার দিয়েছেন **মৃণাল চৌধুরী**.

বিহারের মুশাহার টোলার প্রৌঢ় কৃষক ভোলা মুশাহারের অপরিসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আক্রমণকারী সশস্ত্র দলটিও কিভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়, তার এক মৃত্তিকাসম্পৃক্ত দৃপ্ত গল্প **অজিত মুখোপাধ্যায়ের 'গামছা-বোমা'**।

গুমঘরে সিঁড়ির নীচে চাষিদের সবার প্রিয় মধুদার লাশ আবিষ্কার করে তারই ছেলে সোনা। সোনার আর্তনাদ আর তার খুন হওয়া পিতা মধু মাহাতোর ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত..., সব মিলেমিশে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার মশাল। **ব্রজেন মজুমদার 'খোদহাটির ডাক'**-কে পৌঁছে দেন দূরের বিদ্যাধরী পর্যন্ত।

কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সত্তরের সন্ত্রাসের কথা প্রবাসী পুত্রকে চিঠিতে জানিয়ে তাকে স্বদেশেই ফিরে আসতে বলেন পিতা। ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থ-ভাবনায় উদ্দীপিত গল্প **চিত্ত ঘোষালের 'দারাসুতপরিবার'**।

বেলেঘাটার অবস্থা তখন ভয়াবহ। একজন এস আই-কে রিকশা থেকে নামিয়ে খুন করা হয়। আবার পুলিশ বাহিনী দিনদুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে আটটি ছেলেকে গুলি করে মারে। রাত ৮টায় বিবি ঘোষের অ্যানাউন্স থেকে জানা যায় সেই রাতেই মিলিটারি নামছে পাড়ায়। সন্ত্রস্ত মা তাই পুত্র তড়িৎকে বেলেঘাটা থেকে পাঠিয়ে দেয় অন্যত্র। অংশুদের বাড়ি। এদিকে অংশুদের পাড়ায় রবিদের এস্টেটে বোমা পড়ে। রবিরা এম এল. পার্টির ছেলেদের খুঁজতে থাকে। অংশুর প্রতিবেশী সুবোধবাবুর ছেলে মনাকে দেখা যায় রাতের আঁধারে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে লিখতে : 'হিংসার উত্তর আমরা হিংসা দিয়ে দেব,' সেই মনার বাসি শুকনো রক্ত ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জলে আবার যেন টাটকা হয়ে ওঠে। সে-সময়ের এক বিশ্বস্ত ছবি উঠে এসেছে **সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'অংশু সম্পর্কে ২টো ১টা কথা যা আমি জানি'** গল্পে।

স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান ফাটিক রায় সেই উত্তাল সময়ে নিহত হয়। ফাটিকের খুন হওয়াকে কেন্দ্র করে তারই সহপাঠীদের চোখে প্রতিশোধস্পৃহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পান শিক্ষক নরেশচন্দ্র মজুমদার। **অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রোহিতাশ্বের নামে'** গল্পটিতে ধরা পড়েছে সেই জীবন্ত ছবি।

নির্মল চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'পিপাসা'** গল্পে বিধবা দ্রবময়ী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে স্নেহ-মায়া-মমতায় গড়া এক চিরন্তন মা-কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সেই ঝোড়ো সময়টাতে, একেবারেই বাইরের সাতে-পাঁচে না-থাকা, রাজনীতির সঙ্গে সমস্তরকম সম্পর্ক বর্জিত কিশোর যুবকদেরও বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকতে দেওয়া হয়নি। ফলে বাবা-মা দিদিমা দিদি, এইসব নিবিড় মানবিক সম্পর্কের মানুষগুলোকে ছেড়েই দূরে চলে যেতে হয়েছে কত জনকে। সে কাহিনীই শুনিয়েছেন **প্রলয় সেন** তাঁর **'তপু চলে যাচ্ছে'** গল্পটিতে।

রবির সন্ধানে বেরিয়েছে তিনটি মানুষ। রবিকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করে চলেছে সেই তিনজন। শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয় অর্থাৎ রবিকে ধরে এবং খুন করে। তখন অন্য আরও আট দশজন ছুটে আসে। এই তিনজনের সন্ধানে। পূর্বের তিন অনুসরণকারী এবার পলাতকে পরিণত হয়। ভয়, ঘৃণা, অবিশ্বাস, সন্ত্রাস আর সে সময়ের সহজ খুনের ছবি কী অনায়াস দক্ষতাতেই না ফুটিয়ে তুলেছেন **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** তাঁর **'পলাতক ও অনুসরণকারী'** গল্পটিতে।

সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'পরিচয়হারা' নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা পুলিশি নৃশংসতায় আপাত ঠাণ্ডা শীতল এক ভয়ঙ্কর বীভৎস কাহিনী। এক নিরীহ, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত দরিদ্র ছাত্রের প্রতি পুলিশ প্রশাসনের ভয়ঙ্কর আচরণ ও অন্যায়ের ছবি চমৎকার ফুটেছে এখানে। সত্তরের সন্ত্রাসে এমন কত নির্দোষ কিশোরকে চূড়ান্ত অন্যায়, অবিচারের শিকার হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। সেই এক নির্মম জীবন্ত চালচিত্র হয়ে উঠেছে এই গল্পটি।

একদা নেতা, নিখোঁজ নাট্যকার নলিনাক্ষবাবুর কিশোরপুত্র, নিরপরাধ কৃষ্ণেন্দুকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। পুত্র হত্যাকারীদের প্রতি পিতার প্রতিশোধস্পৃহায় শেষ হয় অথবা শুরু হয় **জ্যোৎস্নাময় ঘোষের 'স্থানীয়-সংবাদ'** গল্পটি।

একজন সাব ইনস্পেক্টর সহ পাঁচটা মার্ডার আর দুটো আর্মস ছিনতাই করা নসু কোনওদিনই জেল থেকে ছাড়া পাবে না। অবশ্য তাতে একটুও দমে না নসু। খতমের রাজনীতিতে মনে প্রাণে বিশ্বাসী নসু জেল থেকে ছাড়া পেলেও পুনরায় খতম অভিযানই চালাবে, এ বিষয়ে সে নিজেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ। এই নসুর চোখ দিয়ে সত্তরের জেলখানার ভেতরকার চিত্র রূপ পেয়েছে **দেবেশ রায়ের 'কয়েদখানা'** গল্পে।

সে সময়ে পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার, অবিচার তথা তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে প্রবীণতম এক ব্যক্তি ভুবনবাবু সকলকে নিয়ে প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় দৃঢ় সঙ্কল্প হন। এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদে উজ্জ্বল গল্পটি লিখেছেন **তপোবিজয় ঘোষ**। গল্পটির নাম **'কপাটে করাঘাত'**।

বিশ্বাসঘাতক রতনের সাহায্যে নাটাদাদের ঘরে ঢোকে পুলিশ বাহিনী। তাদের না পেয়ে আর এক নেত্রী বিন্দুদিকে পুলিশ জিপে করে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু বস্তিবাসী শত শত মেয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে বিন্দুদিকে ফিরিয়ে আনতে যাত্রা করে থানার দিকে। এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রাগী গল্প **সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'জনৈক অষ্টাদশীর আত্মবিশ্লেষণ'**।

প্রতীক ও রূপকের মধ্য দিয়ে সে-সময়ের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেহারাটা আর তা থেকে মুক্তির আশ্বাস তথা বিশ্বাসের কথা আমরা শুনতে পাই **রাম রায়ের 'একচক্রা নগরে'** গল্পটিতে।

সেই দুর্দিনে বাড়ি-না-ফেরা ভাই অজয়কে খুঁজতে বার হয় দাদা বিভূতি। খুঁজে পায় না। অজয় ফেরে না। মা বাসন্তীর অনিদ্র রজনী কাটে। রাতের পর রাত ঘরে না ফেরা অজয়দের জন্য কত, কত বাসন্তী মায়ের বিনিদ্র নিশি যাপিত হয়েছে সে-সময়ে, তারই ছবি দেখি **দিব্যেন্দু পালিতের 'মানুষের মুখ'** গল্পে।

সত্তরের সন্ত্রাসের নায়ক অথবা সন্ত্রাসবাদীদের দমনের নায়ক-চরিত্র পুলিশ তথা পুলিশি নির্যাতন যে কোনও সূত্র অথবা না-সূত্র ধরেই কোন্ চরম পর্যায়ে যেতে পারে, তার অনন্য-সাধারণ এক দলিল আমাদের উপহার দিয়েছেন **মণি মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গণতন্ত্র এবং গোপাল কাহার'** গল্পটিতে।

দীর্ঘ এক বছর পর বিপ্লবী শান্তনু এসেছে তারই প্রিয় বন্ধু কমরেড কল্যাণের বাড়িতে। কল্যাণের মা-কে ভয়ঙ্কর এক মর্মান্তিক সংবাদ জানাতে। শান্তনু কিছুতেই তা বলতে না পারলেও ভয়াবহ সেই সত্য মায়ের চোখে-মনে ঠিকই ধরা পড়ে যায়। সেই প্রেক্ষিতে এক মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনিয়েছেন **শুকদেব চট্টোপাধ্যায়** তাঁর **'তরাইয়ের মা'** গল্পে।

পুলিশি তাণ্ডবে মুহূর্তের মধ্যে বরদাকান্তের গৃহ তছনছ হয়ে যায়। তারা বরদাকান্তের নাতি কমরেড দিব্যকান্তর খবর পেয়েই এসেছিল তাকে গ্রেপ্তার করতে। কারারুদ্ধ হওয়ার মুহূর্তেও দৃপ্ত নাতির গৌরবে তৃপ্ত বৃদ্ধের ছবি এঁকেছেন **জীবন সরকার** তাঁর **'যাত্রা'** গল্পে।

বিপ্লবী পুত্রের হত্যাকারী, পুলিশ অফিসার গোপেন মল্লিককে একান্তে, সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশে পেয়েও তাকে হত্যা করতে পারে না তীর্থঙ্করের মা রেখা। একদিকে পুত্রহন্তারক, অন্যদিকে কর্মসূত্রে নার্সের দীর্ঘজীবন; সেই প্রেক্ষিতে মাথায় থাকা ফ্লোরেন্সের ছবিই বড়ো হয়ে ওঠে সেবিকা রেখার কাছে। এটিই **শংকর সেনগুপ্তের 'অন্যমুখ'** এর বিষয়।

সেই সময়ে অজস্র তরুণের জিভ টেনে বার করার পরেও চোখের মণি উপড়ে ফেলা বীভৎস এক পশুসদৃশ মানুষের কথা শুনিয়েছেন **সমীরকান্তি বিশ্বাস** তাঁর **'নেকড়ে'** গল্পে।

গল্পকথক সত্তর বন্ধু গুণীন ও রূপার কাহিনী **হীরালাল চক্রবর্তীর 'চিহ্ন'**। নকশাল আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মী গুণীনের মৃত্যুর পরও, গর্ভবতী স্ত্রী রূপা সন্তানকে ঘিরে অন্যভাবে বাঁচার সন্ধানে বার হয়।

নকশাল-নেতা সুমন ও তার গর্ভবতী স্ত্রী ব্রততীর উপর পুলিশ প্রশাসনের অমানুষিক নির্যাতনের এক ভয়াবহ জীবন্ত ছবি আমরা দেখতে পাই **শৈবাল মিত্রের 'শবসাধনা'** গল্পটিতে।

অন্ধকারে সাংবাদিক নীলাদ্রি হোঁচট খায় একটি লাশে। পাশাপাশি আরও দু'-তিনটি। হত্যা। শুধু হত্যা আর রক্ত। ভাগ্যিস চাঁদ ওঠেনি সে রাতে। যদিও সেদিন ছিল বুদ্ধ-পূর্ণিমা। অহিংসার পূজারীর জন্মদিনে সহিংসার রক্তধারা বয়ে যেতে দেখি **সুনীল দাশের 'পারমাণবিক চুক্তি এবং নীলাদ্রির কোলকাতায় বুদ্ধ পূর্ণিমা'** নামক গল্পে।

দীর্ঘকালের ঘুণধরা সিস্টেমকে বদলানোর জন্য যে ডেডিকেটেড ছেলেরা নকশাল আন্দোলনে নেমেছিল, তাদেরকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন ট্যারামাস্টার। সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কোনওদিনই সামাজিক পরিবর্তন আসেনি বলেই ট্যারামাস্টার রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে বন্দুকের নলের উপরই ভরসা রাখতে চেয়েছিলেন। সেই অপরাধে যথেষ্ট অত্যাচার শেষে পুলিশ-বাহিনীর হাতে খুন হন ট্যারামাস্টার। এঁর কথাই শুনিয়েছেন **সুবিমল মিশ্র** তাঁর **'মাংস বিনিময় হল'** গল্পে।

আদর্শবান মৃদুলকাকার পরার্থে জীবনদান আর তাঁর যথাযোগ্য স্ত্রী শোভনা কাকিমার বেদনাবিধুর জীবন কাহিনীটিকে বড়ো মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন **সুব্রত নিয়োগী** তাঁর **'ঠিকানা জানা নেই'** গল্পে।

সন্তোষপুরের এক জরুরি মিটিং-এ যোগ দিতে কমরেড অবিনাশ যে শেয়ার ট্যাক্সিটিতে ওঠে, সেই একই গাড়িতে বলপূর্বক উঠে পড়ে সরকার পক্ষের এক নেতা জগন্নাথ তার পোষা গুন্ডাবাহিনী নিয়ে ওই মিটিংটাকেই পণ্ড করার উদ্দেশ্যে। ড্রাইভার, বিপ্লবের সুহৃদ অনাদি কি করে বাঁচাল বিপ্লবী অবিনাশ তথা বিপ্লবকে, সেই নাটকীয় ঘটনার ক্রম-উন্মোচন দেখি **অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প'**-এ।

সুনীলের বন্ধু দিবাকরের বিশ্বাসঘাতকতায় খুন না করেও পাঁচবছর খুনির সাজা পেতে হয়েছে সুনীলকে। আবার সুনীলের দুটো খুনের দায়িত্ব নিয়ে তাকে বাঁচাতে নিরপরাধ মৃত্যুঞ্জয়দা আত্মসমর্পণ করতে থানায় আসে। সেই টালমাটাল সময়টায় স্বার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগের এক সুন্দর জলছবি **দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'আততায়ী'**।

বারিদবরণ চক্রবর্তীর 'সবুজ দ্বীপের মাঝি' গল্পে মাঝি নকুল হালদারের পিতা নিতাই হালদার খুন হয়। দীর্ঘকাল পরে সেই খুনি বিভাস চক্রবর্তীকে হাতের মধ্যে পেয়েও প্রতিশোধ নিতে পারে না নকুল, তার সবুজ দ্বীপকে মনের মতো করে গড়ে তোলার স্বপ্নের কারণেই।

সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছিল একদল তরুণ-তাজা স্বপ্ন-দেখা যুবক। তাদেরই একজন এ-গল্পের রত্নাকর চক্রবর্তী। **মিহির ভট্টাচার্যের 'বাল্মীকির মা'** গল্পে দস্যু রত্নাকর চক্রবর্তীকে বাল্মীকিতে মুক্তি দেওয়ার জন্য রতুর মায়ের অবদান তথা স্বার্থত্যাগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

অতুল বিশ্বাস নামের এক নারীলোলুপ, বকধার্মিক, মদাসক্ত, লম্পট এবং সত্তর দশকের অত্যাচারী গোয়েন্দা পুলিশের ভয়ঙ্কর কুৎসিত চরিত্র উদ্‌ঘাটনই **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মুক্তিপণ'** গল্পের প্রাণ।

রিদেপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে বহরমপুর স্টেশনে নামে দুই যাত্রী। গোপাল আর হেমন্ত। কাজের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে এই জেলাতেই শ'য়ে-শ'য়ে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন সব কিছু বদলে দিতে। **'ছোটো বকুলপুরের পরের কথা'**-য় তাঁদের কাহিনী বলেছেন **সিদ্ধার্থ সাহা।**

সে-সময়ের অনেকের মতোই কমরেড রতনলালও নিজেকে সুখী গৃহস্থ করতে চায়নি। একদা, অদূরে মামুদপুরে তার মায়ের কাছে আসতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত আর আসা হয় না রতনলালের। বিষ্টুচরণ সহ বিরোধী পক্ষের হাতে রতনের খুনের দৃশ্য দেখি **স্বপন চক্রবর্তীর 'রতনলাল'** গল্পে।

সমাজটাকে বদলে ফেলে মানুষকে মুক্তির আনন্দ দিতে চেয়েছিল সে-সময়ের সমীর, সুদীপ, প্রেসিডেন্সির মহীতোষ, যাদবপুরের শ্যামল, অজয়ের ছোটোভাই অলোকরা। তাদের স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন পূরণের পূর্বে মৃত্যুর মিছিলের ছবি এঁকেছেন **কমল চক্রবর্তী** তাঁর **'প্রথম শনিবার'** গল্পে।

সে-সময়ে পুলিশি অত্যাচারে চব্বিশ বছরের অশক্ত, পঙ্গু শরীর নিয়েও দ্বৈপায়নের আবেগের নদী শুকিয়ে যায়নি। আগামীদিনের ঝলমলে সকাল সম্পর্কে সে এখনও আশাবাদী। দ্বৈপায়নের এই আশাবাদের কথা শুনিয়েছেন **তৃষিত বর্মণ** তাঁর **'মুক্তি'** গল্পে।

সেই ছেলেগুলোর কথায় একটা গভীর প্রত্যয় জন্মায় হাবার মনে। হাবা হলেও সে বোঝে, ছেলেগুলো নিজেদের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে এসেছে স্রেফ তাদের মতো শোষিত, দরিদ্রদের বাঁচাবার জন্য। সেই প্রেরণায় নির্বিকচিত্তে শ্রেণীশত্রুর গলা এক কোপে নামিয়ে দিতে পারে হাবা। সেই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী বলেছেন **একলব্য ঘোষ** তাঁর **'হাবা'** গল্পে।

সত্তরের এক স্বপ্ন দেখা তরুণ পরিমল ফিরে আসে। ফিরে, ফিরে আসে দিবাকর আর দিবাকরদের চেতনায়। **গৌর বৈরাগীর 'গল্পের পরিমল'** এভাবেই সত্য পরিমল হয়ে ওঠে।

শ্লেষবিদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে রূপক সঙ্কেতের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠী বাউরির মায়ের জীবন কথা তৎসূত্রে অন্য মায়ের কথাও শুনিয়েছেন **ভগীরথ মিশ্র** তাঁর **'মায়ের জন্য'** গল্পে।

মুক্তিপণ হিসেবে তপনদা, সন্তু, বিল্টু ও আনন্দকে ছোট্টো একটা কথা বলতে হবে; পুলিশ অফিসারের সেটাই ছিল অনুরোধ-নির্দেশ আদেশ। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করেও বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে জানা চার সাহসীর গল্প **সিদ্ধার্থ ঘোষের 'বার্তা'**।

দুঃসাহসী কমরেড আন্নার প্রত্যুৎপন্নমতিতে বৈপ্লবিক গল্প **স্বর্ণ মিত্রের 'প্রসব'**। আদ্যন্ত নাটকীয়তায় ভরা গল্পটি। বিশেষ করে আন্নার কার্যকলাপ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পের ময়নার মা কে চকিতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রঘুনাথ মন্দিরের সেবাইত রামবিলাস। সেই এক চক্ষু কৃষ্ণকায় পুরোহিত আসলে ছিল ভণ্ড, বকধার্মিক। চরিত্রহীন। জোতদারের দালাল। তার মতো দুরাচারী, ধর্মের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন **অলক সান্যাল** তাঁর **'র‍্যাবিজ্'** গল্পে।

দরিদ্র সাঁওতাল গাঁ তে এসে একটা ছেলে সে-গাঁয়ের মরদগুলোকে জাগিয়ে দেয়। লড়াই করে মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। ছেলেটির আন্তরিক আহ্বানে বদলাতে থাকে মানুষগুলো। আত্মস্বার্থে নয়। পরার্থে। বহুজনের হিতার্থে জীবন-দানের সে অমোঘ বাণী গাঁয়ের মানুষগুলোকে সূর্যের মতো তেজোদৃপ্ত করে তোলে। সেই অন্য আলোয় পথ দেখাতে চেয়েছেন **তিমিরবরণ সিংহ** তাঁর **'সূর্যসেনা'** গল্পটিতে।

সে-সময়ে ভাগলপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কমরেড রতন ফিরে এসেছিল বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে আবার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তখনও তাদের ফিরে আসার ঠিক সময় হয়নি ভেবেই হয়তো রতন বেরিয়ে পড়ে। তবে, যথাসময়ে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে তারা। সেই বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন **দীপঙ্কর দাস** তাঁর **'ওরা ফেরেনি'** গল্পে।

বহুদিন ফেরার, নকশাল আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও সংগঠক গৌতম বিশ্বাস 'কালীতলা যুবক সমিতির জলসায়' গান শুনছে, —এমন একটা খবর দ্রুত চলে আসে পুলিশের কাছে। সেই অবস্থাতেই পুলিশ-বাহিনী গিয়ে তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরও জলসা চালিয়ে যেতে বাধ্য করে উদ্যোক্তাদের পুলিশ। 'শুরু করতে বলুন—জলসাফলসা থামানো চলবে না—গান হোক, গান চলুক—আমরা লাশ বার করে নিয়ে যাচ্ছি।' এমন ঘটনা তখন আকছার ঘটেছে। সে-সময়ের পুলিশি আক্রমণের এই ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেছেন **নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর 'খোঁচড়'** গল্পটিতে।

অনিচ্ছে সত্ত্বেও দলের নীতি পালনে বাধ্য হয়েই মিহির খুন করে বিশ্বাসঘাতক শ্যামলকে। বন্ধুকে খুনের পর তার বিধ্বস্ত মানসিকতাকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন **মনোজ দাস** তাঁর **'ওথেলো'** গল্পটিতে।

ভারতিয়ার কপিলের চোখে এবং বুকেও লেনিন ও তাঁর সহকর্মী স্তালিন হলেন 'রামলছমন'। তাঁদের খোঁজেই কপিল আসে দেশের বাড়িতে। **শংকর বসু 'কপিলের মুলুকযাত্রা'**-য় সে কাহিনীই শুনিয়েছেন আমাদের।

সুযশ ভট্টাচার্যের 'গাণ্ডীব' গল্পে দেখি জেল ফেরত লড়াকু রজনী কপাট পুনরায় স্বপ্ন দেখে। এবারের লড়াইটা জব্বর। একটা কিছু হবে ভেবেই উৎসাহী রজনী তার অস্ত্রটা তৈরি রাখে।

একদা নকশাল পিতার আদর্শকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করা পুত্রকে দেখে পিতার ভয়-উদ্বেগ-আনন্দ-সমীহ ভাবের চমৎকার মিশ্র অনুভূতির চিত্র তুলে ধরেছেন **অমল রায়** তাঁর **'কম্বিং'** গল্পে।

স্রোতের জলের গতিময়তায় অনেক সময় কিছু আবর্জনাও ভেসে আসে। সে-সময়ের তেমন এক মানুষ (?) বান্টির মৃত্যুঞ্জয় কাকু ওরফে ম্যাটি আঙ্কল চরিত্রটিকে জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন **অসীম ত্রিবেদী** তাঁর **'অভিজ্ঞান'** গল্পে।

স্বামী সুমিতাভকে নিয়ে সুখী হতে পারেনি দুই সন্তানের জননী জয়া। কলেজে পড়াকালে সেই সময়ের স্বপ্নদেখা এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল জয়ার। সেই দীপঙ্করের জন্য জয়ার মনের আর্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন **জগন্নাথ প্রামাণিক** তার **'স্বর্গের পাখিরা'** গল্পে।

অমর মিত্রের 'ডাইন' কেবল নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই নয়, সাধারণভাবে বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় এক অনন্য উজ্জ্বল সৃষ্টি। নিজেকে, বিশেষত গোটা গাঁ-কে বাঁচাতে স্বামীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেও সধবা থাকার অভিপ্রায়ের মধ্যে যে মহত্ত্ব লুকিয়ে, তাতে তার মতো মানব-দরদি মানবী আর কে হতে পারে। অথচ অন্যদের চোখে সেই নিতান্ত মানবিক মহিলাটিই 'ডাইন' আখ্যা পেয়ে যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে আশাপূর্ণা দেবীর 'অনাচার' গল্পের সুভাষ-কাকিমার কথা।

বিপ্লবের খোয়াব পঙ্গু করেছে শৈলেন্দ্র সমাদ্দারকে। অমানুষিক পুলিশি অত্যাচারসহ ১৫ বছরের হাজতবাস শেষে ক্রাচই এখন তার প্রধান সঙ্গী। শৈলেন্দ্রের সেদিনের সব সঙ্গী কমরেডগণ সেই দগ্ধ দিনের স্মৃতি মুছে ফেলে মূলস্রোতে ফিরে এসে এখন বেশ করে-টরে খাচ্ছেন। তবু একা নন শৈলেন্দ্র। **সুদর্শন সেনশর্মার 'দগ্ধ দিনের কিছু স্মৃতি'** গল্পের শেষে এসে দেখি, শৈলেন্দ্রর ছেলে সুদিন চলে এসেছে তাঁর কাছে। এসেছে পিতৃদত্ত নামটিকে সার্থক করার জন্যই কী?

এককালে সমাজ-বদলানোর আন্দোলনে নেমে পড়া বেকার যুবক দীপেনের আত্মিক যন্ত্রণা, তার সূক্ষ্ম অনুভূতি, গভীর অনুভব, ভাই-বোন-মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে না-পাবায় তার ভেতরকার ক্ষরণ, ব্যাপারগুলোকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন **কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়** তাঁর **'প্রতিক্রিয়া'** গল্পে।

নকশাল আন্দোলন দমনে সে-সময়ে পুলিশি অত্যাচারে নিহত হয়েছে ৯ বছরের বালকও। তারপর ৯-কে ২৯ করে সর্বত্র সংবাদ ছড়ানো হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। সেই বানানো গল্পের নাটক দেখি **বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের 'একটি নাটকের ভূমিকা'** গল্পটিতে।

জোতদার রতিকান্ত সাধন মাস্টারকে হত্যা করলেও মৃত সাধন মাস্টার রতিকান্তের চোখ-মাথা-মন-ভাবনার মাঝে পাথর হয়ে বসে থাকে। হত্যাকারী রতিকান্তের আতঙ্ক। পাণ্ডুর ভীতগ্রস্ত ছবিটি বিশেষ ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন **স্বপ্নময় চক্রবর্তী** তাঁর **'স্বস্ত্যয়ন'** গল্পে।

ব্রতকথার রূপকে গায়ত্রী নামের এক দুখিনী মায়ের গভীর দুঃখ আর নিঃসীম শূন্যতার মধ্য দিয়ে সে-সময়ের এক হৃদয়স্পর্শী গল্প শুনিয়েছেন **কিন্নর রায়** তাঁর **'চক্রব্যূহ'** গল্পটিতে।

মানওয়াটগঞ্জে মজারুলরা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সব কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা কাটিয়ে মহাজনদের শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করে। সেই বদলে যেতে থাকা মানওয়াটগঞ্জের বৃত্তান্ত শুনি **জয়ন্ত জোয়ারদারের 'উত্তরাধিকার'** গল্পে।

নকশাল আন্দোলনের তীব্র বিরোধী গোয়েন্দা পুলিশ স্বয়ং মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী নিরুপমাই মনে মনে সমর্থন করে দামাল ছেলেগুলোর কার্যকলাপ। সমর্থন, সাহায্যের পর্যায়ে উন্নীত হলে স্বামী তথা পুলিশবাহিনীর হাতেই খুন হন নিরুপমা। এ কাহিনী পাই **প্রদীপ মিত্রের 'সময় অসময়'** গল্পে।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চক্রব্যূহ' গল্পটিতে দেখি সাংবাদিক কৌশিক, প্রকৃত সত্য-উদ্ঘাটনের ব্যাপারে তার আন্তরিক, সৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনও পক্ষ থেকেই কোনও রকম সহযোগিতা পায় না। অনভিজ্ঞ সরল ছেলেটি শেষ পর্যন্ত এক নির্মম অভিজ্ঞতার দ্বারে এসে পৌঁছায়, প্রতিটি মানুষই এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্দী।

জোতদার শ্রীযুক্ত রামজীবন দে-র অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে চাষিরা। সেই নতুন দিনের কথা শুনিয়েছেন **অসিত চক্রবর্তী** তাঁর **'ঈশ্বরের মা উল্লাসিনী'** গল্পে।

এটি কেবল নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি গল্পমাত্র নয়। জীবনের গভীরতম ভাবনার এক অনবদ্য রূপায়ণও বটে। প্রবহমান জীবন চলতে চলতে পালটাতে পালটাতে কোথায় গিয়ে যে ঠেকে, পূর্ববর্তী পরবর্তী জীবন যাপনের মধ্যে আদর্শগত কত দুস্তর ব্যবধানই যে বেড়ে ওঠে, সেই চলমান জীবনের বহমান স্রোতের কথা অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন **মীনাক্ষী সেন** তার **'মামিমা'** গল্পটিতে।

কৃষকের ফসল রক্ষার সংগ্রামে পৃথ্বীরাজের আত্মোৎসর্গের এক উজ্জীবিত কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন **মোহিত রায়** তাঁর **'নামকরণের ইতিকথা'** গল্পটিতে।

জোতদার, মহাজনদের সঙ্গে লড়াইয়ে সুমন সর্দাররা জয়ী হলেও প্রাণ দিতে হয় তাদের নেতা বুধু মাস্টারকে। তবে সংগ্রামী চেতনায় দৃপ্ত, ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবীদের মধ্য দিয়েই নতুন নেতা তৈরি হয় যথাকালে সেই সত্যে উদ্ভাসিত **সনৎ বসুর 'মৃত্যুহীন'** গল্পটি।

সকালে-দুপুরে বিকেলে-সন্ধে দিনের যে কোনও সময়েই বাড়ি থেকে বার হয়ে সে আর আদৌ বাড়িতেই ফিরবে কি না সে নিশ্চয়তা সেদিন ছিল না। বাড়ি থেকে বার হয়ে অনেকে সরাসরি চিরকালের জন্য স্থান পেয়েছে মর্গে। সেই স্বপ্নদেখা যুবকদের আর তাদের অসহায় পিতাদের কথা বলেছেন **সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর **'জনৈক অনিরুদ্ধ'** গল্পে।

কৃষ্ণরূপের ছেলে, একদা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায় ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা ভাবে। মনে হাজারো প্রশ্ন জাগে তার। অতীতের সেই ভেসে যাওয়া দিনগুলির ভাবনা সূত্রে বর্তমানের আনন্দ ক্রম উন্মোচিত হতে থাকে **গৌতম ঘোষ দস্তিদারের 'চাঁদ ও স্বৈরিণী'** গল্পে।

সন্দেহ, সংশয়, ভয়, বিশ্বাসহীনতা, সংঘাত আর রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ভরা খুনোখুনির সেই সময়টাকে স্বরূপে তুলে এনেছেন **স্বপন সেন** তাঁর **'সাদা রুমাল'** গল্পটিতে।

সনাতন চৌকিদারের ছেলে বিশ্বনাথ বিশেষ রাজনৈতিক ভাবনায় দীক্ষিত হয়ে সংগ্রামে নেমেছিল। সে-সময়ের অনেক তরুণের মতোই তারও অনিবার্য পরিণতি ঘটে মৃত্যুতে। পুলিশের হাতে। বিশ্বনাথের লাশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যায় পুলিশ। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য অদূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় সনাতন চৌকিদার। এই নির্মম ভয়াবহ দৃশ্যের চূড়ান্ত বাস্তবতায় আমাদের শিহরিত করেন **অনিল ঘড়াই** তাঁর **'চৌকিদার'** গল্পে।

একদা বিশেষ রাজনৈতিক দলের পোষ্য মস্তান বিল্টুর মুখ দিয়ে রাজনৈতিক দল ও তার নেতাদের চরিত্রের আভ্যন্তরিক সত্য সুন্দরভাবে উদ্ঘাটন করেছেন **মৃণাল চক্রবর্তী** তাঁর **'অ্যাকশন'** গল্পে।

মাতাল মাস্টার ওরফে অলকেশদার অন্য জীবনের কথা ফুটবল খেলোয়াড় তথা রিকশাচালক বিলু সুন্দর বর্ণনা করেছে। মাস্টারের কথাবার্তা, জীবনদর্শন, কাজকর্মকে; সর্বোপরি অলকেশদাকে ভালোবেসে ফেলে বিলু। **সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টিপাত'**-এ পাই এ-কাহিনী।

বিপ্লবী নিলয় সেনের আত্মখননের মধ্য দিয়ে এক গভীর ভাবনায় আমাদের পৌঁছে দেন **রবিশংকর বল** তাঁর **'বিপ্লবীর সোনারূপো'** গল্পটিতে।

এই সঙ্কলনভুক্ত গল্পকারগণ তাঁদের একটি করে মূল্যবান লেখা দিয়ে বর্তমান সঙ্কলনটিকে সমৃদ্ধতর করতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত চারটি গল্প সঙ্কলন থেকেও শ্রীমিহির আচার্য সম্পাদিত 'পশ্চিম বাঙলার গল্প সংগ্রহ', প্রকাশিত শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পাদিত 'স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গল্প সংকলন', শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ ও শ্রীচন্দন ঘোষ সম্পাদিত 'জন্মভূমির গল্প সঙ্কলন' এবং দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও রতন খাসনবীশের সম্পাদনায় 'অনীক' পত্রিকার 'অনীক পঁচিশ বছর গল্প সংকলন'—অতিথি-সম্পাদকঃ মহাশ্বেতা দেবী) আমরা কয়েকটি গল্প নিয়ে এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছি। সেই সঙ্কলন-সম্পাদকদের প্রতিও রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কিছু গল্প সংগ্রহ করে দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীশুকদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমিহির আচার্য ও শ্রীমতী শান্তি আচার্য। এঁদেরকে জানাই আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা।

শ্রীমিহির সেন, শ্রীচিত্ত ঘোষাল, শ্রীকল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকিন্নর রায় ও শ্রীস্বপন দাসাধিকারী কয়েকজন গল্পকারের সন্ধান দিয়েছেন। এঁদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আমার প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী সুতপা সরকার দুটি গল্প সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দুটি জরুরি গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার আর দুই প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী সঙ্গীতা রায় ও শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত।

'পুনশ্চ'-র তরুণ প্রকাশক শ্রীসন্দীপ নায়কের জন্যই এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হল। সন্দীপের বিশিষ্ট রুচিবোধ, সততা ও ভদ্রতার টানেই তার কাছে আসা। থাকা। তিনি আমার বিশেষ স্নেহভাজন। আপনজন। কাছের মানুষ। বিশেষণে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন তাঁর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

সূচিপত্র

নকশাল আন্দোলনের গল্প

সিগারেট ধরালাম। সুবোধের মুখ খানিকটা লম্বা ধরনের। চোয়াল ভাঙা। গালে কয়েকটা ব্রণর দাগ। থুতনি শক্ত এবং চাপা। নাকের ডগা রীতিমতন মোটা। কপালের ডান দিকে বড়ো আঁচিল।

—তুমি কলকাতায় থাকো?

—দমদমে।

—তোমার বয়েস? তেইশ না চব্বিশ?

—তেইশ।

—পড়াশোনা কতদূর করেছ?

—বেশি দূর নয়। বি কম শুরু করেছিলাম।

—তোমার কি শীত করছে?

আমার বেখাপ্পা প্রশ্নে সুবোধ কেমন থতমত খেয়ে গেল। এটাও আমার ইচ্ছাকৃত। মানুষের স্বভাব হল, স্বাভাবিক কথাবার্তা বেশিক্ষণ বলতে দিলে সে ধাত পেয়ে যায়। আপাতত সুবোধকে খানিকটা এলোমেলো করে রাখাই আমার দরকার।

—শীত? ....না, শীত নয়। সুবোধ খাপছাড়াভাবে বলল।

আমার মনে হল, সুবোধের শীত শীত করছে। এখন কার্তিক মাসের শেষ। সকালে রাত্রে বেশ ঠান্ডা পড়ছে এখানে। সকালে এক একদিন ঘন কুয়াশা জমে। রাত্রে হিম পড়ে। এখন অবশ্য না সকাল না সন্ধে। দুপুরের শেষ। জানলার পর্দা সরিয়ে কাচের পাল্লাগুলো খুলে দিলে আলো আসবে, মরা রোদ দেখা যাবে মাঠে-ঘাটে।

পাখাটা বন্ধ করার উপায় ছিল না আমার। সামান্য আগে কপাল গলা ভিজে গিয়েছিল ঘামে। সল্ট ট্যাবলেট খেয়েছি জলে গুলে। এই ঘামকে বলে টেনশান সোয়েটিং। শীত গ্রীষ্ম বলে কথা নেই; উত্তেজনা থাকলেই ঘাম হবে। ইদানীং এটা হচ্ছে আমার। বয়েসের জন্যে বোধ হয়। কিংবা মনের জোর হারিয়ে ফেলছি। আমাদের পেশায় পঞ্চাশই যথেষ্ট। তার পর শরীর আর মনের স্বাভাবিকতা থাকে না।

—তুমি গলার দিকে বোতাম এঁটে দিলে—তাই মনে হল, আমি বললাম। সিগারেটের ধোঁয়া গিলে একবার ফাইলটার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ তুললাম। 'তোমার বাড়ির কথা বলো। কে কে আছেন?'

সুবোধ গলা পরিষ্কার করল। 'অনেকে আছে।'

—মা বাবা, বোন ভাই বিধবা এক পিসিও বোধ হয়.........। আমি এবার একটু হাসির মুখ করলাম।

—আপনি তো সবই জানেন.......। সুবোধ অবাক হল না আর।

—কাগজপত্র দেখে যা জেনেছি। ....তা তোমার বাবার বয়েস কত?

—কাগজে লেখা নেই? সুবোধ যেন অন্য গলায় বলল, একটু খোঁচা থাকতে পারে।

—যা জিজ্ঞেস করছি বলো। আমার গলা নিজের থেকেই শক্ত হয়ে গেল।

সুবোধ চোখ নামাল। 'বাবার ঠিক বয়েস আমি জানি না। বছর ছাপান্ন।'

—এখনও চাকরি করেন?

—হ্যাঁ। সিনেমা হাউসে। বুকিং কাউন্টারে।

—তোমাদের একটা দোকান আছে না?

—না, দোকান নয়। আমার ভাই একটু জায়গা ঘিরে নিয়ে বসে ইলেকট্রিকের কাজকর্ম করে।

—তোমার মা স্কুলে কাজ করেন?

—পড়াশোনার কাজ নয়। স্কুলের অফিসে। সামান্য কাজ।

—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—বাড়ি? জানি না। দেখিনি।

আমি সুবোধের মুখচোখ লক্ষ করছিলাম। বাড়ির কথাবার্তা বলতে তার ভালো লাগছিল না। বিরক্ত হচ্ছি[illegible]।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে নিভিয়ে দিলাম। দেওয়ালে ঘড়ি ঝুলছে। তিনটে দশ। বাইরে রোদের তাত কমছে বোধ হয়। জানলার পর্দা সরিয়ে পাল্লাগুলো খুলে দিলে ছেলেটা আরাম পাবে। বাইরে আকাশবাতাস মনোরম। হেমন্তের পালানো রোদ মটর খেতের মাথায় বসে ধুলো ঝাড়ছে যেন গায়ের।

—তোমাদের দেশ কোথায় জানো না?

—শুনেছি যশোর। শোনা-কথায় দেশ। দেখিনি।

—তোমরা কি বরাবর কলকাতায়?

খাস কলকাতায় নয়! আমি টালিগঞ্জে জন্মেছি। আমরা টালিগঞ্জ, বেহালা, পাতিপুকুর অনেক জায়গায় থেকেছি। ভাড়াবাড়িতে। বস্তিতে।

—বস্তিতে?

—আজকাল বস্তিই বেশি। সুবোধের গলা যেন ঠাট্টার মতন শোনাল। 'বস্তিতেই বেশি লোক থাকে। আমাদের মতন লোক।'

আমি কিছু বললাম না। ওকে অল্পস্বল্প সহজ স্বাভাবিক হওযার সুযোগ দেওয়া উচিত। বরং আরও একটু বেশি হালকা হতে দিলেও ক্ষতি হবে না।

তা ঠিক। আমি মাথা নাড়লাম, 'কলকাতার দশ আনাই শুনেছি বস্তি হয়ে গিয়েছে। এক একটা ভাড়াটে বাড়িতে বিশ ভাড়াটে। আউটস্কার্টের কলোনিগুলো নাকি নরক।'

—লোকে তাই বলে।

আমার চশমাটা টেবিলের উপর রাখা ছিল। চশমার পাশে ডট পেন্। ডট পেনটা তুলে, প্যাডের উপর রাখলাম। তারপর আচমকা বললাম, 'এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে।'

সুবোধ যেন আমার কথা ভালো বুঝল না।

—তুমি তিন নম্বর ব্যারাকে আছ না।

—হ্যাঁ।

—তিন নম্বরটা সবচেয়ে ভালো। স্পেশাল ব্যারাক। নতুন হয়েছে। অঢেল রোদ, বাতাস, স্যানিটারি অ্যারেঞ্জমেন্টও খুব ভালো। তাই না।

—হ্যাঁ, কিন্তু জানলার বাইরে লোহার জাল। বাইরে তাকালে কম্পাউন্ড ওয়ালের মাথায় কাঁটাতার। আপনাদের লোকজন পাহারা দেয়, বসে থাকে।

কথাগুলো আমি শুনেছি এমন কোনও ভাব করলাম না। আবার আচমকা বললাম, 'তুমি গায়ে-মাথায় মাখার জন্যে সাবান-টাবান পাচ্ছ তো? ওয়াশিং সোপও আমরা দি। মশার তেল পেয়েছ? এখানে খুব মশা। ম্যালেরিয়া হতে পারে। বি ভেরি কেয়ারফুল। আমাদের মশার তেলটা খুব ভালো। মিলিটারি থেকে সাপ্লাই পাই। তিন চার ফোঁটা হাতে নেবে, মাখিয়ে নেবে হাতে তারপর মুখে হাতে জাস্ট বুলিযে নেবে.... । শরীরে যে কোনও ওপেন পার্টেইউজ করবে। কোনও ক্ষতি হবে না। ....ভালো কথা, তোমার ডান পায়ের থাইয়ের এক জায়গায় ইনজিউরির দাগ আছে। ওটা কীসের? বোমা-টোমার চোট?

সুবোধ কেমন চমকে উঠল। তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, এই ব্যাপারটাও আমার জানা।

মনে মনে আমি কৌতুক অনুভব করছিলাম। সুবোধ নিশ্চয় বুঝতে পারছে না আমি তাকে আরও কতভাবে অবাক করে দিতে পারি।

সুবোধ বলল, 'না, বোমার নয়।'

—বোমার নয়! কীসের দাগ?

—একবার তারকাঁটার ওপর পড়ে গিয়েছিলাম।

কেমন করে? তোমার পিঠের দিকেও সামান্য দাগ আছে।

আমাদের পাড়ার একটা একতলা বাড়ির নেড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে পড়ে গিয়েছিলাম।

—ও! কত দিন আগে?

সুবোধ বেশ বিরক্ত হল। বুঝতে পারছিল আমি তার কথায় সন্দেহ করছি। ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'দু-তিন বছর আগে। হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। আর জি কর। ওখানে খাতায় লেখা আছে।'

সুবোধ রেগে যাচ্ছিল। কম বয়েসে রাগটা চট করে হয়। সুবোধকে মাঝে মাঝে রাগানোও আমার দরকার। রাগানো, ভোলানো।

আমি আবার একটু নরম হয়ে গেলাম। 'ছোটোখাটো ব্যাপারেও ওই পুলিশের বড়ো সন্দেহ বুঝলে হে, নিজের বাপকেও সন্দেহ। ওরা একেবারে অমানুষ। আমি কিন্তু পুলিশ নয়। নাথিং টু ডু উইথ দেম। তোমার কাগজপত্রে নানান রকম কেচ্ছা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই বললাম। ....চা খাবে?'

—না।

—আরে রাগ করছ কেন? খাও, একসঙ্গেই খাওয়া যাক। সাড়ে তিনটে বেজে গিয়েছে। তোমার তো আবার শীত শীতও করছে। বলে আমি টেবিলের তলায় সুইচে হাত দিলাম। বাইরে কলিং বেল বাজবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার আরদালি মোহন এল।

—চা দাও। দু কাপ। পাখাটা বন্ধ করে দাও।

মোহন পাখার সুইচ বন্ধ করল। করে চলে গেল। দরজা বন্ধ হল।

আমি একটু হাসলাম। নরম হাসি। 'দেখো সুবোধ, যার যা কাজ তা না করে উপায় নেই। আমারও সেই অবস্থা। আমার কাজটা ঝকমারি। তবু ভালো পুলিশের কাজ নয়। পুলিশদের আমি নিজেও পছন্দ করি না। টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, আমার মেয়ে—তা ধরো তার বয়েস এখন একুশ, আমাদের ফার্স্ট চাইল্ড. তার বিয়ের এক সম্বন্ধ এসেছিল আই পি এস ছেলের সঙ্গে। না করে দিয়েছি। আমার স্ত্রী একটু খুঁতখুঁত করছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম, হাজার ভালো হোক, অনেস্ট হোক—পুলিশ পুলিশ, দেযার ইজ সাম ডার্ট অন দেম ইউ ক্যান নেভার ওয়াইপ আউট। ....তা তোমারও তো একটি বোন রয়েছে। কত বয়েস?' আমি খোলামেলা গল্প করার ঢঙে, খানিকটা অন্তরঙ্গ হয়ে কথাবার্তা বলছিলাম, ইচ্ছে করেই। কথা শেষ করে বাকি জলটা খেয়ে নিলাম। সল্ট ট্যাবলেটের নোনতা স্বাদ। আবার একটা সিগারেট ধরালাম।

সুবোধ বলল, 'আমার বোন আর ছোটো ভাই যমজ। বোনের বয়েস কুড়ি।'

—আমার মেয়েরই সমবয়েসি। কিন্তু যমজদের ব্যাপারে একটা পিকিউলিয়ারিটি আছে। যমজরা সাধারণত একই রকম হয়। ছেলে তো দুটোই ছেলে; মেয়ে তো দুটোই মেয়ে। এক ছেলে এক মেয়ে দেখা যায় না। তাই না?

—আমি ঠিক জানি না।

—নজর করোনি আর কি। আরও দু জোড়া যমজের কথা ভাবলে বুঝতে পারবে। তোমার বোনের নাম কী?

—ডাকনাম বেলা।

—বিয়ে-থা দিতে পারনি? কী যেন করে দেখছিলাম?

সুবোধ তাকিয়ে থাকল। বুঝতে পারল, আমার জানা আছে তার বোন বেলা কী করে। সামান্য পরে বলল, 'বাড়ি বাড়ি ধূপ, আচার, মোরব্বা বিক্রি করে।'

সিগারেটের ধোঁয়া গিলে চুপচাপ বসে থাকলাম। আমার আর ঘাম হচ্ছিল না। টেনশান যে কেটে গিয়েছে তা নয়, সয়ে গিয়েছে। এ-রকম হয় আমার। আগে যে উত্তেজনা এবং মানসিক দুর্বলতা থাকে, কেমন একটা অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, সেটা ধীরে ধীরে কেটে যায়। ধাতস্থ হয়ে পড়ি।

মোহন চা নিয়ে এল। রাখল। তাকে ইশারায় আমি কিছু বললাম। সে আমার ডানপাশের ঘরের দরজার চাবি খুলল। ভেতরে গেল। ফিরে এল। ইশারায় জানাল—সব ঠিক আছে।

চলে গেল মোহন।

—নাও, চা খাও।

সুবোধ চায়ের দিকে তাকাল। মুখ দিল না।

মনে মনে আমার মজা লাগছিল। সুবোধ বোধ হয় ভাবছে চায়ের সঙ্গে কিছু মেশানো আছে। না, তেমন কিছু নেই। যা আছে তাতে ওর উপকার বই অপকার হবে না।।

চায়ে মুখ দিয়ে আমি বললাম, 'খাও!'

সুবোধ আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য দ্বিধার সঙ্গে চায়ে চুমুক দিল।

—সিগারেট খাবে?

আমার আচমকা প্রশ্নে সুবোধ থতমত খেয়ে গেল। ছোটো করে বিষম খেল একবার।

—না। মাথা নাড়ল সুবোধ।

—তুমি সিগারেট খাও না?

—খাই।

—এরা তোমায় সিগারেট দেয় না?

—দেয়। এক প্যাকেট। সস্তা সিগারেট।

—তুমি কি দামি সিগারেট খেতে?

—না। কোথায় পাব। যা খেতাম তাই দেয়।

—আমাদের যা নিয়ম তার বাইরে কিছু দেওয়ার উপায় নেই। তা হলেও তুমি দেখেছ—আমাদের সব রকম ব্যবস্থাই ভালো। খাওয়া শোওয়ার কোনও কষ্ট নেই। আমরা সাধ্যমতন তোমাদের আরামে রাখার চেষ্টা করি। ঠিক?

সুবোধ কোনও কথা বলল না। চেষ্টা করল হাসার। ওর দাঁতের, সামনের দাঁতের সামান্য দেখা গেল। সাদা। শক্ত। সুবোধের চোখ খানিকটা লালচে দেখাচ্ছিল। কেন কে জানে!

—নাও, সিগারেট নাও। যদিও তুমি আমার ছেলের বয়েসি, তবু নাও। লজ্জার কিছু নেই। আমি হাসলাম, প্যাকেট লাইটার এগিয়ে দিলাম। 'কী একটা শ্লোক আছে না—কত বছর বয়েস হয়ে গেলে যেন ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করতে হয়......!'

সুবোধ হাত বাড়াল না, সিগারেটও নিল না। চায়ে চুমুক দিল আবার।

আমার মজা লাগছিল। এই সব ছেলে-ছোকরাদের এক ধরনের অবাধ্যতা থাকে। বেয়াড়াপনা ঠান্ডা করতে আমাদের বেশি সময়ও লাগে না। তবু, এখন এই মুহূর্তে আমি কিছু করতে চাই না।

—তুমি আর কী নেশা কর? আমি বললাম, শান্ত গলায়, গল্প করার মতন আমেজি ঢঙে।

—নেশা! আর কোনও নেশা করি না।

—মদটদ খাও?

—না।

—গাঁজা, চরস? হ্যাসিস?

—না না।

—কিছুই না। বাঃ, তুমি তো ভালো ছেলে! ....আজকাল যে কী হয়েছে বুঝতে পারি না। ছেলে-ছোকরা দেখলেই কতকগুলো দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। ফরনাথিং কতকগুলো ভাইসেস তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। এই যেমন তুমি। তোমার কাগজপত্রের মধ্যে দেখছিলাম—তুমি সিগারেটের মধ্যে গাঁজা ঢুকিয়ে খাও।

—মিথ্যে কথা। আমি গাঁজা খাই না।

—আচ্ছা। মদও নয়?

—এক-আধ দিন খেয়েছি।

তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মদ-গাঁজার খুব চল। কী বলো।

—অনেকে খায়।

ড্রয়ার টেনে আমি ভেতরে হাত ডোবালাম। আঙটিটা এবার পালটে নেওয়া উচিত। সুবোধ চা খাচ্ছে।

—তোমার বোনের কথা হচ্ছিল তাই না, আমি আঙটি পালটাতে পালটাতে বললাম, 'কী যেন নাম বললে? বেলা! তা এই বেলার সঙ্গে যে ছেলেটা ঘুরত, তাকে তুমি ছুরি-ছোরা মেরেছিল নাকি?'

সুবোধ খানিকটা থতমত খেয়ে গেল, তাকিয়ে থাকল। এমন করে আমায় দেখছিল যেন বুঝতে পারছিল না, আমি সর্বজ্ঞ কি না!

আমি চা শেষ করলাম।

সুবোধ বলল, 'আমি ছুরি মারিনি।'

—কে মেরেছিল?

—জানি না।

—তুমি কিছুই জান না? এত ন্যাকা-বোকা তো তুমি নও হে! হঠাৎ আমি বললাম।

সুবোধের মুখ সামান্য অন্যরকম হয়ে গেল। মনে হল, যেন ঠাস করে আমি ওর গালে চড় মেরেছি।

ওকে সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়েই আমি বললাম, 'তোমার বোন ক বার নার্সিংহোমে গিয়েছে?'

সুবোধ স্তম্ভিত। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল বোকার মতন। কমুহূর্ত পরেই তার চোখ ঘৃণায় কেমন জ্বলে উঠল।

—লজ্জার কিছু নেই, আমি বললাম, 'আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে। বাইরের কেউ শুনতে যাচ্ছে না। তা ছাড়া আজকাল তো এ-সব জলভাত। ....ক বার?'

সুবোধ উঠে দাঁড়াল। 'আপনি আমার বাড়ির লোকদের সম্পর্কে........।'

—বসো। মাথা গবম কোরো না। এখানে মাথা গরম করতে নেই। তাতে তোমার লাভ হবে না। বসো।

আমাব গলার স্বর হঠাৎ এত শক্ত, কঠিন হয়ে গেল যে সুবোধ বোধ হয় চমকে গেল। আবার বসল।

তোমার বাড়িকে বাদ দিয়ে কথা বলতে পারলে ভালো হত। আমি খুশি হতাম। কিন্তু তার উপায় নেই। তোমাব বাড়ি তোমায় তৈরি করেছে। ....আগে তোমার বোনের কথা হোক—তারপর তোমার মা বাবার কথায় আসছি। ....বলো, তোমার বোন কবার নার্সিংহোমে গিয়েছে?

সুবোধ দাঁতে দাঁত চাপছিল। 'একবার।'

—দু বার।

না।

—প্রথম বাব সে বাড়ি ছেড়ে দিন সাতেকের জন্যে কোথায় গিয়েছিল?

—কেষ্টনগর, আমাদের এক মাসির বাড়ি।

—দ্বিতীয় বার কেন গিয়েছিল?

—বিষ খেয়েছিল।

—কেন?

—মাব সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল।

—তুমি আমায় এত বোকা ভাবছ কেন হে, আমি হাত বাড়িয়ে সুবোধের ফাইলটা টেনে নিলাম। 'মা মেয়ের ঝগড়া কোন বাড়িতে না হয়। শুধু ঝগড়ার জন্যে কেউ বিষ খায়? তা ছাড়া বাপু নার্সিং হোমে মেয়েকে রাখার ক্ষমতা তোমার মা-বাবার, আছে বলে তো বিশ্বাস হয় না। ও-সব বড়লোকি ব্যাপার কি তোমাদের পোষায়!'

সুবোধ এবার আর কোনও কথা বলল না। তাকে অসহায় দেখাচ্ছিল। ফাঁদে পড়ে গিয়েছে।

—তোমার বাবা আর মায়ের মধ্যে বনিবনা কেমন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তাকিয়ে থাকল সুবোধ। তার চোখ সামান্য যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মোটা মোটা ভুরু, কপালের মাঝামাঝি এত ময়লা যে মনে হয় ঘা-টা কিছু হয়েছিল এক সময়।

—কী হল, কথা বলছ না? তাড়াতাড়ি করো—।

—বাবা বদমেজাজি। খায় দায় তাস খেলে আর সিনেমা হাউসে গিয়ে বসে থাকে।

—শখের তাস না জুয়া?

—জুয়াও খেলে।

—নেশা ভাং করার অভ্যেস আছে?

—আছে।

—তোমার মা কত দিন স্কুলের কাজটা করছেন?

—চার-পাঁচ বছর।

—কেন?

—পয়সার জন্যে। বাবার রোজগার কম। সেই টাকায় সংসার চলে না। বাবা যা পায়—তারও খানিকটা নষ্ট করে। মা স্কুলের চাকরিতে সোয়াশো দেড়শো টাকা পায়। মায়ের চাকরি ঝিয়ের মতন। স্কুলের অফিসে টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করে, খাতা গোছায়, দিদিদের ফরমাস খাটে, বড়োদি—মানে হেডমিস্ট্রেসের এটা-ওটা করে দেয়। মা সামান্য লেখাপড়া জানে। ভালো কাজ আব কী করবে!

—তুমি কী করতে?

—কিছু না।

—চাকরি-বাকরি করতে না কেন?

—কেউ দিত না। দু-এক জায়গায় এক-আধ মাস করেছি। তাড়িয়ে দিয়েছে।

—ঠিক আছে। ....এবার তোমায় নিয়ে একটু পাশের ঘরে যাব। বেশিক্ষণ না, ঘণ্টাখানেক; তারপব তোমার ছুটি।

দুই

ঘরে ঢুকে সুবোধ দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন ভয় পেয়েছে। আমি তার পেছনে ছিলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম।

এই ঘরের চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে ভয় পাওয়াব কিছু নেই। সরু, লম্বা ঘর। ছোটো। একটি মাত্র লম্বাটে জানলা। জানলা বন্ধ। পর্দা ঝুলছে। ঘরের মাথার দিকে ঘুলঘুলিতে একটা একজস্ট ফ্যান, পাখাটা চোখে পড়ে না। সেটা ঘুরছিল। শব্দ হচ্ছিল সামান্য। দুটি মাত্র চেয়ার ঘরে। একটা টেবিল—লম্বা সরু ধরনের, ডাক্তারদের রোগী দেখার চেম্বারে যেমন থাকে। আপাতত মিহি বাতি জ্বলছিল ঘরে। জোরালো বাতিগুলো নেভানো। সেগুলো কোনটা কোথায় বোঝা যায় না। বোঝা যায় না—এই ঘরের দেওয়ালে একটা চোরা ছোটো কাবার্ডও রয়েছে। একেবারে স্তব্ধ ঘর। পাখার একঘেয়ে শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ শোনা যায় না।

—ওই চেয়ারটায় বসো তুমি, আমি বললাম। বলে একটা চেয়ার দেখালাম।

সুবোধ বসা-গলায় বলল, 'এই ঘরটা কীসের?'

—এমনি ঘর। বেশ নিরিবিলি। বলে আমি একটু হাসির গলায় বললাম, 'আমি নাম দিয়েছি, জতুগৃহ।'

—জতুগৃহ?

—আরে মহাভারতের জতুগৃহ নয়। পুড়িয়ে মারার জন্যে তৈরি হয়নি। যাও, বসো।

—চেয়ারের মাথার পাশে ওটা কী?

—কিছু না। আলো। নেভানো রয়েছে। তোমার ভয়ের কিছু নেই।

সুবোধ চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। 'আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে।'

—একটু পেতে পারে। যদি বেশি পায় টেবিলে শুয়ে পড়ো।

সুবোধ চেয়ারে বসল। ওর মুখ বলছিল ও ভয় পেয়েছে, তবু এক ধরনের নিরুত্তেজনায় তার চোখ মুখ ঠোঁট কেমন শান্ত, শুকনো দেখাচ্ছিল। দেখানোই স্বাভাবিক। চায়ের সঙ্গে যে ওষুধটা মেশানো ছিল—তা ওকে ক্রমশই খানিকটা অবশ, শান্ত, অচঞ্চল করে তুলবে। ঘুমঘুম পাবে, আলস্য অনুভব করবে। এক ধরনের আচ্ছন্নতা আসবে সুবোধের, তন্দ্রার মতন অবস্থায় থাকবে।

সুবোধ বলল, 'আমাকে এখানে কেন এনেছেন?'

আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম। বসলাম না। হাতের ঘড়িটা দেখলাম এক পলক। চারটে পাঁচ। ঘণ্টা খানেকের বেশি আমার লাগবে না।

—তোমার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানতে চাই, আমি বললাম।

এতক্ষণ তো জানলেন। আপনার সবই জানা আছে।

—মোটামুটি আমি টেবিলের দিকে সরে গেলাম।

— তোমার কাগজপত্রের মধ্যে বানানো কথা রয়েছে অনেক। তুমি আমায় সত্যি কথা বলবে। লুকোবে না। আমি সত্যি-মিথ্যের তফাত করতে পারি। বলে আমি পকেট থেকে পেনসিলের মতন সরু ইঞ্চি ছয় লম্বা চকচকে একটা জিনিস বার করলাম। দেখালাম সুবোধকে।

—ওটা কী? সুবোধ বলল।

আমি হাসির মুখ করলাম। 'তেমন কিছু নয়। ডিটেক্টার। এটা ইলেকট্রনিক্যালি অপারেটেড এক রকম টর্চ। ইন্‌ফ্রারেড রে বেরুবে জ্বাললে। তোমার চোখের পাতায় আলোটা দিয়ে রাখলে ভীষণ যন্ত্রণা হবে। গরম লাগবে খুব। মনে হবে চোখের পাতা, মণি পুড়ে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ রাখলে অন্ধও হয়ে যেতে পাব।'

সুবোধ হতবাক। ভয় পেল। 'আপনি আমায় অন্ধ করে দেবেন?'

—না না, আমি মাথা দোলাতে লাগলাম, 'আমি কেন অন্ধ করব! তুমি যদি চাও হতে পারো। তোমাব ওপর নির্ভব করছে। ......এই আঙটিটা দেখছ?' আমি ডান হাত বাড়িয়ে আঙটিটা দেখালাম। 'এটা আমাব আবিষ্কাব! মাছির কত চোখ, জানো? মাথা ভরতি চোখ। এই আঙটিটাব মাথায় সুতোর মতন সরু সরু গোটা পঁচিশ ছুঁচ আছে। ভেরি শার্প অ্যান্ড হার্ড নিড্‌ল্‌স। তোমার ঘাড় আর মেরুদণ্ডের কাছে যদি টিপে ধরি যন্ত্রণায় মরে যাবে।'

সুবোধ শিউবে উঠল। তার ঠোঁট মুখ এত শুকিয়ে গেল যে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে লাগল। ঢোক গিলল বার কয়েক।

টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে আমি ওকে আশ্বাস দেওয়ার গলায় বললাম, 'সবই তোমার ওপর নির্ভব করছে। তুমি ঠিক ঠিক বললে, সত্যি কথা বললে এ-সবের দরকার হবে না। মিথ্যে বললে......!'

সুবোধ শুকনো ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ক্লান্ত চোখ সামান্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ভয়ের সঙ্গে ঘৃণা ছিল দৃষ্টিতে। বোধ হয় সে ভব্য কোনও শয়তানের চেহারাটা দেখছিল।

—আমায় একটু জল খাওয়াবেন? সুবোধ বলল।

—এখন নয়। পরে।

—আমার তেষ্টা পাচ্ছে।

—পাক।

চুপ করে গেল সুবোধ। কিছু ভাবছিল। মাটির দিকে চোখ। সামান্য পরে মাথা তুলল। 'কী জানতে চান আপনি?'

—তুমি নিজেই বলো। আমার যা জানার আমি জেনে নেব।

সুবোধ জামার গলার কাছের বোতামটা খুলে ফেলল। বলল, 'আমার বাড়ির কথা আপনি জানেন। আপনার কাছে যে কাগজপত্র আছে তাতে দেখেছেন। তবে সেটা সব নয়, বাজে কথাও রয়েছে অনেক। ...আমার

বাবার কথাই বলি। বাবা একসময়ে সিনেমার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করত। মেশিন সারানোর কাজ। মেকানিক। তাতে পয়সাকড়ি ছিল। চুরিচামারির জন্যে কাজটা যায়। তারপর বসে ছিল অনেক দিন। শেষে হাতেপায়ে ধরে লাহাবাবুদের সিনেমায় বুকিং কাউন্টারে কাজ জোগাড় করে। বাবাকে ওরা বিশ্বাস করে না। টিকিট বিক্রির সময় কেউ না কেউ পাশে থাকে। তবু ওই কাজটাই বাবার ভরসা।'

সুবোধ থামল একটু। ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল। 'বাবার স্বভাবে কোনও দায়দায়িত্বের বালাই নেই। আমরা ছেলেবেলা থেকে গোরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির মতন বেড়ে উঠেছি। কোনওদিন দেড় কি দুখানা ঘরের বেশি দেখিনি। আলাদা জলকল পায়খানা পাইনি কখনও। আমার পিসি বিয়ের দু বছরের মাথায় বিধবা হয়ে আমাদের কাছে চলে আসে। পিসেমশাই কর্পোরেশনে কাজ করত। ট্রামে কাটা পড়ে মারা যায়। পিসেমশাইয়ের কিছু পয়সাকড়ি জমানো ছিল। তার মা আর ভাই পিসিমার পেছনে লেগেছিল। ভাগ্নি পিসিমাকে শুতে-বসতে-কাপড় ছাড়তে দিত না। পিসিমা পালিয়ে এল আমাদের কাছে। কিছু পয়সাকড়ি হাতে পেয়েছিল পিসিমা। ছেলেবেলা থেকে আমরা যে যার মতন চরে বেড়ালেও পিসি আমাদেব মানুষ করেছে।'

—তোমাব মা?

—বলছি, শুনুন। দেড়-দুখানা ঘরে গাদাগাদি করে ছজন মানুষ থাকতাম। মা বাবা একঘরে, বাকি চার জন অন্য ঘরে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মা আব বাবা ঝগড়া করত। বাবা ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট বেচতে দুপুবে বেরিয়ে যেত—তারপর বাড়ি ঠান্ডা হত। বাবা বাড়ি ফিরত রাত্তিরে। বেশিরভাগ দিন দিশি খেয়ে। মা-বাবায় আবার লাগত। মাঝে মাঝে হাতাহাতি। বাবা নেশার ঘোরে কাপড়চোপড় খুলে ফেলত, পেচ্ছাপ করত ঘরে দাঁড়িয়ে। মা বাবাকে মারত। পিসি মাঝখানে গিয়ে পড়লে দু-তরফের গালাগাল হজম করত। .... আমার মা সংসার ঠেলে ঠেলে আর বাসন মেজে মেজে রোগ বাধিয়ে ছিল নানান রকম। পয়সা নেই বলে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ধরেছিল মা। তার নাম গোকুল। লোকটার চোখ টেরা ছিল। সবাই বলত টেরা গোকুল। টেরা গোকুল মাকে একটু ভালোই বাসত। বলত এক দেশের লোক। মা পিসিকে টেরা গোকুলের বাড়িতে পাঠাত যখন—তখন। তারপর পিসি একদিন গোকুলের বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজে লেগে গেল। প্রথম প্রথম সন্ধের পর বাড়ি আসত, তারপর আর আসত না। পিসি এখন বারাসাতে থাকে। তার ছেলেপুলেও হয়েছে।

সুবোধ গলা ভেজাবার জন্যে লালা গিলল। এখন তার চোখমুখ আরও শুকনো, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। চোখের পাতা আরও যেন ছোটো হয়ে এসেছে।

—তারপর? আমি শুধোলাম।

—তারপর?.....হ্যাঁ—তার পরও আছে। জন্তু-জানোয়ার, রাস্তার কুকুর, ফুটপাতের বাচ্চাকাচ্চাও বড়ো হয়। তারা কী খেয়ে বড়ো হয়, কেমন করে বড়ো হয়—সে-সব আপনারা ভেবে দেখবেন। আমরাও বড়ো হয়ে উঠেছি গাদাগাদি করে মাটিতে শুয়ে, উকুনভরা ছেঁড়া তোশকের ওপর ঘুমিয়ে। শীতের দিন একটা কাঁথা একা কোনওদিন গায়ে দিতে পারিনি। আমি স্কুলে পড়েছি শেষ ক্লাস পর্যন্ত। পিসির জন্যে। কলেজেও ঢুকেছিলাম। পিসি থাকলে দশ-বিশ টাকা জুটত। মা-বাবা দু বেলা খাওয়াতেই পারে না তো পড়া। আমার ভাই এইট পর্যন্ত পড়েছে। শম্ভু—আমার ভাইয়ের মাথা মোটা। খাটতে পারে। অত রোগা, তবু ঘোড়ার মতন খাটে। শম্ভু পাড়ার ইলেক্‌ট্রিশিয়ান হরিদার দোকানে ভিড়ে গিয়েছিল। কাজ শিখেছে। এখন নিজে টুকটাক কাজ করে।'

—তোমার বোন?

—বেলা! বেলার কথা কী বলব?

—যা ঠিক, তাই বলো।

সুবোধ আবার জামায় হাতায় মুখ মুছল, জিভ চাটল। বলল, 'বেলাকে ছেলেবেলা থেকেই মা শাসনে

রেখেছিল। বেলা দেখতে ভালো নয়, খারাপও নয়। তার চেহারা ছিল বাড়ন্ত। বেলা স্কুলে ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। তার কাজ ছিল বাড়িতে বসে থাকা আর ঝি-গিরি করা। মা তাকে মারত, ধরত, গালাগালি দিত। বাবা বরং বেলার হয়ে লড়ত মার সঙ্গে। অনেকটা বড়ো হয়ে একদিন বেলা মার সঙ্গে চুলোচুলি করল। বিচ্ছিরি ঝগড়া। মা বেলার পিঠে ছেঁকা দিয়ে দিল খুন্তির। বেলা মার কনুই মচকে দিল। সে যে কী কাণ্ড ঘটল—বুঝতে পারবেন না। বেলা উনিশ নম্বর বস্তিতে তার বন্ধু কাঞ্চনের বাড়িতে গিয়ে থাকল দু রাত। এরপর থেকে মা ঠান্ডা। আর কিছু বলত না।'

সুবোধের গলা আরও জড়িয়ে আসছিল। টেনে টেনে ধীরে ধীরে কথা বলছে। আলস্য যেন তাকে গভীর করে গ্রাস করছে।

—তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে?

—হ্যাঁ, চোখ বুজে আসছে।

—এই টেবিলে এসে শুয়ে পড়ো।

—আমায় আর কতক্ষণ আটকে রাখবেন?

—কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

—আমি পারছি না।

—পারবে।

সুবোধ উঠল। তার পা টলল না। তবু ঘুমঘুম অলসভাবে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। আমি সরে গেলাম। পায়ের চটি খুলে সুবোধ টেবিলে উঠল। শুয়ে পড়ল।

সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, 'তোমার বোন বেলা কবে থেকে ধূপ, আচার বিক্রি করতে শুরু করল?'

—আজ বছর তিন করছে।

—ও বিয়ে করেছিল?

—আপনি তাও জানেন? ....হ্যাঁ, ও একটা বাজে ছেলেকে বিয়ে করেছিল লুকিয়ে। কালীঘাটে গিয়ে। আমাদের বলেনি। আমরা জানতাম না। সেই ছেলেটা, বাচ্চু, গাড়ির মাল চুরির লাইনে ছিল। গাড়ির টায়ার, রিম, ব্যাটারি..........টপাটপ সরাতে পারত। মল্লিকবাজার থেকে পয়সা পেত ভালো। একবার বাবার সিনেমা হাউসের কাছে গাড়ি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। বেদম মার খায়। বাবা দেখেছিল। বাচ্চুকে এত মেরেছিল সবাই যে হাসপাতালে সে মারা গেল। তার পেচ্ছাপের থলে ফাটিয়ে দিয়েছিল মেরে। বেলা তখন কান্নাকাটি করত। আমরা সেই সময় জানতে পারি।

—তা তুমি বোমা ছোড়া, ছুরি মারাটা কবে শিখলে?

সুবোধ শুয়ে শুয়ে মাথা নাড়ল। 'আমি বোমা ছুড়তে জানি না।'

—জানো না? বেশ........। আমি তার মাথার কাছে সরে এলাম। হাতে সেই চকচকে যন্ত্র। চোখে ফেলব।

সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। 'না।' তারা সারা মুখে আতঙ্ক। 'না।'

—তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তোমার জাংয়ের কাছে ওই দাগটা বোমার-সস্প্লিন্টারের। তোমার ওই পায়ের কড়ে আঙুল নেই।

মাথা দোলাল সুবোধ। 'হ্যাঁ।'

শুয়ে পড়ো। আমায় ঠকাবার চেষ্টা কোরো না।

সুবোধ শুয়ে পড়ল।

—এবার বলো।

সুবোধ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আমার যখন কিছুই হচ্ছিল না, একটা বেয়ারার চাকরিও নয়, তখন আমি সিঁথির ছোটো বাজারে মাছ বিক্রি করব ঠিক করে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পুঁজি নিয়ে নেমে

পড়লাম। দমদম মাছপটি থেকে কাদাচিংড়ি কিনে আনতাম আর বাজারে বসে বেচতাম। মাসখানেক পরে একটু পুঁজি বাড়ল। সকাল চারটে নাগাদ এক বন্ধুর ঝরঝরে পুরনো সাইকেল নিয়ে দমদম স্টেশনে মাছ আনতে যেতাম। একদিন গলির মধ্যে আমায় আটকে গুন্ডারা টাকাপয়সা কেড়ে নিল। আমি লড়তে গেলাম, শালারা আমায় বোমা মারল। জখম হয়েছিলাম। হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।'

'—তখন তুমি মিথ্যে বলেছিলে।

—হ্যাঁ। সত্যি বলে কী লাভ, স্যার। ....হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি অন্য রকম হয়ে গেলাম। সবাই দেখি হারামি। দশ আনা ছ আনা। তো আমিও হয়ে গেলাম। শয়তানদের সঙ্গে লড়তে হলে শয়তান হতে হয়।

—তোমার বোন বেলার সঙ্গে যে ছেলেটা ঘুরত, তাকে তুমি ছোরা মেরেছ?

—না। সত্যি না। মারতে গিয়েছি। পারিনি। শালার কপাল ভালো বেঁচে গেছে।

—কেন তাকে মারতে গিয়েছিলে?

—কেন? কেন আপনি বুঝছেন না? আমার বোনকে সে অন্য পাঁচটা ধূপ-বেচা মেয়ের সঙ্গে টুকরির মাল করে নিয়েছিল। সারা দিন ধূপ বেচলে কমিশন বাবদ তিনটাকা। সে-শালার সঙ্গে ঘুরলে ফিরলে দশ পনেরো। চাই কি বিশ। ওই শালা শুয়োরের বাচ্চা আমার বোনকে নার্সিং হোমে রেখে...........।'

—তোমার বোনেরও তো দোষ আছে।

—এক হাতে তালি বাজে না স্যার জানি। আমাদের দোষ আছে। কুকুরের দোষ। আর আপনাদের শুধু গুণ.........। আরে, ওটা কী করছেন?'

—তোমার কাটা কড়ে আঙুলের জায়গাটা দেখছি। পুরো বাদ দিতে হয়েছে। গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল নাকি?

সুবোধ আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আচমকা ডান পা তুলে লাথি মারল। মুখে। তার লাথিটা আমার থুতনি, দাঁত, নাকে লাগল। বেশ জোরে।

আমার লেগেছিল। চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম। যন্ত্রণা হচ্ছিল নাক আর দাঁতে।

সুবোধ টেবিলের ওপর উঠে বসেছে ততক্ষণে। আমায় দেখছিল।

আমার নাক দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে লাগল। ওপর ঠোঁট ভিজে নীচের ঠোঁটে গড়িয়ে পড়ল।

সুবোধ বলল, 'আমি বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম --আপনি কোনও চালাকি করছেন। ওই কাটা জায়গাটায় আমার খুব ব্যথা। এখনও। ভীষণ কষ্ট হয়।'

রুমাল বার করে নাক-মুখ চাপতে চাপতে আমি মাথা নাড়লাম। আস্তে। বলতে চাইলাম, জানি; আমারও হয়। সুবোধ বুঝল কিনা কে জানে। □

প্রতিলিপি (৯)

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ

একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ১৯২২ সালে এ দেশে এসেছিলেন, যিনি নিজের নাম বলেছিলেন কার্ল মার্ক্স। তার সম্বন্ধে কিছু লোকের সাক্ষাতের বিবরণ শুনেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন এক বৃদ্ধা ভিখারিনি, যে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় পড়েছিল, যাতে পাঁচটি হতভাগিনী মেয়ের প্রাণ যায় এবং বৃদ্ধার কোমরের অস্থি ভেঙেছিল। বাকি পাঁচজনের, একটা প্রকাণ্ড জঞ্জালের স্তূপের নীচে জীবন্ত সমাধি ঘটেছিল। সে বৃদ্ধ সাহেব নাকি দুর্ঘটনার আগের দু দিন সন্ধ্যাবেলা ওদের দেখতে ধাপায়, ওদের ভাষায় জঞ্জালগাঁয়ে গিয়ে ওদের মিঠাই খাইয়েছিল। বুড়ি ওই দু দিনের বৃত্তান্ত আমাকে শুনিয়েছিল ঘটনার পাঁচ-ছ বছর পরে। বুড়ি তখন ভাঙা কোমর নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষা করে। বুড়ি আমাকে বলেছিল, সাহেব নাকি বলেছিলেন, পাঁচ ছজন শহুরে ভদ্রলোকের সঙ্গে এ দেশের সামাজিক আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি (বুড়ির ভাষায় হালচাল) নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

যা হোক সাহেব হয়তো অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গেই কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে আমি জনা ছয়েককে খুঁজে পেয়ে তাদের মুখে যেমন সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনেছি, সেগুলো নিজের ভাষায় যথাসাধ্য বয়ন করে পরিবেশন করেছিলাম একে একে লেখক সমাবেশে। তারই কটি :

প্রথম ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই বোলপুরে। তিনি তখন আই বি-তে কাজ করতেন। সে সময়ে প্রধানমন্ত্রী শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবে ভাষণ দিতে এসেছিলেন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে, বাংলা ৭ই পৌষ সকালে শান্তিনিকেতনে বেশ কুয়াশা পড়েছিল। তবে একটু বেলা বাড়তেই অনেকটা ফিকে হয়ে গিয়েছিল। ফলে সকালের অনুষ্ঠান বিশেষ বিঘ্নিত হয়নি। সকালে ছাতিমতলায় প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থনাস্তিক ভাষণ শুনতে উপচেপড়া ভিড় জমেছিল। কারণ অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি। ভিড়ের বড়ো অংশটাই ছিল বহিরাগত। কলকাতার হুজুগপ্রিয় মধ্যবিত্তই বেশি। আর ছিল দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও ভ্রমণকারী।

প্রধানমন্ত্রী ওই সভায় দুজন দেশীয় ও একজন বিদেশি পণ্ডিত ব্যক্তিকে যথাক্রমে দেশিকোত্তম এবং আচার্য উপাধি প্রদান করে উত্তরীয় ভূষিত করেন ও এতদুপলক্ষে একটা দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণের মধ্যে একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল সরকার (অবশ্যই কেন্দ্রীয়) দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে তার ফিরিস্তি। অতঃপর সভাভঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করে হেলিকপ্টার যোগে পানাগড় সামরিক এরোড্রোম হয়ে দিল্লি চলে যান।

উমেশ সরখেল গোয়েন্দা বিভাগের মাঝারি অফিসার। প্রধানমন্ত্রী শান্তিনিকেতনে আসার সাতদিন আগে থেকে বোলপুরে ঘাঁটি করে বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের তাবৎ হোটেল, মেস, গেস্টহাউস, এমনকি বোলপুর স্টেশনের স্টাফ রিটায়ারিং রুম প্রভৃতি জায়গায় ঘন ঘন হানা দিয়ে কে কোথা থেকে নতুন এসেছে, নাম, বাড়ির ঠিকানা, আসার উদ্দেশ্য ইত্যাদি হাঁড়ির খবর বের করে নেওয়াই ছিল তার ডিউটি।

৭ই পৌষ প্রধানমন্ত্রী শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিলে সাধারণ পুলিশের মতো উমেশেরও একটা ভারী দায়িত্ব থেকে রেহাই জোটে। সে বিকেলের দিকে বেশ হালকা মন নিয়েই শ্রীনিকেতনের কাছ থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয় বোলপুরের উদ্দেশে। অনেকটা পথ এসেও পড়েছিল। হঠাৎ ডানদিকে নজর পড়তে দেখতে গেল একটু দূরে পুরোনো সঙ্গীতভবনের দিক থেকে লম্বা-কৃশ ইউরোপীয় পোশাকে একজন লোক এসে চিনাভবনের কাছে দাঁড়াল। তার মাথায় ফরাসি ধরনের কানা উঁচু হ্যাট। উমেশ মনে করতে চেষ্টা করল

সকালে প্রার্থনাসভায় এরকম পোশাক ও চেহারার কোনও লোককে দেখেছিল কি না। না একে দেখেনি। তবে কোত্থেকে এল? কখন এল? অবশ্য ভোরের ট্রেনে আসা সম্ভব। কিন্তু তা হলেও কখন কীভাবে শান্তিনিকেতনে ঢুকল? ছাতিমতলায় একে তো দেখেনি? অবশ্য একটু কুয়াশা ছিল। ব্যাপার যাই হোক, এ কথা মানতেই হবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষায় এ দিক থেকে একটু ত্রুটি ছিল। একটা লুপহোল। ভোরের ট্রেনে কারা এখানে এসে ঢুকল তা লক্ষ করা হয়নি। এ সব চিন্তা মাথায় নিয়ে চলতে চলতেই উমেশ দেখল, লোকটি বড়রাস্তার দিকেই আসছে। কাছে আসতে দেখা গেল লোকটি বৃদ্ধ এবং কৃশ হলেও চলায় আড়ষ্টতা নেই। দিব্যি যুবকের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন।

কাছে এসে বৃদ্ধ টুপি স্পর্শ করে বলল, 'গুড আফটারনুন বাবু।'

উমেশ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিকভাবে হাত তুলে প্রত্যাভিবাদন করে বলল, 'গুড আফটারনুন।' মনে মনে বলল, 'আমার চোখকে ধুলো দিয়ে শান্তিনিকেতনে ঢুকেছ। নির্ঘাত ইউরোপীয়। তবে কোন্ দেশি?'

বৃদ্ধ নিজেই হয়তো উমেশের চোখ দেখে মনের কথা বুঝে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'বোলপুরে যাচ্ছ তো? চলো আমিও ওই পথে স্টেশনে যাব। আমার মুখে বাংলা শুনে অবাক হচ্ছ তো? আমি জার্মান ইহুদি। ১৯৩৮-এ হিটলারের ইহুদি পার্জিঙে আমি ইংল্যান্ডে পালিয়ে এসেছিলাম তদবধি ইল্যান্ডবাসী। ইংলন্ডেই বাংলা শিখেছি। আমার কয়েকজন বাঙালি বন্ধুও আমাকে আধুনিক বাংলা শিখতে সাহায্য করেছিল। তুমি আমার সঙ্গে বাংলায় বাক্য বিনিময় করলেই খুশি হব। আমি এবার নিয়ে চারবার ভারতে এলাম। আগামী বছর কার্ল মার্ক্সের জন্মশতবর্ষে আরেকবার ভারতে, বলতে পাব মার্ক্সবাদীদের দ্বারা শাসিত পশ্চিমবঙ্গে আসার ইচ্ছা পোষণ করি। এ রাজ্যে এতদোপলক্ষে খুব ঘটা করা হবে নিশ্চয়। আমি সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলাম। তবে অর্থনীতি, রাজনীতি আর ভারতের আধুনিক ইতিহাস পাঠও আমার হবি। আচ্ছা, বলতে পার তোমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে প্রার্থনান্তিক ভাষণে গুণিজনদের সম্বন্ধে কিছু না বলে এত বেশি রাজনীতির বিষযীভূত কথা বললেন কেন? তিনি শোনালেন তাঁর আমলে দেশের কী বিপুল শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হয়েছে। দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটে খাদ্যশস্যে দেশ স্বয়ংভর হয়েছে। দেশ অতি দ্রুত শিল্পপ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। অ্যাটম বোমা আর না বানালেও অ্যাটমিক এনার্জিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। উৎক্ষেপণের উপযোগী রকেট দেশেই তৈরি হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা তুমি কি মনে কর খাদ্যে সেলফ সাফিসিয়েন্ট, মানে আত্মনির্ভরশীল হয়েছ তোমরা? তোমাদের কি সব নাগরিকই দিনে দুবার পেট পুরে খেতে পাচ্ছে? আর দুবেলা টিফিন? যা তোমরা মধ্যবিত্তরা পাচ্ছ? তা না পেলে কী করে সেলফ সাফিসিয়েন্ট—মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়।'

উমেশ সরখেল এ সব শুনতে শুনতে ভাবছিল, এ আবার কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক? নিশ্চয়ই বামপন্থী। কিন্তু কোন দল? পশ্চিমবঙ্গের বামমোর্চা সরকার তো এখন বড়বাজারিয়াদের বন্ধু। তবে বুড়ো সাহেব নির্ঘাত নকশালপন্থী। সর্বনাশ, বোলপুরে তো নকশালদের শক্ত ঘাঁটি। সাহেব যদি তাদের খোঁজ পায় তো সেই ইংরেজি প্রবচন : বার্ডস অব দি সেম ফেদার ফ্লক্স টুগেদার। আর দেখতে হবে না। কী বলছে? এ দেশের সব লোক দু বেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছে কি না? হুঁ, কোনও কালেই পেত না। তবে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই সরকার তা স্বীকার করে না। 'অনাহার মৃত্যু' নামে কোনও রোগের নাম ডা: বিধান রায়ও কোনও কালে শোনেননি—বিধানসভাতেই তিনি বলেছিলেন। যে কথাটা উহ্য তা হল, ঘাসপাতা একটা কিছুই খেয়ে মরে। যাই থাক, বিষয়টা গোলমেলে এবং উমেশের এক্তিয়ারে পড়ে না।

উমেশ সাহেবকে বলল, 'দেখো সাহেব, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। আমি ইন্টেলিজেন্স বিভাগের চাকুরে। আমার ইন্টারেস্ট এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যা তা হল তোমার হোয়ার আবউটস্ জানা। —তুমি এ দেশে কবে কোথা থেকে এসেছ, এখান কোথায় আছ বা উঠেছ, আসার উদ্দেশ্য কী, কতদিন থাকবে? আর তোমার নাম কী?

সাহেব অন্য সব প্রশ্ন বাদ দিয়ে একটা শব্দ শুনে উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কী বললে? ইন্টেলিজেন্স? তা হলে সেই বিভাগে নিশ্চয় ইন্টেলিজেন্ট লোকেরাই সব নিযুক্ত হয়? তেমন লোকই আমি খুঁজছি। কী যেন বলে বাংলায়? বুদ্ধিবৃত্তি যার পেশা—ও হাঁ হাঁ, বুদ্ধিজীবী। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করতেই কলকাতায় যাব। বুদ্ধিজীবীরা শুনেছি বেশিরভাগই কলকাতায় বাস করেন।

উমেশ বলল, 'বুদ্ধিবেচাও বলতে পার। তবে বুদ্ধি থাকলেই সবাই বেচার সুযোগ পায় না। যারা সুযোগ পেয়েছে তারা দু হাতে কামিয়ে নিচ্ছে। যেমন একদল করিৎকর্মা রাজনীতিক, স্পেশালিস্ট তকমাপরা ডাক্তার, নামকরা উকিল, নোটবই লেখা আর প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষক-অধ্যাপক আর বড়ো বড়ো বাজারিয়া ব্যবসাদার প্রকাশকদের পোষা সাহিত্যের নামে ছাইপাঁশ উগরানো লেখক প্রভৃতি। নিজ নিজ পেশার বাইরে এঁরা আকাট মূর্খ। এঁদের কেন বুদ্ধিজীবী বলে বুঝি না। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকও আছে এ দলে। তুমি যেমন প্রধানমন্ত্রীর আজকের বক্তৃতার সমালোচনা না করেও পরোক্ষ তির ছুড়লে তেমনই কোনও কোনও সাংবাদিকও হয়তো পত্রিকায় সুকৌশলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার বাঁকা সমালোচনা করে এক-আধ কলম লিখবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি ডেকে ইন্টারভিউ দেন, অথবা তাঁর সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ দেন তা হলেই কলম উলটো করে ধরে প্রশস্তি গাইবে। এ দেশে এই করেই প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা দুকূল রক্ষা করে। এ দেশে তাঁদের এই রোল। মরুক গে। তোমার হোয়ার অ্যাবাউটস বল তো? তোমার নাম কী?'

বৃদ্ধ চোখ মটকে বলল, 'এখানে আজই সকালে এসেছি তোমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কভার করতে। লন্ডনের একটা পত্রিকা আসা-যাওয়ার খরচ জোগাচ্ছে। তাদের হয়ে কিছুটা সংবাদ সংগ্রহ তো করতে হবেই। সেই সঙ্গে আমার বইয়ের কিছু উপাদান। বুঝতেই পারছ একেবারে ফ্রিলান্স। এটা অবশ্য আমার পেশা না। আমি আসলে সমাজতাত্ত্বিক। আমার নামটা পরে বলব। নয়তো ভয় পেতে পার। বরং আমার প্রশ্নটার উত্তর আগে দাও। তুমি কি বিশ্বাস কর, এ দেশের সব মানুষই দু বেলা পেটপুরে খেতে পাচ্ছে?'

উমেশ বলল, 'অবান্তর কথা। প্রধানমন্ত্রী ঠিক ও কথা বলেননি। দেশে যে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে সে কথা আমেরিকাও স্বীকার করেছে। আর দেশের যে বিপুল উন্নতি হয়েছে তা সাদা চোখেও দেখা যায়। দেশভর্তি কত মাল্টিস্টোরিড বাড়ি উঠেছে লক্ষ করেছ? মেট্রোপলিটান শহরগুলোর স্কাইলাইন আকাশ ছুঁয়েছে।'

বৃদ্ধ বলল, 'তুমি যদিও বুদ্ধিজীবী নও তবু কিছু কিছু বিষয়ে যথার্থ বুদ্ধিমান। বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিমান নাও হতে পারে। যেমন কার্ল মার্ক্স। তাঁর মা বলতেন, আমাদের কার্লি সারা দুনিয়ার মানুষকে রুটি দেওয়ার (মানে দু বেলা পেট পুরে খাওয়ার মতো খাদ্য) চিন্তায় মশগুল, অথচ তার নিজের ঘরে রুটি বাড়ন্ত। তবেই দেখ, বুদ্ধিজীবী হয়েও হা অন্ন যো অন্ন। তুমি বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই তেমন হাঁড়ির হাল হওয়ার আগেই সামলাতে পার।'

উমেশ কথাপ্রসঙ্গে বলল, 'আমাদের দেশে অবশ্য একদল বুদ্ধিজীবী বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। এখনও নিচ্ছেন। কিছু কবি-সাহিত্যিক তো শুধুমাত্র বডি-শো দিয়েই বড়ো বড়ো সরকারি-বেসরকারি পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা কী লিখেছেন, সেগুলোর সাহিত্যিক বা কাব্যিক মূল্য কতটুকু তার মূল্যায়ন হয় না। এ সবের পিছনে ব্যবসায়িক স্বার্থ, রাজনৈতিক পলিসি, এমনকি দালালি বা বখরার স্বার্থও জড়িত থাকে।'

বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে ব্যবসায়ীতন্ত্র এখনও অ্যারিস্টোক্র্যাট বুর্জোয়া হয়ে ওঠেনি। এখনও ওদের পায়ে বানিয়াবৃত্তির গন্ধ আছে। চুরি, জালিয়াতি, গণেশ উলটানো, ভেজাল বা নকল মাল তৈরি এ সবই নতুন বুর্জোয়াতন্ত্রের লক্ষণ। তাতে তাদের অনুগ্রহধন্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও মেকি বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বেশি থাকে। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা আত্মসম্মানরোধে পিছিয়ে পড়ে। সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা যতই চর্বিত চর্বণ করে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করুক, তাদের অন্তর কখনও পরিশীলিত হয় না।'

কথা বলতে বলতে দুজনে শান্তিনিকেতনের সীমানা অতিক্রম করে বোলপুরের আড়াআড়ি রাস্তায় পড়ল। ডানদিকে কোপাইয়ের দিক থেকে জনাচারেক পূর্বে অদেখা যুবককে আসতে দেখে উমেশ সন্দিগ্ধভাবে সে দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাহেব এবার তোমার নাম বলো।'

সাহেব বলল, 'কার্ল মার্ক্স। ব্র্যাকেটে বিংশ শতাব্দী বসিয়ে নিতে পার।'

উমেশের কানে যেতেই ফিরে তাকাল। কিন্তু বৃদ্ধকে আর দেখতে পেল না। তার মনে একটুকালের জন্য ভূতের ভয় জাগল। তারপর ভাবল, আমি হয়তো ডানদিকে একটু বেশি সময় তাকিয়েছিলাম। তার মধ্যেই সাহেব স্টেশনের দিকে চলে গেছে। □

দেওয়ালের লিখন

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

দাহকার্য শেষ হলে শ্মশানের দেওয়ালের গায়ে শ্মশানবন্ধুদেরই একজন লিখে রাখল সরোজিনী দেব্যা। জন্ম ১৩৫০, মৃত্যু ১৭ই শ্রাবণ ১৩৭৯, সাকিন আটপুর চব্বিশ পরগনা। দেওয়াল ভরা নামের পাশে যোগ হল আরও একটি নাম। সবই শ্মশানের কাঠ-কয়লা দিয়ে লেখা। বৃষ্টির জলে মোছেনি বা ধুয়ে যায়নি। নতুন মৃতদেহ এল। এদেরও অনেকে একটু জায়গা খুঁজে লিখে রাখবে স্মৃতিরক্ষার জন্য।

সরোজিনী দেব্যার দেহটা পুড়ে ছাই হল। শ্মশানবন্ধুরা হরিধ্বনি দিয়ে ফিরবে এবারে। শোকতাপ যার যা ছিল সব পড়ে রইল পিছনে। যে সরোজিনীর জন্য এদের অনেকেই পাগলা হয়ে ঘুরেছে একদিন তারা ওকে একা পাওয়ার জন্য, অপেক্ষা করবে না শ্মশানে। সরোজিনীর নামও ভুলে যাবে। নতুন কোনও সরোজিনীকে খুঁজবে ওরা। যারা শ্মশানে শোক প্রকাশ করেছে একে অন্যের কাছে, প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে সম্পর্কে সরোজিনীর খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না তার জমানো অর্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে কোনও একজন পায়। কিন্তু কেউ যখন কিছু পাবে না তখন সরোজিনীর উদ্দেশে গালাগালি দেবে। এতগুলি লোকের শ্মশানে আসার কারণই অর্থ। টাকা আছে এমন একজনের শবদাহ করতে এসেছে তারা। খাওয়া-দাওয়াটা হবে ভালোই। বেচে থাকতে তার রূপ, মৃত্যুর পর অর্থ। অর্থকৌলীন্যের জগতে অর্থই সব সময় লক্ষ্যবস্তু।

তাই তো সরোজিনীর হাসি পায়। আশ্চর্য এই দুনিয়া। বালবিধবা অনাথা সরোজিনীকে কেউ সহানুভূতি দিয়ে ভালোবাসেনি। একটা কিছুর আশায় এই কৃত্রিম শোক। বেঁচে থাকতে ভালোবাসা, মরার পর অর্থ, এরা বাইরে এক একজন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। বিধবার সংযম, চলাফেরা আর মৃত স্বামীর প্রেমে ভরপুর থাকা উচিত বলে সাধারণের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার পরই অন্ধকার নামলে সরোজিনীর দরজা ঠেলতে সঙ্কোচ বা লজ্জা হয়নি এতটুকু। শেষ পর্যন্ত বঁটি দাকে ভয় পেয়ে কুৎসা রটিয়েছে এবং বঁটি দা চুরি করে আর একটা চান্স নেওয়া যায় কি না ভেবেছে। অথচ বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসেনি একজনও বিধবাকে বিয়ে করার সাহস দেখিয়ে। এরা সকলেই বয়স্ক। দায়িত্ব না নিয়ে প্রেম প্রেম খেলা খেলবে লুকিয়ে যাতে লোকে না দেখে।

—দাদা, ভাবনার কী আছে! ছাড়ুন না মালকড়ি কিছু! আর সবই তো কড়ায়-গণ্ডায় উসুল হবে। শ্মশান থেকে ফিরতে যা দেরি। সরোজিনী দেবীর পয়সার ভাবনা কী!

—সে তো জানি রে ভাই! বলো কী দরকার, যা চাই তাই পাবে। আমার কাছে ও সব কৃপণতা নেই। ভাবখানা এই যে তাঁরই টাকা। তিনিই খরচের মালিক। তোমরা চাইলে পাবে।

মনে মনে ভেবে রেখেছেন যা খরচ করবেন হিসেব দেওয়ার সময় তার বেশ কিছু বেশিই দেখাবেন। কে আর অত খুঁটিয়ে দেখবে।

হাসি পেয়েছে সরোজিনী দেব্যার এই ভদ্রলোকের খরচের বহর দেখে। নিজের কাজ হলে এর সিকিও হত না। লাভের ব্যাপার দেখে দরাজ হাত। শ্মশানবন্ধুদের জন্য পাঁচ সেরের জায়গায় দশ সের মিষ্টি জোর করেই উনি আনালেন টাকা দিয়ে। শ্মশান থেকে ফেরার পর যখন সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজবে, পাবে না কিছুই, তখন মাথায় হাত দিয়ে বসবে! গালাগালি দেবে মৃতার উদ্দেশে। আপশোশে মৃতপ্রায় হবে। পাড়ার লোকেরা হাসবে কৃপণের শাস্তি দেখে। লোভীর নাকি-কান্না শুনে।

আমি সরোজিনী দেব্যা সবই দেখছি। ঠিক এই একই চিতায় একটু আগে যে লোকটাকে পুড়িয়ে গেল তিন-চারজন মানুষ একটা বাঁশের সঙ্গে ছেঁড়া মাদুর আর চট দিয়ে জড়িয়ে এনে, সে অনাহারে মরেছে। অবশ্য অনাহার কথাটা বে-আইনি। সরকার স্বীকার করে না যে এ রাজ্যে কোনও লোক অনাহারে মরতে পারে। দেশের সত্তর কোটি লোক নিম্নতম মানের অনেক নীচে অর্থাৎ আধপেটা খেয়ে না-খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু মরতে পারে না কিছুতেই। যদি মরে তাহলে বলতে হবে অপুষ্টিতে অথবা সরকারের দুর্নাম দেওয়ার জন্য।

যাই হোক জীবিত ব্যক্তিরা বলতে না পারলেও আমার কোনও বাধা নেই। আজ এখানে বসে আমি সব সত্যকে দেখতে বা বুঝতে পারছি। আমার নামে কোনও মামলা চলবে না। দিনের পর দিন ফেলে মামলায় কোনও চার্জ না এনে দীর্ঘদিন আমাকে জেলেও রাখা যাবে না এমন নিরাপদ আমার অবস্থিতি। লোকটাকে পোড়াবার খরচ লেগেছে তেত্রিশ টাকা এগারো আনা। টাকাটা নাকি ব্লক অফিস থেকে দেওয়া, যদিও সে বেঁচে থাকতে আবেদন জানিয়েছিল এবং ব্লক সে আবেদন সমর্থনও করেছিল। তবু বলা যায় সম্রাট মহানুভব। একই লোকের কাজে ওই টাকা লেগেছে। জীবনে না হোক মৃত্যুর পরেও শ্মশান খরচ আছে। সরকারের কাছে জীবনমৃত্যু সবই সমান।

—কি ভাই ঠিক বলছি তো! অনাহারে মরা প্রায় আত্মহত্যারই সমান।

লোকটাকে না দেখলেও জানি সে প্রেতলোকে আছে এবং সেখানে থেকেই জবাব দিল। —ঠিকই বলেছেন' বাঁচতে চেয়েছিলাম—

—মিথ্যা কথা ভাই। সরকারি নথিপত্রে কোনও লেখা নেই তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে, বরং উলটে লেখা তুমি সরকারকে বিব্রত করার জন্য না খেয়ে মরেছ।

—ও সব তো বুঝিনে, মুরুক্ষু লোক কিনা।

—আমিও তাই! এখানে এই স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব দেখছি আর বুঝছি।

—আজ্ঞে, ভোটের বাবুরাও ওইরকম কতা বলতেন! বলতেন পেরানকেষ্ট একদিকে তো ভোট্ দিলে সারা জীবনভোর, এবার পালটাও! এক ডাকতার পারলে না অন্য ডাকতার আনো, দেক একবার।

—দেকলে, কী হল?

—এজ্ঞে! সে বুঝতে পারলাম না। কেউ বলল খারাপ কেউ বলল পরে ভালো হবে; আবার কেউ বলল ভালো হয়েছে বুঝতে পারছ না। তোমরা মুরুক্ষু লোক তো! তা ঠিকই, মুরুক্ষু আর গরিবদের অনেক দোষ। ভালোর সোয়াদ না পেয়ে পেয়ে ভালোটা আর বুঝতে পারিনে।

ভালো আর কে কবে বুঝেছে। তা হলে দুনিয়াটা ভালো হয়ে যেত অনেককাল আগে। রাজা প্রজার ভালো করতেই চায় কিন্তু প্রজারা বোঝে না মোটেই। তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা : রাজা কেবল নিজের ঐশ্বর্য, পারিষদ-বর্গের ঐশ্বর্য বাড়াবার জন্যই করছে সব কিছু। মন্ত্রীরা জনগণের কথা ভাবতে ভাবতেই জীবন যৌবন নিঃশেষ করে দিলেন। তবু কু-লোকে বলবে, দেখ না গাড়ি বাড়ি টাকা বেনামে সম্পত্তি দশাসই চেহারা। কারও গলার কাছ থেকে ভুঁড়ি নেমেছে (দিল্লির অবশ্য), কারও চোরাকারবারি ভেজালদার মুনাফাখোরের রক্ষার জন্য কথা ও স্টেটমেন্টের ধূম্রজাল সৃষ্টির প্রয়াস। তাদের শোষণকে আড়াল করতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। বেশি দুষ্টু লোকেরা বলবে—সরকার বছরে তো কম গুলি খরচ করে না, তার দু-চারটে যদি ওইসব মুনাফাখোরদের জন্য করত তা হলে দেশের চেহারাটাই পালটে যেত। এ রকম লোক অবশ্য আঙুলের কর গুনে বলা যায় এবং আমাদের সৌভাগ্য যে তাদের কথা শোনার মতো বোকা লোক এ সংসারে বেশি নেই। তা না হলে কী যে হত ভাবতে শিউরে উঠতে হয়!

সত্যিই, আমি সরোজিনী দেব্যা আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল পাশের চিতায় যে মেয়েলোকটিকে দাহ করে গেল কয়েকজন তরুণ ছেলে তার বিবরণ জানার পর! আশ্চর্য। মহিলাটি কী ভাগ্যবতী! আমারই মতো নিঃসন্তান অথচ কী আশ্চর্য সুন্দরী। গায়ে এতটুকু দাগ লাগেনি। ভিড় করে এসেছিল অনেকেই। স্বামীর খোঁজ নেই অনেকদিন। যা কিছু ছিল বেচে কিনে সারা। দিন চলে না। বাঁধা রেখেছিল শেষ পর্যন্ত বসতবাড়ি ও

পাশের জায়গাটুকু পাড়ারই সুদখোর মহাজনের কাছে। পাড়ার লোকদের আবেদনে তিনি রাজি হয়েছিলেন দু বছরের মতো মহিলাকে ওই বাড়িতে থাকতে দিতে।

একদিন রাত্রি একটু বেশি হলে ভদ্রলোক সুন্দরী সুমতির বাড়ি গিয়ে হাজির।

সুমতি অত বোঝেনি। সহজভাবে দরজা খুলে দিয়ে ঘরে বসিয়েছে একটু অবাক হয়েই। মতলবটা ভালো করে বোঝেনি। তা ছাড়া প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাপ কাকার বয়সী।

—দেখো সুমতি, তোমার স্বামী ছোঁড়া আর আসবে বলে তো মনে হয় না।

সুমতি মাথা নিচু করেই ছিল। সুন্দর মুখে নামল বিষণ্ণতা।

—তা কী করে চলবে তোমার? আমি না হয় দু বছর থাকতে দিলাম তোমাকে কিন্তু পেট চালাবে কীভাবে?

মুখ তুলতেই সুমতি পিছিয়ে এল দরজার কাছে।

—শোনো, কাছে এসো, ভালো পরামর্শই দেব তোমায়!

পরামর্শের ব্যাপারটা সুমতি বুঝে ফেলেছিল নরেশ মহাজনের চোখমুখের দিকে চেয়ে।

হয়তো পরিত্রাণ ছিল না সুমতির শেষ পর্যন্ত। কিন্তু পরিত্রাতার দল হঠাৎ এসে গেল এবং এল যে মূর্তিতে তাতে ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মহাজন ও সুমতির সর্বাঙ্গ। চারটি ছেলে। প্রতিহিংসায় চোখগুলো জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। হাতে উদ্যত রিভলভার। —সাবধান বুড়ো শয়তান, আর এক পা এগোলেই খতম! তোমার যে এত গুণ তা তো জানা ছিল না।

বুড়ো নরেশ মহাজন তখন কাঁপছে থরথর করে। চোখে অন্ধকার, মুখে কথা নেই।

—এ দিকে এসো। বলো, কত লোকের সর্বনাশ করেছ?

—না বাবা আমি কিছু করিনি। আমি--আ—আ—মি—ন—ই। সুমতির দিকে চাইল ছেলেরা। সেও কাঁপছিল।

— আপনার কোনও ক্ষতি করেছে এই বুড়োটা?

—না ভাই, তোমরা না এলে হয়তো সর্বনাশই হত। ওঁর কাছেই তো আমার বাড়ি-ঘর-জমি সব বাঁধা!

—তাই নাকি?

ছেলেদের মধ্যে যার হাতে অস্ত্র সে এগিয়ে যেতেই নরেশ মহাজন কেঁদে পড়ল তরুণটির পায়ে।

— ছেই বাবা বাঁচাও অার করব না এমন কাজ!

—আমার পায়ে নয়, যাঁর কাছে অপরাধ করেছ তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও!

—মাগো মা, আমাকে বাঁচাও মা। আমি তোমার সন্তানের মতো।

--তোমাকে বাঁচাতে পারি একশর্তে। তোমার সমস্ত দলিল যা গরিবদের ঠকিয়ে বাঁধা রেখে বা নামমাত্র মূল্য দিয়ে দীর্ঘদিন থেকে ভোগ করছ তা সেই গরিবদের ফেরত দিতে হবে। রাজি? সামনের তরুণটিই বলল।

— হাঁ বাবা রাজি।

—কদিনের মধ্যে এ সব দলিল ফেরত পাবে?

—কালই।

—তিনদিন সময় দিলাম, আর এঁর দলিলটা এখনই আমাদের সামনেই ফেরত দিতে হবে।

নরেশ মহাজন দুর্গা নাম জপেছে এতক্ষণ। এই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রাণটা বাঁচানোর জন্য দলিল তো ছার আরও কিছু দিতে রাজি। মুখে সে কথা না বললেও কাঁপতে কাঁপতে ঘাড় নেড়ে তাদের কথায় সায় দিয়ে ছুটল বাড়ির দিকে। সুমতির দিকে লোভের হাত না বাড়ালে হয়তো জমিগুলো বসতবাটি যা তার নিজের মুঠোয় ছিল হাতছাড়া হয়ে যেত না এমন করে। লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু।

নরেশ মহাজন তিনদিনের মধ্যে সব দলিলই ফেরত দিয়েছিল গরিবদের। কিন্তু এগুলো তার জীবনের থেকেও মূল্যবান। সে আর শিশুখাদ্যের চোরাবাজারি যারা, অত্যধিক দাম নিয়ে মুনাফা করত তারাও মরমে মরে ছিল। এক পোস্টার দিয়ে ছোড়াগুলো ওদেরও খতম করার ভয় দেখানোয় যার যা লুকানো স্টক ছিল

সব বার করে ন্যায্য দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। বাঘের রক্তের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া আর মুনাফাখোরদের মুনাফায় হাত দেওয়া একই। এর ফল ফলতে দেরি হয়নি। গোপনে পুলিশে খবর দিতেই বিরাট পুলিশ বাহিনী হাজির। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে। জোরজবরদস্তি বা খুনের ভয়ে দেখিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি সহ্য করবে না পুলিশ কোনও মতেই। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য হোক, না পাওয়া যাক, কাজ না পেয়ে মানুষ মরুক, অনাহারে মরুক সেখানে আইনশৃঙ্খলা তো ভঙ্গ হয় না। যে মরে সে চিৎকার করে মরে না। চোরাকারবারি নিঃশব্দে মানুষের গলা কাটে, ভেজাল ওষুধ খাইয়ে তিলে তিলে মারে সেখানে, পুলিশের কিছু করার নেই। কারণ তারা তো করে আইনসম্মত উপায়েই।

সুতরাং পুলিশ আসতেই ধরা পড়ে গেল ছোকরাদের অনেকেই, কেউ গা ঢাকা দিল। চোরাকারবারি আর নরেশ মহাজনের দলের মুখে হাসি ফুটল।

বেঁচে গেল মহাজনেরা। তারা খুশি। শুধু সুমতি বাঁচতে পারল না।

ছেলেগুলো ডেরা গেড়েছিল সুমতির বাড়িতে। প্রথমে কৃতজ্ঞতায় আশ্রয় দিয়েছিল ছেলেদের। তারপর ওদের কাজটাকে তার মনে হয়েছিল এই তো দেশের কাজ। এরাই দেশপ্রেমিক। মেয়েমানুষ তো। বুদ্ধির বহর ওইরকমই। কিছু চ্যাংড়া ছেলের সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে তার মনে হল দেশপ্রেম। সুতরাং তার চরম মূল্যও দিতে হল। ছেলেরা পালালে তার মালপত্র সরাতে গিয়ে বোমা ফেটে সমস্ত দেহটা বিশেষ করে অমন সুন্দর মুখখানা পুড়ে বিকৃত হয়ে গেল সুন্দরী সুমতির।

দুটো দিন মাত্র বেঁচেছিল সুমতি। পুলিশই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল যদি বাঁচে। সুমতি বাঁচেনি। পুলিশ পাহারায় শ্মশানে এসেছিল অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাড়ার ছেলেরাই বয়ে এনেছিল সুমতিকে। শ্মশানে সবাই ভিড় করেছিল সুমতির শবদেহের চারপাশে। অবাক হয়েছিল মেয়েলোকের এই কাণ্ড দেখে।

আমি ঁসরোজিনী দেব্যা এখন শ্মশান থেকে চলে যাব। জানি না স্বর্গ, নরক বা প্রেতলোকে। সুমতি কিন্তু আমার সঙ্গে যাচ্ছে না। দেওয়ালে ওর নামটা কেউ লিখল না। আমার নামটা জ্বল জ্বল করছে। সুমতি মুছে গেল এর মধ্যেই।

কিন্তু একী, অবাক কাণ্ড! পুলিশ চলে গেলে আর শ্মশ্রানযাত্রীরা বাড়ি ফিরলে দুটো তরুণ চুপি চুপি এসে ওর চিতায় দুটো ফুলের মালা রেখে গেল নিঃশব্দে। তারপর দেওয়ালের মাথায় বড়ো করে লিখে গেল— 'তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলব না।'

মরণ আর কি। পুলিশ একবার দেখলেই হয়। মরণ বাড় বেড়েছে তোদের। আমি ঁসরোজিনী দেব্যা দিব্যচক্ষুতে দেখছি তোদের মরণ ঘনিয়ে এসেছে। □

শহিদের মা

সমরেশ বসু

শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হল, পেটের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়চড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে, বিমলা তথাপি নড়তে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগল, 'বাদল! বাদল রয়েছিস?' পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটু ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইরের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তারপরে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তরকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কড়াটার দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পারলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এলেন। আকাশে ঘন মেঘ। পুবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। এক বছরের শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িতে নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনের দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল, মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশের বাড়িতে কণার মা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফণীমনসার বেড়া ডিঙিয়ে সে দিকে একবার দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায়। লোকজন দেখা যায় না। তিনি চোখ ফিরিয়ে আবার ঘরের দরজা খোলা বাড়িটার দিকে তাকালেন। কারওর কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথেয় বাসী সিঁদুরের দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। শেমিজের ওপরে খয়েরি পাড়ের সাদা শাড়ি ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রৌঢ় বয়সেও শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতে বয়স যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়সে সুশ্রী আর সবল ছিলেন। এখন তার সমস্ত শরীর যেন শক্ত আর কঠিন।

বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরে। পিছনে গেলেন। ফণীমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে একটা জবাফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইট এক জায়গায় এখনও জড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহিদ বেদি হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই, আর কোনও চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদিটা ভাঙল, ইটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখেছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদিটার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইট ছাড়া এখন আর কিছু নেই। বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়ল। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদিটা যখন তৈরি হলো, তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহিদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই

ওরা ডাকতে এসেছিল। ও বাড়িতে আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের দুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহিদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তার ধারে, এখন যেখানে কয়েকটা ইট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহিদ বেদির শেষ চিহ্ন। কেন গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, 'মাসিমা, আপনি একবার চলুন।' বিমলা গিয়েছিলেন যেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মতো। তার দু দিন আগে, আঠারো বছরের বাদলকে ওইখানেই কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখের সামনে এখনও স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট। নিথর বাদলকে এ বাড়ির উঠোনে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোটো ছেলে। বিমলার শেষ সন্তান না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচেনি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপনমনেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল।' উঠোন জুড়ে মানুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হরিবোল ধ্বনি দেয়নি। স্লোগান দিয়েছিল। 'কমরেড বাদল, জিন্দাবাদ! খুন কা বদলা খুন।' ....কিন্তু বিমলা আর ভালো করে কাঁদতে পারেননি; ডাক ছেড়ে কান্না যাকে বলে, তেমন করে কাঁদতে পারেননি। সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বেদিটা তৈরি হয়েছিল। বাদল যে দিন খুন হয়, সে দিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অন্য কোনও দলের সভা, বাদলের না। সেখান থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারেনি। সন্ধের ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারেনি। কেউ বলে, বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনিরা আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরও অনেক রকম কথা। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিৎকারে লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধের ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। পুলিশ এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। হত্যাকারী বলে যাদের নাম করা হয়েছিল, তাদের মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হওয়ার দু দিন পরে শহিদ বেদি তৈরি হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও ছোটোখাটো সঙ্ঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহিদ বেদির কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনেরো ষোলোটা ইট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদির গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল, 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন'.......ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলের নাম করে কী সব বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায়নি। তিনি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। আবার আচ্ছন্নের মতোই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মতো গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কারওর সঙ্গে কথা বলেননি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে না, হরপ্রসাদ নিজে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'কত দিন বলেছি, ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।'

বিমলা কোনও জবাব দেননি। হরপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার

বলেছিলেন, 'এখনকার এ সব পার্টি, খুনখারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল, তার গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।'

হরপ্রসাদ চুপ করেছিলেন। বিমলা কোনও জবাব দেননি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হরপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী করবার আছে। আমার দেরি হয়ে গেছে, অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছে নেই।'

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোনও কথা হয়নি। তবে এই তিন মাসে মাঝে মধ্যেই ওই কথাটা বলেছিলেন, 'মনকে শক্ত কর। বাদলকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

বিমলা সে কথার কোনও জবাব দেননি। সংসারের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে কী দরকার, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষয়ে কোনও কথা বলেননি। কৃপাল দয়াল কোনও কথাই বিমলাকে বলেনি। কৃপাল চাকরি করে। দয়াল বেকার। ওরা কী ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা-তেল-সাবান, চান করার কথা বলে, সিনেমা থিয়েটারের কথাও বলে। দলের কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়; কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলের বিষয়ে কোনও কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরেনি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টির লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনও কথাই নেই।

বিমলা জবাগাছের গা ঘেঁষে ভাঙা বেদির দিকে দেখছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলার সারা শরীরে জেগে রয়েছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেই দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এ সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্য বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠছে।

বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ, যে কোনও সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ সময়েই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তার কবিরাজের দরকার ছিল না। বিমলা নিঃশঙ্ক। তিনি সবই বুঝতে পারছিলেন। অভিজ্ঞতা তাঁর শরীরের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। ব্যথা উঠলে বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা নিষ্ফল ব্যথা না। সময় আসন্ন। আঠারো বছর আগে এই দিনে এই সময়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না, বিমলা কোনওরকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপিচুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি, আর সময় নেই।'

কণার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলার সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছসাত বছরের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিলেন মেঘুর মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকার মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিমলাদের প্রসব হত না। মেঘুর মা-ই খালাস করাত। মেঘুর মা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ, আসল ব্যথা। আর বেশি দেরি নেই।'

কণার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খালি করে দিয়েছিল। সেই ঘরেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। টিনের দেওয়াল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল। মাথায় তখনও টিনের চাল, কাঁচা মাটির মেঝে। বিমলা রান্নাঘরে মাদুরের উপর শুয়ে বসে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করছিলেন। কণার মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির থাকবার চেষ্টা করছিলেন। সব মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে। হরপ্রসাদের সাধ ছিল মেয়ে হয় যেন। হরপ্রসাদের সাধ, বিমলারও সাধ। দুই ছেলের পরে একটি মেয়ে। কিন্তু তার শেষ গোঙানির সঙ্গে, যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে ছেলে। মেঘুর মায়ের হাত, বিমলার পেটে চেপেছিল। তখন ফুল পড়েনি, আর একটি ব্যথার অপেক্ষা। তার মধ্যেই, বিমলা লহমায় দেখে নিয়েছিলেন। রক্তে আর লালায় মাখানো একটি ছেলে। তখনও গলায় কান্না ফোটেনি। ছোটোখাটো এক-আধটা গোঙানি শব্দ। ফুল পড়ার পরে প্রথম গম্ভীরস্বরে কেঁদে উঠেছিল, ওঁয়া ওঁয়া।

মেঘুর মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, 'কত বড়ো। যেন পেট থেকেই এক বছরের ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।'

মাতৃমুখী। বিমলা তাকিয়ে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেননি। মেঘুর মায়ের কোলের দিকে তাকিয়েছিলেন আর হঠাৎই নিজের কোলটা বড়ো ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে না হোক, নাড়ি ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা করেছিল। সে কথা বলতে পারেননি। মনে মনে বলেছিলেন, মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়।

বাইরে তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কশার মা বিমলাকে সাব্যস্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিল। মেঘুর মা নতুন শিশুকে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে, কাঁথায় মুড়ে বিমলার কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি রে বাপু। জলের তোড়ে এলি, বাপের যেন এরকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাদুলে ছেলে বাবা, জগৎ ডোবানো বিষ্টি মাথায় করে এল।' জগৎ-সংসার ভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থইথই করছিল। তখন রান্নাঘরের অবস্থাই বা কী। এখন তো অনেক পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপরে ক্যানেস্তারার গোঁজামিলের চাল। ঘরের এখানে সেখানে টপটপ করে জল পড়ে। বিমলা একটা কোণ বেছে নিয়ে ছেলেকে বুকের কাছে ঢেকে শুয়েছিলেন। কশার মা চলে গিয়েছিল। তার তো সংসারের কাজ। মেঘুর মা ছিল। তার ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকের কাছে নিয়েও কৃপাল দয়ালের কথা বিমলার মনে পড়েছিল। ওরা তখন স্কুলে গিয়েছিল। বিমলার দুশ্চিন্তা, যা দুরন্ত তাঁর ছেলেরা। বৃষ্টি মাথায় করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কি না কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে হলে, মাস্টারমশাইরা কি আর ধরে রাখতে পারবে। হরপ্রসাদের কথা মনে পড়েছিল। অফিসে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। বিমলাই জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া করার কিছুই নেই। তার চেয়ে অফিসের কাজে থাকলে ভালো থাকবে। এ দিককার ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কশার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুর মাকে ডেকে নিয়ে আসা। এমন কিছু হাতি-ঘোড়া ব্যাপার তো নয়। পোয়াতি মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োবে, তার জন্য পাড়া দূরের কথা, বাড়ি মাথায় করার কিছুই নেই। ভালোভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে আশেপাশে কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায়নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবার চেষ্টায় মুখের কাছে ছুঁইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধরিয়ে দিতে হয়। শিশুর মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবার কেমন হবে কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হয়েছে। কৃপাল দয়ালের বেলাতেও। সব মায়ের কি এমনি মনে হয়? কে জানে। কৃপাল দয়ালের পরে আরও দুটি হয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী করবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বুকের কাছে আরও চেপে ধরেছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুর মা বলেছে, মাতৃমুখ। বলেছে, খুব দুষ্টু হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয় না, দুষ্টুও হয়। কী দুষ্টুমি করবে? বিমলাকে জ্বালাতন করবে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। কৃপাল দয়াল যে রকম দুরন্ত, এও সেইরকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলেপিলে তো দুরন্ত হবেই। তার জন্য বকুনি খাবে, মার খাবে, আবার ভুলেও যাবে। কৃপাল দয়াল যে-রকম করে। ওদের দৌরাত্মে এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন না মেরে উপায় থাকে না। এও দুষ্টুমি করলে মার খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন? বড়ো হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বুকের কাছে তুলে, স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু তা নিতে পারেনি। তখন দুধেতে পলতে ভিজিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনও কথাই ভোলেননি। এই তো যেন সে দিনের কথা। প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট মনে আছে। কৃপাল দয়ালের কথাও মনে আছে। ওরা জন্মেছিল পদ্মার ওপারে, নিজেদের ভিটেয়। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল।

বৃষ্টি একটু ধরতেই, কাক ভেজা হয়ে, কৃপাল আর দয়াল বাড়ি এসেছিল।

আঁতুড় মানতে চায়নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দয়াল তো বায়না ধরেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুর মা ধমক দিয়েছিল, বিমলা সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল চান করবার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধেবেলা হরপ্রসাদ বাড়িতে এসে আগেই আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়েছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুর মাকে বলেছিলেন, 'কৃপার বাবা এসেছে, দরজাটা খুলে দাও।'

মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথার কোনও জবাব দেননি। হ্যারিকেনের আলোর সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীরভাবে শব্দ করেছিলেন, 'হুম্!' তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মতো হয়নি।'

বিমলা ও সব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিলেন, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ, দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিলেন। বিমলা একটু গর্ববোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই মুখ দেখে হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখেনি।

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখ যে।'

তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। নামটা তখনই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জবর বাদুলে, একেবারে বাদলা।'

ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনিরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে সে রান্নাবান্না করবে। বীণা বড়ো ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতেছিলেন। সে দিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয়নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। এ দিকে মেঘুর মা নানানখানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সন্তান নিয়ে কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ সেই দিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন এখন, বেলা এগারোটা। চুপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে জবাগাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহিদ বেদির দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ, আবার, আবার মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এবকম মনে হচ্ছে কেন? সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর, অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তাঁর গর্ভের মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে। তিনি মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল।'

'মা! ও মা!'

কৃপালের গলা। কৃপাল ডাকছে, বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি-ভাঙা শহিদ বেদির দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনওদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে তাঁর মনে পড়ল, কৃপাল-দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করত। কৃপাল-দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে দুজন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোটো বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখাশোনা করেছে। ছোটো ভাইটিকে দুজনেই ভালোবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলত। ছোটো ভাইকে কিছু না দিয়ে দুজনে মুখে তুলত না। পিঠোপিঠি হলে তা হত না। কৃপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগে ছিল। ওরা দুজনে ছিল সমানে। ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি তুলতে হতো। হরপ্রসাদও শাসন করতেন। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দুজনেই কাড়াকাড়ি। সব কথাই মনে আছে বিমলার। বাদল যখন কথা বলতে শিখেছিল তখন কৃপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালোবাসে। কার কাছে থাকতে চাইত। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারত, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন জুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন. 'একফোঁটা ছেলের চালাকি দেখো।'

হরপ্রসাদও ছোটো ছেলেটিকে ভালোবাসতেন। কৃপাল দয়াল যত না আদর কাড়তে পেরেছে, কোলে

চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে। কিন্তু সে সবই ছেলেবেলার কথা। তখন সংসারের চেহারা ছিল অন্য রকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতেন আর প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতেন। অবসর সময়ে, নিজের দল নিয়ে মেতে থাকতেন। বিমলার তাতে কোনওদিন কিছু যায় আসেনি। পুরুষমানুষ কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদের সে সব ভাবতে গেলে চলে না। বিমলা বরং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা-সমিতি করছে। তবু নেশা ভাং করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট করে না। সবাই হরপ্রসাদ বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক, বাইরে বাইরের মতো, সংসার সংসারের মতো। স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে, গরিব মধ্যবিত্তের জমজমাট পরিবার।

আস্তে আস্তে কৃপাল দয়াল বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। ওদের পিছনে বাদল যত বড়ো হয়ে উঠতে লাগল সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগল। বাদল দাদাদের সঙ্গ আর পাচ্ছিল না। ওরা তখন বাইরের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কোথায় কী দল, বন্ধু, সে সব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগৎ খুঁজে নিয়েছিল। ওরও বন্ধু ছিল, খেলাধুলা ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ করে কখনও কিছু ভাবেননি। বরং মনে হয়েছে, এরকমই হয়। সকলেরই হয়। বড়ো হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যার আলাদা পথে ফিরছে।

কেবল হরপ্রসাদ বিরক্ত হচ্ছিলেন। কখনও রাগ, কখনও ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে কৃপাল আর দয়ালের উপরে। বিমলা হরপ্রসাদের কাছে শুনতেন, কৃপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে. ছাত্ররা সবাই করে। কৃপাল দয়ালের কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পারতেন, হরপ্রসাদ যে রাজনীতি করে কৃপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, 'কলেজে ওরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, 'ও সব রাজনীতির নামে গুণ্ডামি। আমার পয়সায় কলেজে পড়ে ও সব চলবে না। তোমার ছেলেদের এ কথা জানিয়ে দিও।'

হরপ্রসাদের কথার ধরনে বিমলা মনে মনে কষ্ট হতেন। আবার ভাবতেন, বাবা যে রকম বলে ছেলেদের সেরকম চলাই উচিত। তা হলে আর সংসারে কোনও গোলমাল থাকে না। কৃপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, 'কলেজে যাস পড়তে, সেখানে আবার ও সব কী। তোদের বাবা পছন্দ করে না।'

ওদের এক জবাব, 'ও সব তুমি বুঝবে না মা।'

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখন কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। হরপ্রসাদেরও কোনও অভিযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশি। সংসারের কাজেকর্মে, বাদলকেই পেতেন। বকেধমকেই করাতে হত, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল।

কৃপালের সঙ্গেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগল। বাইরের বিবাদ ঘরে এসে ঢুকেছিল। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হত না। হরপ্রসাদ খেপে উঠতেন। খেপে উঠে যা তা বলতেন। কৃপাল মাথা নোয়াত না। সে হরপ্রসাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে থাকত। বিমলা এসে কৃপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সরে যা এখান থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা হয় না।'

বিমলা হরপ্রসাদের উপর খুশি হতেন না। কৃপাল তো ওঁর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু শুনলে সেই রকমই মনে হত। কেবল কৃপালের সঙ্গে না, দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদের একই ব্যাপার ঘটত। বিমলা মনে করতেন, কৃপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি, যখন দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া নিতান্ত বাড়ির মধ্যে, আর বিমলা সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা করতে পারত না। এত দলাদলি কীসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল। আর এক দলে বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলত, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন?'

বাদল বলত, 'আমাদের স্কুলের সব উপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে—ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলে ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।'

—তাই বুঝি ছোড়দার মতো হবি!

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলত না। ওর জবাব ছিল, 'তা আমি কী করে জানব।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ও সবের মধ্যে যাসনি। দেখছিস্ না, বাড়িতে কী রকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তির চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল কেউ কারওর সঙ্গে কথা বলত না। বিমলা রান্নাবান্না করেন, ওরা এসে খায়। রাত্রে শোয়। কৃপাল, দয়াল রোজ রাত্রে বাড়িতেও থাকত না। পড়াশোনা হচ্ছিল না। কৃপাল একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল। দয়ালেরও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পার্টি করলে চলবে না। ওরও একটা চাকরি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড়ো হয়ে উঠেছিল। ক্লাস টেনে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভিতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এতখানি বড়ো বয়সে কোনও সন্তান তাঁকে হারাতে হয়নি। এমন ভারী রোগও কারও হয়নি। তখন দেখা গিয়েছিল, কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় বরফ দিয়েছে। রক্ত, বিষ্ঠা পরীক্ষা করাবার জন্য নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে, বাদলের বিছানার সামনে বসে থেকেছেন।

তখন তো বাদল কোনও পার্টি করে না। করলে কী চেহারা হত, কে জানে। বিমলার চোখের সামনে ভেসে উঠল শ্মশানযাত্রার ছবি। এ বাড়ির উঠোন থেকেই, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পার্টির লোকেরা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায়নি। বোধ হয় দাঁড়াতে পারেনি। হরপ্রসাদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে কেউ একটা কথা বলে নি। তিনিও বলেননি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইয়েরা নয়, পার্টির ছেলেদের কাঁধে বাদলের মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। দাদারা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পার্টি করত, তা হলে কী হত কে জানে। শ্মশানযাত্রার মতোই হয়তো, বাবা দাদারা দূরে সরে থাকত। পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু পার্টিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহিদ বেদি থেকে। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে, পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

—কোথায় গেলে অ্যাঁ? শুনছ।

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছেন। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন ভাঙা শহিদ বেদির দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কীসের ছুটি। কৃপাল হরপ্রসাদ কেউই কাজে যায়নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এইদিনে, এই সময়ে যা ঘটেছিল, তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদিতে না, শ্মশানে না, বাদল যেন যার ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে।

বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড়ো রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। মনে হত ওকে শিশুর মতো কোলে নেওয়া যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক তবু প্রাণে বেঁচেছিল, বিমলার সেটাই সান্ত্বনা। কৃপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেইরকম হত। হরপ্রসাদের অল্পস্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তা ছাড়া, হরপ্রসাদই তো একমাত্র কান্ডারি। স্বামীকে তিনি কখনও কোনও কারণে অযত্ন করেননি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠেছিল। আগের মতো স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলত। বিমলার মতো। বিমল তো কথা কম বলেন।

বেশি বলবার অবকাশ এ সংসার তাকে দেয়নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী-পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলত। বিমলা মনে করতেন, বাদল, কৃপাল দয়ালের পথ ধরবে না। বাড়িতে তিনটে পার্টির লোক। কারওর সঙ্গে কারওর সদ্ভাব নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখেশুনে ও আর ও-পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এল, বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ও সব পার্টি করতে যাচ্ছিস।'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয়নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়েননি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছেন, তেমনি করেই বাদলকে বকেছেন, ধমকেছেন। বলেছেন, 'তুই গিয়ে একটা খুনি পার্টির সঙ্গে জুটেছিস!'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিলেন, বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনি পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছেন, 'আলবত খুনি পার্টি। কতকগুলো গুন্ডা বদমাইস লোক ছাড়া ও পার্টিতে কোনও ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।' বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি যেন চিনতে পারছেন না। ও শান্ত আর গম্ভীরভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। কৃপাল দয়ালের মতো গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলেনি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখল। ও যেন কত বড়ো হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে, একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করত, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন । অথচ আবার, বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ববোধ করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দুরকম কথা জানতেন না। ঠিক যেমনভাবে কৃপাল দয়ালকে বলেছিলেন তেমনিভাবেই বাদলকে বলেছিলেন, 'ও সব কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে, তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা, বিমলার কখনও ভালো লাগে না। মানুষটা কথায় কথায় বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনও জবাব দেয়নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিলেন, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে...।' এমনি অনেক কথা বলেছিলেন। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনও দেখা গেল না, মাথা ঠান্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন কৃপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেইরকম করে কথা বলেছিল।

বিমলার বুকভরা অশান্তি তার উদ্বেগ। শেষ পর্যন্ত বাদলের উপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে পার্টি ছাড়া, আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষপর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলেছিলেন, 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবিদাবি, খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি?'

বাদল শান্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনও ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ও সব ক্ষতি-টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে, তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবি, এ সব আর আমি সহ্য করতে পারছি না! তুই ও সব পার্টি-টার্টি ছাড়।'

বাদল গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমি বাড়িতে কারওর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারব না।'

বিমলা বলেছিলেন, তা ছাড়বি কেন। তা হলে যে আমার একটু সুখ হয়। বুঝেছি, আমি না মরলে তোরা

বাপ-ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার? কতকগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।' বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, 'এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।

মায়ের কথা শুনে বাদল বোধ হয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এরকম করছ কেন। বলছি তো, আমি বাবা-দাদাদের কারও সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।'

কিন্তু বাদলের সে-কথা টেকেনি। কখনও কৃপাল, কখনও দয়াল, কখনও বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমত পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।

প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোনদিন একটা কী ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'

—ও বোঝাবার বাইরে চলে গেছে।

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আব তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?'

কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।'

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন একরকমভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে, 'তোমার ছোটো ছেলেকে বলে দিও, এখনও সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড়ো পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'

বিমলার বুকের মধ্যে সে দিন একবার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, 'নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পার না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও। তুমি পার্টি ছাড়তে পার না? তারপরে ছেলেকে বলতে পার না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?'

হরপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি ও সব বুঝবে না। আমার পার্টি ছাড়ার কিছু নেই। আমি ওদের মতো গুন্ডা পার্টি করছি না। কিন্তু বাদলা যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, ও একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না।'

বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, 'আমাকে ও সব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাঁদি আছি। তোমাদের খেদমত খাটছি। আর তোমরা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।'

বিমলা হরপ্রসাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তারপরেও হরপ্রসাদ আপনমনে বকবক করছিলেন, 'বাদলার মরণ ধরেছে। পার্টির নেতাদের উস্কানিতে, ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আরম্ভ করেছে।'

বিমলার বুকের মধ্যে আবার কেঁপে উঠেছিল। বাবা হয়ে হরপ্রসাদ কেমন করে বলেছিল, ছেলেটার মরণ ধরেছে। কেবল বাদলের বেলায় না। হরপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছেন। কৃপাল-দয়ালের কথাতেও বলেছেন, ওদের মরণ ধরেছে। হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়? পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়ো? ওদের কি ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছু নেই? পার্টি কি তার ওপরে? এই সংসারের মাঝখানে বসে, এ কথাটা কোনওদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কেবল ভেবেছেন, তাঁর ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের সংসার কি ওরা গড়তে পারত না। তার বদলে ওরা এক একজন, এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।

বিমলা বাদলকে বলেছিলেন, 'তোর বাবা দাদারা সবাই তোর নামে নালিশ করছে। তুই কি একটা বিপদ-আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না?'

বাদল বলেছে, 'বিপদ-আপদ আবার কী। ওরা চায়, ওরা পার্টি করবে, আমি চুপচাপ বসে থাকব। তা আমি থাকব কেন? ওদের শাসানিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করতে এলে, আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।' বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, 'তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগতে যাস?'

বাদল বলেছিল, 'আমি কেন লাগতে যাব। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে।'

—কেন, তুই বাবা-দাদাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারিস না?

—বাবা-দাদারা বুঝি মিলে-মিশে আছে? পার্টির ব্যাপারে কারওর সঙ্গে কারওর মিল-মিশ হবে না। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছে, 'পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমার বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারওর পরোয়া করি না।'

বিমলা তারপরেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েননি, 'বাপের অমতে এ সব করছিস। এর পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে?'

বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, 'বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টিকে সমর্থন করতে পারব না।'

বিমলা যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়েছিলেন। কোনওদিকে তাঁর শান্তি ছিল না। স্বামী-পুত্রদের কারওকে তিনি বোঝাতে পারেননি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টির লড়াই চলছিল। এক সঙ্গে বসে বাবা-ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনওদিন সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারওর সঙ্গে একটি কথা বলত না। কলের পুতুলের মতো সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।

—মা। মা কোথায় গেলে?

এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে কৃপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করেছে। বিমলা কোনও সাড়া দেননি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহিদ বেদির দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবে বাতাসের সঙ্গে এবার ইলশেগুঁড়ি ছাটের মতো বৃষ্টি নেমে এল। জবাগাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্নাঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে, বাদলের ওই আঁতুড়ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়ে চড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনও তাঁর গর্ভে।

বিমলা চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই আবার ভেসে উঠল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। কৃপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারেনি। পুলিশ যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারেনি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদের পার্টি ছাড়াও, আরও পার্টি আছে। কিন্তু স্বীকার করেনি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।

যতই অস্বীকার করুক, কোনও না কোনও পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন্ পার্টি? কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে। অথচ তারা বিমলার স্বামী-পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না? কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধ পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে? তা-ই যদি হয়, তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।

বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাকে ডাকাডাকি করছে। কৃপাল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছেন। ওরা নিজেরা কেউ কারওর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা আলাদা ডেকে চলেছে।

—মা, ও মা!

—মা কোথায় গেলে?

—কই গো শুনছ, কোথায় গেলে?

বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে, ঘরে ঘরে, রান্নাঘরে, সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে। বৃষ্টির ছাঁটে ছোটাছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন, দয়াল রান্নাঘরের কাছ থেকে কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, 'মাসিমা, ও মাসিমা।'

কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, 'কী বলছিস রে দয়াল।'

—মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে?

—না তো। সকাল থেকে একবারও আসেনি তো। কোথায় গেল তোর মা?

—কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্নাঘরের দরজা খোলা। কুকুর ঢুকে, কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে। রান্নাবান্না কিছু হয়নি।

কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, 'সে কী করে। তোর মায়ের তো এরকম কখনও হয় না। দ্যাখ্ খুঁজে, কোথায় গেল। আমিও দেখছি।'

কোথাও যাননি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহিদ বেদির দিকে দেখছেন। যারা বেদি তৈরি করেছিল, তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহিদ বেদি করেছিল। তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহিদ বেদিতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর আসেনি। তারা যেমন পার্টি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা-ছেলেরাও করছে। বিমলাই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে বাদল পৃথিবীতে এসেছে। এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। গম্ভীর হয়ে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনাবার চেষ্টা করছেন।

বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহিদে বেদিতে না। তাঁর বুকেই আছে।

—বড়োবউ!

হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তাঁর ভাইয়ের মধ্যে সকলের বড়ো। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড়োবউ বলেই ডাকা হত। হরপ্রসাদ কখনও কখনও তাঁকে ওই নামে ডাকেন। বিমলা কোনও জবাব দিলেন না।

হরপ্রসাদ বললেন, 'আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। বিমলা জানেন, আজ বাদলের জন্মদিন হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারওর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না। কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে ওদের একটু পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে বাদলকে পায়েস রান্না করে খাইয়েছিলেন। বাদলের জন্য আর তাঁকে পাযেস রান্না করতে হবে না।

হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিস্ময়, কারণ তিনি বিমলার কিছুই বুঝতে পারছেন না। বলেই চলেছেন, 'রান্নাবান্না কিছু করোনি। আধকাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে গেছে। কী ব্যাপার তোমার?'

হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবেন না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড়ো হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।

হরপ্রসাদের গলার শব্দে কৃপাল-দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারওর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

কৃপাল বলল, 'মা, তুমি এখানে কী করছ?'

দয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী-পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড়োবউ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদির দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।' তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্না-বান্না করোনি, আমরা খাব কী?'

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'

তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী করব এখন?'

বিমলা বললেন, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।' অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে ফণীমনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিনজনেই দেখল। তিনজনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ কোনও কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না এই প্রথম, তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।

তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় আর বৃষ্টির ছাঁটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিস্ময় নিয়ে একে একে চলে গেল।

বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির ছাঁটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠছে, গলার কাছে উঠে আসছে। তার চোখে এখন জল আসছে, বৃষ্টির জলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বুকের কাছে হাত রেখে মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমাব কাছে থাক।' □

দ্রৌপদী

মহাশ্বেতা দেবী

নাম দোপ্‌দি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্‌ মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা............

দুই তকমাধারী ইউনিফর্মের মধ্যে সংলাপ।

এক তকমাধারী ঃ সাঁওতালির নাম দোপ্‌দি ক্যান্‌? আমি যে নামের লিস্টি লইয়া আইছি তাতে তো এমুন নাম নাই? লিস্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে?

দুই তকমাধারী ঃ দ্রৌপদী মেঝেন। ওর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর (নিহত) বাড়িতে ধানভানারি ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।

এক তকমাধারী ঃ অহনকার অপিচাররা জানে ক্যাবল ফশফশাইয়া ইংরাজি লিখতে। হেয়ার নামে এত লিখছে কী?

দুই তকমাধারী ঃ মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ান্টেড ইন মেনি.....

ড্যসিয়ের ঃ দুলন্‌ ও দোপ্‌দি দাওয়ালি কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। উনিশশো একাত্তর সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজনও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই মেন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিশের হাতে সারেন্ডার না করাতেও। এবং অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট ক্যাপ্টেন অর্জন সিং প্রভাতে লাশ গণনা করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে না পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্লাডসুগারে আক্রান্ত হয়ে পুনর্বার প্রমাণ করে বহুমূত্র সত্যই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ব্যাধিও বটে। বহুমূত্র বারোভাতারি। তার এক ভাতার অ্যাংজাইটি।

দুলন্‌ ও দোপ্‌দি দীর্ঘদিন নিয়ন্‌ডারখাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং বিশেষ বাহিনী সে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে বিদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দাওয়ালি সাঁওতাল সাঁওতালনিকে তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে যেতে বাধ্য করে। ভারতের সংবিধানে জাত-ধম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষই পবিত্র, তা সত্ত্বেও এহেন অঘটন ঘটে যায়। কারণ দ্বিবিধ ঃ এক—নিখোঁজ দম্পতির আত্মগুপ্তিতে অসামান্য দক্ষতা। দুই—বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল কেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুন্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক চেহারা মনে হওয়া।

বস্তুত, বাঁকড়াঝাড় থানার আন্ডারে (এ ভারতে কেন্নোটিও কোনও না কোনও থানার আন্ডারে) অবস্থিত কুখ্যাত ঝাড়খানি জঙ্গলের চতুষ্পার্শ্বে, এমনকি অগ্নি ও নৈর্ঋত কোণেও থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ (যেহেতু ছেনতাইপার্টি নির্বিশেষে সুশিক্ষিত নয় সেহেতু বন্দুকের বদলে তারা "চেম্বারটা দিয়ে দিন"ও বলে)—গোলদার-জোতদার-মহাজন-শান্তিরক্ষক-কাগুজেবাবু ও খোঁচোড় ইত্যাদিতে অপরাধী বলে যাদের সন্দেহ করা হয়, তাদের সম্পর্কে সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীয় বিবরণীতে জানা যায় বহু পিলে চমকানো কথা। দুই কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর ঘটনার আগে সাইরেন চিৎকারে "কুলকুলি" দিয়েছে। কতকগুলি অসভ্য, সাঁওতালিদের কাছেও দুর্বোধ্য ভাষায় তারা নিহতদের ঘিরে উল্লাস-সঙ্গীত গেয়েছে। যথা ঃ

"সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে"

এবং

"হেন্‌দে রাম্‌ব্রা কেচে কেচে

পুনডি রাম্‌ব্রা কেচে কেচে।"

এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় এরাই ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের বহুমূত্রের কারণ। প্রশাসনিক কার্যরীতি সাংখ্যের পুরুষ, বা মাকড়া দর্শকের চোখে আন্তোনিওনির আগেকার ফিল্‌মের মতোই দুর্বোধ্য বলে প্রশাসন পুনর্বার অর্জন সিংকেই অপারেশন ফরেস্ট ঝাড়খানিতে পাঠায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি দপ্তরের কাছে উক্ত কুলকুলে ও নৃত্যশীল দম্পতিই যে পলাতক লাশদ্বয় তা জেনে অর্জন সিং কিছুক্ষণ 'জোম্‌বি' অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষে তার এমন অহেতুক ভীতি জন্মায় যে, নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে 'জান্ লে লি' বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়। কী ইউনিফর্ম, কী গ্রন্থসাহেব. কেউই তাকে এ অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তারপর প্রিম্যাচিওর ফোর্সড রিটায়ারমেন্টের জুজু দেখিয়ে তবে তাকে বাঙালি প্রৌঢ়, সমর ও বামপন্থী উগ্র রাজনীতি স্পেশালিস্ট সেনানায়কের টেবিলে হাজির করা যায়। সেনানায়ক প্রতিপক্ষের কাণ্ডবান্ড ও এলেমের দৌড় প্রতিপক্ষের চেয়েও ভালো জানেন। তাই তিনি অর্জন সিংকে প্রথমে শিখ জাতির সমরপ্রতিভা সম্পর্কে স্তুতি জানান। পরে বুঝিয়ে দেন, শুধু কি প্রতিপক্ষের বেলাই বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস? অর্জন সিংয়ের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল অর্গান থেকে বেরয়। হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে "পঞ্চ ক" অব্দি বিকল ও ব্যর্থ। এ সকল বক্তিমে তিনি অন্যদের কাছেও করেন, ফলে যুধ্যমান বাহিনীর মনে পুনর্বার "আমি হ্যান্ডবুক" কেতাবে আস্থা ফেরে। কেতাবটি সাধারণের জন্য লয়কো। তাতে লেখা আছে. আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সব চেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শন মাত্রে নিধন হল সেনামাত্রের পবিত্র কর্তব্য। দোপ্‌দি ও দুল্‌না উক্ত যোদ্ধাদের ক্যাটেগরিতেই পড়ে, কেননা তারাও টাঙি-হেঁসো-তির-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে নিধনকার্য চালায়। বস্তুত তাদের আক্ষেটি-ক্ষমতা বাবুদের চেয়ে বেশি। সকল বাবু চেম্বার ফোটনে বিশারদ হয় না, তারা ভাবে বন্দুক ধরলেই ক্ষমতা আপ্‌সে বেরবে। কিন্তু দুল্‌না ও দোপ্‌দি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করেছে জন্ম পবম্পরায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই সেনানায়ককে প্রতিপক্ষ তুচ্ছ মনে করে বটে, কিন্তু এ সামান্যি মানুষ নয়। ইনি প্র্যাক্টিসে যাই করুন, থিওরিতে প্রতিপক্ষের আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন। এই জন্য শ্রদ্ধা করেন যে 'ও কিসসু নয়, চেংড়ারা বন্দুক লইয়া খেলে' মনোভাব নিয়ে এগোলে ওদের বোঝা যাবে না ও বিনাশ করা যাবে না। ইন অর্ডার টু ডেস্ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তাই তিনি ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন। এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালিখির বাসনা রাখেন। তখন (সেই লেখায়) বাবুদের ডিমোলিশ করে দাওয়ালিদের বক্তব্যটিকে হাইলাইট করবেন, এও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর মনের এ সকল প্রসেসকে আপাতজটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি খুবই সরল এবং কাউঠার মাংস খেয়ে তাঁর সেজ ঠাকুরদার মতোই তিনিও আনন্দ পান। আসলে তিনি জানেন, প্রাচীন গণনাট্যগীতির মতো করভটে বদল হোগা জমানা। এবং সকল জমানাতেই তাঁর সসম্মানে টেকার মতো টিকিটপত্তর চাই। দরকার হলে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিয়ে দেবেন, তিনিই ব্যাপারটি কত ঠিক পারস্পেকটিভে বুঝেছিলেন। আজ যা যা করছেন তা ভবিষ্যতের মানুষ ভুলে যাবে তাতে তাঁর তিলেক সন্দেহ নেই এবং জমানা হতে জমানায় সবার রঙে রং মেশাতে পারলে তিনি সংশ্লিষ্ট জমানার প্রতিনিধি হতে পারবেন, এও তিনি জানেন। আজকে 'অ্যাপ্রিহেনশন অ্যান্ড এলিমিনেশন' করে তিনি তরুণদের নিকেশ করছেন বটে কিন্তু মানুষ রক্তের স্মৃতি ও শিক্ষা অচিরে ভুলবে এ তিনি জানেন। এবং একই সঙ্গে তিনিও শেক্সপিয়রের মতো তরুণের হাতে পৃথিবীর লিগেসি তুলে দেওয়াতে বিশ্বাসী। তিনিও প্রস্‌পেরো।

যা হোক, এরপর জানা যায় বহু যুবক-যুবতী ব্যাচ বাই ব্যাচ জিপগাড়ি আরোহণে থানার পর থানা হানা দিয়ে অঞ্চলটিকে যুগপৎ সন্ত্রস্ত ও উল্লসিত করে ঝাড়খানির জঙ্গলে বিলীন হয়। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে দোপ্‌দি ও দুল্‌ন্ প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে, সেহেতু তারা হন্তব্যদের বিষয়ে হন্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল। অবশেষে

দুর্ভেদ্য ঝাড়খানি জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও রণভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝর্না ও কুণ্ডীগুলি পাহারা দেয় আড়ালে থেকে, আজও দিচ্ছে, আজও খুঁজছে। তেমনই এক তল্লাশকালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখিরাম ঘড়ারি দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁততাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ৩০৩-র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দু হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে 'মা—হো' বলে সফেন রক্ত উদ্‌গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সে-ই কুখ্যাত দুলন্‌ মাঝি।

এই 'মা—হো' শব্দটির মানে কী? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী স্লোগান? এর মানে কী তা ভেবে শান্তিরক্ষক-দপ্তর বহু চিন্তা করেও হালে পানি পান না। আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হয় এবং তাঁরা হফম্যান জেফার, গোল্‌ডেন-পামাব প্রমুখ মহাশয় রচিত অভিধান নিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকেন। অবশেষে সর্বজ্ঞ সেনানায়ক চমরুকে ডাকেন। ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু দুই বিশেষজ্ঞকে দেখে ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, "উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। তা হেথা কোন্ বেটা 'মা—হো' বলল বেটে? মালদ' হতে কেউ এল?"

সমস্যা ফরসা হয়। তারপর দুলনের শবদেহ উক্ত পাথবে ফেলে রেখে সেনারা সবুজ উর্দির কামুফ্লাজে গাছে গাছে চড়ে দেবতা প্যানের মতো গাছের ডাল আলিঙ্গনে বেঁধে অসভ্য জায়গায় কাঠপিঁপড়ের সন্ধানী কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করে। দেখে, মৃতদেহ নিতে কেউ আসে কি না। এটি শিকার-পদ্ধতি যেমন, যুদ্ধের পদ্ধতি তেমন নয়। কিন্তু সেনানায়ক জানেন, কোনও চেনা-জানা পদ্ধতিতেই এ খচড়াদের নিকেশ করা যাবে না। তাই তিনি মড়ির টোপ দেখিয়ে শিকারকে টেনে আনতে বলেন। তিনি বলেন, 'সব ফরসা হয়ে যাবে। যে সব গান গেয়েছে দোপ্‌দি তার মানেও বের করে ফেললাম বলে।'

তাঁর কথা শিরোধার্য করে সেনারা তৎপর হয়। কিন্তু দুলনের মৃতদেহ নিতে কেউ আসে না। উপরন্তু রাতের আঁধাবে খচরমচর শুনে সেনারা গুলি ছুড়ে নেমে এসে দেখে তারা শুকনো পাতার বিছানায় সঙ্গমরত শজারু-দম্পতিকে মেরেছে। জঙ্গলে সেনাদেব পথ চেনাবার খোঁজিয়াল দুখিরাম ঘড়ারি অসংসারীর মতো দুলন্-সংশ্লিষ্ট বর্কশিশ না নিয়েই কার যেন হেঁসোতে গলা দেয়। দুলনের লাশ বয়ে আনতে আনতে সেনারা লাশভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত কাঠপিঁপড়েদের কামড়ে আশীবিষের যন্ত্রণা পায়। লাশ নিতে কোই না আয়া শুনে সেনানায়ক পেপারব্যাকের আন্টিফ্যাসিস্ত্‌ 'ডেপুটি' কেতাবটি চাপড়ে 'হোআট' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং তখনই একজন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসেব মতো ন্যাংটো ও শুভ্র আনন্দে ছুটে এসে বলে ওঠেন, 'সাব! ওই হেন্‌দে রাম্‌ব্রা কথাগুলোর মানে বের করে ফেলেছি। ওগুলো মুন্ডারি ল্যাংগোয়েজ।'

অতএব দোপ্‌দির খোঁজ চলতে থাকে। ঝাড়খানি জঙ্গল বেল্‌টে অপারেশন চলেছে—চলছে—চলবে। ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোঁড়া। সিদ্ধ মলমে সারবার নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়। প্রথম ফেজে পলাতকরা জঙ্গলের টোপোগ্রাফি না জানায় পটাপট ধরা পড়ে ও সম্মুখ সঙ্ঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরে করদাতার খরচের শ্রাদ্ধ করে গুলি বেঁধানো হয়। সম্মুখ সঙ্ঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরের চক্ষুগোলক-পৌষ্টিকনালী-পাকস্থলী-হৃৎপিণ্ড-জননস্থান প্রভৃতি শেয়াল-শকুন-হায়না-বনবিড়াল-পিঁপড়ে ও কৃমির খাদ্য হয় এবং নির্মাংস শুভ্র কঙ্কাল নিয়ে ডোমরা সানন্দে বেচতে যায়।

পরবর্তী ফেজে তারা সম্মুখ সঙ্ঘর্ষে ধরা দেয় না। তাতে এখন মনে হচ্ছে তারা কোনও একজন বিশ্বস্ত ক্যুরিয়ারকে পেয়েছে। সে যে দোপ্‌দি, সে সম্ভাবনা ট্‌াকায় নব্বই পয়সা। দোপ্‌দি দুলন্‌কে রক্তাধিক ভালোবাসত। এখন সেই ওদের বাঁচাচ্ছে নিশ্চয়।

'ওদের' কথাটিও হাইপোথেসিস।

কেন?

ওরিজিনালি কতজন গিয়েছিল?

উত্তর নীরবতা। সে বিষয়ে বহু গল্প উড্ডীয়মান, বহু কেতাব যন্ত্রস্থ। সব কথা বিশ্বাস না করাই ভালো।

ছয় বছরে কতজন সম্মুখ সঙ্ঘর্ষে নিহত?

উত্তর নীরবতা।

সম্মুখ সঙ্ঘর্ষের পর কঙ্কালসমূহের হাত ভাঙা বা কাটা কেন? নুলোরা কি সম্মুখ সঙ্ঘর্ষ করতে পারে? কণ্ঠাস্থি, লটরপটর পা ও পাঁজরের অস্থি চূর্ণিত কেন?

উত্তর দুরকম। নীরবতা। চোখে অভিমানী তিরস্কার, ছিঃ! এ সব কথা কি কইতে আছে? যা হওয়ার তা তো......এখন কত

এখন কতজন জঙ্গলে আছে?

উত্তর নীরবতা।

তারা কি এক লিজিয়ন? তাদের কারণে করদাতাদের খরচে একটি বড়ো বাহিনী হামেহাল ওই জঙ্গলের বন্য পরিবেশে মোতায়েন রাখা কি জাস্টিফায়েড?

উত্তর ঃ অবজেকশন। 'বন্য পরিবেশ' কথাটি ঠিক নয়। মোতায়েন বাহিনী সুষম খাদ্য-চিকিৎসা ব্যবস্থা, যথাধর্ম মতে অনুষ্ঠানের সুবিধা, বিবিধ ভারতী শোনা ও 'ইয়ে হ্যায় জিন্দ্‌গী' ফিল্‌মে সঞ্জীবকুমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দেখার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। না, পরিবেশ 'বন্য' নয়।

কতজন আছে?

উত্তর নীরবতা।

কতজন আছে? অ্যাট অল কেউ আছ কি?

উত্তর দীর্ঘ।

যথা : ওয়েল, অ্যাকশন হচ্ছে। মহাজন-জোতদার-গোলদার শুঁড়ি-বেশ্যালয়ের বেনামি মালিক অতীতের খোঁচোড়, এরা আজও সন্ত্রস্ত। নিরন্ন ন্যাংটারা আজও উদ্ধত ও অনমনীয়। দাওয়ালরা কোনও কোনও পকেটে বেটার ওয়েজ পাচ্ছে। পলাতকদের প্রতি সহানুভূতিশীল গ্রামগুলি আজও নীরব ও বিদ্বেষী। এইসব ঘটনা থেকে মনে করার কারণ আছে........

এ ছবিতে দোপ্‌দি মেঝেন্‌ কোথায় বসে?

সে নিশ্চয় পলাতকদের সঙ্গে শামিল আছে। ভয়ের কথা অন্যত্র। যারা আছে, তারা দীর্ঘদিন জঙ্গলের আদিম জগতে আছে। সাহচর্য করছে দরিদ্র দাওয়াল ও আদিবাসীদের সঙ্গে। এই সাহচর্যের ফলে তারা নিশ্চয়ই কেতাবি শিক্ষা ভুলে মেরে দিয়েছে। যে মাটিতে থাকছে, তার সঙ্গে হয়তো কেতাবি শিক্ষা ওরিয়েন্টশন করে নতুন করে সংগ্রাম-পদ্ধতি ও বাঁচবার নিয়ম শিখছে। বাইরের কেতাবি শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এইমাত্র যাদের সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে। হাতেকলমে কাজ করছে যারা, তারা অত সহজে নিকেশ হওয়ার নয়।

অতএব অপারেশন ঝাড়খানি ফরেস্ট থামতে পারে না। কারণ আর্মি হ্যান্ডবুকের সাবধানবাণী।

২

দোপ্‌দি মেঝেনকে ধর। সে ওদের ধরিয়ে দেবে।

দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বেঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। মুসাই টুডুর বউ ভাত রেঁধে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেয়। ভাত জুড়োলে দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বাঁধে ও ধীরে ধীরে চলে। চলতে চলতে ও মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ডাঙর বের করে মারছিল। একটু কেরোসিন পেলে মাথায় ঘষে দিলে উকুন নিকেশ হয়। তারপর সোডা দিয়ে মাথা ঘষে ফেলা যায়। কিন্তু হারামিরা ঝর্নার বাঁকে বাঁকে খেপ মারে। জলে কেরোসিনের বাস পেলে ওরা গন্ধে গন্ধে চলে আসবে।

দোপ্‌দি!

দোপ্‌দি সাড়া দিল না। স্বনামে ডাকলে কখনই সাড়া দেয় না ও। ওর নামে বকশিশ ঘোষণার কাগজটা

আজই পঞ্চায়েত আপিসে দেখে এসেছে। মুসাই টুডুর বউ বলছিল, 'উ কী দেখিস? কুথাকার কে দোপ্‌দি মেঝান! তারে ধরা করালে টাকা!'

—কত টাকা?

—দু—শো!

—হাই গ!

বেরিয়ে এসে মুসায়ের বউ বলল, 'ইবার সাজসাজন্ খুব। স—ব লতুন পুলুস!'

—হাঁ।

—তু আসিস না আর।

—কেনে?

মুসাইয়ের বউ চোখ নামিয়ে বলল, 'টুডু বলে সি সাহেবটা আবার এসেছে। তোরে ধরলে গাঁ-বসত.........'

—আবার জ্বালাই দিবে?

—হঁ। আর দুখিরামের কথাটো.......

—সাহেব জেনেছে?

—সোমাই আর বুধনা হারামি করল।

—তারা কুথা?

—ট্রেন চেপে পালাল।

দোপ্‌দি কী ভেবে নিল। তারপর বলল, 'ঘর যা। কী হবে জানি না, মোরে ধরলে তুরা মোরে চিনবি না।'

—তু পলাতে পারিস না?

—নাঃ। কতবার পলাব বল? ধরলে বা কী করবে বল? কাঁউটার করে দিবে, দিক।

মুসাইয়ের বউ বলল, 'মোদের আর কুথা যাবার নাই।'

দোপ্‌দি আস্তে বলল, 'কারো নাম বলব না।'

দোপ্‌দি জানে, এতদিন শুনে শুনে শিখেছে, কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মুকাবিলা করা যায়। যদি নির্যাতনে নির্যাতনে শরীর ও মন ভেঙে পড়ে তখন দোপ্‌দি নিজের জিভ দাঁতে কেটে ফেলবে। সেই ছেলেটা কেটে ফেলেছিল নিজের জিভ। তাকে কাঁউটার করে দিল। কাঁউটার করে দিলে তোমার হাত থেকে পেছনে বাঁধা। শরীরের প্রতিটি হাড় থাকে চূর্ণ, যৌনাঙ্গে ভীষণ ক্ষত। —কিল্‌ড বাই পোলিস ইন অ্যান এনকাউন্টার.......আননোন্ মেল......এজ টুয়েন্টি টু........

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে দোপ্‌দি শুনল কে তাকে ডাকছে, দোপ্‌দি!

সাড়া দিল না ও। স্বনামে ডাকলে ও সাড়া দেয় না। এখানে ওর নামে উপি মেঝেন। কিন্তু কে ডাকে?

ওর মনে নিরন্তর সন্দেহের কাঁটা গুটিয়ে থাকে। 'দোপ্‌দি' শুনে সন্দেহের ধারাল কাঁটা শজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ও মনে মনে চেনা মুখের ফিলম রোল খুলে চলল। কে? সোম্‌রা নয়, সোম্‌রা পলাতক। সোমাই আর বুধ্‌না পলাতক, অন্য কারণে। গোলক নয়, সে বাকুলিতে আছে। এ বাকুলির কেউ? বাকুলি ছেড়ে বেরবার পর থেকে তার ও দুলনার নাম হয়েছিল উপি মেঝেন, মাতং মাঝি। এখানে এক মুসাই আর তার বউ ছাড়া আসল নাম কেউ জানে না। বাবু ছেলেদের মধ্যে আগেকার ব্যাচের সবাই জানত না।

সে সময়টা বড় গোলমেলে। দোপ্‌দির ভাবতে গেলে গোলমাল লাগে। বাকুলিতে অপারেশন বাকুলি। সূর্য সাউ বিড্ডিবাবুর সঙ্গে যড় করে দু বছরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবয়েল বসাল, কুয়ো খুঁড়ল তিনটে। কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল, কাকের চোখের মতো নির্মল।

কানাল টেক্সো দিয়ে জল লাও, জ্বলে গেল সব।

টেক্সোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কী লাভ?

জ্বলে গেল সব।

যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতি বদমাসি আমি মানি না। জল নিয়ে চাষ বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান বাড়ি দাও, টাকা দাও, যাঃ তোদের তরে ভালো কাজ করে আমার শিক্ষা হয়েছে।

—কী ভালো কাজ করলা তুমি?

—জল দিই নাই গ্রামকে?

—ভগুনলে বিয়াইকে দিয়েছ।

—তোরা জল পাস না?

—নাঃ। ডোম চাঁড়াল জল পায় না।

এই কথা থেকে ঝগড়া। খরায় মানুষের ধৈর্যসহ্য সহজে জ্বলে। গ্রামের সতীশ যুগল—সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল, জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।

সূর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও। সূর্য সাউ বন্দুক বের করেছিল। গোরুর দড়িতে পাছমোড়া বাঁধা সূর্য। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। দুল্‌না বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারি দেই।

দোপ্‌দি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।

সূর্য সাউ। তারপর সিউড়ি থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজ। স্পেশাল ট্রেন। আর্মি। জিপ বাকুলি অব্দি আসেনি। মার্চ-মার্চ-মার্চ। নালপরা বুটের নীচে কাঁকরের ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ। কর্ডন আপ। মাইকে আদেশ। যুগল মণ্ডল-সতীশ মণ্ডল-রানা অ্যালায়াস-প্রবীর অ্যালায়াস দীপক-দুল্‌না মাঝি-দোপ্‌দি মেঝেন সারেন্ডার, সারেন্ডার। নো সারেন্ডার সারেন্ডার। মো—মো—মো ডাউন দি ভিলেজ। খটাখট—খটখট—বাতাসে কর্ডাইট—খটখট—রাউন্ড দি ক্লক—খটখট। ফ্রেম থ্রোআর। বাকুলি জ্বলছে। মোর মেন আন্‌ড উইমেন, চিল্‌ডরেন.......ফায়ার—ফায়ার। ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ। ওভার-ওভার-ওভার বাই নাইটকল। দোপ্‌দি আর দুল্‌না বুকে হেঁটে পালিয়েছিল।

বাকুলির পর পল্‌তাকুড়িতে ওরা পৌঁছতে পারত না। ভূপতি আর তপা নিয়ে যায়। তারপর ঠিক হয় দোপ্‌দি ও দুল্‌না ঝাড়খানি বেল্টের আশেপাশে কাজ করবে। দুল্‌না দোপ্‌দিকে বুঝিয়েছিল, এই ভালো রে! এতে আমাদের ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে হবে না! কে বলতে পারে একদিন জোতদার-মহাজন-পুলিশ—সব নিশ্চিহ্ন হবে না?

কিন্তু আজকে ওকে পিছন থেকে কে ডাকল?

দোপ্‌দি হাঁটতে থাকল। গ্রাম-প্রান্তর-ঝোপঝাড় ও খোয়াই-পি ডব্লু ডির খাম্‌বা—পেছনে ছুটে আসার শব্দ। একজনই আসছে। ঝাড়খানির জঙ্গল এখনও ক্রোশখানেক। এখন ওর মনে হল জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচে। ওদের বলতে হবে পুলিশ আবার তার নামে লুটিস দিয়েছে। বলতে হবে সেই হারামি সাহেব আবার এসেছে। হাইড-আউট পালটাতে হবে। তা ছাড়া, সান্দারাতে খেতমজুরদের টাকা দেওয়া নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়, তারপর সেখানে লক্ষ্মী বেরা, নারান বেরাকে সূর্য সাউ করে দেওয়ার প্ল্যানও নাকচ করতে হবে। সোমাই ও বুধনা সবই জানত। দোপ্‌দির বুকের নীচে ভীষণ বিপদের আর্জেন্সি। ওর এখন মনে হল সোমাই ও বুধনা যে হারামি করবে তাতে সাঁওতাল হয়ে ওর লজ্জার কিছু নেই। দোপ্‌দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপ্‌দির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস্ রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। শব্দ ও দোপ্‌দির মাঝে ব্যবধান এক থাকছে। কোঁচড়ে ভাত, কষিতে গোঁজা তামাক পাতা। অরিজিৎ, মালিনী, শামু, মন্টু কেউ বিড়ি সিগারেট চা খায় না। তামাক পাতা ও চুন। কষিতে কাগজের মোড়কে গোঁজা আলকুলির বীজ থেঁতো। বিছে কামড়ালে অব্যর্থ ওষুধ। কিছুই দেওয়া যাবে না।

দোপ্‌দি বাঁ দিকে ঘুরল। এ দিকে ক্যাম্প। দু মাইল দূরে। বনের পথ নয় এটা। কিন্তু পেছনে খোঁচোড় নিয়ে দোপ্‌দি বনে যাবে না।

জান কসম। জা—হান্ কসম দুল্‌না, জান ক—সম। কিছুই বলা হবে না।

পায়ের শব্দ বাঁ দিকে ঘুরল। দোপ্‌দি কোমরে হাত দিল। হাতের তেলোয় বাঁকা চাঁদের আশ্বাস। হেঁসোর বাচ্চা। ঝাড়খানির কামাররা গড়ে ভাল। এমন শা—হান দিয়ে দিব উপি, যে শত দুখিরামরে—। দোপ্‌দি ভাগ্যে বাবু হতে যায়নি। বরঞ্চ ওরাই বুঝেছে সব চেয়ে ভাল কাস্তে-হেঁসো-টাঙি-ছুরি। নীরবে কাজ সারে। দূরে ক্যাম্পের আলো। দোপ্‌দি সে দিকে বা যাচ্ছে কেন? দাঁড়া তুই, ফিন বাঁক ঘুর্যে যায়। আঃ—হা! রাতভর আমি চক্ষু মুদে ঘুর্যে বুলতে পারি। জঙ্গলে যাব না, পথ হারাব না। দম ছুটবে না। তুই শালো খোঁচোড়, জাহানের মায়ায় মরিস, তু ঘুরবি? দম ছুট্যোয়ে তোরে গাড়ায় ফেলে নিকাশ করি দিব।

কিছুই বলা হবে না। নতুন ক্যাম্প দেখে এসেছে দোপ্‌দি, বাস স্টেশনে বসে গল্প করে বিড়ি টেনে জেনে এসেছে কত কনভয় পুলিশ এল, কটা ওয়্যারলেস ভ্যান। ডিংলা চার, পিঁয়াজ সাত, লঙ্কা পঞ্চাশ—সিধা হিসাব। কিছুই জানানো যাবে না। ওরা নিশ্চয় বুঝে নেবে দোপ্‌দি মেঝান কাঁউডার হয়ে যেলছে। তখন পলাবে। অরিজিতের গলা, যদি কেউ ধরা পড়ে, টাইম বুঝে অন্যরা হাইড-আউট চেঞ্জ করবে। কমরেড দোপ্‌দি যদি দেরি করে আসে, আমরা এখানে থাকছি না। কোথায় যাচ্ছি, নিশানি থাকছে। কোনও কমরেড নিজের জন্যে অন্যদের ডেস্ট্রয়েড হতে দেবে না।

অরিজিতের গলা। জলের কুলকুল শব্দ। পাথর তুলে নীচে রাখা কাঠের টুকরোর তির ফলা-মুখ যে দিকে, সে দিকের হাইড-আউটে যাওয়া হয়েছে।

এটা দোপ্‌দির পছন্দ, বোধায়ত্ত। দুল্‌না মরে গেল, কারুকে মেরে মরেনি বাবা। প্রথম থেকে এ সব মাথায় জারায় নি বলে এ ওর জন্যে হামলাতে গিয়ে কাঁউটার হতিস। এখন অনেক নির্মম নিয়ম, সহজ ও বোধ্য। দোপ্‌দি ফিরল—ভালো, না—ব্যাড। চেঞ্জ হাইড-আউট। নিশানি এমন হবে, অপোজিশন দেখতে পাবে না, দেখলে বুঝবে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। দোপ্‌দি আবার ঘুরল। এই সাড়ে তিন মাইল বিস্তীর্ণ ভাঙা ও খোয়াই জঙ্গলে ঢোকার প্রকৃষ্ট পথ। দোপ্‌দি সে পথ পেছনে রেখে এসেছে। সামনে খানিকটা সমতল। তারপর আবার খোয়াই। এত উঁচুনিচুতে কখনও আর্মি ক্যাম্প ফেলেনি। এ দিকটা নির্জন। ভুলভুলাইয়া। বাঘাগুগগুলি ইটা বেটে, সকল ঢিবা সকল ঢিবার মতো দেখতে। ঠিক আছে, দোপ্‌দি ফেউটাকে শোঁসানে নিয়ে তুলবে। সারান্দার পতি পাবনকে তো শ্মশানকালীর নামে বলি দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাপ্রিহেন্ড।

ঢিবাগুলির একটা উঠে দাঁড়াল। আরেকটা। আরেকটা। প্রৌঢ় সেনানায়ক যুগপৎ আনন্দিত ও নিরাশ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেস্ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তিনি তা হয়েছিলেন। ছ বছর আগেও উনি ওদের প্রতিটি মুভ অ্যান্টিসিপেট করতে পারতেন, এখনও পারছেন, আনন্দ। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখার ফলে 'ফার্স্ট ব্লাড' পড়ে তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজের সমর্থন দেখেছেন।

দোপ্‌দি তাঁকে ধাপ্পা দিতে পারল না, দুঃখ ও নিরাশা। কারণ দ্বিবিদ: ছ বছর আগে মস্তিষ্ক-কোষে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তিনি প্রমাণ রেখেছেন, তিনি এ সংগ্রামের সমর্থক, দাওয়ালিদের পরিপ্রেক্ষিতে। দোপ্‌দি দাওয়ালি। ভেটেরান ফাইটার। সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয়। দোপ্‌দি মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হতে চলেছে। ডেস্ট্রয়েড হবে। দুঃখ।

হল্ট!

দোপ্‌দি থমকে দাঁড়াল। পেছনের পদশব্দ ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল। দোপ্‌দির বুকের নীচে কানালের

বাঁধ ভাঙল। সর্বনাশ। সূর্য সাহুর ভাই রোতোনি সাহু। সামনের ঢিবা দুটি এগোল। সোমাই ও বুধ্না। ওরা ট্রেনে পালায়নি।

অরিজিতের গলা, যখন জিতছ—তা যেমন জানবে, যখন হারলে—তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।

দোপ্দি এখন দু হাত ছড়িয়ে আকাশপানে মুখ তুলে জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে সর্ব সত্তার শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিল। একবার, দুবার, তিনবার। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানি জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল। কুলকুলির প্রতিধ্বনি বহুদূর যায়।

৩

সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হয়। ওকে নিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে লাগে একঘণ্টা। ঠিক একঘণ্টা জেরা চলে। কেউই তার গায়ে হাত দেয় না এবং তাকে ক্যাম্বিসের টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নিডফুল' বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কী বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখন ওর দু হাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে জল বলে ওঠে, সেই ভয়ে দাঁতে নীচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কত জন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?

ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নীচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে—হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত—তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।

পাশে চোখ ফিরিয়ে ও সাদা কী যেন দেখে। ওরই কাপড়। আর কিছু দেখে না। সহসা দৈবকৃপা আশা করে ও। সম্ভবত ওকে ফেলে গেছে ওরা। শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে বলে। কিন্তু ওর কানে আসে পায়ের ঘষটানি। ঘাড় ঘোরায় ও, বেয়নেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সান্ত্রি ওকে দেখে হাসে। চোখ বোজে দ্রৌপদী। অপেক্ষা করতে হয় না বেশিক্ষণ। আবার বানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।

তারপর সকাল হয়।

তারপর দ্রৌপদি মেঝেনকে তাঁবুতে আনা হয় ও খড়ের ওপর ফেলা হয়। গায়ের ওপর কাপড়টা ফেলে দেওয়া হয়।

তারপর ব্রেকফাস্ট, কাগজ পাঠ, রেডিও মেসেজ—দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড খবর পাঠানো ইত্যাদি হয়ে গেলে দ্রৌপদী মেঝেনকে নিয়ে আসার হুকুম যায়।

কিন্তু এখন হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু হয়।

'চল', বলতেই উঠে বসে দ্রৌপদীও জিজ্ঞাসা করে, কুথাক্ যেতে বলছিস?

—বড় সাহেবের তাঁবুতে।

—তাঁবু কুথাক্?

—হুই।

দ্রৌপদী লাল চোখ ঘোঁচ করে অদূরে তাঁবু দেখে। বলে, চল্, যেছি আমি।

সান্ত্রি জলের ঘটি এগিয়ে দেয়।

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়। জলের ঘটি মাটিতে ঢালে উপুড় করে। কাপড়টি দাঁতে ধরে টেনে টেনে ছেঁড়ে। সান্ত্রি এবংবিধ আচরণ দেখে বাউরা হো গিয়া—বলে ছুটে হুকুম আনতে যায়। সে নিয়ে যেতে পারে কয়েদিকে, কিন্তু কয়েদি দুর্বোধ্য আচরণ করলে কী করবে তা সে জানে না। তাই ওপরওলাকে শুধোতে যায়।

জেলে পাগলাঘন্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তাঁর দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত সান্ত্রিরা তার কিছু তফাতে।

এ কী? বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান।

দ্রৌপদী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। স্তন দুটি ক্ষত।

এ কী? তিনি ধমকাতে যান।

দ্রৌপদী আরও কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাঁধানের মানুষ, দোপ্‌দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?

—কাপড় কই ওর, কাপড়—?

—পরছে না স্যার। ছিঁড়ে ফেলেছে—।

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেওয়ার মতো ভীষণ আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাথা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটা বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করঠব? লেঃ কাঁউটার কর্, লেঃ কাঁউটার কর্—?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়। □

অভিনয়

মানবেন্দ্র পাল

ভবেন্দু মজুমদার সম্প্রতি দেশের পরিস্থিতিতে ভযানক বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

তিনি এই মহকুমা শহরের একজন বিখ্যাত লোক। শুধু মস্ত বড়ো ব্যবসাদার বলেই নয়—ব্যবসাদার হলেও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি।

মিসেস মজুমদারও শহরে একটা-না-একটা কিছু নিয়েই আছেন। আজ বন্যার্তদের সাহায্যে নাট্যানুষ্ঠান, কাল 'বাংলাদেশ'-আগত শরণার্থীদের সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান, পরশু প্রাইমারি ইস্কুলেব দ্বিতল তোলার জন্য চাঁদা আদায় ইত্যাদি। সঙ্গে মিস্টার মজুমদারও আছেন—অন্তত চাঁদার লিস্টে প্রথমেই তাঁর নাম দেদীপ্যমান।

ভবেন্দু মজুমদার খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছেন এই জন্য যে, প্রতিদিনের এই হাঙ্গামায় তাঁদের সংস্কৃতিচর্চা বিশেষভাবে ব্যাঘাত পাচ্ছে। কিছুদিন আগেও হাঙ্গামাগুলো কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু এখন মফস্‌সলেও শুরু হয়েছে। রোজ দুমদাম বোমা ফাটছে যেখানে-সেখানে যখন-তখন। ইস্কুলগুলোয় স্ট্রাইক তো লেগেই আছে। পরীক্ষা-টরিক্ষা বন্ধ। তারপর দেওয়ালে দেওয়ালে কত রকমের পোস্টাব! আর সে সব পোস্টারে 'গলাকাটা', 'বদলা', 'লাল সেলাম' ছাড়া আর কোনও কথা নেই। কাজেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা প্রায় বন্ধ।

ভবেন্দু মজুমদার খুব মনোযোগ দিয়ে রোজ কাগজ পড়েন। নিয়মিত কাগজ পড়ে কতকগুলো কথা তাঁব অভ্যাস হয়ে গেছে। তিনি প্রাযই বাড়িতে সোফায় গা এলিয়ে চা খেতে খেতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা কবেন। বলেন. 'খুনোখুনিব রাজনীতি' চলতে দেওয়া উচিত নয়, 'অবিলম্বে' বন্ধ কবা উচিত। তাঁর মতে 'দুষ্কৃতকারীরা' সকলেই এক একটি রাজনৈতিক 'ছত্রছায়ায় পুষ্ট'। কাজেই এইসব রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে সরকাবের 'কঠোর ব্যবস্থা' নেওয়া উচিত। তিনি সমযে সমযে 'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা' সম্বন্ধেও বাড়িতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু মিসেস মজুমদারের চোখের ইঙ্গিতে তখনই থেমে যান। কে জানে কাছেপিঠে পুলিশের লোক নেই তো? কারণ পুলিশের উপর তাঁকে অনেক বিষয়ে নির্ভর করতে হয়।

খুব একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মজুমদাব দম্পতি এবাব খুব জাঁকজমক করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনে মনস্থ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমারসভা' নাটকটি বেশ হাসির। এটি এবার মঞ্চস্থ করতেই হবে।

বেলা নটা থেকে জোর রিহার্সাল চলছিল। ভবেন্দু মজুমদাব ছেলেমেয়েদের পার্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে অভিনয় জিনিসটা কী—সে সম্বন্ধে প্লেটো থেকে আনন্দবর্ধন কোথায় কী বলেছেন তা শ্লোক আউড়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর মতে সবাই অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে পারে না। ওটা ভগবদ্দত্ত প্রতিভা। তবে কার ভেতর প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা তো হঠাৎ বাইবে থেকে বোঝা যায় না। সেই জন্যেই তাদের প্রতিভাস্ফুরণ'-এর এইসব সুযোগ করে দিতে হয়।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা যারা তাদের 'প্রতিভাস্ফুরণ'-এর এই দুর্লভ সুযোগ লাভ করবার জন্যে জমায়েত হয়েছে তারা সবাই ভবেন্দু মজুমদারের এই জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রদ্ধাসহকারে শুনল। কেউ কেউ অবশ্য বাড়ি যাওয়ার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। কারণ ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে কাঁটা ঝুলে গেছে।

কিন্তু সংস্কৃতিপালক ভবেন্দু মজুমদারের বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি বললেন, 'আচ্ছা ফার্স্ট সিনটা আর একবাব করো দিকি।'

অভিনয়ের মহড়া আবার শুরু হল। এমনি সময় দরজা ঠেলে ঢুকল পিওন।

—রেজিস্ট্রি আছে।

এই রকম রেজেস্ট্রি প্রায়ই আসে। পিওনও চেনা—মহাদেব সাঁতরা। কিন্তু আজ তাকেই দেখে ভবেন্দু মজুমদার চমকে উঠলেন। শুধু তিনিই চমকালেন না, অভিনেতারাও কেমন একরকমভাবে মহাদেব পিওনের দিকে তাকাল। কিন্তু মহাদেব সাঁতরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না। সই করিযে নিয়ে চিঠির ব্যাগ কাঁধে ফেলে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

সে দিন আর মহড়া জমল না। সকলেরই চোখেমুখেই কেমন যেন ত্রস্ত ভাব। ভবেন্দু মজুমদার যেন কেমন হয়ে গেলেন। মহাদেব সাঁতরা হঠাৎ একটা দুর্গ্রহের মতো হাজির হয়ে সব ওলটপালট করে দিয়ে চলে গেল।

ভবেন্দু বললেন, 'আজ আর থাক। তোরা বাড়ি যা।'

বাইরের ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে ভবেন্দু ব্যস্ত হয়ে ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে চুপি চুপি বললেন, 'মহাদেবকে দেখলাম।'

—কোন্ মহাদেব গো?

—চুপ! মহাদেব সাঁতরা—পিওন।

—ওমা সে কী! কোথায় দেখলে?

—আমাদের বাড়ি। চিঠি দিয়ে গেল।

—মহাদেব তা হলে বেবচ্ছে!

—শুধু বেরুচ্ছে নয়, বহাল-তবিয়তে কাজ করছে।

—কী করে যে করছে কে জানে। ও কিছু বলল?

—কিছুমাত্র না। যেমন অন্যদিন রেজিস্ট্রি সই করিয়ে নিয়ে যায় তেমনি নিঃশব্দে সই করিয়ে নিয়ে গেল।

—চোখমুখের ভাব?

—আমি তো কোনও পরিবর্তন দেখলাম না।

—তা হলে কি যা রটেছে তা গুজব?

এবার ভবেন্দু গর্জন করে উঠলেন।

—কখনওই গুজব নয়। দেশসুদ্ধু লোক বলছে। এই যে মেয়েগুলো রিহার্সাল দিতে এসেছিল তারা পর্যন্ত মহাদেবকে দেখে থ'। আর রিহার্সাল দিতে পারল না। গুজব বললেই হল!

মিসেস মজুমদার বললেন. 'কেউ কি ওদের জিজ্ঞেস কবছে না, অনিল কোথায়?'

মিস্টার মজুমদার বললেন, 'করছে বইকী। ওরা বলে বেড়াচ্ছে অনিল কলকাতায় আছে।'

মিসেস মজুমদার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'রাধেশ্যামের মন্দিরে রোজ সন্ধেবেলায় মহাদেবের বউটা রামায়ণ শুনতে আসে। আজ আমিও যাব। দেখি বউটা আসে কি না।'

—তুমি যেন আবার কিছু জিজ্ঞেস করে বোসো না। তা হলে সাত কৈফিয়তের মধ্যে পড়বে। আজকাল তো আর কেউ বড়োর সম্মান রেখে কথা বলে না।

মিসেস মজুমদার ঝংকার দিয়ে বললেন, 'সে আর আমায় শেখাতে হবে না। যার তার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভারী দায় পড়েছে। এক নজর দেখলেই বুঝতে পারব। তা ছাড়া আমি বাজি ধরতে পারি মহাদেবের বউ এখন কিছু দিন—অন্তত বছব খানেক, কোথাও বেরোতে পারবে না। কোন্ মুখে বেরবে?'

রাত্রিবেলায় শয়নমন্দিরে স্বামীস্ত্রীর দেখা হল।

ভবেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাদেবেব বউ গিয়েছিল?'

মিসেস মজুমদারের মুখ বেজায় গম্ভীর। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছিল। শুধু যাওয়াই নয়, একেবারে প্রথম সারিতে নামাবলি গায়ে দিয়ে ভক্তিগদ্‌গদ হয়ে বসেছিল। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।'

—তা হলে ব্যাপারটা কী? সবটাই রটনা? কিন্তু সে দিনের পর অনিলকে কি আর দেখেছ?

মিসেস মজুমদার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কে আর তা লক্ষ করেছে?'

বলে পাশ ফিরে শুলেন।

মিসেস মজুমদার পাশ ফিরে শুয়ে ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মিস্টার মজুমদার অত সহজে পাশ ফিরতে পারলেন না। হাজার হোক তিনি পুরুষ মানুষ। তাঁর দায়িত্ব অনেক—ভাবনাচিন্তা অনন্ত।

মিসেসকে বিরক্ত না করে অথচ শুনিয়ে শুনিয়ে যেন স্বগত বললেন, 'বাড়িটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি জড়িয়ে না যাই। আসামিরা ধরা পড়লে বা শেষ হয়ে গেলে ঝড়ঝাপটা তাদের উপর দিয়েই যেত। কিন্তু এখন পুলিশ দেখবে, কাউকে পাচ্ছি না তবে বেঁড়ে শেয়ালকেই ধর।

মিসেস মজুমদার সেই এক-কাতে শুয়ে শুয়েই বললেন, 'আহা, বাড়ি তো আর আমাদের নয়। অন্যের বাড়ি—আমাদের কাছে বাঁধা আছে। তা ছাড়া ও বাড়িতে কেউ থাকে না। তালা বন্ধ।'

মজুমদার বললেন, 'সে তো তুমি বুঝলে আর আমি বুঝলাম। কিন্তু পুলিশ? তারা বলবে ওই বাড়িতে যখন ঘটনা ঘটেছে—আর বাড়ির চাবি যখন আমাদের কাছে তখন নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে ওদের ষড়যন্ত্র আছে।'

মিসেস মজুমদার এবার সোজা হয়ে শুলেন। গলায় স্বরে যেন ভয় ভয় ভাব। বললেন, 'কিন্তু ছেলেগুলো তো পাঁচিল টপকে ঢুকেছে। বাইরের দরজায় যেমন তালা ছিল তেমনই রয়েছে।'

মজুমদার বললেন, 'সে কথা পুলিশ শুনবে না। ইচ্ছে করলে হাজার প্রসঙ্গ তুলে তালাটা একটা অছিলা বলে আমাদের জব্দ করতে পারে।'

মিসেস মজুমদার এবার আঁতকে উঠে বললেন, 'তা হলে উপায়?'

ভবেন্দু বললেন, একমাত্র উপায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন। জাঁকিয়ে ফাংশনটা করো। পুলিশ অফিসারদের নিজে গিয়ে হাতে হাতে কার্ড দিয়ে এসো। ওরা বুঝুক আমরা বোমা ফাটাফাটির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না, আর যেহেতু ও বাড়ি আমাদের নয়—ও বাড়িতে আমরা বাস করি না, সেইজন্যে কী ঘটছে তা নিয়ে আমরা ভাবি না। আমাদের ভাবনা সংস্কৃতির ভাবনা। কেমন করে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবটা সাকসেসফুল করা যায় এই আমাদের ধ্যানজ্ঞান। অর্থাৎ এক কথায় তোমাকে আমাকে নিখুঁত অভিনয় করতে হবে। স্টেজে নয়—ঘরে বাইরে রাস্তায় ঘাটে পুলিশ অফিসারদের সামনে। আমাদের মনের এক কোণে যে ভয় বাসা বেঁধেছে নিপুণ অভিনয়ে তা চাপা পড়ে যাবে। কারণ বুঝতেই পারছ ভয় থেকেই মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর দুর্বল হয়ে পড়লেই সবলে গলা টিপে ধরবে।

কিছুদিন ধরেই এই ছোট্ট শহরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অশান্তি চলছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে একটা বড়ো রকমের ঘটনা ঘটে গেল। রাত প্রায় দুটো—প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে শহর কেঁপে উঠল।

ভোরবেলায় দেখা গেল শহর থেকে মাইলখানেক দূরে একটা বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। দরজা জানলা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়।

বোঝা গেল ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এর ভেতরে বোমা বাঁধা হচ্ছিল। অসাবধানতায় এই দুর্ঘটনা।

কিন্তু আসামিরা? নিশ্চয় দু-একজনের কাজ নয়। তারা গেল কোথায়? অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গেছে? অসম্ভব। কেননা মেঝেতে দেওয়ালে চাপ চাপ রক্ত তখনও তাজা।

বোঝা গেল দলের আর সব, বা পাড়া-প্রতিবেশী রাতারাতি হতাহতদের সরিয়ে ফেলেছে।

তারপর থেকে শহরে কত না জল্পনা-কল্পনা।

কারা বোমা বাঁধছিল? তারা কি সব এখানকার ছেলে, না বাইরের? ক'জন ছিল? তাদের মধ্যে ক'জন হত ক'জন আহত? লাশগুলো কোথায় সরিয়ে ফেলা হল? আহতদের কোথায় রাখা হল? সরানোর কাজ এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করা সম্ভব হল কী করে? পুলিশ নাকি গোপনে তল্লাশ করছে। কিন্তু শহরের মধ্যে হতাহতদের কোনও চিহ্ন নেই।

যত জিজ্ঞাসা—যত সংশয়, ততই গুজব। যে যা পারছে বলে বেড়াচ্ছে। সব গুজবের সাধারণ তত্ত্বগুলি একত্র করলে দাঁড়ায়—চার পাঁচটি তরুণ ছেলে বোমা বাঁধছিল। এদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই

বাইরের। বোমা ফাটার শব্দে দলের লোকেরা এসে পড়ে। রাতারাতি তারাই আহতদের সবাইকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে দিয়েছে। এদের মধ্যে স্থানীয় যে ছেলেটি, সে হচ্ছে অনিল—মহাদেব পিওনের ছেলে।

গুজবের দুটি ভাগ। কেউ বলে অনিল বেঁচে আছে, তবে চোখ গেছে। কারও মতে অনিল আর নেই।

খবর খুব চাপা। ফিসফিস করে কথা। কারণ পুলিশ নাকি তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে।

দু দিন পরে আবার চাপা খবর—অনিল নাকি বেঁচেই ছিল, কিন্তু গত পরশু দিন মারা গেছে। এ একেবারে পাকা খবর। কেননা অনিলদের পাশের বাড়ির সবাই গতকাল অনিলের মাকে কাঁদতে শুনেছে।

একুশ বছরের একটি তরুণ প্রাণের এই অপচয়ে কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কিনা জানা কঠিন তবে ভবেন্দু মজুমদার যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কারণ, ছেলেটা পোস্টার লিখত খুব। আবার বুক ফুলিয়ে চলত। তা ছাড়া এই মৃত্যু সত্য হলে পুলিশের রোষ অনিলের বাপমায়ের উপরই গিয়ে পড়বে—বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু অনিলের মৃত্যুর খবরটাও স্রেফ গুজব হয়ে যেতে পারে। কিছুদিন পরেই হয়তো দেখা যাবে অনিল বুক ফুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার সেঁটে বেড়াচ্ছে।

অথচ এ ব্যাপারটা নিয়ে মহাদেব বা তার মায়ের কাছে তো কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। সে সাহস কারও নেই। তাই শহরসুদ্ধ লোক—এমনকি মহাদেবের অন্তরঙ্গরাও—দূর থেকে কেবল তাকে লক্ষই করছে। পুরুষরা করছে মহাদেবকে লক্ষ, মেয়েরা করছে মহাদেবের স্ত্রীকে লক্ষ। পুত্রশোক বলে কথা। তার কি কোনও চিহ্ন ফুটে উঠবে না মা-বাপের চোখেমুখে, চলায় ফেরায়?

রাত হল।

পিওনের খাকি পোশাক দূরে ফেলে দিয়ে মহাদেব বিছানায় এসে শুলো। পাশে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে মহাদেবের স্ত্রী। কে বলবে—কিছুক্ষণ আগেই নামাবলি জড়িয়ে ভক্তিভরে ঠাকুরবাড়িতে রামায়ণ শুনছিল! পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মহাদেবের ছোটো ছেলে শিবনাথ।

মহাদেব বিছানায় শোওয়া মাত্র মহাদেবের স্ত্রী ফুঁপিয়ে উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। মহাদেব কোনও কথা বলতে পারল না। বলবার কিছু নেই। এমনি তো রোজ।

তবু মহাদেবকে বলতে হল, 'ধৈর্য ধরো।'

—আর যে পারি না। ওগো আমায় একটু ডাক ছেড়ে কাঁদতে দাও।

বলেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মহাদেব তখনই স্ত্রী-মুখ চেপে ধরে কাতর স্বরে বলল : দোহাই তোমার চারদিকে লোক ঘুরছে। কে কোথায় শুনতে পাবে—সব্বোনাশ হয়ে যাবে।

শোকার্ত স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—আর কতকাল গো, আর কতকাল এমনি করে লোকের চোখ ভুলিয়ে চলব?

মহাদেব শান্ত গম্ভীর স্বরে শুধু একই কথা বললে, 'ধৈর্য ধরো। চাকরিটা বজায় রাখতে হবে। শিবুটার ভবিষ্যৎ—'

দূরে এমন সময়ে কীসের যেন কোলাহল শোনা গেল। বিছানায় উঠে বসে জানলা দিয়ে মহাদেব দেখল, দূরে মাঠে স্টেজ বেঁধে মজুমদার দম্পতির উদ্যোগে নাটক অভিনয় হচ্ছে। □

অনি

অসীম রায়

—তোমরাই বলতে না বাবা, বাংলাদেশের রেনেশাঁটা বোগাস?

এইরকমই একটা কথা বোধ হয় অনি আমাকে বলতে চায়। কিন্তু আমাদের সংলাপে বেশিরভাগ সময় কারও ঠোঁট নড়ে না। কারণ ঠোঁট নড়লেই সে যে আমার রক্তমাংস অস্থিমজ্জার অংশ সেই সচেতনতা যা মৌনে প্রকট তা হারিয়ে যায়। আর আমি এই দুর্লভ সংলাপকে কথা বলে নষ্ট হতে দিতে চাই না। অনির পাতলা গোঁফের পাশে একটা চাপা প্রায় সর্বক্ষণ সদাজাগ্রত হাসিটার দিকে চেয়ে আমি মৌনে বলি, 'কিন্তু বিদ্যেসাগরটা? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যাই বলো বাপু।'

দিন সাতেক আগে বিদ্যেসাগর প্রসঙ্গ অনির মা তুললে অনি বলেছিল, 'বিদ্যাসাগরের চুষিকাঠি দিয়ে কদ্দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখবে মা?' সেই জবাব আবার তার কচি গোঁফের ফাঁকে হাসির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। আমি এতক্ষণ পর একটু নড়েচড়ে বসি। গলা ঝাড়তে ঝাড়তে এই মৌন ইন্দ্রজাল ছিন্ন করার চেষ্টায় বলি, 'তোর সর্দিটা সেরেছে?'

অনি অপ্রস্তুতভাবে হাসে। তার কালো বিষণ্ণ চোখ দুটো আমার দিকে মেলে হঠাৎ বলে, 'তোমাদের উনিশশো আটচল্লিশটা—যখন তোমরা সশস্ত্র বিপ্লব করতে রাস্তায় নেমেছিলে—আর আজকের মধ্যে অনেক ফারাক। তখন তোমাদের পেছনে কেউ ছিল না, আর এখন সমস্ত পৃথিবীর মেহনতি মানুষ আমাদের পেছনে।'

আমি আতঙ্কে আমার ছেলের দিকে চেয়ে থাকি। এর উত্তরে আমি কী বলব তা আমার ঠোঁটস্থ আর তার প্রতিক্রিয়ায় আমার ঘরে আসা যে অনি বন্ধ করে দেবে তাও প্রায় অবধারিত। আমরা দুজন গত এক বছর ধরে এই অন্ধকারে কানামাছি খেলছি, কেউ কাউকে ছুঁতে পারছি না, কেউ কাউকে বোধ হয় ছোঁওয়ার চেষ্টাও করছি না। তার চেয়ে অনি যদি কথা না বলে আমার ঘরে একটুক্ষণ বসে থাকে তা হলে বোধ হয় আমার পিতৃত্বের বুভুক্ষা অনেকখানি মেটে। আমি সরব হতে গিয়েই জোর করে হাই তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মন গজরাতে থাকে, 'বয়স অনি, বয়স; রক্ত ফুটছে তোর শরীরে। এই রক্তফোটা সারা দেশের ছেলেগুলোকে আমি পুষব মণ্ডামিঠাই দিয়ে। তারপর যেই রক্তের তোলপাড় শান্ত হয়ে আসবে, ধর, তিরিশ পেরোলেই, তোদের ছেড়ে দেব। তখন তোদের মন বিচার করবে, বুদ্ধি পরখ করবে, কোনও জিনিস মানবার আগে দু বার ভাববি, ঝাঁপ দেওয়ার আগে তাকাবি, আর জীবনের এই মায়ার অক্টোপাসের শুঁড়ে আবদ্ধ হবি। এই কয়েকটা বছর, এই দশ-বারোটা বছর যদি দেশের ছেলেগুলো লাফ দিয়ে পার হয়ে বুড়ো হয়ে যেতে পারত! কারণ বাংলাদেশের তারুণ্য তো কখনই পরিণতি পাবে না, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে তার জয়ধ্বজা তো কখনও মিলাবে না সূর্যরাঙা দিগন্তে। তা সব সময়, অন্তত ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের শৌর্য সময় থেকেই, এক অসমাপ্ত মহত্ত্বের প্রতীক মাত্র। এই অসমাপ্ত মহত্ত্বের শৌর্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে অনি। আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। আমি আর দেখতে চাই নে।'

আমার কথাগুলো যেন অনি বুঝতে পারে। তার পাতলা গোঁফের ফাঁকে আবার তার সাম্প্রতিক ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। আর আমি তার মাকে বলা আমার সম্পর্কে কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই, 'আসলে বাবা তার নিজের অতীত থেকে বেরতে পারছে না। কারণ বাবা আর পলিটিক্যাল এলিমেন্ট নয়। বাবা ভাবছে তাদের সময় যেমন পুলিশের মার খেয়ে আন্দোলন গুটিয়ে গিয়েছিল এবারেও তাই হবে। একবারও

তাকিয়ে দেখছে না চারদিক। শুধু নিজে কী করেছিল এককালে কেবল তারই স্বপ্ন দেখছে। ও সব কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, ভুলে যাওয়াই ভালো। ও সব অতীত পুজো করে কিছু হয় না। আমরা যুদ্ধ শুরু করেছি, শেষ করব।'

অনির শেষ কথাটা হাতুড়ির মতো আমার মাথায় পড়ে। আমি পলিটিক্স থেকে সরে গেছি সত্যি কথা কিন্তু কোনও স্লোগান রক্ত সঞ্চার পেশি সংবদ্ধ করে নতুন প্রতিজ্ঞায় তা বোঝবার ক্ষমতা বোধ হয় এখনও হারাইনি। অনিদের স্লোগানে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে যা আপাতদৃষ্টিতে ভাবের কথা, মেলোড্রামার কথা কিন্তু তার প্রচণ্ড রোখ আমায় স্পর্শ করে। এই কথাগুলো যেন শুধু চিৎকার করে না, বস্তুত আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দেয়। যদি এরকম একটা ব্যাপার হত, আমি চারপাশের কেউ নই, আমি বাঙালি মধ্যবিত্ত নই, আমি জার্মানি কিংবা পাঞ্জাবি, তা হলে লোকে যেমন সিনেমায় দেখে তেমনি এই বাংলাদেশের নতুন কাহিনীকে দেখতাম দূর থেকে। উত্তর ভারতীয় ঔদাসীন্যে হাই তুলে বলতাম, মিলিটারি ডাকলে হয় না? কিন্তু আগুন এত কাছে যে, তার আঁচ গায়ে এসে লাগছে, ঘটনা এখন বিচারবিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে এমন এক আশ্চর্য স্বয়ংভরতা অর্জন করেছে, এমন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে রোজ প্রাতঃকালে উদিত হচ্ছে খবরের কাগজে যে, বিপ্লবের ইতিহাস ভূগোল যা যৌবনে পড়েছি এবং বহুকাল পর্যন্ত এই মধ্যবয়সী জীবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে থেকেছি তা সব ভুলতে বসেছি। আমি এখন নিজেই চমকে উঠি নিজের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায়। ছেলেটাকে যখন টেনে বুড়ো বানানো যাবে না, তখন বিলেত পাঠানো যায় না, অন্তত দিল্লি-মুম্বই কিংবা আহমেদাবাদ? এই সব অপরিণত মস্তিষ্কের চিন্তা অথবা চালশেধরা চিন্তা আমাকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসে আর সঙ্গে সঙ্গে পিতৃত্বের অক্ষমতায় চিড়বিড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অন্তত অন্যদিনের বিপ্লবটা যদি বছর পাঁচেক পরেও আসত আমার রিটায়ারমেন্টের সময় তা হলে বোসবাবুকে হাতেপায়ে ধরে কর্পোরেশনের লাইটিং ডিপার্টমেন্টের একটা পোস্টে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত ওকে। বাপের জায়গায় ছেলে এ ঐতিহ্য অনেক অফিসের মতো আমাদের অফিসেও আছে। কিন্তু পাঁচ বছরে আমাদের দেশের কী চেহারা হবে এই সব ত্রিকালজ্ঞ ভাবনার চেয়েও আমার একটা প্রশ্নই কাঁটার মতো বিঁধে থাকে বুকের মধ্যে, উঠতে বসতে খচখচ করে—ছেলেটাকে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারব তো?

অনি বোধ হয় উঠে পড়বে। আমাদের মানসিক সংলাপ বেশিক্ষণ চালানো যায় না। অন্তত আমার ভালো লাগলেও অনির বোধ হয় আপত্তি আছে। সেও অস্থিরতা বোধ করে। আমিও করি। আমি এবার মুখ খুলি, 'রূপনারায়ণপুর জায়গাটা বেশ; না অনি?'

—বড্ড একঘেয়ে, বড্ড নির্জন। কিছু করার নেই, ঘুমনো ছাড়া। তা ছাড়া আরও কিছু দিন থাকা সম্ভব ছিল না। দাদুর ওপর চাপ হচ্ছিল। তুমি বলেছিলে বটে থাকতে, কিন্তু আর বেশি দিন থাকলে বোধ হয় ওদের অসুবিধে হত।

বিলেতে নয়, বিহার বর্ডারে রূপনারায়ণপুরে পাঠিয়েছিলাম ছেলেকে। আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই সেখানকার স্টেশন মাস্টার। মাস দুয়েক আগে যখন সামনের বড়রাস্তায় পুলিশের গাড়িতে বোমা পড়তে একজন পুলিশ মরল, আর তার তিন ঘণ্টা পর আততায়ী কাছেপিঠে বসে বসে চিঁড়েভাজা খাচ্ছে, এই গভীর প্রত্যয়ে পুলিশ এসে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অনিকেও নিয়ে গেল এবং পুলিশ লক-আপে তাদের নিয়ে ফুটবল খেলার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ভাঙা অনি ফেরত এল দু দিন বাদে, তারপর থেকে ঘন ঘন পুলিশের লোকের যাতায়াত আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রীর স্নায়ুরোগের সূত্রপাত তখন থেকেই। মাঝরাতে হাওয়ায় দরজার পাল্লা নড়লেই ঘুমের মধ্যে নীহার চেঁচিয়ে ওঠে। আমি মরিয়া হয়ে চিঠি লিখি আমার স্টেশন মাস্টার জ্যাঠার কাছে। জ্যাঠা কোনও বাবাজীর ভক্ত, ভালোমানুষ। নির্জনতায় আঁকপাক করেন। চিঠি লেখার কয়েক দিনের মধ্যেই রাজি হয়ে গেলেন।

—আসলে আমি কাওয়ার্ড। আমাদের দরকার আজ মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া, সুগতর মতো। আমি তা পারছি

না। সেইটাই তো আসল সমস্যা। আর তোমার কথা শুনলে হাসি পায় বাবা। মানুষ কি কুকুর বেড়াল যে, তাকে দুবেলা খেতে দিলে আর আদর করে গায়ে হাত বুলোলেই তার সমস্যা মিটে যাবে?

আমরা এতক্ষণ যে বন্ধুত্বের মৌন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলাম অনি তা দু হাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল। আমরা যে দুজন বাপ-ছেলে দুই সমান্তরাল রেখা ধরে দৌড়োচ্ছি, কথা বললেই তা একেবারে স্পষ্ট। চুপ করে থাকলে এতদিন একসঙ্গে এতগুলো সকাল-সন্ধে-রাত্রির সান্নিধ্যের স্মৃতি যেন আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ ছাপিয়ে এক গভীর অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরি করে, সমস্ত বৈরী বোধ ভোঁতা হয়ে যায়। এমনকি মৌনে বোধ হয় সম্ভাবনাও লুকানো আছে, একসঙ্গে বেঁচেবর্তে থাকার সম্ভাবনা চুপ করে থাকার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দুজনের রক্তেই সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই। অনির আঘাত আমাকে মুখর করে তোলে।

—অনি, তোরা কি একটা মেড-ইন-বেঙ্গল বিপ্লব সৃষ্টি করতে যাচ্ছিস?

অজান্তে কথাগুলি আমার ঠোঁট ছিটকে বেরিয়ে যায়। কথাটার গুরুত্ব হালকা করার জন্যে আমি টেবিলে রাখা পেনিসলটা দু বার নাচিয়ে দিই।

মানে? অনির সেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর মধ্যে আমি আবার বাংলাদেশের সেই তরুণ সমাজকে দেখি যারা এখন অসি ধারণ করেছে। কিন্তু এই হুঁশিয়ার আমাকে শান্ত করে না। প্রবল অস্থিরতায় আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'মেড-ইন-বেঙ্গল ছাড়া কী বল? কোন্ দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে আছে যে, ব্যক্তিগত খুনের মাধ্যমে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়? তুই একটা দেশ দেখা—রাশিয়া, চিন, কিউবা, ভিয়েতনাম?'

—তুমি যা শিখেছ বাবা সেগুলো ভুলে যাও। নতুন বিপ্লব ঘটছে চারপাশে, সেখানে তৈরি হচ্ছে বিচারের নতুন মানদণ্ড। এ সম্পর্কে তো তোমাকে পড়তে দিয়েছিলাম? ভালো করে পড়েছিলে?

অনির স্থির শান্ত কণ্ঠ আমাকে আরও অস্থির করে তোলে। বস্তুত তা যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যঙ্গ করে, আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ এক মুহূর্তে নস্যি বানিয়ে দেয়।

পড়েছি, পড়েছি। কিন্তু ওগুলো তো সব আপ্তবাক্য। সব ধরে নেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ জেগে উঠেছে, গ্রামে গ্রামে খেত-খামারে চাষির মনে শ্রেণীঘৃণা উদ্দীপ্ত। আসলে কী জানিস, তোরা তোদের নিজের মনের মাধুরী দিয়ে তোদের ভুবন সৃষ্টি করছিস। কিন্তু বিপ্লব বস্তুভিত্তিক, বাস্তব অবস্থার ওপর বিপ্লব দাঁড়ায়।'

বলবার শেষে আমার মনে হল আমি একটা দারুণ বলে ফেলেছি। নিজের বিশ্লেষণী শক্তিকে মনে মনে তারিফ করে আমি অনির দিকে তাকাই। কিন্তু অনি যে এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে কথাগুলো বার করে দিয়েছে। এ কথাগুলো তার কাছে যেন এমন যা নতুন করে ভাবায় না, যা আর পাঁচটা কথার মতো শোনা কথা।

—আসলে তুমি মন দিয়ে পড়নি যে-লেখাগুলো দিয়েছিলাম তোমাকে পড়তে।

এবার আমি আমাদের সন্ধের মৌনব্রত একেবারে ভুলে যাই। অনির প্রতি যেন আমার কোনও দায় নেই, সে শুধু প্রতিপক্ষ মাত্র। চারপাশে যাই ঘটুক, যে তাণ্ডবই চলুক না, আমাদেব একসঙ্গে গত বিশটা বছরের ইতিহাস তা কি লুপ্ত করে দিতে পারে? এই আত্মবিশ্বাস ঝুলে পড়ে এক নিমেষে।

—আমি তো বলেছি তোদের একটা প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিক, বিপ্লবের নাম করে সবাই যখন নিজের কেরিয়ার করছে তখন তোদের অপরিসীম আত্মত্যাগ...

একটা হাত শূন্যে তুলে অনি প্রতিবাদের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে, "এইসব বস্তাপচা কথা, এইসব স্তোকবাক্য আর বোলো না। সবাই বলে তাই তোমাকেও বলতে হবে? বিপ্লবটা কি খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ককটেল পার্টি? বিপ্লবের মৃত্যু, ত্যাগ অবধারিত। মানুষ আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। সে সুগতর মতো মৃত্যুকে জয় করেছে বলেই বিপ্লব অবধারিত।'

এগুলো অবশ্য সে ঠোঁট খুলে বলে না। কিন্তু আমি ঠিক শুনতে পাই। এইসব কথা তার মার সঙ্গে

হয়। আমার সঙ্গে ঠোঁট খুলে কথা বেশিদূর এগোয় না। সামান্য এগোতে না এগোতেই ছেদ পড়ে। এ ব্যাপারে অনি একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। আমার বিচার-বিশ্লেষণী মন যখন নড়েচড়ে ওঠে, তখনই সে চুপ মেরে যায়। আর তখন তার মৌন মুখ থেকে তার উত্তরগুলো আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাই।

তার হাত-তোলা তীক্ষ্ণ সুকুমার শ্যামলা মুখখানার দিকে চেয়ে আমি অবসন্ন বোধ করি। চেঁচিয়ে উঠি, 'অনি, অনি আর একটু সবুর কর। এইরকম আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের ভস্ম করে দিস নে। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয় বছরের পর বছর।'

একটা চাপা হাসি খেলে যায় অনির ঠোঁটের দু পাশে, 'তোমরা যেমন গত বাইশটা বছর জ্বালিয়ে রেখেছ।' স্পষ্ট আমি শুনতে পাই অনির উত্তর। আমিও ছাড়বার পাত্র নই, বলি, "আসলে আমাদের দুর্বলতা বা আমাদের অক্ষমতার সাফাই গাইছি না। সত্যিই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে, তখনই একটা এসপার ওসপার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ভারতের ইতিহাস তখনই একটা মোড় ফেরার সময় ছিল। তা হলে আজ সারা দেশ জুড়ে, অন্তত আমাদের বাংলাদেশে, তরুণদের এমন মরিয়া হয়ে মাথা কুটতে হত না।...আমার সে দিনটা বেশ মনে পড়ে। আমরা রাস্তায় নেমে মিছিল করে জেলের তালা ভাঙতে চলেছি, আর সানগ্লাস পরে মেয়েরা ক্রিকেট খেলা দেখতে ইডেন গার্ডেন ময়দানে ভিড় জমিয়েছে, আর আমরা পড়ে পড়ে মার খেয়েছি।"

প্রশান্ত হাসিতে সারা মুখ ভরে যায় অনির। তার আত্মবিশ্বাসের সেই হাসি আমার গালে যেন জুতো বসিয়ে দেয়। 'আর এখন? এখন কী হচ্ছে দেখছ না? সারা কলকাতা এখন মুক্তাঞ্চল হতে চলেছে। মধ্যবিত্ত ন্যাকামির কোনও স্থান নেই। রাস্তায় বেরতেই বারুদের গন্ধ নাকে আসে না? এই পথেই বিপ্লবের দিন এগিয়ে আসছে।'

আমি আড়ষ্টতায় থমথম করি। পঁচিশ বছর আগে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে, সেই দিনগুলো আবার মনের মধ্যে ফিরে আসে। বিপ্লবের পদধ্বনি তখন দিনরাত আমাদের রক্তে বেজে চলেছে। তারপর দু-তিন বছরের মধ্যেই সে জোয়ার চলে যেতে আত্মবঞ্চনার পাঁজরা হাড়গুলো পাঁক ঠেলে উঠে এল। আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী দৌড়ল অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের বস হতে। আর আমি হাত কচলাতে কচলাতে দাঁড়ালাম আমার এক বহু দূর সম্পর্কের মামা, কলকাতা কর্পোরেশনের এক ডেপুটি মেয়রেব সামনে। তারপর যে-কোনও ঘটনারই মার্ক্সবাদ দিয়ে সমর্থন খোঁজা হতে লাগল। এক সার্বিক আত্মবঞ্চনার ইতিহাসের পাতা আমাদের যৌবনের সামনে খুলে গেল। তার চেয়ে অনিদের ব্যাপারটা কি আরও স্পষ্ট নয়? আরও তাৎপর্যপূর্ণ নয়? এ কি সত্যিই পুনরাবৃত্তি, না পুনর্জন্ম?

আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনি আমার বইয়ের শেলফের দিকে সরে যায়। মার্ক্স, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও জে দং-এর বইগুলোয় ধুলো পড়েছে। সে অন্যমনস্কভাবে একটা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে তাকের ধুলোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে থমকে তাকায়। আমি একবার আড়চোখে তাকাই কোন্ বিশেষ বই দেখছে। লেনিন, না মাও জে দং?

—তোমার কি মনে হয় না বাবা, তোমার এই বর্তমান হাত-কচলানো অস্তিত্বের সঙ্গে, সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্য দরকার হলে দুর্নীতি করে এবং তাকে গালভরা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে বেঁচে থাকার সঙ্গে এই সব বইয়ের কোনও যোগ নেই? এই সব বই এরকম জাদুঘরে মানায় না; এইরকম মৃত বারবার একই বৃত্তের মধ্যে যান্ত্রিক সংক্রমণের সঙ্গে বিপ্লবের সফেন জোয়ারের কোনও যোগ নেই। তোমার পঞ্চাশটা বছরে বিপ্লবের জন্য তুমি যা না করেছ, তার চেয়ে সুগত তার একুশ বছরের জীবনে অনেক বেশি করেছে তার আত্মদানে। সে তার আত্মদানের মারফত বিপ্লবের দাবানল সৃষ্টি কবতে সাহায্য করেছে। তুমি কী করেছ তোমার বিশ্লেষণী শক্তি নিয়ে, তোমার ধুলোয় ভরা মার্ক্সবাদী বই নিয়ে?

অনি এবার জানলার বাইরে পশ্চিমের আলোর দিকে চেয়ে আছে। বোধ হয় বয়স বাড়ার জন্যেই হোক আমি আজকাল এই পশ্চিমের আলো দেখতে ভালোবাসি। আর সে দিকে চেয়ে আমার চোখ আটকে যায়। কলকাতার পড়ন্ত শরতের শেষ বেগনি বাহার এ-অঞ্চলের আকাশে। বেগনির পাশেই জাফরানি রং ধরেছে।

সে দিকে চেয়ে চেয়ে আমি আবার নিজের অতীতের দিকে চাই। অনির নিঃশব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথাগুলো আমাকে ওলটপালট করে দেয় ওদের স্লোগানের মতো। সত্যিই কি আমি জাদুঘরে বাস করছি, আমার মার্ক্সবাদী জাদুঘরে? কারণ সত্যিই তো রাজনীতি মানেই সেই নীতি, যা মানুষকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায়। বিপ্লবের জোয়ার চলে যাওয়ার পর পাঁকে-কাদায় আমরা কি লক্ষ্য হারিয়ে ফেলিনি সেই কাদায় বাড়ি ঘরদোর বাঁধার চেষ্টা করে? সেই ক্ষয়কে জয় করবার জন্যে মর্মান্তিক পেটি বুর্জোয়া চেষ্টায়? তা ছাড়া আমরা কী করতাম? সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশ্লেষণী শক্তি মাথাচাড়া দেয়। এক সার্বিক আত্মহত্যার পথ উন্মুক্ত করতাম সারা দেশ জুড়ে এবং সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শহিদ হতাম!

আমি পেনসিলটা হাতে তুলে আবার নাচাতে থাকি নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে। অনি হেসে ফেলে আমার দিকে চায়। এ হাসিতে ব্যঙ্গ নেই, মজা-পাওয়া তরুণের চমৎকার উজ্জ্বল হাসি। আমিও সে হাসিতে যোগ দিই। আমার মনে হয় আমার শরীরের রক্তসঞ্চালন যেন এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বছর দুই আগে সবে কলেজে ঢোকা অনির রাফ খাতার পেছনে একটা লাইন দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম—'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।' 'এটা কার কবিতা রে?' অনি অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'জীবনানন্দ দাশ। নাম শোনোনি?' আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করতে সে মাথা নিচু করে বললে, "রূপসী বাংলা" বইটার নাম। চমৎকার কবিতা। আমি তখন ভাবছিলাম ওই লাইনেই তলে তলে হয়তো অনি এগোচ্ছে। আমি কবিতা-টবিতা বুঝি না, তবু ওই পংক্তি বিপজ্জনক নয় ভেবে আশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু গত দু বছরে রূপসি বাংলার রূপ যেমন পালটাতে লাগল, অনির রূপও পালটে গেল। অনির সেই চেঁচিয়ে খোলা হাসি বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার একচিলতে জমিতে খোলা ড্রেন, ভাঙা ঘুঁটে লাগানো পাঁচিল ও আবর্জনার গাদার পাশে ক্রিকেট খেলার অসহ্য ছোটো মাঠে তার ক্রিকেট পেটনোও উঠে গেল। তার মুখ ক্রমশ থমথমে গম্ভীর। আর মাঝে মাঝে আয়ত চোখে চুপ করে চেয়ে থাকা। এই চলল। তারপর হঠাৎ থানায় ডাক পড়ল। তখন থানার ও-সি ছিল আমার সহপাঠী। জানতাম না। বিশেষ করে নিজের রাজনীতির সঙ্গে এককালে সংশ্লিষ্ট থাকায় ও পাড়ায় হাঁটতাম না। আমি চিনতেও পারিনি। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ চেহারা বানিয়ে ফেলেছে যে, চেনবার কোনও উপায় ছিল না। চায়ের সঙ্গে এটা সেটা আলাপের পর হঠাৎ বললে, 'ছেলের দিকে একটু নজর-টজর দিস। বাজে দলে মিশছে।' আমি আর ঘাঁটাইনি। চায়ের শেষ চুমুকের স্বাদ বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে আসি। আসবার মুখে আমাকে বোধ হয় সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই সহপাঠীটি বললে, 'অবশ্য অনেক সোস্যিও-ইকনমিক ফাক্টর আছে, আই অ্যাডমিট। তোরাও তো পলিটিক্স করেছিস। এখন বুঝতে পারছিস তো, ভায়োলেন্স দিয়ে কিছু হয় না।' মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু বলিনি। ভায়োলেন্স ভালো কি মন্দ তা নিয়ে সারা দেশের নেতারা রোজ কাগজ ভর্তি করেছেন। আমি কর্পোরেশনের লাইটিং ইন্সপেক্টর, আমি কী বলব? এইরকম আত্মবিশ্লেষণে সান্ত্বনা খুঁজি।

কিন্তু গত গ্রীষ্মেও যে অবস্থা ছিল এখন তা স্বপ্ন এই শরৎ-শেষে। পাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ এবং সে জন্যে অনির হাজতে মার খাওয়া তাকে তার পন্থা আঁকড়ে ধরতে আরও উদগ্র করে তুললে। তারপর থেকে সে বাড়ির পাট মিটিয়ে দিল। হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব হত আর মার সঙ্গে দেখা করেই হত অন্তর্ধান। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ ছিল, যা আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। তার মা তাকে বকতেন, গাল দিতেন, আবার বুকে জাপটে আদর করতেন। এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড রক্তমাংসের টান ছিল। অনির মা কখনও তাকে ভয় করতেন না, বরং উলটে ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। মেয়েদের এই প্রত্যক্ষ শারীরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান খুঁজবার চেষ্টা আমি পাশের ঘরে বসে বসে বুঝবার চেষ্টা করতাম আমার ব্যর্থ মনোরথে।

তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, আমার বাড়ির ওপর আমারই রাজনৈতিক দলের আক্রমণ। যে দলের পতাকার তলায় আমার যৌবনকে দাঁড় করিয়ে একদা রাজপথে নেমেছিলাম, এমনকি এখনও পুরাতন বন্ধুত্বের সূত্রে যে দলের সঙ্গে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত, সেই দলের ছেলেরা গত মঙ্গলবার সন্ধেবেলা এল অনির খোঁজে। তাদের হাতে লাঠি, লোহার রড, দা, ছোরা, পাইপগান। বোমা ছুড়তে-ছুড়তে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে এল সেই

তরুণ দল, যাদের দাদা-মামার সঙ্গে একদা আমি রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছি। আমি হতভম্বের মতো চেয়েছিলাম সেই আততায়ীদের মুখমণ্ডলের দিকে, কিন্তু দেখলাম তাদের একজনকেও আমি চিনি না, তারাও আমাকে চেনে না।

আমি এই অদ্ভুত মেলোড্রামার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলাম না। বাইরের চেঁচামেচি হট্টগোলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধন্দ হয়ে গিয়েছিলাম। আর আমার কানের চারপাশ দিয়ে খিস্তির বুলেট ছুটতে লাগল। একজন তরুণ এগিয়ে এসে বলল, 'বেশ তো ভুঁড়ি বাগিয়েছ ঘুষ খেয়ে খেয়ে।' আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'দে না ফাঁসিয়ে।' তারপর প্রবল লাথির ধাক্কায় দরজার একটা পাল্লা ভেঙে ঝুলতে লাগল। তখন হঠাৎ আমার খেয়াল হয়, অনি এসেছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে কাণ্ডীয় নর্তকের উল্লম্ফনে আমি ভাঙা দরজা জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি উদ্যত তরোয়ালের সামনে। মনে হল আমি যেন ধড়হীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। কারণ সামনে সেই হিংস্র কোলাহল আর সার সার আততায়ীর পলকহীন চক্ষু আমার দৃষ্টি ও শ্রবণের বাইরে। হঠাৎ আগের জন্মে দেখা একটা মানুষের মুখ যেন উঠে এল সেই হিংস্র যুবমণ্ডলীর মুখের উপর। একটা মোটা ভারী আদেশের গলা বেজে উঠল, 'এখানে না, এখানে না। যা করবে বাড়ির বাইরে, এ বাড়িতে না।' তারপর আমার কিছু মনে নেই। বোধ হয় চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। জ্ঞান হলে দেখলাম স্ত্রী আমার মুখেচোখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। অনি বাড়ি নেই।

হঠাৎ আমি আমার আত্মচিন্তার জগৎ থেকে ধড়মড় করে উঠি অনির কাশির আওয়াজে। অনি বোধ হয় উঠছে। আর বেশিক্ষণ বসে থাকা তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

—অবশ্য আমাদের মধ্যেও যে প্রশ্ন নেই তা নয়। আমি কান খাড়া করে বসি। অনেক দিনের অভুক্ত লোক যেমন হ্যাংলার মতো বাড়া ভাতের দিকে চেয়ে থাকে আমি সেইভাবে চেয়ে থাকি আমার ছেলের দিকে। অনি বোধ হয় নিচু গলায় স্বগতোক্তি করে, 'এই যেমন সবাই বলে, তুমি বলো, বেশিরভাগ দেশের গরিব মানুষকে নিয়েই বিপ্লব! কিন্তু কী করা যাবে বলো? তাদের তো জাগাতে হবে, পথ দেখাতে হবে। তোমরা যে পথে গিয়েছিলে, সে পথে তো দেখলে, সে পথে খালি মিনিস্টার হওয়া যায়, বিপ্লব আসে না।'

আমি কিছু বলি না। আমাদের মৌন সংলাপের সন্ধ্যায় এইরকম স্পষ্ট সহজ মুখর মুহূর্ত খুব কম। যখন আমাদের ঠোঁট নড়ে ওঠে তখন কেবল আমি জ্ঞান দিই উত্তেজিতভাবে নিজের অতীত-বর্তমানের সমর্থনে আর অনির কাছ থেকে আসে এক একটা বক্রোক্তি। আমি হ্যাংলার মতো অনির তীক্ষ্ণ সুকুমার মুখখানার দিকে চেয়ে থাকি যেন তাকে আমি এই শেষবারের মতো দেখছি। 'এখন এতদূর এগিয়ে যদি কমজোর হয়ে পড়ি, আমার সহকর্মীরা আমাকে ক্ষমা করবে না।' আস্তে আস্তে সে বলে।

—আমি তোকে দিল্লি পাঠিয়ে দেব। পাগলের মতো হঠাৎ চিৎকার করে উঠি।

গভীর সহানুভূতিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে অনি কিছুক্ষণ। তার সেই ধীর চাহনির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় আমিই বোধ হয় অনির ছেলে। পিতৃত্বের স্বাভাবিক পরাজয় আমি সেই মুহূর্তে স্বীকার করি।

অনি বললে, 'তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না বাবা। রাস্তায় দেখলে পুলিশ গুলি করে মারবে, বাড়িতে এলে অন্য পার্টির লোক চড়াও হয়ে মারবে। আর যদি চাকরি-বাকরি করব ভাবি, তা হলে আমার বন্ধুরা ছেড়ে দেবে না। আমার জন্যে চেষ্টা কোরো না বাবা।' অনি উঠে পড়ে। আমি চোখ বুজি। চোখ খুলে দেখি অনি চলে গেছে।

তারপর ক দিন আমি আর কাগজ দেখি না, রেডিও খুলি না। রাজনৈতিক আলাপ যেখানেই হয় সেখান থেকে পালিয়ে আসি। এ রকম অবস্থায় লোকে সচরাচর যা করে যথা মদ্যপান সে চেষ্টাতেও ত্রুটি ছিল না; কিন্তু আমার জ্ঞান এত টনটনে যে, মাল খেয়ে দুঃখ ভুলে থাকার ন্যাকামিতে আমার গা ঘিনঘিন করে। অভিভাবক হওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক জ্ঞান শুনি, আমার আত্মীয়স্বজনের কেউ কেউ আমার রাজনৈতিক অতীত ধিক্কার দিয়ে যান। এগুলো আমাকে স্পর্শ করে না। কারণ যে ভবিষ্যৎ অনির্বচনীয় নিয়তির মতো

তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য তো আমার নেই। আমার এক হিতাকাঙ্ক্ষী আমার ছেলের মঙ্গলার্থে ছেলেকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন যাতে তার প্রাণ বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু আমি সে পলায়ন চাই না। সেই পলায়নে সাময়িক সমাধান থাকতে পারে কিন্তু অনি তাতে রক্ষা পাবে না তা আমি নিশ্চিত। বরং আমার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া এই অসি হাতে বাঙালি তরুণ তো আমাদেরই উত্তরাধিকার। যারা আজ নেই সেই অসংখ্য তরুণের বিজয়কেতন তো আজ অনিদের হাতে। আজ যদি অনিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আমার কিছু বলার নেই। অন্তত এটুকু বুঝেছি আমার জ্ঞান দেওয়া সাজে না। জ্ঞান দিতে গেলে রণক্ষেত্রে নামতে হবে, যুদ্ধে যেতে হবে। অনিরা যে সব প্রশ্ন তুলেছে তাকে আপ্তবাক্য দিয়ে ধামাচাপা না দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। সে ক্ষমতা আমার নেই, কারও আছে কি না জানি না। তাই চোখ থেকেও আমি অন্ধ, কান থেকেও আমি বধির।

সে দিন ভোরেই ফোনটা পেলাম। মর্গ থেকে অনির দেহ খালাস করার অনুমতি পুলিশ দিয়েছে। আমি ফোনের জন্য তৈরি ছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে গলা কাঁপেনি যখন ফোন তুলেই প্রশ্ন করেছিলাম, 'পুলিশকে বোমা মেরেছিল অনি?' আর উত্তর না শুনেই দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম, 'পুলিশের গুলিতে মরেছে?'

আমার কোনও সাড় ছিল না। কারণ এ তো অনির মৃত্যু না, এ আমারও মৃত্যু, আমার সমাজবাদ স্বপ্ন দেখার মৃত্যু, আমার লেনিন, স্তালিন, মাও জে দংয়ের মৃত্যু। খালি একটা ব্যাপারে আমি চমকে উঠেছিলাম যখন হাঁক উঠল, 'চোর অনি, চোর অনি—কেউ এসেছেন?' আমি ধড়মড় করে উঠে পড়ি। বরাবর আমার ধারণা ছিল অনির্বাণ মুখার্জির নাম চেষ্টা করলেও অবিকৃত থাকে, তার ওরফে নাম গুলে কিংবা হরে বানানো মুশকিল। কিন্তু নাম পালটানোর এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার তারিফ না করে পারি না। আমার সঙ্গীটি অস্ত্রবিশেষজ্ঞ। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে অনির ক্ষতস্থান দেখে ফিরে এসে বললেন, 'খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে।' কিন্তু নিজের মৃতদেহের সামনে এলে মানুষের কি কোনও বক্তব্য থাকে? আমি ঘাড় ফিরিয়ে খোলা জানলার বাইরে চেয়ে থাকি। 'ঘুঁটে লাগানো একটা বেঁটে নিমগাছ প্রথম শীতের রোদ পোহায়। নীচে একফালি হলদে জমিতে দুটো শালিক ঝগড়া করে। অনির রাফ খাতায় অনেকদিন আগে দেখা সেই কবিতার লাইনটা আমার মনে আসে, 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।' □

আসামি এবং তার বিচার

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

বাড়ির বড়ো ছেলে, বাপ নেই, মারা গেছেন অনেককাল। মা হাসপাতালে চাকরি করে সংসারের হাল ধরে আছেন। রঞ্জু অর্থাৎ রঞ্জন জানে তার উপর মায়ের অনেক ভরসা। মা কিন্তু কখনও তাকে সংসার সম্পর্কে চিন্তা করতে দেন না। বাড়িতে পৌঁছলে রোজ বলেন, 'রঞ্জু, শহরের অবস্থা ভাল না, একটু দেখেশুনে চলবি।'

গাড়িটা চলতে চলতে কেবলই থামছে আর বার বার রাস্তা বদল করছে। এই যে একশোবার থামা আর চলা, এর দরুন বিকট ঘ্যাক্ ঘ্যাক্ আওয়াজটা তাকে ভীষণ বিরক্ত করে তুলছিল। কী আওয়াজ রে বাবা! লাঠি হাতে পুলিশগুলোর গায়ে গা ঘেঁষে বসে থাকতে তার আরও বেশি অস্বস্তি লাগছিল।

আজ সকালের কথা। কুয়াশা ঢাকা ভোরে উঠে সে ক্লাবে ব্যায়াম করতে গিয়েছিল। শরীর গঠনের দিকে তার বরাবরই খুব নজর। সুঠাম শরীরের জন্যে ক্লাবেও বেশ নাম আছে। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা এবং বুকের পেশিগুলো যখন শক্ত হয়ে ওঠে, আনন্দে খুশিতে গর্বে মনটা ভরে ওঠে তার। আজ সকালেও তাই অনেকক্ষণ ব্যায়াম করেছে। ভার তুলতে গিয়ে সাধারণত যে পরিমাণ ওজন নেয় আজ তার উপরে আরও কিছু বেশি চাপিয়েছিল।

—এই শালা, শুয়ারকা বাচ্চা!

চমকে ওঠে রঞ্জু। সেই অফিসারটি চিৎকার করছে। গাড়ি থেমে পড়ল। আবার নেমে কাউকে ধরে আনবে নাকি? কিন্তু না, ড্রাইভার আবার গিয়ার টানল। হুঁহুঁ শব্দে ছুটল গাড়ি।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে পুলিশ ছাত্র-অধ্যাপক নির্বিশেষে লাঠিপেটা করেছে। টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করেছে শতাধিক ছেলেকে। নিজে সে পালিয়ে কোনওরকমে আত্মরক্ষা করেছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরেও শুনেছিল একই ব্যাপার। যেখানে যাকে পেয়েছে ধরে নিয়ে গেছে, তার সমবয়সী বন্ধু কতজনকে যে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মার-টার খাসনি তো রে রঞ্জু? তোর জন্যে আমার ভাবনা হয়েছিল।'

—কেন মা, আমি তো সাবধানেই চলাফেরা করি।

কথা শেষ না হতেই মা বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'দেশে বিচার নেই, সে কথাই তো তোকে আমি বলতে চাইছি। আমাদের দুটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে।'

দুটি মেয়ে মানে হাসপাতালের নার্স। অনশন ধর্মঘট করেছিল। অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর কোনও প্রতিকার না পেয়ে তারা অনশন করেছিল। ওদের জন্যে মার মনের ব্যথাটা তার মধ্যেও সংক্রমিত হল। যদি প্রতিকার করবার ক্ষমতা থাকত সে করত।

মজার ব্যাপার হল, মা নিজে চিরকাল সভা-সমিতি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কতবার জেল-ফাটকও ঘোরা হয়ে গেছে। অথচ তাঁর ছেলেকে তিনি সাবধানে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। বাবা ইংরেজ আমলে দীর্ঘজীবন কারাবাসে কাটিয়ে অনেক বয়সে সংসার জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। সেই ঘরের ছেলে হয়েও সে মার এই উৎকণ্ঠা আর সাবধানতাকে কিশোর বয়েস থেকে দেখে আসছে। যখনই দেশে কোনও অশান্তি দেখা দেয় তার সম্পর্কে মা বিশেষ করে সচেতন হয়ে পড়েন।

গাড়িটা ঘ্যাঁক করে আবার ব্রেক কষল। একটু থেমে আবার রাস্তা বদল করে বাঁ দিকে ছুটল। সার দিয়ে বসে থাকা পুলিশগুলো তার গায়ে ধাক্কা মারতে সে টাল সামলাতে না পেরে কাত হয়ে পড়ল।

সমস্ত শহর জুড়ে বিক্ষোভ আর উত্তেজনা। পুরো সরকারি যন্ত্রটা লেগেছে বিক্ষোভ দমনের কাজে। লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস, গ্রেফতার, বাড়িতে বাড়িতে সশস্ত্র পুলিশের হামলা, আসলে সারা দেশটা জুড়ে চলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব।

পুলিশ ভ্যানটাতে তাকে যখন টেনে তোলা হল তার আগে পর্যন্ত সে ভাবতেই পারেনি ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াবে। কী করে কীভাবে যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। জালে-ঢাকা গাড়ির দরজাটা তার পেছনে যখন বন্ধ হয়ে গেল তখনই কেবল সে বুঝতে পারল যে সে এবার বন্দি। অফিসারটি তাকে দুটি সিপাইয়ের সাহায্যে টানতে টানতে এনে গাড়িবন্দি করল তারপর ড্রাইভারের পাশে গিয়ে আসন নিতে নিতে ঘাড় ফিরিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। সে দেখে অবাক হল যে ওর দাঁতগুলো কেমন বড়ো বড়ো আর বীভৎস রকমের জান্তব। মনে হল সারা মুখটায় ওর যেন দাঁত ছাড়া আর কিছু নেই। নিজের আসনে বসতে বসতে অফিসারটি ওকে শাসিয়ে বললে, 'আগে থানায় চলো চাঁদু, তারপর তোমার রস বের করব।

ওর এক নম্বর অপরাধ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের মুখে দাঁড়িয়েছিল। দু নম্বর অপরাধ ওর হাতে একখানা খাতা ছিল অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছিল ও একজন ছাত্র। তিন নম্বর অপরাধ পুলিশ ভ্যানটা যখন যাচ্ছিল ও চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেছিল, ওহে এ পর্যন্ত কতজন ছেলেকে ধরলে?

এখন যদি ও জিজ্ঞেস করে, কী অপরাধে ওকে ধরা হল, ওরা কী বলবে? তুমি ও কথা বললে কেন, এই তো? কিন্তু ও কথা বলতে কি কোনও আইন লঙ্ঘিত হয়েছে? আইনে কি ওরকম কথা বলা নিষেধ আছে?

থানার কম্পাউন্ডের মধ্যে গাড়িটা এসে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে অফিসারটি নির্দেশ দিলে, 'ওই শালাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।'

তাজ্জব ব্যাপার বটে! লোকটায় বয়েস পঁয়তাল্লিশের নীচে হবে না, আর তার বয়েস এখনও কুড়ি পেরয়নি। একেবারে শালা বলে সম্বোধন আরম্ভ করল!

ঘরের মধ্যে তাকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখে টেবিলে কাজ করে চলল লোকটা। কিছুক্ষণ মুখ গুঁজে কী সব লিখে হঠাৎ উঠে এসে ব্যাটন দিয়ে তার পেটে একটা জোর গুঁতো মারল, 'বাঞ্চোত এবার বল কী বলছিলি!'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গুঁতোর আঘাতটা সামলে নিয়ে ও বললে, 'আমাকে কী জন্যে ধরলেন তাই আগে বলুন।'

ফোন বেজে উঠল কিরিং কিরিং...

ফোন ধরতে ফিরে গেল লোকটা, অনেকক্ষণ ধরে কী সব কথাবার্তা বলল, তারপর ফিরে এসে আবার ওর সামনে দাঁড়াল। —মোহিনী দত্ত রোডে পুলিশ ভ্যানে ঢিল পড়েছে কেন? বল্, বল্ শালা!

ধাঁই করে ব্যাটনটা ওর মাথায় এমনভাবে পড়ল যে সঙ্গে সঙ্গে ওর জ্ঞান লোপ পেল। কাত হয়ে বেঞ্চের উপর পড়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরতে আবার উঠে বসল এবং ততক্ষণে দরদর করে ওর মাথা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়তে শুরু করেছে। নিজের মধ্যে থেকে একটা স্বাভাবিক প্রেরণায় সে রুখে দাঁড়াতে গিয়েছিল কিন্তু কে যেন পেছন থেকে হাত দুটো জাপটে ধরে ফেলল। যেই ধরে থাক তার শক্তিতে কিন্তু কুলোল না। হাত দুটো সে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ দু-তিনজন সিপাই তাকে একসঙ্গে জাপটে ধরে ফেলেছে। অনেক ধস্তাধস্তি করে শেষে তারা তার হাত দুটো মুড়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে দিল এবং দুজন দু দিকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অফিসারটি আবার টেবিলে গিয়ে কাজে মন দিল।

রক্ত বেয়ে বেয়ে ওর ঠোঁটে এসে পড়তে লাগল। নিজের দেহের রক্তের স্বাদ পেয়ে ও ঠোঁট দুটো চেপে বন্ধ করে রইল। ঘাড়ের কাছ থেকে জামাটা ভিজে উঠেছিল।

আবার ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল লোকটা। চিৎকার করে কী সব বলল, তারপর রেগেমেগে ফোনটা রেখে দিয়ে ছুটে এল—পলিটেক্‌নিকের ছাত্ররা রাস্তায় বেরিয়েছে কেন? এই শুয়োরের বাচ্চা—জবাব দে!

ব্যাটনটা এবার এত জোরে ওর পিঠে পড়ল যে মনে হল পিঠের হাড়গোড়গুলো বোধ হয় ভেঙে গেল। পিঠের অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল সে। সিপাই দুটোকে কী নির্দেশ দিয়ে লোকটা আবার টেবিলে ফিরে গেল। ওরা সারা গায়ে এবার ওরা কী একটা জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতে লাগল। কম্বল না চট কী যেন একটা দিয়ে সমস্ত শরীরটা পেঁচিয়ে দিল।

একটা করে ফোন বাজে আর অফিসারটি ছুটে আসে। কখনও বলে, 'ওয়েলেসলিতে ট্রামে আগুন লাগল কেন? বল্, বল্ শালা! গাঙ্গুলীবাগানে পুলিশের ওপরে বোমা পড়ল কেন? বল্, বল্ শুয়োরের বাচ্চা! কলেজ স্ট্রিটে গণ্ডগোল হচ্ছে কেন? বল্ বেজন্মা!'

তখনও পর্যন্ত জ্ঞান ছিল তার। রুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল, হাত বাঁধা বলে পা দুটো নাড়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এমন করে জড়িয়ে বাঁধা যে একটুও নাড়াতে পারেনি। তখন তার ওই জড়ানো শরীরটাকে ছুড়ে দিতে চেয়েছিল ওই জন্তুর মতো মুখ লোকটার উপর। রক্তাক্ত মুখখানা দিয়ে কামড়ে ধরতে চেয়েছিল ওর টুঁটিটা।

এইটুকুই মনে আছে আর কিছু মনে নেই।

কোর্টে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সে এই মারের বিবরণ দিচ্ছিল। তার মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন তাকে, মাথায় ব্যান্ডেজ, ছেঁড়া রক্তাক্ত জামা। উকিল তার পক্ষ থেকে কী একটা বলতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ওর জামিনের বিরোধিতা করা হল। উকিল আবার উঠে দাঁড়িয়ে জামিনের সপক্ষে অনেক যুক্তি হাজির করলেন। কিন্তু তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হল না। অনেকগুলো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। পুলিশের উপর বোমা ছোড়া, রাস্তায় শোভাযাত্রা করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙা, ট্রামে আগুন লাগানো এবং এমনই আরও কত। তাকে জেলে হাজতে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

ও একবার মার দিকে তাকাল। মা একবার ওকে দেখলেন ভালো করে তারপর কাছে এগিয়ে গেলেন। মার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও বলল, যদি সেই শয়তানটাকে একবার আমি একা পেতাম মা, এখনও, এই অবস্থায়ও—

যে মার মুখখানা একটু আগে বেদনায় করুণ হয়ে উঠেছিল সেই মুখখানাই হঠাৎ ক্রোধে কঠিন হয়ে উঠল। ওর হাতখানা কিছুক্ষণ হাতের মধ্যে ধরে থেকে তিনি বললেন, 'তোকে কেবলই সাবধানে চলতে বলেছি, ভেবেছি সেইভাবে বাঁচিয়ে রাখব, কিন্তু সে যে আমার কত বড়ো ভুল!'

কথাগুলো তিনি অবিচলিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন কিন্তু চোখ দুটো ছল ছল করে উঠছিল। তিনি যেন ওর হাতখানার মধ্যে দিয়ে ওর সমগ্র সত্তাকে অনুভব করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ওকে কাঠগড়া থেকে বের করে নিয়ে যেতে পুলিশের লোক আসছে দেখে তিনি এগিয়ে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, বললেন, 'হুজুর আমি ছেলের মা, আমার কিছু বলবার আছে।'

সমস্ত কোর্টরুমটা দর্শকদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি। ভিড়ের মধ্যে যা কিছু গণ্ডগোল কথাবার্তা সব হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'বলুন।'

ছেলের দিকে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমার ছেলে তার গ্রেফতার হওয়া থেকে জ্ঞান হারানো পর্যন্ত যা বলেছে সব সত্যি। আমি জানি সে একবর্ণ মিথ্যে বলেনি।'

ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিলেন। দুজন সরকারি উকিল হইচই করে উঠলেন। কিন্তু পেছনে কোর্টরুমের দর্শক জনতা থেকে চিৎকার উঠল, 'বলতে দিন, বলতে দিতে হবে।'

বিচারকক্ষে এ একটা সত্যই অভূতপূর্ব ঘটনা। ম্যাজিস্ট্রেট যে এর জন্যে তৈরি ছিলেন না সেটা বোঝা গেল তিনি যখন হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষে অবশ্য বিচারালয়ের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি কোর্ট ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠালেন। হন্তদন্ত হয়ে ইন্সপেক্টর ছুটে এসে সামনে দাঁড়ালে তিনি তাঁকে কয়েকটা কড়া কড়া মন্তব্যে ভড়কে দিয়ে অবাধ্য জনতাকে তৎক্ষণাৎ কোর্ট থেকে বের করে দিতে হুকুম দিলেন।

ও দিকে এই সব ব্যাপারে বাধা পেয়ে মা একটুক্ষণ থেমেছিলেন। এবার তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে আর তখন মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আমি এ সম্পর্কে তদন্তের হুকুম দিয়েছি।'

—আমি জানি তদন্তে কিছুই হবে না, ম্যাজিস্ট্রেটের বিরক্তি অগ্রাহ্য করে মা বলে উঠলেন, 'সুবিচার যদি করতে হয় তবে এখনই সেই অফিসারকে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার বিচার করা হোক!'

ম্যাজিস্ট্রেটের কপালটা বিরক্তিতে আগেই ভাঁজ হয়েছিল। এবার তিনি তাঁকে থমকে থামিয়ে দিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ও দিকে সেই অবাধ্য জনতা চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ এনে দাঁড় করানো হোক। সেই শুয়োরের বাচ্চাটা কোথায়? এসে ওখানে দাঁড়াক!'

কোর্ট জমাদার এবং পুলিশে মিলে এবার জনতাকে লাঠি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। মা তখন ছেলেকে লক্ষ করে কী যেন বলছিলেন কিন্তু তুমুল হট্টগোলে তার কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

লাঠির মুখে যে অবাধ্য জনতাকে কোর্টরুম থেকে ঠেলে বের করা হচ্ছিল তারা ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর আবার ঠেলেঠুলে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। ও দিকে পুলিশ ক্রমেই বেশি করে মারমুখী হয়ে উঠছিল।

সে দিন কোর্টরুমে কে যে কার বিচার করছিল বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। এর কিছুক্ষণ পরে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত আসামিকে পুনরায় বন্দিশালায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। □

লোহার খুর

মিহির আচার্য

অপরাজিতা সন্ধে ডিঙিয়ে কলেজ থেকে ফিরে ঘরে পা দিতেই অসুস্থ রমেন শয্যা থেকেই বলল : এ তো ভীষণ উৎপাত শুরু হল।

কাঁধ থেকে ব্যাগটা খালাস করে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে গেল অপরাজিতা। তার শুকনো মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমেন আবার বইয়ের মধ্যে মুখ লুকাল। হার্টের অসুখ। ডক্টর চন্দ্র এক মাস শয্যা গ্রহণের বিশ্রাম বরাদ্দ করেছেন বলে আপিস থেকে ছুটি নিয়ে সারাদিন বাড়িতে জাঁতাকলের ইঁদুরের মতো আটকা থাকতে হয়েছে। দাম্পত্যজীবন বলতে তো ওরা দুজন। সুবীর—একমাত্র সন্তান........

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে অপরাজিতা কখন স্টোভ ধরিয়েছে। চায়ের সরঞ্জামগুলো ওর হাতের নাগালে। মোড়ায় বসা ওর পুষ্ট শরীরটা পিছন থেকে স্তব্ধ পাথরের মতো দেখাচ্ছে।

আবার একটা নিশ্বাস ফেলল রমেন। বয়েস কি অপরাজিতাকে আরও শক্ত, গম্ভীর করে তুলেছে? কত বয়েস হল ওর? রমেন আগে নিজের বয়েসের হিসেবটা নিল। পঞ্চাশ না বাহান্ন? অপরাজিতা বছর তিনেকের ছোটো। অথচ চিরকাল তো এমন ছিল না। মাত্র বছর সাত-আটের মধ্যে ও একেবারে বদলে গেল। একটা কঠিন অঙ্কের মতো। সুবীর.....? কত বয়েস হবে ওর? ষোলো না সতেরো? হ্যাঁ সতেরোই। শনিবারের বিকেলে কার্জন পার্কে নাটক দেখতে গিয়েছিল। না আর ফেরেনি। ফিরতে পারেনি। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল। রেজাল্ট তার ফার্স্ট ডিভিশনেই হয়েছিল। লাভ কী! কে আর পড়বে কলেজে!

খবরটা তারা অনেক পরে পেয়েছিল। হাসপাতালে ওর রক্তে থেঁতলানো মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়ার পরে। ওর বন্ধুরাই ফ্যাকাশে মুখে খবরটা প্রথমে চুপিচুপি তাকেই দিয়েছিল। অপরাজিতা তখনও কলেজ থেকে ফেরেনি।

রমেন আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

অপরাজিতা তার কাছে প্রথম খবরটা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল। বোধ হয় সে নিজের সঙ্গে প্রাণপণ যুঝছিল। মায়ের প্রাণ তো। রমেন বাবা হয়ে কতটুকু ত' বোঝে। হাসপাতালে গেল না, শ্মশানেও নয়। রমেন ওই ছেলেদের সঙ্গে করেই শেষ কাজটুকু করে এল। সে দিন রাত্রিটা ঘন থমথমে হয়ে নেমে এসেছিল। মেঝের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে অপরাজিতা। পাশের ঘরে সুবীবের বিছানাটা খালি। সে রাত্রে ভয়ে কেউ আলো জ্বালতে পারেনি। কেন জানি অপরাজিতার মুখের দিকে তাকাবার সাহস ছিল না রমেনের। অপরাজিতা মা, সেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই। স্বামিত্বের অধিকার দিয়ে রমেন স্ত্রীকে হয়তো বুঝতে পারে, তার ভেতরের মাকে নয়। রমেন অনেক ছোটোবেলায় মাকে হারিয়েছে। একটা নির্বোধ সংস্কার ছাড়া তার কাছে কিছু নয়।

পরের দিন ভোরে উঠে স্নান করল অপরাজিতা, গোয়ালা এলে তার কাছ থেকে দুধ নিল, ঝিকে উনুনে আঁচ দিতে বলল, চা তৈরি করার পর রান্না করল। রমেনকে আপিস পাঠাল। নিজে সে আর কলেজে ক্লাস নিতে গেল না। রমেন তড়িঘড়ি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল অপরাজিতা নিজেকে একলা পেতে চায়। রমেন বুঝেছিল তার বাড়িতে থাকাটা সে দিন সে পছন্দ করত না। কিংবা রমেনও হয়তো সে দিন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চেয়েছিল।

বস্তুত সে দিন গভীর দুঃখ নিয়ে মুখ-বোজা বইয়ের মতো কাটাল রমেন। কেমন ঘুমঘুম আচ্ছন্নের মতো। যেন দীর্ঘ রোগভোগ শেষে আজই প্রথম সে আপিসে এসেছে।

শোকটা চেপে রাখতে চাইলেও চেপে রাখা যায়নি। দলে দলে সহানুভূতি জানাতে এসেছিল। রমেন কোনও উত্তর করেনি। নীরবে সব সহ্য করেছিল।

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, রমেন এই বিষয়টি নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে চায়নি। সে সরকারি চাকরি করে, কেন জানি তার মনে হয়েছিল এ একটা বিপজ্জনক ঝুঁকি। যদিও পাকা চাকরি তবু যে কোনও সময় কলমের খোঁচায় সেটা খোয়ানো কিছু বিচিত্র নয়। ছেলের অপরাধের দায় বাবাকে বহন করতে হয়। অপরাধ! স্বগত উচ্চারণ করল রমেন : কার্জন পার্কে নাটক দেখতেই যাওয়া নয়, নাটকটি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। রমেন এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পায়। তা না হলে এরা নাটক বন্ধ করতে ছুটে এল কেন? এলোপাতাড়ি ব্যাটন চার্জ, লোহার খুরের লাথি, এবং, এবং—

আহা, কী ভাবছে রমেন। অথচ চোখের সামনেই ছেলেরা কেমন বদলে গেল। সুবীর তো একা নয়।

চাকরির ভয়টা কি অমূলক ছিল রমেনের? না তা নয়। রমেন কি কখনও-সখনও দেখেনি তার বাড়ির সামনে, কিংবা গলির মোড়ে, কখনও বাসেও, সন্দেহজনক লোকের ছায়া! কেউ তাকে অনুসরণ করছে, তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। পিঠের ওপর ওই কালো ছায়াটা নিয়ে কে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে! কোনও কোনওদিন গলায় তিক্ত স্বাদ বোধ করত। যেন তার গোপন কোনও অসুখ হয়েছে, যা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে হবে। হ্যাঁ পিতৃত্বের একটা দায় আছে। রমেন অপরাজিতার ভেতরের মাকে কোনও দিনই বুঝতে পারেনি। মাতৃত্ব সম্ভবত মেয়েদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পিতৃত্ব শুধু একটি কার্যকারণের ফল। দুর্মর ক্লান্তির মধ্যেও ভাবতে পারছে রমেন।

সে দিন রাত্রে বাড়ি ফিরে অনিবার্যভাবেই ফেটে পড়ল রমেন—এইভাবে বাঁচা যায় না।

অপরাজিতা যেন প্রস্তুতই ছিল। বলল : বাঁচা!

রমেন বলল : আমরা যখন মরে যাইনি তখন জীবিত লোকের মতোই বাঁচতে হবে।

—আমরা কেউই বেঁচে নেই। নিঃশ্বাস নিলেই বাঁচা বলে না।

—এখন এইভাবেই মানুষ বাঁচে। এর চেয়ে ভালো কিছু আশা আমরা কেউ করতে পারি নে। রমেন একটু থেমে বলল : সুবীর নেই, এ-সত্যকে মেনে নিতেই হবে। কোনওদিনই আর আমরা তাকে ফিরে পাব না।

—তা তো জানি।

—ধরো, তার অসুখ করেছিল, দুরারোগ্য অসুখ। মরে গিয়ে আমাদের মুক্তি দিয়ে গেছে।

—সে তো মরেনি। তাকে হত্যা করা হয়েছে।

—চুপ চুপ। আস্তে কথা বলো। সে মরেছে এটা মিথ্যে নয়।

অপরাজিতা বলল, ও যখন মরেছেই সত্য করে জানো তখন স্বীকার করতে ভয় পাও কেন? এত চুপ চুপই বা কেন?

রমেন ওর কথার উত্তর দিতে পারেনি। ওর মনে হয়েছিল অপরাজিতা এতদিন মৌন থেকে নিজের ভাবনার অটুট যে ভঙ্গিটি তৈরি করেছে সেখানে ঘা দেওয়া যাবে না। সময় ওর মনের ক্ষতকে কিছুমাত্র আরোগ্য করেনি।

রমেন দস্তুর মতন ক্রুদ্ধ হল। সে ভেবেছিল একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দাম্পত্যের ব্যাপারটা সামনাসামনি ফয়সালা করে নেবে। কিন্তু কে জানত অপরাজিতার মাতৃত্বের দুর্গের একটা ইটও সে খসাতে পারবে না। আর এই মুহূর্তে দ্বিতীয় চিন্তাটা রমেনের জাগল যে, মাতৃত্বকে বুঝুক বা না বুঝুক তার গৌরববোধ মেয়েরা স্বামীর কাছেই চায়।

রমেন অতিশয় ক্লান্তি বোধ করল। ক্লান্ত এবং নিঃস্ব। তার স্বামিত্বের অহঙ্কার বিন্দুমাত্র তাকে রক্ষা করতে পারল না। এমনকি, দিনের পর দিন তার রাগের একমাত্র কারণ যে দাম্পত্য সম্পর্কের অভাব এবং যে অসহযোগিতার জন্য দায়ী অপরাজিতা, সেই নির্মম সত্যটা সে অস্বীকার করে কী করে!

গতকাল রাত্রে ক্ষুধার্ত শরীরে অপরাজিতাকে কাছে টেনে নিয়েছিল, কিন্তু অপরাজিতা এমন শীতল

পাথরের মতন পড়েছিল যে রমেনের কঠিন পৌরুষ লজ্জায় হাহাকার করে উঠেছিল। অথচ অপরাজিতা তারই স্ত্রী।

রমেন বিড়বিড় করে বলেছিল, আমাকে অকারণ এইভাবে শাস্তি দেওয়া.......

অপরাজিতার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। অন্ধকারেও বুঝতে পেরেছিল রমেন, ও কাঁদছে। ওর কান্নাটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অপরাজিতা তো পুরুষ নয়, সে জানেও না কোনও কোনও সময় মেয়েদের কান্নাও তাদের কাছে অসহ্য অত্যাচারের মতো লাগে।

অপরাজিতা মুমূর্ষু গলায় বলেছিল : আমি জানি একটা শিশুর মতো তুমি আমাকে ভোলাতে চাও। কিন্তু তুমি বোঝো না আমার বয়েস হয়েছে, এত সহজে আমাকে ভোলানো যায় না।

রমেন নিঃশব্দ। লজ্জায় তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

অপরাজিতা আস্তে বলল : সুবীরকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি; তুমি কী করে ভাবছ নতুন অতিথির আমরা দায়িত্ব নিতে পারব? না গো না, যাকে রক্ষা করতে পারব না তাকে পৃথিবীর আলোতে টেনে আনার কোনও অধিকারই আমাদের নেই।

রমেন হার স্বীকার করবে না। বলল : সুবীরকে যেমনভাবে দেখা উচিত ছিল আমরা দেখতে পারিনি। হয়তো আমাদের সময়াভাব ছিল অথবা ছেলের ওপর বেশি বিশ্বাস করেছিলাম। এ কথা তুমিও স্বীকার করবে আমাদের ধ্যানধারণা মতো সে চলেনি। সে দলে পড়ে হঠাৎ উগ্র হয়ে গিয়েছিল।

অপরাজিতা বলল : আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

—আমি বলতে চাইছি সে রাজনীতির সঙ্গে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়েছিল।

অথচ তার এমন কী বয়েস হয়েছিল। সে আরও অপেক্ষা করতে পারত। আরও পড়াশোনা, আরও.....রাজনীতি বড়োরা করে, ছাত্রাবস্থায়.........

—হয়তো আমাদের, বড়োদের ওপর ওর বিশ্বাস ছিল না। দীর্ঘকাল আমরা ওদের কাছে কোনও আদর্শই রাখতে পারিনি। আমরা মুখে বলেছি পৃথিবী পরিবর্তন করতে হবে। অথচ আমাদের কোনও কাজগুলোই পরিবর্তনের দিকে যায়নি। আমরা নিজেদের চাকরি গুছিয়ে নিয়ে এই সমাজের অন্ধ সেবাই করে গিয়েছি, যাচ্ছি।

আহত রমেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল ঃ এখন বুঝতে পারছি তুমি সুবীরকে সমর্থন করতে।

—আমরা যা পারিনি ওরা যদি তা পারে.........

—ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেই হবে? দেখবে না তারা ব্যবহার করতে জানে কি না?

—আমরা দীর্ঘকাল ব্যবহার করতে না শিখেও মুখস্তের মতো অস্ত্রের কথা বলেছি। বলিনি? এক দলকে তো এগিয়ে আসতেই হবে যারা অস্ত্র আর ব্যবহার একই সঙ্গে করতে শিখবে।

—তারা ভুল করবে। করেছে। তারা পরিণতি দেখেছ! হাজার হাজার ছেলে।

—ওদের ভুলের মাশুল ওরাই দিয়েছে। আমাদের বিন্দুমাত্র দায়ি করেনি। কাজটা সহজ নয়, আমরাই বহুকাল ধরে ওদের কাজটাকে জট পাকিয়ে রেখেছি, ভুল হতেই পারে।

—যারা ভুল জেনেই এগোয়, তারা চিরকাল ভুল করে।

—এও ঠিক, ওদের কাজটা সফল হলে আমরাই তখন জয়ধ্বনি করতাম।

রমেন বিরক্ত হয়ে বলল : তা হলে তো বলতে হয় সুবীরের এই পরিণতি স্বাভাবিক ছিল।

অপরাজিতা বলল : না, আমি তাও বলি নে। আমি যতদূর জানি সুবীর ওর বন্ধুদের সঙ্গে মিশত, চিন্তাভাবনাও করত, কিন্তু তার জন্যে তাকে এমন শাস্তি পেতে হবে এটাও ভাবা যায় না। সে একটা নাটক দেখতে গিয়েছিল সে দিন, নিশ্চয় কোনও লড়াই করতে নয়; তা হলে বিনা প্ররোচনায় ঠাণ্ডা মাথায় কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারে এটাকে মেনে নেওয়া যায় না। তুমি নিশ্চয় বলবে না সেখানে কোনও সংঘর্ষের ব্যাপার হয়েছিল।

—না, তা অবশ্য নয়। চিন্তিত রমেন স্বীকার করল।

অপরাজিতা বলল : আমার সেখানেই দুঃখ। অকারণ এমন ঘটনা ঘটলে আমাদের কারওরই জীবন তো নিরাপদ নয়।

বিনিদ্র রাত্রি কখন ভোর হয়ে এসেছে। আর ফিকে আলোয় কপালে গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। অপরাজিতার ঘুমন্ত কোমল মুখের দিকে চেয়ে কেমন শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল রমেনের। সে দিনই চোখের ওপর পড়েছিল ওর চুলে ঈষৎ রুপোলি ঝিলিক। রমেনের আরও মনে হয়েছিল অপরাজিতা ক্রমশ তার দুঃখের মধ্যে একা হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় স্বামীর অস্তিত্বও তাকে সবল করে না।

—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অপরাজিতা বলল ফের।

—হ্যাঁ। এই যে। চায়ের কাপ টেনে নিল রমেন : আমার কথাটা কি তুমি শুনতে পেয়েছ?

—হুঁ।

—তা হলে?

—আমাকে জিজ্ঞেস করছ?

—বাহ্।

জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে অপরাজিতা রমেনের মুখের ওপর ঠাণ্ডা চোখ দুটো মেলে ধরল : তুমি এমনভাবে আমার মতামত জানতে চাইছ যেন ব্যাপারটা আমার একার, তোমার কিছু যায় আসে না।

রমেন আবার অস্ফুটে উচ্চারণ করল : বাহ্।

অপরাজিতা বলল : বারবার ওরা আমার কাছেই বা আসে কেন? তুমি না ওর বাবা, তোমার কথাটাই যথেষ্ট নয়?

রমেন বলল : ওঁরা যে তোমার সঙ্গেই কথা বলতে চান।

—তার মানে তোমার কাছে ওরা আশ্রয় পাচ্ছে। তোমাকে দিয়ে আমাকে নরম করতে চাইছে। আশ্চর্য, তোমার লজ্জা করে না?

—জানো আমি নির্বিরোধ থাকতে চাই। এই ঝামেলা...

—ঝামেলা বলছ? ঝামেলা সৃষ্টি করেছে কে? আমি? অপরাজিতার চোখের তারা ধক করে জ্বলে উঠল : ব্যাপারটা যদি আমার নিছক ব্যক্তিগত হত তা হলে এত চিন্তা করতাম না। তুমি জানো না একইভাবে কত মায়ের কোল ওরা খালি করে দিয়েছে! আমার কোনও গর্হিত কাজ সমাজ ক্ষমা করবে? আমি যদি ঠিকমত খাতা না দেখে ছাত্রীকে ফেল করাই? যদি আমি ঘুষ নিয়ে কোনও ছাত্রীকে পাশ করিয়ে দিই? বলো, কেউ ক্ষমা করবে? তুমি করবে? না গো না, সচেতনভাবে যে অন্যায়টা করে তাকে ক্ষমা করা যায় না। তাতে সমাজেরই ক্ষতি হয়।

—তুমি কি ওদের বিরুদ্ধে লড়বে?

—ন্যায়বিচার পাওয়ার আমার অধিকার আছে। যেমন আমার কাছেও সমাজ ন্যায়বিচার আশা করে। ভেবে দেখো, আমি সে সময় ওদের দরজায় ছুটে গেছি, জানতে চেয়েছি কেন আমার ছেলে এই শাস্তি পেল? এরা আহত মাকেও ক্ষমা করেনি। আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, চোখ রাঙিয়েছে আটকে রাখবে বলে। আমি খবরের কাগজে চিঠি দিয়েছি, কেউ ছেপেছে, কেউ ছাপেনি। আমি উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেছি। অথচ কেউ আমাকে পাত্তা দেয়নি। ভাবখানা এই : একটা অন্যায় হয়ে গেল এ দেশে কোনও প্রতিকার নেই। যেন বেঁচে থাকা-না-থাকা একই ব্যাপার। দশজনের মতোই আমি একজন নাগরিক, ইনকাম ট্যাক্স দিই, ছোটো বাড়িটার জন্যে কর্পোরেশনকে কর গুনে দিই। অথচ আমার কোনও জিজ্ঞাসা নেই, আমাকে মুখ বুজে নিয়তির মতো সব কিছু সয়ে যেতে হবে। তুমি আমার স্বামী, তুমিও যখন ওদের পাশে দাঁড়াও...

রমেন উত্তেজিত গলায় বলল : আমার একটা কথার উত্তর দাও। ছেলে কি ফিরে পাবে?

—না।

—তা হলে?

—তোমার ওই 'তা হলে'-গুলোই আমার কাছে অসহ্য লাগছে। আমার নিজের ছেলের কথাই ভাবিনে। আরও অনেক মায়ের ছেলে হবে, তারা বড়ো হবে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই—

—তুমি কী করতে পারো?

—এখন পুরনো অবস্থাটা পালটেছে। ভয় দেখিয়ে ওরা আর আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। ওরাও তা বুঝতে পেরেছে। তা হলে বার বার আমার সঙ্গে আপস করতে ছুটে আসত না।

রমেন চিন্তিত হয়ে বলল : পুরনো অবস্থা আর ফিরে আসবে না, কে বলতে পারে। তখন?

অপরাজিতা স্থির গলায় বলল : সে দিন সুবীর কেন, আমরাও কেউ বাঁচব না।

রমেন কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই জানলার পর্দাটা তুলে লক্ষ করে ফিসফিস করে বলল : ওঁরা এসে পড়েছেন।

অপরাজিতা বলল : আমাদের এ সময়ে একসঙ্গে পাওয়া যাবে ভরসা দিয়েছিলে বুঝি?

—মিস্টার মিত্র—বাইরের বারান্দায় একজোড়া ভারী বুটের শব্দ।

—আমি—রমেন কী করবে বুঝতে পারল না।

অপরাজিতা বলল : তুমি এখানে বসো। আমি দেখছি।

দরজা খুলে চৌকাঠের ওপর সটান দাঁড়িয়ে রইল অপরাজিতা।

—আশা করি অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম না। অফিসার হাসলেন, না নিকোটিনে হলদে দাঁতগুলোর প্রদর্শনী করলেন।

অপরাজিতা দরজা থেকে একটুও না সরে বলল : বলুন—

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কি কথা হবে? ভেতরে আসতে পারিনে কি?

—দেখুন, বার বার আপনাকে বলেছি কোনও লাভ নেই। শুধু আমাদের সময় নষ্ট হবে।

—মিস্টার মিত্র অবশ্য.......তিনি কি বাড়িতে নেই?

—আছেন। ডেকে দেব?

—একসঙ্গে আপনাদের দুজনকে পাওয়ার সৌভাগ্য তো কম হয়। এই যে রমেনবাবু—

—হ্যাঁ।

—মিসেস তো আমাকে বাড়িতে ঢুকতেই দেবেন না দেখছি।

—আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম—রমেন বলল।

—তা অবশ্য বলেছিলেন। কিন্তু আমার দিক থেকে গরজটাও তো কম নয়, বলুন? ধুলো পায়ে ফিরে যাই কী করে?

আশপাশের বাড়ি থেকে কিছু কৌতূহলী মুখ।

রমেনের অস্বস্তি লাগছিল।

—দেখুন রমেনবাবু, আপনার ভরসায় আমি এসেছি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলেছিলেন। স্বামী হিসাবে স্ত্রীর ওপর, আপনার প্রভাব আছেই।

রমেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল : আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন দেখিনে। সে কথা থাক। আপনার অনুরোধ এড়াতে না পেরেই বাধ্য হয়ে আপনাকে এই সময়ে আসতে বলেছিলাম।

—আমি কি ভেতরে বসতে পারি?

রমেন বলল : না বলতে পারলেই খুশি হতাম। আসুন। এই সিদ্ধান্তটা অবশ্য আমার একার।

অফিসার ভেতরে পা দিয়ে চেয়ারে শব্দ করে বসলেন।

—মিসেস মিত্র—

—বলুন।

—আমি কোনও সরকারি দায়িত্ব নিয়ে বলছি নে। ধরুন, আমিও আপনাদের মতোই একজন সাধারণ

মানুষ, দোষে-গুণে ভরা, একেবারে শুদ্ধ চরিত্র এ কথা বলে লজ্জা দেব না। দেখুন, আমাদেরও অস্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থায় সময় সময় কাজ করতে হয়, যার জন্যে পরে আমাদের অনুতাপ পেতে হয়, গ্লানি বহন করতে হয়। আফটার অল আমরাও তো স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ। আমাদেরও তো সংসার আছে, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সবই আছে। বলুন? ক্ষমা করবেন যদি কথাটা উপদেশের মতো শোনায়। মিসেস মিত্র, আমরাও একটা সিস্টেমের দাস, অন্ধ হয়ে সে সিস্টেমকেই আমাদের সেবা করতে হয়। সেটা ভালো কি মন্দ বিচার করবারও কোনও সুযোগ নেই। দেখুন, আমাদের এই সার্ভিসে ব্রিটিশ আমলে শুধুমাত্র চাকরির খাতিরেই আমাদের কত দেশপ্রেমিককে নিগৃহীত করতে হয়েছে, স্বদেশি আমলে শাসকরা আমাদের কাজটাকে অন্যায় বলে মনে করেননি। আমাদের প্রমোশনও তাতে আটকায়নি। তা না করলে আমাদের চাকরির শর্ত লঙ্ঘন করা হত। তার অর্থ কি এই যে, দেশের স্বাধীনতা আসুক আমরা তা চাইনি? দেখুন মিসেস মিত্র, সমস্ত সমস্যাই এমন জটিল, কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য, পক্ষপাতহীন বিচার করাই মুশকিল। এ কী, কফি নিয়ে এলেন কেন, এ তো আমার প্রাপ্য নয়।

অপরাজিতা বলল : ঘরে যখন বসতে পেরেছেন তখন কফিটা দিলে আর বেশি ক্ষতি হবে না।

অফিসার কফির পেয়ালা টেনে নিলেন। তারপর ঘড়ি দেখে বলতে শুরু করলেন : জানেন মিসেস মিত্র, সে সময়ে আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি মিথ্যা নয়। সে জন্যে ক্ষমা চাইবার কোনও মানে নেই, কারণ এটাও সমান সত্য যে, অবস্থা আমাদের অনুকূলে এলে আবারও সে আচরণ করতে দ্বিধা করব না। তবে বিশ্বাস করুন, সে দিন সুবীর আমাদের লক্ষ্য ছিল না, আমাদের ওপর আদেশ ছিল নাটকটা বন্ধ করার। কার্জন পার্কে নাটকের ব্যাপারটা একটা সমস্যা হয়ে উঠছিল। আমরা চিরদিনের মতো সেখানে নাটকের ব্যাপারটা বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। সে দিন সমস্ত জিনিসটা এমন গোলমেলে হয়ে উঠল, এমন ছুটোছুটি, ধাক্কাধাক্কি, অনেকে পড়ে গিয়েছিল......সে দিন নাটক দেখতে লোকও জমেনি কম, আমরাও কম নার্ভাস ছিলাম না, স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ, তবু বলি, সুবীর আমাদের লক্ষ্য ছিল না। অথচ দুর্ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে। অস্বীকার করি কী করে। কোর্টের সামনে আরও দুজন সিপাহির সঙ্গে আমাদের দুবার হাজির হতে হয়েছে। আমি জানি শনাক্তকরণের ব্যাপারেও আপনার অসুবিধে হবে না। কাগজের ফোটোগ্রাফারের রোলটা আমরা ছিনিয়ে নিতে পারিনি। পরে ওদের আপিসে যোগাযোগ করলে সম্পাদক জানিয়েছিলেন, রোলটা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তা হয়নি। সেটা আপনার হস্তগত হয়েছে। কোর্টে ফোটোটা পেশ করলে শাস্তি আমাদের পেতেই হবে। তা হোক। কিন্তু সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে মিসেস মিত্র, আমরা কজন শাস্তি পেলেও তা দূর হচ্ছে না। আসল কথা হচ্ছে সিস্টেম, সেটাকে বদলাতে না পারলে আপনাদের, আমাদের কারওরই মুক্তি নেই। অনেক সময় নষ্ট হল আপনাদের, আমি আন্তরিক দুঃখিত। এত কথা বলার অর্থ এই নয় যে আপনি মামলা তুলে নেবেন। আইনকে সম্মান দিতেই হবে। অথচ এই ধাঁধাটাকে কিছুতেই পরিষ্কার করতে পারিনে মিসেস মিত্র, একই সিস্টেমের অনুগত দাসত্ব করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই আমরা, আর সিস্টেম থাকে অক্ষত। কর্তব্য-অকর্তব্য ঘুলিয়ে যায়। বড়ো জটিল, বড়ো দুরূহ সমস্যা মিসেস মিত্র, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। অনেক রাত হল, এবার উঠতেই হয়। ক্ষমা করবেন আপনাদের অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম বলে। শুভ রাত্রি।

অফিসারের লম্বা শরীরটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও ঘরে দুজন প্রাণী নিঃশব্দে বসে রইল। □

আলোয় শুধু

মিহির সেন

মাঝে ক'দিন বন্ধ ছিল। আজ আবার সন্ধ্যার পর ঝিলটার কোণ থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ এসে সবাইকে সচকিত করে তুলল।

উৎকণ্ঠিত মুখগুলো জানলার শিকে ঝুঁকে অন্ধকার ঝিলটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

রেললাইনের ওপারেই ঝিলটা। এখন বর্ষার কচুরিপানায় দূর থেকে দেখে মাঠ মনে হয়। আশেপাশে ঝোপঝাড়। ঝিলটার ওপারে জবরদখল বিরাট কলোনি। এপারে নতুন গড়ে-ওঠা বসতি। আগে নিচু জমিই ছিল, এখন ভরাট হয়ে অনেক বাড়ি উঠে গেছে। আগে দাম অনেক কম ছিল। সামান্য সঞ্চয় বা ধার-করা টাকায় মধ্যবিত্তরাই প্রথম এসে উঠেছিল তাই। এখন দাম আকাশছোঁয়া। অভিজাতরাও নজর ফিরিয়েছে এ দিকে। সম্প্রতি দু-এক বছর হল খ্যাতনামা এক শিল্পপতিও প্রায় প্রাসাদতুল্য এক আবাস গড়েছেন। এপল্লিতে বাড়িটি এখনও বেমানান। কিন্তু আশেপাশে এখন নতুন ক'টি বাড়ির ভিত উঠছে, যেগুলো উঠে গেলে আর বেমানান মনে হবে না। তখন হয়তো ওগুলোর পাশে পুরনো পল্লিটাকেই বেমানান প্রাচীন মনে হবে।

প্রথম আর্তনাদের পর ক্ষণিক বিরতি উৎকণ্ঠিত মুখগুলোকে আবার ঘরে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু উপর্যুপরি কতকগুলো বোমার শব্দে আবার আঁতকে ওঠে সবাই। গোটা ঝিলটা জুড়েই যেন তাণ্ডব চলছে। হইচই, চিৎকার, আর্তনাদ, বোমার শব্দ, পাইপগানের গুলির শব্দ।

নিয়মিত অভ্যেসবশে মুহূর্তে সমস্ত বাড়ির দরজা জানালা শব্দ করে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল। অন্ধকার হয়ে গেল গোটা রাস্তা। মোড়ের পানের দোকানের ঝাপ বন্ধ হয়ে গেল। কোণের মুচির দোকানটার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চোখের নিমেষে রেললাইন ঘেঁষে বসা কাঁচা শাক-সবজির সান্ধ্য-বাজারটা উবে গেল যেন।

পাড়ার রাস্তাটা দিয়ে এক ঝাঁক উত্তেজিত পায়ের ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। গোটা পাড়া উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে। আসন্ন একটা আক্রমণের আশঙ্কায় ঘরে বসে কাঁপছে সবাই। প্রতিবাদের উপায় নেই। প্রতিরোধের শক্তি নেই। বিপদটা যদি এসেই পড়ে। গোটা তল্লাট জুড়ে আসবে। কারণ লড়াইটাও এ তল্লাটের সঙ্গে ও তল্লাটের। যুদ্ধের মতোই। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এখানে বিচার্য নয়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অন্ধকার ঝিলটা রণক্ষেত্র হয়ে থাকল। এত বড়ো সঙ্ঘর্ষ এ তল্লাটে এই প্রথম। অন্তত সাম্প্রতিককালের ভেতর। এ দিকের দুটি ছেলেকে নাকি কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারই জের কি না কে জানে।

সুষমা আজ সকাল থেকেই কেমন যেন বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলেন। ছেলেগুলোর চলাফেরা, কথাবার্তায় কিসের যেন একটা চাপা প্রস্তুতি চলছিল। তপুর কাছেও দু-চারজন বন্ধু এসেছিল। ওর জ্বর হয়েছে শুনে নাকি দেখতে এসেছে। কিন্তু ওরা যাওয়ার পর ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে অশুভ একটা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছিল সুষমার।

সত্যি জবাব পাবেন না জেনেও জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওরা কী বলে গেল রে? তপু চোখ সরিয়ে নিয়ে শুকনো জবাব দিয়েছিল, অসুখ, তাই সাবধানে থাকতে।

সুষমা তবু একবার জিজ্ঞেস করলেন, শুধু তাই?

তপু মার চোখে চোখ রেখে বলল, যদি গোপন কিছুও বলে গিয়ে থাকে, সেটা তো গোপন রাখার জন্যই বলে গেছে। সব কথা জানবার এত আগ্রহ কেন তোমাদের?

ওর জবাবের চাপা বিরক্তি ও ধমকের সুরে মনে আঘাত পেয়েছিলেন সুষমা। নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন।

তপুটা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ওর বয়সে অপুও তো রাজনীতি করত। পুলিশের লাঠিগুলির সামনেও পড়েছে কতবার। জেল খেটেছে। কিন্তু অপুকে সুষমা পুরো বুঝতে পারতেন। সাধারণ কৃষক-মজুরদের জন্য ওদের দরদে অনেক সময় ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস থাকলেও, ওদের পথটাকে পুরো বুঝতে পারতেন। নিজের মতবাদ নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল তর্ক করত। কিন্তু শ্রদ্ধাও করত। অথচ তপুটাকে দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সুষমার, পারিবারিক বন্ধনগুলোকে কি ওরা পুরো অস্বীকার করতে চায়?

বেশ কিছুক্ষণ হয় ও দিক থেকে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না দেখে সুষমা সন্তর্পণে এবার রান্নাঘরের জানলাটা একটু ফাঁক করেন। দোতলার এই কোণটা থেকে ঝিলটা প্রায় পুরোই দেখা যায়। পাশের প্লটটায় বাড়ি উঠে গেলে আর দেখা যাবে না।

আবেগে, উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় বুকের ভেতর কী যেন একটা দলা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে সুষমার। হাত কাঁপছে। সমস্ত দেহ শিথিল হয়ে আসছে।

এত দূর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড়ে অন্ধকারে থমথম করছে ঝিলটা। কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। নিঃশব্দ, নিস্পন্দ, একটা বধ্যভূমির মতো পড়ে আছে জমাট অন্ধকারটা। কে বলবে একটু আগেই ওটা ছিল এক কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন।

ও দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকটা হুহু করে ওঠে সুষমার। কত মায়ের বুক খালি হল কে জানে। এমনিতেই কিছু দিন হল এক অভিশপ্ত বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে জায়গাটা। প্রায় রোজই একটা-দুটো করে সদ্য নিহত বা বিকৃত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় এখানে-ওখানে। কিন্তু আজ আর গুপ্তহত্যা নয়, সম্মুখ সঙ্ঘর্ষ হয়ে গেল দু দলের। কিন্তু আশ্চর্য, একটা লোকও তো এগিয়ে যায় না ওদের বাধা দিতে। ছেলেগুলোকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মিটমাট করে দিতে। মানুষগুলো কি সব আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে? না, প্রাগৈতিহাসিক আপন স্বার্থবিদ্ধ পশু হয়ে গেছে? নিজের জীবনটাই যেখানে একমাত্র বিচার্য!

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে দীপা এসে রান্নাঘরে ঢুকল।

—মা, দাদা কোথায়?

চমকে ফিরে তাকান সুষমা। কেন, ঘরে নেই?

—না তো?

দীপার মুখ ফ্যাকাশে। গলা কাঁপছে কথা বলতে।

সুষমা ছুটে গেলেন তপুর ঘরের দিকে। বিছানা খালি। বাকি ঘর দুটোতে নেই। হঠাৎ কী যেন ভেবে ছুটে নীচের তলায় এলেন সুষমা। যা ভেবেছিলেন তাই। সদর দরজার খিল খোলা।

ততক্ষণে অন্য ভাড়াটেরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুষমা প্রায় কান্নার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেউ তপুকে বাইরে যেতে দেখেছেন?

কারও পক্ষেই ঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব হল না। আতঙ্কে সবাই তখন যার যার বন্ধ ঘরে। নিজের সন্তানদের আগলাচ্ছে। তা ছাড়া, তপুর উপস্থিতিই এ বাড়ির সবার কাছে এক অনুচ্চারিত আতঙ্ক। ওর জন্যই বিরুদ্ধ পক্ষর কাছে এ বাড়িটাও আজ চিহ্নিত।

সুষমা আবার ওপরে ছুটে গেলেন। তপুর বাবা এখনও বাড়ি ফেরেননি। অথবা, এ গোলমালের জন্যই ফিরতে পারেননি। কী করবেন বুঝতে পারছেন না সুষমা। দীপা বিছানায় ভেঙে পড়ে কাঁদছে। ছোটো ভাইবোন দুটোও আতঙ্কে বোবা হয়ে টেবিলের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরামর্শ করার কেউ নেই। নিজেও যেন সব কিছু গুছিয়ে ভাবতে পারছেন না। হাত-পাগুলো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। অথচ এ অবস্থায় ঘরেও বসে থাকা যায় না। সম্ভব নয়। বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠছে অন্ধকার ঝিলটা। জ্বর গায়ে ছেলেটা যে কোথায় ছুটে গিয়েছে, সুষমা জানেন তা।

—লণ্ঠনটা কোথায়?

দীপা আস্তে মাথা তোলে। মাঝে বেশ কদিন ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ না হওয়ায় লণ্ঠনটা কে কোথায় রেখেছে কে জানে। কিন্তু হঠাৎ মা লণ্ঠনটা খুঁজছে কেন বোঝে না দীপা। আস্তে জিজ্ঞেস করে, কেন?

স্থির কণ্ঠে বলেন সুষমা, খুঁজে দেখে আসি।

ভয় পায় দীপা। গোটা তল্লাট যেখানে আতঙ্কে ঘরবন্দি, মা একা একজন মেয়েলোক সেখানে কোথায় খুঁজবে দাদাকে। কী করে খুঁজবে। অন্ধকারে ওতপাতা আততায়ী ওখানে প্রতিটি ঝোপের আড়ালে। জিঘাংসা ওখানে নারী পুরুষ-ভেদ মানে না।

কিন্তু কোনও নিষেধ শুনলেন না সুষমা। লণ্ঠনটা খুঁজতে খুঁজতে অকম্পিত স্বরে বললেন, 'মা হলে বুঝতিস কেন যাচ্ছি। পুরুষগুলো সব ক্লীব, পশু হয়ে গেলেও মায়েরা সন্তানের এই বিপদে চুপ করে থাকতে পারে না। আমার মন বলছে, তপু ওখানেই গেছে।

একটু বাদেই অন্ধকার নির্জন ঝিলটার পাড়ে ক্ষীণ একটা লণ্ঠনের আলোকে সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কী যেন খুঁজছে কে। মাঝে মাঝে থেমে কী যেন দেখে নিচ্ছে। তারপর আবার এগোচ্ছে। নীরন্ধ্র নিঃশব্দ অন্ধকারে একটা ভৌতিক আলোর বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে যেন।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে থাকতে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন সুষমা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি কিশোর দেহ। মাথা রক্তে জবজব করছে। পিঠের ওপর আমূল-বিদ্ধ একটা ছোরা।

না, তপু না। তবু সেখানে থেকে নড়তে পারছেন না সুষমা। বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখের সামনে যেন আপন সন্তানই অসহায় মৃত্যুর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

তপুর মুখই আবার সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল সুষমাকে। অন্ধকারকে খোবলাতে খোবলাতে ক্ষীণ আলোর বৃত্তটা সুষমার পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। ঝোপঝাড়গুলোর আড়াল খুঁজে বেড়াতে লাগল। এখানে ওখানে বোমার পোড়া কাগজ, চাকু, ভোজালি, জামার টুকরো, বিক্ষিপ্ত জুতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে রক্তের ধারা, রক্তমাখা জল।

স্মৃতিভ্রষ্টের মতো সেই অন্ধকারে তপুকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন সুষমা। কতক্ষণ থেকে খুঁজে ফিরছেন ভুলে গিয়েছেন। যেন কোনও অনাদি অতীত কাল থেকে এভাবেই আপন সন্তানকে সন্ধান করে ফিরছেন। নিজের অস্তিত্বের এক খণ্ডাংশের অনুসন্ধানে এ যেন এক অন্তহীন যাত্রা।

ঝিলটার পুবকোণে একটা উঁচু মাটির ঢিপি ছিল। খুঁজতে খুঁজতে সেটার কোণ কেটে ওপারে যেতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সুষমা। একটা স্তিমিত টর্চের আলো ওকে দেখেই যেন হঠাৎ নিবে গেল।

অজান্তেই অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কে?

জবাবে একটা সবিস্ময় শব্দ গড়িয়ে এল সামনে থেকে, ঠাকুরঝি!

ব্যাটারি ফুরিয়ে-আসা ফ্যাকাশে টর্চের ফোকাসটা আবার সামনে ছড়িয়ে পড়ল। সেটায় পা রেখে রেখে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এলেন প্রায় সমবয়স্কা বউদি।

বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুষমা, খোকনকে খুঁজছ?

বউদি সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাঙা গলায় বললেন, "হ্যাঁ। আমি জানতাম, একদিন এরকম একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে ও ছাড়বে না। তুমি তো জানো ঠাকুরঝি পর পর দুটো ছেলে মারা যাওয়ায় ওকে কীভাবে আগলে রেখে বড়ো করেছিলাম। চির রুগ্‌ণ ছেলেটাকে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।"

আক্ষেপের সুরে বলেন সুষমা, 'যেন মরণ নেশায় পেয়েছে ছেলেগুলোকে। কেন যে মরছে, কেন যে মারছে, কিছুই বুঝছি না।'

বউদি আলগাভাবে বললেন, 'কিন্তু খোকনদের লড়তে হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। তোমাদের ও দিকের ছেলেরা ওদের দেখলেই খুন করছিল।'

সুষমার জবাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ ফোটে, "তা কেন বউদি। আমাদের পাড়ার ছেলেরাই তো বরং লাইনের ওপারে যেতে পারে না। কাল তপুদের দু-তিনজন বন্ধুকে তোমাদের পাড়ার ছেলেরা ধরে নিয়ে যাওয়াতেই তো আজকের এই হাঙ্গামা।

বউদি দৃঢ়স্বরে বললেন, "কিন্তু গত সপ্তাহে তপুদের দলের হাতে খোকনদের দলের দুটো ছেলে খুন

হয়নি? রাগের মাথায় তার বদলা নিতে চেষ্টা করেছিল বোধ হয় ওরা। ওরাও তো বয়সের ছেলে। রক্ত গরম।"

সুষমা তিক্ত স্বরে বললেন, "কিন্তু এ সব যারা করছে তারা রক্ত গরমের জন্য করছে না বউদি, ঠাণ্ডা মাথাতেই করছে। এরা চিরদিনের গুণ্ডা বদমাইশ, এখন সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক দলের ভেতর ভিড়ে পড়েছে।"

বউদি বোঝেন, খোকনদের দলের কথাই ইঙ্গিতে বলছে সুষমা। অথচ খোকনরাই সবসময় এই একই অভিযোগ করে তপুদের দলের বিরুদ্ধে। নিজের ছেলে বলেই ও দিকটা দেখতে চায় না সুষমা।

আস্তে বলেন, "বউদি, ঠিক একই অভিযোগ তো খোকনদেরও তপুদের দলের বিরুদ্ধে।"

কোনও জবাব দেন না সুষমা কথাটা পুরো অস্বীকার করতে পারেন না বলে। সব দলের ভেতরেই আজকাল এমন কিছু ছেলে-ছোকরা চোখে পড়ে যাদের দেখে ভাল লাগে না। ভরসা করা যায় না। রাজনীতি না বুঝলেও, এক সময় রাজনীতির জন্য আত্মবিসর্জন দিতে আসা সে সব ছেলেকে দেখে মনে মনে সমীহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, এ মুখগুলোর সঙ্গে সে সব মুখের মিল খুঁজে পান না। এমনকি অপু, খোকন, ওদের মুখের সঙ্গেও মেলে না যেন এই মুখগুলো।

নাম দুটো একসঙ্গে মনে পড়ায় সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সুষমার। দেশ ছেড়ে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তু হয়ে যখন একই সঙ্গে সব এখানে এসে উঠলেন, তপু-খোকন তখন কতটুকু! কিন্তু কী ভাব ছিল দুজনের! সবাই দেখে আমোদ পেত, হাসাহাসি করত! পুতুলের মতো খেলত ওদের নিয়ে।

রেললাইনের ওপারের জবরদখল কলোনিতেও একই সঙ্গে থাকত সবাই, একান্নবর্তী পরিবার গড়ে। তপু, খোকন তখন আরও বড়ো হয়েছে। একসঙ্গে গলাগলি করে স্লেট বই নিয়েই স্কুলে যেত দুজনে। একদিন দুজনেই সারা গায়ে কাদা মেখে জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি এসে উপস্থিত। তপুকে নাকি ক্লাসের একটা গুণ্ডা-প্রকৃতির ছেলে মেরেছিল, তাই খোকন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দুই ভাই একই সঙ্গে মার খেয়ে ফিরে এসেছে।

এমনকি কয়েক বছর আগের সে দিনটার কথাও মনে পড়ে সুষমার। সবে তখন নিজেদের ছোট্ট একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় তুলে এপারে ওঠে এসেছেন। তপু, খোকন দুজনেই কলেজে পড়ে। অপুরাজনীতি ছেড়ে দিলেও এক সময় ওর কাছ থেকেই পাঠ নেওয়া দুই ভাই তখন একই দলে। খোকনকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের মাথা ফাটিয়ে এসে হাজির তপু।

অথচ কোনখান দিয়ে যে কী হয়ে গেল, আজ তপুর মামাবাড়ি আসা বন্ধ। খোকনের পিসিবাড়ি। শুধু তাই নয়, দুই ভাই আজ রেললাইনের দুপারে অতন্দ্র সশস্ত্র প্রহরী, একজনের ছায়া যেন আর একজনের তল্লাটে না পড়ে।

—ওখানে কী একটা পড়ে আছে না?

বউদির কথায় আবার চেতনায় ফেরেন সুষমা। ঝিলের জল ছুঁয়ে কালো মতো কী যেন একটা পড়ে আছে। উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠা স্তিমিত লণ্ঠনের আলোর বৃত্তটা দুজনকে টেনে নিয়ে যায়।

না, মানুষ না। একটা পচা কলাগাছের ডুম। দুজনে নিঃশব্দে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যান।

ঝিলের দুপাশের গোটা বসতি এখনও অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। কেউ আলো জ্বালাতে সাহস পাচ্ছে না। দরজা খুলে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। বোবা যন্ত্রণায় ঘরে-ঘরে সেই একই অসহায় প্রার্থনা গুমরে মরছে, ঈশ্বর, আমার কোল যেন খালি না হয়!

তারই ভেতর থেকে মাত্র দুটি অসহ্য যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা আতঙ্ক কখন যেন ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। অশরীরী দুটো ছায়ার মতো অন্ধকারের বুক চিরে চিরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাদের হারানো হৃৎপিণ্ড। একই যন্ত্রণার সূত্রে বাঁধা-পড়া একটি একক সত্তার মতো।

প্রতিটি মৃতদেহে আপন সন্তানের মুখের আদল খুঁজে বেড়াচ্ছিল সত্তাটি, দেহের খণ্ডিতাংশে আপন অস্তিত্বের অনুসন্ধান করছিল। অন্ধকার থেকে একদিন যাদের আলোর উৎসবে এনেছিল, মৃত-আলোর অতল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল তাদের।

একসময় ক্লান্তস্বর শোনা গেল সুষমার। যেন নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন।

—অথচ ওদের দুজনেরই তো স্বপ্ন ছিল অন্যের সুখ। জীবনের অটুট স্বস্তি।

—হ্যাঁ। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ওরা দুজনেই গরিবের মঙ্গল চেয়েছিল।

—শ্রমিক-কৃষকের দুঃখের কথা, শোষণের কথা বলতে বলতে চোখে জল আসত তপুর। —আর, শোধনবাদের কথা বলতে বলতে ঘৃণায়, ক্রোধে চোখে আগুন জ্বলত খোকনের। অথচ একই ক্রোধ, একই দুঃখ তো মানুষকে কাছে টানে বউদি। তবু কেন ওরা আজ পরস্পরের এমন নিষ্ঠুর শত্রু?

করুণ কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণ করলেন বউদি, "জানি না, আমরা সাধারণ মানুষ জটিল রাজনীতি বুঝি না ঠাকুরজি। কিন্তু আমাদের, গরিবদের যারা মঙ্গল চায় তাঁরা সবাই বেঁচে থাকুক, রাজনীতির কাছ থেকে সেটুকুও কি আমরা চাইতে পারি না?"

এ প্রশ্ন সুষমারও। কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগে কাউকে হাতের কাছে খুঁজে পান না। পেলেও তাদের ভাষা বোঝেন না। একই আলোর রেখায় পা রেখে নিঃশব্দে তাই এগিয়ে চলেন আবার দুজনে।

হঠাৎ দুরে একসময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। দুজনেই সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লণ্ঠনের শিখাটা একটু কমিয়ে দিলেন সুষমা। কাদের গাড়ি কে জানে? পুলিশেরও হতে পারে! সামনে মাটির একটা ঢিপি থাকায় এত দূর থেকে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

আচমকা কয়েকটা উপর্যুপরি বোমার শব্দে হতচকিত হয়ে পড়েন সুষমারা। গাড়িটার দিক থেকেই শব্দটা আসছে যেন। আবার কি নতুন করে শুরু হল হাঙ্গামা?

বউদি ফিস ফিস করে বললেন "ঠাকুরঝি, শিগগির চলে যাও। এখানে আর থাকা উচিত নয়।"

সুষমা চাপা আতঙ্কের সঙ্গে বললেন, "আর তুমি?"

—আমিও অন্ধকারের আড়াল দিয়ে চলে যাচ্ছি।

—না না, তা হয় না। তোমাদের দিক থেকেই শব্দগুলো আসছে মনে হয়। — সুষমার স্বরে ভয়।

বউদি যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন। এবার পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে এল ওদিক থেকে। বোমার শব্দে, গুলির শব্দে, চিৎকারে মুহূর্তে আবাব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল চারদিক।

সুষমা শক্ত করে হাত চেপে ধরলেন বউদির। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "বউদি, ও দিকে যেতে পারবে না এখন। আমার সঙ্গে এসো।"

—কোনও দিক আর নিরাপদ নেই ঠাকুরঝি, কোন দিকে যাবে তুমি? —হতাশ হাহাকারের মতো শোনায় বউদির স্বর।

ক্ষীণ লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার কাঁপিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেন দুজনে। পেছনে বিস্ফোরণের শব্দ। চিৎকার। একরাশ ভারী পায়ের শব্দ যেন এ দিকেই ছুটে আসছে।

শাড়িতে পা জড়িয়ে আসছে। চারদিকে নিঃসীম নীরন্ধ্র অন্ধকার। কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে যেন আলোর সন্ধানে ছুটে চলেছে দুটি তাড়িত মানব।

পায়ের শব্দগুলো যেন আবও কাছে এসে পড়েছে। চিৎকার করে কী যেন বলছে ওরা। মাটির ঢিপিটার কাছ এসে একটা মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন সুষমা।

বউদি হাত টেনে ধরেন। তারপর আবার ছুটতে শুরু করেন দুজনে। কার মৃতদেহ পায়ে ঠেলে এলেন, তপু না খোকনের, দেখবার সময় নেই। স্তিমিত, অস্থির।

আচমকা একটা গুলি এসে লণ্ঠনটাকে প্রচণ্ড শব্দে চুরমার করে দিল। দপ্ করে নিভে গেল একমাত্র আলোর শিখাটা। আর মুহূর্তে বিশ্বগ্রাসী নীরন্ধ্র অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেল নিষ্প্রাণ এই বধ্যভূমির এতক্ষণের একমাত্র সঞ্চরণশীল ছায়া দুটি।

আর সেই সীমাহীন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এতক্ষণে, এই প্রথম, অবাক হয়ে লক্ষ করলেন সুষমা, এই অন্ধকার সমুদ্রে উজ্জ্বল একটা আলোর দ্বীপের মতো একমাত্র আলোকিত ওদের কলোনির সেই শিল্পপতির প্রাসাদটি। নিরাপদ উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ও বাড়ির নিরুদ্বেগ কৌতূহলগুলো একটু ঝুঁকে ঝিলটার অন্ধকার সন্ত্রাসকে নিরীক্ষণ করছে। □

রৌদ্রদীপ্ত

মৃণাল চৌধুরী

অবশেষে সোমা-দীপেনের ঘরখানা ভাড়া দেওয়া স্থির হয়েছে।

ভাড়াটেরা আসবে আগামী মাসের দোসরা। পয়লা নয়। কেননা সে দিন শনিবার, তায় কৃষ্ণ-চতুর্দশী। জেনেশুনে কোনও মতেই আধুনিক একটি বাঙালি পরিবার ও-দিন 'ঠাঁই নড়া' হতে পারে না। দোসরা হতে কটা দিন মাত্র বাকি। ঘরটা পরিষ্কার করা দরকার। কলি ফেরাতে হবে। প্রথমে স্থির হয়েছিল—রান্নার একটা ঘর, অর্থাৎ চিলতে একটা খালি জায়গা ঘিরে দিয়ে, সারা বাড়ির কলি ফিরিয়ে দিতে হবে। অনেককাল তো কলি ফেরানো হয়নি। এই উপলক্ষে হবে শুনে সবাই খুশি। বিশেষ করে এ বাড়ির বড়ো বৌ শেফালি। কিন্তু বাড়ির বড়ো ছেলে নরেন, দু দিন পর ভাবনাচিন্তা করে জানাল—আপাতত ভাড়া দেওয়ার ঘরটার জন্য যা প্রয়োজন তাই করা হবে। কথা শুনে শেফালির মুখ গোমড়া হল। হেতু আছে। তার ঘরখানির অবস্থা কহতব্য নয়। লোকজন এলে সে খুব লজ্জায় পড়ে। নরেন ফাঁপরে পড়ে। শেফালি এগিয়ে না এলে বাড়িতে কোনও কাজ হতে পারে না। এক সকালে অফিস যাওয়ার আগে সে বলল—কাল মিস্তিরিরা আসবে। ও ঘরের ঝিটিমিটি যা রাখবে, সেটা তো সরিয়ে নিতে হয়। এখনও গা করছ না!

—আমাকে নাচতে হবে নাকি?

প্রশ্নটার ঝাঁঝ গায়ে না মেখে, হাসিমুখে নরেন বলল—নাচবে? তা হলে অফিস নাই-বা গেলাম।

—গা জ্বালানো কথা বোলো না তো!

কথাগুলো ঝঙ্কার দিয়ে বললেও শেফালির গোমড়াভাব হালকা হল। একফালি একটু হাসিও ফুটল। নরেন সিগারেট ধরিয়ে অফিস যাত্রা করল। অফিসযাত্রী নরেনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শেফালি দেখল—বাড়ির কাজের মেয়ে যশোর মা বসে বসে পান চিবুচ্ছে।

—যশোর মা, একবার এ দিকে এসো তো।

যশোর মা আসে। —কী গো বউদিদিমণি?

—ছোটো দাদাবাবুর ঘরটা পরিষ্কার করতে হবে।

—অ্যাতো বেলায়! রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে।

—থাক। এ কাজের জন্য আলাদা পয়সা পাবে।

—একখান ঘর সাফাই করতি কম টাইম যাবি?

—এসো একবার, কাজ দেখে যাও। দরকার হলে অন্য লোক ডাকবে। তাকেও পয়সা দেব।

—আর কেউ বলতি তো যশোর বাপ! সে পোড়ারমুখো আতক্ষণে—ইয়ের দোকানে গিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে—কথাগুলো বিড় বিড় করে বলতে বলতে যশোর মা ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ায়। শেফালি দরজা খোলে। থানা থেকে আসা তল্লাশি-বাহিনী যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তেমনভাবে পরিদর্শন করে যশোর মা।

—অ্যাই চৌকিখানি তোমাদের কুন কাজে লাগবি?

আচমকা যশোর মার তাচ্ছিল্যভরা প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হয় শেফালির।

—বাড়িতেই থাকবে। কখন কাজে লাগে।

—আমি টানতে পারবনি।

—তোমার একা টানতে হবে কেন? কয়েকজনে ধরাধরি করে নিয়ে যাবে।

কেন জানি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যশোর মা। খানিক পরে বলে—ওটার যা দশা! তোমাদের কুনো কাজ লাগবে না। দেখি, সারায়ে সুরায়ে যদি দু-চারদিন শোয়া যায়। বাতের বেথা, মাটিতে শুতি পারি না।

তক্তপোশটি অনেক দিনের পুরনো। তবে এখনও বেশ জবরদস্ত। হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হয় না শেফালির, ভাবে—ভাড়াটেরা এলে এ-ঘর থেকে নিয়ে কোথায় রাখা হবে সে এক সমস্যা। জিনিসটা নষ্টই হবে। যশোর মাকে দিলে ক্ষতি নেই। তবু গালে হাত বুলতে বুলতে শেফালি মতলব ভাঁজে।

—তক্তপোশ যদি নাও তা হলে পয়সাকড়ি পাবে না।

—সে তোমার খুশি। দিলে দেবে, না হয না দেবে।

খানিকপর একজন লোকসহ যশোর বাপ আসে। তক্তপোশ নিয়ে যায়। যশোর মা ঘর ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে। দরজা বন্ধ করতে এসে শেফালি দেখে—ঘরের দুই দেওয়ালের চারটে থাক জুড়ে বোঝাই হয়ে আছে বইপত্তর আর পত্রিকা।

—তাকগুলোয় হাত দাওনি?

—অত ওপরে আমি কি নাগাল পাই? পুরনো কাগজওলা ডেকে ওগুলো বেচি দিও। আমি এসবো। ঝাঁটায়ে দেবো। কথাগুলো বলে যশোর মা দ্রুতপায়ে চলে যায়। তার কথাগুলো মনঃপূত হয় না শেফালির। মেজোবউ অমিতাকে গিয়ে বলে—গাদা গাদা বই আর কিছু ঝিটিমিটি আছে। আমরাই সরিয়ে দেব। কী বলিস অমু?

মেজবউ অমিতার মুখে হাসি লেগেই থাকে। হাসিমুখেই সে বলে—খুব পারব।

দুপুর গড়ায়। সোনা-দীপেনের ঘরের দরজা খুলল শেফালি। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে অমিতা। ঘরটা গত তিন বছর থেকেই বন্ধ। ইদানীং সম্ভাব্য ভাড়াটেকে দেখানোর সুবাদে বার বার খুলতে হয়েছে। কোনওবার শেফালি, কোনওবার অমিতা খুলেছে। এখন আর রুদ্ধ হাওয়ার দমকা বেরিয়ে আসে না। তথাপি তালা খুলে থমকে দাঁড়ায় শেফালি। স্বভাব-কৌতূহলী অমিতা, যার মুখে সর্বদা হাসি লেগেই থাকে, তার মুখখানিও থমথমে। ঘরখানির শূন্যতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তক্তপোশ সরানো দৃশ্য। আর দিন কয়েকের মধ্যেই অন্য এক দম্পতি এসে বাস করবে এটা যেন তারই মহড়া। ওদের দুজনের অবচেতন মহাশূন্যতার এক আদল গড়ে তোলে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেফালি। অমিতা চোখ মোছে।

তাক থেকে একগোছা বই টানতেই শেফালির হাত থেকে একটা চিঠি লেখার প্যাড খোলা অবস্থায় মেঝেতে ছিটকে পড়ে। তিনটি পাতা যেন ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে আছে। কুড়িয়ে তোলে শেফালি। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখাগুলোর মাঝখানে উঁকি দেয় সোমার মিষ্টি-মধুর মুখচ্ছবি। জানলায় হেলান দিয়ে চিঠি পড়ে শেফালি ....

"........কলম থামল। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের এক নায়িকার কথা। সেই ভদ্রমহিলা স্বামীকে চিঠি লিখবার সুযোগ পাননি। আমাকেও তুমি চিঠি লিখবার অবকাশ দাওনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর থেকে আমরা কতটুকু সময় বিচ্ছিন্ন থেকেছি? আমি ভেবে পাই না। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ—মত, পথ, কর্ম, দুঃখ-বেদনা, সুখ-শান্তি এক ডোরে বাঁধা ছিল। রবীন্দ্রনাথের নায়িকার সঙ্গে আমার অমিল এখানে।

"রবীন্দ্রনাথের নায়িকা স্বামীকে ছেড়ে, সমুদ্র-সৈকতে পৌঁছে চিঠি লিখল। বিনাবিচারে বন্দি করবার 'সুসভ্য' আইন জারি করে শাসক তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বোধ হয় আমাকে পত্র-লেখিকা বানাবার জন্যই অতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন সরকার বাহাদুর। ভাবছি, সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাব।

"মাত্র তিনটে পয়সার অভাবে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বালিগঞ্জ রেল লাইন পেরিয়ে প্রতিদিন নিত্যবাবুর কাছে যেতে হচ্ছে। একটি গার্লস স্কুলের টিচার করে দেবেন বলেছেন তিনি। অতএব এখন এটা আমার নিত্য যাওয়া-আসা।

"তোমাকে হিংসা করতে ইচ্ছে হয়। খোলা কারাগার থেকে তুমি নিরাপদ দূরত্বে। রাজার জামাইয়ের

সোহাগ যত্নে রয়েছ। আর আমি খুচরো, খেলো অথচ জীবন অতিষ্ঠকারী সমস্যার খানাডোবায় ডুবে আছি। হিংসে করছি বলে আবার মুখখানা তোলা হাঁড়ি করে তুলো না। তুমি কি আবার দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছ? তবে যত্ন নিও। উড়ু-ঘুরু করে রেখো না। নিত্যবাবু কাজটা পাইয়ে দিলে, একমাস পর একবার আমি যাব, গরাদের এপাশে-ওপাশে দাঁড়াব। কারওই মনোবেদনা বিন্দুমাত্র কমবে না। তবু চোখের দেখাটুকু মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। তুমি কিন্তু মানা করবে না। যাতায়াতের ধকল সইতে পারব।

"তোমার বাবা আর কতদিন বাঁচবেন, বলা যায় না। দেশের নিরাপত্তার জন্য যদি দীর্ঘদিন কিংবা দু-এক বছর তোমাকে আটকে রাখে, তা হলে তাঁকে আর দেখতে পাবে না। মা দিনরাত খিটিমিটি বাঁধিয়ে তুলছেন। মা যে এমন ধারা হবেন, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

"তোমার কলেজ থেকে নিয়মিত মাইনের টাকা আসছে না। অনেক খোঁচাখুচি করে মাঝে-মধ্যে আদায় করে আনছি। ভাবলাম, তোমার-আমার ঘরটা ভাড়া দিয়ে দেব, মায়ের কাছে শোব। মা বললেন—তোমার কষ্ট হলে বাপের বাড়ি চলে যাও। নীরবে শুনলাম। উনি ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। নিজের ঘরে এসে আমিও কাঁদলাম খানিক সময়। বড়দা, বড়দি, মেজদা, মেজদিব কাছে প্রস্তাবটা রাখলাম। বড়দা বললেন—ব্যবস্থাটা করলে সংসারের কিছুটা সুরাহা হয়। সকলেই তার কথাটা মানলেন। কিন্তু ঘর ভাড়া দিতে গেলে রান্নার জায়গা করে দিতে হবে, কলি ফেরাতে হবে। কদিন কাটল। ভাবলাম আবার কথাটা তুলব। একদিন মেজদি আমার ঘরে এসে বসল। পা দোলাতে লাগলে। জানোই তো মেজদি কেমন হাসিখুশি। তখন কিন্তু সে গম্ভীর। বলল—ছোটো, তুই আর ঘর ভাড়ার ব্যাপারে থাকবি না। কোনও কথায় থাকবি না।

—কেন?

—বড়দি বলছেন, তুই লেখাপড়াজানা মেয়ে। তোর পেটে জিলিপির প্যাঁচ। মা তো আজকাল বাবাব ঘরেই থাকেন দিনরাত। মার ঘরটা তোর দখল হয়ে যাবে। তোর নিজের ঘরটা ভাড়া দিয়ে টাকা জমাবি। ফাঁকতালে দুটো ঘরই তোর হয়ে যাবে।

"অতএব প্রস্তাবটি ঢোক গিলে নিয়েছি। এ দিকে বড়দা-বড়দি আখের দেখতে চাইছেন। সংসারে টাকার অঙ্ক কমিযে দিয়েছেন। মেজদা-মেজদির ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। মতলব—বেশি রোজগেরে মেজদা বাড়ি থেকে বেরুলে তিনখানা ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে। মেজদা সংসারে বেশি টাকা দেবেন না। অফিস-কোয়ার্টার্সে চলে যেতে পারেন। বাবা বেঁচে থাকতেই এ কাজ সেরে নেওয়ার ভীষণ তাগিদ বোধ করছেন বড়দা। এখন আর উনি অফিস থেকে এসে তাসের আড্ডায় যান না। তবে মতলব হাসিল করা দুরূহ ব্যাপার। কেননা যশোর মা দু পক্ষেরই উকিল। সব কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। মা সব শুনছেন। কপালে করাঘাত করছেন। সকলকে পরামর্শ দিচ্ছেন—মারা যেতে। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন—দীপুটা যদি এ সময়ে—! মায়ের শেষ কথায় আমার সায় আছে। তুমি থাকলে ব্যাপাবটা এতদূর গড়াত না। আমি চেষ্টা করিনি তা নয়। কারও ভাবনায় প্রভাব ফেলবার ক্ষমতা আমার নেই। কোথায় যেন মৌলিক ত্রুটি রয়ে গেছে। নইলে এমন সহজ কথাগুলো, মিলেজুলে বাঁচবার কথাগুলো, কাউকে গ্রাহ্য করাতে পারছি না। ঠেকে শিখলাম, কোলে চড়ে বসলেই আপন হওয়া যায় না।

"সুবীর, তোমার ভাইপো, পরম আদরে গড়া সে। বয়ঃসন্ধির সীমানা পেরনোর আগেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের পাণ্ডাদের ভাষায়—জীবনযন্ত্রণায় ভুগছে। কলেজে যায় কি যায় না, ও জানে। যা সব শুনছি তাতে দিশেহারা বোধ করছি। আমাদের মতো রাজনীতি কিংবা সমাজবোধের পোকা ওর মাথায় নেই। অথচ বিশেষ এক ধরনের রাজনীতির পাণ্ডাদের সাকরেদ হয়েছে। সে দিন রাত তখন সাড়ে দশটা (ওটাই তার বাড়ি ফেরার প্রভাতলগ্ন), ঘরে এসেই সজোরে, সগৌরবে ঘোষণা করল—সে প্রেমে পড়েছে। প্রেমে পড়তেই পারে। ভুবনময় প্রেমের ফাঁদ পাতা। বড়দা মিনমিন করে বললেন—বিয়ে করলে খাওয়াবি কী?

"বিয়ে করার কথাই উঠছে না। যখন উঠবে তখন দেখা যাবে। কথাগুলোর চাইতে সুবীরের বলার ভঙ্গিটাই চমকে দেওয়ার মতো। তোমরা যেমন কথা বলতে বলতে, সিগারেটের ছাই আনমনে হেলায় ঝেড়ে ফেল, তেমনি ভঙ্গি।"

"মেজদা তিরিক্ষি হয়ে বলেন—তা হলে এমন পবিত্র সংবাদটি সকলকে শোনাবার কী দরকার ছিল?

"না জানালেও পারতাম। জানিয়ে দিলাম—বাড়ি ফেরার দেরি হলে গ্যাজর গ্যাজর করা, ট্যাক ট্যাক করে কথা শোনানো বন্ধ হবে। যদি কোনওদিন বৈশাখি এ বাড়িতে আসে, সে অপমানিত হবে না।......"

"সুবীরকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বড়দা গর্জে ওঠেন—'এ বাড়িতে ঢুকলে, ঠ্যাং ভেঙে দেব। মেজদির কনুইয়ের ঠেলা খেয়ে মেজদা তড়াক করে উঠে বসেন। বড়দাকে লক্ষ করে বলেন—কথাটা মনে রেখো। এ বাড়ির মান-ইজ্জতে টান পড়লে কাউকে ছাড়া হবে না। তখন আবার বাৎসল্যে ধৃতরাষ্ট্র হয়ে যেও না। বাড়ি ছাড়া করব সকলকে।"

—তেমন পরিস্থিতি আসুক। আগেই তড়পাস কেন? কথা ক'টা বলে বড়দা ছাদে উঠে গেলেন।

"বড়দি ফুঁসে উঠলেন—বাড়ি ছাড়তে বলার তুমি কে ঠাকুর-পো?"

"মেজদা কী বলতে চাইলেন বোঝা গেল না। শোনা গেল না। কেননা সুবীরটা শব্দের চাইতে আওয়াজ জোরালো করে কুৎসিত কথার ঝড় বইয়ে দিল। মেজদা রণে ভঙ্গ দিলেন।

"মা আদরের নাতিকে নিয়ে ঘরে গেলেন। দুই রণরঙ্গিনীকে রেখে আমি ঘরের দোর এঁটে দিলাম।

"তবু রেহাই পেলাম না। দু দিন পরে শুনলাম—বড়দি সুবীরের ব্যাপারটার জন্য তোমাকে আমাকে সরাসরি দায়ি করেছেন। এ বাড়িতে বিয়ের চল ছিল। কিন্তু ভাব-ভালোবাসার (ওনার ভাষায় ঢলানির) বিয়ে হয়নি। সে রেওয়াজ আমরা আমদানি করেছি। আমি রা কাড়িনি। কিন্তু যখন বড়দি বললেন—তুমি কীসব বই-পত্তর পড়িয়ে, শিখিয়ে, ওর কচি মাথা খেয়েছ, নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না।

"দোহাই বড়দি, অন্তত আপনার ঠাকুরপোকে সুবীরের স্তরে নামাবেন না।

"আগুন-ঝরানো চোখে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

"—গুছিয়ে কথা বলতে পারিস, তাই ভেবেছিস তোকে চিনতে পারিনি? আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? অমিতাব ছেলেমেয়ে হয়নি। ডাক্তার বলেছে হবেও না। সুবীরকে জেলে পাঠিয়ে দাগি আসামি বানালি। পার্টি করিস—ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারলি না? তা যাবি কেন? ওই ছেলেটা গেলেই তো এ বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকবে না। বাবা-মা তো তোর হাতের পুতুল। সব লুটেপুটে খাবি। কালসাপ হয়ে ঢুকেছিলি......

"আর একটা কথাও শুনিনি। ছুটে চলে এলাম ঘরে। খিল লাগিয়ে শুয়ে থাকলাম। ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। জাগলাম। আলো জ্বালিয়ে দেখি হাত ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা। দরজা খুলে দেখি সারা বাড়ি নিঃশব্দ, গভীর রাত। প্রথমেই মনে হল আজ সারাদিন খাওয়া হল না, এক বাড়িভরা লোকের কারও মনে হল না কথাটা। ভাবলাম রাত পোহালেই বাপের বাড়ির চলে যাব। পরক্ষণেই চোখের সামনে ভেসে উঠল তোমার মুখ। লজ্জায় সে মুখ কালো হয়েছে। না, পালাব না।

"পরদিন গেলাম বৈশাখিদের বাড়ি। ঠিকানা দিয়েছেন মেজদি। মেয়েটি বসতেও বলল না। ওর পোশাক, কথার ভঙ্গি-ভাষা ভালো লাগল না।

"তবু বললাম—জানই তো সুবীর লেখাপড়া শিখছে না। কোনও কাজ শেখেনি। আমাদের বাড়তি কোনও ঘরও নেই। এ অবস্থায় তোমরা ঘর বাঁধবে কী করে?

"ডান চোখ কুঁচকে, বাঁ চোখে তেরছাভাবে তাকাল বৈশাখি নামের মেয়েটি, যার নারী হিসেবে সম্বল পুষ্ট দেহ। ঠোঁট ওলটাল। তারপর বলল—ঘর বসাতে কোনও শালা হেলপ করে না। বসাতে হয়। আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে এলাম। বৈশাখি পাড়া-জানানোর মতো গলা চড়িয়ে বলল—আমার আর সুবীরের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে, যা করে বেড়াচ্ছেন, তাই করুন গে।

"কথাগুলো পিঠ দিয়ে ঠেকালাম। মুখ না ফিরিয়ে জোরে হাঁটতে থাকলাম।

"রাত এখন গভীরতর। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ? জানি, তুমি ঘুমতে পারোনি। দিন গড়িয়ে গড়িয়ে মাস, বছরও পেরিয়ে গেছে। কতদিন যে যাবে! চিঠি লিখছি। জানি না চিঠি পাঠালে তুমি পাবে কি না। পেলেও

কতটা জখম হওয়া চিঠি পাবে তার ঠিক নেই। আমলাদের হাতে হেনস্তা হবে তোমাকে লেখা আমার চিঠি—তা আমার সইবে না। ডাকে ফেলব না। থাকবে আমার কাছে। চিঠি লিখব। অনেক, অনেক চিঠি। চিঠি লিখতে বসলে অনুভব করি তুমি আমাকে ঘিরে রয়েছ। হাসিভরা গালে টোলপড়া, তোমার নিশ্বাসের হাওয়াটুকু.....আজ আর লিখব না গো। ঘুম পায়নি। তবু চেষ্টা করব। নিত্যবাবু ছটার আগে যেতে বলেছেন কাল কাজটা পেয়ে যাব।

সোমা

.....নভেম্বর, ১৯৪৮

রবীন্দ্রনাথ নামটিতে শেফালির আপ্লুত হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। নামটি তার চোখের সামনে ভাসিয়ে আনে এক ঋষির মুখচ্ছবি। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ঘাড় দুলিয়ে মুখস্থ করা গুটিকয়েক কবিতার ছত্র। আপাতত তার মনে পড়ে—

"আমাদের ছোটো নদী চলে এঁকে বেঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।"

রবীন্দ্রনাথের "স্ত্রীর পত্র" গল্পের নায়িকা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানে না শেফালি। সোমাকে সে জানে। চিঠির মর্ম বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। একা সে কখনও বাঁচতে চায়নি। প্রবলভাবে সকলকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল।

মনের অগোচর পাপ নেই। শেফালি তাকে আপন করে নিতে পারেনি। এই মুহূর্তে সোমা, তার হৃদয়ের বড়ো কাছের মানুষ মনে হয়। ওরা লড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সে লড়াই শেফালিদের জন্যও। তার মর্যাদাটুকু দিতে পারেনি সে।

—বড়দি, কী ওটা?

—সোমার চিঠি। এই নে।

অমিতা চিঠিখানা হাতে নেয়। শেফালি দ্বিতীয়খানার ভাঁজ খোলে.......

"..........সকালে উঠতেই কান্না শুনলাম। বড়দির ব্যাকুল কান্না। কারণ বুঝলাম না। বড়দি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেজদি---ছোটো, চলে আয়। সবই তো জানা ছিল। এখন ন্যাকামি করে লাভ।

"বড়দির কাছে বসে রইলাম। মেজদি, বুঝলে বাইরেই হাসিখুশি। মনটা বড়ো ছোটো। পরিবারের এতবড়ো অসম্মান—পেটের ছেলে নয় বলেই গায়ে লাগবে না।

"আসল খবর শোনো। সুবীর গত রাতে হাতেনাতে ধরা পড়েছে, মুখুজ্জেদের ছোটো বউয়ের গলা থেকে হার ছিনতাই করতে গিয়ে। ওরা পুলিশে দিয়েছে। এখন হাজতে আছে।

"এক সময় বড়দির কান্না থামে। চোখ মুছতে মুছতে আমাকে দেখেন। কর্কশ গলায় বলেন—কাটা ঘায়ে নুন ছেটাতে এলি?

"—কী বলছেন, মেজদি?

"—ঠিকই বলছি, এ সংসারে এসেই আমার হাতেগড়া ঠাকুরপোকে পর করে দিলি— (ইচ্ছে হল বলি, সে কাজটা বিয়ের আগেই করে নিয়েছি)। বললাম না। আর বললেন—তোমার বাবা-মা নাকি আমার হাতের পুতুল। মেজদি নিঃসন্তান। সুবীরকে শেষ করে সব লুটেপুটে নেব। দেরি না করে এসো, জমিদারি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। আমি গড়ছি।

"ঝগড়া করবার, দুটো ঝাঁঝাল কথা বলবার ইচ্ছের টুঁটি টিপে বাইরে গেলাম। চারুদিদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ঘরে এসে শুলাম। খেয়ে এসেছি গীতাদের বাড়ি থেকে।

"নিত্যবাবু কথা রেখেছেন। আজ থেকে আমি বামাসুন্দরী বিদ্যালয়ের প্রাতঃবিভাগের শিক্ষিকা। যে টাকা সই করব তার চাইতে মাইনে কম পাব। হোক। বাবার চিকিৎসা চালিয়েও সংসারকে কিছু দিতে পারব।

"বহরমপুর জেলে রাজবন্দিদের উপর লাঠি-চার্জ করা হয়েছে। আমাকে এড়িয়ে শোভন রায় বাণীদিকে বললেন—তোমরা জেলে অনশন করছ। আড়ি না পেতেও কানে এল। আমার দিকে তাকিয়ে সত্যমিথ্যা জানিয়ে দিও লক্ষ্মীটি। চরম একটা কিছু না ঘটলে তোমাদের কথা তো সংবাদপত্রে উঠবে না। তোমাদের অস্তিত্ব, বাস্তব পরিস্থিতি প্রচার করবার জন্য তো ওরা কাগজ ছাপে না।

"অমানবিক দম্ভ আর বন্দুকে-বারুদে জন-অসন্তোষ দমনের চেষ্টায় জনজীবন অতিষ্ঠ। পর পর তিনদিন ছাত্রদের উপর সশস্ত্র হামলা হয়ে গেল। আইনের টেকনিক্যাল মর্যাদা রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি তরুণ তাজা প্রাণ বলি হল।

"পারিবারিক শোচনীয় দুর্দিন সঙ্গে নিয়ে ইতিহাসের যাত্রাপথ থেকে পিছিয়ে পড়িনি। আমি কিন্তু এখন আর দেশের রামা-শ্যামার মতো নই। অনন্যা, কেউকেটা। পথে বেরুলে কিংবা ঘরের কোণে, পেছনে থাকে কার না কার সদা-সতর্ক দৃষ্টি। কোনও এক সুপ্রভাতে দেখবে, আমাকে তোমার পাশে হাজির করেছে। মনে হয় না ওরা অতটা করুণাময় হবে।

"সারাটা দিন বড়ো ধকল গেছে। চোখে জুড়ে আসছে ঘুমে......."

এরপর বোধ হয় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমা। চিঠিখানা অসমাপ্ত। শেফালির বুকের মধ্যে দুঃখ-দহন-জ্বালা এমন প্রবল হয়, মনে হয় এখনই দমবন্ধ হয়ে যাবে। ভাবে—ধকল, সারা জীবনভর ধকল ছাড়া আর কী সয়েছে সোমা-দীপেন?

বধূবরণ করেছিল শেফালি। সোমার মুখখানি, মুখের সেই মধুর হাসি এখনও জলজ্বল করে। চোখের উপর ভেসে ওঠে তার টানাটানা কাজল-কালো দুটো চোখ। কান-ভাঙানো, ঝগড়া করা, কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার—এ জাতীয় কোনও ঘটনা ঘটায়নি সোমা। অথচ তার সঙ্গেই চরম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে শেফালি। অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে সে। শেষ দিকে অমন কাজল-কালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি বিবর্ণ আর নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছিল। শ্যামলা দেহত্বক কর্কশ কালো হয়েছিল। মানুষের কত পরিশ্রম সহ্য হয়! স্কুলে পড়ানো, রাতদিন সভা-সমিতি-প্রতিবাদের মিছিল—এই নিয়ে মেতেছিল সোমা। শেফালির দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। ইচ্ছে করে, যে শত্রুরা এমন মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়।

—দেখি ওখানা, অমিতা হাত বাড়ায়।

শেফালি তৃতীয়খানার ভাঁজ খোলে। এ-খানার দু পিঠে লেখা। এক পিঠে গুটি কয়েক লাইন। শেফালি পড়ে.........

".........আমাদের ঘরখানা রাস্তামুখো। ঘরের কাগজ দিয়ে যায় জানলা গলিয়ে। প্রতিদিনের মতো আজকেও দিয়েছে। ঘুমভাঙা চোখে দেখলাম বড়ো হরফে লেখা......জেলে অনশনরত তিন রাজবন্দি নিহত। সঙ্ঘর্ষে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। নিহতদের মধ্যে আছেন দীপেন সান্যাল—পরের নামটি চোখের সামনে থেকে সরে যায়।"

তারপর আর কিছু দেখেনি সোমা। দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসে শেফালির। ছুটতে ছুটতে এল যশোব মা। বলল—বউদিদি, শিগগির এসো দেখিনি। ছোটো বউদিদি খবরের কাগজ খিমচে ধরে কেমনভাবে খাটে হেলান দিয়ে রয়েছে—বুকটা ধড়াস করে উঠল......এ-কবারটি চলো......। শেফালি ছুটে যায়। সারা বাড়ির চেহারা বদলে যায়। পরিচর্যা চলে সোমার। শোকে মুহ্যমান বাড়িটা ভরে যায় অসংখ্য লোকে। সোমার আত্মীয়স্বজন, পার্টির নেতা ও কর্মীরা আসে। ....শেফালি সে দৃশ্য ভুলতে চায়। বলা উচিত ভুলে যায়। এতক্ষণ কোনও মতে সে লেখাগুলো পড়েছে। আর পড়তে পারে না। চোখের জল বাঁধ মানে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, অমি তুই পড়। বাকিটুকু পড়। অমিতা হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নেয়।

"তখন ভর সন্ধে। আলো জ্বালিনি। গতকাল সকাল থেকে অচেতন হয়েছিলাম গভীর রাত অবধি। আমাকে আমার মতো একা থাকতে দিতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু। তাই রয়েছি। তোমাতে বিলীন আমার সত্তা,

অস্তিত্ব। মৃত্যুর চাইতে তুমি বড়ো। আমার জীবনে তুমি কেবলমাত্র দীর্ঘশ্বাস নও। তাই বাস্তবের নিরেট দেওয়াল বার বার ধ্বসে যাচ্ছে। মনে পড়ছে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা.........তারপর ফিরে ফিরে দেখা........এক গোধূলিবেলায় পরস্পরের কাছে পরস্পরের ধরা পড়ে যাওয়া.........

"দরজার কাছে পা ফেলার আওয়াজ। উঠলাম। আলো জ্বাললাম। সুকোমল। বড়ো বড়ো স্বপ্নালু চোখঅলা সুকোমল। চিন্তায় গম্ভীর, দরদে গভীর। ঝাঁকড়াচুলো, যাকে তুমি বলতে জাতকবি, সেই সুকোমল আর ঝকঝকে নেই। তাকে চিনতে কষ্ট হয়। ওর নামে 'হুলিয়া' ঝুলছে। কোথায় থাকে ঠিকঠিকানা নেই। খায় কি খায় না, ঠিক নেই। তবু এসেছে। না এসে পারেনি। অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে এসেছে। কোনও কথা না বলে চেয়ারটায় বসে থাকল সুকোমল। সময় কাটাতে লাগল নীরবে।

"—বসো। খাবার নিয়ে আসি—ওর শুকনো মুখ দেখে বললাম। তবু ও নির্বাক। আমার মুখের দিকে তাকাল না।

"যশোর মা খাবার নিয়ে এল। আমার দিকে অভিমানী চোখে তাকাল। কোনও কথা না বলে খেয়ে নিল। ও কি বোবা হয়ে গেছে!

"ব্যথায় কবিকেই তো মুখ খুলতে হবে। ভাষা দিতে হবে রুদ্ধ আবেগের। কিন্তু........পর পর দুটো বিড়ি টানল ও। তারপর বলল—যাই। চিন্তা কোরো না সোমাদি। দীপেনবাবুর কিছু হয়নি। আমি খবর নিয়েছি। দমকা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল সে। ফিরে ডাকলাম। বুঝলাম, আমার বেদনা কমিয়ে দিতে কবি মিথ্যে কথা বলছে। ও কেন ভুলে গেছে—সংবাদপত্রের পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে তোমার নাম—আর দুজনের সঙ্গে। আর কোনওদিন তোমরা তো সংবাদ ছিলে না জাতীয়তাবাদী পত্রিকায়। কিন্তু এখন তো রক্তের স্বাক্ষরে অন্যদিন।

"এমন বীভৎস অন্যায় অবিচারে স্তম্ভিত সারাদেশ। থমথমে আবহাওয়া। আগামিকাল প্রতিবাদ জমায়েত আর বিক্ষোভ মিছিল। তার প্রস্তুতিতে সারাক্ষণ কাটিয়েছি দুপুরের পর থেকে। চারুদিরা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি। অনেক চেষ্টা করেছেন। অনেকেই ভুলে যান—তুমি আর আমি পরস্পরের কাছে এসেছিলাম একুশে নভেম্বরের প্রতিবাদ-মুখর, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-নিক্ষিপ্ত গুলিবেঁধা ধর্মতলার মোড়ে!........

অমিতার চোখ ঝাপসা হয়। চোখের জল মোছে। আজ তারা ঘর খালি করছে—ভাড়াটেরা আসবে। বছর তিনেক আগে এক দুপুরে জেলেবন্দি দীপেন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে। তার দু দিন পর কলকাতার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে সোমা। ঘর তো খালি হয়ে গেছে—সে দিনই। বড়ো বেদনার মতো সেই স্মৃতির ভার এই মুহূর্তে ব্যাকুল করে তোলে অমিতাকে।

নীরবে কাটে খানিক সময়।

শেফালি বলে—ঠিক সর্বনাশের আগের রাতে হতভাগিনী এখানা লিখেছিল। ঘাড় কাত করে সায় দেয় অমিতা। তারপর শেষ অংশ পড়ে ভেজা গলায়.......

"......তুমি নেই! এই মহাশূন্যতা আমাকে গ্রাস করতে চায়। আমি মানব না। আমার সত্তা, আমার অস্তিত্ব, তোমার সঙ্গেই মিশে থাকবে। মানুষকে ভালোবেসেছিলে তুমি। ভালোবেসেছিলে শ্যামল বাংলা তথা ভারতের শোষিত মানুষকে এবং তার এক 'শ্যামলা' মেয়েকে। তোমার শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে, আমৃত্যু তোমার এ ভালোবাসার মর্যাদা আমি রাখবই কমরেড......" □

গামছা বোমা

অজিত মুখোপাধ্যায়

দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। দিল্লি আর বেশি দূরে নেই। সমতল উঁচুনিচু মাটি, ছোটোবড়ো টিলা আর পাহাড়, গ্রাম-গঞ্জ আর ছোটোবড়ো শহর কত কী পার হয়ে চলেছি আমরা। হঠাৎ কোথাও দিগন্তবিস্তৃত মাঠ দেখে, সবুজ ফসলের বিস্তার দেখে আবিষ্ট হয়ে যায় চোখ, অন্তর্মুখী হয়ে যায় মন।

সুদীর্ঘ যাত্রা। ইতিমধ্যে মাঝপথে কাছাকাছি কয়েকজন যাত্রী মিলে আমরা গড়ে তুলেছি একটা ছোটোখাটো জটলা, চালাচ্ছি এই তাসখেলা, এই গল্প, এই একসঙ্গে ধূমপান অথবা টুকিটাকি খাওয়া। কোথাকার কে, অথচ একটা ছোটোখাটো পরিবার হয়ে উঠেছে। কত আলোচনা—সর্দিকাশি থেকে আণবিক অস্ত্র পর্যন্ত কত বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলেছে, চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে, এক-এক সময় মনে হচ্ছে বোধ হয় হাতাহাতিও হয়ে যাবে।

বলছে সবাই নিজ নিজ বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সবজান্তা সবজান্তা ভাব আছে আমাদের অনেকেরই, কথায় কথায় সরকারি কর্মচারী দত্ত বলে ওঠে, 'আমার মনে হচ্ছে, এ বিষয়টা কিন্তু অন্যরকম, এই রকম নয়।' এক ছোকরা লেখক, সর্বদাই যে নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে পরিচয় দেয়, সে কথায় কথায় 'শ্রেণী সংগ্রাম' শব্দটা গুঁজে দিতে ভালোবাসে। অধ্যাপক ভদ্রলোক সুযোগ পেলেই কয়েক আলমারি পুস্তক আর চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চোখে আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে বিচার করবেই। প্রাচীন ভদ্রলোক যে জীবনের আদ্যোপান্ত বুঝে বসে আছে, সে বলবে আমাদের দেশের উন্নতি করতে পারে এমন ক্ষমতা কারও নেই, মার্ক্সবাদ অভ্রান্ত, পৃথিবীতে এখনও প্রমাণিত হয়নি। মাঝে মাঝে মদ্যপানের পক্ষে সগর্বে ওকালতি করবে।

তবু আমাদের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ সৌহার্দ্যের পরিবেশ গড়ে উঠেছে—ক্রুদ্ধ অথবা অশালীন কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত স্থায়িভাবে ক্ষুণ্ন করতে পারছে না। নিস্তরঙ্গ শান্তিময় পরিবেশটাকে। প্রত্যেকের নিজের জ্ঞান থেকে সহজে চলতে চায় না।

শিউশরণ প্রসাদ বললে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। প্রকৃতপক্ষে কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যে, আমরা জানি না। সে যাচ্ছিল দিল্লি, ইন্টারভিউ দিতে। ২৫/২৬ বছর বয়সের বিহারি যুবক, মাথায় টিকি-ফিকি নেই, প্যান্টশার্ট জুতো-মোজা পরা আধুনিক গৌরাঙ্গ যুবক। মুখে যেন তার খই ফুটছে। সে নাকি বিয়ে করেছে এক হরিজন কন্যাকে, সে জন্য বিশেষ গর্বিতও। তার পিতাজি আর গ্রামের গণ্যমান্য মাতব্বর বর্ণহিন্দুরা তাকে দিয়েছে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে। এখন সে সস্ত্রীক বাস করছে হরিজন পাড়ায়—মুশাহার টোলায়।

মুশাহাররা কৃষক, বেশিরভাগই গরিব, নিরক্ষর আর নাকি ভীষণ গোঁয়ার। ইদানীং তাদের সঙ্গে বাবুদের প্রায়ই লেগে থাকছে ঝগড়াঝাঁটি লাঠালাঠি—এমনকি কখনও কখনও খুনখারাপি পর্যন্ত গড়াচ্ছে।

শিউ বলে চলল হিন্দিতে, ইংরেজি মিশ্রিত হিন্দি—আপনারা সবই দেখতে পাচ্ছেন খবরের কাগজে। এক সন্ধ্যায়, বোধ হয় আশ্বিন কি কার্তিক মাস, সূর্যের শেষ রক্তিমাভা নিভে যাচ্ছিল আকাশের প্রান্তদেশে থেকে। মাঠময় সবুজ ধানের বর্ণে শেষ রক্তাভা মিশে সৃষ্টি করছিল অপূর্ব গ্রাম্য সন্ধ্যা—যে সৌন্দর্য শহরে বসে আপনারা কোনওদিন দেখতে পাবেন না। ওরা—বাবুরা চিৎকার করে হাঁকতে হাঁকতে গ্রামে ঢুকেছিল, বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় শুয়োরের বাচ্চারা, বেরিয়ে আয় ঘর থেকে। কে বাপের বেটা আছিস, আয়!

ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের হাতে কিরিচ, শড়কি, তলোয়ার, বন্দুক আর রাইফেল! দিনের শেষ আলোতেও অস্ত্রগুলো একপাল বাঘের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছিল।

—হাঁ, জরুর দেখা। এই তো বেরিয়ে এসেছি। দেখা-দেখা তুমলোগ, দেখা এহি নকশালি বোম? —তাদের সমুচিত জবাব দিয়ে ভোলা রাস্তার মাঝখানে ওদের থেকে খানিক দূরে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

এই অংশটুকু ঘটনা শেষ হওয়ার পরে জেনেছিল শিউ। প্রথম দিকটাতে শিউপ্রসাদ ব্যস্ত ছিল খিড়কির পুকুরে নিবিষ্ট মনে মাছ ধরতে। শুনতে পাচ্ছিল দূর থেকে ভেসে আসা অনেক মানুষের মিশ্রিত কণ্ঠের কোলাহল—বলা যায় রণহুঙ্কার। মনে হচ্ছিল কোলাহলটা তেমন পরিচিত নয়—একটু নতুন-নতুন। কী হতে পারে, সে মুহূর্তে যথার্থ ধারণা করতে পারছিল না।

উর্মিলা এল ছুটতে ছুটতে। তখন ফাতনাটা বার বার ডুবছে আর উঠছে। একটা অতিকায় মাছের লোলুপ আশায় শিউপ্রসাদ বিমগ্ন, উদ্‌গ্রীব—তার মনটাও যেন জলে ডুবছে আর উঠছে!

হাঁপাতে হাঁপাতে উর্মিলা এসে বললে, 'বাবুরা এসে গেছে। আজ শেষ করে দিবে। কী যে হবে কে জানে—হায় সিয়ারাম।' ফাতনাটার দিকে গভীর মনোনিবেশ করেই শিউ বললে, 'তোমার কী আর আমার কী?'

—তোমার কিছু হবে না। কিন্তু আমার? আমাদের?

ডুবছে না আর উঠছেও না ফাতনাটা, উর্মিলার দিকে মুখ তুলে তখন তাকাল শিউ। স্ত্রীর হাতে বড়ো আকারের হেঁসো, ঝক্‌ঝক্ করছে! ইতিমধ্যে কি শানের পাথরে বালি ছড়িয়ে হেঁসোটাকে ঘষে নিয়েছে উর্মিলা।

—আমি যাচ্ছি। এক ঝলক বাতাসের মতো সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিৎকার করে বলল শিউ—'যেও না, যেও না উর্মি, মারা পড়বে।'

ততক্ষণে সে চলে গেছে চোখের আড়ালে, কেবল তার অপস্রিয়মাণ পদশব্দ শোনা গেল কয়েক মুহূর্ত। পুকুরের ওধার থেকে, একা একা, ছোটোবড়ো দল বেঁধে কিষানদের দৌড়োদৌড়ি করে আসতে দেখা গেল। শিউপ্রসাদ ছিপটি গুটিয়ে নিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে এল ঘরে। সিগ্রেট ধরাল, ভাবল ; ঘরের জানালা থেকে দেখল উঁকি মেরে, চারদিক থেকে মানুষ জড়ো হয়ে চলেছে। একটা কিছু ঘটতে চলেছে যেন বড়ো রকমের বিপজ্জনক একটা। সাতপাঁচ ভেবে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল প্রাইমারি স্কুলঘরের মাঠে, দেওনাথের ঘরের মাটির দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে, নিরাপত্তা বজায় রেখে।

মুশাহার আর বাবুদের বিবাদে সে নেই। কী দরকার তার? সে না কিষান, না বাবু। অদূরে মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাবুদের, ভোলা মুশাহার তার থেকে মাত্র আট-দশ হাত তফাতে। আধবুড়ো মানুষ ভোলা। বেঁটেখাটো, খালি গা, আট-হাতি ধুতি, একমাথা কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুল, আধভাঙা গাল, চোখা নাক, শক্ত-সমর্থ শরীর, লালচে চোখ দুটি সর্বদাই ঘুরছে—সব মিলিয়ে সামান্য পুঁচকে মানুষটির চওড়া চোয়ালে মরিয়া এক প্রত্যয়—দিনের শেষ আলো যেন কৃষ্ণকায় মানুষটির শরীরেই সঞ্চিত হয়েছে।

ভোলার মনে তখন কী তোলপাড় করছিল, হাসতে ইচ্ছে হচ্ছিল শিউপ্রসাদের। একদিকে অতগুলো হিংস্র বাঘ, অস্ত্রসজ্জিত—আর মুখোমুখি ভোলা প্রায় নিরস্ত্র—তার হাতে কী যেন সামান্য জিনিস! এমন অবস্থায় ভোলার বুকের ভেতরে কি ছাদ পেটার শব্দ হচ্ছিল? নাকি সে সত্যি-সত্যি তার মুখভাবের মতোই মনটাকে অবিচল সাহসে পাহাড়সদৃশ স্থির রাখতে সমর্থ হয়েছিল?

ভোলার কণ্ঠস্বর এমনিতেই চাঁচাছোলা, পরন্তু সে অস্বাভাবিক তাতানো লোহার মতো গন গন করছিল। তার পূর্ণ চিৎকার দশটা তালগাছের চাইতেও অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল, পরক্ষণে নেমে এসে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে আদিগন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ভোলা একটা ছোটোখাটো বক্তৃতা করে চলেছে, অথবা বলা যায় গলাবাজি করে শাসিয়ে চলেছে বাবুদের।

—আয়, চলে আয় কুত্তার বাচ্চারা! দেখছিস আমার হাতে এটা কী?

কসাইয়ের ভঙ্গিতে বাবুরা নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে পরামর্শ করে চলেছে, আর বন্দুক-রাইফেলগুলো

তাক্ করে ধরে আছে ভোলার দিকে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল শিউ। কিন্তু কোথায় গেল তর্জন-গর্জন, আকাশ-ফাটানো হুমকি? অবাক ছবির মতো দেখা যায় কেবল তাদের অল্পস্বল্প অঙ্গ সঞ্চালন। তারা কি তাদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ভোলা মুশাহারের হঠাৎ হার্টফেল করা শব্দের জন্য মানসিক প্রস্তুতি চালাচ্ছে?

পার্শ্ববর্তী ফণীমনসার ঝোপটাকে দুর্গের আড়াল করে সেখানে আচমকা মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল ভোলা। আবার আচমকা লাফ দিয়ে নামছিল কাঁচা রাস্তাটার উপর। আধবুড়ো মানুষটা জ্যান্ত চিংড়ি মাছের মতো হালকা। একবার বাঁ পাশে, একবার ডান পাশে, একবার সামনে, একবার পরমুহূর্তে পেছনে—কখন যে কোন দিকে সে লাফ দেবে আগের মুহূর্তে টের পাওয়াই মুশকিল।

এটা কী জানিস রে হারামজাদা? এর নাম নকশালি বোমা! জানিস এর কিস্মত? এ তোদের কিরিচ না, বন্দুক না, রাইফেল না। এ হল গিয়ে নম্বরি ওয়ান নকশালি বোমা! এক মারে একশো সাবাড়। তোদের তামাম দলটাও উড়ে যাবে আশমানে, একরাশ চুল্লির ধোঁয়ার মতো। মাথা খুঁড়ে মরলেও তোদের বাপ-মা-পরিবার খুঁজে পাবি না কাউকে। আয়, আয়, মাত্তর দো-কদম এগিয়ে আয়। আয়, আ.......য়.......'

একটানা অনর্গল বকে চলেছে ভোলা এক নিশ্বাসে। তার মুখ থেকে বর্ষিত হচ্ছে দেওয়ালির তুবড়ির মতো অনবরত রাশিকৃত ফুলঝুরি! চিৎকার চলেছে সমানে, আগেকার মতো ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডানে, সামনে থেকে পেছনে আর পেছন থেকে সামনে, এক একটা হালকা লাফে বাবুদেব চক্ষুস্থির করে দিয়ে চলেছে। এই কৌশলটা ভোলা চালিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে, সামান্য বিরাম না দিয়ে, অক্লান্তভাবে সতেজে।

ভোলার সুনিপুণ দ্রুত এলোমেলো চমকের মতো পাঁয়তারা আর রুদ্রমূর্তি দেখে বাবুরা থমকে দাঁড়িয়েছে ঝাঁকড়া নিমগাছের নীচে। ছড়ানো ছিটানো লোকগুলো আতঙ্কে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের গা ঘেঁষে। মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছে পরস্পর। কানে-কানে কী সব বলাবলি করছে বারবার। অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, সম্পূর্ণ অন্ধকার হতে তখন আর বেশি দেরি নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করা—অবশ্য টর্চ ব্যবহার করলে অন্য কথা। টর্চ আছে বাবুদের কাছে। কিন্তু ওরা সন্ধের পর এ অঞ্চলে থাকবে বলে মনে হয় না, ওরা জানে এ-অঞ্চলে রাত্রি অধিকতর ভয়ঙ্কর। কী যে ঘটবে কোনখান থেকে বলা খুবই কঠিন।

কৃষ্ণকায় ভোলা, পরনের ধুতিটাও তার আধময়লা, আবছা আঁধারের মধ্যে সেও মিশে যাচ্ছে ক্রমশ, ঘন অন্ধকারে তাকে আর দেখাই যায় না।

আস্তে-আস্তে বাবুরা পেছতে লাগল।

তেড়ে গেল ভোলা বজ্রকণ্ঠে, 'কী, কী পেয়েছিস তোরা? আমরা কি মড়া? আয় দেখি, তোদের একদিন কি আমাদের একদিন! বড়ো বাড় বেড়েছিস তোর.! বেশি বাড় বেড়ো নাকো, ঝড়ে পড়ে যাবে।'

মুশাহারকে শিউ মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিল না—সে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল ফণীমনসার ঝোপে। নজরে পড়েছিল একসময় ভোলার ডান হাতে গোল মতো একটা কী যেন। মনে হচ্ছে, তার বিখ্যাত লাল গামছাটিকে পুঁটুলি পাকিয়ে গোল করে নিয়েছে, আকার হয়েছে একটা পাকা বাতাবি লেবু।

প্রথম থেকেই কয়েকজন চাষি ভোলার কাণ্ডকারখানার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি, বিশ্বাস রাখতে পারেনি তার উপস্থিত বুদ্ধির উপর। তারা ছুটে এসে ভোলাকে সজোরে ধরে টেনে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভোলা তো সরবেই না, বরং মোকাবিলা করবে বাবুদের। দেখা যাক, কত শক্তি বাবুদের, আর কত শক্তি ছোটোলোকদের। সে কি পাগল হয়ে গেছে! হারিয়ে ফেলেছে প্রাথমিক বোধবুদ্ধিটুকুও? অতগুলো হিংস্র নির্দয় সশস্ত্র মানুষের সঙ্গে বোকার মতো আচরণ করা কি উচিত?

অন্ধকার দ্রুত ঘনায়মান। দূর থেকে বড়ো রাস্তায় চলন্ত ট্রাক বা গোরুর গাড়ির শব্দ আসছে। মিলিয়ে যাচ্ছে যথারীতি। অদূরবর্তী ত্রিশ-চল্লিশটা বাঁশঝাড়ে অগুনতি চড়ুই-কাক-শালিক-টিয়া প্রভৃতি পাখির সংমিশ্রিত বিচিত্র গানে-ডাকে-আর্তনাদে সশব্দ আকাশ। ঝুম-ঝুম ট্যাঁ-ট্যাঁ খরর-খরর—শব্দের মতো আওয়াজ—কত রকম ডাক। নীলাভ আকাশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কালপুরুষ আর শুকতারা।

—আমরা মরতে ভয় পাই নারে শালা।

ভোলার চ্যাচামেচিতে পাখিগুলি মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে ঠোঁট উঁচিয়ে শুনছে, আবার শুরু করছে কলতান। সহস্র কণ্ঠের কলতান।

'—আমি কি মরতে ভয় পাই? আমরা লড়াইকে ভয় করি না, লড়াইয়ে মরতেও ভয় করি না। রে বাঁচে চিরকাল? তোরা—তোরা বাঁচবি চিরকাল? শয়তান-বদমাশ—অন্যায়কারীরা চিরকাল বাঁচে না রে শালা! বাঁচে সাধুসজ্জন, বাঁচে ন্যায়! তোদের মরণের আর দেরি নেই—দেরি নেই! এই তোদের মারণ, ফৌজ এল বলে! হ্যাঁ, খবর দেওয়া আছে আগেভাগে হাঃ হাঃ হাঃ। এই তারা এল বলে! শয়ে শয়ে আসছে! হাতে জেল্লাদারি হাতিয়ার—বাপ-ঠাকুরদার কালেও যা তোরা কখনও দেখিসনি! অবিশ্যি ওরা আসার আগেই তোরা আমার হাতে সাবাড় হয়ে যাবি রে হতভাগার দল! ওরা যদি এসে বলে, বড়োভাই আমাদের জন্যে ছিটে-ফোঁটা কিছুই ফেলে রাখলে না! সবটাই দিলে শেষ করে! বড়ো আপশোশ কি বাত! তখন কী বলব আমি? বলব, বুড়ো হাড়ে একটা ভেলকি দেখিয়ে দিলাম! হাঃ হাঃ হাঃ......

বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে ভোলার অট্টহাসি বাঁশঝাড়, বাগান ও ঝোপ থেকে পাখিদের দিলে উড়িয়ে। একজোড়া লক্ষ্মীপেঁচাও পালিয়ে গেল কঁক্-কঁক্ শব্দ তুলে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকও থেমে গেল কয়েক মিনিটের জন্য।

—বল শালা, দেব তোদের শেষ করে? নাকি কিছুটা রেখে দেব ছোটোদের জন্য? দেব শেষ করে এই নকশালি বোমা দিয়ে চিরতরে? নাকি রেখে দেব বড়ো বড়ো হাতিয়ারের জন্যে? এই সামান্য একটি হাতিয়ারে মরলে কি তোদের বেইজ্জত হবে? হোক। বড়ো হাতিয়ারে মরার মতো কোনও কীর্তি করিসনি তোরা। কয়েকটা মশা মারতে একটা কামান দাগে নারে শালা!'

সঙ্গীদের বলে, 'দে—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে একবার।' সুর পালটে বলে, 'একবারটি ছেড়ে দাও ছোটোভাই; ছোড় দে বাপ; ছেড়ে দে সবাই—'

অক্টোপাসের মতো তাদের বাঁধ ছিঁড়ে ভোলা এগোবেই। সঙ্গীরা ভোলাকে আঁকড়ে ধরে টেনে রাস্তা থেকে সরিয়ে আড়ালে নিয়ে আসবেই আসবে। আট-দশজন জোয়ান মিলে লোকটাকে টেনে আনতে তো পারছেই না, ভোলাই তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সবাই একেক বার এগিয়ে যাচ্ছে টলতে টলতে, আবার তারা সক্ষম হচ্ছে পিছু হটতে। কিন্তু ভোলার টান যেন রোখা যায় না, তার শরীরে তখন মত্ত হাতির শক্তি।

—ছাড়বি না তোরা? ছাড়্—একবারটি ছেড়ে দে।

সঙ্গীরা প্রথম থেকেই ভোলাকে বুঝিয়ে চলেছে নিচুস্বরে, বারণ করে চলেছে।

সে চিৎকার করে বলছে, 'আরে কোনও ভয় নেই; আমার হাতে কী আছে তোরাও জানিস না। এ চিজ যেখানে পড়বে সেখানটার কোনও চিহ্ন রাখবে না। তা ছাড়া আজ সকালেই ফৌজকে আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি যে জানতাম তোরা আসবি। কখন আসবি, কজন আসবি তা—ও জানতাম। তোদের কোনও চিন্তা নেই; ওই—ওই—ওই যে আসছে! ফৌজ আসছে! ওই যে বল্লমচকের সাঁকোর ওপর গোধূলির মতো ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। ফৌজের পায়ে ধুলো উড়ছে আকাশে।'

আকুল কণ্ঠে আবেদন জানাল ভোলা, 'দে—দে, আমাকে ছেড়ে দে তোরা। একবার ঝাঁপিয়ে পড়ি যমের মতো। হয় নিজে যাব, নয় ঠিক পথে পাঠিয়ে দেব ওদের। ধর যদি আমি যাই, চিন্তা কী? ওই তো আসছে আমাদের ফৌজ, তোরাও তো আছিস—দিবি ওদের ধ্বংস করে। হাঃ হাঃ হাঃ.......'

বাবুরা যারা ছিল সুদীর্ঘকাল অলৌকিভাবে ভয়ঙ্কর, আজ যারা ভোলার তুলনায় অস্ত্রে ও শক্তিতে প্রায় দেড়শো গুণ, কৃষককে চিরকাল যারা রাখে পায়ের ধুলোর নীচে, যাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী বর্ণনাতীত—তারা ঝাঁকড়া নিম গাছ থেকে আগেই পশ্চাদপসরণ করে চলেছিল, এখন আশ্রয় নিল রামজির পোড়ো মন্দিরটার ওধারে। কৃষকরা চারদিক থেকে—দরজা, জানলা, ঘর, প্রাচীর, গাছের গুঁড়ি, ঝোঁপঝাড়, পুকুরপাড় প্রভৃতির আড়াল থেকে লক্ষ করছিল ঘটনাটা, কী করা যায় সে বিষয়ে শলাপরামর্শ চালাচ্ছিল, প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

ঊর্মিলা ফণীমনসার ঝোপের আড়ালে হেঁসোটা দৃঢ়-মুঠিতে ধরে অপেক্ষা করছিল—যে কোনও মুহূর্তে ভোলাকে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত!

উত্তেজনার শীর্ষে কণ্ঠস্বর তুলে ভোলা বলছে, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে। কতবার বলব এক কথা?'

সঙ্গীরা ভোলার পরামর্শ মানতে একদম নারাজ। বাবুদের বন্দুক রাইফেলের টিপের বাইরে তাকে সবিয়ে আনবেই। বলতে বলতে সে সত্যিই জ্যা-মুক্ত তিরের মতো ছিঁড়ে ফেলল আট-দশজনের শক্ত হাতের বাঁধন। টিবির ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল চিতাবাঘের মতো। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললে,—'খবরদার, কেউ আসবি না কাছে!'

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে গেছে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। দূরের মানুষকে আর দেখাই যাচ্ছে না। একপা একপা করে ভোলা অত্যন্ত সন্তর্পণে এগিয়ে চলল শিকারি বেড়ালের মতো। আকাশে অথবা গাছের মাথার পাখিদের কলগুঞ্জন আর সরব নয়, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর বড়োরাস্তায় মোটরগাড়ির শব্দ ছাড়া চরাচর নির্বাক।

কৃষকেরা ক্ষীণ আর্তস্বরে সাবধান করে দিয়ে চলেছে ভোলাকে। কে শোনে কার কথা। অদৃশ্য ভোলা কিছু শুনতে পাচ্ছে কি না, টেরও পাওয়া যাচ্ছে না। ওর স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে—বাবুরা তাদের কান্না শুনতে পেলে যে সমস্ত কৃষকের মাথা নিচু! প্রাণপণে আটকে দিচ্ছে উথলে ওঠা সশব্দ কান্নাকে—মুখ কিংবা গলা টিপে ধরে। আলোচনা চালাচ্ছে কৃষকরা বিমূঢ় হয়ে। কে যেন বলে উঠল, ওকে একা যেতে দেওয়া ভারী অন্যায় হয়েছে!

ভোলার বিধবা মা সশব্দে সজোরে কেঁদে ওঠে। তাকে নাতি-নাতনিরা কাঁদো কাঁদো গলায় ধমকাতে লাগল। কৃষকেরা ততক্ষণে রাস্তার মাঝখানে জড়ো হয়েছে সশস্ত্র প্রস্তুতির সঙ্গে।

হঠাৎ বেশ কিছুদূর থেকে ভেসে এল বন্দুকের ফায়ারের পরপর কয়েকটা শব্দ, কৃষকদের অন্তস্তল পর্যন্ত উন্মথিত করে দিল শব্দগুলো। সকলেরই মনে হল, এঃ, কেন যে ভোলা এমন মাথা গরম করতে গেল।

বিধবা মায়ের সংযত কান্না অসংযত হয়ে পড়ল, কারও ধমক-ধামক আর মানল না, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল সে। কপাল ও বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠল বিধবা মানুষটি। প্রতিটি মুহূর্ত এক-এক বছরের মতো দীর্ঘ মনে হতে লাগল।

—আাহি, আাহি চুপ মার্, মা চুপ মার্। কিছুই হয়নি আমার। লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে শেয়ালগুলো। যাওয়ার সময়ে ফাঁকা আওয়াজ করে গেল, যদি আমরা শালাদের পিছু ধাওয়া করি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...... জীবন্ত অন্ধকার ভোলার কণ্ঠে যেন গর্জন করে উঠল।

ভোলা? হ্যাঁ ভোলা। বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বেঁচে আছে। গুলি-টুলি লাগেনি তো? না না লাগেনি। ওরা গুলি ছুড়েছে গাছের মাথায়। অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে ভোলা? হ্যাঁ, অক্ষত বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছে! উপরন্তু একপাল জানোয়ারের হাত থেকে অনেক মানুষের প্রাণরক্ষা করেছে সে।

ভোলার বুকের পাটা উঠছে আর নামছে, ঘেমে গেছে সর্বাঙ্গ, কুতকুতে চোখ দুটি থেকে বেরচ্ছে বিদ্যুতের ছটা, অনবরত; আনন্দ তৃপ্তি আর উল্লাসের ভাব মিশেছে দৃষ্টিতে। প্রাইমারি স্কুলের বারান্দাটার শাল খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ধুলোর উপর বসে পড়ল সে।

ভোলার মা ছেলের পিঠ থেকে মাথা, মাথা থেকে পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে, গামছা দিয়ে হাওয়া করে চলেছে। মাকে সান্ত্বনা আর সাহস জুগিয়ে চলেছে। মায়ের হাত থেকে গামছাটা নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে আবর্তিত করে বুক, মাথা ও পিঠে হাওয়া করতে লাগল। ইতিমধ্যে লণ্ঠন, কুপি, হ্যারিকেন, টর্চ প্রভৃতি নানান ধরনের আলো স্কুলঘরের দিকে ছুটে এসেছে। দাবি জানাচ্ছে অনেকেই—তারা দেখতে চায় ভোলার গামছা বোমাটা। কখন সে বানিয়েছে এমন মারাত্মক বোমা! কেউ জানে না তো!..... ছেলে ছোকরার দল করছে উসখুশ—ভোলার পাশে সযত্নে রক্ষিত লাল গামছা বাঁধা বোমাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখার মতলব আঁটছে। ভোলা কষে ধমক দিল একটা।

সবাই বলে উঠল, 'দেখাও—ওটা দেখাও। গামছা খুলে দেখাও; দেখব আমরা।'

ভোলা বিশেষ সযত্ন পরিপাটির সঙ্গে গামছার অনেকগুলো ফাস-গেরো একে-একে খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল তার প্রিয় খৈনির কৌটোটা। গামছাটা কয়েকবার ঝেড়ে দেখিয়ে দিল, নাঃ, আর কিছু নেই। হো হো শব্দে হেসে উঠল উপস্থিত সকলেই।

শেষ করল শিউপ্রসাদ তার গল্প! আমরা সবাই শুনছিলাম বিভোর হয়ে। কয়েক জোড়া হাঁটু যুক্ত হয়ে অনেকটা গোরুর গাড়ির চাকার মতো দেখাচ্ছিল।

'মার্ক্সবাদী' তরুণ লেখকটি যে নিজেকে গোর্কি-লুশুনের উত্তরাধিকারী মনে করে, সে প্রথমে চশমার নীলচে কাচের পেছন থেকে সূক্ষ্ম নজর হেনে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'এটাকে শ্রেণী সংগ্রাম বলে না; এ হল জনগণ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মানুষের সংগ্রাম।'

সরকারি কর্মচারীটি বলে তেরছা মুখভঙ্গিতে—'শত্রুকে আমরা বড়ো করে তো দেখবই না, এমনকি ছোটো করেও দেখব না। এ গল্প নীতিহীন, অবাস্তব। আর যদি বাস্তবে কোথাও সম্ভব হয়েও থাকে, গল্পে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হয়নি।'

তারপর সে স্তালিন থেকে গড় গড় করে উদ্ধৃত করে গেল কয়েক লাইন।

প্রবীণ ভদ্রলোক যার মুখমণ্ডলে অনেক অভিজ্ঞতার এলোমেলো ভাঁজ—সে শিরদাঁড়া সোজা করে নিল বার কয়েক। একটা গোল্ড ফ্লেক চেপে ধরল ঠোঁটে, লীলায়িত মুদ্রায় নাটকীয় কায়দায় জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি স্পর্শ করল সিগারেটের ডগায়—সামান্যতম ছোঁয়াচ। পৃথিবীটা সে এক নাট্যমঞ্চভাবে বলে স্বভাবসুলভ নাটকীয় সুরে বললে, 'দেখুন মিঃ পরসাদ, এসথেটিক সেন্স, মানে নন্দনতত্ত্ব জানা থাকলে হয়তো গল্পটা উত্তীর্ণ হতেও পারত। একে তো এখানে—বুঝলেন কিনা—এলিমেন্টারি দিকটা অবর্তমান, তার উপর নন্দনতত্ত্বের প্রকট ঘাটতি। কী বলছেন, তার চেয়ে বড়ো কথা কীভাবে বলছেন।' তারপর কয়েকবার শুকনো গলায় নিপুণ কৌশলে কাশল ভদ্রলোক—ট্রেনটা লাইন বদল করার জন্য এ সময়ে কাশির ব্যঞ্জনাটা লুপ্ত হয়ে যায়।

ছোকরা অধ্যাপকটি সবাইকে ছাত্রের মতো ধমকে উঠল, 'আরে মশাই, গাঁজার কলকেতে ফুটপাথের পাশে টান মেরে কি টাটকা টগবগে রগরগে জীবনের গল্প বলা যায়? আপনারা আজকাল পড়েছেন ছোটোলোক নিয়ে। সে যাক গে! মিঃ পরসাদ এই নিরাপদ ট্রেন জার্নিতে যা বলেছেন সবই মানিয়া গেছে। আমরা চলছি না—মাটিতে না—আকাশে—সুড়ঙ্গ—'

—মাটিতে পা দিলেই ভুলে যাব। শেষ করল সরকারি কর্মচারীটি।

প্রসাদ আর কিছুই বললে না। বললে না—আরে মশাই আমার নিজের চোখে দেখা! সে কেবল হাসতে লাগল, সপ্রতিভ যুবকের মতো!

অপরাপর যাত্রী জিনিসপত্র গুছতে শুরু করে দিয়েছে দেখে আমরাও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। সামনেই আসছে আমাদের সকলের অভিপ্রেত স্টেশন দিল্লি! □

খোদহাটির ডাক

ব্রজেন মজুমদার

সকাল থেকেই প্রতীক্ষা করে আছে মানুষটার জন্য। ধীরে ধীরে রাত বেড়ে উঠেছে। এখনও তার পাত্তা নেই। মাথাটা টিপ টিপ করছে সোনার। কালু গুণ্ডার 'কালা বল্লমের' খোঁচায় বাহুসন্ধির যেখানে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গেছে, এখন তা থেকে যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে। তবু সোনাকে বেরতে হল। রাধিকা গিয়েছিল কৃষক সমিতির সদর অফিসে। সে ফিরে এসে সতীশের বাড়িতে যাবে। সোনার বাবাকে ঘুরতে হচ্ছে লাটে লাটে।

কিন্তু এতক্ষণে তো তার ফেরা উচিত। একা সোনা কী করবে না করবে বুঝে উঠতে পারছে না। গামছা আর লাঠিটা নিল সোনা। গোয়ালের দিকে গেল একবার। কালো বলদটা জখম হয়েছে বল্লমের খোঁচায়। সাদাটি জোয়াল ছিঁড়ে লাফ মেরেছিল লাঠালাঠি দেখে। খাল টপকাতে গিয়ে কাদায় পড়ে পা মচকেছে।

পাঁচজোড়া হাল মাঠে নেমেছিল। লাঙল গুঁড়ো হয়েছে তিনখানি। মাথা ফেটেছে এ পক্ষে নকুল ঘরামির, ওপক্ষে গোটা দশ ঠেঙাড়ের।

এখন খোদহাটির মাঠ, পথ থমথম করছে। খোদহাটির মাঠের বাইশ নম্বর দাগের জমিটাতে একটি পতাকা দুলছে। অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে আছে যেন কী এক শঙ্কার ছায়া। সেখানে একটা পাহারা বসাবার কথা ছিল। কিন্তু কেউ এখনও যায়নি। তেপান্তরের ধুধু মাঠ। খোদহাটির চারদিকের গ্রামগুলো স্তব্ধ হয়ে আছে। মৌন শঙ্কায়, না গূঢ় প্রতিজ্ঞায়!

সোনা সতীশের দাওয়ায় উঠে লাঠি ঠুকল। তার বিশাল শরীরের দিকে সবাই কী কারণে একবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। বোধ হয় আগের দিন খোদহাটির মাঠে সোনার অসীম শক্তিমত্তা এবং সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকবে এবং সোনাকে দেখে তাদের সে কথা মনে পড়ল।

সতীশের ঘরে জমায়েত হয়েছে রাধিকা, পঞ্চা, কৈলাস, হলধর এবং আরও অনেকে। সতীশ বলছে, 'ভাই রে, বিপদ যে সাঙ্ঘাতিক। কালকেরে মাঠে লাঙল ফেলতে দেবেনি।'

সতীশের কথাবার্তা এমন হতাশাব্যঞ্জক যে পঞ্চা খেপে উঠে বলে, 'কোন সুমুন্দির ব্যাটা—'

সতীশ বোঝাতে চেষ্টা করে যে সে ফালতু কথার পাত্র নয়, কাটিপোতার শিবুদা বলেছেন, দক্ষিণ খোদহাটিতে কাল জোতদারদের 'মিটিন' বসেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল কিশোরী নস্কর, হরিধন মুখুজ্যে, কানা শশী, ভূপতি মণ্ডল আর জমিদারমশাই। আরও ছিলেন অঞ্চল প্রধান, শক্তি সরকারের পাঁচজন গুণ্ডা-সর্দার আর একজন এম এল এ।

পঞ্চা এই সব জাঁদরেল নামের ফিরিস্তি শুনে মিইয়ে যায়। কিন্তু রাধিকা শান্তভাবে প্রশ্ন করে, কী চায় তারা?'

'নাবাল মাঠে পাঁচশো ঠেঙাড়ে নামাবে। চককলামান, কাটিপোতা খোদহাটির মাঠে হাল ফেলতে দেবেনি।'

কৈলাস হুঁকো টানছিল, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ওরা পাঁচশো, আমরা হাজার—হাজার।'

সতীশ বলল, 'এবার আর বল্লম আর হেঁসো নয়, বন্দুক বোমা ইত্যাকার সব—'

কৈলাস খেপে উঠে বলল, 'ধ্যেৎ তোর নিকুচি করেছে, বন্দুক—!'

তখন রাধিকা শান্তভাবে বলে, 'শোনো তোমরা, এভাবে মাথা গরম করলে স্রেফ মারা পড়বে। জমি-টমি পাওয়া যাবেনি। পাগল, না মাথা খারাপ? বন্দুকের সঙ্গে লড়বে দা-কুড়োল আর বল্লম নে। তাতে আর কিছুই লাভ হবেনি, জমির লড়াইটাই বরবাদ হয়ে যাবেনে।'

কথাটা এমন বিভ্রান্তিকর যে সবাই প্রথমত হকচকিয়ে গেল। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তখন সোনা বললে, 'তা হলে কী করতে হবে?'

রাধিকা একটা বিড়ি ধরায়। অতি শান্তভাবে বলে, 'আইনের সহায় নিতে হবে।'

সোনা বলে, 'সব গোলমেলে কথা বলছ কেন। আইনের সাহায্য চাষিরা কবে পেল? খোদহাটির মাঠের জমি হরিধন মুখুজ্যে ডাণ্ডা মেরে কেড়ে নিতে চায়। তা হরিধন মুখুজ্যের গুণ্ডাগুলোকে পিটিয়ে না তাড়ালে এ জমিটা দখল হবেনে কিসে?'

'হবে হবে! তার রাস্তা আছে। কাশীবাবু এইয়েছেল আজ সকালে। বলি গেল, খপদ্দার, হঠকারি কোরোনি। খুব চিন্তা করি কাজ করতি হবে। ওদের শক্তি প্রচণ্ড শক্তি। ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার খ্যামতা আমাদের হয়নি এখনও। যতদিন না হচ্ছে ততদিন নরমে গরমে চলতি হবে। তা না হলি একেবারে পিষে ফেলবে ওরা।'

কৈলাস, হলধর এবং পঞ্চা বেজায় অস্বস্তিতে নড়াচড়া করতে লাগল, মশা মারতে লাগল, মাথা চুলকোতে লাগল। এমন তো কথা ছিল না। সোনা খানিকটা ক্রোধ দমন করে বললে, 'সেই পুরনো কাসুন্দি! ও সব বস্তাপচা বোলচাল ছাড়ো। জমি রক্ষা কবব, লড়াই করবোনি—এ সব সুবিধাবাদী কথা। মতলব খারাপ।'

রাধিকা আরও শান্তভাবে বিড়ি টানতে থাকে। এবং মুখ টিপে টিপে হাসে। বলে, 'ভায়া, এটা তো আমার কথা নয়। সমিতির নেতারাই বলছেন। খপর হয়ে গেছে।'

'কী খপর হয়ে গেছে?'

'জমির লড়াই হবে শান্তিপূর্ণ।'

কৈলাস হুঁকো রেখে দিয়ে বলে, 'কে? কোন সুমুন্দির নেতা বলছে?'

রাধিকা শব্দটা চেপে কথা বলে। চকিত মোলায়েম কণ্ঠস্বর। বলে, 'কাশীবাবু—শিবদাস—'

অমনি লাফিয়ে ওঠে পঞ্চা। 'রাখ্ তুই, ওই শ্যালার বেটা বাবুদের দেখে আসছি গত বিশ বছর।'

রাধিকা পঞ্চাকে চুপ করাবার জন্য ফস করে বলে, 'ঠিক।'

পঞ্চা তার সমর্থন পেয়ে খুশি হয়ে বলে, 'স্বীকার করো, আমরা বারে বারে এভাবে পড়ে পড়ে মার খেতে পারিনে।'

রাধিকা বলে, 'সে কথাই তো বলছেন নেতারা। মার খেয়েই যদি ফৌত হয়ে গেলুম, তবে আন্দোলনটা করবে কে? সের জন্যি বলা হচ্ছে, আন্দোলন এমন কায়দায় চালাতে হবে, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। এ তো ভাই খুব সোজা কথা।'

রাধিকার সোজা কথার অর্থ কী, সোনা বুঝতে চেষ্টা করে। সংশয়ে তার চোখ দুটো আকুল। সোনা বলে, 'রাধিকা তুমি কি গেঁজাতে এসেছ?'

রাধিকা ভাবে পঞ্চা এবং তার সঙ্গীদের সে বোঝাতে পেরেছে। সতীশ তো কাবু হয়ে আছে আগেই। পঞ্চাকে হাত করতে পারলে সোনাকে ল্যাঙ মারা সম্ভব।

রাধিকা পঞ্চার দিকে ফিরে বলে, 'এবার তোমরাই জবাবটা দাও।'

সোনা বলে, 'জবাবটা আমিই দিচ্ছি। আন্দোলন যেভাবে শুরু হয়েছে, সেভাবেই হবে, এর অন্যথা হবেনি।'

রাধিকা চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'তা তো আর হওয়ার নয় ভাই। ও দিকে যে খপর হয়ে গেছে।'

সে কথা শুনে পঞ্চা আর কৈলাস লাফিয়ে উঠে বলে, 'মারো গুলি আন্দোলনের মুখে। যা করে জমি পাবনি তার মধ্যে নেই আমবা।' সতীশ থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিতর্কটা থামে না। ইতিমধ্যে কেউই খেয়াল করেনি, সতীশের দাওয়া ভরে উঠোন ছাপিয়ে গেছে লোকে। বিতর্কিত বিষয়টা ঘুরপাক খেতে খেতে মুখে মুখে একটা অনিশ্চিত টালমাটাল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে একসময় একটা আওয়াজ উঠল, 'মধু মাহাতো কোথায়? মধুদা? ও সব কাশীবাবু-টাশিবাবু বুঝি না, মধু মাহাতো যাই বলবে তাই হবেনে!'

তারা তখন সোনার মায়ের কাছে খবর পাঠিয়ে মধু মাহাতোর অপেক্ষায় বসে রইল। একটু একটু করে রাত গভীর হল। আস্তে আস্তে ভিড় ভাঙল। ঘুমে ঢুলতে লাগল হলধর। কৈলাস ভূতের গল্প জুড়ে দিল। রাত দুপুরের কুরোল ডাকতেই সোনার মা খবর পাঠাল, সোনার বাবা ফেরেনি।

সোনা মাথায় গামছাটা পাকাতে পাকাতে বললে, 'তবে তো আমায় একটু যেতে হয়।' লাঠিটা বাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তৈরি থাকো তোমরা। মধু মাহাতোর খোঁজে চললুম আমি।'

খোদহাটির মাঠে নেমে সোনা একবার আড়চোখে তাকাল আকাশের দিকে। কোদালকাটা মেঘ জমেছে থরে থরে। অন্ধকার পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে। সামনে খোদহাটির মাঠ আড় হয়ে আছে। দক্ষিণে আটমরার খাল। খালের ধারে মুখুজ্যের আবাদ। তার থেকে বেরিয়েছে আর একটা ফালি, যাকে বলে চককলার মাঠ। কাটিপোতার খাল গেছে মাঝ বরাবর। বামে তাড়দহের অংশ এবং ভগবানপুরের নাবাল জমি।

সোনা ভাবল, আগে সে ভগবানপুরে যাবে কৃষক সমিতির অফিসে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে খানিকটা মেঠো চর পার হয়ে ভেড়ি পথে উঠল। একা পথ চলতে সোনা ভয় পায় না। তবু লাঠিটা রাখে সঙ্গে: একা পথ চলতে গেলেই সোনার মনের ভাবনাগুলো আগুপিছু সঙ্গী হয়। কত ভাবনাই যে ভিড় করে। এই উদার বিস্তৃত প্রশান্ত মাঠের মতোই সোনার মনটা। আবার তেমনি ভেড়ি-বাঁধ, খাল-নালার বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কত যুগ ধরে তা কে জানে!

মুখুজ্যের আবাদের কাছাকাছি এসে সোনা তার জমির দিকে তাকায়। সেখানে কয়টা লোক বোধ হয় পাহারা দিচ্ছে। এই আবাদে প্রায় আড়াইশো বিঘা জমি। সব জমিই খোদহাটির চাষিদের। দুই পুরুষ আগেও ছিল তাই। তার মধ্যে সোনার ঠাকুরদার জমি ছিল পঁচিশ বিঘে। সোনার বাবার জমি ছিল ছয় বিঘে। এখন এ জমির দখল নিয়ে বিরোধ বেধেছে। দেওয়ানি মামলার রায় সোনার পক্ষে থাকা সত্ত্বেও চাষ ফেলতে গিয়ে দাঙ্গা করতে হচ্ছে। এ জমি নিয়ে এখন বিরোধ চরমে উঠেছে।

বিরাট মেছো ভেড়িটা নিঃসাড়। সোনা জোরে জোরে পা ফেলে। দীর্ঘ ময়ালসাপের মতো ভেড়ির খালের বাঁধ পড়ে আছে। মাছের ঘাই আর লেজের ঝাপটা শোনা যাচ্ছে ইতস্তত। প্রায় আড়াই হাজার বিঘে জমি আল বেঁধে খাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এখন ভেড়ির জমিতে আবাদ।ফসল উঠবে কিশোরী নস্করের খামারে। চাষ উঠলেই পাম্প করে ময়লা জল তুলে পোনার চাষ ফেলে দেখানো হবে সমস্ত জমিটাই মেছো ভেড়ি।

খোদহাটির মাঠের যেখানে শেষ সেখানে শুরু হয়েছে মেছো ভেড়ি। একটির পর একটি ভেড়ি। উত্তরে ভগবানপুর থেকে দিয়াড়া পর্যন্ত। ভগবানপুর থেকে ক্রমেই জমি নিচু হতে শুরু করেছে। ডোঙাসোড়ার খাল, করের খাল, জলনিকাশি খাল দক্ষিণে নেমে গিয়ে পড়েছে টালির নালায়। টালির নালা বরাবর বাগ্‌দিরা বাস করে নিচু জমিতে। অথচ উত্তর অঞ্চলের সমস্ত জমিতে মেছো ভেড়ি। সেচের খালকে কায়দা করে জমির পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। উঁচু উঁচু আল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। শত শত বিঘে আবাদি জমি জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যুগের পর যুগ। সোনার বুকটা টন টন করে ওঠে এ সব কথা ভাবলে। এই কালো কালো ভূতুড়ে বাঁধগুলো যেন বহু দানবের কঠিন বাহুর মতো পৃথিবীর কণ্ঠরোধ করছে। বিরোধ বেধেছে তাই। ওই কালচে রঙের আবাদি মাটি, যার মধ্যে তার পূর্বপুরুষের চোখের জল আর হাজার হাজার চাষিবউয়ের লক্ষ্মীর পট চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, সে মাটি মুক্ত করতে হবে।

সোনা এ সব চিন্তায় উন্মনা হয়ে যায়। এক পলকের জন্য সে একবার থমকে দাঁড়ায়। দু পাশে হোগলার বন, বুনো ঘাসের ঝোপ। জলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। দীর্ঘদেহী সোনাকে মনে হচ্ছে মাঠের সম্রাট। অনেকটা দূরে কয়টা খড়ের চালের 'আলা'। টিমটিমে লণ্ঠন বাতাসে দুলছে। পাহারা আছে। মনে হচ্ছে পাহারার জন্য বেশ কিছু ভাড়াটে গুণ্ডা মোতায়েন আছে। তবু সোনা নির্ভয়ে হাঁটে। কারণ ভয়টা তো ওদেরই। ওদের যে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর খোদহাটির মাঠ থেকে হাঁক দিলে সোনার কণ্ঠস্বর অনেক সময় টালির নালা এমনকি বিদ্যাধরীর চর পর্যন্ত যায়।

সোনা ভগবানপুরে এসে কৃষক সমিতির অফিসটা বন্ধ দেখতে পেল। কারণ কী? সটান গগন মাঝির ঘরের দরজায় গিয়ে ঘা মারল। লোকটার অনিদ্রা রোগ থাকায় এক ঘায়েই কাজ হল। প্রশ্ন করল, 'কে?'

আত্ম-পরিচয়ে উৎসাহ নেই সোনার। জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা এইয়েছিল?'

'কে? কার বাবা?'

সোনা বলল, 'মধু মাহাতো। তোমাদের মধুদা গো।'
গগন ধড়মড়িয়ে উঠে বাইরে এসে দাঁড়াল।
'কেন? কী ব্যাপার? আসেনি তো।'
সোনা বলল, 'কাল খোদহাটির মাঠে নামা হবে তো?'
গগন চুপ করে রইল। সোনা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।
'বাবার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল?'
গগন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'মধুদা তো ঠিকই বলেছে, কিন্তুক—'
'বলেই ফ্যালো না, কী হয়েছে।'
গগন আরও জড়সড় হয়ে বলল, 'সদর সমিতির অফিস থেকে—'
'বুঝলুম, লড়াই হবেনি।'
গগনকে নিরুত্তর দেখে সোনা হাঁটা ধরল। ভগবানপুর থেকে সে দেউড়িয়াতে এসে ভুবন মণ্ডলকে ডেকে তুলল। ভুবন কোনও বিপদের আশঙ্কায় ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ে বলল, 'কী ব্যাপার? অতো রাত্তিরে?'
'বাবা এইয়েছে?' সোনা জিজ্ঞাসা করল।
ভুবন বললে, 'না তো।'
'গেল কোথায়? এখনও যে বাড়ি ফেরেনি!'
ভুবন বললে, 'তেউড়েতে একটা সভায় থাকার কথা ছেলো কাল। সভা করে বাড়ি ফেরার কথা।'
'ফেরেনি। ইদিকে খোদহাটির মাঠে কাল লাঙল ফেলতে হবে। নস্করের ভেড়ি কেটে জমি দখল নিতে হবে। তোমার যাচ্ছ তো?'
ভুবন নিরুত্তর।
'কী গো, পড়ে পড়ে মার খাব?' সোনা প্রশ্ন করে।
ভুবন যেন কাতরে উঠে বলে, 'আমাকে বলে কী হবে ভাই!'
সোনা একবার হতাশভাবে তার মুখের দিকে তাকায়। তারপর হাঁটা ধরে।
তেউড়ের কৃষক সমিতির ঘরে একটা লোক থাকে। কিন্তু আজ সে দরজা বন্ধ করে চলে গেছে। সোনা গিয়ে দাঁড়াল হারান মালোর উঠোনে।
'কে আছ? বাড়িতে কে আছ?' সে হাঁক পাড়ল!
প্রায় সব কটি ঘরের ঝাঁপ খুলে গেল একসঙ্গে। জনাকয় পুরুষ এবং নারী সোনাকে ঘিরে এসে দাঁড়াল।
'মধু মাহাতো আছেন? মধু মাহাতো?'
'কে তুমি?'
'আমি সোনা। তার ছেলে।'
'মধু মাহাতো কালই তো চলে গেল।'
'তোমরা কি খোদহাটির মাঠে যাচ্ছ?'
সবাই একসঙ্গে বলল, 'না।'
অন্ধকারে সোনা ঘুরে দাঁড়াল নিজের অসহ্য ক্রোধ দমন করার জন্যে। সে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু কে যেন পিছু পিছু আসছে। প্রায় ছুটে এসে লোকটা সোনার হাত ধরল। বলল, 'আমি নিরুপায় ভাই, আমি নিরুপায়।'
সোনার মুখে কথা ফুটল না।
সে তেউড়ের মধ্য দিয়ে দিয়াড়া পেরিয়ে সটান নয়াবাদে এসে হাজির হল। নয়াবাদের কৃষকসমিতি কাশীবাবুর বাড়িতেই। একতলা একটি ছোটো পাকা বাড়ি। কাশীবাবুর সিঁড়ির ধারে লাঠিটা পড়তেই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল গোটা তিন কুকুর। সেই শব্দে কাশীবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। সোনা বারান্দায় উঠে গম্ভীর গলায় বলল, 'কাশীবাবু, আপনি একবার বাইরে আসুন।'

ঘরে নিবু নিবু আলোটা দপ করে জ্বলে উঠল। দরজা না খুলেই কাশীবাবু জানতে চাইলেন, 'কে কথা বলছে?'

সোনা বলল, 'আমি মধু মাহাতোর ছেলে সোনা।'

কাশীবাবু দরজাটা খুলে দিলেন। বললেন, 'ভেতরে এসো।'

সে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ঠিক আছে, আমি এখানেই দাঁড়াই। জিজ্ঞেস করতে এলুম, বাবা আছেন নয়াবাদে?'

কাশীবাবু ঘরের দরজার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'না। সে কাল এসেছিল। তাকে নিরস্ত করা গেছে!'

সোনা বলল, 'বুঝতে পারছি নে। পষ্টাপষ্টি বলো।'

কাশীবাবু চটে উঠে বললেন, 'এটা বুঝতে না পারার কী আছে? একটা হট্টিচট্টি পাকাবার মতলব করছিল। বুঝিয়ে বারণ করে দিলুম।'

'তবে কি খোদাহাটির মাঠে লাঙল পড়বেনি?'

'পড়বে না কে বললে? যথারীতি লাঙল পড়বে। তবে অস্ত্র হাতে কেউ মাঠে যাবে না।'

'বেশ কথা বললেন! ওখানে পাঁচশো গুণ্ডা ছোরা বল্লম আর বোমা বন্দুক হাতে করে ওত পেতে বসে আছে। আর তুমি ব্যোম ভোলানাথের মতো সেখেনে গিয়ে লাঙল ফেলবেন!'

কাশীবাবু একটা সদ্য গোঁফ-ওঠা ছোঁড়ার ঔদ্ধত্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তার তালগাছের মতো চেহারাটি এবং চোখমুখ পাকানো দেখে ভয় ভয় করতে লাগল। বললেন, 'এই তো সব বুঝতে পারছ। ওদের পাঁচশো গুণ্ডা, লাঠি, ছোরা, বোমা, বন্দুক—এ সবের মোকাবেলা করতে পারবে?'

সোনা বুঝল, লোকটা পাশ কাটাতে চায়। সে পালটা প্রশ্ন করল—"তাই যদি বুঝলেন, তবে 'যথারীতি' লাঙল ফেলবাব উপদেশ দিচ্ছ কেন?"

কাশীবাবুর মগজটা চন্‌চন্ করে উঠল। ছোঁড়া 'যথারীতি' কথাটায় জোর দিয়ে তাঁকে শ্লেষ করছে। তেড়ে উঠে বললেন, 'আমি কি বলেছি ওখানে গুণ্ডা মোতায়েন আছে? গুণ্ডা কথাটা তো তুমিই বললে!'

রাগে সোনার নাকখানি ফুলে ফুলে উঠল।

'তা হলে আপনি কি বিশ্বাস কব না যে খোদহাটির মাঠে গুণ্ডা মোতায়েন আছে?'

কাশীবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না। বিশ্বাস কবি না। ও সব তোমাদের বাড়িয়ে বলা। খোদহাটির জমিদারের অমন সাহস নেই।'

সোনা এবাব গবম হয়ে বলল, 'আপনি বড়ো বেযাড়া লোক মশায়। খোদহাটির বাধিকাকে ভয় দেখালেন ওদের প্রচণ্ড শক্তিব কথা বলে, আবার এখন বলতিছেন ওদের সাহসই নেই।'

কাশীবাবু এরকম অভব্য জেরায় প্রায় দিশা হারিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হ্যাঁ, শক্তি আছে বটে, তবে সাহস নেই।'

অকাট্য যুক্তি!

কাশীবাবু তারপর স্বর নামিয়ে বলেন, 'শোনো, জমিতে লাঙল দেবে। কিন্তু দাঙ্গা করতে পারবেনি। চিরকাল যেভাবে চাষ কবতে, সেইভাবে চাষ করবে। কোনও জমিদারের বেটা জমিদারের সাধ্য নেই, চাষিদের উচ্ছেদ করে।'

'চিবকাল আমরা তো বর্গাচাষি।' সোনা প্রশ্ন করে, 'এখনও তাই করতে বলছেন, তো ফয়দাটা কী হল? চাষির জমি কি চাষি ফেরত পেল?'

কাশীবাবু চোখ বুজে ধীরেসুস্থে বললেন, 'বর্গাচাষিরা সব উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল। সেটা ঠেকানো গেল। সমস্ত জমিতে চাষের অধিকার চাষির আছে। এর ভিত্তিতে সমস্ত জমিতে লাঙল ফেলবে, জমি দখল করবে। এখানে মারপিটের কোনও প্রশ্ন নেই।'

সোনা বললে, 'অর্থাৎ, চাষের জন্যি জমি দখল! মালিকানাব জন্যি নয?'

কাশীবাবু দ্রুত বললেন, 'তা একই হল! দখল মানেই দখল। হাজার হাজার বিঘে জমি এইভাবে একদিন দখল হয়ে যাবে।'

সোনা বললে, 'কিন্তু ওরা তো আপনার মতো বুঝবেনি! ওরা ভাববে, আমরা মালিকানাই দখল করছি। তেখন যদি খেতের উপর আমাদের লাশ ফেলে দেয়?'

কাশীবাবু আবার চোখ বুজে ফেললেন। 'না, তবু দাঙ্গাবাজি নয়! কারণ তাতে ওদেরই সুবিধে।'

'অর্থাৎ গরিব চাষিকে মার খাওয়াতে চাইছ কাশীবাবু?' সোনার স্পষ্ট কথা।

কাশীবাবু এবার রেগে বললেন, 'শোনো ছোকরা! কেবল লম্বা কথায় বিপ্লব হয় না। মার দেওয়ার ক্ষমতা হয়েছে তোমার? খোদহাটির মাঠে তো বীরত্ব ফলিয়ে আসবে! তারপর যে তামাম এলাকাটা জুড়ে পুলিশ মিলিটারি আর ঠেঙাড়েরা ভূষণ্ডির মাঠ বানাবে, তখন তোমার বাবা এসে রক্ষা করবে আমাদের?'

'বাঃ!' সোনা বিস্ময় প্রকাশ করল। 'এখনই আত্মরক্ষার ভাবনা? কিন্তু এই যে বললেন, ওদের মোটে সাহস নেই!'

'সাহস নেই, সাহস হবে! ঠেঙাড়ের সহায় হবে পুলিশ-মিলিটারি। সাহস হবে না?'

'তেমন তো কথা ছিল না। পুলিশ-মিলিটারি তো আমাদের সহায় হবে কথা ছিল।'

'তা বলে জোতদার-জমিদারদের হামলা করতে ডেকে নিয়ে আসবে যে সব উগ্রমস্তিষ্কের দল, তাদের সহায়তা করে বিপ্লবকে বরবাদ করার কথাও বলা হয়নি।' কাশীবাবু উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন!

সোনা বলল, 'কাশীবাবু, আপনাদেব বুঝতে পেরেছি! আজ খোদহাটির চাষির মাথায় যখন জোতদারের লাঠি ভাঙছে, তখন আপনারা চাষির হাতের লাঠি কেড়ে নিচ্ছ। আপনারা যদি বিশ্বাসঘাতক না হও, তবে বিশ্বাসঘাতক কে?'

সোনা সদর্পে লাঠিটা ঠুকল। ঘরের চারদিকে তখন উচ্চ বাদানুবাদে আকৃষ্ট এ ঘরের সে ঘরেব কয়েকজন লোক জড় হয়েছে। কাশীবাবু হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। বিশ্বাসঘাতক অভিযোগটা তাঁর সমস্ত সত্তাব মূল ধরে নাড়া দিল। নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বললেন, 'বাছা, তোমার সঙ্গে আমি আর তর্ক করতে চাইনে। জোতদারদের সঙ্গে একটা আপস-রফা হচ্ছে। তাতে তোমাদের ওপর হামলার কোনও ভয় নেই।'

সোনা আরও অবাক হয়ে বলল, 'আপস-রফা! সেটা কী করে সম্ভব?'

'হ্যাঁ সেটা সম্ভব। ওটা রণকৌশল! ও সব তোমার বুঝতে দেরি হবে। তোমার বাবাকে আমি সব বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়েছি।'

সোনা বলল, 'আমার বাবাকে আপনি কী বোঝাবেন?'

'কেন, তোমার বাবা কি লেনিন-স্ট্যালিন নাকি?'

'এই সব কথা সে বুঝে চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, সে সমিতির সিদ্ধান্ত মেনে, সেইমত কাজ করতে গেছে।'

'আমি বিশ্বাস করিনে।' সোনা ঘাড় সোজা করে দাঁড়াল।

'বেশ তো! বাবার সঙ্গে দেখা করে জেনে নাও।'

এই বলে কাশীবাবু বিছানায় গিয়ে বসলেন।

সোনা বলল, 'কিন্তু এভাবে পিঠের চামড়া বাঁচাতে পারবেন ভেবেছ? শত্রুকে বলে দিলেন যে আমরা দুর্বল? ওরা আর বেশি দেরি করবেনি। এবার কারও রেহাই নেই কাশীবাবু। কোনও সুবিধেবাদী যদি কেটে পড়বার তাল করে, তবে সে গুড়ে বালি!'

কাশীবাবু শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আবার চমকে সোজা হয়ে বসলেন। সোনা প্রচণ্ড বেগে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু খানিক দূর যেতেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সোনার মন দোল খেতে লাগল। বাবার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা। বাবা কাশীবাবুর কথা মেনে নিয়েছে, এ কথাটাই বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারছে। এটা কী করে সম্ভব? সে যা মানতে পারল না, বাবা কীভাবে তা মেনে নিলে? তা হলে কি সোনা ভুল পথই বেছে নিয়েছে? কিন্তু এটা তো সবাই চাইছিল! সবাই বলছিল, এ ছাড়া আর পথ নেই! এখন কী হল মধু মাহাতোর? উলটো দিকে হাঁটা কেন তার? বুড়োহাবড়া রক্ত ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে নরম করে ফেলেছে সব? ভোঁতা মেরে গেছে জ্বালা-যন্ত্রণা-ঘৃণা? ভাবতে ভাবতে সোনা ক্লান্ত বোধ করে। বল্লমের খোঁচাব যন্ত্রণাটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। মাথাটা টিপ টিপ করছে ফের।

কিন্তু এটা তো চুপচাপ হজম করে মুখ বুজে বাড়ি ফেরা যায় না। একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে এই বেলা। কোথায় মধু মাহাতো? কোথায় সে উলটো কথা বলে জল ঘোলা করছে? নিজের মুখে নিজে কালি মাখাচ্ছে!

সোনা আর একবার জোরে হাঁটবার তাকত বোধ করল। ডোঙাসোড়ার খাল ধরে সে দক্ষিণে হাঁটা ধরল। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে উঠল গিয়ে খেয়াদহে।

'কে আছ বাড়িতে? কে আছ?' সোনা জিজ্ঞেস করল, 'মধু মাহাতো আছে খেয়াদহে? তোমাদের মধুদা?'

'না। মধুদা আসেনি তো!'

বিদ্যাধরীর চর ফেলে সোনা দক্ষিণে ঘুরল। দুই নম্বর সাহেবের আবাদ পেছনে ফেলে এসে দাঁড়াল কাটিপোতায়।

'কে আছ বাড়িতে? কে আছ? কাটিপোতায় মধু মাহাতো আছে? তোমাদের মধুদা?'

'না তো! কাটিপোতায় তো মধু মাহাতো আসেনি!'

কোথায় গেল মধু মাহাতো! সোনার মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। কাটিপোতা ছেড়ে সে গড়পাড়ে ঢুকল, খোঁজ না পেয়ে দক্ষিণ তেউরিয়ায় গেল। সেখান থেকে আটমরা, কামডহরি, চকশ্রীহরি ঘুরে সোনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কোথাও পাত্তা নেই মধু মাহাতোর। কাল কাশীবাবু তাকে 'নিরস্ত' করে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আর কোথাও সে যায়নি। ভোল পালটে, যে কৃতকর্মের দায় সারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সে পালন করেনি। তবে কি ডুব মেরে আছে লজ্জায়? এ সব নানা ভাবনায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে এসে দাঁড়াল খুঁড়িগাজির হাটখোলায়। সে খেয়াল করেনি, তার আশপাশ দিয়ে কয়েকটা লোক একবার সামনে গেল, আবার পেছনে এল। হঠাৎ শব্দে সে চমকে উঠল—'কে যায়?'

সোনা চকিত ক্ষিপ্রতায় নিজেকে প্রস্তুত করে দাঁড়াল। বলল, 'তোমরা কে?'

লোকগুলো পায়ে পায়ে কাছে সবে এসে দাঁড়াতে সোনা চিনতে পারল। জমিদারবাড়ির পেয়াদা এবং পাহারাদার তিনজন।

একজন বললে, 'কে? খোদহাটির সোনা মাহাতো?'

সোনা ধমকে উঠে বললে, 'সাবধান!'

আর একজন বললে, 'মস্ত বড়ো বীর দেখছি!'

সোনার ভাবভঙ্গি দেখে আর একজন বললে, 'যাও বাবা, যাও!'

হাটখোলা ছেড়ে পিচের রাস্তা ধরে মাইল খানেক যাওয়ার পর হঠাৎ কেউ যেন খুব কাছে থেকে সোনার নাম ধরে ডাকল। সোনা ঘুরে দাঁড়াল। সেই পেয়াদাটি, খোদহাটির সোনা মাহাতোকে যে চিনতে পেরেছিল, ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল।

'ভাই, বাহ্যি করব বলে কেটে পড়লুম। খপর খারাপ! মধুদা—এ পর্যন্ত বলে সে ভয়ার্ত শেয়ালের মতো সামনে পেছনে দেখে নিয়ে বলল—'গুমঘরে! আজকেরি আত্তিরে হাফিজ করি দেবে!' তারপর সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সোনার মাথায় যেন ভেঙে পড়ল আকাশ। পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা সরে গেল। মাথাটা ঘুরে উঠল এমন জোরে যে লাঠিটা আঁকড়ে ধরে কোনও মতে নিজেকে সামলাল। তারপর সে দাঁড়িয়ে রইল বজ্রাহতবৎ। এখন কী করবে সোনা? গলা ছেড়ে হাঁক দেবে তল্লাট জুড়ে—'মধু মাহাতো গুমঘরে! জমিদারের কাছারিবাড়ির তলায়—একটা অন্ধকূপের মধ্যে!' কিন্তু চিন্তাশক্তি ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেছে। সোনা ভাবল, এই রকম কিছু করাই হবে ভুল। তাতে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। তার চেয়ে গ্রামে ফিরে যাক সোনা। খবর দেওয়া যাক চতুর্দিকে। তারপর দেখা যাক, কী করা যায়।

কিন্তু এভাবে বেশি দূরে সে অগ্রসর হতে পারল না। এক অস্থির আবেগের প্রবল দোলায় তার বিশাল বুকখানি উঠতে পড়তে লাগল। মনে হল, নিজের ভাবনার সঙ্গে কাজের কত তফাত! কত দেরিই না হয়ে যাবে কাছারিবাড়িতে ফিরে আসতে। মনে হল, সে এক অনন্ত সময়। গুম ঘরে তার পিতার লাশটি পড়ে আছে! তার সকরুণ দৃশ্য কল্পনা করে সোনাব বুকটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। গ্রামে ফেরার কথা কখন সে ভুলে গেল। পা বাড়াল অন্ধকারে কাছারিবাড়ির দিকে।

কাছারিবাড়ির সামনে আসতেই হঠাৎ তার খেয়াল হল, লোকটা ফাঁদে ফেললে না তো? যদি জমিদারদের সঙ্গে একটা আপস-রফাই হয়ে থাকে, তবে মধু মাহাতো গুমঘরে কেন? মধু মাহাতো যদি আপসই করে থাকে, তবে তো আর কোনও লেঠাই নেই! সোনা ভাবল, হৃদয়াবেগে সে হয়তো অন্ধ হয়ে গেছে, তাই সে আগুপিছু চিন্তা করেনি। শেষে বুঝি এখানেই একটা 'হটকারী' করে বসল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সোনা চারদিক দেখতে লাগল। কোনও জনপ্রাণীর আভাস পাওয়া গেল না। কান খাড়া করে প্রতিটি শব্দকে বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঝিল্লির শব্দ আর হাওয়ার ঝরঝরিয়ে পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দই শোনা গেল না। ঘন বাগানের আড়ালে দাঁড়িয়ে সোনা প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। জরাজীর্ণ পলেস্তারা খসা, নোনাধরা দেওয়াল। একটা অংশ ধসে পড়েছে। দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে বট আর অশ্বত্থের চারা বেশ বড়োসড় হয়ে উঠেছে। দূর থেকে এটা প্রকাণ্ড ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়।

সামনের অনেকটা জায়গায় দেওয়াল নেই। সদরের উপর প্রকাণ্ড হাঁ-করা একটা সিংহমূর্তি। যুগের পর যুগ এমনি হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। প্রতিটা ইটের পাঁজরায় কলঙ্কের দাগ—চাবুক খাওয়া চাষির চিৎকার। সোনা অতি সাবধানে কাছারির দক্ষিণ পাশ কাটিয়ে চাতালের ধারে এসে দাঁড়াল। একটা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দালানের দক্ষিণের মহলে ঢুকতে হবে। ওপাশে কিছু তাল নারকেল আর ঘন কাঁটা-ঝোপের বন বাড়ির দক্ষিণ মহল প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এই ঝোপের নীচে মাটির তলা দিয়ে আছে একটা সুড়ঙ্গ। এককালে নদীর সঙ্গে যোগ ছিল। এখন নদী বুজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটিও বুজে গেছে।

সোনা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল। পরপর অনেকগুলো চোরাকুঠুরি। আঁকাবাঁকা গলির মতো একটা বারান্দা। অন্ধকার থমথম করছে। নিঝুম, নিস্তব্ধ। পায়ের শব্দে জেগে উঠছে যেন চিড় ধরা দেওয়াল। বিরাট বেঢপ পোকাধরা বন্ধ দরজাগুলো যেন কোন গূঢ় খবর মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সোনা পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল গুমঘরের সামনে। কোথাও পাহারা নেই। দাঁড়িয়ে সে একটু প্রতীক্ষা করল। আশেপাশে কোন ঘরে কী আছে, বোঝা মুশকিল। কয়টা চামচিকে কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। মস্তবড়ো একটা পুরনো কাঠের দরজা। তাতে প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে।

সব দেখেশুনে সোনা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটি দরজার এ পাশে সোনা, ও পাশে মাটির তলায় তারই পিতার দুমড়ানো দেহ। অসহ্য আবেগে সোনা দরজায় পদাঘাত করল। অমনি স্বাভাবিক শব্দ চতুর্গুণ হয়ে প্রতিধ্বনি তুলল দেওয়ালে দেওয়ালে। হা হা করে উঠল চারদিক। সোনা শিউরে উঠে দরজায় পিঠ দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়াল। প্রতীক্ষা করল। না! আর কোনও সাড়া নেই। কিন্তু কী বোকামিই না করেছে সোনা! লাথি মেরে নিছক ক্রোধই প্রকাশ করা যায়, দরজাটা তো ভাঙবে না। সোনা হাত বুলিয়ে তালাটার ভার বুঝতে চেষ্টা করল। এই তালাটা ভাঙতে পারলে সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে পারে। একটা লোহার শাবল কি একটা রড হলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তা এখন পাবে কোথায়? অগত্যা নিজের লাঠির কুঁদোটা ঢুকিয়ে আস্তে চাপ দিয়ে সে আন্দাজ করল, চাপ সইবে কি না। তারপর আর একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখে নিয়ে সে পুরো চাপ দিল। প্রচণ্ড শক্তি সোনার কবজিতে। জংধরা কড়া দুটো কড় কড় করে শব্দ করল একটা, তারপর তুবড়ে ছিঁড়ে আলগা হয়ে গেল।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল সোনা। গভীর অন্ধকার। একটা বোটকা গন্ধে দম আটকে আসছে। সিঁড়ির ধারে নীচে পড়ে আছে মধু মাহাতোর লাশ। বোধ হয় পিটিয়ে মেরে এখানে গুম করা হয়েছে। নিশ্চিহ্ন করে দেবে একটু বাদেই। সোনা হুমড়ি খেয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরল পিতার শরীর। সে আপস করেনি। আত্মদান করেছে। সোনা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল। আঘাতে আঘাতে মাংস ফুলে উঠেছে। জামা ছিঁড়ে আলগা হয়ে গেছে। সে প্রতিরোধ করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে। সোনা বুকে জড়িয়ে ধরল পিতার শরীর।

কিন্তু শরীর তো মৃত ব্যক্তির মতো শক্ত হয়ে ওঠেনি! তবে কি বেঁচে আছে মধু মাহাতো? উপুড় হয়ে একবার ডাকল, 'বাবা গো।' ঝাঁকুনি দিল। নাকের কাছে গালটা ঠেকিয়ে ধরল। প্রাণের অতি ক্ষীণ আভাস পেয়ে সে দেহটা কাঁধে তুলে ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল।

কিন্তু সেখানে তখন প্রস্তুত হয়ে আছে চারটে বল্লম। পেছনে দাউ দাউ মশাল জ্বলছে। নিজেকে প্রস্তুত

করার আগেই ছুটে এল প্রথম বল্লম। সটান বুক বরাবর। কিন্তু তীব্র ধারালো সেই বল্লম সোনার বুকের নাগাল পেল না। কী আশ্চর্য, সোনার বুকটা রক্ষা করল তার পিতার নিঃসাড় শরীর। বল্লমের আঘাতে সেটা বেঁকে উঠল মাত্র একবার। কিন্তু এখন সোনা মাথাটাকে পরিষ্কার রাখতে চায়। কারণ ঠাণ্ডা মাথায় লড়বার তার অভ্যাস আছে। ইতিমধ্যে আর একটা বল্লম ছোড়া হচ্ছে। চকিত ক্ষিপ্রগতিতে বসে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে পিতার দেহভার মাটিতে ছেড়ে দিল। বল্লমটা ঠকাস করে দরজায়। সোনা হাত বাড়িয়ে খুঁজে পেল তার লাঠিটা। তারপর সে উঠে দাঁড়াল। লাঠি চালনায় সোনার জুড়ি নেই। তার ঘূর্ণ্যমান লাঠিতে ঠিকরে পড়ল বল্লম, ছোরা এবং হেঁসো! এভাবে নিরস্ত্র হয়ে শত্রুদল দৌড় মারল। সোনা হাঁটু গেড়ে বসল পিতার বুকের কাছে। পিঠ থেকে বল্লমটা টেনে তুলল। নাঃ! মধু মাহাতো শেষ হয়ে গেছে! বল্লমের শেষ আঘাতে প্রাণটুকু চলে গেছে!

পৃথিবী কেঁপে উঠুক তবে! নেমে আসুক প্রলয় ধ্বংস, মহাবিপ্লব! রুদ্র ভোলানাথ জাগুক। দক্ষযজ্ঞ শুরু হোক। উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে গেল সোনা। উত্তর মহলের সদর দরজাটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলল। টান মেরে ফেলে দিল সিঁড়ির রেলিংটা। লাফিয়ে উঠল দোতলায়। চারদিকে ভীত সন্ত্রস্ত চিৎকার এবং আর্তনাদ, হইচই এবং ছোটাছুটি শুরু হল। সোনা আক্রমণ করল খাজাঞ্চিঘর। দরজা ভাঙল। চূর্ণ করল আসবাবপত্র। তারপর এক লাফে গিয়ে পেছন মহলে ঢুকল। অন্ধকারে কে যেন পালাচ্ছিল। তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে। মশাল নিয়ে কারা যেন উপরে উঠে আসছে। সোনা খাজাঞ্চিঘরের বিশাল দরজাটা ছুঁড়ে মারল ওদের মাথায়। ওদের হাতের মশাল ছিটকে পড়ল মাটিতে। আগুন ধরল কাঠের রেলিঙে। হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হল দুবার। বিদ্যুৎগতি সোনা অন্ধকারে খ্যাপা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়ো খাজাঞ্চি শ্রীধরের বুকের ওপর। তারপর প্রচণ্ড দুই থাবায় গর্দানটা মুচড়ে দিল। কয়টি স্ত্রীলোক উপুড় হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। কয়টা মশাল উপরে উঠে এসেছে, লক্ষ করল। টান মেরে ছুঁড়ে দিল একটি ভারী সিন্দুক। ছিটকে-পড়া মশালগুলো ছুঁড়ে মারল ঘরের মধ্যে। ঘরে ঘরে আগুন ধরাল। তারপর লাফিয়ে পড়ল দক্ষিণ মহলের উঠোনে। গুমঘরের দরজার পাশ থেকে পিতার লাশটি কাঁধে তুলে নিল। তারপর বনবাদাড় ডিঙিয়ে দ্রুত ছুটে চলল খোদহাটির দিকে। পথে পথে মধু মাহাতোর রক্ত ঝরে পড়ল কামডহরি—আটমরা—কাটিপোতা এবং বিদ্যাধরীর চরে। রক্ত ঝরল খেয়াদহে—নয়াবাদের বন্ধ্যা মাটিতে—দিয়াড়ার অন্ধকার পথে—আর ভগবানপুরের বুকের গভীরে।

তারপর সোনা নামল মাঠে। মুখুজ্যের ভেড়ি দ্রুত পার হল। খোদহাটির মাঠে পৌঁছাতে রাত্রি শেষ হয় হয়। খোদহাটির মাঠ থেকে পাহারা উঠে গেছে। কখন কে জানে! কেউ কোথাও নেই। জমির উপর এসে দাঁড়াতেই সোনার হৃদয় আর বাধ মানল না। এতক্ষণের বিক্ষুব্ধ বিধ্বংসী সোনা হঠাৎ পিতৃপুরুষের জমির স্পর্শে বেসামাল হয়ে পড়ল। পিতার মৃত শরীরটা শুইয়ে দিল সে জমিনের ওপর। তারপর উপুড় হয়ে ডাকল—'বাবা, বাবা গো! চেয়ে দেখো, তোমার জমিনে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি!' আবার ডাকল—'কমরেড, ওগো কমরেড! এবার যে লড়াই হবে! জাগবেনি তুমি? জাগবেনি?'

কান্নায় তার কণ্ঠস্বর বুজে আসছে দেখে সোনা স্তব্ধ হল। কাঁদবে না সোনা। কাঁদতে নেই তার। উঠে দাঁড়াল সোজা দিগন্তের মুখোমুখি।

তারপর হাঁক দিল—'চাষি ভাই হো—ও—ও—ও--! মধু মাহাতো খুন হয়ে গেছে গো—ও—ও—ও—!' সে হাঁক দিগন্ত কাঁপিয়ে নক্ষত্র জাগিয়ে বিদ্যাধরীর চর পেরিয়ে গেল।

আবার হাঁক দিল সোনা, আরও জোরে, আরও জোরে—'ভাই হো—ও—ও—ও—ও—ও! মধু মাহাতো খুন হয়ে গেছে গো—ও—ও—ও—ও!'

সে হাঁক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল তল্লাট জুড়ে—আকাশ কাঁপিয়ে—নক্ষত্র জাগিয়ে! আর সঙ্গে সঙ্গে মাহাতোর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত হাজার হাজার মশাল হয়ে জ্বলে উঠল! খোদহাটি থেকে বিদ্যাধরী পর্যন্ত! □

দারাসুতপরিবার

চিত্ত ঘোষাল

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

বাবা অলক, কলিকাতা ও. পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের খবর ও দেশের সংবাদপত্রে হয়তো সামান্যই পাইয়া থাক। অবস্থা অতি ভয়ানক এবং উত্তরোত্তর আরও ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা যে এখন কতটা খারাপ তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে অনুমান করাও শক্ত। অবশ্য খবরের কাগজ পড়িয়া আমরাও অবস্থাটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। একই সংবাদের ভাষা টীকা-টিপ্পনী এক এক পত্রিকায় এক এক রূপ ধারণ করে। মনে হয় সংবাদপত্রগুলি তাহাদের কর্তব্য পালনে তেমন যোগ্যতার পরিচয় রাখিতে পারিতেছে না।

সত্তর বৎসরের বুড়া মাথাটা আমার গুলাইয়া যাইতেছে। কে কাহাকে মারিতেছে, কেন মারিতেছে তাহা বুঝা আমার এবং আমার ধারণা অধিকাংশ মানুষের বুদ্ধির অসাধ্য। একটি উদাহরণ দিতেছি। আমাদের পাড়ার শশধর মুদি সে দিন মধ্যরাত্রে তাহার দোকানের মধ্যে খুন হইযা গেল। সে রাত্রে দোকানে ঘুমাইত। শশধর লোকটা খুব সদাশয় সাধুপুরুষ ছিল তাহা নয়। কিন্তু সেটা হিসাবের মধ্যে ধরিলে তো খুন না হইবার অধিকার খুব কম লোকেরই আছে। শশধরের দোকানে হাজার দুই টাকার মাল থাকিত। মাসে তিন-চারশো টাকার বেশি আয় ওই দোকান হইতে সম্ভব নয়। এই হত্যাকাণ্ডেব নেপথ্য কাহিনী কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহা আমার জানা নাই। তবে শশধর খুন হওয়ার দিনকতক আগে পোস্টার পড়িয়াছিল—'শ্রেনিশত্রু সসধর সাবধান। সসধরের মুণ্ডু চাই।' শশধর পোস্টার দেখিয়া হাসিয়াছিল, ভাবিযাছিল পাড়ার ছেলেদের মশকরা, নির্বোধটা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করিতে পারে নাই। তাহাকে যথার্থই মুণ্ডু দিতে হইয়াছিল। তাহার হত্যাকারীরা কোপাইয়া ধড় হইতে মুণ্ডুটাকে আলাদা করিয়া ফেলিয়াছিল। পুলিশ আসিয়াছিল, পুলিশের কুকুর অপরাধীদের ধরিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। যাক, সে অন্য কথা। শশধরের বউ পাঁচটি সন্তান লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে তাহাদের কীভাবে দিনাতিপাত হইতেছে, জানি না। আমি শুধু ভাবিতেছি শশধর কোন্ শ্রেণীর মানুষ, কোন্ শ্রেণীর শত্রু। তাহার মৃত্যুতে কোন্ শ্রেণীর কোন্ সমস্যার সমাধান হইল, তাহাও আমি বুঝতে পারি না। যাহারা তাহাব দোকানে বাকি খাইত একমাত্র তাহাদেবই কিছু সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই দোকানে-বাকি-রাখা চাকুরি-করিয়া-খাওয়া মানুষগুলি পারিলে ঠকায়, অন্যায় সুবিধা লয়, খুন করে না, খুন করার ধাত তাহাদের নয়। আমার বুদ্ধির অতীত ঘোর এক বিপ্লব এখন পশ্চিমবঙ্গে চলিতেছে। আমাদের যৌবনে বিপ্লবীদের দেখিয়াছি। তাঁহাদের আমরা ভালোবাসিতাম, পূজা করিতাম। আর এই বিপ্লবীদের আমরা ভয় করি, ঘৃণা করি। আমরা জানিয়াছি বিপ্লব মানুষের মুক্তির জন্য, তাই যাহারা লড়ে এবং যাহাদের জন্য লড়ে তাহাদেব মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। কিন্তু যে আশ্চর্য বিপ্লবের আমরা সাক্ষী তাহা যে কাহার মুক্তিব জন্য তাহা কেহই জানে না। একমাত্র মুক্তি যাহা দেখিতেছি—যে কোনও ব্যক্তির প্রাণটি যে কোনও সময়ে তাহার দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। মনে হয় আসলের মধ্যে অনেক নকল গূঢ় অভিসন্ধি লইয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অভিসন্ধিটা ধরিতে পারি তেমন রাজনীতিজ্ঞান আমার নাই। তবে আরও দুই-চারি বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো বুঝিতে পারিব।

এই তো গেল বিপ্লবীদের দ্বারা বলিয়া কহিয়া শ্রেণী-শত্রু খতমের একটি ঘটনা। না বলিয়া কহিয়া মারগুলি

আরও অদ্ভুত। বলিয়া কহিয়া মারের বেলায় খুনি ধরা না পড়িলেও (খুনিরা আজকাল আর ধরা পড়া পছন্দ করে না!) আস্ত ঘটনাটা স্থানীয় লোকেরা আন্দাজ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু না বলিয়া কহিয়া মারের বেলায় সবই অন্ধকার। বিনা উদ্দেশ্যে হত্যা হয় না। না বলিয়া কহিয়া মারের বেলায় সেই উদ্দেশ্য কখনও এমন প্রচ্ছন্ন যে ব্যক্তিগত কোনও তুচ্ছ মনোমালিন্য হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু একটা কল্পনা করিয়া লওয়া যায়, অথবা এমনই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ যে অতি সরল বলিয়াই অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে বাধে না। তিনকড়িবাবুর বড়োছেলে তপন এইভাবে না-বলা-কওয়া খুনে খতম হইয়াছে। সে কোনও মতে স্কুল ফাইনাল পাশ করিয়াছিল। তারপর হাতের কাজ শিখিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে ছোটো একটা কারখানায় কাজ করিতেছিল। কারখানায় কাজ করিলেও ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল। দোষের মধ্যে কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সে কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিল। তুমি জানো ইউনিয়ন করিয়া শিল্পে অশান্তি সৃষ্টি করা আমি পছন্দ করি না। যাহা হউক তপনদের কারখানায় কোনও গণ্ডগোল ছিল না, একটার বেশি ইউনিয়নও ছিল না সেখানে। অথচ তপন খুন হইয়া গেল। একদিন রাত করিয়া কারখানা হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় পাঁচ-ছয়জন অজ্ঞাতপরিচয় লোক তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করে। হাসপাতালে লইয়া যাইবার পর তাহাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাহার গায়ে আঠারোটা ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। খবরের কাগজ ও অন্যান্য দায়িত্বশীল সূত্রের মতে হত্যার কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু তপনের সহকর্মী বন্ধুরা তাহার হত্যার যে অতি স্পষ্ট কারণটি তিনকড়িবাবুকে জানাইয়াছে তাহা জানিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। হতবুদ্ধি হইবার আরও কারণ এই যে, সমস্ত ব্যাপারটা দুয়ে দুয়ে চারের মতো সরল যোগ অঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও অঙ্কটা মিলাইবার ভার লইতে কেহই আগ্রহী নয়, বরং নিয়তি ও ঈশ্বরঘটিত নানা আপ্তবাক্য শোনাইবার সময় কেহ কেহ গোঁফের কোণে মুচকি হাসিয়াছে।

সাত বৎসর হইল তুমি জার্মানি গিয়াছ। মোটা টাকা মাহিনায় চাকরিও করিতেছ। তবু বহুবার আমি তোমাকে এখানে চলিয়া আসিতে লিখিয়াছি। আমি ও তোমার মা দুজনেই আমাদের এই শেষ বয়সে তোমাকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া এখানে যাহা চলিতেছে তাহাতে তোমাকে চলিয়া আসিতে বলিতে আর ভরসা হয় না। দূরে থাকিলেও ভালো আছ ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রতিদিন কয়েক শত বোমা ফাটে, আইনি ও বেআইনি বন্দুক পিস্তল হইতে বেশ কিছু গুলি ছোড়াছুড়ি হয়, ছোরা ভোজালি তলোয়ার প্রভৃতির দ্বারা খোচানো পোচানো ইত্যাদি ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ঘটিয়া থাকে। অবশ্য অতি-সম্প্রতি ছোরাছুরির ব্যবহার কিছু কমিয়াছে, তাহার জায়গা লইয়াছে বেআইনি বন্দুক-পিস্তল। মনে হয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে আমরা খোদ আমেরিকার গুণ্ডাবদমায়েশদের টেক্কা দিতে চলিয়াছি। কাগজপত্রে বক্তৃতায় প্রচুর পারস্পরিক দোষারোপ চলিতেছে। কিন্তু বোমা যেমন ফাটিবার ফাটিয়া চলে, মরিবার যাহারা তাহারা মরে, যাহারা মারিবার তাহারাও অনায়াস যোগ্যতায় মারণকর্ম চালাইয়া যাইতেছে। আমি শুধু ভাবি জীবনের না হয় দাম নাই, কিন্তু বোমা-বন্দুক-পিস্তলগুলির তো দাম আছে, বেশ মোটা রকমেরই দাম, সে দাম আসে কোথা হইতে? দেয় কে? আর একটা কথাও ভাবি। জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সে সবেরই দাম প্রতিদিন হুহু করিয়া চড়িতেছে, উলটা দিকে জীবনের দাম লাফাইয়া লাফাইয়া নামিয়া যাইতেছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি? যে জীবন রাখিতে গেলে খরচ এত বেশি সেই জীবন যাইবার সময় এত সস্তা হইয়া যায় কীভাবে?

আমাদের জন্য চিন্তা করিও না। আমাদের মুদির দোকান নাই, বাড়িটাও এত ছোটো যে ভাড়া দিয়া কাহাকেও শোষণ করিবার উপায় নাই। ফলে শ্রেণীশত্রু হিসাবে খতম হইয়া যাইবার আশঙ্কা আপাতত দেখিতেছি না। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে আজকাল ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় ও পুরাতন জুতা পরিয়া রাস্তায় বাহির হই। বাজারের থলিটাও প্রায় ঠোঙার আকারে বানাইয়া লইয়াছি। পারতপক্ষে বাড়ির বাহির হই না। আগে বিকালে পার্কে বেড়াইতে যাইতাম। জনাকয় রিটায়ার্ড বন্ধু জুটিয়াছিল। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে বিপজ্জনক বিষয়গুলিও আসিয়া পড়ে বলিয়া সেখানে যাওয়া বন্ধ করিয়াছি। অর্থাৎ আমি যে সচ্ছল

অবস্থার লোক নই এই সত্য কথাটা বিজ্ঞাপিত করার সর্বপ্রকার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে অকারণে ঝামেলায় জড়াইয়া না পড়ি সে জন্যও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। ঘরের মধ্যেই যথাসম্ভব চলাফেরা করিয়া রক্ত-চলাচল ঠিক রাখিবার চেষ্টা করি। তোমার মায়ের অবশ্য এ সমস্যা নাই। বাতের জন্য তাঁহার হাঁটাচলা করা শক্ত, শুইয়া বসিয়া বাতের তেলে মালিশ করিয়া তাঁহার সময় কাটে। কাজেই আমরা এক প্রকার নিরাপদ। বাবা অলক, আমরা বুড়া হইয়াছি, কিছু করিবার শক্তি নাই, তাই প্রাণপণে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু যাহাদের শক্তি আছে তাহারাও যেন তাহাদের (অর্থাৎ তাহাদের ও তাহাদের পরিজনদের) কিছু হইবে না এরূপ একটা আত্ম-সম্মোহিত অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। আমাদের মতো বুড়াবুড়িদের বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা অপেক্ষা ইহাদের মনোভাবটা অধিকতর লজ্জার। কেউ কেউ যে রুখিয়া দাঁড়াইতেছে না, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দেওয়াল খাড়া করিতে গিয়া মারাত্মক ঝুঁকি লইতেছে না, এমন নয়। কিন্তু সংখ্যায় তাহারা বড়োই কম। আমাদের সদিচ্ছাগুলির হাত-পা বুক ও সেই বুকে সাহস থাকিলে বড়ো ভালো হইত।

এ পর্যন্ত লিখিয়া এখন বড়োই লজ্জা হইতেছে। তোমার কথা জানিতেও চাহিলাম না, বাজেব বাজে কথা লিখিয়া কাগজ ভরাইয়া ফেলিলাম। বুড়া বয়সটা বোধ হয় এই রকমই। যখন যাহা মাথায় ঢুকে তাহা লইয়া অবিশ্রান্ত প্যাঁচাল পাড়িয়া চলে। বাবা অলক, যত বিপদই থাকুক আমি তোমাকে এখানে চলিয়া আসিতেই লিখিতাম। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। আমাদের না আছে শারীরিক শক্তি, না টাকাপয়সার জোর. তবু প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা বুড়াবুড়ি ভাবি তোমাকে বুকে আগলাইয়া সব বিপদের আঁচ হইতে রক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু বাবা. হাজার মার্ক দূরের কথা, মাসে তিনশো টাকার চাকরিও তুমি এখানে পাইবে না। কালীপদবাবুর মেজোছেলে শৈলেশ ফ্রান্স হইতে ফুয়েল টেকনোলজি শিখিয়া আসিয়া প্রায় ছয় মাস হইল বেকার বসিয়া আছে। যখন বেশি লেখাপড়া তোমার হইল না বলিয়া তুমি জার্মানি যাইতে মনস্থ কবিয়াছিলে, তখন তোমার মা ও আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইলেও তোমার জেদের সঙ্গে পারিয়া উঠি নাই। এখন দেখিতেছি তোমার সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদেব প্রতি অবিচার ও সুবিচার সমান মাত্রায় করিয়াছেন। তোমাব মা যাহাই বলুন, আমি বড়ো দুঃখে লিখিতেছি, বাবা, তুমি আসিও না, আসিও না।

মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় বাড়িটা বেচিয়া দিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাই। কলিকাতা হইতে অনেক দূরে, বাংলাদেশের বাহিরে। পারি না। বড়ো মায়া, এই বাড়িটার বড়ো মায়া..

সত্যিই এই বাড়িটার জন্য বড়ো মায়া নীলমাধববাবুর। প্রায় পঞ্চাশ বছব আগে মা বাবা আর ছোটো বোন নিরুকে নিয়ে এ বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসেন তাঁবা। এখানে বাবা-মার মৃত্যু। এ বাড়ি থেকেই নিরুর বিয়ে দেন নীলমাধববাবু। তিনি বিয়ে করেন তার কিছুদিন পরে, একটু বেশি বয়সে। নিরুর বিয়ের দরুন তাঁর মোটা দেনা হয়ে গিয়েছিল। সে দেনা শোধ করবার পর নিজের বিয়ের কথা তিনি ভাবতে পেরেছিলেন। নিরুর তিনটি সন্তানের জন্ম এই বাড়িতে। সামাজিক নিয়মে বাবার অবর্তমানে দাদার বাড়িতে আসত সন্তানসম্ভবা নিরু। নীলমাধববাবুর আর্থিক কষ্ট এতে বাড়লেও তিনি খুশি হতেন। নিরুকে বড়ো ভালোবাসতেন তিনি। নিরুর বাচ্চাগুলিও হত বড়ো সুন্দর। তারপর বিয়ের প্রায় পাঁচ বছর পরে অনেকদিন তাঁদের হতাশায় রেখে সুপ্রভার কোলে এল অলক—তাঁদেব একমাত্র সন্তান। সেও এই বাড়িতে। নীলমাধববাবুর বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। তিনি একটু-আধটু লিখতেন-টিখতেন। কিন্তু সংসারের দায়দায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে সে সব ছাড়তে হল। তখনকার চাকরিতে মাইনে যা ছিল তাতে বাজারদর কম থাকায় সংসার মোটামুটি চলে যেত। কিন্তু না ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ড, না গ্র্যাচুইটি। প্রাইভেট ফার্মে পেনশনের কথা কেউ কানেও শোনেনি। নীলমাধববাবু কোমর বেঁধে শুরু করলেন টিউশনি, সাত-সতেরো। লেখাটেখা ছাড়লেন, ছাড়তে একরকম বাধ্য হলেন। কিন্তু সংসারটাকে জড়িয়ে ধরলেন গভীর আবেগে, ভালোবাসায়, সেইসঙ্গে এই বাড়িটাকে। তখন এ সব জিনিসকে গভীরভাবে ভালোবাসা যেত। এখনও মানুষ ভালোবাসে, তবে গভীর ভালোবাসা গভীর ভয় আনে

এখন। অনেক পরিশ্রমে কিছু সঞ্চয় করলেন নীলমাধববাবু। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় কোম্পানি থেকে পেলেন কিছু টাকা। সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা এমন যা খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা দরকার। কিন্তু সব হিসেব গুলিয়ে দেওয়ার মতো একটা ঘটনা ঘটল এ সময়। বাড়িওয়ালা ভবতোষবাবুর বউ আর তিন ছেলেমেয়ে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় মারা গেল। ভবতোষবাবু পাগলের মতো হয়ে গেলেন। একদিন এসে নীলমাধববাবুকে বললেন, 'বাড়িটা আপনি কিনবেন, নীলমাধববাবু? দেড় কাঠা জমি, তিনখানা ঘর। দশ হাজার টাকা আমাকে দিন, বাড়িটা আপনাকে লিখে দি।' 'এর চাইতে অনেক বেশি দাম আপনি পেতে পারেন।' 'কী হবে আর বেশি টাকা দিয়ে। কাশীতে ও টাকাই যথেষ্ট। আপনি অনেকদিন আছেন এ বাড়িতে, যদি চান এ বাড়ি আপনি নিতে পারেন।' হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল নীলমাধববাবুর। এ বাড়ির সঙ্গে জড়ানো হাজার স্মৃতি—সুখ-দুঃখ সাফল্য ও ব্যর্থতায় সবচেয়ে তীব্রভাবে বাঁচার বছরগুলি—সহসা তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। তিনি যেন পুরনো বটগাছের মতো এই বাড়িটার সর্বত্র প্রবিষ্ট হয়েছেন, শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তবে আর ভাড়াটে হয়ে থাকা কেন? বাড়িটা কিনে ফেললেন নীলমাধববাবু। যতদিন ভাড়াটে ছিলেন বাড়িটা মেরামত বা অদলবদল করানোর জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাগিদ কখনও বোধ করেননি। সৌন্দর্যের প্রশ্নটা ছিল অবান্তর, পরের বাড়ির রূপ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু বাড়িটা কেনার পর একটু-আধটু মেরামত করাতে করাতে একদিন আবিষ্কার করলেন বাড়িটার খোলনলচে সবই পালটানো হয়ে গিয়েছে। বাড়ির চেহারাও হয়েছে অনেক সুশ্রী, চোখ-জুড়ানো। আর সেইসঙ্গে সঞ্চয়ের অঙ্কটাও এই নেশার পাল্লায় পড়ে হাস্যকরভাবে শীর্ণ হয়ে পড়েছে। তবু একটা আশ্চর্য তৃপ্তি আর আরাম অনুভব করেছিলেন তিনি।

নীলমাধববাবু আবার চিঠি লেখার প্যাডটা টেনে নিয়ে অসমাপ্ত বাক্যটা পড়লেন। শেষ করার জন্য প্রত্যয়হীন আঙুলে ধরা কলমটাকে প্যাডের উপর ঠিক জায়গাটিতে নামালেন ধীরে ধীরে। পুবের জানলা দিয়ে এই সময় তুমুল একটা কান্নার রোল ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। মুহূর্তে চমকে উঠলেন নীলমাধববাবু, তারপরই মনে পড়ল ব্যাপারটা। হাসপাতাল থেকে ছেলেটার মৃতদেহ নিয়ে ওরা ফিরে এসেছে নিশ্চয়। কলম বন্ধ করলেন নীলমাধববাবু, অভ্যাসমতো প্যাডটা ঠেলে দিলেন একটু পিছনে। উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন পুবের জানলায়।

দুখানা বাড়ির পরেই বড়োরাস্তা। বড়োরাস্তা আর গলির মোড়ে মিত্তিরদের বাড়ি। পাঁচ কাঠা জমির ওপর মস্ত বাড়ি ছিল একসময়। শরিকে শরিকে পেন্ডুলামের মতো ঝুলন্ত মামলা আর সময় চারদিকে বাড়িটাকে খসাতে খসাতে মাঝখানে খানকয় নোনা-ধরা ইটের একখানামাত্র ঘরের অবয়বে দাঁড় করিয়েছে। পলস্তারা বহু অতীতের ব্যাপার, ভেতরে ইটগুলির আলাদা কোনও চেহারা নেই, গেরুয়া ধুলোর দেওয়ালের মতো দেখায়। দেওয়ালে অসংখ্য ফাটল, জানলা-দরজায় কপাট পাল্লা কিছু নেই, ছাতের একদিকে ধসে পড়ায় আকাশ অবারিত। এই ঘরে বিনা ভাড়ায় একটি হিন্দুস্থানি পরিবার থাকে। নিরুপদ্রবেই থাকে, কেননা ঝুরো বালির মতো পলকা। ওই ঘরে থাকার মতো সাহসী ভাগিদার জোটেনি এখনও। বাড়ির মালিকরাও চক্ষুলজ্জায় ভাড়া আদায় করতে ও-মুখো হয় না। তা ছাড়া ভাড়া যদি দিয়েই বসে লোকটা তা হলে তার হিস্‌সা নিয়েও আর একটা মামলা শুরু হয়ে যেতে পারে। ওই হিন্দুস্থানি পরিবারটির জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় কাগজ কুড়োনো, ডাস্টবিন থেকে কয়লা কুড়োনো, বাজার থেকে পচাগলা শাকসবজি কুড়োনো প্রভৃতি নানা প্রকার কুড়োনো প্রক্রিয়ায়। ঘাটতি পুরণের জন্য আছে ভিক্ষাবৃত্তি। পরিবারে ওদের একটা মাদি আর একটি মদ্দা (এভাবেই ওদের সম্পর্কে ভাবেন নীলমাধববাবু, ঈষৎ ঘৃণা-মিশ্রিত করুণায় ঠিক স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ওদের ভাবতে পারা যায় না) আর একপাল ছেলেপুলে, যাদের যথার্থ সংখ্যা নীলমাধববাবুর জানা নেই।

নীলমাধববাবু দেখলেন। ঠিকই ভেবেছেন তিনি। ওরা বড়োছেলেটার মৃতদেহ নিয়ে এসেছে হাসপাতাল থেকে। একটা দড়ির খাটিয়ায় রাস্তার ওপর শোয়ানো। আপাদমস্তক একখণ্ড মার্কিনে ঢাকা। মা-টা চিৎকার করে কাঁদছে মৃতদেহের ওপর পড়ে। বাপটা অদ্ভুতভাবে বসে বসে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটা দোলাচ্ছে। বোধ হয় নেশা করেছে, চুর হয়ে আছে নেশায়, ওর বুদ্ধিসুদ্ধির উপযুক্ত কোনও দার্শনিক তত্ত্ব সম্ভবত গাঁজার

ধোঁয়ায় পরিপুষ্ট হয়ে ওকে পরম প্রশান্তি দিয়েছে। বড়োবাচ্চাগুলি কান্নাকাটি করছে, ছোটোগুলো কৌতূহল, বিস্ময় ও মজা উপভোগ করার ভঙ্গিতে পাশে দাঁড়িয়ে। ছোটোটা রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে, কারণ ক্ষুধা বলেই মনে হয়।

কাল এইখানে রণক্ষেত্র ছিল। হঠাৎ হইহই, গলিতে দৌড়োদৌড়ি, তারপর বোমা ফাটার দুমদাম। পুবের জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নীলমাধববাবু। দোতলার জানলা। বড়োরাস্তার মোড় থেকে এ দিকের অনেকটা রাস্তা একদম ফাঁকা। ওই রাস্তার দিকে একদল—তাদের দলটা বড়ো, তাদের ভূমিকা আক্রমণাত্মক। তারা একসঙ্গে চার-ছটা করে বোমা ছুড়ে দিচ্ছিল, ধোঁয়া আর বারুদের বিশ্রী গন্ধে বাতাস বিবিয়ে যাচ্ছিল। ওদের অনেকের হাতে ছিল মোটা নলের এক ধরনের ছোটো ছোটো বন্দুক। নীলমাধববাবু পরে ওগুলির নাম জেনেছিলেন—পাইপগান। অবশ্য গুলি ওরা বেশি ছুড়তে পারছিল না। কারণ সংখ্যায় কম প্রতিপক্ষ সরু সরু বাইলেনগুলির মধ্যে ঢুকে থাকায় ওদের সরাসরি বন্দুকের নাগালে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ পক্ষ থেকে হঠাৎ এক এক জন তড়িৎবেগে বেবিয়ে এসে আচমকা বোমা ছুড়ে আবার গলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। যে কটা মুখ নীলমাধববাবু যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের দেখতে পাচ্ছিলেন তারা কেউ কোনও অর্থেই তাঁর চেনা নয়। আর পাড়ার সমস্ত চেনামুখ তখন বন্ধ জানলা বা দরজার ও দিকে। দু-একটা জানলা শুধু সেকালিকা নববধূর ঘোমটার মতো এক-আধ ইঞ্চি ফাঁক। এই আশ্চর্য লড়াইটা অবশ্য বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হয়নি নীলমাধববাবুর। সুপ্রভাও বড়ো চেঁচমেচি শুরু করে দিয়েছিলেন—চলে এসো, চলে এসো বলছি জানলা থেকে। তৎসহ উপযুক্ত ছেলে প্রবাসী ও স্বামী অবুঝ হলে স্ত্রীলোকের যে কী দুঃসহ জ্বালা...ইত্যাদি...ইত্যাদি... ইত্যাদি...ইত্যাদি...এবং ইত্যাদি...

কিছু পরে যখন বোমাবাজি বন্ধ হয়েছিল তখন বেওয়ারিশ মিত্তিববাড়ি থেকে শোনা গিয়েছিল কান্নাব শব্দ। একটি বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছাদের ভাঙা জাযগা দিয়ে ঘরের ভেতরে বড়োছেলেটির মাথায় পড়ে। ফলে একটি মাথা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলেও অন্যরা আশ্চর্যজনকভাবে অক্ষত থাকে। ছেলেটিকে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটাব বা ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়নি। ইমার্জেন্সি থেকে সোজা মর্গে, মর্গ থেকে লাশকাটা ঘরে। তারপর সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ে স্বগৃহে। নীলমাধববাবুর মুখের ভেতরটা একটা যন্ত্রণাদায়ক তিক্ত বিদ্রূপে বিস্বাদ হয়ে গেল। মেয়েছেলেটার চিৎকার করে কান্না অত্যন্ত নির্লজ্জ বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। যে ঘরটায় ওরা আশ্রয় নিয়েছে সেটাই তো মৃত্যু-ফাঁদ, যে কোনও মুহূর্তে ওদেব মাথায় ভেঙে পড়তে পারে—পড়বেই। তবে ওরা এত বেশি কান্নাকাটি করে মৃত্যু সম্পর্কে এত বেশি আপত্তি প্রকাশ করছে কেন? নাঃ, মানুষ একেবারেই যুক্তির ধার ধারে না।

— ও সব দেখতে হবে না। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে এসো।

সুপ্রভা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাননি নীলমাধববাবু।

—হ্যাঁ, চলো।

প্যাডটা টেনে নিয়ে চিঠিটা শেষ করার চেষ্টা করতে লাগলেন নীলমাধববাবু। ভাবলেন এই ঘটনাটা লিখবেন অলককে। কথাটা মনে হতে তিরস্কার করলেন নিজেকে। কী হবে ছেলেটার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে? অকারণে ওকে এ সব জানানোই বা কেন? ছেলেবয়েসের সেই গল্পটল্প লেখার অভ্যাসটাই এখনও এভাবে ভেতরে ভেতরে রয়ে গেছে নাকি? নাঃ, যা লেখা হয়েছে তাই যথেষ্ট। আবেগের তোড়ে অতটা লেখাও উচিত হয়নি। কিন্তু উপায়ই বা কী? কার কাছে পাবেন নিজেকে একটু খুলে-মেলে ধরতে? সুপ্রভা বড়ো সাদামাঠা, যাকে বলে বুদ্ধিজীবী মানুষের সংবেদনশীলতা সে বস্তু তাঁর কাছে আশা করা বৃথা। গৃহিণী হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই নীলমাধববাবুর। কিন্তু ললিতা যদিবা তিনি হয়েও থাকেন কোনও ধূসর অতীতে, সচিব সখা কদাচ নয়। তাই অলকের কাছে চিঠি লেখা তার মস্ত বড়ো মুক্তি। তিনি যা বোঝেন, ভাবেন, অনুভব করেন সে সব স্বগতকথনের মতো লেখা হয়ে যায় অলকের কাছে চিঠিতে। যা কিছুই তাঁকে আলোড়িত করে তা তিনি অলকের কাছে না লিখে পারেন না। তবু আজকের ঘটনাটা তিনি অলককে লিখলেন না। সাবধানে চিঠি শেষ করলেন তাকে অভয় দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, একটু যেন নাটকীয়ভাবে। —'আমি বিশ্বাস

করি এ অন্ধকার একদিন কাটিয়া যাইবেই, নহিলে যে মানুষের ভবিষ্যৎই মিথ্যা হইয়া যায়।' চিঠিটা খামে ভরে ধরে ধরে গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লিখলেন নীলমাধববাবু, যদিও লাইনগুলি ঠিক সোজা হল না। হ্যাঙারে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেটে চিঠিখানা রেখে নীচে নেমে গেলেন স্নান করতে।

রিটায়ার্ড লাইফে স্নানের ব্যাপারটা নীলমাধববাবুর বেশ একটা বিলাস—আয়েশের জিনিস। প্রথমে দীনতারণ কবিরাজের উপদেশ অনুযায়ী একটু পাতলা ঘি চাঁদিতে ঘষে ঘষে মালিশ—অন্তত পনেরো মিনিট। দীনতারণ অসাধারণ কবিরাজ ছিলেন, বলতেন—বাপু হে, যৌবনে ঘি পেটে দেবে, বার্ধক্যে মাথায়। দেখবে প্রেশার-ট্রেশার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। নীলমাধববাবু এই নির্দেশ মেনে চলেছেন পনেরো বছর ধরে। তাতে ভালোই আছেন মনে হয়। চাঁদিতে ঘি বসে যাওয়ার পর কর্ণরন্ধ্র থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ পর্যন্ত সর্ষের তেল নানাভাবে প্রয়োগ। তারপর ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে সামান্য গরম জল মিশিয়ে স্নান। সব মিলিয়ে ঘণ্টা দুয়েক। এই সময়টা নীলমাধববাবু অদ্ভুত ভালো থাকেন। ভাবনাচিন্তা মাথায় আসে না। পুরনো, বয়সে শিথিল শরীরটার পরিচর্যা করাব সময় তিনি যেন নিজের থেকে বেরিয়ে আসেন। যেন শরীরটাকে সন্তানের মতো আদর করেন। স্নানের সময় ও তার পরেও অনেকক্ষণ তাঁর মেজাজ খুব ভালো থাকে।

স্নান সেরে দশাবতার স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে নীলমাধববাবু চুল আঁচড়ালেন, জামাকাপড় পরলেন, তারপর পথের সঙ্গী লাঠিগাছ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন চিঠি পোস্ট করতে।

রাস্তায় বেরতেই আবার মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। ছেলেটার শব এখনও সেই একই জায়গায় একইভাবে শোয়ানো। কান্নাকাটি বন্ধ হয়েছে, ছেলেটার মা খাটিয়ায় মাথা রেখে উপুড় হয়ে ঝিম ধরে আছে। বাপটা উঠে দাঁড়িয়েছে। নীলমাধববাবু আস্তে আস্তে ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক। তারা কেউ এ পাড়ার মানুষ নয়। একে তাকে চাপা কৌতূহলে দু-একটি প্রশ্ন। 'কী জানি' গোছের উত্তর। কিছু খুচরো পয়সাও পড়েছে। কিন্তু পাড়ার কাউকে ধারে-কাছে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি পাশের চায়ের দোকানটা, যেটা সর্বক্ষণই খোলা থাকে বলে নীলমাধববাবুর ধারণা, সেটাও কোনও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ। শুধু তিনকড়িবাবুর মেজোছেলে স্বপন একপাশে দাঁড়িয়ে। কোমরে গামছা বাঁধা, খালি পা। বোঝা যায় সে শ্মশানযাত্রী।

নীলমাধববাবুর কাছে এল স্বপন।

—কী করি বলুন তো জ্যাঠাবাবু, পাড়া'র কেউ আসছে না।

—কেন? জাত?

—না। মড়া পোড়াতে আজকাল আর কেউ জাত-টাত নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। আসলে সব ব্যাটা ভয়ে ঘরে সেঁধিয়েছে।

—ভয়! ভয় কিসের?

—বুঝলেন না! এদের সাহায্য করলে যদি মস্তানদের কোপে পড়ে যায়...

—অদ্ভুত কথা। এরা তো কোনও দলেরই লোক নয়। ভয়ের একটা যুক্তি তো থাকা দরকার।

—সে কথা কাকে বোঝাবেন। অনেকে হাওয়া, কারও আজকেই ভীষণ পেটখারাপ নয়তো জ্বর, আরও নানারকমের অজুহাত।

নীলমাধববাবু অল্প দামের মার্কিন কাপড়ে জড়ানো মৃতদেহটো দেখছিলেন। মাথাটাও ঢাকা। বোমার ঘায়ে থেঁতলানো মাথাটা পোস্টমর্টেমের পর এখন নিশ্চয়ই মাংস আর অস্থিচূর্ণের একটা পিণ্ড ছাড়া কিছু নয়। চোঁয়ানো রক্ত আর স্রাবে মাথার কাছের কাপড়ে বিবর্ণ লালের ছোপ। ওর শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি খুলে বের করে রাখা হয়েছে পরবর্তী বিশদ পরীক্ষার জন্য। তারপর খোলসটা কোনও মতে জোড়াতাড়া দিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে তার পরিজনদের হাতে। কিন্তু কোন্ অস্থিচূর্ণ হওয়া বা কোন্ কোন্ শারীরযন্ত্রের বিকৃতি মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ সেই জ্ঞানে অপ্রত্যক্ষ (!) কারণ বোমাবাজদের নাগাল পাওয়া যাবে কি? ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে তাতে শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক কৌতূহল মেটানো ছাড়া পোস্টমর্টেমের আর কী প্রয়োজন? হঠাৎ

নীলমাধববাবুর মনে হল এই বিকৃত বীভৎস শরীরটা যদি হত অলকের, যদি ঠিক এমনি করেই সুপ্রভাকে নিয়ে রাস্তায় বসে তাঁকে ছেলের শব আগলাতে হত, যদি এমনি করেই সবাই নারাজ হত শ্মশানসঙ্গী হতে? স্নানস্নিগ্ধ নীলমাধববাবু ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তিনি মিত্তিরবাড়ির ভগ্ন অবশেষের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে চারপাশের সমস্ত বাড়ি যেন ওই বাড়িটার মতোই বিপন্ন ভগ্নপ্রায় দেখাল। চিঠি পোস্ট হল না তাঁর। লাঠিটা জোর করে চেপে ধরে তিনি ফিরে চললেন বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি হতে পাশের বাড়ির সুবোধবাবু বারান্দা থেকে নেমে এলেন। কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন—দেখলাম আপনি কথা বলছিলেন স্বপনের সঙ্গে। একেবারে গবেট ছেলেটা। আরে বাবা, পরোপকার করা ভালো, তাই বলে এরকম ডেঞ্জারাস রিস্ক নেওয়া কোনও সেন্সিবল লোকের উচিত নয়। কদিন আগে তো ওর বড়োভাই তপনটা মার্ডার হয়ে গেল। আপনি মশাই বুড়োমানুষ, অহেতুক ঝামেলায় যাতে...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। নীলমাধববাবু আর দাঁড়ালেন না।

নিজের ঘরে গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে তিনখানা দশ টাকার নোট বের করে পকেটে রাখলেন। ভেজা গামছাখানা ভাঁজ করে কাঁধে নিলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন নীচে।

—চললে কোথায় আবার? সুপ্রভা বললেন ঘর থেকে।

—ফিরতে দেরি হবে আমার। তুমি অপেক্ষা কোরো না, খেয়ে নিও। বলতে বলতে নেমে গেলেন নীলমাধববাবু।

সুপ্রভা গজগজ করে চললেন।

নীলমাধববাবু স্বপনের কাছে গিয়ে তার হাতে দশ টাকার নোট তিনখানা দিয়ে বললেন—এর সৎকারের ব্যবস্থা করো। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

স্বপনের চোখ দুটি উজ্জ্বল বিস্ময়ে নীলমাধববাবুকে দেখে বলল—আমি সব ব্যবস্থা করছি জ্যাঠাবাবু। আপনার যাওয়ার দরকার নেই। বুড়ো মানুষ, কষ্ট হবে।

অন্যমনস্কভাবে নীলমাধববাবু বললেন—যদি না পারি চলে আসব।

আর তিনি তখন ভাবছিলেন—চিঠিটা আবার নতুন করে লিখতে হবে। অলককে তিনি ফিরে আসতে লিখবেন। অনিশ্চিত, বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের মধ্যে, এই রক্তপিচ্ছিল স্বদেশেই তিনি ফিরে আসতে লিখবেন তাঁর একমাত্র সন্তানকে। এই দুঃসময়ে তার জন্মের স্বদেশ থেকে একজন মানুষকে দূরে সরে থাকতে বলার কোনও অধিকার তাঁর নেই! □

অংশু সম্পর্কে ২টো-১টা কথা যা আমি জানি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

আমার ও অংশুর জন্ম হয়েছিল ২১ নভেম্বার, ১৯৩৪ সালে, ৫টা ৩৫ মিনিটে। শুরুতেই কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারেন, আমার জন্ম হয় আরও কবছর পরে। হেসে তাকে বলার, এটা ভুল। নবজাত শিশু বাড়তে থাকে বটে, হ্যাঁ, সে তার হাত-পা। দৃশ্যত, মাথাও বড়ো হয়। কিন্তু তার মস্তিষ্কে জন্মমুহূর্তের নিউরন-সংখ্যা একই থেকে যায়, শেষের দিকে কমে বই বাড়ে না। যাই হোক, এ নিয়ে তর্কাতর্কির মধ্যে আমি যাব না।

বস্তুত, জন্মতারিখটি অংশু জানতে পেরেছে এই সে দিন। গেল বছর, বিজয়া করতে সে গিয়েছিল বেলেঘাটায়, রাঙাবউদির ওখানে। রাঙাদার কাগজপত্রের মধ্যে এতকাল পরে খুঁজে পেয়ে তার বাবার একটা ডায়েরি বউদি সে দিন তাকে দেয়। না, ঠিক ডায়েরি নয়, প্রাক্তন জার্ডিন-হেন্ডারসন কোম্পানির এয়ারোপ্লেন-মার্কা স্টেনোগ্রাফির খাতা একখানা, মাত্র পক্ষকালের দিনপঞ্জিই তাতে রয়েছে। বাবার হাতে ইংরেজিতে '২১ নভেম্বার, ১৯৩৪'-এর নীচে লেখা : 'টো-ডে, অ্যাট ফাইভ থার্টিফাইভ এ এম. প্রতিমা গেভ বার্থ টু মাই ফার্স্ট চাইল্ড—আ বয়। শি সাফার্ড মাচ ট্রাব্‌ল অ্যান্ড পেন টু ডেলিভার দা চাইল্ড।' প্রায় দুই যুগ পরে ওই ভাষায়, বা, হতে পারে জে বি ডি কালিতে লেখা মৃতমানুষের বিবর্ণ অক্ষরের টান-টোনের মধ্যে পরলোকগতা সুন্দরী স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি আমার দিকে বাবার উদ্যত তর্জনী দেখতে পাই। শরীরের তুলনায় আমার মাথাটা হয়েছিল ভারী ও বড়ো, কষ্ট সেইজন্যেই হয়। তাকে জন্ম দিতে গিয়ে মা-র কষ্টের কথা অংশু আগেও শুনেছে, যা সে স্রেফ ভুলে মেরে দেয়। তবুও এ কথা সত্যি যে, জেনেছে যখন, তার জন্মতারিখটি অংশু কখনও ভুলতে পারবে না।

সেটা হেমন্তকাল। ঠিক হেমন্ত নয়. হেমন্ত ও শীত এই দুই ঋতুর মাঝামাঝি সময়ে সে দিন শেষরাতে বেনেটোলায় ২২ নং অভয় মিত্র স্ট্রিটে তাদের অধুনালুপ্ত পৈতৃক বাড়ির দোতলার নতুন ঘরে অংশুর জন্ম। মা-র গর্ভসঞ্চার হওয়ার প্রায় সমসাময়িককালে বাড়িটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রয়োজন হয় এবং তার জন্মের ৬ মাসের মধ্যে প্রথম ও শেষাবধি একমাত্র সন্তান অংশুকে কোলে নিয়ে, প্রপিতামহের তৈরি সাদামাটা ছোট্ট বাড়িটি ছেড়ে তার বাবাকে সপরিবার গঙ্গার অপর-পারে শিবপুরে চলে আসতে হয়। পশ্চাৎগণনা করে অবিশ্যি সে দিন শেষরাতে গ্রহতারকার অবস্থান জানা যেতে পারে, কৃষ্ণপক্ষ না শুক্ল জানা গেলে তখনও আকাশে চাঁদ থাকার কথা ছিল কি ছিল না, থাকলে তার আকার কী ছিল, ষাঁড়ের জোড়া শিঙের মতন, না......বা, সে দিন, পৃথিবীতে তার প্রবেশমুহূর্তে, ভারতবর্ষসহ সমগ্র পূর্ব ভূখণ্ড জুড়ে তখন সূর্যোদয় হচ্ছিল না হচ্ছিল-না, এ সবই জানা যেতে পারে। বাস্তবিক, পরবর্তিকালে এই অংশুকে, দুই ঋতুর মাঝ বরাবর অকাল বর্ষার সূচনায় ব্যগ্র হয়ে উঠতে কত দেখেছি, আমি জানি কেন, অংশু জানে না। ২১ নভেম্বার, ১৯৩৪, শেষরাতে, যখন হেমন্তের শেষ ও শীতের শুরু, সে দিন আবহাওয়া কেমন ছিল? কেঁপে-ওঠা হাওয়ার সঙ্গে নবজাত বৃষ্টির ফোঁটা দারুণ ও আবেগময়, শীতার্ত মরণ-খেলায় মেতে উঠেছিল নাকি? অংশুর অতশত জানা নেই, সে কিছুই বলতে পারবে না। ২২ নং অভয় মিত্র স্ট্রিটের দোতলার আঁতুড়ঘরে. যখন. যে-সময়, পৃথিবীর এই পূর্ব ভূখণ্ডে সে ঢোকে, সেই তার জন্মক্ষণে ঘরের বাইরে বাবার সঙ্গে রাঙাদাও দাঁড়িয়েছিল কিনা তা জানার জন্যে অংশুর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা কোনওরূপ কৌতূহল কখনও দেখিনি। ঘরটির মেঝে সাদা-কালো টালির বড়ো বড়ো বরফি দিয়ে বাঁধানো ছিল কি? ধ্যাৎ, অংশু তাও জানে না।

অথচ এই জন্মদিন তথা জন্মক্ষণটি মানুষমাত্রেরই জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেটা হল এ-পৃথিবীতে

তার অবতারণার মুহূর্তটি, মৃত্যু-পর্যন্ত পরবর্তী জীবনে সেটাই তো প্রবেশমুহূর্ত, নয় কি? সে সম্পর্কে অণুমাত্র ধারণা না রেখে জীবন নামে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরার কথা ভাবা যায় কি? আমি পারি না ভাবতে। কিন্তু অংশু তো তাই পারছে। পুরাণবর্ণিত থিসিউস, বহুতলা ল্যাবিরিন্থ-এর ৩৫০০ অবিকল একরকম কক্ষ থেকে কক্ষান্তরের কেন্দ্রে উৎকর্ণ ও অপেক্ষমাণ ষণ্ডদানবের দিকে ধোঁয়া ও দুর্গন্ধের ভেতর দিয়ে তার সেই রোমহর্ষক অবতরণ, চিহ্ন না রেখে গেলে সূত্র বিনা, সে কখনওই ফিরে আসতে পারত না। এগিয়েই যেত, এগিয়েই যেত, ঘুরেই মরত শুধু। ১৮ বছর বয়সে গল্পটি প্রথম পাঠের সময় উদ্বেগে ভরে গিয়েছিল তার মাথা, বাস্তবিক হত্যার পর থেকে প্রবেশপথ অবধি ওই ফিরে-আসাটুকু ছিল গল্পের সবচেয়ে আকর্ষক অংশ, শেষ পাতা কটির মধ্যে আঠারো বছরের তরুণ অংশু তখন স্বয়ং নেমে পড়েছিল বলা চলে। বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট, বইটির কথা অংশু একদম ভুলে গেছে ও গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে, তরবারি ছুড়ে ফেলে, একটা লাটাই হাতে, সুতো গুটিয়ে, থিসিউসের উঠে-আসার ব্যাকুল ও ছুটন্ত ছবিটি। আজ আর বইটির নাম অংশুর মনে পড়ে না। মনেও পড়ে না যে মনে পড়ে না। ছবিটি ছিল সাদায়-কালোয়।

এই তো, মাস দুই আগের কথা; একদিন সক্কালবেলায় তড়িৎ এসে হাজির। পাড়ার অবস্থা ভালো নয় দেখে রাঙাবউদি পাঠিয়ে দিয়েছে, বন্ধ খামে জানিয়েছে কদিন জোর করে রাখতে। তড়িতের মুখে পাড়ার অবস্থা শুনে অংশু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পরশু বেলেঘাটায় একজন এস আই-কে রিকশা থেকে নামিয়ে......ছেলেকে স্কুল থেকে আনছিলেন ভদ্রলোক, নিশ্চিত, কিন্ডারগার্টেন, ছেলেটা নাকি পালায়নি, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী, তবু খবরের কাগজে পড়তে গিয়ে, স্কুলড্রেস পরা পিঠে কিটব্যাগ ও কাঁধে ওয়াটার-বটল, আনুমানিক শিশুটির জন্যে অংশু বিশেষত কষ্ট পেয়েছিল বললে ডাহা মিথ্যে বলা হবে, হায় অংশু। কষ্ট পাওয়াই তো কবিপ্রসিদ্ধি, পেতও, কিন্তু হত্যার একমাত্র সাক্ষী ওই ছেলেটিকে মনস্থ করা, ওহ্, তা কী অমানুষিক শ্রম দাবি করে। হ্যাঁ, অমানুষিক, যা মানুষে পারে না, আমি জানি। ও-সব কষ্ট-টস্‌টো ইলাস্ট্রেটেড ছোটোগল্পেই জমে ভালো। কাগজ মুড়ে রেখে রেবাকে ডেকে অংশু বলেছিল, 'আদা দিও, বুঝলে।' অর্থাৎ চা-এ। 'তারপর' তড়িৎ বাকিটা বলে, 'কাল ৫টা ছেলেকে হাত বেঁধে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে পুলিশ দুপুরবেলায় রিভলভার উঁচিয়ে বন্ধ করিয়েছে পাড়ার সমস্ত খোলা জানলা, খড়খড়ি তুলে দেখেছে অনেকেই, পরপর ৮টা গুলির শব্দ সবাই শুনেছে। ৩৪ জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে ২৬ জনকে ছেড়ে, বাকি ৮ জন সম্পর্কে পুলিশের ভূত বলছে, ঘৃণায় মুখ ভেঙে যায় তড়িতের, 'আমি তো জানি না।' 'তুই কদিন থাক এখানে', সব শুনে পাংশুমুখে অংশু বলেছিল। বলেই জানতে চায়, 'তোকে ফলো করেনি তে, হ্যাঁরে।' ছেলে অবশ্য পরদিন সকালেই হাওয়া। বেশ জড়িয়ে পড়েছে, অংশু বোঝে। যাই হোক, সে দিন সব শুনে, বাজার করতে রাস্তায় বেরিয়ে পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা' ছবিটির কথা অংশুর সহসা মনে পড়ে যায়। ও থলি-হাতে, বহুকালের মধ্যে সেই যা একদিন, উলটোদিকে, পিকাসোর গোয়ের্নিকার দিকে, সিঁথির অশোকবাবুর বাড়িতে তাকে যেতে দেখি।

তো অংশুর ছেলেবেলার কথা, যা বলছিলুম। তার পিসতুতো দাদা রাঙাদার বিয়ে হয় তাদের শিবপুরের বাড়িতে। কখনওবা অংশু মনে করে এটাই তার প্রথমতম স্মৃতি যখন রাঙা বউদিকে নিয়ে নীচে মা খুব ব্যস্ত, দোতলায় সদ্য-বিবাহিতার ঘরে ঢুকে প্রথমেই বিছানা থেকে এসেন্সের উগ্র গন্ধ অংশুর নাকে এসে লাগে, তারপর ফুলের গন্ধ পায়। মূলত রজনীগন্ধা, যা খাটের বাজুতে তখনও জড়ানো; ছতরি থেকে তোড়া ঝুলছে। গোলাপে কাঁটা থাকে সে জন্যে অথচ ফুলের মধ্যে তাই-ই সবচেয়ে নরম বলে, রাতের বিছানায় অজস্র পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাঁটার তুলনায় তাও কম পীড়া নাকি, যে জন্যে নিপুণভাবে ঝাঁট দিয়ে গভীরতর রাতে তা মেঝেয় ফেলে দেওয়া হয়। সুজনির জঙ্গলি-সবুজের ওপর অজস্র সাদা বুটি, বেলকুঁড়িগুলি বিছানায় থেকে গেলে ওরকমই দেখাত, বা, সবুজ মাঠের ওপর শীতল বরফকুচি যেন, আজ অংশুর এরকম মনে হয়। দুটি কানের ফুল ও দিকে পড়ে ও একটা বোতাম, নিশ্চিত বউদির ব্রা থেকে। দৃশ্যটা ২৩ বছর পরে পুনর্নির্মাণ করতে যাওয়া, আজ, ফেরা-নেই এমন নিরস্ত্র এতদূরে এসে পড়ে, একপ্রকার বোকামি তা আমি মানি। আমাকে অবাক করে দিয়ে অংশু তবু তাই করে। এবং আশ্চর্য এই যে, সুজনিটি ছিল প্রকৃতই সবুজ ও তার ওপর অজস্র সাদা বুটি ছিল, এও ঠিক, বরফকুচির উপমাটিও তাই অনেকখানি যথার্থ হতে পেরেছে, যে জন্যে আমি অংশুকে বারবার চিয়ার্স জানাই।

এ-রকম নির্মাণ-কাজে অংশুর ব্যস্ততা তবু আশানুরূপ নয়। তাদের ৭২ পাতার পারিবারিক অ্যালবামটি আজ অংশুর কাছে অটুট থেকে গেছে। কিছু ছবি খুলে গেছে যা আর লাগানো হয়নি, কর্নারের দাগ দেখে সেগুলো সবই যথাস্থানে লাগানো সম্ভব, শেষের পাতা কটির ফাঁকে ফাঁকে ক্রমাগত জড়ো হয়ে মরক্কো-বাঁধাই অ্যালবামটি এতদিন বেঢপ করে তুলেছে। মাঝেসাঝে অ্যালবাম খুলে বসে না অংশু এমন নয়, কিন্তু ভারী আপসোসের কথা, পাতার পর পাতা উলটে খালি আমার একক ছবিগুলোর দিকেই বারেবারে আকৃষ্ট হতে তাকে দেখি। অবশ্য অ্যালবামের সকলকেই সে চেনে তা আমি বলছি না। ....মস্ত বলের দিকে উপুড় .হয়ে ৩ মাসেই আমি, তে-চাকার সাইকেলে ফুলের টবের পাশে অংশু, পুরীর সমুদ্রতীরে আমি, ততদিনে সিঁড়ি ও গুহাসহ বালির পাহাড় তৈরি করতে শিখেছি। পুকুরপাড়ে সদ্য ধরা ছিন্নভিন্ন ঘুড়ি বুকে আঁকড়ে, আমি, আ, সেই একবারই অংশু, যখন তার হাতে কাটিম কাটিম সুতো-ভরা লাটাই, গায়ে দো-বোনা হাইনেক পুলোভার, অবিকল ঠাকুমার মতন তার নীলাভ কটা চোখে নির্ভীক ও দৃঢ় অভিব্যক্তি, হাওয়ায় উড়ে মাথার চুল আক্রমণোদ্যত খাড়া—লাটাই থেকে উপচে সুতো লুটোচ্ছে মাটিতে। পাশেই, একই পাতায়, একটি ছোট্ট কোয়ার্টার সাইজ ছবিতে পড়ার টেবিলে খোলা কলম হাতে আমি, আমার গায়ে ঢাউস মিলিটারি ইউনিফর্ম, রাঙাদা কি তখন ছুটিতে না যুদ্ধের মাঝামাঝি রিব ভেঙে ডিসচার্জড হয়ে একেবারে দেশে ফিরে এসেছে? এমন সুন্দর এসেছে ছবিটা যে, সেটা এডেন বন্দরে কেনা মহার্ঘ ক্যামেরা রাঙাদার তোলা না হয়েই পারে না। অংশুর চোখে ঝুলে-পড়া ওই মোটা লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমাটিও তবে নিশ্চিত রাঙাদার, পুরু লেন্সের নীচে রাঙাদার চোখের মতন অবিকল ততদিনে তার চোখ দুটিও। তাদের বংশে ঠাকুমা ছাড়া কেবল রাঙাদার চোখের তারাতেই ছিল নীলাভা। ঠাকুমার ছবিও রয়েছে, লরির ওপর খাটে শোয়ানো, টানা বহরমপুর থেকে এসে তাদের শিবপুরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। ছিপছিপে বৃষ্টির মধ্যে ও আলো বিনা এমন উৎকৃষ্ট ছবি রাঙাদা ছাড়া কে তুলবে? ছবিটি তোলা হয় গ্লসি-পেপারে ও-সিপিয়ায়, আউট-অব-ফোকাস আমরা তখন প্রায়ান্ধকার বারান্দা থেকে ঝুঁকে।

নেকড়ের থাবাঅলা হাই-চেয়ারে বসে মা; একটা ত্রিভুজ যেন। পিছনে, বাঁ দিকে, মা-র কাঁধে হাত রেখে বাবা দাঁড়িয়ে, ত্রিভুজের দক্ষিণ প্রান্তে রাঙাদা। রাঙাদা কিন্তু হাত দুটি চেয়ারের ওপর রেখেই সন্তুষ্ট। বাবা রাশভারি হাসছেন, হাসছে রাঙাদাও, দুজনেরই মাড়ি দেখা যায়; আরও পিছনে দেখা যায় রামধনু, পাহাড় ও ঝরনা। কোনও মেলাটেলার মধ্যে স্টুডিওয় তোলা নিঃসন্দেহে। কালো তাফ্‌তা থেকে বেরিয়ে পড়ে নৃত্যপর হাতের অস্থি শাটার তুলে যখন শেষ নির্দেশ দিচ্ছে, মা তখনও তাঁর ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত অভিপ্রেত হাসিটি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি বোঝা যায়, যুবতীর ঠোঁট দুটিতে তবু হাসি একটু যেন লেগেই আছে, রহস্য যা, যা অনুধাবন করলে, অর্থাৎ প্রিন্ট থেকে নেগেটিভ হয়ে ওরিজিনালের দিকে কিছুদূর—এবং ভ্রমণ বলতে তো এই একটাই যা এপিক—খানিকটা ফিরে গেলেই অংশু একটি স্মারক খুঁজে পেত কি না কে জানে। তার জন্মের আগের দিনগুলোর কথা অংশুর জানার কথা নয়? বেশ তো, যুদ্ধের জন্যে বহরমপুরে দেশের বাড়িতে তারা যখন, বাবা কলকাতায় থেকে অফিস করছেন, মাঝে মাঝে যাতায়াত করছেন, তাদের দেখাশোনা করার ভার রাঙাদার উপর, ডিসচার্জড হয়ে একেবারে ফিরে রাঙাদা তখন ওখানেই। অংশু তো তখন বেশ বড়োসড়োই, তা ৭-৮ বছরের হবে। এই বহরমপুরেই সে, অংশু, মধ্যরাত্রির বিছানা ছেড়ে মাকে উঠে যেতে প্রথম দেখে। তারপর অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে, সে ফের ঘুমিয়ে পড়ে এবং রাত তখন কত সে জানে না যখন জেগে উঠে অংশু টের পায় মা-র হাতের তেলো তখনও ভিজে, উরু কাঁপছে, চুল বিস্রস্ত.....গরম ও দীর্ঘস্থায়ী, এলোমেলো নিশ্বাস এসে পড়ছে তাঁর মুখেচোখে, বুকে। অ্যালবামের ছবিতে মা-র মুখে, মুখে নয়, ঠোঁটে, হাসিটি আজও তেমনি, অর্থাৎ যার কোনও মানে হয় না, গোয়েন্দা লাগিয়েও বোঝা যাবে না হাসিটি আছে, ছিল না থাকবে। তবু মা-র ওই ঠোঁটে-লেগে-থাকা আপাত-অদৃশ্য হাসির সঙ্গে তার বাবা ও রাঙাদার উদ্ভাসিত মুখের একটা প্রতিতুলনা করে সে দেখলে পারত। চ্যুত ছবিগুলি পরম্পরা মেনে যথাস্থানে মাপসই বসিয়ে পরপর দেখে গেলে পারত অংশু, যে, কী ছিল তাদের মনে যা তাদের, মা ও রাঙাদাকে, দিনে দিনে উজ্জ্বল করে তুলছে, অথচ, অন্যদিকে, ছবির পর ছবিতে বাবা কত রোগা হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর চওড়া হাসি ক্রমেই লীন হয়ে এল। তার চোখ দুটির সঙ্গে রাঙাদার চোখের ওই অনির্বচনীয় নীলাভায় মিল

এভাবে, সময়ের ক্রম মেনে অনুসরণ করে গেলে একদিন হয়তো সে নিজে নিজেই বুঝে পেত, কেন দিনে দিনে অমন সোনালি স্বাস্থ্যে ভরে উঠছে তার মার নারীশরীর, ছবিটির ত্রিভুজের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে ফোকাসের বাইরে সে সেই ওরিজিনালে মিলিয়ে যেতে পারত কি না, যেখানে পা গুটিয়ে, পাশ ফিরে ও চোখ বুজে, বুকের উপর দু হাত জড়ো করে জননীর গর্ভ-আঁধারে সে বা আমি অভিসন্ধিহীন শুয়ে—আমি জানি না।

বিস্মৃতির সঙ্গে মিশে নেই, অন্তত এমন স্মৃতি বলতে অংশুর আর বিশেষ-কিছু অবশিষ্ট নেই। বাস্তবিক, বিমূর্ততা বলে যদি কিছু থাকে তবে এই একটা ব্যাপারে অংশুকে 'চিরভিখারি' আমি বলি। সাদা বুটি-ছড়ানো রাঙাদার ফুলশয্যার সবুজ সুজনিটির সত্যতা সম্পর্কে আগে বলেছি, যার উপর বউদির জামা থেকে একটা বোতাম ও কানের দুটি সোনার জুঁই ছাড়া একটিও পাপড়ি পড়ে নেই। এটা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়। কেননা ওই সব স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়েও যা বেশি, অংশুব যা মনে নেই তা হল, তারপর খাটের নীচে থেকে অতি সন্তর্পণে সে টেনে এনেছিল কৌমার্যহারা তার রাঙাবউদির বিবাহের ট্রাঙ্ক, আঙটা খুলতেই চাপে লাফিয়ে ওঠে ডালাটি এবং ঠাসা জামা কাপড়ের উপর বিছানো বিবাহের জোড়ের উপর কয়েকটি চকচকে বই তার চোখে পড়ে। যার মধ্যে, কিছু না-বুঝে, ক্লাস নাইনের ফার্স্ট বয় অংশু অতি অবোধভাবে তুলে নেয় মারি স্টোপ্স-এর 'বিবাহ ও জীবন' নামে অনূদিত বইটি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঙাদা এসে কান মূলে বইটা তার হাত থেকে কেড়ে নেয় এবং পুনরায় ট্রাঙ্কের ভেতর বেখে এবার চাবি দিয়ে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই বইটা আন্দাজে খুলে বিনা আয়াসে অংশু পেয়ে গিয়েছিল প্রয়োজনীয় পাতাটি, সম্ভত, বইটিব শেষাশেষি বাঁ দিকের পাতাব মাঝ বরাবর অবশ্যম্ভাবী কটি পঙ্‌ক্তিই কেবল টেনে নিয়েছিল তার চোখের তারা যা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে অবিলম্বে পড়ে ফেলে 'সঙ্গমেব পব পু[illegible]সের উচিত,' সে পড়েছিল, 'তাব পুরুষাঙ্গ নারী শরীরের মধ্যে বেখে এবং নারীর উচিত পুরুষাঙ্গ তাব শরীব অভ্যন্তবে নিয়ে ও রেখে, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ঘুমিয়ে-পড়া।' এতে করে, শ্রীমতী স্টোপ্স দেখেছেন, 'গভীরতব রাতে তাদের একসঙ্গে নিশ্বাস নিতে ও প্রশ্বাস ফেলতে দেখা যায়।' এটুকু পড়েই ঝপ করে অংশু বইটি বন্ধ করে ফেলে। এর মানে কী? ভালো কবে কিছু বুঝে পাওয়াব আগেই পঙ্‌ক্তিটির সর্বগ্রাসী ঘূর্ণি তাকে টেনে নেয়, রাঙাদা এসে কেড়ে নেওয়াব পরেও বেশ কিছু সময় ধবে বিবাহেব শূন্য ঘরে গ্রন্থ-হাবা নিশ্চুপ বসে থেকে এভাবেই সে, অংশু, জীবনে প্রথম নারীকে ভালোবাসাব ও তার ভালোবাসা পাওযাব প্লেটনিক্ প্রযোজন মূলে মূলে টেব পায ও আমাকে পাওয়ায়। আমাদের বাকি জীবনের জন্যে চেতনাধারার অববাহিকা সেখানেই একরকম ঠিক হযে যায়।

তা, কখনও-কখনও তুমি যাকে এখনও মনে কর তোমাব 'প্রথমতম স্মৃতি', অংশু, তুমি সেটাই ভুলে মেরে দিলে, অ্যাঁ? ভুলে যেতে সে পারল কী কবে, আমি অবাক হযে ভাবি। কেননা, ওই বোধই হচ্ছে সেই বড়শি, রাতেব প্রখর জলে গেঁথে তুলে যা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল খরতর জলে, জাল ছিঁড়ে, জলেব অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে, ফেরার পথ না রেখে, বাধা না দিয়ে, অংশু চলে গেল অতদূর? চিহ্ন-বিনা? একটিও স্মাবক না রেখে? নিয়তির দিকে এভাবে কি বহে যেতে দিতে আছে, অংশু একদিন তোমারও হাতে উঠে এসেছিল কাটিম কাটিম সুতোয় ভরাভবতি লাটাই। সুতো ছাড়তে ছাড়তে তুমিও গেলে পারতে।

সপ্তাখানেক আগে বেলেঘাটায় গিয়ে অংশু দেখে, 'এ-রকম কোরো না বাবা বুঝলে, এ-রকম কোরো না বাবা, সোনা আমার', বলে দামড়া ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে রাঙাবউদি বোঝাচ্ছে। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়। তড়িতের মুখ-চোখ দেখে অংশু বোঝে, এভাবে হবে না। তড়িৎকে শনিবার সকালে সে তাদের বাসায় আসতে বলে। 'শনিবার?' মা-র ভুজবন্ধন ছাড়িয়ে তড়িৎ উঠে দাঁড়ায়। খালি গা, খোলা বেল্ট ট্রাউজারের আঙটায় আটকে সামনের দিকে ক্রেস্টসহ ঝুলে রয়েছে। ঘনকালো জোড়া ভুরু চোখ দুটো পেয়েছে মায়ের থেকে, সবসময় সজল, চোখের নীচে নীলচে কালি, কোলে আঁচড়। ইতিমধ্যেই, আমার অজ্ঞাতসারে, ওর শরীরটা বেশ গড়ন পেয়ে গেছে দেখছি। তবে মুখখানা তুলনায় রোগাই থেকে গেছে। মুখশ্রী বুকের দিকে কিছুটা লুটিয়ে সে দাঁড়িয়ে, বুকের পাটা ইচ্ছে করেই একটু চিতিয়ে রেখেছে। তড়িৎ এই স্বাস্থ্য পেয়েছে

বউদির কাছ থেকে; কিন্তু সৌন্দর্য......রাঙাদা ছিল বরাবরের রোগা ও লম্বাপানা, বাট হীন ওয়জ মোর দ্যান হ্যান্ডসাম, হি ওয়জ বিউটিফুল! এবং ওই রোগা সৌন্দর্যকে নারীর স্বাস্থ্যের ওপর চাবুক হিসেবে ব্যবহার, এছাড়া কিছু, কোনও অভিলাষ, তার কখনও ছিল না।

—শনিবার? ও বলে, 'কেন?

—দরকার আছে। আয় না। রোববারই ছেড়ে দেব।'

তড়িৎতের জন্যে অংশু সত্যিই আবার বই খুলে বসে। এককালে তারাও পার্টি করত, মেয়েরা যেমন চুড়িসুদ্ধ ঝনাৎ করে আগে একবার ঝেড়ে নিয়ে মুখে পাফ বুলোয়, তেমনি, কিছু পড়াশোনাও করেছিল। সে বাবদে লেনিনের ৩ ভল্যুম সিলেক্টেড ওয়র্কস থেকে যাওয়ার কথা, ৩টির জায়গায়, একযুগ পরে, মাত্র একটি পায়। প্রয়োজনীয় লাইনগুলির জন্যে এতকাল পরে তার সে কী খোঁজাখুঁজি। 'লার্ন!' সে পেয়ে যায়। 'আই মাস্ট সে দা টাস্কস অব দা ইউথ ইন জেনারেল মে বি সাম্‌ড-আপ ইন ওয়ান ওয়র্ড : লার্ন।' 'যদিও ওল্ড স্কুল থেকে যা শিখবে তার টু-থার্ড আর ব্যবহার্য নয় এবং বাকি ওয়ান-থার্ড বিকৃত'—এই অংশটা দাগাবার সময় কীভেবে অংশু বাদ দিয়ে যায়। এভাবে শনিবার তড়িৎ-এর সম্মুখীন হওয়ার জন্যে তৈরি হয় সে, পেন্সমার্ক দিতে দিতে। 'Partisan warfare is an inevitable form of struggle', এক জায়গায় পায়,' at a time when the mass movement has actually reached the point of insurrection The argument that the partisan warfare, which is engendered by powerful political and economic causes, disorganises the mass-movement must be regarded critically Every new form of struggle, accompanied as it is by new dangers and new sacrifices, inevitably 'disorganises' organisations which are unprepared for the new form of struggle Every military action in any war, to a certtn exten, disorganises the ranks of the fighters But this does not mean that one must not fight It means that one must learn to fight That is all " গুডনেস্! তড়িৎ পড়েছে নাকি এ-সব! অংশু তাড়াতাড়ি পাতাগুলো উলটে যায়।

শনিবার তড়িৎ এল না। রবিবারও না। সোমবার সকালেই হেমন্ত বসুর খুন হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। তখন থেকেই ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে অফিসের হলগুলো। সর্বত্র থেকে নানান গুজব এসে জড়ো হতে থাকে। 'তুমি এখনও অফিসে?' ১২টা নাগাদ ফাঁকা হলে কাচের ঘরে একা, হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে শ্রীকান্তদা জানতে চাইলেন, 'খবর শুনেছ? রাত্তিরেই মিলিটারি নেমে যাচ্ছে। আজ রাত ৮টায় বি বি ঘোষ অ্যানাউন্স করছে।' আমি বলতে চাই, না তো। রেডিও বার-বার করে বলছে বটে, শ্রীবিবি ঘোষ স্পেশাল অ্যাডভাইসার টু দা গভর্ণর অব ওয়েস্ট বেঙ্গল উইল স্পিক টু দা পিপল অব.....বিষয়বস্তু তো বলেনি। সে তো 'আন্তর্জাতিক কণ্ঠ দিবস' ব্যাপারেও হতে পারে। কিন্তু অংশু ঘাড় নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ।' সে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

অফিস থেকে পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত হেঁটে আসতে হয়। এ-সব দিকে যুবতীর উরু বরাবব দেখা গেছে, সন এর মাঝামাঝি। আজকাল নাভি ও তলপেটের খানিকটা করে দেখা যাচ্ছে। তার তাড়া ছিল এবং এ তো নতুন কিছু নয়, মোড় বেঁকেই লিপটন-বিজ্ঞপ্তির ঠিক নীচে কম দামি ছাপা-পরা একজন বিবাহিতা যুবতী দেখে অংশু ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? মেয়েটি শ্যামাঙ্গী, বধূটি। সে ছোটোখাটো। পাশে তার রং-ওঠা সোয়েটার ও কটনের ক্রিজহীন প্যান্ট-পরা গড়পড়তা স্বামী, মুখে অন্তত একদিনের দাড়ি। 'নখের ময়লা ঢোকাও বেশ ঠেসেঠুসে, আর ঝাল দিয়ো আঁচ্ছা করে', এক ছোকরা তার ফুচকা-সম্পর্কে এরকম বলে বধূটির দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে পারলেও, অবোধভাবে হেসে, হাসি সে গলাধঃকরণ করে নেয় ফুচকার ঝোলের সঙ্গেই, বধূটি।

ওই মেয়েটিকে পেলে ভালো হত; প্রেম হত। বা, ও-রকম আরও-কত চেতলা, আহিরিটোলা, কচিৎ লেকটেরাস বা আলমবাজারের মেয়েদের, একসঙ্গে নয়, একবারে একটি করে মেয়ে পেতে থাকলে ঠিক হত, মানে, যতদিন না সঠিক মেয়েটি নগরীর লোহার সিঁড়ি ঘুরে ফুটপাথে উঠে আসে।

আমি ভাবলুম, ছি-ছি, যাকে মনে থাকা বলে সে ভাবে অংশুর কি আমাদের মাকেও মনে নেই? অন্তত, দশ বছর অবধি তো দেখেছিলি? বেচারা।

বাসট্রাম বন্ধ। বহু কসরত করে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে ৯টা হয়ে যায়। মোড় থেকে বাড়ি অবধি আজ রাত ৯টা নাগাদ অংশু হেঁটে আসতে পারে না। তার ভয় করে। একটা পানবিড়ির দোকান পর্যন্ত খোলা নেই। শুধু সাইনবোর্ডগুলো আলোকিত করে কর্পোরেশনের নিয়ন জ্বলছে। পথ এমন প্রাণহীন ফাঁকা যে বোর্ডগুলো যেন একটু দূরে দূরে মনে হয়। অংশু একটা রিকশা নেয়। রিকশাওয়ালার কাছে পাড়ার অবস্থা জানতে চাওয়ার সাহস হয় না, মানেও হয় না। রাস্তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়. একটু আগে স্ট্রিট-ফাইটিং হয়ে গেছে। বরং ভাড়াটা আগে থেকে বের করে এই শীতে সে রিকশাওয়ালাকে জোরে চালাতে বলে, যাতে, তাদের হাউসিং এস্টেটের সামনে থামামাত্র ভাড়া গুঁজে দিয়ে অংশু নেমে পড়তে পারে। সে চালায়। আকাশে চাঁদ আছে কি নেই কে আর লক্ষ করে। অংশু করে না। রিকশাওয়ালার মুখও ছিল তেমনই বাহুল্য। ৩০ পয়সা ভাড়া দিতে গিয়ে ১টি সিকি ও ২টি ৩ পয়সা দেওয়ার সময় অংশু ১ পয়সা বেশি দিচ্ছে, এটা লক্ষ না করে আমি পারি না।

হাউসিং এস্টেটের ভেতরে ঢুকে ফাঁকা সুরকির রাস্তা ধরে ৫টি ব্লক পেরিয়ে এফ-ব্লকের কাছ থেকে তাদের কে-ব্লকের চারতলার ফ্ল্যাটটি প্রথম দেখা যায়। আলো জ্বলতে দেখে গত ৫ বছরের প্রতিদিনের অভ্যাসমতন অংশু একটা ছোটো নিশ্বাস ফেলে অর্থাৎ, আছে।

তিনটি ছেলের মধ্যে দুজন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে।

—কে? ও, কাকাবাবু। আমরা মনে করেছিলুম.....এত রাত হল?

অংশু ছেলেটিকে চিনতে পারে। 'আপনি কি কিছু শুনেছেন?' রবি বলল, 'আমাদের এস্টেটে আজ একটা বোমা পড়েছে।'

—কারা ছুড়ল?

—না, ছোড়েনি কেউ। কর্কশস্বরে একজন অন্ধকার থেকে বলল।

—মানে, আমাদের দলের কেউ নয়। রবি বিনীতভাবে জানায়, 'এখানে এম-এল পার্টির ছেলে রয়েছে। কথা হচ্ছে, তারা কারা। আমরা তাদের খুঁজে বের করবই।'

—এটা আমাদের লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন। কর্কশ গলা জানায়। রবি বলল, 'এই এস্টেটের মধ্যে অন্য দলের ছেলে আমরা থাকতে দিতে পারি না।' চারতলায় উঠে ফ্ল্যাটে বেল বাজার সময়টুকু জুড়ে অংশুর মনে হয় বাড়ি থেকে তার শান্ত বেরনো এবং যার-চেয়ে-ছোটো-ভালো এমনভাবে হেঁটে ফেরার তারতম্য এতদিনে নিশ্চিত অনেকেই লক্ষ করেছে।

তড়িৎতের জন্যে 'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ্‌স ব্যাক' পড়ে শেষ করতে বেশ রাত হয়ে যায়। জানলায় দাঁড়িয়ে আজকের মতো শেষ সিগারেট ধরাতে গিয়ে অংশু দেখে হোয়াইট ওয়াশ শেষ, তিনজন গেটের দিকে মুখ করে চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে। নীচে তাদের কম্পাউন্ডের দেওয়ালের সামনে একজন আলকাতরার টিনে ব্রাশ ডোবাচ্ছে। এবার লিখবে।

অংশু তাড়াতাড়ি এ-ঘরে চলে আসে। 'এই, এই, নকশাল দেখবে?' বলে রেবাকে তোলে। চোখ রগড়ে ভালো করে দেখে রেবা বলে, 'ও তো সুবোধবাবুর ছেলে। মনা!' মনা 'হিংসার উত্তর আমরা হিংসা দিয়েই দেব' পর্যন্ত লেখার সময় জুড়ে রেবার ব্লাউজ ও আলগা সায়ার ফাঁকে তার বাহুল্য-বর্জিত কোমরের ওপর আমার হাতের কাজ চলতে থাকে।

—ইস। মাংস খেয়েছ?

—হুঁ। শ্রীকান্তদা খাওয়াল।

মুরগি?

না।

উঁউঁউঁ। 'না বইকী। কতদিন মুরগি খাওয়াওনি।' ছাতি ইঞ্চি-দুই ফুলিয়ে বোধ হয় তো মুরগির কারণেই রেবা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাস টানে।

—যাই বলো, মুরগি-মাটন এই বয়সে আর পোষায় না। তাই ওই একটা মাংসই খাই যাতে ছিবড়ে লাগে না।'

'?'

পাছাসহ রেবার উন্মুক্ত কোমর টেনে নিতে নিতে অংশু রেবার কানে চুম্বন করে। 'মাগীর মাংস', ওখানে বলে।

হেমন্তের বেলাবেলি দিন। সামান্য মেঘ করেছে। সমস্ত খড়খড়ি খুলে রেবা শার্সি বন্ধ করে দিয়েছে। জলভরা অ্যাকোয়ারিয়মের মতো মেঘলাভাঙা আলোয় ফ্ল্যাট ভরে গেছে, অংশুর সামনে রেবা কিলোখানেক কড়াইশুটি ঝুড়িভরতি নামিয়ে রেখে যায়। কচুরি করবে। ইতিমধ্যেই স্নান সেরে ও চুল খুলে ফ্ল্যাটময় রেবা খেলে বেড়াচ্ছে, অধোঃ নেমে কখনও-বা ঊর্ধ্বেও উঠে যাচ্ছে যেন। কে বলবে এই মহিলা, এই প্রিয় অভিভাবিকা, সকালবেলার এই মারি ম্যাগদারিন, কাল রাতে শানানোর সময়সহ অন্তত আধঘণ্টা ধরে, পড়ে পড়ে, মোটামুটি শান্তভাবে, অংশুর চাকু খেয়েছে।

অংশুর সামনে টেবিলের উপর সকাল থেকে আজকের আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে আছে। প্রথম পাতায়, হাসপাতালের বন্ধ দরজায়, কলেরা-আক্রান্ত শিশু কোলে ক্রন্দনরতা মা-র একটি সেন্টার-স্প্রেড ছবি বেরিয়েছে— খোলা বুক মরণপণে চুষে শিশুটি ঢলে পড়তে চাইছে জীবনেরই দিকে। অংশু না-দেখলেও, মানুষের ইতিহাসচেতনা থেকে ৪ কালামব্যাপী ধূসর ছবিটি, একটিও পাতা না কাঁপিয়ে, তার লক্ষ লক্ষ কালো গ্রেন মেলে ধরে, সেই কোন ভোরবেলা থেকে অংশুকে দেখছে, আমি জানি। স্বর্গস্থ পিতঃ ঈশ্বরই কেবল একমাত্র চক্ষুষ্মান নন, আমি জানি, এক একটি ছবিও কিছু দেখে। মানুষের চেয়ে বেশি স্মৃতিধর কিছু কিছু ছবির বিষাক্ত উদাহরণ তো মিউজিয়ামগুলিতে থেকে গেছে, নয় কী, যা পোকারা চেনে ও কখনও কাটে না? সংবাদপত্রের লক্ষ লক্ষ কপিতে ছড়িয়ে পড়ে আজ যা শ্রেষ্ঠ তামাশা, নিদারুণ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে একদিন যা ভাবত পোড়াবে, সে দিকে এতটুকু এগোবার চেষ্টা না করে ৪ কালামব্যাপী ওই নিদ্রিত আগ্নেয়গিরির মুখে উপুড় করে ঢেলে অংশুকে এককিলো ফ্রিজের শিশির-মাখা কড়াইশুটি ছাড়াতে দেখে, সত্যি কথা বলতে কি, হেসে না ফেলে আমি পারি না।

এই অংশুর ভবিতব্য, এ-ছাড়া আমি জানি, অংশুর জীবনে হওয়ার কিছু নেই। শুনতে ৩৭, আসলে কিন্তু ৫০ থেকে অংশু আর মাত্র ১৩ বছর দূরে। তার বয়স ৩৭, এটা বলার আর কোনও মানে হয় না, আমি ভেবে দেখেছি। এর মানে কী, এই জন্ম থেকে ৩৭? জাস্ট, স্রেফ-একটা, কিছু-নাঃ—তা ছাড়া কী। উলটোদিকে ৫০-এর পরে কিছু নেই।

অমি মানি এবং অংশুর টু-থার্ড এটা মানে। কিন্তু তার বাকি ওয়ান-থার্ড মনে করে এখনও ১৩ বছর থেকে গেছে এবং মৃত্যু ছাড়া ইতিমধ্যে যদি কিছু হয় তো আগামী ১৩ বছরেই সেটা হবে—এ-রকম একটা আশা ছেড়েও অংশু ছাড়তে পারে না, এই হয়েছে অংশুকে নিয়ে আমার মুশকিল। বুঝি আমিও। অর্ধশত বৎসরের একটা গোটাগুটি জীবনে আর কিছু হওয়ার নেই এটা কেমন যেন কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আগামী ১৩টা বছর সে তাই কারও ওপর, কিছুর ওপর, আর ভরসা করে না। আজ তাকে ফাঁকি দিয়ে, ৫০-এর এই আসন্ন বছরগুলোয় অন্তত, কিছু ঘটে যাওয়া দুঃসাধ্য। সে এত এলার্ট, সে মনে করে। ভালো! কিন্তু তার আজ ভোরবেলার কাণ্ড দেখে আমার মনে হয় এমন তো হয়নি যে তার আর সব একে একে ডুবে গিয়ে আজ ভেসে আছে শুধু চোখ দুটো?

শিবপুরে বটানিক্যাল বাগানের লাগোয়া শ্রমিকদের জন্যে তৈরি সস্তা ফ্ল্যাটে সুবল বাসা বদলেছে। এই তো, মাস ছয়েকও হয়নি, সে গিয়েছিল সেখানে। সুবল বাড়ি নেই। এটা আমি কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে আজকাল বাড়ি বা অফিস যেখানেই হোক, গিয়ে অংশু কাউকেই আর তেমন পাচ্ছে না। যেন যে যার ঘরে আর নেই। মীনাক্ষীর বাড়ি তো বরাবর হুট করেই চলেছে এবং ১২ বছর ধরে সময়ে-অসময়ে ঠিকই

বাড়িতে পেয়েছে বা একটু পরেই পেয়ে গেছে। তারপর পর পর দু দিন মীনাক্ষী বাড়ি নেই। একদিন তো একবেলা অপেক্ষা করেও ফিরল না। গত দোলের দিন দুপুরবেলা তাদের দমদম পার্কের এ প্রান্ত থেকে যাত্রা করে, শ্যামবাজারে বাস পালটে, ট্রাম ধরে গোটা সার্কুলার রোড ঘুরে, নানারঙের রাস্তা অনেকটা মাড়িয়ে, সে পৌঁছয় ও-প্রান্তে ল্যান্সডাউন রোডে মনোজদের বাড়ি। সেই ফার্স্ট-ইয়ার থেকে আসা-যাওয়া, মনোজদের বাড়ি কখনও বেল দিতে হয় না। সদর বরাবর খোলা থাকে। এই সে দিন পর্যন্ত অংশু রাস্তা থেকেই ডাকাডাকি করেছে। এই সে দিন, ভাবতেও অবাক লাগে। নামেই বয়স ২০ পেরিয়ে ২৫, ২৫ থেকে ৩০ হয়, আসলে কিছুই না, কিছু পালটায় না। অন্তত প্রথম পাকাচুলটি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়বেই, এ কথা সত্যি নয়। তারপর হঠাৎ একদিন বয়স বাড়ে।

যা বলছিলুম। ভেজানো দরজা ঠেলে করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগে অংশু বাঁ দিকে বাথরুমে ঢুকে পেচ্ছাপ করে নেয়, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে গলা জমকালো করে তারপর ডাকে, 'মনোওওজ?' দ্বিতীয়বার ডাকার সময় উত্তীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও, এর আগে উত্তরের জন্যে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে এবকম অপেক্ষা তাকে আগে কখনও করতে দেখিনি। আবার ডাকার দরকারও হয় না। তার আগেই দালানের মুখে দাঁড়িয়ে মনোজের মা সাড়া দেন, 'কেএ?' অবশ্য তাঁকে দেখা যায় না।

—আমি মাসিমা। অংশু বলে।

—কে, অংশু? মনোজ তো নেই বাবা।'

নেই! অপ্রত্যাশিত কিছু নেই তবু।

—গেল কোথায়? অংশু নীচে থেকে জানতে চায়।

তা তো জানি না বাবা। দুপুরে কাকে যেন ফোন করছিল। খুরুটে তোমাদের চেনা কেউ থাকে, তুমি জানো? হয়তো খুরুটে গেছে।

হয়তো খুরুট? মনোজ সহসা বলে ফেলে, 'না! চলি মাসিমা। বলবেন মনোজকে।' বলে বেরিয়ে আসে।

ওরকম দুম করে 'না-না' বলে ব্যাপারটা আর একটু পারস্য করলে পারত অংশু। মনোজ এখন ঠিক কোথায়? সে ভেবে দেখলে পারত। মনোজকে কোথাও প্লেস করার চেষ্টা করলে পারত—এবং শুরু করা তো একেই বলে। অংশুর চেষ্টা নেই।

অন্তত ৬ মাস আগে সুবলেব বাসায় একটা কাণ্ড তো ঘটতই।

সুবলের মেয়ে তার জন্যে দুটো পরটা আনে। মলিনা চা নিয়ে ঢোকে। নামিয়ে রাখে ও, চলে যায না। সুবলের বউ অসম্ভব রোগা। চোখ তার হিম, অংশু জানে।

জানালার পাশেই একটা অন্য ধরনের পাম গাছ। ও দিকে আরও একটা। 'কী ব্যাপাব!' অংশু অবাক, 'ভারী অদ্ভুত তো গাছগুলো?'

মলিনা বলল, 'হ্যাঁ! বাগানের খানিকটা কেটে নিয়েই এই কোয়ার্টারগুলো হয়েছে তো, আসলে এগুলো বাগানেরই গাছ। আপনি পর্দা তুলে দেখুন। দেখুন না!'

বেশ ছোঁয়াচে মেয়েটির উৎসাহ, মলিনার। সুবলদের আগের বাসায় যখন সে, তখনও অংশু বিয়ে করেনি, খালি গলায় অবিকল ছোটবেলার যূথিকা রায়ের গায়কীতে মলিনা একদিন গেয়েছিল, 'ঝর-নো পাত ারো পঅথে—কুসুম-ে া দল-িয়া পা-া-ায়—', সেই থেকে অংশুর চোখে সে গায়িকা। তখন সুবল তাকে বাঁজা মনে করত, যদিও তাকে সন্তান উপহার দিতে মলিনা সামান্যই দেরি করে ফেলে। এই নিয়ে তিনবার অ্যাবরশন করাল, সুবল তাকে শেষপর্যন্ত একটি হারমোনিয়ম কিনে দিয়েছিল কি না কে জানে। মলিনা চেয়েছিল।

পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের কাঁটাতারের ও পাশে বেশ খানিকটা বাগান মলিনা অংশুকে দেখায়। শেষদুপুরে ঝাউয়ের সারির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ঝরা-পাতায় ভরা ছায়াবীথি.....দূরে অর্কিড হাউসসহ একটা পোল অবধি দেখা যায়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া হয়তো ওরই নীচে? মলিনার জাগ্রত কণ্ঠা ও উড়ন্ত মধুরঙা চুলের ফাঁক দিয়ে ওই ঘন ছায়া ও পথ মূল ধরে ভীষণ টানে অংশুকে। সেই কোন ছেলেবেলায় সে, খেলা

ফেলে, দাদার সাইকেল নিয়ে প্রায়ই চলে আসত এই বাগানে, তখন একা ঘুরে বেড়াত। তখন প্রতিটি নুড়ি ও প্রত্যেকটি ঘাস চিনত। পরটা ফেলে, কই গেল না ত অংশু? কত চিহ্ন পড়ে আছে, গেলে কিছু পেত কি না কে বলবে। বা, মলিনার পাশেই সে তখন—দূরে ছায়াবীথি, পোল, পোলের নীচে হয়তো ভিক্টোরিয়া রিজিয়া, আরও দূরে অর্কিড হাউস—চুল তুলে গায়িকার ঘাড়ে একটি চুমু খেলে সেটাই তো হত তখন সবচেয়ে স্বাভাবিক। 'পার্ক থেকে ঘুরে আসছি মা', বলে মলিনার মেয়েও বেরিয়ে গিয়েছিল। অংশু আমাকে সংযত করল কেন? একবার যখন তার দু হাত একসঙ্গে কেঁপে উঠল, বড়ো আশা করে স্নায়ুর অন্ধকাব গ্যালারি থেকে একা-দর্শক আমি চিৎকার করে উঠেছিলুম, তার বাহুমালা এই বুঝি সে পরিয়ে দিল যূথিকা রায়ের গ্রীবায়, আমি ভেবেছিলুম, দিনে দিনে বেড়ে উঠে যা এত বছর মলিনার মুখখানা অংশুর জন্যে তুলে ধরে রেখেছে। তাব বদলে, রাঙাদার আজানুলম্বিত কাঁপা হাতে সিগারেট বের করে অংশু কিনা বলল, 'দেশলাই আছে?' তারপর স্বয়ং দাঁড়ায় জানালার রড ধরে। দূরে ছায়াবীথি, পোল, ভিক্টোরিয়া-রিজিয়া বোধ হয় তো ওখানেই, অর্কিড হাউস পর্যন্ত দেখা যায়—কিন্তু যে দেওয়ালে দরজা নেই তার জানালার রড ধরে আমৃত্যু থাকলেও কি অংশু কখনও বেরুতে পারবে? চোখ দুটির পক্ষেও তার আয়ুষ্মান দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভবপর হবে কি? কী জানি।

গোড়ার দিকে বিয়ে করে সুবল বাগবাজারে বাসা নেয়। বেশ কয়েক মাস লুকিয়ে দেখা করেছিল মলিনা। আমার খুব মনে পড়ে, একদিন, সেই-ই বোধ হয় শেষদিন, বাগবাজার জেটিতে বাঁধা একটা গাধাবোটের অন্ধকারে আমরা বসি। সে দিন ছিল চৈত্রমাস, ১০৮ গরম পড়েছিল। হঠাৎ-ঝড়ে মলিনার মুখের আঁচল উড়ে গেলে, আমি তাকে তখুনি চিনে ফেলি। সেই উড়ন্ত আঁচল ধরে টেনে ওর রিস্টলেসসুদ্ধ শুভ্র কবজি চেপে ধরে ও কাছে টেনে আনতে আনতে অংশু জীবনে প্রথম ভয় ও সর্বনাশ টের পায়, আমি নয়। আমি বুঝে পাই, এই সেই নারীর দক্ষিণবাহু যার কারণে অশ্রুপাত ও রক্তপাত করার জন্য যা পাচ্ছে তার ওপবেই হাত রেখে সকল যুবক একই আবহমান খুঁজছে। যেন, অবিকল পদ্যের সেই, 'রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে, যতক্ষণ চিনি নাই তোরে!' ঠোঁটে তর্জনী রেখে সেই প্রথম হিমচোখে মলিনা আ-মা-র চোখে চোখ রেখে ক্ষণকাল তাকায়।

তারপর হঠাৎ কুলকুল করে হাসতে থাকে সে; চৈত্রের ঝড় ও ঘনঘন বিদ্যুৎ ও বোটের দোলানির মধ্যে, 'ভালো হচ্ছে গো—ঠিক আছে—বলছি, বলছি—সত্য—এ ভীষণ অন্যায় কিন্তু—' বলতে বলতে সরে যেতে থাকে হাসতে হাসতে। কী যে হল অংশুর, আর আমারও কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মনে হল, মন নয়, শবীব নয়, ওই হাসিটাই আ-মা-দে-র আগে ধরা উচিত। অংশু ওর হাত ছেড়ে দিল, আঁচল গলে গেল আমার তালুর ফাঁক দিয়ে। 'ইশ্‌শ! কটা মাথা আছে ঘাড়ে?' বুকে আঁচল তুলে মলিনা এবার সরাসরি ডাক দেয়!

সেই যে আমরা পারিনি, আমি তখুনি জানতুম, অংশু বাকি জীবনে আর কিছুই পারবে না। কাজেই অংশু এখন 'দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না', এইসব বলছে।

—দিদিমণি! দিদিমণি!

খুব ভোরে চাঁপির-মা ছাদে গিয়ে আগুন ধরায়। তারপর চা করে রেবাকে ডাকে। সাড়ে ৮ টায় অংশুকে বেরুতে হয়। বেস্পতিবার ভোরে দরজায় ঘুঁষির পর ঘুঁষি মেরে সে রেবাকে তোলে, 'দিদিমণি শিগগির আসুন। দাদাবাবুকে তুলুন।'

ওরা তিনজনে ছাদে যায়। ভোর হচ্ছে, কুয়াশা ভেদ করে লাল আলো এসে পড়েছে ওর মুখেচোখে, মুখ এ দিকেই ফেরানো, মুখের আঁশটে রং তবু মোছেনি। 'সি' ব্লকের সুবোধবাবুর ছেলে মনাকে দেখে চেনা যায়। অলিভ গ্রিন ট্রাউজার পরে মুখ ফিরিয়ে চিত হয়ে সে শুয়ে, কোমরের কাছে বেরিয়ে রয়েছে আন্ডার-উয়্যার, গায়ে জাম্পার। ডুব দিয়ে ওঠার পর যেমন হয়, হিমে-ভেজা চুল লেপটে রয়েছে কপালে—হাত

দুটো মুঠি করা—রগের কাছে গড়িয়ে এসে ক্ষীণ রক্তরেখা গালেই শুকিয়ে গেছে। শীতল জল থেকে তুলে আনা ঝরঝরে নুড়ির মতন চোখ দুটো এখনও খোলা।

রেবা গোঁ-গোঁ করে ফিট হয়ে পড়ে। কোলে করে অংশু তাকে নীচে নামিয়ে আনে। চাঁপির-মা পরামর্শ দেয়, তারা প্রথম দেখেছে এটা জানাজানি হওয়া ঠিক হবে না। একসময় কৌতূহলবশত কেনা কয়েকটি সাপ্তাহিক 'দেশব্রতী' অংশু বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। 'দি অ্যানালেক্টস অব কনফুসিয়াস' বইটা এমনিতে পোড়াত না, প্রচ্ছদের চিনা-হরফ তথা বইটি বাই-লিংগুয়াল হওয়ার দরুন সেটিও পোড়াতে গিয়ে তার হাত দস্তুর মতো পুড়ে যায়।

শুক্রবার দিন দাড়ি কাটতে গিয়ে সেলুনের আয়নায় একবার দেখা দিয়েই সে আয়নার বাইরে চলে যায়। একটু পরে আয়নায় আরও দুটি ছেলে, কে জানে মোট ৪ জন কি না তারা, চারজনের কথাই তো থরোথরো অক্ষরে বারংবার ছাপা হয়। আরও-একজনের প্রতিফলন আমার কামানো ডানগালের পাশাপাশি ভেসে ওঠে। তার চোয়াল বিধ্বস্ত, আয়নার বুক পর্যন্ত ভাসিয়ে একটুও না এগিয়ে সে এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। আয়নায় ওই লম্বালম্বি ক্র্যাকটি আগে ছিল কি?

তড়িৎ শনিবার আসেনি। পরের শনিবার তার খবর এল। ওরা তখন বিছানায়। উঠে টেলিফোন রেবাই ধরেছিল। 'বেলেঘাটা থেকে', বলে রিসিভারের মুখ চেপে ব্যাকুল হাতছানি দিয়ে সে অংশুকে ডাকে। রেবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রিসিভার তুলেই অংশু রাঙাবউদির ফোঁপানি শুনতে পায়। তারপর থেকে সারারাত—- এই এখন রবিবার রাত ১২টা নাগাদ প্রথম অবসর। হাসপাতালে একবারটির জন্যে যেতে পেরেছিল, পুলিশ হাঙ্গামা পোয়াতেই সময়ের সবটাই চলে গেল।

মৃতবৎ তাকে হাসপাতালের গেটে পাওয়া যায়। তার জিভ বেরিয়ে পড়েছে, ফুলে রাক্ষসের মতন ঠোঁট, পাঁজরার রিব ভেঙেছে কি না কাল জানা যাবে। তার জ্ঞান রয়েছে। তার অতিতেকণ মুখে সরল শান্তি, অংশু যতক্ষণ ছিল সে একবারও 'উঃ'-'আঃ' করেনি। 'গায়ে একটা মাছি বসলে লাগছে', এই হচ্ছে একদিকে বাধ্যত কাত হয়ে শুয়ে, তার অভিব্যক্তি।

রাতের খাবার নাড়াচাড়া করে এসে অংশু চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে। রান্নাঘরে কফির পেয়ালায় রেবার চামচ ঘোরানোর শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎই অংশুর স্পষ্ট মনে পড়ে যায়, এই তো বছর দুই আগেও, আমি যখন একদিন রেবার ভাইঝি জুলিকে উপেন্দ্রকিশোরের 'কুঁজো আর ভূতো' পড়ে শোনাচ্ছি বাচ্চা মেয়েটাকে টেক্কা দিয়ে দম ফাটিয়ে হাসতে হাসতে তড়িৎকে এই বিছানাতেই লুটোপুটি খেতে সে দেখে, গল্পের মধ্যে ভূতদের 'লুন হ্যায় ইমলি হ্যায়' শীর্ষক গানটিতে তার সেই ইনস্ট্যান্ট সুরারোপ—এই সে দিনের কথা, তড়িৎ তখন রীতিমতন কলেজিয়ান। হায়, এর বেশি অংশু আর বিশেষ-কিছু মনে করতে পারে না। এইটুকু স্মৃতির তৃণসম অবিরাম, অবিরামভাবেই তার শরীরময় ৩৬ বছর ঘুমের দিকে নত হয়ে পড়ে...অত বড়ো ছেলে, শেষ যে দিন এসেছিল, আঃ, কতবার অম্লানমুখে সিগারেট এনে দিয়েছে—কফির পেয়ালার চামচ-ঘোরানোর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমের দ্রুততর ঘূর্ণির ভেতর ঢলে পড়ে শরীরময় শ্লথ ও নীবিবন্ধহারা ঘুম, অংশু চট করে ঘুমিয়ে পড়ে।

....সমুদ্র সরে গেছে। সরে গিয়ে উন্মোচিত করে রেখে গেছে তার ক্ষণকালব্যাপী তলদেশ, কেননা, অন্ধকার পটভূমি জুড়ে সমুদ্রের কলরোল কখনও থামেনি। বিরতিহীন বিদ্যুচ্চমকে তৈরি অলৌকিক দিনের বেলায় তলদেশে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে একটি জনপদ—সারি সারি কোয়ার্টার—শুকনো, খটখটে বাড়ি সব—অধিকাংশ একতলার। ছাদের তারে জামাকাপড় শুকোতে দেখা যায়। যে কোনও শহর থেকে মানুষ বের করে নিলে যেমন, এবং মানুষের বাড়ি হরাইজন্টাল হয়ে থাকে একারণে, তীরে দাঁড়িয়ে এত উঁচু থেকে বাড়িগুলো এক একটা সমাধিফলকের মতন দেখায়।

ক্রমাগত ৯০ ডিগ্রি কোণে বাঁক নেওয়া মধ্যবর্তী প্যাসেজগুলির ভেতর থেকে দ্রুততর বেগে বেরিয়ে আসছে একটি সাইকেল। শরীর দু ভাঁজ করে হ্যান্ডেলে মাথা রেখে, ঢালু উপত্যকা উতরে এগিয়ে আসছে সে, তড়িৎ, তার গতি অবরুদ্ধ, চাকা থেকে বালি উড়ছে ফরফর করে, তবু, তিরবেগেই সে ছুটে আসছে। এসময় অনিশ্চিত পটভূমি জুড়ে আবারও সমুদ্রগর্জন শোনা যায়।

এত জোরে আসছে সাইকেলটি যে মনে হয় সমুদ্রের চেয়ে তা ঈষৎ দ্রুতগামীই; তবু, সমুদ্রের আসন্ন আছাড়ের ঠিক প্রাক্‌মুহূর্তে, সাইকেলটি তীরে এসে উঠতে পারবে কি? পারে কি পারে না দেখতে গিয়ে, তীরে দাঁড়িয়ে, প্রকাণ্ড ঝাঁকে অংশ শরীরময় সমস্ত জীবন তার দিকে বেঁকে যেতে থাকে।

শেষরাতে অংশুর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে প্রথমেই জেগে ওঠে সাঁ-সাঁ উত্তুরে হাওয়া, এত আগে! এই তো সবে হেমন্তের শেষ ও শীতের শুরু। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি নিয়ে হাওয়া মেতে উঠেছে মরণখেলায়, ফোঁটাগুলো প্রায় আভূমি নামিয়ে এনে হুশ করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আকাশে।

জানালার আর্চ দিয়ে মশারির ভেতর থেকে ঘুমঘোরে ষাঁড়ের শিঙের মতো প্রতিপদের চাঁদ দেখে নিজেরই অজ্ঞাতসারে কেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে অংশু? পাশেই প্রিয় অভিভাবিকার মতো রেবা ঘুমিয়ে। হাওয়ায় উড়ে একগাছি চুল পড়ে রয়েছে তার উসুখুসু ঠোঁটে। 'আর একবার.....তা হলে আরও প্রগাঢ় ঘুমুতে পারব', এই যুক্তি অংশুকে বাথরুম সেরে আসতে বলে।

করিডোরে বেরিয়ে ছাদের দরজা সশব্দে খোলা বন্ধ হওয়ার শব্দ সে পায়। ছাদের দরজা কাল বন্ধ হয়নি? একের পর এক আলো জ্বালতে জ্বালতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে অংশু দেখে দরজা হা-হা করছে খোলা। এত হাওয়া যে দু হাতে পাল্লা চেপে ধরতে হয়, এবং—বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে এ ধার থেকে ও ধার পর্যন্ত ছাদ উজলে দিয়ে, উঁচুতে, একবারমাত্র বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে।

ছাদের মাঝখানে মনার রক্তের ছাপ অংশু দেখতে পায়। দিনচারেক আগের শুকনো রক্ত ফোঁটা ফোঁটা জল পেয়ে ইতিমধ্যেই বজকে উঠেছে। যে কোনও অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অংশু রক্তের কাছে যায়। প্রকাণ্ড ক্ষতমুখের মতন, সাদা সাদা চাপ রক্তে কিলবিল করছে। এই সামান্য বৃষ্টিতে পিঁপড়েরা এখনও বিরত নয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর চেয়ে ঢের বেশি শৃঙ্খলার সঙ্গে, প্রকাণ্ড ছাদ পেরিয়ে, মনার রক্তের কিনারা পর্যন্ত তাদের অবিচলিত যাতায়াত আজ ৪ দিন ধরে অব্যাহত। এটা দেখতে দেখতে গ্যয়টে থেকে একটি পঙ্‌ক্তি আমার মনে পড়ে যায়। অংশুর পড়ে না।

সিল্কের লুঙ্গি ঈষৎ তুলে অংশু উবু হয়ে বসে।

—মনা! সে ডাকে।

উত্তর নেই।

—মনা?

সাড়া নেই।

মেঘলা-ভাঙা চাঁদের ঈষৎ আলোয় অংশু বসে থাকে। বৃষ্টি দু-চার ফোঁটা, তবে ফোঁটাগুলো মস্ত, সোজা বুকে এসে লাগছে। সহসা, ওদিক থেকে, আর-একটি বিদ্যুৎ....তড়িৎ বেঁচে আছিস?

তড়িৎ! প্রায় মনে মনে, মনার রক্তের দিকে আরও ঝুঁকে, ফিসফিসিয়ে অংশু ডাকে, 'তড়িৎ!'

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বজবজিয়ে ওঠে। বেশ কয়েকটা ডেঁয়োপিঁপড়ে রক্তের চাপে আটকে রয়েছে। রক্তের দানা-বেঁধা দাঁড়া বিস্তৃত করে খুলে কয়েকটা পিঁপড়ে তারই দিকে পলকহীন রক্তাক্ত চোখে তাকিয়ে, অংশু সভয়ে লক্ষ করে।

চাঁদ ডুবে গেছে। জেগে-ওঠা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর ঝুঁকে, অন্ধকারে, হাওয়ায়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে, দুই ঋতুর মাঝখান থেকে তার মা-র প্রেমিকের ছেলে অংশু, বিমাতার সন্তানকে আবার ডাকে, 'তড়িৎ!' 'তড়িৎ!' □

রোহিতাশ্বের নামে

অমলেন্দু চক্রবর্তী

কে বা কারা কাল রাতে ফটিককে খুন করেছে।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তল্লাট জুড়ে ভোর থেকেই নাকি এক তুলকালাম কাণ্ড। রতন সাহার বস্তির একেবারে কোণের দিকে ট্রামরাস্তার ওপর গোরুমোষের খাটালের পাশে দিনের পর দিন ফেলে রাখা আবর্জনার স্তূপ আর পাবলিক ল্যাট্রিনের পচা দুর্গন্ধের মধ্যে তাজা জোয়ান ছেলেটার মৃতদেহটাকে ঘিরে যে-পরিমাণ লোক জমেছিল, এককাট্টা থাকলে তাতে নাকি একেবারে খালি হাতেই একটা বড়োরকমের ডাকাত দলকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব। ফুটপাতের ঘুম থেকে উঠে কয়েকজন রিকশা কী ঠেলাওয়ালা পায়খানা করতে এসে যখন মৃতদেহটাকে প্রথম আবিষ্কার করল, তখনও ভালো করে সূর্য ওঠেনি। কাক ডাকছিল, রাস্তার সরকারি আলোগুলি জ্বলছিল, প্রথম ট্রাম রাস্তায় নামেনি। হোসপাইপের জল ছড়াচ্ছিল কর্পোরেশনের মানুষ, কলকাতা ঘুমচ্ছিল তখনও।

এবং বেলা প্রায় এগারোটায় কলকাতার আর এক প্রান্ত থেকে প্রতিদিনের মতো স্কুলে এসে শিক্ষক নরেশ মজুমদার শুনলেন—স্কুল বন্ধ। ওয়ার্নিং বেলের অনেক আগেই হেডমাস্টারমশাই দরজায় নোটিস সেঁটে জানিয়ে দিয়েছেন—'.....দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান ফটিক রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বিদ্যালয় বন্ধ রহিল।' নোটিসের চারদিকে যথারীতি কালো কালির একটা চওড়া বর্ডার ছিল।

কিন্তু মৃত্যু! মৃত্যু আর নিহত হওয়া কি এক? সংবাদটার প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পরই নরেশ মজুমদারের প্রশ্ন। আপাতত এ জাতীয় প্রশ্ন অবাস্তব। এবং প্রধান শিক্ষকের নিজের হাতে লেখা নোটিসে যদি বানান ভুল বা ব্যাকরণের ভুলও থাকত, আজ প্রশ্ন উঠত না। ক্লাস টেন-ডি, হিউম্যানিটিজের ছাত্র ফটিক রায় ষোল......বড়ো জোর সতেরো হবে বয়স, পাতলা দোহারা সুন্দর ছেলেটা। কদিন আগেও সেকেন্ড পিরিয়ডে বোর্ডে ডেকে এনে একটা সহজ কমপ্লেক্স সেনটেন্স ভেঙে অ্যানালাইসিস করতে বলেছিল যাকে এবং মন দিয়ে পড়াশুনো না করার জন্য মৃদু তিরস্কার করে যাকে বেঞ্চে ফিরে যেতে বলেছিল, কচি কিশোর স্মার্ট ছেলেটা কেন এমন বিচ্ছিরিভাবে খুন হবে মানুষের হাতে?

দুপুরবেলায় নিঝুম স্কুলবাড়িটার চারদিকে থমথমে আবহাওয়া। স্কুলের দরজায় পুলিশের ওয়ারলেস ভ্যান, জিপ। এবং এ রকম একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের গাড়ি দেখেই কৌতূহলী মানুষের ভিড় বাড়ছে, কোলাহল শোনা যায়। এবং পুলিশ-জনতার গা ছোঁয়াছুঁয়িতেই আজকাল যেভাবে দপ করে জ্বলে উঠছে আগুন, সেই আশঙ্কাতেই পুলিশের গাড়ি পাহারা দিতে বেঞ্চি টেনে বসে বা দাঁড়িয়ে হাতে হাতে খৈনি ডলছে রাইফেল কাঁধে সি আর পি। দোতলায় হেডমাস্টারের ঘরে স্থানীয় থানার ওসি, তাঁরও বড়োকর্তা ডিসি। সুইং-ডোরের সামনে টান হয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলের চার-চারজন বেয়ারার। বেচারিরা ভয়ে চুপসে আছে।

টিচার্স রুমে ধোঁয়া উড়ছে। পাঁচ মাস যাবৎ সরকারি মহার্ঘভাতা আসছে না বলে ক্ষুব্ধ মাস্টারমশাই থেকে শুরু করে দেশে বিপ্লব আসছে না হেতু উত্তেজিত শিক্ষক—প্রায় সকলেরই চোখমুখ কেমন বদলে গেছে মনে হল। নরেশ একটা চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসল একপাশে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে চোখ রেখে তাকাতে পারছে না কোনওদিকে। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে একবারমাত্র ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সবাই। 'শুনেছেন মশাই......' অবনীবাবুর বাজখাঁই গলার উত্তরে নিস্পৃহভাবে মৃদু ঘাড় নেড়ে পকেটের রুমালে ঘাড়গর্দান মুছল নরেশ।

সিলিং ফ্যানটা দূরে পড়েছে, তারই তলায় হঠাৎ ছুটির আসর। একপাশে চুপচাপ বসে সে ফটিকের মুখটা মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল। প্রায় সাড়ে সাতশো ছাত্রের মধ্যে একটি বিশেষ মুখ। এক ঝটকায় মনে

হয়, মুখটা সে এই মুহূর্তে মনে আনতে পারছে না। একবার ফটো দেখতে হবে। টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি। ক্লাস ফাইভ থেকে ফটিক পড়ছে এ স্কুলে! এবং সে চাকরি করছে প্রায় একটানা আট বছর। কোনও দিক থেকেই এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না সে ছেলে। না অতি সুবোধ বালক, না হতচ্ছাড়া মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো নচ্ছার। নরেশ স্পষ্ট অনুভব করে, সে ভেতরে ভেতরে ঘামছে। ও পাশে স্থানীয় অধিবাসী ইকনমিক্সের ভবানীবাবু, ফিজিক্সের শীতলবাবু, পুরনো মাস্টারমশাই সদানন্দবাবু চুপচাপ থাকলেও বা মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা বললেও, কমার্সের হরিবাবু প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় একনাগাড়ে বলে যাচ্ছেন ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ। মনে হয়, যেন সাতসকালে তাঁকে ঘর থেকে ডেকে এনে, সাক্ষী রেখেই কাজটা নিখুঁতভাবে শেষ করেছে খুনিরা।

একরাশ বিরক্তির ভারে নরেশ মজুমদার ক্লান্ত। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে টেবিলের তলায় লম্বা পা ছড়িয়ে একটু স্বস্তি চেয়েছিল। সহকর্মী দেবাংশু বসাকের পায়ে পা ঠেকে যেতেই আঙুল কপালে ছুঁয়ে দ্রুত পা গুটিয়ে নিতে হয়। ভাবনার বৃত্তে অব্যাহত সেই ছেলে। খুবই চেনা মুখ। কিন্তু কিছুতেই নাকমুখ চোখের আদলে চেহারাটাকে ধরা যাচ্ছে না বলে চাপা অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে। এবার সরস্বতী পুজোয় প্রচুর খেটেছিল ফটিক। গাইতে জানে না, নাচতে জানে না, এমনকি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার একটি চরণও মুখস্থ ছিল না হয়তো, তবু পঁচিশে বৈশাখের উৎসব নিয়ে মেতে ঘেমে নেয়ে একসার হল গরমের ছুটির আগে। কিন্তু........কিছুদিন ধরে, এই কয়েক মাসে কেমন একটু একটু করে পালটে যাচ্ছিল ছেলেটা। একটু সিরিয়াস। মাঝে মাঝে ক্লাসের মধ্যেই অদ্ভুত সব প্রশ্ন। ইতস্তত কিছু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন শব্দের ব্যবহার—শব্দ, শব্দ শুধু, রাজনৈতিক পরিভাষা......ভাসা ভাসা একটা ধারণা, অর্থ বা সংজ্ঞা বোঝার দায় নেই, ট্রামে-বাসে হাটে-বাজারে যথেচ্ছ ব্যবহারে যা আজ আর পণ্ডিতি ব্যাপার কিছু নয়......

'বলেন কী মশাই, এ-টুকুন ছেলের পেটে পেটে এত?'

নরেশ হরিবাবুর দিকে তাকাল।

'পুলিশ তো সন্দেহ করছে শুনছি—সে দিন কোলে মার্কেটের কাছে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টির ছেলেটাকে দিনদুপুরে ছুরি মেরে ফেলে দিয়ে পালাল, অ্যাবডোমিনা দু ফাঁক... .'

'বলেন কী.......ফটিক? আমাদের ফটকে? রিটালিয়েশন!'

নরেশ চোখ তুলে ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকায়। অনেক দূরে—যদি একটু বাতাস আসত এ দিকে। রুমাল দিয়ে ঘাড়গর্দান মোছে। অসহ্য গরম।

'ফিরতে রাত হবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সন্ধেবেলা। রাতে আর ফেরেনি।'

'প্রায়ই তো যেত এ রকম.........অনেক কিছুই তো হতে পারে........ভুসো কালি আর ব্ল্যাকজাপানে সাদা দেওয়াল খুঁজে খুঁজে কত কী লিখে বেড়াত, রাত জেগে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটত......'

'ভালো সিগারেট আছে? কী খাচ্ছেন? চারমিনার.......'

'এক্সকিউজ মি........নাম্বার টেন আছে?'

'উইলস? আরে মশাই, করেন তো মাস্টারি, বুর্জোয়া ফাঁটটা তো ঠিক আছে.......'

'ওই একরত্তি ছেলেটা মানুষ খুন করেছে, বিশ্বাস করি না. ...'

'মেট্রোয় বইটা কালই উঠে যাচ্ছে, চলুন যাই..... '

এক ঝটকায় চেয়ারটা ঠেলে সশব্দেই উঠে দাঁড়াল নরেশ। দু-পাশের বন্ধ দরজার ক্লাসঘরগুলি পেরিয়ে একেবারে সিঁড়ির মুখে এসে সিগারেট ধরাল। স্কুল ছুটি বলেই এখন সে করিডরের নির্জনে, রেলিঙে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনায়াসে ধূমপান করতে পারে। নিস্তব্ধ দুপুরের তেজি রোদে কাক ডাকছে ইতস্তত। ভাবতে অবাক লাগে, কয়েকশো শিশুকিশোরের কলকল হল্লাচিৎকারের শূন্যতায় এ স্তব্ধতা! হঠাৎ ছুটি। ক্লাস টেন-ডি-র কতকগুলি হোমটাস্কের খাতা আছে ডেস্কে। দেখলে হত। অন্তত একটি খাতা, যা আজ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, স্মৃতি করে নিয়ে যাওয়া যায়! ওর ভুল বানান অথবা ব্যাকরণ ভুল লাল কালিতে রক্তাক্ত করে লাভ নেই। আমাদেরই ভুল অঙ্কের ভুল ব্যাকরণের পরিণামে সারা দেহে রক্তাক্ত হয়ে কাল রাতে, সকলের অলক্ষ্যে সে রাস্তার আবর্জনায় পড়েছিল অন্ধকারে।

নরেশ সচকিত হয়ে ওঠে। নীচের তলায় হঠাৎ জমাট বাঁধা কলরব, দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসার সঙ্ঘবদ্ধ পায়ের শব্দ। স্যান্ডেলচটি ভারী জুতো আর শব্দহীন স্লিপারের সমবেত ধ্বনি দোতলায় উঠে এসেই একেবারে মুখোমুখি থমকে দাঁড়াল। চোখে চোখ পড়তে সবাই নির্বাক। টেন-ইলেভেনের বড়ো ছেলেরা, কয়েকজন যুবক, প্রাক্তন ছাত্র—কলেজে পড়ে। তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে নরেশ নিঃশব্দে একমুখ সিগারেটের ধোঁয়ায় ওদের দিকে তাকাল। ওরা হাঁপাচ্ছে, বেশভুষোয় চপ্‌চপ্ ঘাম। এলোমেলো চুলে রুক্ষতা।

'পোস্টমর্টেমের পর পুলিশ ডেডবডি ছেড়েছে স্যার। ওদের বাড়ি ঘুরে স্কুলে আনা হবে।'

নরেশ চুপ করে শোনে। ছাত্র শিবনাথকে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি মনে হয়।

'আমরা মালা দেব স্যার, টাকা চাই।'

'স্কুলের তরফ থেকে হেডস্যারকে মালা দিতে হবে।'

'স্টাফ কাউন্সিল থেকে আপনাদেরও মালা দিতে হবে।'

'সোমেশবাবু কোথায় স্যার।'

সোমেশবাবু! সোমেশ মুখুজ্জে! নরেশ তাব অতি পরিচিত ছাত্র সত্যব্রতর চোখের মণির আগুনের হলকা দেখে চমকে উঠল। লিপিপরিচয়হীন বিদেশি ভাষার বইয়ের মতো দুর্জ্ঞেয় মনে হচ্ছে ছেলেগুলিকে। উত্তেজনায় কাঁপছে। হয়ত যে কোনও সময়ে হঠাৎ যা খুশি করে বসতে পারে অনায়াসে। কাছাকাছি কোথায় একটা প্রচণ্ড বোমার শব্দ, পরপর আরও কয়েকটা। পুলিশের রাইফেল। দুপুরের শান্তি থরথর করে কাঁপে। তিনতলায় ছাদের কার্নিশ থেকে একঝাঁক পায়রা উড়ে গিয়ে পাক খেতে খেতে কোথায় চলে গেল।

'আমরা জানি স্যার, ফটিককে কারা খুন করেছে.......'

'পুলিশেফুলিশে বিশ্বাস করি না। আগুন জ্বলবে।'

'একটা মানুষের বাচ্চা কুকুর বেড়ালের মতো ডাস্টবিনে মরে পড়ে থাকবে, আমবা মুখ বুজে সইব?'

'বুর্জোয়া আইনে এব প্রতিকার হয় না স্যার।'

পিঠ টান করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ছেলেগুলি। নিরুত্তর নরেশ ওদের ভাষা বুঝতে চাইল। মানুষ মানুষের ভাষা বুঝছে না, অদ্ভুত এ সময়। পকেট থেকে দুটো টাকা বের হল। এগিয়ে দিযে বলল—'আমার হয়ে একটা মালা দিও ফটিককে।'

'মিছিলে যাবেন না স্যার?'

'সব স্কুলকলেজ থেকে ধর্মঘট করে ছাত্ররা আসবে। হাজার হাজার ছেলেব মিছিল, লাল পতাকায় ভাসিয়ে দেব।'

'আমাদের মিছিলে যেতে ভয় পাচ্ছেন স্যার?'

ভয়! নরেশ সর্বাঙ্গে নাড়া খেল। কাল এবং পরবর্তী আরও অসংখ্য দিন আর মাস এবং বৎসর ক্লাসে বসিয়ে ওদের পড়াতে হবে! ইংরেজি লেখার কায়দাগুলি, পরীক্ষা পাশের জন্য।

'কিন্তু সোমেশবাবুকে আমরা চাই স্যার। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

'যদি না যান!'

'আগুন জ্বলবে স্যার, খুন কা বদলা খুন।'

বাঁ হাতের পাতায় ডান হাতের ঘুসি মারার মুহূর্তে অমরের লিকলিকে হাত দুটোতেও যেন পেশির উত্তেজনা চোখে পড়ে নরেশের। সে এবার সত্যি ভয় পেল। এখন, অন্তত এই মুহূর্তে অথবা কখনও, অন্য কোনও সময়ে শুধু বাক্য দিয়ে, মানুষের ভাষা বা বুদ্ধি দিয়ে এই তীব্র হননের উন্মাদনা প্রশমিত করা অসম্ভব।

এবং ঠিক তখনই অকস্মাৎ বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে নির্জন বাড়িটা থরথর কেঁপে উঠল একবার। আসলে কাঁপল নিজেরই ভেতরে বুকটা। নরেশ কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই জোয়ান ছেলেগুলি চোখের পলকে আবার অশ্বক্ষুরের ধ্বনি তুলে সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে কোথায় মিশে গেল। বন্ধ সদর দরজার ভেতর থেকে তালা। তালাবন্ধ সিন্দুকের মতো চারদিক থেকে ঢাকা আছে বাড়িটা। কোথায় পালাবে? কিংবা ওরা হয়তো সব পারে। নরেশ ভাবল। মুহূর্তের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ঘটে যাচ্ছে কিছু। ও দিকে মাস্টারমশাইরা দ্রুত ছুটোছুটি করছেন, হেডমাস্টারমশাই হুড়মুড় করে নেমে গেলেন নীচে।

নরেশ দ্রুত নামল। রাস্তায় হাজারও মানুষের কোলাহল, চিৎকার। বোমাপটকা, বন্দুকের গুলি, কাঁদানে গ্যাস। দূরাগত হল্লা-চিৎকারের সঙ্গে বাতাসে চোখেমুখে জ্বালা ধরানো গ্যাস আর বারুদের গন্ধ। এক্ষুনি, ঠিক এক্ষুনি না পারলে হয়তো সারাদিন দুঃসহ বারুদের গন্ধ আর প্রচণ্ড শব্দ বিস্ফোরণের মধ্যে ভয় আর আতঙ্কের সময় গুনে গুনে ফটিকের শূন্যতা দুর্দান্ত ফটিককে নিয়েই আটকে থাকতে হবে এখানে। তুচ্ছ নাম না জানা অখ্যাত এক কিশোরবালক হঠাৎ এক বিশাল ময়াল সাপের ফণায় স্থির হয়ে শুয়ে লকলকে জিভের ক্রুদ্ধ হিংস্রতায় বাতাসে ওড়ানো আগুনের শিখায় ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে আসছে। অশান্ত বেপরোয়া যৌবনের ডগায় ফুলের পাহাড় বুকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে ফটিক। হিংস্র ময়াল সাপটার ওপর শিকারির সঙ্গিন তাক করা ছিল, গর্জে উঠেছে। প্রতিহিংসার লকলকে জিভগুলি দাউ দাউ আগুন হয়ে জ্বলে উঠেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত তল্লাট জুড়ে ক্রোধ আর হিংসার আগুন। অসংখ্য ফটিক, অনেক ফটিকের বিরুদ্ধে। মাঝখানে শিকারি। নরেশ পেছনের দিকে সরু গলিটার দিকে ছুটল। ছেলেদের পেচ্ছাবের ঘর আর পায়খানার পাশ দিয়ে একটা দরজা। দরজাটা বন্ধই থাকে চিরকাল। স্কুলের বেয়ারা মদনকে ডেকে দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এক চিলতে সরু গলি। গিজ্‌গিজ্ করছে মানুষ। উত্তেজনা আর সন্ত্রাস। দু পাশের বাড়িগুলির রকে, জানলায়, দোতলার রেলিঙে উৎকণ্ঠা। নরেশ পালাবার পথ খুঁজল। ট্রামবাস যানবাহন নির্ঘাত বন্ধ। গলিতে গলিতে হেঁটে যদি পৌঁছে যাওয়া যায় শিয়ালদা, তারপরও না হয় হাঁটা যাবে অনেকক্ষণ।

ইউনিয়ন অফিসেই ছিলেন নিলুদা। অবসাদে ক্লান্ত হয়ে নরেশ যখন ঘরে এসে ঢুকল, নিলুদা কথা বলছিলেন কয়েকজন মানুষের সঙ্গে। চোখে চোখ পড়তেই একটু হয়তো অবাক হলেন। কিন্তু নিস্পৃহতায় আবার নিজেদের কথাবার্তায় মন দিলেন যথারীতি। নরেশ একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। আজ কত বছর পর, ঠিক ঠিক হিসেবে আনা কঠিন, প্রায় পাঁচ-সাত বছর পর এখানে সে এল। এর মধ্যে নিলুদার সঙ্গে দেখা হয়েছে—রাস্তায়, যুক্তফ্রন্টের সভায়, মিছিলে, কদাচিৎ বাড়িতে। অথচ নিলুদা। ছেলেবেলায়.. .....নরেশ ঠিক মনে করতে পারে না, সেটা বয়সের কোন স্তর, শৈশব না বালক বয়স, পিসিমার বাড়িতে থাকার সময় ওর চোখের সামনে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল মানুষটাকে। বেআইনি পার্টির লোক! পিসিমা ছেলের জন্য মেঝেতে লুটিয়ে গড়িয়ে কাঁদলেন, পিসেমশাই ঝিম মেরে রইলেন এবং সেই বয়সে, কোনও কিছুই না বোঝার বয়সে সে তার জীবনের প্রথম জ্যান্ত বড়ো মানুষ, মহৎ মানুষ দেখেছিল প্রথম।

কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বেঞ্চিতে বসে থেকে অফিসঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল নরেশ। মোটামুটি ফাঁকা, ইতস্তত কয়েকজন মানুষের আসা-যাওয়া। চেয়ারটেবিল, কাগজের ফাইলের স্তূপ, টেলিফোন, টাইপ-রাইটিং, সাইক্লোস্টাইল মেশিন, আলমারি, সারি সারি ফাইল। চার দেওয়ালে বাঁধানো ছবি—মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, হো-চি-মিন। ছোটো বড়ো আরও অসংখ্য ফটো, দূর থেকে স্পষ্ট না হলেও বোঝা যায়, পার্টির সমর্থনে ব্যাপক জনসমষ্টির ছবি—শ্রমিক মিছিল, ব্রিগেড ময়দানে বিশাল সমাবেশ। ঝুল আর মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন দেওয়ালে পুরনো বছরের বাতিল ক্যালেন্ডারের সুন্দর ছবির মতো ফটোগুলি ঝুলছে অনাদরে।

'কী রে, কী খবর! হঠাৎ একেবারে এখানে........' কথা শেষ করে নিলুদা সামনে এসে দাঁড়ালেন—'চাকরিবাকরি করছিস। ভালো সিগারেট আছে?'

প্রায় পনেরো বছরের বড়ো দাদার হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই তুলে দিয়ে নরেশ বলল—'কাল রাতে নৃশংসভাবে কারা ফটিককে খুন করেছে।'

'কে ফটিক?' হাতের করপুটে লুকানো আগুনে সিগারেট ধরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন নিলুদা—'কমরেড, কাল বিকেল পাঁচটায় তিন নম্বর গেটের গেটমিটিঙে-এ আমি যাব। সুখেনকে জানিয়ে রাখবেন। আর এ দিকে, ভেরি বিজি, বুঝলি.......'

নিলুদা টেবিলের ও দিকে গিয়ে বসলেন। নরেশ উঠে গিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে। সিগারেট ঠোঁটে চেপে টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ থেকে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ঠোঁট চেপে বললেন—'হ্যাঁ, কী বলছিলি: কে কাকে খুন করেছে।'

'ফটিককে......'

টেলিফোন। 'জাস্ট্ এ মিনিট.......' নিলুদা রিসিভারটা তুলে নিলেন—'হ্যালো........' কী একটা সংবাদে যেন খুশি হলেন মনে হল। নরেশ তাকিয়ে রইল। কাঁচাপাকা চুল, লম্বা-পাতলা পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষটি সত্যি কর্মব্যস্ত। একসময় রিসিভার রেখে চিৎকার করে কাকে ডাকলেন। একটা জরুরি কাগজ খুঁজে না পাওয়ার জন্য তিরস্কার। সেই ভদ্রলোক কাগজ খোঁজার দায় নিলে নিলুদা আবার তাকালেন—'হ্যাঁ, খুনোখুনির কথা কী বলছিলি। কে খুন হয়েছে?'

'ফটিক।'

'সে কে?'

'আমার ছাত্র।'

'ছাত্র?' মুঠো-করা আঙুলের ভাঁজে সিগারেট রেখে দীর্ঘ একটা কলকে-টান নিলুদার। ভাঙা চোয়াল দুটো গেঁথে গেল, কণ্ঠাসর্বস্ব গলাটা জিরাফের মতো চাগিয়ে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। তারপর খুক্‌খুক্ কাশি সামলে হাসলেন—'তুই ভুল করছিস। এটা একটা ট্রেড ইউনিয়ন আপিস। পুলিশ স্টেশন নয়, আমিও পুলিশের বড়োবাবু নই।'

'পুলিশের কাছে যাবেন ওর বাবা। হয়তো গেছেন। সেটা আমার কাজ নয়। কিন্তু আমি তোমার কাছেই আসতে পারি নিলুদা। আমি বুঝতে চাই......'

'একটা মৃত্যুর জন্যে এরকম ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ কান্নাকাটি সেন্টিমেন্টালিজম। এ তো প্রায় ডজন দেড়-ডজন রোজই শুনতে হচ্ছে। কী করা যাবে? রাজনীতিটা ভীষণ ক্রুড।'

'না, একটা মৃত্যুর কথা আমি বলছি না। আরও অনেক, অসংখ্য মৃত্যুর জন্যে .....রাজনীতি যুদ্ধ বাধালে হাজার হাজার মানুষ মরে, তার অর্থ বুঝি। কিন্তু বিপ্লবের কোন স্তরে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত গরিবের ছেলেকে এভাবে খুন হতে হয়?'

'হতেই পারে.........' নিলুদা ভ্রূ কুঁচকোলেন—'দেশটা যাদের মৃগয়াক্ষেত্র, আর লণ্ডভণ্ড চায় তারা। তুই তো ইংরেজির মাস্টার, ম্যাকবেথ পড়েছিস.......'

'পার্টি ভাঙাভাঙির জন্যে কোনও কষ্ট হয় না তোমাদের? প্রতিদিন পার্টির মধ্যে আছ, বলতে গেলে গোটা জীবনটাই। ভেতরে ভেতরে কান্না পায় না তোমার নিলুদা?'

নিলুদা, অনেকটা ঘাবড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতেই নড়চড়ে তীক্ষ্ণতায়—'এ কী? এটা কি থিয়েটারের স্টেজ নাকি? কী বলতে এসেছিস, চটপট বল্। তোর প্যাস্টাইমের জন্যে তো আমি বসে নেই এখানে.......'

'ইভ্‌ন্ কেরেনেস্কি, নাম্বার ওয়ান এনিমি অব দ্য সোসালিস্ট রিভলিউশান ওঅজ অ্যালাউড টু কুইট রাশিয়া.......' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল নরেশ—'লেনিন তাঁকে খুন করেননি।'

নিলুদা তথাপি শান্ত। একগুঁয়ে ছাত্রের সামনে প্রাজ্ঞ শিক্ষকের ভঙ্গি—'আমাদের পার্টিও খুনখারাপি চায় না। কিন্তু খুনোখুনিটা যদি ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয় কেউ উই মাস্ট হ্যাভ দ্য রাইট অব সেলফ ডিফেন্স। এত বড়ো, গোটা একটা পার্টি টোটালি অ্যানিহিলেটেড হওয়ার জন্যে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না নিশ্চয়ই, ...'

'ঠিক এই কথাই বলছিল আমার ছাত্ররা। ফটিকের আততায়ীকে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কে আততায়ী? ফটিক নিজেই কি ওর খুনিকে চিনতে পেরেছিল নাকি? অথচ ওরা, ফটিকের বন্ধুরা, হত্যাকারী খুঁজতে গিয়ে মাস্টারমশাইকে সন্দেহ করছে।'

'সে তো হতেই পারে। ইনডিভিজুয়াল্ কে? অনেস্ট প্রফেশনই তো আর প্রফেশনের মানুষগুলোর অনেস্টি প্রমাণ করে না। তাই যদি হত, দেশের এ হাল হয়?'

'এগ্‌জাক্টলি!' নিজের উত্তাপে নিজেই ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল নরেশ। চারদিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, আস্তে অথচ দৃঢ়তায় ফুঁসে উঠল—'কালই বুর্জোয়া এডুকেশনের জন্যে যারা হাইবেঞ্চিতে গিয়ে বসবে আর চাকরি রাখার দায়ে তোমাদেরই পার্টির লোক, যিনি বুর্জোয়া এডুকেশন বিলোবেন, দু পক্ষই কিন্তু পরস্পর ঘেন্না আর অবিশ্বাসের চোখে তাকাবে। দুদিকেই ছুরির শান চলছে। কে শেখায়? কে শেখে?'

'শিখতে হবে না। কী হবে ও সব ছাইপাঁশ শিখে? হবে তো তোর মতো কেতাদুরস্ত ভদ্দরলোক। সেল্‌ফ-সেন্টার্ড পেটিবুর্জোয়া স্কাউন্ড্রাল্‌স.......'

'এই......এখানেই তোমার সঙ্গে আমি একমত নিলুদা। আমরা স্কাউড্রেল্‌স......' নরেশ সোজাসুজি তাকাল। প্রৌঢ়ত্বের শিথিল ভাঁজে ভাঁজে ভগ্নস্বাস্থ্য, একগাল দাড়ি, অনাড়ম্বর জীবন! সারাটা জীবন শুধু দেশকে ভালোবেসে, শুধু পার্টির জন্য আজও অকৃতদার। মানুষটাকে রহস্যময় মনে হয়। শ্রদ্ধা আর বিস্ময়—'আমার ছাত্ররাও ঠিক তোমার কথাই বলে নিলুদা। এ সবই নাকি অর্থহীন। ফিউডাইল্‌। সুতরাং ভাঙো, ভাঙো সব কিছু। জানি, আমরা স্কাউন্ড্রালরা যা পড়াই সব ননসেন্স। কিন্তু একটাকে নাকচ করলে অন্য কিছুকে মেনে নিতে হয় না? কী বলে তোমাদের ডায়লেকটিক্স? সব কিছু বাজে বলে এর সবই ভাঙতে হবে, আর সবটাই স্পন্টেনিউটির ওপর ছেড়ে দিয়ে? কন্সাসনেসের লেভেল নেই কোথাও? লাঠি, ছুরি, বোমা, অ্যাসিড-বাল্‌ব, মলোটভ-কক্‌টেল......'

'এ সব আমাদের পার্টি তৈরি করেনি। কুড়ি বছর ধরে এ দেশটায় কারা ভূতের নেত্য নেচেছে রাজনীতির নামে? ঘরে ঘরে গুণ্ডা তৈরি করেছে? তার সঙ্গে লড়তে গেলে এ সব কারওর কারওর প্রয়োজন হতেই পারে। ইউনিয়ন করেছিস কখনও? মালিকের হয়ে শ্রমিকদেব খুন করতে কারা আসে দেখেছিস? জমিদখলের আন্দোলন কি জিনিস জানিস? বেনামি জমি দখলে রাখতে জোতদার ঘরে ঘরে কাদের পুষ্যি রাখে জানতে চেষ্টা করেছিস কোনওদিন?'

'কিন্তু ষোল বছরের ছাত্র ফটিককে যারা খুন করে......'

'কী ফটিক-ফটিক করছিস তখন থেকে? তোর তো একটা ফটিক। এখানে বসে কয়েক হাজার ফটিকের কথা রোজ ভাবতে হচ্ছে আমাদের। ঘরে ফিরতে পারছে না ছেলেগুলো। কলেজের হস্টেলে থাকতে পারছে না। প্রায় রোজই খুন হয়ে যাচ্ছে দু চারজন করে। অল আওয়ার ইম্পর্ট্যান্ট ক্যাডার্স। দেয়ার ওনলি ক্রাইম, দে বিলং টু আওয়ার পার্টি। কারা কোত্থেকে কেন এ সব করছে বুঝতে চেয়েছিস কোনওদিন? মার্ডার মার্ডাব......মার্ডার এভরিহয়্যার......'

নরেশ বোবা হয়ে যায়। বিস্ময়ে শিথিল হয়ে আসে—'তোমার বড়োভাই খোকনদা, পুরনো দিনের কমিউনিস্ট, গান্ধীজি ঘুরে আসাব কিছুদিন পবেই নোয়াখালিতে রিলিফ ওয়ার্কে গিয়ে, দাঙ্গা থামাবার ঝুঁকি নিয়ে নিজেই খুন হয়ে গেলেন, মনে নেই তোমাব!'

'সে কথা কেন?'

'খোনকদা যা পারতেন, তোমরা তা পারো না......'

'মানে?' নিলুদার কপালের ভাঁজে তীক্ষ্ণধীর রেখা পড়ে।

'স্রেফ ঘেন্না আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে এ দেশে স্বাধীনতা এসেছিল। ভাবতে পারো, গোটা দেশ একটা স্লটারল্যান্ড, একটা পুরো জাত স্লটারার। সে দিন নিজেদের স্বার্থে যারা হিন্দু মারতে মুসলমান যুবককে আর মুসলমান মারতে হিন্দু যুবককে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছে, তারা কেউই কিন্তু পরে আর ওদের হাত থেকে বন্দুক বোমা ছুরি ফিরিয়ে নেয়নি। সমাজের একটা স্তরে একটা কাল্ট তৈরি হয়ে গেল—কোল্ড-ব্লাড মার্ডারার্স ইউজড অ্যাজ পলিটিকাল টুলস। খোকনদা ওগুলো কেড়ে নিতে গিয়েই গুণ্ডার হাতে প্রাণটা দিলেন। আর তোমরা নিলুদা। তোমরা......' উত্তেজনায় সংযম হারায় নরেশ—'তোমরাও দেশের যৌবনের ফ্রাস্ট্রেশনের সুযোগটা নিলে। পার্টি ভাঙল, নিজেরা টুকরো টুকরো হলে, জনসাধারণকে নানাভাগে ভাঙলে। তারপর সেই ঘৃণা আর বিদ্বেষের রাজনীতি! প্রতিদিন পার্টি ভাঙছে, প্রতিদিনের ভগ্নাংশ পুরনো ভগ্নাংশকে মারছে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত উন্মত্ততার রাজনীতি। খোকনদার মতো তোমরা দাঙ্গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মরতে শিখলে না, মারতে শেখালে একে মিলিট্যান্সি বলে? পলিটিকাল কনভিকশনের এই-ই চেহারা? অ্যান্ড এভরিথিং বাই দ্য নেম অব ক্লাস স্ট্রাগল...'

'স্‌সাট্‌ আপ......' একেবারে অতর্কিতে, অসতর্ক পথচারীদের মধ্যে হঠাৎ বিস্ফোরণের মতোই গলা ছিঁড়ে চিৎকার নিলুদার। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে থরথর কাঁপছেন। প্রবল উত্তেজনায় দ্রুত কথা বলতে গলায় ফ্যাঁসফ্যাঁস ধরে আসে—'এটা ট্রেড ইউনিয়নের আপিস্‌ হলেও সবাই একটা পার্টির লোক। অনেকক্ষণ তোকে সহ্য করেছি। নাউ আই সে, গেট আউট......'

নরেশ নিজেও হাঁপাচ্ছে। এবার বিব্রত বোধ করল। চারদিকে থেকে ছুটে এসেছে মানুষজন, টেবিল ঘিরে

বিস্ময় আর কৌতূহল। চোখগুলিতে সেই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসের দৃষ্টি। নিলুদার দিকে তাকায়। পঞ্চাশোর্ধ্ব সেই দুঃসাহসী তেজি মানুষ। দেশের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে আজ পার্টিই যার সংসার। ভরাট বিস্ময়ে মানুষটার দিকে তাকাল। তার জীবনের চোখে-দেখা প্রথম বড়ো মানুষ, মহৎ মানুষ। নিরুত্তেজ শান্ত গলায়— 'আমি তোমার কাছে বুঝতে এসেছিলাম নিলুদা......'

'কী বোঝাব তোকে?' নিলুদা সক্রোধে তাঁর কমরেডদের দিকে তাকালেন—'এখানে এসে অকারণে যারা এভাবে রাজনীতির কথা বলে, আমরা তাদের পুলিশের লোক মনে করি। কিন্তু তুই, মামাতো ভাইকে এর বেশি সহ্য করা যায় না। নারু বাড়ি যা......'

'তোমরা আমাকে সন্দেহ করছ?'

'বিশ্বাস করি না।'

স্নায়ুর শিরাগুলি দপদপ করছে। নিলুদার চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল নরেশ। তাকায় অবিশ্বাসী চোখগুলির দিকে। নিলুদার মাথার ওপর দেওয়ালে টাঙানো লেনিন। মনে হয়, যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। লেনিন কি যিশুখ্রিস্ট হয়ে গেছেন! বুদ্ধ! নইলে ফটোর মানুষকে এতটা অসহায় মনে হবে কেন? নরেশ ক্লান্ত হল। ফটোর চেয়েও অনেক বেশি বাস্তব মনে হয় নিলুদার চোখজোড়া. আরেকজন বড়ো মানুষ মহৎ মানুষের দৃষ্টি। ইস্পাতের ছুরির মতো উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল সে। আচ্ছন্নের মতো টলতে টলতে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায়।

মানুষ! মানুষ! মানুষের স্রোতে ভেসে নিরাপদ শান্তি। গলিতে গলিতে হেঁটে এবার সে একা এগোয়। কিন্তু কোথায় পালাবে? নিলুদার টেবিল ঘিরে অবিশ্বাসী চোখের চাউনিগুলি এখনও শাণিত ছুরির ফলায় তাকে বিঁধছে। অথচ বিশ্বাসে স্থির থেকে জীবনে কত অসংখ্যবার মিছিলে মিছিলে হেঁটেছি কলকাতার পথে, তবু কেন দ্বিধা সংশয় সন্দেহ আর অনৈক্যের চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছি আমরা? নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন নিয়ে নরেশ চোখ তুলে তাকাল। ভরদুপুরের কলকাতা জ্বলছে। দু পাশের উঁচু উঁচু প্রকাণ্ড বাড়িগুলি আকাশের দিকে মাথা চাগিয়ে স্থির। সোজা সরলরেখায় প্রকাণ্ড রাজপথে অপরিচিত মুখের শোভাযাত্রা। বিহ্বল ছুটোছুটি। তাদের চোখে, কপালে, নাকে, মুখে, হাতে, পায়ে, জামার বোতামে, জুতোর গোড়ালিতে, নাকের ঘামে, ছাতার বাঁটে, হাতের ব্যাগে, চুলের সিঁথিতে, মুখের হাসিতে, কপালের বলিরেখায়, চোখের চশমায়, পোশাকে-আশাকে নিলুদার মুখ মনে পড়ে, ফটিকের মুখ! কেমন যেন নিষ্পাপ মনে হয় মুখগুলি। অথচ কী দুঃসহ গোপন ঘৃণা! আততায়ী! ভেতরে ভেতরে একরাশ ক্লান্তি অবশ করে শরীর। ফটিক! কাল মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নিশুতির নির্জন কলকাতায় নাকেমুখে রক্ত তুলে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে শেষমুহূর্তে কী ভেবেছিল ফটিক? আততায়ীর ছুরির ফলায় সে তার নিজের চোখের ছায়া দেখেছিল কি? আততায়ীর দিকে তাকিয়ে কোনও অবিশ্বাসীর চোখ? নিলুদা! যাঁর শেষ মুহূর্তের ক্রুদ্ধ ভঙ্গিটাকে এখনও ভুলতে পারছে না সে। অসম্ভব। ফটিক কখনওই শত্রু হতে পারে না নিলুদার। অনেক বড়ো মাস্টারমশাই। যে কোনও ফটিককে, অনেক ফটিককে জীবনের পথ চেনাতে পারেন যে মানুষ, একদিন চিনিয়েছিলেন নরেশ মজুমদারকেই.....

শরীরে মনে বিধ্বস্ত নরেশ হাঁটতে হাঁটতে পথে অনেকগুলি সিগারেট নিঃশেষে পুড়িয়ে গলির মুখ পেরিয়ে যখন কলেজ স্ট্রিটে এসে পড়ল, চারদিকে শোরগোল তুলে ভিড়ের মানুষ পালাচ্ছে। ট্রামের পর ট্রাম. সারিবাঁধা গাড়ি অচল হয়ে আছে। বাস-মোটর-ট্যাক্সি-রিকশা-ঠেলা সমস্ত রাস্তা জুড়ে খিচুড়ি পাকিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে চারদিক। মানুষের চিৎকার, হর্ন, দূরে বোমার শব্দ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে কোলাহলে দিগদিগন্ত তোলপাড়। 'ওদিকে যাবেন না দাদা, ভীষণ গণ্ডগোল.......।' নরেশ দাঁড়াল না, সম্মোহিতের মতো হাঁটে। বড়ো নির্মম কঠিন এক সময়ের ওপর দিয়ে আমরা হাঁটছি—'ছাত্রদের মিছিল মশাই, হাজার হাজার লাখো লাখো ছেলে......ষোলো, সতেরো, আঠারো বছর বয়স.......' দূরে, মনে হয় রাইফেলের আওয়াজ। নরেশ নতুন একটা সিগারেট ধরাল। 'নাউ ইউথ ইজ অন দ্য অ্যাজেন্ডা......' গায়ে গায়ে ধাক্কা। মানুষ পেছনের দিকে পালাচ্ছে। যৌবনকে ভয়। কোলাহল, ভিড়, ঠেলাঠেলি, ভয়, সন্ত্রাস সব ঠেলে সামনের দিকে এগোতে এগোতে কেন যেন মনে হল, পিছবার কোনও মানেই হয় না আর। ক্লাসের ব্যাকবেঞ্চার ফটিক আজ পথের নায়ক। তার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয়? খোকনদাকে মনে পড়ে। বুকের ওপর থেকে পাথর সরে যায়। সারি

সারি মুখের সারি, কৈশোরের-যৌবনের মুখ। তার প্রতিদিনের জীবিকায় সেই মুখ। কলেজ স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিত্যক্ত নগরীর ভগ্নদশা। এমনকি ফুটপাতের ফেরিওয়ালারাও কেউ বসে নেই। জনশূন্য নগরীর প্রাসাদচূড়ায় হিন্দি ফিল্মের বিশাল হোর্ডিংএ আলিঙ্গনাবদ্ধ যুবক-যুবতীর চুম্বন দুপুরের রোদে বড়ো বেশি উজ্জ্বল। দখলকারী সৈন্যের কায়দায় পুলিশ বা সি আর পি-র উঁচানো সঙ্গিনে শত্রুর প্রতীক্ষা। উলটোদিকে বানভাসি জলের কলোচ্ছ্বাসে লাখো লাখো কণ্ঠস্বর। শব্দব্রহ্ম তোলপাড়।

কী একটা নেশা লাগল হঠাৎ। চারদিকের তাক করা রাইফেলের সন্ত্রাসের মধ্যেও পুলিশের পাশ দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো রাস্তায় নামল নরেশ। এই মুহূর্তে, এ অরণ্যে, যে কোনও মুহূর্তে হঠাৎ কিছু ঘটে যেতে পারে। পাগলের মতো সে এগোয়। হাঁটে। খোকনদা! উন্মত্ত হিংস্রতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে খোকনদা মরেছিল। কিংবদন্তি মনে হয়। দু দিক থেকে ট্রামরাস্তাগুলি এসে যেখানে দাবার ছকের চতুষ্কোণ তৈরি করেছে, ঠিক তার মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল সামনের দিকে। পা টলছে, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে অসহ্য যন্ত্রণা। নরেশ নড়তে পারে না। ভয়ঙ্কর, বিশাল একটা ময়াল সাপ, রাস্তার এ পাশ থেকে ও পাশে, দু দিকের ফুটপাত জুড়ে শুধু কালো সাপের বিশাল শরীরটা ক্রোধে, ক্ষোভে, হিংসায় আর বিদ্বেষে ফুঁসতে ফুঁসতে, পাকে পাকে গোটা শরীরে মোচড় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তরে, নিশ্চিতই নিমতলার দিকে শ্মশানচিতার যাত্রা তার, এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র নিশ্বাসে রাস্তার ধুলো উড়ছে, লকলকে সহস্র জিহ্বায় অবিশ্বাসীর দিশেহারা হুঙ্কার। কিংবা সে নিজেই আজ শ্মশানচিতার অশান্ত বহ্নি। হাজার হাজার উত্তোলিত বাহুর জিঘাংসায় ফুরফুরে রক্তপতাকাগুলি শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া নয় নিলুদা—দাউদাউ আগুন। প্রতিশোধের ঘৃণায় ফুঁসছে আক্রোশ।

এবং প্রতিরোধের সব শক্তিই যখন ভেঙে চুরমার, রাস্তার মোড়ে, ঠিক মাঝখানে অচঞ্চল স্থবিরতায় দাঁড়িয়ে থেকে স্তব্ধ নরেশ মুখোমুখি তাকাল। তার প্রাত্যহিক জীবিকায় পরিচিত মুখের মিছিল। নিলুদা, এ মুখ তুমি দেখোনি অনেক অনেক কাল। ক্লাসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যে মুখগুলি আমি দেখি প্রতিদিন। আমাকে দেখতে হয়।

ভারসাম্য রাখতে পারছে না সে। বিধ্বস্ত শরীর ভেঙে ভেঙে পড়ছে। অথচ শাসন প্রশাসনের রক্তচক্ষু ভ্রূকুটিতে কিছুমাত্র তোয়াক্কা না রেখে বানভাসি স্রোতে ছুটে আসছে উত্তাল গর্জন......পনেরো, ষোলো, আঠারো, পঁচিশ বা ত্রিশ—কচিকাঁচা কালো কালো মাথায় অসংখ্য অগণ্য ওরা, নিষ্পাপ সাদা কাগজে আমাদেরই শোভন হস্তাক্ষরের খুদে খুদে অক্ষরগুলি অথবা আমাদের ভুল অঙ্কের গোঁজামিল নিলুদা.... ভালো ভালো এবং সুন্দর শব্দাবলি কি লুপ্ত আমাদের? ভাষাসম্পদ মনোরম? আর বোধ হয় কোনও ধার নেই সে সব সুস্মিত শব্দমালার। বপন জানি না। মগজের ক্ষুরধার ভাবনাগুলি কোথাও গিয়ে শিকড় পাচ্ছে না আমাদের চোখের পাল্লার কোনও দৃশ্যজগতে।

মনে হল, পায়ের তলার শক্ত কালো পিচ হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠে আসছে। ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে সূর্যের দিকে উঠে যাচ্ছে সে। দেহেরও কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। সর্বদেহে নরেশ অসার বধির। অবশ শরীরটা শক্ত হতে হতে যেন পাথর হয়ে প্রস্তরমূর্তি হয়ে রাস্তার মোড়ে, ঠিক মাঝখানে, নেতাজি কি রাজা রামমোহন, গান্ধীজি অথবা লেনিনের মতোই, অর্থশূন্য সংজ্ঞাশূন্য শব্দ শুধু, নিষ্প্রাণ অবলুপ্ত শব্দের মতো যাগযজ্ঞ হোমপূজায় দেবতা বানানো বিগ্রহ হয়ে ওঠার আগে, ঠিক শেষ মুহূর্তে, ময়াল সাপের নিশ্বাস গায়ে এসে বিঁধতেই অনুভব তার—গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভের ওপর সত্যি-সত্যি হঠাৎ সে পাথর হয়ে গেছে। পুলিশের রাইফেল প্রস্তরমনীষীর বুকে বেঁধে না, পাথরের চোখে মনীষী দৃষ্টিহীন। শুধু সজীব সতেজ জোয়ারে ছুটে আসে ভয়ঙ্কর ময়াল, একগুঁয়ে গোঁয়ার। নেতৃত্বহীন। ক্রুদ্ধ আবেগে তেড়ে এসে বাধা সরায়, পথের বাধা। বিচূর্ণিত হওয়ার আগে চেতনায় ফিরে এসে, নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়ে আবিষ্কার করলেন শিক্ষক শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, তাঁকে পথের পাশে সরিয়ে রেখে প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়ে ছুটছে ময়াল। মাথার ফণার অপঘাত-মৃত্যুর প্রতিবাদ। রোহিতাশ্বের শব। ☐

পিপাসা

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

দ্রবময়ী গঙ্গা স্নান সেরে ফিরছিলেন।

তার মাথা ন্যাড়া, পরনে পরিষ্কার বকের পালকের মতো সাদা থান, বাঁ হাতে ভিজে কাপড় আর গামছার রাশ, ডান হাতে ঝকঝকে করে মাজা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল। সমানে বক বক করতে করতে তিনি পথ হাঁটছিলেন।

মেজাজটা খুবই খারাপ ছিল দ্রবময়ীর। গঙ্গায় ঘাটে এক দঙ্গল বাউন্ডুলে ছেলেমেয়ে সমানে জলের মধ্যে হুল্লোড় করছিল। তাদের হাতের পায়ের জলের ছিটে দ্রবময়ীকে উত্ত্যক্ত করে মারছিল। যতবারই তিনি জল থেকে ভিজে কাপড়ে ঘাটের বাঁধানো সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন ততবারই বদমাইশ ছেলেমেয়েগুলো দাপাদাপি করে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল গায়ে। বারবারই এ রকম হচ্ছিল। আর ফিরে ফিরে দ্রবময়ীকে জলে নামতে হচ্ছিল নতুন করে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য। তিক্ত বিরক্ত দ্রবময়ী ওদের মা-বাপ তুলে সমানে গাল পেড়েছেন। কিন্তু তাতে বড়ো বয়েই গেছে ওদের। ওরা খালি খিলখিল করে হেসেছে নিজেদের মধ্যে, আর বড়ো বড়ো মাছের মতো জল তোলপাড় করে পাক খেয়েছে, কেউ কেউ ডুব সাঁতার কেটে এসে ঢুঁশ দিয়েছে পেটে, কেউ বা ঘাট থেকে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাড়ের অগভীর জলকে ঘোলা আর ময়লা করে তুলেছে। ক্ষিপ্ত দ্রবময়ী তারস্বরে গাল দিয়েছেন, 'ওবে অলপ্পেয়ে হাড়হাভাতে পোড়ারমুখোরা। মা-বাপ কি তোদের শিক্ষা দেয় না? নুড়ো জ্বেলে দিই তোদের বাপ-মায়ের মুয়ে। যম কি তোদের ভুলে গেছে—'

ঘাটের অন্যান্য বয়স্ক স্নানার্থীরা ব্যাপারটা প্রথমে উপভোগ করেছে। গায়ে গতরে যথেষ্ট শক্ত ও কার্যক্ষম এই বৃদ্ধাকে সকলেই সমীহ করে শুধু তার মুখের ভয়ে। মুখরা ঝগড়াটে বলে খ্যাতি আছে দ্রবময়ীর। আর সে খ্যাতি কিছু অযথার্থ নয়। তার ঝগড়ার তোড়ের মুখে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সাহস আর বুকের পাটা এ তল্লাটে কোনও মানুষের নেই। বালখিল্যদেব হাতে দ্রবময়ীর ওই হেনস্থায় স্নানরত অন্যান্য বয়স্ক মানুষেরা বেশ খুশিই হচ্ছিল। কেউ কেউ আড়ালে চোখের ইশারায় প্ররোচনাও জুগিয়েছে। শেষে যখন ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করল তখন সেই বয়স্ক মানুষদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেই রেহাই পেলেন দ্রবময়ী।

এ তল্লাটে ছোটোবড়ো সকলেই দ্রবময়ীকে দিদিমা বলে সম্বোধন করে। সকলেই চেনে দ্রবময়ীকে। কত বয়স হল তার কে জানে। বিধবা দ্রবময়ীকে সধবা দেখেছে এমন মানুষ ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে এ অঞ্চলে। পাড়ার প্রান্তে এক প্রকাণ্ড নির্জন পোড়ো বাড়িতে তার নিঃসঙ্গ বাস। আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও আছে বলে কেউ জানে না। ঘুঁটে দিয়ে, নকশি কাঁথা সেলাই করে, ঠোঙা তৈরি করে তার পেট চলে। তাই বলে কার কাছে নিচু হওয়ার পাত্রী নন দ্রবময়ী। এক কথার উত্তরে দশ কথা শুনিয়ে দিতে এতটুকু কসুর করেন না। একা একা আপন মনে সারাক্ষণই বক বক করেন। বিশ্ব সংসার আর এই সংসারের স্রষ্টা—উভয়ের বিরুদ্ধেই তার অন্তহীন অভিযোগ। উভয়ের মুখেই অহরহ ঝাড়ু মেরে মনে শান্তি পেয়ে থাকেন।

দ্রবময়ী গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছিলেন। আর ক্লান্তিহীন যতিহীনভাবে তার মুখ চলছিল, 'ওই ধাড়িগুলোই হল আসল বজ্জাত। ভাবে আমি কিছু বুঝতে পারিনে! চোখের মাথা কানের মাথা খেয়ে বসে আছি।

আমি যেন বুঝিনি আড়াল থেকে ওই পঙ্গপালকে লেলিয়ে দিচ্ছিল। নচ্ছার পাজিগুলোর ঘরে ঘরে মাগ আছে না—আমি বলছি তাদেরও এই আমার দশা হবে। দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হবে। তেরাত্তির পোয়াবে না। যদি না হয় তো আমার নাম দেরবময়ীই নয়! তখন তোমরা দেরবময়ীর নামে কুকুর পুষো—হ্যাঁ—'

দোকানের ঝাঁপ প্রায় সবটা নামিয়ে দিয়ে একটুখানি ফাঁক করে নটবর বসে দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছিল। বকবকানিতে তার মনোযোগ ক্ষুণ্ণ হল। তাকিয়ে দ্রবময়ীকে রাস্তায় দেখে হেঁকে উঠল নটবর, 'ও দিদিমা, ও দিক পানে যেয়োনি। খুব গোলমাল বেঁধেছে—'

কথার মধ্যে বাধা পেয়ে দ্রবময়ী ঘুরে দাঁড়িয়ে নটবরকে দেখলেন। তার দু চোখে আগুন ছুটছিল। নটবরের কথায় কোনও বজ্জাতি আছে কি না ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নটবরের গম্ভীর উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে খানিকটা নিশ্চিত হলেন যে নটবর ইয়ার্কি মারছে না। তখন তিনি বীরবিক্রমে বললেন, 'কীসের গোলমাল র‍্যা?'

—আর দিদিমা, কীসের গোলমাল সে খোঁজ কে রাখে। গোলমাল তো লেগেই আছে। খুব বোমবাজি হল কিছু আগে, তারপর চাকু চালাচালি। মোড়ের উপর নাকি লাশ পড়ে আছে একটা। পুলিশ এসেছে দু ভ্যান ভর্তি, হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে তাকেই তুলছে। ও দিক পানে এখন যেয়োনি দিদিমা, তোমাকেও রেয়াত করবে না—। নটবর গম্ভীর মুখে আবার বিড়ি বাঁধায় মন দিল।

নটবরের উক্তিতে দ্রবময়ীর অহঙ্কারে আঘাত লাগল। কোনও কীটপতঙ্গ দেখার দৃষ্টিতে নটবরকে দেখলেন তিনি। তারপর সদর্পে বললেন, 'দেরবময়ীকে ধরবে তেমন পুলিশ এখনও মায়ের গব্বে। পুলিশ এয়েছে তো হয়েছেটা কী। পুলিশের ভয়ে কি এই গঙ্গাচ্চান করে এসে ঘুরপথে আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে বাড়ি ফিরব! তেমন বাঁদি দেরবময়ী নয়—'

বকবক করতেই দ্রবময়ী এগোলেন, 'আমায় কিনা পুলিশ দেখাচ্ছে। বলে কত পুলিশ দেখনু জেবনে। বোচনের বিয়ে হয়েছিল পুলিশের কে বড়ো কত্তার সঙ্গে। সবাই তো ভয়েই তটস্থ। এই দেববময়ী গিয়ে সেই পুলিশের কানটা এমন মলে দিল যে কান ছাড়িয়ে নিয়ে পালানোর পথ পায়নি বাছাধন। সব্বাই বললে, হ্যাঁ দিদিমা তোমার সাহস আছে বটে। আমি বলনু, সাহসেব আর দেখলি কী, ওই পুলিশের বাপকে নিয়ে আয় না, তার কানটাও মুলে দিই কো তরিবত করে—'

আপন মনে বকতে বকতে দ্রবময়ী পথ হাঁটছিলেন। পুরোনো কথার টানে পুরোনো দিনগুলো তার মনে ফিরে আসছিল। বোচন হল দ্রবময়ীর ভাইঝিব মেয়ে। সে এখন বয়স্কা বিধবা, কাশীবাসী। সেই বোচনের বিয়ে—সে আজ কতদিন হয়ে গেল—

স্মৃতি রোমন্থনের দরুন অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিলেন দ্রবময়ী। বাইরের দিকে চোখ ছিল বটে, বিশেষভাবে লক্ষ করে কিছু দেখছিলেন না। নইলে দেখতে পেতেন যতই এগোচ্ছেন রাস্তা ক্রমেই জনবিরল হয়ে উঠছে, দুপাশের দোকানপাটের ঝাঁপ নামানো, বাড়িঘরের দরজা এঁটে বন্ধ করা। সকালে এই সময় এমনটা হওয়াব কথা নয়। এখন রাস্তাঘাট লোকজনে গম গম করে, দোকানে দোকানে বিকিকিনি চলে, দু দিক দিয়ে হাজারও মানুষ যাতায়াত করে।

চৌরাস্তার মোড় বরাবর এসে পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন দ্রবময়ী। আশ্চর্য চোখ নিয়ে তিনি চারপাশে তাকাতে লাগলেন। নটবরের কথাটা মনে পড়ল। কি নাকি গোলমাল হয়ে গেছে এখানে একটু আগে—

গোলমালের চরিত্রটা বোঝার জন্য দ্রবময়ী নজর তীক্ষ্ণ করে মোড়ের দিকে তাকালেন। দুটো পুলিশের গাড়ি দেখতে পেলেন। গোটা কয় পুলিশ টহল মেরে বেড়াচ্ছে। হাতে বন্দুক। আর কিছু নয়—

না, আরও কিছু ছিল। ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা মানুষ শুয়ে রয়েছে কাত হয়ে। ঠিক শুয়েও নেই। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওভাবে শোয় না। হাত-পায়ের অবস্থান প্রথামত নয়। দুটো পা পরস্পরের সঙ্গে একটা প্রায় অসম্ভব কোণ সৃষ্টি করেছে, বাঁ হাতটা যেভাবে বেঁকে সমস্ত শরীরের তলায় চাপা পড়ে

গেছে তাতে মনে হয় মানুষটা যেন দৈবাৎই পড়ে গেছে রাস্তায়, পড়বার আগে নিজেকে সামলে নেওয়ার অবকাশটুকুও পায়নি।

মানুষটাকে ঘিরে এক গঙ্গা রক্ত। সহস্রধারায় সেই রক্ত গড়িয়ে চলে গেছে, নানা দিকে গড়ানো রাস্তার গা বেয়ে বেয়ে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা বহুপদ লোহিতবর্ণ প্রাণী তার হাজারটা পা দিয়ে মাটি কামড়ে ধরে রয়েছে অন্তিম মৃত্যু পদক্ষেপে।

দ্রবময়ীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। নটবর বলেছিল বটে একটা লাশ পড়ে আছে মোড়ের উপর। আহারে! কে জানে কে মরল। কার ছেলে বা কার স্বামী। কী যে হল দেশটার! খালি মারামারি আর কাটাকাটি। আর অল্পস্বল্প কিছু নয়। একেবারে জীবনের মতো শেষ। যে যাকে পারছে শেষ করে দিচ্ছে ঠান্ডা মাথায়। লোকমুখে শুনতে পান দ্রবময়ী রোজই নাকি এমন দশ-বিশটা মরছে। এ অঞ্চলেও যে এর আগে কেউ মরেনি এভাবে এমন নয়। তবে এতদিন শুধু তিনি শুনে শুনে এসেছেন, এমন সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করেননি কোনওদিন এর আগে—

মোড়টা পেরিয়ে যেতে হবে দ্রবময়ীকে। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার চলতে শুরু করলেন। মুখে বকবকানির কামাই ছিল না, —'মার ঝাড়ু, ঝাড়ু মার এমন স্বাধীনতার মুয়ে। কাটাকাটি করে সব শেষ হয়ে গেল আর ভোগ করবে কে স্বাধীনতা। তখন সব একেবারে হেদিয়ে উঠে সায়েবগুলোকে খেদালে, এখন কোনও কিছুই সামলাতে পারছে না নিজেরা। সব চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে—'

জনমানবশূন্য চৌরাস্তায় শুধু কয়েকজন পুলিশ প্রহরী আর দ্রবময়ী। দ্রবময়ীর দুর্জয় সাহসে বোধ হয় পুলিশ কজন অবাক হয়ে গিয়েছিল। মুখে কথা জোগায়নি! ততক্ষণে দ্রবময়ী অনেকটা এগিয়ে এসেছেন! এখন সংবিৎ ফিরে পেয়ে একজন প্রহরী হেঁকে উঠল, 'এ ই বুড়িয়া। তুম কিধর যাতি হ্যায়?—'

দ্রবময়ী ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তা পুলিশটির দিকে তাকালেন। তামাটে ফোলা ফোলা মুখ। জমকালো চোমড়ানো গোঁফ দু ভাগ হয়ে দুদিকে উঠে গেছে কান পর্যন্ত। কান থেকে অনেকখানি উপরে তুলে ছোটো ছোটো করে চুল ছাঁটা, চোখের সাদা জমিতে লাল ছিটে। দ্রবময়ীর হাবেভাবে যুদ্ধং দেহি ভাব ফুটে উঠল,—'কেন বে আঁটকুড়োর ব্যাটা, তোকে সে কৈফত দেব কেন?'

সম্বোধনের অর্থটা বুঝতে পারল না পুলিশ। কিন্তু দ্রবময়ীর চোখের রক্তিমাভা আর বাজখাই কণ্ঠস্বর থেকে সে অন্তত বুঝল যে সেটা খুব প্রীতিপূর্ণ নয়। সেও সমান তেজের সঙ্গে তার বন্দুকের কুঁদো দুবার মাটিতে ঠুকে বলল, 'হঠ যাও, হঠ যাও ইধরসে। ভাগ যাও—'

নেহাত দ্রবময়ীর দু হাত জোড়া বলেই তিনি কোমরে আঁচল জড়াতে পারলেন না। কিন্তু তার চোখমুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সম্মুখযুদ্ধ থেকে হাব মেনে পিছু হটার পাত্রী তিনি নন। দ্রবময়ী কাংস্য কণ্ঠে চাপান দিলেন, 'কেন্ র‍্যা? কেন্ র‍্যা নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি? এটা কি তোর চোদ্দোপুরুষেব বাপেব জমিদারি যে হট যাও বললেই হটে যাব। ও সব চোখরাঙানি দেরবময়ীকে দেখাতে এসনি। দেরবময়ী কারও শাসানিকে ভয় পায় না। মুল্লুকমে তোমার জরু হায় না, চোখ গরম তাকে করগে যা ব্যাটা, সে ভয় খায়গা—'

মুল্লুকস্থিত জরুর উল্লেখে পুলিশটি বড়োই অপমানিত বোধ করল। তার চোখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তার অন্যান্য সঙ্গীরা হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠায় ভীষণ অপ্রস্তুত বনে গেল সে। উত্তেজনা দমনের জন্য সে বাঁ হাতে গোঁফের পরিচর্যা করতে করতে বলল, 'হাসতে কিঁউ? হাসতে কিঁউ তুমলোগ? হাসনে কা বাত কেয়া হুয়া?'

এবার অপর একটি পুলিশ এগিয়ে এল। সমঝোতার সুরে দ্রবময়ীকে বলল, 'আরে বুড়ি মাই—। আপ কাহে ইধর আয়ি? বহুৎ বোম গিরা, ফিন শুরু হো যায়গা আভি। উধর দেখিয়ে চাক্কুসে আদমি খুন হো গিয়া। আপ জানানা হায় না। ইতনা ঝামেলা মে আপকো ত আনা ঠিক নহি—'

শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে দ্রবময়ী বললেন, 'দেখ জমাদার সাহেব, আমাকে আর ঠিক বেঠিক শেখাতে এসনি। এই চার কুড়ি বয়স হতে চলল আমার। আমার লেড়কা বেঁচে থাকলে এতদিনে তোমাদের চেয়ে বড়ো হত। তোমরাও আমার লেড়কার মতো—'

স্বজন স্বদেশ থেকে দূরে প্রবাসী পুলিশটি দ্রবময়ীর কথায় খুশি হয়ে উঠল। তবু একটু খুঁতখুঁতুনির সঙ্গে সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলল, 'ইত ঠিকই বাত হায় মাইজি লেকিন—'

ততক্ষণে দ্রবময়ী পুলিশের নির্দেশমতো রাস্তায় পড়ে-থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়েছেন। মানুষটার গোটা শরীরটা কাত হয়ে গেছে বটে, মুখটা কিন্তু একটা অস্বাভাবিক মোচড় খেয়ে চিত হয়ে আছে আকাশমুখো। ফলে মুখটা ভালো করে দেখতে পেলেন দ্রবময়ী। আর দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মানুষ কোথায়। এ যে নেহাত কচি ছেলে। কত আর বয়স হবে। সতেরো আঠারো খুব জোর। গোঁফের রেখা থেকে এখনও নীল ভাবটুকু সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। একেই দ্রবময়ী এতক্ষণ একটা দশাসই মানুষ ভেবে ভুল করেছিলেন।

—আহা রে! কোন মায়েব কোল আলো করা মানিক এমন ধুলোয় লুটোয় রে! বলে দ্রবময়ী পড়ে-থাকা ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

—আরে এই বুড়ি মা-ই— সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত ভাবে হেঁকে উঠল পুলিশরা সমস্বরে, 'আপকো উধব মৎ যানা। শুনতি নহি কিঁউ আপ—'

ধমকধামকে কর্ণপাত করলেন না দ্রবময়ী। গুটি গুটি এগিয়ে গেলেন যেমন যাচ্ছিলেন। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তিনি ছেলেটিকে দেখতে লাগলেন। জনা দুই পুলিশ তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দ্রবময়ীর দু পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। একজন অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দেখিয়ে বুড়ি মাই, আপ কেয়া ঝামেলা পাকাতি। বাত শুনতি নহি আপ। অফসর লোক আ যায়েগা তো বহুত গুস্‌সা করেগা—'

মনোযোগে বাধা পেয়ে রেগে গেলেন দ্রবময়ী, 'আ মলো যা। এত ভ্যাজর ভ্যাজর করে জ্বালিয়ে মারলে বাপু। তোমবা ভেবেছ কি অ্যাঁ? একটা ছেলে মরে পড়ে আছে—ভালো করে দেখব না কাদেব বাড়ির ছেলে, কি বিত্তান্ত—'

বলতে বলতে দ্রবময়ী লক্ষ করলেন, যে ছেলেটিকে তিনি মৃত ভেবেছিলেন, আসলে সে মরেনি এখনও। ধীবে বিলম্বিত লয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে ছেলেটির। খুব ক্ষীণভাবে তার বুক উঠছে নামছে। দেখেই সর্ব কিছু ভুলে গেলেন দ্রবময়ী। ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত ভাবে একজন পুলিশের দিকে ফিবে বললেন, 'এ যে মরেনি জমাদার সায়েব। বেঁচে আছে এখনও।' সাগ্রহে পুলিশের বাহু চেপে ধরলেন দ্রবময়ী, 'ও জমাদার সায়েব,' ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা কর না, শিগগির। দেখছ না ধড়ে প্রাণটা রয়েছে এখনও। ও জমাদার সায়েব। এখুনি ব্যবস্থা কর—'

উদ্দিষ্ট পুলিশটি বিপন্ন দৃষ্টিতে তাব সঙ্গীসাথিদের দিকে তাকাল। তারপর মরিয়ার মতো বলল, 'আপ কেয়া বাতাতে মাইজি! ও কাম হামসে নেহি হোগা। অফসর লোক আ কর মেরা নোকবি খা লেগা—'

তাচ্ছিল্যোব ভঙ্গিতে হাত ছুড়লেন দ্রবময়ী, 'কি খালি অফসর অফসর করতা হায়। বোলাও তোমাব অফসরকে। তুমকো অফসরের ধুধ্‌ধুড়ি নেড়ে নেই দেগা তো আমার নাম দেরবময়ীই নয়। কোথায় গেছে সে গুখেকোর বেটা—'

চালু বিশেষণগুলো বোধগম্য হল না পুলিশের। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দ্রবময়ীব মুখেব দিকে। তারপর আন্দাজে প্রশ্নটা বুঝে বলল, 'অফসর লোক গিয়া হায় ইনকুয়েরি মে। আভি আ যায়গা। আপ অভি হট যাইয়ে ইধরসে, হট যাইয়ে—।' দুজন পুলিশ তাদের রাইফেল আড়াআড়ি করে দ্রবময়ীকে মৃদুভাবে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল।

—আরে এ উনুনমুখোগুলো ঠেলাঠেলি করে কেন র‍্যা—। দ্রবময়ী হাতের তাড়নায় আড়াআড়ি রাইফেল দুটোকে সরিয়ে দিলেন সামনে থেকে। তারপর সেই ধুলোবালি আকীর্ণ রাস্তায় ঝপ করে বসে পড়লেন পড়ে থাকা ছেলেটির পাশে। গঙ্গাজলের ঘটি আর স্তূপীকৃত ভিজে কাপড়চোপড় রাস্তাতেই নামিয়ে রাখলেন। তারপর সযত্ন সাবধানে মুমূর্ষু ছেলেটির মাথাটি তুলে নিলেন নিজের কোলে।

পুলিশরা সমস্বরে হাঁ হাঁ করে উঠল।

দ্রবময়ী ধমকে উঠলেন, 'চুপ করে থাক বেটারা। কানাকড়ির মুরোদ নেই—কুলোপানা চক্কর!—'

ছেলেটির মাথা কোলে নিয়ে দ্রবময়ী চারপাশে কাছে দূরে তাকাতে লাগলেন। চারপাশে বাড়ির বারান্দায় জানলায় কিছু কিছু মানুষ দেখা দিয়েছে ততক্ষণে। চৌরাস্তার মোড়ে যে কাণ্ডটা চলছে তাই দেখবার জন্য কতগুলো মানুষের কৌতূহলী উৎসুক মুখ—সতর্ক চোখ জড়ো হয়েছে এখানে সেখানে বারান্দায় জানলায় গলির মোড়ে মোড়ে। দ্রবময়ীকে সকলে চেনে, সকলে সমীহ করে। কিন্তু তবু তার এই দুর্জয় সাহসের সঙ্গে কারও পরিচয় ছিল না। এখনই পুলিশরা মারধর শুরু করতে পারে, ছেলেটির বিপরীত পক্ষ—যারা তাকে হত্যাই করতে চেয়েছে—বোমা ছুড়তে শুরু করতে পারে। অথচ বলিহারি সাহস বুড়ির, কোনও কিছুকে পরোয়া না করেই কেমন পুলিশের সঙ্গে যুঝে একেবারে সিংহের গুহায় আসন পেতে বসেছে।

দ্রবময়ী দূরে দূরে দৃশ্যমান মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন বাজখাঁই গলায়, 'বলি ও ভদ্দরনোকের ছেলেরা, ও ছেলেপুলের বাপেরা, ও এয়োতি পোয়াতির সোয়ামিরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে মজা না দেখে একটু এগিয়ে এস না। এই ছেলেটাকে একটু হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত কর। এখনও প্রাণটা ধুক্‌পুক্ করছে বুকের মধ্যে। রাস্তায় পড়ে পড়ে বিনে চিকিচ্চেয় মরে যাবে নাকি বেচারা—'

দ্রবময়ীর উচ্চ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভর করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যারা দ্রবময়ীর কার্যকলাপ দেখবার জন্য দূরে দূরে জমায়েত হয়েছিল, এখন সহসা দ্রবময়ীর এই আহ্বানে বিপন্ন বোধ করল। ডাকলে কি অমনি সাড়া দেওয়া যায় নাকি! যাওয়া যায় নাকি ওখানে! ওখানে পুলিশ আছে, পুলিশের হাতে রাইফেল আছে, রাইফেলে গুলি ভরা আছে, প্রয়োজনবোধে গুলি চালানোর খোলাখুলি নির্দেশ দেওয়া আছে, আড়ালে আবডালে মারমুখো ছেলেরা হাতবোমা নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে—ওখানে গিয়ে কে যেচে বিপদকে বরণ করে নেবে। তার চেয়ে নিরাপদে পিছিয়ে যাওয়াই ভালো।

দূরে দূরে জমায়েত মানুষগুলোর মধ্যে পিছনোর জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গেল। জানলা থেকে মুখগুলো কাগজের ছবির মতো হাওয়ায় উড়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষগুলো হঠাৎ উবু হয়ে বসে পড়ে বারান্দার জাফরির আড়ালে আত্মগোপন করল, আর গলির মোড়ে মোড়ে মানুষগুলো একজন আর একজনের আড়ালে যাওয়াব প্রচেষ্টায় সবাই মিলেই প্রায় গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে অবাক চোখে বয়স্ক মানুষগুলোর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করলেন দ্রবময়ী। তারপর তাঁর ভাঙা কাঁসরের মতো কণ্ঠস্বর খন খন করে বেজে উঠল, 'এ কি র‍্যা, এ কি! এগুলো সব মানুষ না আর কিছু। নাকি ভেড়ার পাল। সব পালিয়ে গেল। একটা ছেলে মরে যাচ্ছে আর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কেউ একটু এগিয়ে পর্যন্ত এল না। এই কি মানুষের মতো ব্যাভার—' দ্রবময়ী পাহারারত পুলিশদের দিকে তাকালেন করুণ চোখে। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'ও বাবারা, তোমরা একটা কিছু ব্যবস্থা কর। এ যাতে মরে যায় তাই দেখবার জন্যই কি তোমরা আছ এখানে—'

ততক্ষণ পুলিশদের দৃষ্টি ঘুরে গেছে অন্যদিকে। সে দিক থেকে মস্‌মস্ করে এক সঙ্গে অনেক জোড়া জুতোর শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে এ দিকে। দ্রবময়ী ঘাড় ঘুরিয়ে পুলিশদের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন চার-পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাদের চোখেমুখে উত্তোলিত ভ্রূতে গভীর বিস্ময়।

পুলিশ অফিসাররা কাছে চলে এল। একজন অফিসার পাহারাদার পুলিশের দিকে তাকিয়ে দ্রবময়ীকে দেখিয়ে কঠোর স্বরে বলল, 'ই কেয়া?'

একজন পুলিশ কৈফিয়তের সুরে বলল, 'বাত মানতি নেহি মাইজি। আ গেয়ি আউর বৈঠ গেয়ি উধর—'

পুলিশ অফিসারের কণ্ঠস্বর কঠোরতর হল, 'হুঁ। আ গেয়ি আউর বৈঠ গেয়ি। তুম ইধর থা কিঁউ?' অফিসার দ্রবময়ীর কাছে এগিয়ে এল। উপর থেকে উপবিষ্ট দ্রবময়ীর দিকে তাকিয়ে তর্জনী সংকেতে নির্দেশ দিয়ে কঠিন কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'এই যে! আপনি উঠুন। উঠে পড়ুন—'

দ্রবময়ী চোখ তুলে পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন গাড়িবারান্দাওলা টুপির নীচে অফিসারের দৃষ্টি খর। লালচে মুখ রাগে থমথম করছে। কিন্তু রাগ দেখে ভয় পাওয়ার পাত্রী দ্রবময়ী নন। তিনিও সমান তেজের সঙ্গে বললেন, 'কেন? উঠব কেন?'

—এটা বসে থাকার জায়গা নয়।

দ্রবময়ী বললেন, 'তাতো নয়ই। আগে ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর। গিয়ে হাসপাতালে বসে থাকব—'

পুলিশ অফিসার আরও রেগে গেল। দ্রবময়ীর 'তুমি' সম্বোধন তার সম্মানবোধকে ক্ষুণ্ণ করেছে, 'হাসপাতালে পাঠাব কি মর্গে পাঠাব সে আমরা বুঝব। এখন আপনি উঠুন। চলে যান এখান থেকে—'

দ্রবময়ী কয়েক পলক দেখলেন অফিসারকে। তারপর সুরটিকে একটু টেনে রেখে বললেন, 'ই—স্। উঠব। চলে যাব। উঠব কেন? কেন চলে যাব? তোমার হুকুমেই? এটা কি তোমার রাজত্বি নাকি? ছেলেটা এখানে পড়ে থাকবে, আর আমি তোমার কথাতেই চলে যাব ওকে ছেড়ে! বলি তুমি পেয়েছ কী? অ্যাঁ? মগের মুলুক নাকি?—'

পুলিশ অফিসার কী বুঝল কে জানে। চট করে সে আর কোনও কথা বলল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত সহকারে সে বলল, 'ও কি আপনারই ছেলে?'

দ্রবময়ী চোখ তুলে পুলিশ অফিসারের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। আমার ছেলে। আমারই। মেলা বকবক কোরো না বাপু—'

—আপনার ছেলে তো সামলে রাখতে পারেননি ছেলেকে! এই সব গুণ্ডামি বদমাইশি না করলে এমন অকালে মরত না—

দ্রবময়ীর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছুটল, 'সে কৈফত তোমাকে দেব না। তোমরা ভাত দেওয়ার ভাতার নও, কিলোবার গোঁসাই। ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পার না। ওই সব ভালো ভালো বুলি কপচাতে এয়েছ যে বড়ো—'

সহসা দ্রবময়ীর কোলের মধ্যে আহত মুমূর্ষু ছেলেটার মাথাটা নড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তিনি কথা থামিয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন সে চোখ খুলেছে। সারা মুখে তীব্র যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। ঘোলাটে চোখের মণি দুটো নিষ্প্রভ সাদা জমিতে অস্থির অনির্দিষ্টভাবে নড়ছে ঘুরছে, যেন তার চোখের সামনে অতি দ্রুত নেমে-আসা কালো পরদাটা ভেদ করে সে কিছু দেখতে চায়, কিন্তু ক্রমেই তার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, ঝাপসা হয়ে আসছে, ঘন কালিমা ছাড়া আর কোনও কিছুই নেই সামনে। তখন ছেলেটার ঠোঁট দুটো ক্ষীণ ভাবে নড়ে উঠল। কী যেন বলছে। কিন্তু তার অস্পষ্ট অস্ফুট কণ্ঠস্বর কারও কানেই পৌঁছল না। তাড়াতাড়ি দ্রবময়ী মুখ নামিয়ে তার মুখের কাছে কান পেতে শুনলেন, 'জ—ল—'

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন দ্রবময়ী, 'জল! বাছা আমার জল খেতে চাইছে। জল কোথায় পাব এখানে এখন—' ব্যগ্র ব্যাকুলভাবে দ্রবময়ী নিজের চারপাশে তাকালেন—'জল। একটু জল এনে দাও না কেউ আমার বাছার জন্য। একটু জল—'

ঠোঁট আবার কেঁপে উঠল ছেলেটার। তখন দ্রবময়ী পাশে বসানো গঙ্গাজলের ঘটিটা হাতে তুলে নিলেন, 'এখানে আর জল কোথায় পাব। কে এনে দেবে। নে বাবা, একটু গঙ্গাজলই খা। শেষ সময়টা গঙ্গাজলই পড়ুক মুখে—'

দ্রবময়ী ঘটি কাত করে ক্ষীণ ধারায় গঙ্গাজল ঢেলে দিতে লাগলেন ছেলেটার মুখে, 'হরি বল, বাবা, হরি বল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল বাবা—'

ছেলেটার মুখে কিছু জল গেল, বেশিটাই গেল না। তারপর কশ বেয়ে সবটাই রাস্তায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে তার চোখের মণি দুটোর চঞ্চলতা ঘুচে গেল। অবশেষে উর্ধ্বে উঠে গিয়ে স্থির অনড় হয়ে গেল দুটো ছররা গুলির মতো। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ থেকে শুরু হয়ে একটা তীব্র শিহরন ক্রমেই

উপর দিকে উঠে আসতে আসতে সেই শিহরনের অন্তিম আক্ষেপেই যেন ছেলেটার মাথাটা দ্রবময়ীর কোলের মধ্যেই ঢলে পড়ল।

দ্রবময়ী বুঝলেন ছেলেটা মরে গেল! আর কিছুই করার নেই। কী হবে আর এখানে বসে থেকে মরা ছেলের মাথা কোলে নিয়ে। দ্রবময়ী সাবধানে ছেলেটার মাথাটা ধরে পথের ধুলোয় নামিয়ে দিলেন। তারপর উঠলেন। এক হাতে তুলে নিলেন ভিজে কাপড়ের রাশ, গঙ্গাজলের ঘটি অপর হাতে। কারও দিকে না তাকিয়ে কোনও কথা না বলে এগিয়ে চললেন তিনি। পুলিশ অফিসাররা আর তাদের অধস্তন কর্মচারীরা আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে রইল অপস্রিয়মাণ দ্রবময়ীর দিকে।

দ্রবময়ী বক বক করতে করতে চলেছেন, ‘ছেলেটা রাস্তাতেই মরল। কেউ একটু এগিয়ে এল না। ধরল না একটু। হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করল না। এ দেশে কি আর মানুষ আছে, না শেষ হয়ে গেছে সব। শ্যাল কুকুরে ভরে গেল সারা দেশটা। দয়ামায়া নেই, মানুষে মানুষে ভালোবাসা নেই, কেউ কারও জন্যে কাঁদে না—’

বলতে বলতে দ্রবময়ী অতীতে ফিরে গেলেন। আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে এক ঝড়জলের রাতে দ্রবময়ীর জোয়ান সমর্থ ছেলে তারই কোলের মধ্যে মাথা রেখে একটু একটু করে মরে গিয়েছিল। একটু সাহায্যের জন্য প্রতিবেশীদের দোরে দোরে গিয়েছিলেন দ্রবময়ী। চিৎকার করে কেঁদেছিলেন। ঝড়জলের শব্দে হয়তো সে চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি, অথবা ওইরকম এক ভয়ঙ্কর রাতে কেউ বাইরে বেরতে চায়নি বলে না শোনার ভান করেছিল। সহায়তার হাত বাড়িয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। সারা রাত অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ভোর রাত্রে ঠান্ডা নিঝুম হয়ে মরে গিয়েছিল দ্রবময়ীর ছেলে। মনে মনে সেই ঝড়ের গর্জন বৃষ্টির শব্দমুখরিত রাতে চলে গিয়েছিলেন।

সহসা দ্রবময়ীর শোকার্ত ব্যাকুল তীক্ষ্ণ মরাকান্নার ধ্বনি হাজারটা ছুরির ফলার মতো চারপাশের নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। চিৎকার করে কেঁদে উঠে দ্রবময়ী বলতে লাগলেন, ‘মার কোলে ছেলে মরে গেল, কেউ একটু দেখল না গো, কেউ একটু এগিয়ে এল না, মার কান্না কেউ শুনল না গো—’ কাঁদতে কাঁদতে দ্রবময়ী সহসা ফুঁসে উঠলেন, ‘ঝাড়ু মারি, সাত ঝাড়ু মারি পিথ্থিমির মুখে, ভগবানের মুখে—’

দ্রবময়ী এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর প্রায় অবশ হাতে ধরা গঙ্গাজলের ঘটির কানা বেয়ে জলের ধারা পথে ছড়িয়ে পড়ছে।

আকুল তৃষ্ণার্তের মতো পথের ধুলো সেই জল পলকে শুষে নিচ্ছিল। □

তপু চলে যাচ্ছে

প্রলয় সেন

উমা এতক্ষণ গোছগাছে ব্যস্ত ছিল। মালপত্র খুবই সামান্য। একটা চামড়ার সুটকেস। তাতে তপুর বইখাতা আর কিছু জামাকাপড়। এ ছাড়া একটা ছোটো বেডিং।

শ্রাবণের শেষ বেলা। তপু খাটে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জানলার ধারের পেয়ারা গাছটা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। ঘরে পর্যন্ত আলো নেই। উমা উঠে সুইচটা অন করল। তারপর শিয়রের কাছে এসে দমচাপা গলায় ডাকল, তপু এই তপু—

শেফালি রান্নাঘরে। কড়াইয়ে খুন্তি ঘষার ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ শোনা যাচ্ছে। অবিনাশ বলে গেছেন, সন্ধেসন্ধি যেন রান্না শেষ হয়! দাক্ষায়ণী উঠোনে। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে বসে দূর্বা তুলছেন। নন্তু সামনের ঘরে। আজ ওকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি। একাচোরা বসে তপুর পেনসিলের বাকসটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। কুয়োতলা থেকে ঠিকে ঝি পারুলের মা বাসন মেজে ফিরে আসছে।

ফের ডাকতে গিয়েও উমা থেমে গেল। তপুর মুখে একটা কালচে সর পড়ছে। মাথার চুলে ঝিনুক কুচিব মতো পেয়ারার ফুল জড়িয়ে। তপু কোলকুঁজো হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত খাটের বাইরে। চাদরের অনেকটা বুক থেকে খসে মেঝেয় লুটোচ্ছে। তপুর শোওয়া বরাবর বিশ্রী ধরনের। বছর দু-তিনেক আগেও তপু উমার সঙ্গে শুত। তারপর হঠাৎ তপু কেমন বড়ো হয়ে উঠল। এখন সামনের ঘবে অবিনাশেব সঙ্গে ও ঘুমোয়।

তপুর দিকে তাকাতে উমার বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠল। কাল রাতে পাড়া ছেঁকে ছেলেছোকরাদেব তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তপুকেও রেহাই দেয়নি। অথচ, উমা জানে, তপু কখনও বাইরের সাতেপাঁচে থাকে না। লেখাপড়া আর অবসর সময়ে ছবি আঁকা ছাড়া ওর আর তৃতীয় কোনও বাতিক নেই। তপুকে নিয়ে ভ্যানে তোলবার আগে সে কথা একবার শেফালি পুলিশকে স্মরণ করিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। পুলিশের লোক উত্তরে বলেছেন, 'এখন এসব কথায় কোনওই লাভ হবে না। উপরওয়ালার হুকুমে এসেছি। কাল থানায় আসুন। আগে ওকে আমরা ক্রস করি। তারপর ভালো বুঝলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।' শেফালি অবশ্য থানায় যায়নি। গিয়েছিলেন অবিনাশ। তপুকে নিয়ে ফিরতে বেলা ভেঙে এসেছিল।

রান্নাঘরে নন্তুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কতক্ষণ আর একা ঘরে থাকবে। শেফালি গনগনে গলায় বলছে, 'আঃ নন্তু! জ্বালাতন করিস না। যা না দিদির কাছে। কাল শেষ রাত থেকে গোটা বাড়িটা দম ফুরিয়ে যাওয়া ঘড়ির মতো থমথমে। শুধু নন্তু আগাগোড়া বিকারহীন।

দাক্ষায়ণী উঠোন থেকে তাঁর ঘরেব দিকে এগুচ্ছেন। এবার সিংহাসনের সামনে বসবেন। প্রদীপ জ্বালাবেন। ধুপধুনো দেবেন। তারপর ঠাকুরের দিকে মুখ করে বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ সব কীসব যেন আউড়ে যাবেন।

উমা নিচু হয়ে মেঝে থেকে চাদরের গড়ানো অংশটা তুলে আলতো করে তপুর গলা অবধি টেনে দিল। অবিনাশের ফিরতে আর দেরি নেই। উমা ভাবল, 'বাবা যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ তপু ঘুমিয়ে নিক। আজ সারাটা রাত ওকে ট্রেনে কাটাতে হবে।'

উমা ঘর থেকে বারান্দায় নেমে এল। আকাশে সবে তারা ফুটতে শুরু করেছে। খুব ছেলেবেলার কথা উমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। তপু তখন মার পেটে। সন্ধ্যা হতেই দাক্ষায়ণীর হাত ধরে উমা উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াত। তারপর আকাশে একটা-দুটো করে তারা ফুটে উঠতে দাক্ষায়ণীর কাছে থেকে

শেখা ছড়াটা সুর করে উমা পড়ত। সেই সঙ্গে দাক্ষায়ণী আঁচলে গিঁট বাঁধতেন। এবং এ সবই তপুর কল্যাণের কথা ভেবে।

শেফালি পারুলের মাকে বলছিল, 'তুমি এবার যাও বাপু। আর কোনও কাজ নেই। কাল সকাল সকাল এসো কিন্তু।' আসলে শেফালির যা মনের অবস্থা তাতে করে কাউকেই বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারছে না।

উমা রান্নাঘরে ঢুকে নন্তুর হাত ধরে টানল, 'চল গপ্প বলব।'

দাক্ষায়ণীর ঘর থেকে শাঁখের ফুঁ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা থেমে যাওয়ার আগেই ধারে কাছে কোথাও পরপর কয়েকটা বোমা ফাটল। নন্তুকে নিয়ে উমা সামনের ঘরে চলে এল।

শেফালি রান্নার ফাঁকে আঁচলে চোখ মুছে যাচ্ছে। আজ সারাটা দিন ধরে কেবলই চোখে জল কাটছে। অবিনাশ তপুকে পৌঁছে দিয়েই বেরিয়ে গেছেন। সকাল থেকে পেটে জলটুকু পর্যন্ত গড়ায়নি। সাদা চোখে দেখলে অবিনাশকে রীতিমত শক্তপোক্ত মনে হয়। কিন্তু শেফালি জানে, আজ কুড়ি বাইশ বছর সে এ সংসারে, লোকটার ভেতরটা কী নরম। সামান্য বিপদের আঁচ গায়ে লাগলেই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েন। তখন, অবিনাশ আর অবিনাশ থাকেন না।

নন্তু থেকে থেকে উমার চুল ধরে টেনে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'কই, বলো দিদি।' —তপুটাও ছেলেবেলায় গল্পপাগল ছিল। বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিল উমা। চিন্তাভাবনা ক্রমশই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ফের একটা বোমা ফাটল। খুব কাছে। উমার বুক দুরদুর করে উঠল। তার ধারণা আজকেব রাতটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। এ এক অদ্ভুত খেলা।

পাড়ায় পুলিশ ঢুকলে ছেলেগুলোর রক্তচাপ যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। উমা উঠে গলির দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গেল। গলির বাতিটা কে বা কারা নিভিয়ে দিয়েছে। দুপাশের বাড়িগুলোর দরজা জানলা সব বন্ধ। অন্ধকার ভয়াল হয়ে একটা অঘোষিত যুদ্ধের প্রস্তুতিতে থমথম করছে। একটা ভয় উমার বুকের উপর হঠাৎ পাষাণের মতো চেপে বসল। অবিনাশ এখনও ফিরছেন না। ওর তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত। হাওড়া থেকে গাড়ি সাড়ে আটটায় ছাড়বে। যে উমা, তপু সন্ধের পর একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলে শেফালির মতোই আশঙ্কা উদ্বেগে ছটফট করেছে, সেই উমাই আজ, এখন চাইছে, কত তাড়াতাড়ি তপুকে বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে পাচার করে দেওয়া যায়। শেফালি অবিনাশের কথা ভাবছিল। ছেলেকে পৌঁছে দিয়েই বেরিয়ে গেছেন। শেফালি বলেছিল, 'এক কাপ চা করি অন্তত। খেয়ে যাও।' অবিনাশ একটা বিড়ি ধরিয়ে মাথা নেড়েছিলেন, 'না, এখন আর দাঁড়ালে চলবে না।'—শেফালি চুপ করে গেছে। মাস্টারি স্বভাবটা অবিনাশের হাড়ে-মজ্জায় সেঁধিয়ে গেছে। অবিনাশ সদর দরজায় মুখ পর্যন্ত এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলেন, 'শেফালি, শোনো।' শেফালি এগিয়ে যেতে অবিনাশ চাপা গলায় বলেছিলেন, 'তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে?' শেফালি প্রমাদ গুনছিল। মাসের শেষ। লক্ষ্মীর ঝাঁপি নন্তুর কৌটো-ব্যাঙ্ক বাক্সপ্যাঁটরা সব কিছু আঁতিপাঁতি করে, হাতড়েও কুল্যে দশটা টাকা হবে না। তবু জিজ্ঞাসু গলায় শেফালি শুধিয়েছিল, 'কত টাকা?' অবিনাশ চোখের দৃষ্টি ঘন করেছিলেন, 'টাকা তো অনেক। আজ ইস্কুলে যেতে পারলে যা হোক করে জোগাড় করে ফেলতাম। শ'খানেক টাকা দরকার।' শেফালি নিভে যেতে যেতে থমকাল। জলে ডুবতে থাকা মানুষের মতো শেষ উপায়টা বার করে ফেলল, 'উমার হাতের বালা দুটো বন্ধক দিয়ে।' অবিনাশ হাসলেন, 'নাহ্ থাক।' তারপর ঠেলে গলিতে পড়লেন।

দাক্ষায়ণী এখন আলোর কাছে। শানকিতে কিছু খই নিয়ে ধান বাছতে বসেছেন। বর্ষাকাল। পেটের গণ্ডগোলের ভয়ে কিছুদিন হল রাত্তিরে রুটির বদলে খই খাচ্ছেন।

তপু জেগে গেছে। মাঝের ঘর থেকে ও তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠল, 'মা, ওমা!' রান্নাঘর থেকে শেফালি বলে উঠল, 'দ্যাখ্ তো উমা। তপু কী চাইছে।' আসলে থানা থেকে ফিরবার পর থেকেই শেফালি তপুকে এড়াতে চাইছে। ওর দিকে সোজাসুজি তাকালেই শেফালির বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে ওঠে। কথা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তপু আগাগোড়া পালটে গেছে। হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছেলে, কেমন অকালগম্ভীর আত্মমগ্ন; নিজের ছেলে বলেই মনে হয় না শেফালির।

উমা মাঝের ঘরে ঢুকতে তপু বলল, 'বাবা ফিরেছে?' উমা মাথা নাড়ল, 'না।' তপু মাথা নিচু করল, 'গামছাটা দিদি!' তপু কি লজ্জা পাচ্ছে। কিংবা কোনও অপরাধবোধ ওর ভেতর কাজ করে যাচ্ছে! নইলে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে না কেন? উমা হাসতে চাইল, 'এই ভরসন্ধ্যায় স্নান করবি।' তপু নন্তুর দিকে চোখ তুলল। রহস্য করে বলল, 'হাঁ করে আমায় কী দেখছিস। আয়, কাছে আয়।' উমা আর ঘাঁটাল না। গামছা খুঁজতে বারান্দায় চলে গেল।

অবিনাশ ফিরলেন ঠিক সাতটার সময়। ততক্ষণে তপুর স্নান-খাওয়া শেষ। নন্তুটা, সারাদিনের একটানা ধকলের পর ঘুমিয়ে পড়েছে। অবিনাশ খুব আস্তে করে সদর দরজায় টোকা দিচ্ছিলেন। বাইরের আলো না জ্বালিয়েই শেফালি এগিয়ে দরজা খুলল। ভেতরে পা দিয়েই অবিনাশ ফিসফিসিয়ে উঠলেন, 'তপুর খাওয়া হয়ে গেছে?' শেফালি উত্তর করল, 'হ্যাঁ। টাকা পেয়েছ?' অবিনাশ আরও কাছে এগিয়ে এলেন, 'পেয়েছি। ভবতারণ বাবুকে অনেক ধরে করে—।' ভবতারণবাবু কোনও এক সওদাগরি অফিসের বড়ো চাকুরে। অবিনাশ ওর ছেলেকে পড়ান।

বারান্দায় উঠে অবিনাশ ডাকলেন, 'উমা—।' গোটা বাড়িটা সাড়াহীন। দাক্ষায়ণী নিজের ঘরে। আলো নিভিয়ে আধশোয়া পড়ে আছেন। অবিনাশ না ফেরা অবধি দাক্ষায়ণী রাতের খাওয়া খান না। উমা মাঝের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে অবিনাশ বললেন, 'তপুর বইগুলো সব বাক্সে দিয়ে দিয়েছিস তো?' উমা মাথা নাড়ল। ফের বৃষ্টি-ভেজা বাতাস বাড়িময় ভারী পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। অবিনাশ ভেতরে ঢুকে তপুকে বললেন, 'পৌঁছেই চিঠি দিস কিন্তু।' তপু খাটে বসে পায়ে মোজা গলাচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেবো।' অবিনাশ ফের বললেন, 'শীতল নিয়ে যাবে তোকে। আমি অবশ্য স্টেশন অবধি পৌঁছে দিচ্ছি।' তপু বাবার কথায় উত্তর করল না। মেঝে থেকে সুটকেসটা হাতে তুলে নিল। তপুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে কেমন এক অপরাধবোধে অবিনাশ যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছিলেন। ভরদুপুরে থানা থেকে ওকে খালাস করে বড়ো রাস্তায় পড়বার পর অবিনাশ ছেলেকে চাঙা করে তোলার জন্যে একটানা বকর বকর করে যাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ এক সময় তাঁর মনে হয়েছে, যাকে তিনি ভরসা দিচ্ছেন, সেই তপু তেমন একটা ঘাবড়ে যায়নি। বরং, তিনি নিজেই ছেলের চেয়ে ভেতরে ভেতরে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। অবিনাশের অজস্র কথার ফাঁকে তপু একবার শুধু রা কেড়েছিল। তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, 'তুমি এত ভাবছ কেন বাবা। যা হওয়ার তা-ই হবে।'

উমা পাশের ঘর থেকে দাক্ষায়ণীকে ডেকে নিয়ে এল। অবিনাশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দাক্ষায়ণী মাজায় হাত রেখে কুঁজো শরীরটাকে সামলাতে সামলাতে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাকছিলি অবু?'

অবিনাশ কাপড়ের খুঁটে চশমার কাচ মুছে নিলেন, 'তপু চলে যাচ্ছে মানে পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

দাক্ষায়ণীর চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে এল, 'তপু যাচ্ছে, কোথায়?'

—বালুরঘাটে।

দাক্ষায়ণীর পিঠের কুঁজটা ওঠানামা করছিল। দু চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে। তিনি ভেঙে ভেঙে বললেন, 'অসময়ে বালুরঘাট কেন; কলেজের পড়া নষ্ট হবে না! সামনেই তো পুজোর ছুটি, তখন—'

উমা বেডিংটা দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অবিনাশ আমতা আমতা করে বলল, 'না, ঠিক বেড়াতে পাঠাচ্ছি না। কাল রাতে পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। পাড়ার অবস্থা খুবই খারাপ। তাই ভাবছি কিছুদিন মামাবাড়িতে কাটিয়ে আসুক।'

দাক্ষায়ণী বড়ো চোখ করে ছেলের ভাবগতিক বুঝতে চাইলেন। তাঁর বহুদিন আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সে দিনটাও ছিল এমন শ্রাবণের শেষ সন্ধ্যার সময়। বাড়ি ফিরে অবিনাশ দাক্ষায়ণীকে ডেকেছিলেন। মার পরামর্শ ছাড়া অবিনাশ কোনও কাজ করেন না। আড়ালে ডেকে বলেছিলেন, 'আর তো এখানে থাকা যাবে না মা।' দাক্ষায়ণী শুধিয়েছিলেন, 'কেন, কী হল?' অবিনাশ উত্তর করেছিলেন, 'দেশ ভাগ হয়ে গেল। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে।' দাক্ষায়ণী তেতোমুখে বলেছিলেন, 'তাই বলে সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে?' অবিনাশ মলিন হেসেছিলেন, 'কী আর করা যাবে। সবাই তো চলে যাচ্ছে।'

দাক্ষায়ণী সে দিন আর কোনও প্রশ্ন করেননি ছেলেকে। আজ করলেন, 'পাড়ার অবস্থা ভালো নয়, তাতে ওর কী। তপুর তো কিছুর মধ্যে নেই!'

ও পাশ থেকে তপু নড়েচড়ে উঠল। হয়তো ওরও এই একই প্রশ্ন অবিনাশের কাছে। তবে জিজ্ঞাস্য বিষয়টা অন্য ধরনের। ছেলেবেলা থেকে অবিনাশ ছেলেকে নিজের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। বারবার বলে এসেছেন অবিনাশ, অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোটাই হল মনুষ্যত্ব। আর আজ, একটা দিনের সামান্য ঘটনায় অবিনাশ সে কথা ভুলে গেলেন কী করে।

অবিনাশ চুপ করে গেলেন। দাক্ষায়ণীর প্রশ্নের উত্তরটা তার জানা নেই। যেমন নেই ছেলের চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো সাহস।। এতকালের কিছু ধারণা-ভাবনা সব ছাপিয়ে এ কথাটাই আজ অবিনাশের কাছে বড়ো হয়ে উঠছে যে, তিনি আসলে তপুর পিতা। নইলে, এ সত্য কথাটা তাঁর চেয়ে কে আর ভালো করে জানে যে, তাঁর সন্তান কতটা নির্দোষ। তবু, এই মুহূর্তে তিনি অসহায়, প্রতিকারহীন। তিনি বুঝে গেছেন, সত্যের চেয়েও বর্তমানটা অনেক মারাত্মক। তপু নিরপরাধ সত্য কথা। কিন্তু ওর বয়েসটা, শুধু ওব ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত দেশের এই বয়সি ছেলেদের ক্ষেত্রেই, সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

দাক্ষায়ণী ছেলেকে নিরুত্তর দেখে ফের বললেন, 'তুই সঙ্গে যাচ্ছিস তো?' অবিনাশ এতক্ষণে যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, 'না, আমি যাচ্ছি না। শীতল যাবে। শীতলকে ফোনে বলে রেখেছি। ও স্টেশনে হাজির থাকবে।' শীতল শেফালির ছোটো ভাই। কিছুদিন হল চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসেছে। উঠেছে ওর কাকার বাড়ি। দাক্ষায়ণী ভ্রূ কোঁচকালেন, 'তা তুই যখন ঠিক করে ফেলেছিস তখন আমি আর কী বলব। তবে, হ্যাঁ রে, বালুরঘাট জায়গাটা তো ভালো?'

দাক্ষায়ণীকে হঠাৎ কেমন মারমুখী লাগছে। ওঁর কথাটা ছুরির ফলার মতো অবিনাশের বুকে গিয়ে বিঁধল : এ প্রশ্নটা আরও ভয়ঙ্কর। গন্ডগোল কি শুধু কলকাতা শহরেই। সারা দেশটাই তো জ্বলছে। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি কোথাও আছে?

অবিনাশ এ কথাটা যে একেবারে ভাবেননি তা নয়। তবু তিনি পিতা বলেই ছেলের প্রতি দায়িত্ব কিংবা মমতাবশত বর্তমানকে এড়াবার অক্ষম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অবিনাশ চালসে গলায় বললেন, 'যদ্দুব জানি মা, বালুরঘাট এখনও ভালোই আছে।

তারপরের পর্বটুকু সংক্ষিপ্ত। তপু একবার ঘুমন্ত নন্তুর মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে এল। তারপর দাক্ষায়ণী আর শেফালিকে প্রণাম করল। উমা ছলছল হেসে বলল, 'আমায় করলি না তপু?' স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভেঙচি কেটে তপু দিদির কথার জবাব দিল।

সদর দরজা অবধি উমা এগিয়ে এসেছিল। গলির নিকট অন্ধকারে নেমে তপু শেষবারের মতো বলল, 'দিদি, চলি রে।'

দাক্ষায়ণী নিজের ঘরে চলে গেছেন। আলো না জ্বেলেই খাটে উঠে গেলেন। শেফালি সামনের ঘরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। একটা নিশ্চল পাথরের মূর্তি যেন। পাশের ঘরে নন্তু ঘুমের ভেতর কঁকিয়ে উঠছে। শেফালি জানে, আরও ছ-সাতটা বছর নন্তুকে নিয়ে তার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। উমা সদর দরজার চৌকাঠে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে গলির অন্ধকাব ছায়ামূর্তি দুটোকে গিলে ফেললে উমা একবার আকাশের দিকে মুখ তুলল। শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার রাত। বৃষ্টি শেষ হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলেও একটা তারাও চোখে পড়ে না। শুধু, হঠাৎ একবার দেখা গেল, আকাশের গভীর থেকে, একটা হলুদ রঙের অশুভ উল্কা চারপাশে আলো ছিটিতে ছিটিতে তীরের বেগে খানিকটা নেমে এসে মাঝপথে মিলিয়ে গেল। এতক্ষণে শেফালি, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, নীরবে একটানা কাঁদবার সুযোগ পাচ্ছে।

আর ও দিকের ঘরে, খাটের উপর দু হাত প্রসারিত করে দাক্ষায়ণী বালিশ কিংবা অন্য কিছু একটা কেবলই খুঁজে যাচ্ছেন। আর থেকে থেকে বলে উঠছেন, 'দেশে কি আর মানুষ নাই রে। সব কি মরে ভূত হয়ে গেল! □

পলাতক ও অনুসরণকারী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

—তুমি?

রবি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ। চকিতে একবার পেছন দিকে তাকাল। এক পা এগিয়ে এসে বলল, পিসেমশাই বাড়িতে আছেন? অশোকদা আছেন?

জয়ন্তী দু দিকে মাথা নেড়ে জানাল, ওঁরা নেই।

—পিসিমা আছেন তো?

—হ্যাঁ।

জয়ন্তী রবির সর্বাঙ্গে চোখ বোলাল। তারপর বলল, তোমার পায়ে এত কাদা। উঠোনের ওই কলে পা ধুয়ে নাও ভাল করে।

জয়ন্তী নিজেই কলটা খুলে দিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, এতদিন কোথায় ছিলে?

—বৌদি, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার আছে? মুড়িটুড়ি হলেই চলবে।

—ওপরে এসো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সিঁড়ির মুখেই পিসিমা। চোখে ভাল দেখতে পান না। —কে এসেছে বৌমা?

—আমাদেব রবি।

আবছা দৃষ্টিময় দুটি চোখ রবির দিকে। একটি শিশু এখন যৌবন পেয়েছে. তবু শিশুটিকে দেখে ওই চোখ।

— আয় দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

—সেজপিসি, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

প্রৌঢ়ার পা দুখানি প্রণাম নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ক্ষুধার্তের কি ও সব মনে থাকে? সে জয়ন্তীর দিকে তাকিযে বলল, একটু তাড়াতাড়ি—

পিসি জিজ্ঞেস করলেন, এক্ষুনি চলে যাবি নাকি? আজ থাকবি না?

—অশোকদা আসুক। অশোকদার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

—বড়োদা কেমন আছে এখন?

—একই রকম।

—আর তোর মা? অনেকদিন চিঠি পাইনি।

রবি রেগে গিয়ে কড়া গলায় বলল, 'বলছি না আমার খিদে পেয়েছে? খাবার-টাবার কিছু দেবে কি না বলো, নাকি শুধু জেরাই করবে?

—ছেলের মেজাজ কি। কদিন ধরে খাসনি?

একবাটি মুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজ, লঙ্কা, চানাচুর মিশিয়ে মোটামুটি সুখাদ্যে পরিণত করে নিয়ে এল জয়ন্তী। রবির হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এখন এটা খাও। লুচি ভাজছি এক্ষুনি—'

—এতেই হবে। লুচিটুচি ভাজতে হবে না।

—চায়ের জল বসাই?

—বসাও।

—এই এক মাসেই তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। নিজের ওপরেও কি একটু মায়াদয়া নেই?

—অশোকদা দিন দিন মোটা হচ্ছে। তুমি তোমার স্বামীর শরীরের যত্ন নিতে পারো না?

—চোখ দুটো তো একেবারে বসে গেছে। ক রাত্তির ঘুমোওনি।

—যাও, তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসাও।

রবি মুড়ি চিবতে চিবতে চলে এল জানলার কাছে। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। চোখ সরু করে চেয়ে রইল বাইরে। একটুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল তিনজন লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছে, নিজেদের মধ্যে গল্পে মত্ত। এ বাড়ির কাছাকাছি এসে তারা একসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর যেন একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা এগিয়ে আসতে লাগল। এই বাড়ির দিকে।

রবি হাতের অর্ধসমাপ্ত মুড়ির বাটিটা ঠক করে নামিয়ে রাখল নীচে। দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়িব কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে নেমে এল নীচে, বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বেরিয়েই সে দৌড়তে লাগল।

সেই তিনজন লোক এ বাড়ি পেরিয়ে এসে এক পলক দেখতে পেল অপস্রিয়মাণ রবির চেহারা। তাবা ব্যস্ত হল না, কোনও রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না।

এক নং অনুসরণকারী বলল, 'এবারেও চলে গেল।'

দু নং অনুসরণকারী বলল, 'ঠিক আছে।'

তিন নং অনুসরণকারী পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চোখের সামনে রেখে বলল, 'এবার কোথায়, দমদম না শ্রীরামপুর?'

১ নং বলল, 'দমদম।'

২ নং বলল, 'তা হলে এখানকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।'

৩ নং কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'শীতটা বেশ জমিছে পড়েছে আজ। মোড়ের দোকানে দেখে গরম চপ ভাজছে।'

১ নং তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা বোমা বার করে ছুড়ে মারল বাড়িটার দরজার ওপরে।

২ নং বেশ সন্তুষ্টভাবে বলল, 'বাঃ, আওয়াজটা বেশ।'

৩ নং বলল, 'তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই। চল্ কয়েকটা চপ খাওয়া যাক।'

রবি একটা বাড়িব সামনে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গলায় ডাকল, 'চন্দন, চন্দন।'

কেউ সাড়া দিল না। রাত প্রায় সাড়ে নটা। মফস্‌সল পাড়া নিঝুম। মাঝে মাঝে শোনা যায সাইকেল রিকশার শব্দ, অনাবশ্যক কুকুরেব ডাক।

ববি এবার জোরে ডাকল, 'চন্দন—'

দোতলার বারান্দা থেকে একটি অল্পবয়েসি মেয়ে শরীর ঝুঁকিয়ে বলল, 'কে?'

—চন্দন আছে?

—দাদার জ্বর।

—বিছানা থেকে উঠতে পারবে না?

—ঘুমচ্ছে।

—একবার দরজাটা খুলে দাও।

—আপনার নাম কী?

—দরজাটা আগে খুলে দাও।

রবি ঝট করে পিছনে ঘুরে দাঁড়াল। দুটো সাইকেল রিকশা তখন বড়ো রাস্তায় সদ্য থেমেছে। দরজা খোলার আর অপেক্ষা করতে পারল না রবি, দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেই তিনজন এসে দাঁড়াল বাড়িটার সামনে। ১ নং বলল, 'ভেতরে ঢোকেনি আমি দেখেছি।'

১ নং কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। সে ধাক্কা মারবার আগেই দরজা খুলে গেল। একটি চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়ে সদ্য শাড়ি পরা ধরেছে, এখনও ভাল করে শেখেনি।

২ নং শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চন্দনের সত্যি জ্বর হয়েছে?' মেয়েটি বলল, 'আজ একশো চার উঠেছিল। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

—রবিবাবুর কাছ থেকে, তোমার দাদাকে একটু দেখে আসব?

—এখন তো ঘুমচ্ছে।

—আচ্ছা থাক।

—কিছু বলতে হবে?

—বলে দিও রবিবাবুর খোঁজ করতে তিনজন লোক এসেছিল। তা হলেই বুঝতে পারবে।

২ নং দরজার কাছ থেকে সরে আসার পর ৩ নং জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি আর ওটার দরকার আছে?'

১ নং বলল, 'আমার তো মনে হয়—'

৩ নং বলল, 'আমারও ছোটো ভাইটার জ্বর। আমিও মনে হচ্ছে জ্বরে পড়ব এবার।'

২ নং তার কপালে হাত দিয়ে বলল, 'কই, টেম্পারেচার নেই তো।'

—ভেতরে ভেতরে টের পাচ্ছি। আঃ, যদি এখন একটু লেপের তলায় শোওয়া যেত।

১ নং বলল, 'এখনকার কাজটা সেরে ফেলা যাক। দেরি করে লাভ নেই।'

৩ নং বলল, 'কদিন ধরে এক ফোঁটা ঘুম নেই। আর শীতও পড়েছে তেমনি। ভগবানের একটু মায়াদয়াও নেই।'

২ নং বলল, 'হারামির বাচ্চাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।'

১ নং থলে থেকে বার করে আর একটা বোমা ছুড়ল বাড়ির দরজায়। নিস্তব্ধ নিশীথ কেঁপে উঠল সেই শব্দে। কুকুরগুলো তারস্বরে ডেকে উঠল।

রবি সারারাত্রি গঙ্গার ঘাটে শ্মশানে গিয়ে বসে ছিল। মাঝে মাঝে ঘুমের ঢুলুনি আসতেই সে উঠে একটু পায়চারি করে নিচ্ছিল, কখনও দাঁড়াচ্ছিল চিতার ধারে। সারারাত ধরেই চারটে চিতা জ্বলছে, লোকজনের আনাগোনার বিরাম নেই, কারও তাকে কোনও প্রশ্ন নেই। চিতার ধোঁয়ায় সর্বক্ষণ তার চোখ ছলছলে, অনায়াসেই তাকে শ্মশানযাত্রীদের অন্যতম মনে করা যায়। বহুদিন কারও মৃত্যুতে তার চোখ দিয়ে জল পড়েনি। বিশেষত শ্মশানে এলে মনে হয়, মৃত্যু নিছক একটা নির্লিপ্ততার ব্যাপার—এর কোনও ভাল বা মন্দ দিক নেই। রবি তার গেঞ্জিহীন বুকে হাত রাখে। হঠাৎ তার নিজেকে আদর করতে ইচ্ছে হয়। নিজের বুকটা অন্যের বুক মনে করে সে হাত বুলোয়।

ভোর হওয়ার পর স্নানের পুণ্য অর্জনকারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হাওড়া স্টেশনে। শ্রীরামপুরের ট্রেন ধরে।

সুশান্ত তখন বাজারের থলে হাতে বেরুচ্ছিল, রবি তাকে বলল, 'আমি আজ এখানে থাকব।'

সুশান্ত ইতস্তত করে বলল, 'দিল্লি থেকে আমার বাবা আসছেন এখানে।'

রবি বলল, 'আজকের দিনটা অন্তত থাকতেই হবে আমাকে।'

—খোকন আছে গোঁসাইপাড়ায়। ওদের কাছে খবর পাঠাব?

—না, কোনও দরকার নেই।

সারাদিনটা রবি পড়ে পড়ে ঘুমল। অনেক দিনের ঘুম পাওনা ছিল তার। মাঝখানে উঠে একবার শুধু স্নান করে খেয়ে নিল। স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে, খেতে বেশি সময় লাগল না।

তার শার্ট আর প্যান্ট এতদূর অপরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে স্নান করে উঠে ওই পোশাক আর পরা যায়

না। সুতরাং তাকে পরে নিতে হল সুশান্তর ধুতি ও পাঞ্জাবি। এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে। সে বলল, 'অন্যরকম পোশাক পরার মতন আমি যদি অন্য একটা মানুষ হয়ে যেতে পারতাম।' এই বলেই সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা জাহাজের স্বপ্ন দেখল।

ঘুম ভেঙে উঠে রবি দেখল বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্ধে এখন গাঢ়। সে আশ্রয় পেয়েছে ছাদের একটা ছোটো ঘরে, চটপট উঠে ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল চতুর্দিক। কেউ নেই।

তখন সুশান্তর স্ত্রী রূপা তার জন্য চা নিয়ে এসেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে রবি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ওই জাতীয় কিছু আছে?'

—না তো। আনিয়ে দেব?

—থাক। সন্ধের পর রোজই একধরনের মাথার যন্ত্রণা, আবার কমেও যায় আপনা-আপনি। সুশান্ত ফেরেনি অফিস থেকে?

—আর একটু বাদেই ফিরবে।

—আপনি এখন নীচে যান। সুশান্ত এলে পাঠিয়ে দেবেন।

—আপনি এখন কিছু খাবেন?

—আমাকে সাধাসাধি করে কেউ কখনও খাওয়ায় না। খিদে পেলে আমি চাইব। বাড়িতে মুগের ডাল আছে? এ বেলা রাঁধতে পারবেন? বহুদিন খাইনি।

—আপনার বাড়িতে—

—আপনি নীচে যান। আমি একটু একা থাকতে চাই।

ঘরের আলো না জ্বালিয়ে রবি গুম হয়ে বসে রইল দেওয়ালের দিকে। একবারও দৃষ্টি ফেবাল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে একটু নড়ে উঠে দু হাতে চেপে ধরল কপালের দু পাশের রগ।

সুশান্ত এসে বলল, 'কী রে, আলো জ্বালিসনি যে?'

রবি বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। ছেলেবেলায আমি একটা কুকুব পুষেছিলাম—তার ডাক ছিল ঠিক এইরকম। অবিকল এইরকম।'

—সে কুকুরটা এখন কোথায়?

—তখন আমরা শিবসাগরে থাকতাম। কুকুরটা ছিল আমার সব সময়ের সঙ্গী, খুব বাধ্য ছিল আমার। হঠাৎ কি হল, সেটা খুব অবাধ্য আর রাগি হয়ে গেল। সবাইকে ভয় দেখায়। মা-বাবা বললেন, কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই মানতে চাইনি—কিন্তু ওঁরা কুকুরটাকে আর বাড়িতে রাখতে সাহস করলেন না। একদিন ভুলিয়ে-ভালিয়ে নৌকায় চাপিয়ে নদীর একটা চরায় রেখে আসা হল। সেই চরটা মাঝে মাঝে জলে ডুবে যায়। সেই থেকে কোনও নির্জন জায়গায় কোনও কুকুরের ডাক শুনলেই—

—তুই এখান থেকে কোথায় যাবি?

—জানি না।

—এখানে থাকতে পারিস দু-একদিন। এই ঘরটা তো কাজেই লাগে না।

রবি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুশান্তর দিকে। হঠাৎ সদর্পে বলল, 'মাথার ওপর ছাদ না থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। ঘরের কথা চিন্তা করে আমি রাস্তায় বেরইনি—

সুশান্তও কড়া গলায় বলল, 'এবার আমাদের রাস্তা বদলাতে হবে। তুই যে পথে যাচ্ছিস, সেটাকে রাস্তা বলে না, এঁদো গলি।

—তোর বাড়িতে গ্রামোফোন আছে নিশ্চয়ই?

—হঠাৎ!

—সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামোফোন—এ না হলে মানায় না।

—এর নাম্ব বোকা অহঙ্কার।

রূপা এসে সুশান্তকে বলল, তোমাকে তিনজন লোক ডাকতে এসেছেন।

রবি তড়াক করে চলে গেল ছাদের পাঁচিলের কাছে। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে ফিরে এসে শান্তভাবে বলল, তোমাদের বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরুবার কোনও রাস্তা আছে?

সুশান্ত রবির হাত চেপে ধরে বলল, 'তুই চলে যাবি?'

—একদম সময় নেই।

—তোকে যেতে হবে না। আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছি। অত ভয়ের কী আছে?

—ভয় না, ঘৃণা। একদম সময় নেই।

রূপা বলল, 'আপনি এরকম করছেন কেন? পাশের বাড়িতে টেলিফোন আছে, আমি থানায় খবর দিচ্ছি।'

রবি রূপার দিকে একবারও তাকাল না পর্যন্ত। সে ছাদের উলটো দিকের পাঁচিল টপকে পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল। একটু দূরে প্রবল ট্রেনের শব্দ।

১ নং অনুসরণকারী বলল, এ দিকে রাস্তার বাড়ির নম্বরগুলো একেবারে উলটোপালটা। সাঁইত্রিশের পর বাহান্ন—বিচ্ছিরি ব্যাপার।

২ নং অনুসরণকারী বলল, 'কোনও কোনও বাড়িতে নম্বর প্লেটই নেই।'

৩ নং বলল, 'হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেল মাইরি।'

১ নং বলল, 'গত বছর এই সময় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। তাতে থ্রিল বেশি।'

২ নং বলল, 'বর্ধন যে দিন মারা যায়—'

৩ নং বলল, 'আমার মামাবাড়িতে একটা পেয়ারাগাছ আছে—ভেতরটা লাল রঙের। ছেলেবেলায় সেই পেয়ারাগাছ থেকে একবার পড়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকে আমার একটা পা কমজোরি হয়ে গেছে।

২ নং বলল, 'পেয়ারার ভেতরটা লাল?'

১ নং বলল, 'দেওঘরেও ওরকম পেয়ারা পাওয়া যায়। আমি অনেকদিন আগে গিয়েছিলাম দাদা-বৌদির সঙ্গে।

২ নং বলল, 'এখানকার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক।'

৩ নং বলল, 'তারপর বাড়ি গিয়ে ভাল করে ঘুমব। বাড়ির গরম গরম ভাত, মুসুরির ডাল আর আলুসেদ্ধ।'

১ নং এগিয়ে গেল দরজার কাছে সুশান্তর সঙ্গে কথা বলতে। অন্য দুজন ছড়িয়ে গেল বাড়ির দু পাশে।

রবি ছুটতে ছুটতে একজন অচেনা লোককে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'স্টেশনটা কোনদিকে?'

লোকটি বলল, 'এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কেন? ওই তো, ওইদিকে রাস্তা।'

—মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাবে না?

—যাওয়া যেতে পারে, আপনি রাস্তা চিনতে পারবেন না।

রবি এক ধমক দিয়ে বলল, 'ঠিক চিনতে পারব। কোনদিকটা আপনি দেখিয়ে দিন না।'

ধমক খেয়ে দমে না গিয়ে লোকটি বলল, 'আপনি যখন অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়েই যেতে চান—তখন নিজেই রাস্তা খুঁজে নিন।'

রবি লোকটির দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর কথা না বলে দৌড়তে লাগল। সে মেপে মেপে নিশ্বাস নিচ্ছে, তাকে সহজে ক্লান্ত হলে চলবে না। সে এখন একা—কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ায় বহু মানুষের নিশ্বাস মিশে থাকে। এমনকি যাঁরা বেঁচে নেই—তাদেরও নিশ্বাস বাতাস থেকে হারিয়ে যায় না।

পেছন দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে রবি।

শীতের রাত্তিরেও তার শরীরে ঘাম। হঠাৎ সে সামনের একটা দেওয়ালে ধাক্কা খেল।

দেওয়াল নয়, তিনজন মানুষ। নিপুণ হাতে তারা রবিকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চল করে দিল। রবিও ছটফট করল না। দু হাতে মুখ চাপা দিল শুধু।

১ নং রবির মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'কিরে, রবি, চিনতে পারিস?'

২ নং বলল, 'বর্ধনকে তোরা তিনজন—'

৩ নং বলল, 'শালা অনেক ভুগিয়েছিস—'

রবি কোনও কথা বলল না। আকস্মিকভাবে তার মনে পড়ল, তার ছোটো বোনকে ছবি আঁকার এক বাক্স রং পেন্সিল পাঠাবার কথা ছিল, দু-তিনবার চিঠি লিখেছে—

ছুরি চালাবার কাজটা সমাধা হল নিঃশব্দে। মাটিতে পেড়ে ফেলে রবির বুক পেট ফালা ফালা করে দিয়েও ওরা তিনজন রবির শেষ নিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে চাইল। পৃথিবীর বাতাস ব্যবহার রবির ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে।

এই সময় দূরে একটা কলরব শোনা গেল। আট-দশজন লোক এই দিকেই ছুটে আসছে।

এই তিনজন সেই দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে তাকাল। ওরা কি তাদের অভিনন্দন জানাতে আসছে, না ধরতে? উভয় ক্ষেত্রেই চিৎকারটা প্রায়ই একই রকম হয়। এই তিনজন কোনও ঝুঁকি নিল না। তৎক্ষণাৎ এরা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল, পালাবার সুবিধার জন্য তিনজন তিন দিকে।

অবিলম্বে সেই দলটি এখানে এসে পৌঁছল। ভূতপূর্ব রবির দিকে এক পলক তাকাল শুধু, তারপর শোনা গেল একটা প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ।

এই দলে ছিল নজন ব্যক্তি। এরা তিনজন করে তিনটে দলে ভাগ হয়ে ছুটতে শুরু করল তিন দিকে।

একটু আগে যে ছিল এক নং অনুসরণকারী, এখন সে এক নং পলাতক—তাকে যারা তাড়া করে আসছে তাদের মধ্যে এক নং অনুসরণকারী তিন নং অনুসরণকারীকে বলল, 'যাবে কোথায়? পকেট থেকে কাগজটা বার ক'র। দেখে নে।' □

পরিচয়হারা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

—রাত কত হল?

—বলা মুশকিল। তবে অনেক রাত।

কলকাতা শহরতলির আধা গ্রাম্য পাড়ার নির্জন গলি। ক্বচিৎ কখনও এক-আধ জন যাচ্ছে কি আসছে। দূর থেকে হঠাৎ ভেসে আসে কুকুরের ডাক। গলির ধারে টিনের চাল দেওয়া ছোটো বাড়ি। মুলী বাঁশের দেওয়ালের উপর বালি সিমেন্টের আস্তর খসে পড়তে শুরু করেছে। জানলায় জংধরা লোহার সরু সরু গরাদের পেছনে মায়ের মুখখানি রাস্তার অল্প আলোতে অস্পষ্ট।

গলির থেকে মুখ ঘরের ভেতর সরিয়ে মা দেখলেন, বাচ্চু ও দিকের জানলার নীচে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মা আবার জানলার বাইরে তাকালেন। ঝপর ঝপর আওয়াজ করে একটা খালি রিকশা এগিয়ে এসে সামনে দিয়ে চলে গেল—আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে। আবার বেশি রাতের নিঃশব্দতা ভারী হয়ে উঠতে লাগল। কোথাও দূরে হঠাৎ একটা বোমা ফাটার শব্দ। তারপরে সব চুপচাপ্। মা উঠে আলো জ্বাললেন। ঘড়িতে সওয়া বারোটা। কখনও তো এত রাত করে না ছেলেটা! মা ডাকলেন, 'বাচ্চু, বাচ্চু ও বাচ্চু।'

বাচ্চু ঘুমের ঘোরে সাড়া দিল, 'উঁ?'

—বাবলুটা এখনও এল না!

—এখনও এল না—আসবে, একটু পরে। বাচ্চু পাশ ফিরল।

এত রাত তো কোনওদিন করে না। মায়ের গলায় উদ্বেগ। 'যা দিনকাল।'

আজ রাত করছে। ওরকম হয়ে যায় এক এক বার।

জানলার নীচে বাবলুর বিছানা থেকে নেমে চাদরটা আবার টেনেটুনে পাতলেন। বড্ড ক্লান্ত হয়ে ফিরবে ছেলেটা। এই তো বাড়ির হাল। যেটুকু শোওয়ার আরাম দিতে পারেন। আর বাচ্চুটা ঘুমোচ্ছে কেমন বাচ্চা ছেলের মতো মুখ করে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

বাইরের দরজাটা খুলে ফেললেন প্রায় নিঃশব্দে। একটু দ্বিধা করে বেরিয়ে এলেন, দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন গলির মাঝখানে। এ দিক ও দিক সব অন্ধকার শুনশান। সামনে তাঁরই বাড়ি তাঁকে গিলবে বলে দরজা হাঁ করে অপেক্ষা করছে।

'ঠাকুর' বলে চোখ বুজে হাত জড়ো করে তাকালেন উপরের দিকে। চোখ খুলে দেখলেন তারাভরা ঈশ্বরের আকাশ মাথার ওপরে। হঠাৎ ছাঁত করে উঠল মায়ের মন। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকে আবার আলোটা জ্বাললেন। ধাক্কা দিয়ে বাচ্চুকে তুললেন ঘুম থেকে। 'এখনও এলো না! কী করি বল তো!'

বাচ্চুর ঘুম ভাঙা বিরক্তি। 'কী আবার করবে? যাও, শুয়ে পড়ো। কাল সকালে দেখা যাবে।'

—ছেলে সারারাত বাইরে পড়ে থাকবে। আমি ঘুমোব? একবার খোঁজ নিবি না?

—কোথায় যাব খুঁজতে? বাচ্চু বিরক্তিতে উঠে বসল। 'দাদা কি বাচ্চা ছেলে? পথ হারিয়ে ফেলবে? পথহারা খোকাকে পথে পথে খুঁজব নাকি?' বাচ্চু আবার শুয়ে পড়ল। মা চুপ করে বসে থাকলেন পাথরের মতো। বাচ্চু হঠাৎ উঠল আবার। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। কোথায় যাব বলো?'

—একবার হলে গিয়ে দ্যাখ না।

—হ্যাঁ, তোমার জন্যে এখনও সিনেমা হল খোলা আছে আর তোমার ছেলে টর্চ জ্বেলে পাবলিককে সিট দেখাচ্ছে। তবু বের হল বাচ্চু।

হল অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। সিনেমা হলের সামনে শিবুদার পানের দোকান। দোকান ধুয়েমুছে শিবুদা সবে তালা লাগাচ্ছিল। পেছন ফিরেই আচমকা অন্ধকারে কাকে দেখে চমকে উঠল। 'কে?'

—আমি বাচ্চু, বাবলু বোসের ভাই বাচ্চু—

—কী ব্যাপার? এত রাত্তিরে?

—দাদা এখনও বাড়ি ফেরেনি।

সে কী! হল তো অনেকক্ষণ—দাঁড়া, দাঁড়া—ওদের কী যেন কথা শুনছিলাম! না বলে কয়ে বাবলু আসেনি বলে ম্যানেজার রাগারাগি করছিল। পাশের বন্ধ দোকানের গায়ে রাখা সাইকেলটা টেনে নিয়ে শিবুদা বলল, 'বাবলু তো আজ হলে আসেনি দেখছি।' সাইকেলে উঠতে গিয়ে থামল আবার। 'বাড়ি ফিরবি কী করে?'

—যেমন করে এলাম—হেঁটে।

—আয়, পৌঁছে দিচ্ছি।

—আপনার দেরি হয়ে যাবে—

—ওস্তাদি করতে হবে না। আয়।

বাচ্চু গিয়ে বসল শিবুদার সাইকেল রডে।

শিবুদা বলল, 'একবার থানায় গেলে হয় না?'

থানায়?

কেউ হারিয়ে গেলে থানাতেই তো খবর করতে হয়। চল।

বাচ্চু বুঝল, পাগলা শিবুদার কাছে আপত্তি করে লাভ নেই।

পথের দু পাশে ঘুমন্ত বাড়ি। থানা জেগে আছে। ঘরের এক কোণে দুটো বাচ্চা ছেলে মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একজন লোক একটা পুরনো মিলিটারি কোট পরে কেটলি থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে মাটির ভাঁড়ে ভাঁড়ে। একজন ইন্‌সপেক্টর ফোনে কথা বলছেন। আর একজন ইন্‌সপেক্টর টেবিলের পেছনে বসে থাকা খাতা লিখছেন। টেবিলের সামনে শিবুদা আর বাচ্চু দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ।

চায়ের ভাঁড় তুলে নিয়ে খাতা লেখক ইন্‌সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?'

শিবুদা বলল, 'স্যার, আমাদের ছেলে বাড়ি ফেরেনি।'

—কত বড়ো ছেলে?

—তা—বড়ো হবে—শিবুদা জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল বাচ্চুর দিকে।

—আপনার ছেলে? ইন্‌সপেক্টর আবার প্রশ্ন করলেন।

—না, এর দাদা। বলে বাচ্চুর দিকে দেখাল শিবুদা।

এতক্ষণে ইন্‌সপেক্টর সোজা হয়ে বসে সরাসরি তাকালেন। 'তা হলে আপনি কে?'

বাচ্চু বলল, 'উনি আমাদের দাদার মতোই।'

শিবুদা বলল, 'ওই রূপশ্রী সিনেমা হলে আমার একটা পান-সিগারেটের দোকান আছে। আর ওর দাদা বাবলু বোস রূপশ্রীতে আশার-এর চাকরি করে। আজ হলে আসেনি, বাড়িও ফেরেনি।'

বদ সঙ্গটঙ্গ করে।

না, স্যার, ও খুব ভালো ছেলে—একটু বেশিই ভালো ছেলে, বলে বাচ্চুর দিকে তাকাল শিবুদা।

—দাদা চাকরি করে সংসার চালায়, আবার প্রাইভেটে কলেজেও পড়ে।

শিবুদা সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার। তাই সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। কলেজ করতে গিয়ে এক-একটা শো কামাই করলে সবাই সামলে দেয়।'

—তবে যে বললে প্রাইভেটে পড়ে।

বাচ্চু বলল, 'প্রাইভেটেই পড়ে, খাতায় নাম নেই, তবু কলেজের ছেলেদের সঙ্গে মিশেটিশে ক্লাসও করে।'

শিবুদা আবার বলল, 'তা হলেই বুঝুন স্যার, কেমন ছেলে। বাবা স্কুলমাস্টার ছিলেন।'

রাজনীতি করে?

শিবুদা বলল, 'না স্যার, ও রাজনীতি করার ছেলেই না।'

তা হলে নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। ঠিক ফিরে আসবে। খালি ভাঁড় ঘরের কোণে ফেলে ইন্‌সপেক্টর আবার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

শিবুদা টেবিলের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল,'ফিরবে তো?'

ফেরা উচিত। তবে বলা যায় না ছেলেছোকরার ব্যাপার, আর যা খুনখারাপির রাজনীতি—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে থানায় আসবেন।

তা হলে চলো বলে শিবুদা বাচ্চুকে নিয়ে বের হল।

সকাল।

চোখ খুলে বাচ্চু দেখল, মা দাদার বিছানায় বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। তার মানে—দাদা এখনও ফেরেনি। আশ্চর্য! কোনওরকম খোঁজখবর না দিয়ে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ছেলে তো তার দাদা না। নেহাতই ভিতু আর ভালোমানুষ সে।

বাচ্চু ডাকল, 'মা।'

মা ফিরে তাকালেন বাচ্চুর দিকে। চাউনিতে প্রাণের আভাস নেই।

—শোওনি?

—শুয়েছিলাম, নিষ্প্রাণ গলায় মায়ের উত্তর। অবশভাবে বিছানা থেকে নেমে বললেন, 'চা দিচ্ছি, খেয়ে আর একবার খুঁজে আয়।'

কোথায় আর খুঁজবে। তবু বাচ্চু পাশের বাড়ির রতনদার কাছে গিয়ে সাইকেলটা চাইল।

রতন বলল, 'দেরি করিস না, আমাকে আবার বেরতে হবে।'

—না, না, দেরি হবে না। বিকাশদার কাছে এই যাব আর আসব।

বিকাশ বাজারে যাওয়ার জন্যে ব্যাগ-ট্যাগ গোছাচ্ছিল। বাচ্চুকে দেখে অবাক। 'কী রে, বাচ্চু? এত ভোরে?'

—দাদা কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি।

—কী বলছিস? বাড়ি ফেরেনি?

—রূপশ্রীতেও যায়নি।

—অসম্ভব! ও তো কাল সকালেও আমার কাছে এসেছিল।

কখন?

এই সাড়ে ন'টা নাগাদ হবে।

তারপর।

আমার একটা কাজ ছিল। বললাম, আজ কলেজ যাব না, তুই যা, ভালো করে নোট নিস, আমি পরে লিখে নেব।

—তারপর।

—তারপর ও চলে গেল। দাঁড়া, চল তো একবার অশোকের বাড়িটা ঘুরে আসি। বাজারের ব্যাগ নামিয়ে রেখে বিকাশদা বলল, 'আমাকে কিন্তু আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।'

বিকাশদাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে বাচ্চু এল অশোকের বাড়ি।

সবে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে অশোকদা বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়ছে। সুনীল দত্ত তখন মাইসোর অ্যানেক্‌সেশন পড়াচ্ছিল, টিপু সুলতান, বাইরে তখন কোথায় একটা দুম করে বোমা-ফাটে।'

বিকাশদা বলল, 'ও তো সারাক্ষণই ফাটছে।'

অশোক বলল, 'না, এটা কলেজের মধ্যেই ফাটে। আর সুনীল দত্তকে তো জানিস। ক্লাসের দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে ভয়ে কাঠ। বাইরে বেশ চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল।'

—বাবলু তখন কোথায়? জিজ্ঞেস করল বিকাশদা।

—ক্লাসেই ছিল। একটু পরে ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে গেল। ব্যস।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, 'ব্যস মানে।'

—তারপর আর জানি না।

বিকাশ বলল, 'মানে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল, এটাই শেষ দেখা?'

—তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

বাচ্চু আবার জিজ্ঞেস করল, 'দাদা বেরিয়ে গেল, প্রফেসর কিছু বললেন না?'

অশোক বলল, 'কী বলবেন? ভিতুর ডিম। খানিক পরে প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠালেন এস ডি-কে। টাকেব ঘাম মুছতে মুছতে ফিরে এসে বললেন, রেজিস্টাবে নাম নেই যতসব বাইরের ছেলে ক্লাসে ঢুকে ঝামেলা পাকায়! তারপর ওঁর খাতা খুলে গড়গড় করে নোট ডিক্‌টেট শুরু করলেন।'

বাইরের ছেলে ক্লাসে ঢোকে মানে? বিকাশ প্রশ্ন করল।

অশোক লাফিয়ে উঠল। 'ঠিক তো! বাবলুর কথাই হবে তা হলে।'

তা হলে? বাচ্চু তাকাল বিকাশের দিকে।

আমাকে বাজার যেতে হবে।

আমি যে চিনি না এস ডি-কে। বাচ্চুর গলায অনুনয়।

সুনীল দত্ত কলেজ যাওয়ার আগে নোট খাতাগুলো গোছাচ্ছিলেন ব্যাগে। এমন সময় তাঁর দরজায় হাজির হল বিকাশ আর বাচ্চু। ওদের দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? কী চাই তোমাদের?'

বিকাশ বলল, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, স্যার।'

—এখন না, কলেজ যাচ্ছি, পবে এসো,' বলে সুনীল দত্ত পেছন ফিবলেন।

বাচ্চু বলল, 'কথাটা জরুরি।' গলায় চাপা কাঠিন্য।

—কী করবে তোমরা? এস ডি-র গলায় চাপা ভয়।

—কাল কলেজে একটা বোমা পড়েছিল। মনে পড়ছে? বাচ্চু প্রশ্ন করল সোজাসুজি।

—আমি তার কিছু জানি না। আমি তখন ক্লাসে ছিলাম।

—হ্যাঁ, জানি। বোমা পড়ার পর আপনার ক্লাস থেকে একজন দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

বিকাশের মুখের দিকে এস ডি তাকালেন। তাঁর টাকে এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম জমছে। ঢোক গিলে এস ডি বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে এ সব জিজ্ঞেস করা কেন?'

—তারপর প্রিন্সিপ্যালের ঘরে আপনার ডাক পড়ে?

—হ্যা। পুলিশ একটা ছেলেকে ধরেছিল। তাকে আইডেন্টিফাই করার জন্যে প্রিন্সিপ্যাল আমাকে ডেকেছিলেন। বোমা পড়াব সময় ও নাকি আমার ক্লাসে ছিল।

বিকাশ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস কবল, 'বিজন ছিল আপনার ক্লাসে?'

ভয়ে ভয়ে এস ডি মাথা হেলিয়ে বললেন, 'ছিল।'

—বললেন প্রিন্সিপ্যালকে সে কথা?

এস ডি চুপ করে থাকলেন।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, 'প্রিন্সিপ্যালকে কী বললেন?'

এ সব কী হচ্ছে? আমাকে কী করতে চাও?

পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বছর এগারো-বারোর একটি ছেলে। ঘরে ঢুকে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

—সত্যি করে বলুন ওর সামনে দাঁড়িয়ে—কী বললেন প্রিন্সিপ্যালকে? বাচ্চু আবার জিজ্ঞেস করল।

—রেজিস্টারে যার নামই নেই, কী করে বলব সে আমার ক্লাসে ছিল? তার ওপর পুলিশের সামনে?

বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশও ছিল নাকি?'

সুনীল দত্ত টাকের ঘামে হাত বুলিয়ে বললেন, 'পুলিশকে তো প্রিন্সিপ্যালই ডেকে এনেছিলেন।'

বাচ্চু বলল, 'ঠিক আছে, বিকাশদা, চলুন একবার প্রিন্সিপ্যালের কাছে।'

বিকাশ বলল, 'আমাকে বাজার যেতে হবে, বাচ্চু।'

বাচ্চু বলল, 'জানি বিকাশদা, কিন্তু আমি কী করে প্রিন্সিপ্যালের কাছে—'

—ঠিক আছে, চল, বলে বিকাশ সাইকেলের রডে চেপে বসল।

প্রিন্সিপ্যালের ঘর। কেউ নেই। টেবিলের ওপারে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাতা খোলা খবরের কাগজ।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিকাশ বলল, 'নমস্কার, স্যার।'

খবরের কাগজ নামিয়ে মুখ তুলে তাকালেন প্রিন্সিপ্যাল। 'কী চাই?' শান্ত গম্ভীর স্বর। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলে পাক ধরেছে।

বিকাশ বলল, 'এর দাদা বিজন বসু আমার বন্ধু। কাল বাড়ি ফেরেনি।'

—আমি তার কী করব?

—ইতিহাসের এস ডি স্যার বললেন, গতকাল কলেজে বোমা ফাটার ব্যাপারে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

—সে কী? উনি যে বললেন, ছেলেটিকে চেনেন না? চুপ করে ভাবলেন। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম তোমার?'

—বিকাশ বাগচি।

—কোন্ ইয়ার?

—থার্ড ইয়ার, স্যার।

—হুঁ। আবার কিছু ভাবলেন। চমশা খুলে রুমালে কাচ মুছে আবার পরলেন। 'আর যাকে ধরেছে, কী নাম তার?'

বাচ্চু বলল, 'বিজন বসু।'

—প্রফেসর দত্ত যে বললেন ওই নামে কোনও ছেলে নেই ক্লাসে!

বাচ্চু বলল, 'এর পেছনে কাহিনী আছে স্যার।'

'কাহিনী? কি রকম কাহিনী?'

বাচ্চু বলল, 'দাদাই চাকরি করে সংসার চালায়। আমাকেও হায়ার সেকেন্ডারি পড়াচ্ছে। দাদার নিজেরও পড়ার খুব ইচ্ছে। অন্তত প্রাইভেটে বি এ-টা পাশ করবার। তাই—' বলে বিকাশের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে আবার বলল, 'বিকাশদার সঙ্গে ব্যবস্থা করে কলেজে ক্লাস করত।'

প্রিন্সিপ্যাল জিজ্ঞাসুভাবে তাকালেন বিকাশের দিকে'

বিকাশ বলল, 'আসলে স্যার প্রফেসর দত্ত বলতে পারেননি খাতায় নাম নেই অথচ ক্লাসে ছিল কিন্তু স্যার যারা ওকে চেনে, সব্বাই বলবে, ও খুব ভালো ছেলে। পড়াশোনার দিকে অসম্ভব ঝোঁক ওর। বাবা মাস্টারমশায় ছিলেন কিনা—গান্ধীনগর স্কুলে।'

'—ও, বলে প্রিন্সিপ্যাল কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, দাড়াও দেখি কী করা যায়।' টেলিফোনের ডায়েল ঘোরাতে লাগলেন। 'হ্যালো, আমি শিবনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ড. অরুণ মুখার্জি বলছি। একবার ও সি-র সঙ্গে কথা বলতে চাই।' একটু থেমে, বোধ হয় ওদিকের কোনও কোনও প্রশ্নের উত্তরে, বললেন, 'গতকাল আপনাদের থানার একজন এস আই একটি ছেলেকে আমার কলেজ থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান—সেই বিষয়ে।'

কলেজ থেকে বেরিয়ে বিকাশ বলল, 'কী হারামি রে বাবা।'

বাচ্চু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

—তোর দাদা। আবার কে? সকাল থেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। মধ্যে থেকে আমাদের বাজারের দফারফা।

—কেন? বাজার করবে না?

পাগল! এই বেলা এগারোটার সময় বাজার যাব বলে ব্যাগ আনতে বাড়ি? বাজার না করলেও খাওয়া নেই, করলেও খাওয়া নেই। যাকে বলে উপোস। চল, থানাটা সেরেই যাই। বাবলুকে নিয়ে তোদের বাড়ি গিয়ে বডি ফেলে দেব।

এতক্ষণে বাচ্চুর মনে পড়ল। 'রতনদাকে বলে এসেছিলাম, এক্ষুনি সাইকেল ফেরত দেব।'

—ফেরত দিচ্ছিস, এই না কত! বিকাশ হাসল।

যা বলেছ! সাইকেলটা বিক্রি করে বম্বে চলে যেতে পারতাম। বাচ্চুও হাসল।

থানার সামনে সব সময়ই কিছু লোক দাঁড়িয়ে থাকে বা ঘোরাফেরা করে। থানার সামনে রাস্তার ওপারে চা-বিস্কুট-পাউরুটির দোকানেও সারাক্ষণই ভিড়। ওদের যে কিসের ধান্দা বোঝা মুশকিল। ওরাও হয়তো কাউকে ছাড়াতে বা কারও খোঁজ করতে এসেছে। শিবুদা বলছিল অনেক বেকার ছেলে নাকি থানায় আসে যায় খবর দিতে-নিতে। হবেও বা।

প্রিন্সিপ্যালের চিঠিটাকে ছাড়পত্র করে বিকাশ আর বাচ্চু ও সি সাহেবের ঘরে পৌঁছল। শিবুদার সঙ্গে গতকাল বাচ্চু ডানদিকের ঘরটাতে এসেছিল, আজ এল বাঁদিকের ঘরে।

ও সি সাহেব চিঠিটা পড়ে টেবিলের ওপর রাখা ঘন্টিটা বাজালেন। একটুক্ষণ পরে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চু আর বিকাশের ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'পাকড়াশিকে ডাকো।'

টেবিলের সামনে চারখানা চেয়ার। দুটো চেয়ারের পিঠ ধরে বাচ্চু ও বিকাশ দাঁড়িয়ে থাকল। ও সি সাহেব নিজের চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা ঠিক জানো, ছেলেটা রাজনীতি-টিতি করত না?'

বিকাশ উত্তর দিল, 'একেবারে কিছু না, স্যার।'

—তোমরা কি রাজনীতি করো?

বিকাশ আবার বলল, 'না, স্যার, কিছু না।'

একালের ছোকরা, কিচ্ছু করো না, এটাও তো সন্দেহজনক।

এবার বাচ্চু বলল, 'ফুটবল খেলি, স্যার।'

ফুটবল! হেসে ফেললেন ও সি সাহেব। 'আর হ্যান্ডবল? হাত থেকে বেরিয়ে গেলেই দুম করে ফাটে—এইরকম সব বল?'

এমনসময় খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন সাব-ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকলেন। বাচ্চু গতরাতে এঁকে টেলিফোনে কথা বলতে দেখেছিল। তা হলে ইনি-ই এস আই পাকড়াশি!

ডেকেছেন স্যার?

হ্যাঁ। চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন ও সি সাহেব। 'আচ্ছা পাকড়াশি, কাল শিবনাথ কলেজে কল্ পেয়ে তুমিই গিয়েছিলে না?'

হ্যাঁ, স্যার।

একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিলে?

হ্যাঁ, স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল বিষয়টির সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে অনুরোধ করে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছেন। ও সি সাহেব চিঠিটা এগিয়ে দিলেন পাকড়াশির দিকে।

পাকড়াশি সেটা না তুলেই বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার।'

—ছেলেটিকে কি কোনও অ্যাকশনের মধ্যে পেয়েছিলে?

—না, স্যার। আমি যখন পৌঁছাই, ও কলেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

—তাতেই ওকে ধরে ফেললে?

—না, স্যার। কলেজে ঢুকে ওকেই প্রথম মিট করি, ও-ই গাইড করে নিয়ে যায় প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। প্রিন্সিপ্যালই ওকে কোয়েশ্চন করে। তখন ও উলটোপালটা সব কথা বলতে থাকে। প্রথমে বলল ওর নাম

প্রকাশ না বিকাশ কী একটা, পরে দেখা গেল আসল নাম বিজন। একবার বলল, এক্সপ্লোশনের সময় কোনও এক প্রফেসরের ক্লাসে ছিল। সেই প্রফেসর এসে উলটো কথা বলল। পরে দেখা গেল, বিজন ও কলেজের ছেলেই না। মোটামুটি বেশ গোলমেলে।

স্ট্রেঞ্জ! এখন প্রিন্সিপ্যাল নিজেই উলটোপালটা লিখছেন। ও সি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করা!'

পাকড়াশি বললেন, 'আর তো কিছু করার নেই। রাত্তিরের এস্কেপ অপারেশনে—'

'আই সি।' ও সি সাহেব টেবল থেকে সিগারেট প্যাকেটটা তুলে নিলেন। প্যাকেটটা আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে ঘোরাতে কিছু একটা ভেবে নিলেন। পাকড়াশির দিকে চোখ তুলে বললেন, 'আচ্ছা, এসো।' পাকড়াশি চলে গেলে সাসেহব প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন।

বিকাশ একবার বাচ্চুর দিকে তাকাল। বাচ্চুকে ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। এখানে বিকাশই দাদা, তারই কথা বলা উচিত। 'আমরা বিজনকে এখনই নিয়ে যেতে চাই।'

ও সি সাহেব জিজ্ঞাসুভাবে তাকালেন বিকাশের মুখে।

বিকাশ আবার বলল, 'অন্তত একবার দেখা করে কথা বলে যাই।'

ও সি সাহেব টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো, এই নাও। কলম আছে?'

বিকাশ তাকাল বাচ্চুর দিকে। আবার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, স্যার।'

—কী রকম স্টুডেন্ট সব! একটা কলম পেনসিলও রাখো না! টেবিল থেকে কলমটা এগিয়ে দিলেন বিকাশের দিকে। বলে চললেন, লেখো, টু দি অফিসর-ইন-চার্জ। ডিয়ার স্যার, আন্ডারস্টান্ডিং ফ্রম ইয়োর পোলিস স্টেশন দ্যাট মাই ফ্রেন্ড—কী নাম ওর?'

—বিজন বসু। কিন্তু ওর দাদা, বলে বিকাশ বাচ্চুকে দেখাল।

—তা হলে তুমিই লেখো।

বিকাশ কাগজ কলম ধরিয়ে দিল বাচ্চুকে।

ও সি সাহেব বললেন, 'মাই ফ্রেন্ডটা কেটে লেখো, দ্যাট মাই এল্‌ডার ব্রাদার বিজন বসু, সন অফ— বাবার নাম লেখো। তারপর অফ দিয়ে বাড়ির ঠিকানাটা লেখো।' খানিকক্ষণ সময় দিয়ে আবার বললেন, 'ওয়াজ অ্যারেস্টেড ফ্রম—কলেজের নাম আর তারিখটা লেখো—আজ হি ফেইল্‌ড্ টু প্রুভ হিজ আইডেনটিটি আফটার এ বম একসপ্লোশন ইন দ্যাট কলেজ প্রেমিস। ফুলস্টপ। ইন দি আর্লি আওয়ার্স অফ দিস ডে, হি, অ্যালংউইথ ফোর আদার্স ট্রায়েড টু রান অ্যাওয়ে—'

বাচ্চু লেখা থামিয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাল ও সি সাহেবের দিকে। 'স্যার?'

—কী হল? লেখো, ট্রায়েড টু রান অ্যাওয়ে ফ্রম দি পোলিস কাস্টোডি হোয়েন,—সিগারেটের ধুঁয়ো আটকে যাওয়াতে ও সি সাহেব হঠাৎ বিষম খেয়ে কাশতে লাগলেন। শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী লিখেছ?'

—স্যার, দাদার পক্ষে এ কাজ সম্ভব না।

—কার পক্ষে কী সম্ভব না সম্ভব জানি না। যা বলেছি, লেখো।

—চোট লাগার ভয়ে দাদা ফুটবল পর্যন্ত খেলত না।

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, বিজন ভীষণ ভিতু ধরনের ছিল।'

ডিসগাস্টিং! ভালো করার চেষ্টা করলেও এরা তর্ক করে! ও সি সাহেব বললেন, 'আমার কথা শুনবে না তো একজন উকিল-মোক্তার ধরে আনো, টাকার শ্রাদ্ধ করো, তারপর দেখা যাবে।'

বাচ্চু খানিকক্ষণ ও সি সাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'না, স্যার, আপনি যা বললেন, লিখে দিচ্ছি।'

তা হলে লেখো—ফ্রম দ্য পোলিস কাস্টোডি হোয়েন হি ওয়াজ শট ডেড। হিজ ডেডবডি মে কাইন্ডলি বি হ্যান্ডেড ওভার টু হিজ ফ্যামিলি ফর পারফর্মিং দ্য লাস্ট রাইটস। □

স্থানীয় সংবাদ

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

থামটার আড়ালে নিজেকে প্রায় গুটিয়ে রেখে তলাকার শান-বাঁধানো চত্বরের মানুষজনের উপব নজ়ব রাখছিল বুন্টন। দাঁড়িয়েছিল মূল মন্দিরের ঢাকা বারান্দায়, তারপরই খোলা বারান্দা। সে ইচ্ছে করলেই খোলা বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে তলাকার শান-বাঁধানো চত্বরে নেমে যেতে পারত। জমানো সিমেন্টের আঙিনার শেষ প্রান্তে ঢেউ খেলানো করোগেটের গড়ানে চালের ভোগঘর। ভোগঘরের সুঘ্রাণে অনেকের মতো তার চোখও জ্বলে জ্বলে উঠছিল, উঠছিল তার অজান্তেই। তলাকার উঠোনে দীর্ঘ মন্দিরের পশ্চিম শিয়রি ছায়া, ছায়া ঘিরে মানুষজনের জটলা। প্রত্যেকের হাতেই গামলা কিংবা থালাবাটি এবং গামছা বা বড়োসড়ো একটি ন্যাকড়া। বুন্টন জানে, গামছা বা ন্যাকড়াগুলো হাতে হাতে কখন ঝোলা হয়ে ওঠে। তার ডান পাশে, মন্দিরের সামনে, বিশাল নাটমন্দির। সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে, কিন্তু থামগুলো শালকাঠের, উপরে টিনের চৌচাল। মেঝেতে দুটো হাঁড়িকাঠ পোঁতা। ছোটোটিতে পাঁঠা বলি হয়, আর বড়োটিতে, বুন্টন শুনেছে, কালীপুজোর রাতে মোষের মুণ্ডু ঘচাং। এই নাটমন্দিরেই বুন্টন তার বাবার লেখা নাটকের অভিনয় হতে দেখেছে। লোকে বলে 'থামকাটা প্লে'। আসলে নাটমন্দিরের মাঝখানকার দুটো থাম কেটে ফেলতে হয়েছিল। স্টেজের ঠিক সামনে পড়ে গিয়েছিল ও-দুটো। অথচ, সব কিছু জেনেশুনেও স্কুলের ছেলেরা এখনও তাকে চিৎকার করে করে শোনায়, 'থামকাটা নাট্যকার'। এমনকি, 'ইংরেজি স্যার' বনোয়ারিবাবু পর্যন্ত একদিন তাকে আর বাবাকে নিয়ে ক্লাসে খুব খারাপ খারাপ কথা বলেছেন। স্ট্রং ভার্ব পড়া ছিল সে দিন। বনোয়ারিবাবু সুযশকে ধরেছিলেন 'ব্রিং'। সুযশ পারেনি। সুযশের পেছন পেছন মাথা হেঁট করে পর পর উঠে দাঁড়িয়েছিল ফাল্গুনি দিব্যেন্দু রসময়। তার পরেই ছিল বুন্টন। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, ব্রিং ব্রট ব্রট। ঢেকুর তুলে, পেটের ভাত মুখে এনে চিবতে চিবতে, জড়ানো গলায় বনোয়ারি স্যার বলেছিলেন, ব্রট বানান বল। বুন্টন মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে বলেছিল, বি আর এ ইউ জি এইচ টি। মুখের চিবনো ভাত কৎ করে গিলে ফেলে কল কল করে উঠেছিলেন স্যার, বি আর এ-অ্যার! 'থামকাটা নাট্যকারের' উপযুক্ত পুত্র! নাটক লেখাটেকা কি শুরু হয়েছে? প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝখানে সুযশ চিৎকার করে বলেছিল' ও কবিতা লেখে স্যার—বলেই আচমকা বুন্টনের রাফখাতা টেনে নিয়ে একেবারে বনোয়ারি স্যারের টেবিলে। স্যার অবিশ্যি খাতাখানা ছুঁয়েও দেখলেন না, হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, অন দি বেঞ্চ—প্রায় পুরো ঘণ্টাটাই ব্রেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে।

অথচ, বুন্টন জানে, তার বাবার মতো ভালো মানুষ আর হয় না। বালিশে বুক চেপে নুয়ে পড়ে সকাল কিংবা দুপুরে অথবা রাতে বাবা যখন লেখেন, বুন্টন স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখে কী করে একটা নাটকের জন্ম হচ্ছে। শুধু দোয়াত-কলম দিয়ে কাগজের উপর কী কাণ্ডটাই না করেন বাবা! হ্যারিকেনের দপদপ আলোয় লিখতে খুব অসুবিধে হয় বাবার। চোখে কম দেখেন। দিনের আকাশে সূর্য এক তেজি লণ্ঠন', বাবা বলেন। তা হলে ফুঁ দিয়ে তাকে সাত-সন্ধেয় কেনই বা নিভিয়ে দেয়া, কেরোসিন যখন এত আক্কারা! আক্কারা না হলে কি হয়! বুন্টন দেখেছে, ভরা কেরোসিনের হ্যারিকেনের আলো কখনও দপদপ করে না। কেরোসিন আর সূর্যের কারসাজিতে বাবার লেখা মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকে। খুব কষ্ট হয় তার তখন।

শুধু কি নাটক, আরও কত কিছুই না লিখতে হয় তার বাবাকে। কত লোকই যে বাবাকে দিয়ে কত কিছু লিখিয়ে নেয়— দবখাস্ত, চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, বাড়ি ভাড়ার রসিদ, বিয়ের পদ্য, মানপত্র, সরস্বতী পুজোর

চিঠি, আরও কত কী সব কিছু মনেও থাকে না বুন্টনের। দরকারে যারা ছুটে আসে, দরকার ফুরিয়ে গেলে তারাই কিন্তু বাবার সম্পর্কে খারাপ খারাপ সব কথা বলে। সেই লোকগুলোই আবার যখন বাবার কাছে এসে হেসে হেসে কথা কয়, আর বাবা অমনি দোয়াতে কলম ডোবান, তখন খুব রাগ হয় তার। এত রাগ যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, কালির দোয়াতটা ভেঙে দেয়। কিন্তু বুন্টন জানে, নতুন একটা দোয়াত কিনতে অনেক পয়সা লাগে। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দিদি একবার বাবার দোয়াতটা ভেঙে ফেলেছিল। তারপর, অনেক দিন পর্যন্ত হাতলহীন একটা কাপে কালি গুলে লিখতে হয়েছে বাবাকে। তা জানে বলেই রেগে গেলেও দোয়াতটা আর ভাঙা হয় না।

বুন্টনের মনে হয়, তার চারপাশের লোকজনেরা নিষ্ঠুর। তাদের নিয়ে সবারই যেন ঠাট্টা। এই জন্যেই জ্যেঠামশাইর বাড়িতে সে যেতে চায় না। খেতে বসে জ্যেঠামশাই ঠিক বাবার কথা তুলবেন। আক্ষেপের মতো করে বলবেন—ভুল্ভুলটা একই রকম থেকে গেল। (বাবাকে যে কেন 'ভুল্ভুল' বলেন জ্যেঠামশাই। বাবার নাম শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ রায়—) মাংসের হাড়টাকে গালের এক দিকে ঠেলে দিয়ে, কিংবা কটাৎ করে ভেঙে ফেলে এক মুখ লাল নিয়ে এরপর তিনি হয়তো বলেন, কোনও দায়িত্ব নেই—আরে, লেখাটেকা কি আমাদের মতো লোকদের সাজে! ও-সব ঠাকুরবাড়ির জন্যে। খাওয়া-পরার চিন্তা ছিল না, সারা জীবন শুধু এঁকে-লিখেই গেলেন ওঁরা। তাই বলে তুই তা পারিস! ওগো, বুন্টনকে আর একটু মাংস দাও! কতদিন হয়তো পেট পুরে খায় না ছেলেটা।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খাবারগুলো বিস্বাদ ঠেকে বুন্টনের। ইলেকট্রিক আলোয় উদ্‌ভাসিত খাবারঘর মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। বুন্টন স্পষ্ট দেখতে পায়, লণ্ঠনের নিভন্ত আলোয় ঝুঁকে পড়ে দিদি পড়ছে। আসলে তার কান রয়েছে বাইরে কিন্তু। চেনা গলার কটি শব্দ শুনতে চাইছে দিদি—'ওগো, ব্যাগ্‌টা ধরোতো'—ব্যাগ, অর্থাৎ চাল, যা ফুটলে ভাত। দোরগোড়ায় বাবার গলা শোনা যেতেই পেটের ভেতর ওত পেতে থাকা জমানো খিদে যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সবার আগে ছুটে যায় বুন্টন নিজে, বাবাকে জড়িয়ে ধরে—তারপর আসে দিদি। বাবা খুশির সুরে বলেন, বুল্‌টি, খেতে খেতে আজ মেলাই ছড়া শোনাব তোকে, লিয়রের ছড়া। কত নামেই না বাবা তাকে ডাকেন : 'বুল্‌টি বুল্টা বুল্‌টি/সব তোর উল্‌টি', 'বুল্‌টা/বোঝা চাই, আছে কোথা মূলটা'—কিন্তু মা এসে দাঁড়াতেই বাবা কেমন যেন মিইয়ে যান, দিদির হাতে ব্যাগটা দিয়ে মার পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যান—সে সময় কখনও কখনও তাঁরা দু চোখে টলটলে জল দেখতে পায় বুন্টন। মার চোখও, দেখতে না দেখতে জলে ভরে ওঠে।

খাবার টেবিলে বসে মনে মনে প্রতিবারই ছবিটা দেখতে পায় বুন্টন—বইয়ের পাতা থেকে দিদির চোখ সরে সরে যাচ্ছে বাইরের দরজার দিকে, বাবা এখনও হয়তো ফেরেননি—ছবিটা স্থির থাকতে দেয় না বুন্টনকে। সাজানো খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ে চিৎকার জুড়ে দেয় সে, বাড়ি যাব, বাড়ি পৌঁছে দাও আমাকে—

অনেক রাতে তোতনদার সঙ্গে সাইকেল চেপে বাড়ি ফেরে সে। সাইকেল চালাতে চালাতে তোতনদা বলে, বাবার কথা সব অমনিই। নাকের বাইরে কখনও কিছু দেখতে পান না—

তলাকার চাতালের ব্যস্ত মানুষজনের কথাবার্তায় বুন্টনের হঠাৎ মনে পড়ে যায়, শহরের এই কালী মন্দিরে প্রসাদ নিতে এসেছে সে। মা দিদি তার পথ চেয়ে রয়েছে। প্রসাদ নিয়ে গেলেই তবে আজ দুপুরে তাদের খাওয়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বুন্টন দেখল, ভোগঘর থেকে পরাত পরাত প্রসাদ নিচেকার চাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। আতপ চালের ভোগের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ। ডেগ বোঝাই ডাল, মাংস এল। নায়েবমশাই, বাবার লেখা নাটকে যিনি অভিনয় করেছেন, চাতালে নেমে এলেন যেন কোত্থেকে। জটলাটা এবার উঠোনময় ছড়িয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে প্রসাদ বিতরণ শুরু হল। প্রথম প্রসাদ পেলেন শহরের যাঁরা মান্যিগন্যি লোক. কদাচিৎ কখনও মায়ের প্রসাদ খেতে যাঁদের ইচ্ছে হয়। প্রসাদের পুঁটলি চাকরের হাতে দিয়ে একে একে চলে গেলেন তাঁরা। নায়েব মশাই গল্প করতে করতে কিছুটা পথ তাদের এগিয়ে দিলেন। এরপর প্রসাদ পেলেন যাঁরা

পুজো দিয়েছেন তাঁরা। পুঁটলি নাচাতে নাচাতে তাঁরাও চলে গেলেন। এরপর উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকল তারা, যারা মান্যিগন্যিও নয় এবং পুজোও দেয়নি।

বুন্টন বুঝতে পারে, এবার তার নেমে যাওয়া উচিত। ঠিক এই সময়ই, নায়েবমশাইর সঙ্গে তার চোখোচোখি হল। বুন্টন ভাবল, তিনি নিশ্চয়ই তাকে প্রসাদ নিতে ডাকবেন। বুন্টনকে তিনি চেনেন। তাদের বাড়িতে সেই অভিনয়ের সময় কতবার গিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে গল্প করেছেন কত। সেই বিশ্বাসে থামের আড়াল থেকে বাইরে এল না, মুখটি বাড়িয়ে ঠায় তেমনই।

কিন্তু খানিকবাদেই তার মনে হল, নায়েবমশাই হয়তো ভাল করে তাকে লক্ষ করেননি। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে আসছে পরাত, অথচ ডাক আসছে না তার। থামের আড়াল থেকে এবার কিছুটা সরে এল সে। আর সরে আসতেই নায়েবমশাইর মুখোমুখি। তলায় দাঁড়িয়ে যেন তার দিকেই তিনি চেয়ে। পরমুহূর্তেই চোখ ঘুরে গেল তার। পাশের লোকটিকে ধমকে উঠলেন, ভিক্ষে করে খেতে পার না? রোজ রোজ পেসাদ, অ্যা!

সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল বুন্টনের। থামের আড়ালে চলে যেতে চাইল সে। কিন্তু, জ্যেঠামশাইর পোষা ময়নার মতো যে শেকলে বাঁধা তার পা। তলাকার লোকজন, গৌরবর্ণের দীর্ঘকায় নায়েবমশাই পরাত হাতে ঠাকুর, মধ্যাহ্নের খর আলোয় ঝলকিত অঙ্গন, কোনও কিছুই আর তার চোখে রইল না। অনুভব ছুঁয়ে ছায়া ছায়া শরীরের ইতিউতি কিছু চলাচল শুধু সে টের পেল।

বাড়ির যতই কাছাকাছি, ততই অস্বস্তি বুন্টনের।

সে জানে, বাড়িতে আজ একটা ঘুম-ঘুম ব্যাপার চলছে। মা দিদি দু ঘরে শুয়ে রয়েছে, যেন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু কালীবাড়ির ভোগের বাজনা বেজে উঠতেই মা শুয়ে শুয়েই বলেছেন, 'এবার যা, বুন্টন।' পাশের ঘরে আসতেই দিদি বলেছে, পেসাদ চাইবি কিন্তু। দাঁড়িয়ে থাকবি নে বোকার মতো। অথচ বুন্টনের ধারণা ছিল, ওরা ঘুমিয়ে যখন, তখন আর কালীবাড়ি যেতে হচ্ছে না তাকে। সে-ও তো ঘুমিয়েই ছিল, কাজেই ভোগের বাজনা শুনবে কী করে। কিন্তু বাজনাটা বেজে উঠতেই বোঝা গেল, আসলে কেউই তারা ঘুমোয়নি। গামলা বাটি আর গামছা নিয়ে বেরিয়ে এসে সারাটা পথ সে ভেবেছে, এখন একটা ভূমিকম্প হয় না কেন— অন্তত হোঁচট খেয়ে পা-টাও তো ভেঙে যেতে পারে তার।

এখনও তা-ই ভাবছে বুন্টন। কিন্তু কিছুই হয় না। সব কিছু ঠিকঠাক্ দাঁড়িয়ে থাকে, অক্ষত পায়ে দিব্যি পথ হাঁটে বুন্টন। যত হাঁটা, ততই বাড়ির কাছাকাছি। যতই বাড়ির কাছাকাছি ততই অস্বস্তি—

বেলা পড়ে আসতেই মার পাশ থেকে চুপি চুপি উঠে পড়ে বুন্টন, পা টিপে টিপে বাইরে আসে। বাইরে এসেই দিদিকে দেখতে পায়। শেফালি ফুলগাছের তলায় জোড়া পিঁড়ি পেতে দিদি ঘুমিয়ে, পাশে ব্যাকরণ কৌমুদীর খোলা পাতা হাওয়ায় ফুরফুর। পড়তে পড়তে এক পেট খিদে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দিদি।

দিদির পাশ ঘেঁষে চলে আসতে গিয়ে কিন্তু ছড়াটা ঠিক মনে এল তার। ছড়াটা বুন্টনেরই বানানো. বাবার কিছুটা মেরামতি রয়েছে অবিশ্যি। কিন্তু সবাই জানে ছড়াটা তারই। দিদি ব্যাকরণ কৌমুদী খুলে বসলেই ঝুঁকে ঝুঁকে সুর তুলে সে বলে,

জুতো পায়ে মসমস
মি বস মস।
তাই দেখে ভ্যাবাচ্যাকা, থ
সি থস থ।
আর সবে খালি পায়
সন্তি সন্তি
তি তস অন্তি।

একটু ঘুর পথে পাড়ার বড়ো রাস্তায় পড়তেই বুন্টনের চোখ গোল। পথ আগলে হেডস্যার! সর্বনাশের আর বাকি থাকল কী। জলের তলায় মাছ যেমন খেলে বেড়ায়, চশমার তলায় হেডস্যারের চোখ তেমনি

খেলে বেড়াল কতক্ষণ। ভুরু এল ছোটো হয়ে। সরু লাঠিটা দিয়ে যেন রাস্তা পরখ করতে করতে গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, বুন্টন—নলিনাক্ষবাবুর ছেলে—ভালো নাম প্রবীর—ক্লাস এইট, 'এ' সেকশন, নাম্বার দুই—সামনের বেঞ্চের কোণের দিকে বসো—তাই তো?

হেডস্যারের স্মরণশক্তিতে স্তম্ভিত বুন্টন কোনও রকমে মাথা নাড়ে।

—স্কুল যাওনি?

সঙ্গে সঙ্গে বুন্টনের মাথার ভেতর সব কিছু তালগোল। একটা শব্দও যদি মনে পড়ে।

—কপালে ফোঁটা কেন? ফ্যাশন! ধমকে উঠলেন হেডস্যার।

প্রাণপণ চেষ্টায় বুন্টন বলে ওঠে, আজ আমার জন্মদিন স্যার।

হেডস্যারের মুখচোখ খানিকবাদেই সহজ হয়ে আসে। আদুরে-গলায় এরপর ধমকে ওঠেন, পেন্নাম কর—বুন্টন টিপ। তারপর তাকে কাছে টেনে নিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বলেন, 'অনেক বড়ো হতে হবে। ইয়োর ফাদার ইজ এ গ্রেট ম্যান। মানে বুঝেছ?—বুন্টন মাথা নাড়তেই খুশি হন তিনি। বলেন, 'গুড। কি জানো, সাকসেস সকলের জীবনে—বড়ো হলে বুঝবে। যাও—

কথাটা ফুরতে ফুরতেই এক ছুটে তালতলায়। মাঠের ঠিক মুখটাতেই, আচমকা ব্রেক চেপে ই এম ইউ কোচের যেমন থেমে যাওয়া, তেমনিভাবেই থেমে পড়ল সে, মুহূর্তেই বন্ধ ছোটার বেগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ছন্দের লয়কারি রেল 'কম' ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম—পোঁ-পোঁ, ঝিকিঝিকি.....

মাঠ জুড়ে শুধু তাঁবু আর তাঁবু, মাঝে মাঝে কাঁধে-রাইফেল 'খাঁকি লোকজনের' খাড়া পাহারা, একটা চাঁদোয়ার তলায় গনগনে রাক্ষুসে উনুনে ডেগ্‌চি ফুটছে বগ-বগ, মাঠময় শুধু খাকি রং আর খাকি রং!

আচমকা থেমে পড়ার দরুনই হয়তো বুন্টনের ভেতরকার কলকবজা নড়ে কেঁপে একশা, জলের ভেতর খালি কলসি ডোবাতে গেলে যেমন একটা শব্দ ওঠে, বুকের ভেতর তেম্মনি এক দম-ফুরোনো শব্দের ভাঙা-গড়া : ধুক-পুক ধুক-পুক লাব-ডাব লাব-ডাব.........

—বুন্টন!

ঠিক সেই সময়ই চাপা-চাপা গলার ডাক ভেসে আসতেই বুন্টনের মনে হলো হাঁটুর তলাকার পায়ের অংশ দুটো যেন হারিয়ে গেল তার, হাঁটু ভেঙে এবার তার যেন বসে পড়া. বাবার নাটকে থানার ও সি-র সামনে মিয়াজান, আসলে দিব্যদা কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু ভেঙে যেমন বসে পড়েছিল। ও সি-র গর্জন স্পষ্ট যেন সে শুনতে পায়, আসলে বাবার : মিয়াজান, অ্যা—নেতা, উঁ! সোজা হয়ে দাঁড়া, দাঁড়া—বেটনখানা মুহূর্তেই শূন্যে লাফিয়ে উঠল—

বেটন নয়, শক্ত একখানা পাঞ্জা। কবজির ওপর লাফিয়ে পড়েই হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বুন্টন যেন ন্যাকড়ার পুতুল, চলা তার তেমনিই টাল্‌মাটাল, পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি, চোখের সামনে তার সব কিছু ঝাপসা ঝাপসা—

এক সময় সে তার হাত ছেড়ে দিয়ে চাপা গলায় ধমকে ওঠে, 'ওখানে কী করছিলি? ওরা যদি গুলি করে দিত?'

সৌগতদাকে সে এখন স্পষ্ট চিনতে পারে। তাদের স্কুলের এগারো ক্লাসের ছাত্র। স্কুলের ফুটবল টিমের গোলকিপার। লম্বা ছিপছিপে সৌগতদা যখন ডোরাকাটা, তার হাতে তখন জাদু, হাত বাড়ালেই ক্ষিপ্ত বল ঠিকঠাক তার করতলে। তার জন্যেই হেডস্যারের ঘরখানা ট্রফিতে-ট্রফিতে গলাগলা।

ঘন ঘন বাতাস ছাড়া-নেয়া করতে করতে ফ্যাসফেসে গলায় বুন্টন জিগ্‌গেস করে, ওরা ওখানে কী করছে?'

সৌগত 'হাত ঘোরালে নাডু পাবে'র মতো করে ডান হাত ঘুরিয়ে বলল, 'আজ দুপুরে না— এই অব্দি বলেই চারপাশে চকিতে নজর বুলিয়ে তার গা বরাবর এগিয়ে এল, ফিসফিস করে বলল, 'তুই কিছু জানিস নে?' বুন্টন মাথা নাড়তেই ভেংচি কাটল সে, "হাঁদা। শহরময় লোক জানে, আর—আজ সকালে দিলা সোমের মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ, সি আর পি, এস পি, ডি এস পি, আই বি-তে এখন সে এক নৈ-

নেত্য কাণ্ড! দিলা সোমকে চিনিস নে? তুই একটা—চারটে ইটের ভাটা, সুদের কারবার, তা ছাড়া এধার-ওধার খুচ্‌খাচ, সে ফেঁদেছিল মেলাই কিছু—হ্যা, লাকি টকির মালিক হুঁউ! বাইরে থাকবি নে, বাড়ি চলে যা। সি আর পি ক্যাম্প বসেছে দেখলি নে। শালারা গুলি ছাড়লেই হলো। যারা মেরেছে তাদের তো করবে ঘেন্টু! তারা যেন পুলিশের ভ্যানে উঠবে বলে 'সিতি' কেটে সব বসে রয়েছে, হ্যাঁঃ! মাঝখান থেকে মারা পড়ব আমরা। বাড়ি যা, বাড়ি যা—"

বুল্টন হাঁটতে হাঁটতে জিগ্‌গেস করে, 'যারা মেরেছে তারা এখন কোথায় গো?' সৌগতের গলায় ঝাঁজি ফুটে ওঠে, 'তা আমি কী করে জানব! এমন গাধার মতো কথা বলিস না।' বলে হনহন করে মুহূর্তেই অদৃশ্য।

বুল্টনের ভয় হয়। অ্যানুয়াল পরীক্ষার কথা মনে পড়ে তার। সবে প্রশ্ন নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছে—সে-দিনই তাদের প্রথম পরীক্ষা, তাদের নয় শুধু স্কুলেরও—হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে হাতরে প্রশ্ন ছিটকে গেল, চিৎকার করে কেঁদে উঠল ফাইভের সরসী, উঁচু ক্লাসের ছেলেরা খাতা ছিঁড়ে ফেলে বারান্দায় চলে গেল, সেখান থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকল, 'আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি না।' এর ভেতরেই আরও দুটো বোমা পড়ল, দোতলার জানালা দিয়ে তলায় তাকাতেই বুল্টন হিম : ফাঁকা লনে দঁড়িয়ে ছিল ওরা, তিনজনের ছটি হাতই সামনে প্রসারিত, একজনের হাতে একটি খোলা তলোয়ার, অন্য হাতে নারকেলের গড়নের একটি বোমা, দ্বিতীয় লোকটির ডান হাতখানা শুধু সে দেখতে পেয়েছিল, সে ছিল পাশ ফিরে, ডান হাতের নল ছিল সামনের দিকে ফেরানো, হঠাৎ সে ডান দিকে ঘুরে গিয়েছিল চকিতে, ঘুরতেই বুল্টনের সঙ্গে চোখাচোখি তার—দিব্যদা! উত্তেজনায় বেঞ্চের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, দিব্যদাকে দেখে কিন্তু ভয় হচ্ছিল, তার মুখময় ছড়িয়েছিল ভয়ঙ্কর এক অচেনা গাম্ভীর্য, দিব্যদা চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার সময় বাঁ হাত নেড়ে তাকে বুঝি সরে যেতে বলেছিল—সে সরে যাওয়ার খানিকক্ষণ বাদেই তাদের জানালার পাশটিতে প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফেটেছিল—এর কিছুদিন বাদেই গভীর রাতে তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ভ্যান থেকে দিব্যদাকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, সারারাত পাড়া মাথায় করে রাজা, দিব্যদার পোষা কুকুর, বাঘের মতো আগলে ছিল দিব্যদাকে, কী করে যেন টের পেয়েছিল রাজা—দিব্যদাকে পোড়াবার জন্যে লোক পাওয়া যাচ্ছিল না পরদিন, শেষ পর্যন্ত বাবা, হর্ষদা, সনাতনকাকু, দীপুকাকুরা মিলে দিব্যদাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্মশান থেকে ফিরে এসে নিমপাতা দাঁতে কাটতে না কাটতেই বাইরে থেকে বাবার নাম ধরে ডেকেছিল। বাবা বাইরে গিয়ে যাদের ভেতরে নিয়ে এলেন. তাদের দেখেই বুল্টন বুঝেছিল, তারা পুলিশের লোক। বাইরের ঘরে বসল তারা। বেঢপ মোটা লোকটি হেসে হেসে জিগ্‌গেস করল, 'এই বুঝি ফিরলেন শ্মশান থেকে?'

কথাবার্তা সে-ই বলল যা, অর দুজন কখনও বা ভুরু কোঁচকাল, মাথা ঝাঁকাল, ঠোঁট ওল্‌টাল, হাতের পাঞ্জা উপুড়-নীচ করল, নুয়ে পড়ে প্যান্টের ভাঁজ বুটের পালিশ পরখ কবল, নিঃশব্দে হাসল, হাঁটু নাচাল ঘন ঘন।

অনেকক্ষণ ধরে বাবা-মোটায় কথা কাটাকাটি। সব কিছু সে বুঝতে পারেনি। তবে যা সে স্পষ্ট ধরতে পেরেছিল, তা হল দিব্যদার পোড়ানোর ব্যাপারটায় বাবার ওপর মোটারা খুশি হয়নি। যেন দিব্যদা রাস্তার পাশে পচে গলে শেষ হলেই ভালো হত! শেষটায় বাবা চটে গিয়েছিলেন। কী একটা কথায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, তিনি গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'কাল কী করব, তা আজ ভাবি না কখনও, ওটা আমার স্বভাব নয়। সারাদিন আমি না খেয়ে। কথা যদি আপনাদের শেষ হয়ে থাকে—'

ওঠার মুখে ওরা তিনজন রিভলভারের খাপে হাত রেখেছিল। গা শিরশির করে উঠেছিল বুল্টনের। এখনও গা শিরশির তার। বড়ো বড়ো পায়ে বাড়ির দিকেই হাঁটতে থাকে সে।

বাড়ির কাছ বরাবর আসতেই পেছনে সাইকেলের ঘন্টি। পরমুহূর্তেই তার গা ঘেঁষে সাইকেল থেমে যায়। হর্ষদা মাটিতে পা ঠেকিয়ে, ঝুঁকে পড়ে বলে, 'এই, নলিনকা কোথায় রে?—বাড়ি নেই? —অ! বলে কী যেন ভেবে নেয় হর্ষদা, বুল্টনের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে, আর একটু যেন ঝুঁকে পড়ে তার ওপর,

তারপর, হাত বাড়িয়ে থাকে টেনে নিতে নিতে বলে, "শোন, নলিনকাকে একটা খবর দিতে পারবি? বলবি, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। নলিনকা'রও থাকা উচিত নয়। ওরা খেপে আছে আমাদের ওপর। আমি যাচ্ছি রে—," বলে প্যাডেলে চাপ দিয়ে হর্ষদা পরক্ষণেই উধাও।

সন্ধের মুখে মুখে বাড়ির দিকেই পা বাড়ায় বুন্টন। বাবাকে কোথাও খুঁজে পেল না সে। হর্ষদার কথাটা মনের ভেতর তখনও তার গাঁথা—পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে বাবাকে। বাবা এক সময় জোর রাজনীতি করতেন। কী একটা ব্যাপারে পার্টির সঙ্গে তাঁর বিরোধ হওয়ায় বাবা রাজনীতি ছেড়ে দেন। আর ছেড়ে দেন রজনী জ্যেঠাবাবু। রজনী জ্যেঠাবাবুর বাড়ি হরীতকী গ্রামে। কখনও-সখনও আসেন। লম্বা রোগা চেহারার মানুষটি ওঁর সঙ্গে যখন বাতাবি লেবুর বল নিয়ে উঠোনময় দাপাদাপি করেন, বুন্টন তখন ভুলেই যায়, এই মানুষটি উনি নিজের দাদাকে পার্টির কথায় মেরে ফেলেছেন। সেকথা কত বারই না মা-দিদির কাছে শুনেছে বুন্টন। জ্যেঠাবাবুর দাদা নাকি ছিলেন মস্ত জোতদার। পার্টি বললে, তাকে মারতে হবে। নির্দেশটা নাকি বাবাই দিয়েছিলেন। বাবা তখন পার্টির নেতা। বাবা আর জ্যেঠাবাবু দুজনাই ধরা পড়লেন এরপর। দু-বছর বাদে জেল থেকে যখন তাঁরা ছাড়া পেলেন তখন পার্টির নাকি 'বদলে গেছে পথটা'। রাজনীতি থেকে সরে এলেন দুজনাই। দীর্ঘদিন বাবা নাকি ঘুমোতে পারেননি রাতে। ঠায় বসে থাকতেন, আর ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠতেন, বউদির কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে! ওরা আমার বিশ্বাসটুকুও কেড়ে নিল শেষ পর্যন্ত—

এ-সব অবিশ্যি তার জন্মের আগেকার কথা।

সেই বাবাকে এতদিন বাদে আজ নাকি খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। পুলিশের আগেই বাবাকে ধরতে চেয়েছিল বুন্টন। কিন্তু পরিচিত জায়গাগুলোতে সব মুখই রয়েছে, শুধু বাবা নেই। বুন্টনের ধারণা হল, বাবা ঠিক শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন, পুলিশ তাঁকে খুঁজে পায়নি।

বড়ো রাস্তায় পড়তেই বুন্টন অবাক। পিচের কালো শরীরের ওপর দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত পথঘাট নির্জন। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় আলো জ্বলেনি। চারধার কেমন যেন থমথম।

পিচের এই প্রধান সড়কটির দু পাশেই যা কিছু শহর। দোকানপাট, কোর্ট, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, সরকারি অফিস, কো-অপারেটিভ, বিলিতি মদের দোকান, ডাক্তারখানা, পৌরভবন, কলেজ, পার্টি অফিস প্রভৃতি এই প্রধান সড়কেব দু পাশেই গড়ে উঠেছে। এ সড়ক ছেড়ে ভেতরে ঢুকলে মনেই হবে না, কোনও মহকুমা শহরের অংশ সেটি। ছাড়া ছাড়া বসতি, পথেঘাটে আলো নেই, এখানে সেখানে জলা-জংলা, সন্ধে হতে না হতেই ঝুপসি আঁধারে চারদিক টইটম্বুর।

ভেতর পথ ছেড়ে বুন্টন বড়ো রাস্তার যেখানটায় এসে দাঁড়াল, সেখানে মুখোমুখি স্টেট ব্যাঙ্ক আর বিলিতি মদের দোকান। রাস্তায় একটিও লোক নেই। কাছে কিংবা দূরে যানবাহনের কোনও চিহ্নও দেখতে পেল না সে। কেমন যেন ভয় হয় বুন্টনের। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে, এগোবে কি এগোবে না ঠিক বুঝতে পারে না।

একটু বাদেই টুক করে বিলিতি মদের দোকানের একটি পাল্লা ফাঁক হলো, ভেতর থেকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে টালমাটাল একটি লোক বেরিয়ে এল। টলতে টলতে, পড়বি তো পড়, প্রায় বুন্টনের ঘাড়েই। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে খিস্তি করে ওঠে সে, 'শুয়োরের বাচ্চারা! সন্ধে রাতেই কার্ফু মারিয়েছে। খোয়ারি কি শালা থানায় গিয়ে ভাঙব, উঁ—হারামি—'তারপর বুন্টনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে ওই কথাই রইল, ভাই, কেমন হ্যা-চ্চলি—'

লোকটি চলতে শুরু করতেই বুন্টনের হাসি পেল আর হাসি পেতেই ভয়ের ভাবটা কেটে গেল তার। 'তা হলে ওই কথাই রইল'—কী কথা রইল! হি হি হি..............

দূরের অন্ধকারে সে হারিয়ে যেতেই বুন্টন ঘুরে দাঁড়াল। প্রতিযোগিতার ট্রাকে দৌড় প্রতিযোগীরা যেমন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি পা আগুপিছু করে শরীরের ওপরের অংশটা ভেঙে নিল সে। দৌড় শুরু করার আগে সামনের পথটা শেষবারের মতো দেখে নয় সে। নির্জন খাঁ-খাঁ সড়ক পিচে-আঁধারে একাকার।

একসময় চারদিকের স্তব্ধতা ছিন্ন করে একটা চাপা শব্দ উঠল, ঝিক্-ঝিক্—ঝিক্......ক্রমশই বেড়ে বেড়ে যায় শব্দটা, পোঁ-ওঁা-ওঁা........পোঁ-পোঁ, ঝিকি-ঝিকি.........ক্রমশই ছুটন্ত এঞ্জিন বুল্টন, পোঁ-ওঁা-ওঁা—

শব্দটা বুল্টন হয়তো শোনেনি, অথবা, তার হয়তো মনে হয়েছিল, ছুটন্ত ইঞ্জিনের জন্যে শব্দটা নয়, কিংবা, বুল্টন হয়তো তার ব্রেক খুঁজে পায়নি। অন্ধকার কাঁপিয়ে শব্দটা আর একবার উঠল, হল্ট.......

কোথায় যেন একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনে বুল্টন, শব্দটা যেন তার শরীরের ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল, ঢেউ-এর মতো দুলে উঠল অন্ধকার, বাবা মা দিদির মুখগুলো, নেগেটিভ ফিল্মের ছবির মতো চকিতেই যেন ভেসে ওঠে একবার, পোঁ—

অনেকটা দূর তবু ছুটে গিয়েছিল সে, তারপর দুহাতে বাতাস খিমচে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল সেই ছুটন্ত ইঞ্জিন—

এর অনেক পরে, যখন এই মহকুমা শহর প্রকৃত এক শোকে মুহ্যমান, যখন কার্ফু এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে বিপন্ন জনক তার প্রয়াত সন্তানের বেদনায় দিশেহারা, ঠিক তখনই ইথার তরঙ্গে ভেসে এল সেই নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর :

......স্থানীয় সংবাদ, পড়ছি—আজ সন্ধ্যায়—মহকুমা শহরে উগ্রপন্থী এক কিশোর পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়ে নিহত হয়। একাধিক হত্যার অভিযোগে পুলিশ দীর্ঘকাল ধরে তার খোঁজ করছিল। আজ সন্ধ্যায় তার নেতৃত্বে একদল উগ্রপন্থী পুলিশের ওপর হামলা চালালে পুলিশও পালটা গুলি চালায়। কিশোরটি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, অন্যেরা পালিয়ে যায়। পুলিশের একজন এস আই এবং দুজন কনস্টেবলও গুলিতে আহত হয়েছেন বলে প্রকাশ। এস আই-এর আঘাত গুরুতর—

এরপর ছিল দশ সেকেন্ডের নীরবতা। কোনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে দশ সেকেন্ড হয়তো যথেষ্ট সময়, যেমন ট্রিগার টানার পক্ষে সময়টা যথেষ্টেরও বেশি।

সেই শোকস্তব্ধ জনক কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কি না আমরা জানিনে। নৈশ আকাশে দীপ্তিমান নক্ষত্রের মতো ক্রোধ ঘৃণা ও নিহিত শোকে তাঁর চোখ দুটো আপাতত শুধু ধক্-ধক্ ধক্-ধক্....... □

কয়েদখানা

দেবেশ রায়

• পরদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়, উপরে, মাঝখানে ছবি, বাঁ পাশে প্রধান সংবাদ—সুপ্রিম কোর্ট মিসা আইনের সতেরো ক ধারা বাতিল করে দিয়েছেন। ডানদিকের শিরোনাম, —আবার জেল ভাঙা, আবার সন্ত্রাস।

দুটো সংবাদ মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, এই জেল ভাঙার ঘটনাতেই প্রমাণ হচ্ছে মিসার সতেরো ক ধারার মতো বা নিবর্তনমূলক আটক আইনের মতো একটি আইন কত জরুরি। এই অধিবেশনেই প্রয়োজনীয় নতুন আইন আনা হচ্ছে। আহত পুলিশদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যেভাবেই হোক, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে।

দুটো সংবাদ মিলিয়ে জনৈক যুবনেতা মন্তব্য করেছেন, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি আদালত স্তব্ধ করতে পারবে না। জয় আমাদের হবেই, কারণ লক্ষ্য আমাদের সমাজতন্ত্র, নেত্রী আমাদের ইন্দিরা গান্ধী।

হাত দুটো মাথার দুদিকে ছড়ানো, ডান হাঁটুতে একটা ভাঁজ, বাঁ পা-টা খাটের কিনারা বরাবর সোজা, ফলে কোমরটা একটু বাঁকা, বাঁয়ে—বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুমটা ভেঙে গেলে, হাত-পা নাড়াবার জোরটুকুও নেই হাসপাতালের এমন কোনও রোগীর মতো নসু পড়ে থাকে, সামনের দেওয়ালের ঘুলঘুলির দিকে চেয়েই, যেখানে সারাদিন চড়ুই পাখিদের কলরব। দুপুরের ঘুম নয়, ঘুমের পর এই নিরুদ্যম শুয়ে থাকাটুকুই জেলখানায় এসে নসুর নতুন অভ্যেস। আর না ঘুমিয়েও জেলখানাটাকে ভুলে থাকা যায় এই সময়টুকুতেই। বাড়িতেও এই সময় চড়ুই পাখিরা ঘুলঘুলিতে যায় আর আসে।

টুবলার খাটে ভোম্বল, টুবলা আর জয়। জেলখানায় এসেও ওদের দুপুরের ঘুমের অভ্যেস যায় নি। জেলখানার বাইরে ও ভেতরে তফাতটা কোথায়, একটা দেয়ালের। একটা দেওয়াল তো আর সামাজিক অবস্থাটা বদলে দিতে পারে না। বাইরেও সেই সমাজ, ভেতরেও সেই সমাজ। আমরা ভদ্দরলোকের ছেলে বলে আরামে আছি আর জলিলকে কনভিক্টদের সঙ্গে রেখেছে—ও আধিয়ারের ছেলে। সুতরাং জেলের বাইরে লড়াইয়ের যে কায়দা, জেলের ভেতরেও তাই। সবই ঠিক, কিন্তু নসুর পেটে ভাত পড়লেই চোখ জড়িয়ে আসে। ওরা না ঘুমিয়ে থাকে কী করে। আর কেউ হলে এই ঘুমের অপরাধেই তাকে টুবলা গ্রুপ থেকে বের করে দিত। কিন্তু নসু মিস্ত্রিরের সঙ্গে ও সব বলতে আসবে কে। পাঁচটা মার্ডার অ্যাকশন, তার মধ্যে একজন সাব-ইনস্পেক্টর। দু-দুটো রিভলভার, একটা রাইফেল ছিনতাই। নসু মিস্ত্রি জেলের বাইরে দু-বছর ঘুমোয়নি, এখন দুপুরেও ঘুমোবে। ঘুমের পর খাট থেকে নামার জন্য এতগুলো কৈফিয়ত নসুকে মনে মনে দিতে হয় রোজই। আর এই কৈফিয়তগুলো মনে মনে আওড়াতে শুরু করলেই ধীরে ধীরে চড়ুইপাখির ঘুলঘুলিটা ঢাকা পড়ে যায়, দেওয়ালটাও দূরে সরে যায় আর টুবলার খাটে টুবলা, ভোম্বল আর জয়ের দিকে তাকাতে নসুকে চোখ নামাতে হয়। ওই উদ্যমহীন শুয়ে থাকার অবস্থাতেও, তাকিয়েই নসু বুঝতে পারে ব্যাটারা কোনও ফন্দি এঁটেছে। মানে জেলের ভেতরে কোনও সংগ্রাম ইত্যাদি। বুঝতে পেরেই নসুও চোখটা আবার দেয়ালে তুলে দেয়। তারপর ভাবে চোখটা বুজে ফেলবে কি না। কিন্তু ওরা যদি, ইতিমধ্যে চোখ খোলা দেখে থাকে, তা হলে ভাববে নসু কাটছে। অবিশ্যি এমন হতেও পারে নসুকে ওরা এখন জানাতেও চায় না, অ্যাকশন শুরু হয়ে গেলে নসু তখন জানবে বা পজিশন নিতে নিতে নসু তখন ব্যাপারটা বুঝতে থাকবে। নসু যেন সেটাই চায়। প্রথম থেকেই সব ঠিকঠাকের ভেতরে থাকলে পরে নানা কথাবার্তার ভেতরে

যেতে হয়। অত কথা বলতে নসুর ভালো লাগে না। আর কী অ্যাকশনের কথা হচ্ছে কে জানে। বাইরে কোনও খবর পাঠানো হতে পারে, বাইরের কোনও খবর এসে থাকতে পারে, ভেতরে কাকাদের গ্রুপের কোনও ব্যাপার হতে পারে, ছোরা বা লাঠি ইত্যাদি আর্মস কালেকশন হতে পারে—এই সব নটখটি ব্যাপার টুবলা আর জয়ই ভালো সামলায়। দেওয়ালে চোখ রেখে নসুকে কান পেতে থাকতে হয় ওদের কোনও কথা শুনতে। একটা শব্দ বা অর্ধেকটা শুনেও নসু বুঝে যাবে কী কথা হচ্ছে। বাইরে ওরা নসুকে কুকুর বলত—ও নাকি পুলিশের গন্ধ পেত। একবার একটা ঘরে নসু আর কানাই শুয়ে, সেই ঘরটার বাইরে সি আর পি। সেই ঘরটারই সিঁড়িতে দুজন। সারা পাড়া তছনছ হচ্ছে। তিন-তিন ঘণ্টা নসু আর কানাই সেই ঘরের ভেতরে নিঃসাড়। আর সেই ঘরে বসে বসে যেন নসু বুঝতে পারছিল পাড়ার কোথায় কোথায় তল্লাশি চলছে, কোন কোন মোড়ে পুলিশ। আর তিন-তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর কী অসম্ভব দ্রুততায় দরজা খুলে সিঁড়িতে বসা দুই সি আর পি-র রাইফেল দুটো নিয়ে কানাই আর নসু হাওয়া। যে ক্ষমতা দিয়ে নসু বাইরে সি আর পি-র গন্ধ পেত, এখন, সেই ক্ষমতাতেই নসু এক পলক তাকিয়েই টের পেতে পারে ওরা তিনজন কোনও ফন্দি আঁটছে। ফন্দিটা কী সেটা বুঝতে আধখানা শব্দও নসুর পক্ষে যথেষ্ট—তাই তাকে কান খাড়া রাখতে হয়, যেমন কান খাড়া রাখতে হত বাইরে, এমনকী ঘুমের ঘোরেও। কিন্তু অত কথার ভেতর নাই যদি থাকবে নসু, আধখানা কথা শোনার জন্য আর এত চেষ্টা কেন। ব্যাপারটা যদি জানা থাকে, অথচ সবাই যদি জানে সে কিছু জানে না, তা হলে অ্যাকশনের সময় নিজের পজিশন নেওয়ার সুবিধে হয়, বা নিজে কী করবে সেটা আগে থাকতে ঠিক করা যায়। 'জেলের বাইরে লড়াইয়ের যে কায়দা, জেলের ভেতরেও তাই।' এক একটা অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরি করো আর অ্যাকশন করো। নিজ নিজ এলাকাকে মুক্ত এলাকায় পরিণত করো। নসুর নিজের অ্যাকশন স্কোয়াড ছিল। সবাই জানে নসু মিত্তির পাঁচটা মার্ডার-অ্যাকশন, তিনটি ছিনতাই অ্যাকশন লিড করেছে। কিন্তু এখানে তো আর বাইরের ছেলেরা নেই যে তাদের দিয়ে অ্যাকশন স্কোয়াড বানাবে। সুতরাং নিজেরা নিজেরা মিলেই এক-একটা অ্যাকশনের স্কোয়াড হয়। নসু বুঝতে পারছে না, যে অ্যাকশনের তাল ওরা এখন করছে তাতে নসুকে স্কোয়াডের ভেতর নিয়েছে কি না। নসু বা আর এ-রকম দু-একজনকে সব স্কোয়াডই পেতে চায়। নসু বুঝে নিতে চায় ওদের তালটা কী। কিন্তু ওরা যদি একবার নসুকে ডেকে ফেলে আর নসু যদি একবার শোনে, তা হলে তো আর না বলার উপায় থাকবে না। না বললেই নসু হয়ে যাবে পাতিবুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী।

নসু খুব আস্তে ডান কাত হয়, যেন ঘুমের ঘোরে, তারপর বাঁ পা-টা খাটের পাশ থেকে নামিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরের দিকে যেতে থাকে। জয় পেছন থেকে 'এই নসু' ডাকলে নসু না-ঘুরে একহাত তুলে জানায় আসছি।

ডেপুটি জেলারের বাড়ির পেছনের বিরাট আমগাছটার আড়ালে তখন সূর্য, সারা আঙিনা জুড়ে ছায়া। ভলিবল নিয়ে চান্দু, ইন্দ্রজিৎ আর কাঞ্ছা প্র্যাকটিস করছে। পরনের লুঙ্গিটা টেনে নিয়ে হাঁটু জড়িয়ে নসু সিঁড়ির উপর বসে। কাঞ্ছা চেঁচায়, 'এই নসুদা, প্যান্ট পরে এসো।' কাঞ্ছার কথার জবাবে 'তোদের তো টিমই নেই' বলতে বলতে নসুর মনে হয়, এখন খেলতে নেমে গেলে লক আপের আগে আর টুবলাদের অ্যাকশনের প্ল্যান জানতে হবে না। কিন্তু পরনে এই আধা লুঙ্গি, এখন প্যান্ট আনতে গেলেই তো ওদের কথা শুনতে যেতে হবে। কথাটা জেনে এলে হত। কিন্তু নসুর একেবারেই ইচ্ছে করছিল না এখন এই আমগাছের লম্বা ও বিস্তারিত ছায়ায় ভলিবলের দাপাদাপি ছেড়ে আঠারো জনের থাকবার ঘরে ওই তিনজনের ফিসফিস কথায় যেতে। আর আগে বুঝে নিয়ে তবে নসু ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চায়।

ভলিবলটা এসে হাতের ভেতর পড়তেই নসুকে উঠে পড়িমরি মারতে হয়, নেটে ঠেকে গেলে কাঞ্ছা সেটা নেট করে, ইন্দ্রজিৎটা এমন লম্বা, লাফিয়ে উঠে আস্তে টুপ করে ঠিক কোর্টের মাঝখানে ফেলে দিলে নসুকে বাঁ হাতে বলটা লিফ্ট করে ডান হাত দিয়ে লুঙ্গি সামলাতে মাটিতে পড়ে যেতে হয়। নসুর অবস্থা দেখে ওরা কোমরে হাত দিয়ে হাসতে থাকে। চন্দু বলে, 'এই নসুদা, খেলছ ভলিবল, আর ধরে আছ যেন বাস্কেটবল।' নসু উঠে দু হাত দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মাথা নিচু করে কিছু বলে। বলটা ড্রপ খেতে

খেতে কোর্ট ছাড়িয়ে দেওয়ালের দিকে দূরে একলা হয়ে যায়। নসুর জিভটা মোটা। তার উপর তাড়াতাড়ি অথচ নিচু স্বরে কথা বলার অভ্যেস। ফলে কান খাড়া করে না শুনলে বা ও খুব ধীরে না বললে ওর কথা কিছুই বোঝা যায় না। সে চান্দুকে বলে, 'যা তো, আমার প্যান্টটা নিয়ে আয়।' চান্দু ছুটে যায় নসুর প্যান্ট আনতে আর বল আনতে ছুটতে ছুটতে নসু ভাবে, যাঃ শালা, আমাকে আর এখন ঘরে যেতে হচ্ছে না। কিন্তু ওরা তালটা কী আঁটছে জানতে পারলে হত। আপন মনে গড়িয়ে গড়িয়ে বলটা দেওয়ালের কাছাকাছি গিয়েছিল। সেটা তুলে ওখান থেকেই কাঞ্চুর দিকে ছুড়ে দেয়, টুবলাদারা তোমার খোঁজ করছিল।'

—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই ডাক সবাইকে এখন। টিম নামা।

চান্দু আর ইন্দ্রজিতের চিৎকার জুড়ে. দেওয়ালের দিকে মুখ করে নসু প্যান্ট পরতে থাকে। সেপাইদের চিৎকারের নকল করে ওরা ওদের ডাক বানিয়েছে— 'হে-এ-এ-এ-আট নম্বর, তিন নম্বর, ছয় নম্বর, খে-এ-লা-আ-র, মা-আ-ঠে-এ,-এ।' প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বাঁ দিকে তাকাতেই নসুর ভুরু কুঁচকে যায়, দূরের দৃশ্য দেখতে গেলে যেমন। কিন্তু প্যান্টের বোতাম থেকে তার আঙুল সরে না। নিজের ভাবনা. কাজ-কর্ম, চাউনি—তিনটিকে পরস্পর থেকে আলাদা রাখতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে নসু যে যা সে দেখেছে সেটা দেখতেই যেন আরও মন দিয়ে প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে যায়, তারপর দৌড়ে দেওয়ালের কাছে গিয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে বাঁ দিকে চেয়ে নেয়, তাদের ওয়ার্ডের পেছন দিকে তিন নম্বরের পায়খানার পেছনেই, ইলেকট্রিকেব কাজের মস্ত লম্বা একটা মই দেওয়ালে লাগানো. এত লম্বা যে দেয়ালটার মাথাব উপরেও হাতখানেক বেড়ে আছে, চারপাশে কোথাও কেউ নেই, ঠিক এখনই নসু এখানে পেচ্ছাপ কবতে না এসে যদি তাদের ওয়ার্ডের পেছন দিকটাতে যেত তা হলে দৌড়ে গিয়ে মই বেয়ে দেওয়ালের উপব উঠে লাফিয়ে নীচে নামলে কেউ দেখবার নেই। দেওয়ালের ও দিকে বা তিন নম্বরের ছাতে বা কোথাও কোনও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি থাকতে পারে, নসু ছুটে গিয়ে মই বেয়ে উঠলে তারা কিছু করতেও পারবে না। কিন্তু নসু যাতে ছোটে আর মই বেয়ে উঠে পালাতে পারে তার জন্য এমন নিরালায়, এমন অসম্ভব সুবিধেজনক জায়গায়, পাহারাহীন এত দীর্ঘ মইটি রেখে দেয় কেন।

—এই নসুদা, কত পেচ্ছাব করছ। শুনে, থুথু ফেলে, প্যান্টের বোতাম আটাকতে আটকাতে খেলাব মাঠের দিকে ছুটতে ছুটতে নসু ভাবে, দেওয়ালের উপরে ফ্লাড লাইট বসাতে আব থামের আলোর লাইন ঠিক করতে গত তিনদিন ধরে কি মইটি সারাদিন ধরে এমন নিরালায় পাহারাহীন পড়ে থাকছে।

খেলা শুরু হয়ে যায়। নেটের দুই ধারে কোর্ট ভর্তি এতগুলো ছেলে কোর্টের সীমানার ভেতব বলের গতির সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত ঘুরছে, নাচছে, টলছে, বেঁকছে। বলটা যেন নৃত্য পরিচালকেব হাতের কাঠি. যাতে এই এতগুলো ছেলের গতি নিয়ন্ত্রিত। নসু লম্বা, পাতলা, নেটে খেলে। চাপা প্যান্ট, গোলগলা গেঞ্জিতে নসু যখন লাফিয়ে ওঠে তখন নেটের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওর মাথা পৌঁছায়। বাঁ হাত ছড়িয়ে দিয়ে ডান হাতটা তুলে ডান হাতের আঙুল থেকে ডান পায়ের আঙুল পর্যন্ত একটা তীব্র বক্ররেখা তুলে চাপা নসুর বল তুলতে বিপরীত দিকে কুমার বসে পড়ে আর দু হাতের দশ আঙুলে বলটা তুলে দেয়। কুমার বেঁটে, হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে খেলছে। প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ও খুব সুন্দর বল তোলে। বলটা উঠে এক কোণ তৈরি করে নসুদের দিকে মাঝখানে একটা অনির্দিষ্ট জায়গায় পড়তে থাকে। আকবর বলটা তুলতে ছুটে যায় কিন্তু শিবু এসে পড়ায় হুমকি খেয়ে সরে যায়। শিবু বলটা ঠিক মতো ধরতে পারে না। তার হাত থেকে পিছলে পেছনে যায়, পেছন থেকে বলটা টেনে মারে বিমলেন্দু। কিন্তু বিজু বলটা আর তুলতে পারে না। বলটা বাইরে ছুটে যায়। আকবর হাঁটুর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শিবুর উপর খেঁকিয়ে ওঠে, 'পারবি না তো ধরতে এলি কেন?' ততক্ষণে একেবারে নেট ঘেঁষে কার্তিকের সার্ভিসের বল থার্ড লাইনে রঞ্জুর নাকের উপর এসে পড়ে। নাক বাঁচাতে রঞ্জু দুই হাত সামনে মেলে ধরে। কার্তিকের সার্ভিস তোলা খুব মুশকিল, এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় এসে বলটা পড়ে। এক ভরসা, নেট ঘেঁষে আসে বলে প্রায়ই নেটে লেগে যায়। কার্তিক দ্বিতীয় সার্ভিসটা করতেই নসু দু হাত মাথার উপরে তুলে দিয়ে নেটের কাছাকাছি উঠে যায় আর তার তালুতে লেগে বলটা হঠাৎ বেঁকে কার্তিকদের দিকে সেকেন্ড লাইনের বাঁ কোনায় মানুর হাতের ভেতর

গিয়ে পড়ে। মানু হকচকিয়ে বলটাকে একটুখানি মাত্র তুলে দিতে পারে। বলটা প্রায় মাটি ছোঁয় ছোঁয়। কিন্তু কুমার মাটিতে শুয়ে পড়ে তার দশ আঙুলে বলটাকে নেটের উপর তুলে দেয়। বলটা ঠিক নেটের উপর পড়ে একটু টলে যায়, তারপর নসুদের দিকে পড়ে। সেকেন্ড লাইন থেকে এগিয়ে এসে শিবু বলটা একবারেই তুলে দেয়। লাফিয়ে শিবুর তোলা বলের উপর চান্দু আঙুল ছোঁয়াতেই নেট গড়িয়ে বলটা নসুদের দিকে পড়তে থাকে। ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে নসু বলটা তোলার চেষ্টা করে। বলটা পেছন দিকে চলে যায়। আসলে কাঞ্চাকে তুলতে দেওয়া উচিত ছিল। পর পর তিনটি পয়েন্ট নষ্ট, টেন-সেভেন। কোর্টের বাইরে থেকে বলটা তুলে আনতে গিয়ে নসু দেখে টুবলা, জয় আর ভোম্বল দাঁড়িয়ে। ওদের দেখা, বল আনতে ছুটে যাওয়া, বলটা তোলা—প্রায় ওদের পায়ের কাছ থেকে, তুলে দাঁড়িয়ে আবার ওদের দিকে তাকানো, তাকিয়ে থাকা আর তারপর বলটা নিয়ে ছুটে আসতে আসতে নসু সহসা বুঝে ফেলতে পারে, ওরা আজকে এসকেপ-অ্যাকশন করবে। বলটা ও দিকে কার্তিককে ছুড়ে দেওয়ার আগে মাটিতে ড্রপ দেয়। সার্ভিস করার জন্য কার্তিক বলটা নিয়ে সার্ভিস লাইনে যায়। কার্তিকের বাঁ হাতের তালুর উপরে বল। ওরা আজকে নিশ্চয়ই এসকেপ-অ্যাকশন করবে। নসু কোমর একটু ঝুঁকিয়ে লাফিয়ে ওঠার জন্য তৈরি হয়। কার্তিকের আগের সার্ভিসটা ও যখন ফিরিয়ে দিয়েছে কার্তিক তখন এবার একটা গোলমাল নিশ্চয়ই করবে। টাইমিংটা আসল কথা। নসু কার্তিকের চোখের দিকে তাকায় না, তাকিয়ে থাকে বলটার দিকে। যে মুহূর্তে কার্তিকের খালি হাতটা দেখা যাবে, যে মুহূর্তে বলটা শূন্যে উঠে আসবে, সেই মুহূর্তে যদি লাফিয়ে ওঠা যায়, তা হলে নেটের ওপরে বলটাকে ঠিক ধরা যায়। যে দিন থেকে কার্তিকের সার্ভিসের কায়দা ধরতে পেরেছে নসু, সে দিন থেকেই সার্ভিসের পালটা মার আয়ত্ত করছে। তাই কার্তিক আর নসু কখনও একদলে খেলে না। নসু বুঝেছে টাইমিংটাই আসল। তিনদিন ধরে ইলেকট্রিক লাইনের কাজ হচ্ছে, তিনদিন ধরে লম্বা মইটা সারাদিন ধরে এ-দেওয়ালে ও দেওয়ালে লাগিয়ে রাখা হচ্ছে, তিনদিন ধরে নিরালায় নিরালায় সেপাইহীন মই দেওয়ালে হেলানো পড়ে থাকছে—অথচ একটাও এসকেপ-অ্যাকশন হয়নি কেন, ওটাই আশ্চর্য। কার্তিক সার্ভিস করে, টেনিসবলের বেগে বলটা কার্তিকের সোজা লাইন ধরে নেটের দিকে ছুটে আসে, নসু গোলকিপারের মতো দুই হাত মাথার উপর তুলে কোনাকুনি উঠে যায়, নসুর আঙুল প্রায় ছুঁয়ে থার্ড লাইনে গিয়ে রঞ্জুকে ধরাশায়ী করে। হেসে ফেলে নসু হাত তুলে কার্তিককে বাহবা দেয়। দারুণ মেরেছে, ভাবা যায় না। কবজিটা এমন ঘুরিয়েছে যে ওর সরলরেখায় বলটা এসেছে। বাহবা। ইলেভেন-সেভেন। কিন্তু ওরা কি তা হলে এখনই অ্যাকশন করবে। এখনও কি মইটা লাগানো আছে। ওরা কি এখন স্লোগান দিয়ে 'র‍্যাশ্' করবে মইয়ের দিকে। যদি করে, সেটাই তো সবচেয়ে ভালো হয়। টাইমিংটাই আসল কথা। কিন্তু ওরা এখন ছুটে গেলে সবাই হয়তো বুঝবে না অ্যাকশনটা কী, সবাই নিজের নিজের পজিশন নিতে পারবে না। অ্যাকশনের সময় পজিশনটা আসল। কার্তিকের দ্বিতীয় সার্ভিস নেটে ঠেকে যায়। সেভেন-ইলেভেন। বলটা এ দিকে আসতে ও রঞ্জুর হাতে যেতে যেতে হাতের তালু দিয়ে নসু একবার মুখটা মুছে নিতে নিতে তাকিয়ে দেখে ওদের তিনজন আর দাঁড়িয়ে নেই। রঞ্জুর সার্ভিস দেখতেই যেন নসু ঘাড়টা অত তৎপর পেছনে ঘোরায়, হ্যাঁ, ওরা তিনজন পজিশন নিয়েছে। টুবলা যেন খেলা দেখার জন্য রঞ্জুর পেছনে কোর্টের উত্তরে দুই নম্বরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে। জয় যেন খেলা দেখার জন্য আকবরের পাশে চার নম্বরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে। ভোম্বলকে দেখা যাচ্ছে না। রঞ্জু সার্ভিস করেছে। থার্ড লাইনে বিকাশবাবুর কাছে গিয়ে বলটা পড়ল। পয়েন্ট। এইট-ইলেভেন। বিকাশবাবুর পেছনে ভোম্বল দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। তার মানে টুবলা প্রথমে সাইন দেবে, জয় প্রথম অ্যাটাক করবে আর ভোম্বল খেলোয়াড়দের সবাইকে অ্যাকশনে নিয়ে যাবে। কিন্তু অ্যাকশন স্কোয়াডটাতে আর কারা কারা আছে, নাকি ওরা তিনজনই মাত্র। বাইরে হলে মাত্র তিনজনে কোনও বড়ো অ্যাকশন করা যেত না। 'জেলের ভেতরে আর বাইরে লড়াইয়ের কায়দা একই।' জেলের ভেতরে সুবিধে আছে—কাউকে রিক্রুট করতে হয় না, পালাতে হয় না, দুজন মিলে—এমনকি একজনও কোনও অ্যাকশন শুরু করে দিলে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়ে সকলের উপর, কারণ পুলিশ সকলকেই আক্রমণ করে। সুতরাং নিজেদের স্কোয়াড বানাও আর অ্যাকশন চালাও—এই নীতি জেলখানায় চালানোর সুবিধে অনেক বেশি। এদের স্কোয়াডে আর

কে কে আছে বুঝে নিতে সবার মুখের উপর দিয়ে নসু নিজের চোখ ঘুরিয়ে নেয় দ্রুত—এত দ্রুত যাতে ওরা তিনজন বুঝতে না পারে যে সে বুঝেছে। মানুর তোলা বলে চান্দু চাপ মারে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে নসু বলটা কাঙ্গার দিকে ঠেলে দেয়, কাঙ্গার নেটিংয়ের উপরে ইন্দ্রজিৎতের চাপের উপরে লাফিয়ে উঠে নসু মারে, কুমার মাটিতে শুয়ে দশ আঙুলে বলটা ঠিক নেটের উপরে তুলে দেয়, শিবু আবার নেট করে। পয়েন্ট নাইন-ইলেভেন। গেটের সেপাই রাইফেলের উপর ভর দিয়ে খেলা দেখছে। ইন্দ্রজিৎদের দিকে কোর্টের বাইরে দু-চারটে সেপাই এসে দাঁড়িয়ে। জেল গেটের জানলায়, দূরে বেশ অনেকগুলি মুখ। অত দূর থেকে তো খেলা দেখতে পারা সম্ভব নয়। তাহলে কি পুলিশও পজিশন নিয়েছে। এখন এই নেটটার দু পাশে বল নিয়ে খেলা চলছে। আর মাত্র কিছুক্ষণ পর বা যে কোনও মুহূর্তে; কোনও নিরালায় রাখা মইটা নিয়ে আর একরকম খেলা শুরু হবে। সেই খেলার জন্য যে যার মতো পজিশন নিয়ে নিয়েছে। নির্মলের বলটার উপর নসু লাফিয়ে উঠতে পারত, কিন্তু সে বিজুকে বলটা ছেড়ে দিল। বিজুর তোলা বলটার উপর শিবু লাফিয়ে উঠল আর বলটা গিয়ে পড়ল ইন্দ্রজিৎ আর চান্দুর মাঝখানে এমন জায়গায় যে কুমার দৌড়ে এসেও বলটা তুলতে পারল না। পয়েন্ট টেন-ইলেভেন। কুমার সবচেয়ে ভালো তুলতে পারে কিন্তু তার জন্য ওর অন্তত পজিশন নেওয়াব সময়টুকু দরকার। রঞ্জু সার্ভিস করছে। কিন্তু টুবলা আর জয় যেমন অদ্ভুত জায়গায় একা একা দাঁড়িযে আছে তাতে তো যে দেখবে তারই সন্দেহ হওয়া উচিত খেলা দেখাটা ওদের কাজ নয়। তা হলে কি এই যারা খেলছে তাবা প্রত্যেকেই বা অনেকেই জানে ও তাদের পজিশন ঠিক করা আছে। তা হলে কি নসুরই পজিশন ঠিক করা নেই। তা হলে কি এই সেপাইরাও সব জেনেশুনেই নিজেদের পজিশন নিয়েছে। বিকাশবাবু নতুন খেলা শিখছেন, ফলে ওঁর বল খুব এলোমেলোভাবে আসে। কুমার নেট করলে কাঙ্গা আবার তুলে দেয়। মানু খুব উঁচুতে বলটা উঠিযে দিলে সেটা এ দিকে বিমলেন্দুর মাথাব উপর পড়তে থাকে। বলটা আউট হবে বলে বিমলেন্দু ক্রমেই পেছনে সরতে সরতে শেযে ছেড়ে দেয়। বলটা লাইনের বাইরে গিয়ে পড়ে। 'ডিসিশন!' বলে টুবলা হাততালি দিতেই নসু এত চমকে ওঠে—তাহলে কি শুরু হয়ে গেল—যে তার আর দেখা হয়ে ওঠে না আর সবাইও অমন চমকে উঠল কি না। ইলেভেন অল—রঞ্জু সার্ভিস করছে। কোর্টসুদ্ধ লোক রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে। বলটা রঞ্জু কেমনভাবে, কোথায় পাঠায় তাব উপর পুরো খেলাটা নির্ভর করছে। রঞ্জুর সার্ভিসটা সবাইকে তাদের ঠিক ঠিক পজিশনে নিযে যাবে। যদি বঞ্জু ভুল স্টার্ট দেয়, তাহলে সবটাই পণ্ড, খেলাটাকে আব বাঁচানো যাবে না। জয় সিগন্যালে থাকলে ভালো হত, ওর মাথা খুব ঠান্ডা, হড়বড় করত না। টুবলা কখনওই টাইমিং বুঝতে পারবে না। ও ঠিক একটু আগে সিগন্যাল দেবে। কিন্তু ওরা কি বুঝতে পারেনি জেল কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে গেছে। এর আগেও তিন-তিনটি এসকেপ-অ্যাকশন আগে থাকতেই ফাঁস হয়ে গেছে বলে কিছু করা যায়নি। কিন্তু যদি সত্যিই কর্তৃপক্ষ জানতে পারত তাহলে কি আগের বারগুলো যেমনি, তেমনি আরও আগে থাকতেই ব্যবস্থা করত না? তা হলে কি এ রকম খোলা নিবালা মই রেখে দিয়ে সেপাইবা ভলিবল খেলা দেখত? সাইড আউট, ইলেভেন অল। আবার কার্তিক সার্ভিস করছে, নসু দুই পা ফাঁক করে যে কোনও পজিশনে মারার জন্য তৈরি হয়ে যায়। কার্তিক যদি আবার সোজা লাইনে মারে, তাই, নসু দু-পা পেছিয়ে বাঁযে সরে যায়। এখান থেকে তা হলে সোজা ড্রাইভ করা যাবে না, ডান হাত দিয়ে বলটাকে ঝাড়তে হবে। কার্তিকের বাঁ হাতের তালুর উপর বলটা টলটল, আর কার্তিক ডান হাতটা মেলে ধবে শরীবটা দোলায়। দু-কোর্টের বাকি সব খেলোয়াড় যেন খেলা দেখছে। কার্তিকের হাতে সার্ভিস গেলেই সেটা কার্তিক আর নসুর খেলা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ যদি জেনেশুনেও এসকেপ অ্যাকশনটা ঘটতে দেয়, যাতে নিজেদের ইচ্ছেমত পালটা অ্যাকশন নিতে পারে। অথবা। আর। অথবা। আর। ফাঁস হয়ে গেছে জেনেও টুবলারা যদি ইচ্ছে করে অ্যাকশনটা ঘটায়—যাতে, সবাইকে এই অ্যাকশন দিয়ে বেঁধে ফেলা যায়, নইলে বড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। তা হলে কি জেল কর্তৃপক্ষ আর টুবলাদের ভেতর একটা অজ্ঞাত বোঝাপড়ায় অ্যাকশনটা ঘটতে যাচ্ছে। পালটা অ্যাকশন নেওয়া যাবে বলেই যে অ্যাকশন ঘটতে দেওয়া, পুলিশ অ্যাকশনের সামনে সবাই লড়াইয়ে সংগঠিত হয়ে উঠবে বলেই যে অ্যাকশন ঘটানো, সে অ্যাকশনে নসুর পজিশন কোথায়। কার্তিকের বলটা নেট ছুঁয়ে ধনুকের মতো গোলাকৃতি বেঁকে

যায় আর নসু প্রায় পেছন দিয়ে লাফিয়ে উঠে হাতের পাঞ্জা খাড়া রেখে বলটাতে এমন খাড়া মারে, যে ইন্দ্রজিতের মুখের উপর গিয়ে বলটা পড়ে, পেছন থেকে কার্তিক বলটাকে তুলে দিলে ইন্দ্রজিৎ নেট করতে পারে, তার উপর খ্যাপা আক্রোশে লাফিয়ে উঠে নসু চাপ মারে। সাইড আউট। কথা নেই বার্তা নেই, যার ইচ্ছে সে অ্যাকশন শুরু করবে আর নসুকে তার হ্যাপা পোয়াতে হবে। এখানে সবাই জানে এখনই একটা অ্যাকশন হবে, যে সে অ্যাকশন নয়, এসকেপ অ্যাকশন, কজন পালাতে পারবে কে জানে, ফিরে কে কে ধরা পড়বে—তাই বা কে জানে, যারা জেলের ভেতরে থাকবে তাদের তখন প্রাণান্ত অবস্থা। তা হলে কেন এখন সবাই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছে না, আমরা এই অ্যাকশনে নেই। কেন নসু বলে দিচ্ছে না। সে তো সেই কখন থেকে এড়িয়ে যাচ্ছে, পাছে জয় ভোম্বল টুবলা কিছু বলে ফেলে। না। নসু মিস্তিরি কারও অ্যাকশনের হ্যাপা পোয়াতে পারবে না। এ দিকে রঞ্জুর একটা সার্ভিস নষ্ট হল। ইলেভেন অল, আবাব কার্তিকের সার্ভিস। আবার দুই পা দুই হাত ফাঁক করে কারও উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেন তৈরি। নসুর লম্বা রোগা শরীরের প্রতিটি পেশি টানটান। লম্বা ঘাড়ের উপর একমাথা চুলে ভারী মাথাটা পিঠের সঙ্গে একটা কোণ তৈরি করেছে। কার্তিক সার্ভিসের জন্য হাতের তালুতে বল রেখেছে, ডান হাতটাকে সে নাড়াচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে সার্ভিস করবে। সার্ভিসের লাইন ভাবছে। এই সার্ভিসটা ঠেকিয়ে, পারলে জেতার একটা চান্স নিতে হবে। কিন্তু টুবলারাই বা কী করবে, যদি তিনদিন ধরে একটা দেওয়াল টপকানো মই সারাদিন চোখের সামনে থাকে। যেন এসকেপ অ্যাকশনের নেমন্তন্ন। না। নসু ব্যাপারস্যাপার না বুঝে এগোবে না। এখন, যখন কার্তিক সার্ভিসের বল তাওয়াচ্ছে তখন এই দুই কোর্টের সবাই জানে খেলাটা যেন নসু আর কার্তিকের ভেতরই। কার্তিক সার্ভিস করল। নসু লাফিয়ে উঠল। আর আকাশমুখো অতগুলো খেলোয়াড়ের ভেতর থেকে ছুটে ওঠে, শূন্যে, নসু বাঁ পায়ের আঙুল থেকে মাথার উপরে তোলা বাঁ হাতের আঙুল পর্যন্ত সামান্য ভাঙচুরেব একটি সরলরেখায় আর ডান হাঁটুর একটি কোণে শূন্যে, মূর্তিতে স্থির হয়ে যায় আর ডান হাতের পাঞ্জাব উলটো মারে বলটাকে নেট-পার পাঠাবার তীব্রতায়, শূন্যে, সেই মূর্তি খান-খান ভেঙে যেতে থাকে, তখন, শূন্যে, মূর্তিভাঙা পাথরের ছিটকে যাওয়ার বেগে নামতে নামতে নসু, শূন্যে, শুনতে পায়—টুবলার চাপা চিৎকার। মাটিতে পড়েই ঘুরে, নেটের দিকে পেছন ফিরে, ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে, হাত পা শরীর থেকে সরিয়ে, যেন ও দিক থেকে এবার কার্তিকের সার্ভিস, নসু দেখে মইটা ঝুলিয়ে নিয়ে আসে যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া মই জয়ের হাতে, মইটা ছেড়ে দিয়ে মিস্ত্রি আর মইটা কেড়ে নিয়ে জয় বিহ্বল দাঁড়িয়ে, চারপাশে চকিত স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে দিয়ে, হাত ঝুলে পড়া খেলোয়াড়দের মূর্তিগুলোর ভেতর দিয়ে দিয়ে পথ করে ক্রমঘন ধপধপ শব্দে ড্রপ খেতে খেতে বলটা জয় আর মইয়ের দিকে, তারপর, দেওয়ালের দিকে তারপর, দেওয়ালের দিকে চলে যেতে যেতে নসুও মনে পড়িয়ে যায়, এই অ্যাকশন তার নয়, সে এই অ্যাকশন স্কোয়াডে নেই, যে জানেও না প্ল্যান কী, যে যার মতো অ্যাকশন করবে আর হ্যাপা সামলাবে নসু মিস্তির, মাত্র কয়েক পা বাঁয়ে সরে গেলে নসুর ওয়ার্ডের দরজা, তার পাশে দাঁড়িয়ে অ্যাকশনটা দেখা যায়, তারপর অবস্থা বুঝে নিঃশব্দে ওয়ার্ডের ভেতরে বা ছুটে মই বেয়ে দেওয়ালের উপরে ও টপকে বাইরে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু অত বড়ো মইয়ের মাথাটা ধরে জয়ের বিমূঢ়তায় নসুকে সহসা বুঝে ফেলতে হয়, মইয়ের মাথাটাই শুধু দেখা যাচ্ছে, বাকিটা চার নম্বরেব আড়ালে, নিশ্চয়ই ও মাথার মিস্ত্রি মই ফেলে পালিয়েছে, অতবড়ো মইটার মাথা ধরে জয় তাই বিমূঢ় দাঁড়িয়ে, এই সময়টা চলে গেলে একজনও বেরতে পারবে না, টাইমিং আর পজিশনটাই আসল, তার পক্ষে দ্রুত দীর্ঘতম পা ফেলে ছুটে যাওয়ায় নসুব কোমরের নীচের অংশটা উপরের অংশের তুলনায় কত দীর্ঘ, ভলি কোর্টের চৌহদ্দিতে বাঁধা খেলোয়াড়েরা বন্দুকের শব্দে ঝাঁক বেঁধে পাখি ওড়ার আকস্মিকতায় ছুটে যায়, ভলি খেলার চারপাশ জুড়ে কোথায় সেপাই, কোথায় কয়েদি, যেন কোনও ফারাক নেই, যেন এক খেলা ঘিরেই সবার সংসার, যেন এই জেলখানার মিলিত সংসার, শুধু নসুর সন্দিহান চোখে ধরা পড়েছিল টুবলা জয় আর ভোম্বল, গেট আর ছাতের সেপাইরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে, আর এখন মুহূর্তের মধ্যে নসুরা সবাই একদিকে ছুটে যায়, সেখানে দেওয়ালের আড়াল থেকে সবাই আক্রমণ চালাতে পারবে আর দেয়ালে মই,

আটকে একের পর এক টপকানো যাবে, নসুদের সমস্ত দলটা মইটাকে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে দেয়, অতগুলো মানুষের পায়ের ভারে মইটা দোলে—দেখতে দেখতে মইয়ের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি তাকেই একজন করে দাঁড়িয়ে; নসু তখন নীচে চার নম্বর আর দেয়ালের মাঝখানের ফাঁকটাতে ব্যারিকেড বানাবার জন্য ওয়ার্ডের ভেতর থেকে খাট আনতে হুকুম দিচ্ছে, খাট এসে যায় আর হাতে হাতে অ্যালুমিনিয়মের থালাকাটা ছোরা বিলি হয়ে যায় আর ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যারিকেড বানাতে হাতে ছোরা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নসু দেখে সবচেয়ে উপরে টুবলা দেওয়ালের মাথায়, একটা গভীর লাফ দেয়ার জন্য টুবলা দেওয়ালের উপর বসে পড়ে, ঝপ, চারটে খাটের দেওয়াল উঠে যায়, সামনে গেটের মাথায় সান্ত্রির হাতে রাইফেল, অথচ ঝপ, ঝপ, ঝপ, এসকেপ ঘটে যাচ্ছে অথচ জেল কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু করছে না, তবে কি তবে কি 'নসু, তুমি পালাও, নসু, ডোন্ট বি ইডিয়েট' পাশে বিমলবাবুর গলা, নসু ছুটে গিয়ে মইয়ের গায়ে হাত দেয়, মইয়ের তাকে পা দেয়, একজন সাব-ইনস্পেক্টর-সহ পাঁচটা মার্ডার আর দুটো আর্মস ছিনতাই, নসুকে ওরা কোনওদিন ছাড়বে না, মই বেয়ে নসু তরতর উঠে যায়। এমন বাধাহীন, তবে কি ওরা নসুদের পালাতে দিচ্ছে, ইচ্ছে করে, তবু নসুকে উঠে যেতে হয়, আর একটা হুইসলের শব্দেই চৌকির আর জলের ড্রামের ব্যারিকেড ভেঙে যায়, নসুর মাথার উপরে অর্ধেকটা মই এখনও, নসুদের কি ওরা পালাতে দিচ্ছে, তা হলে নসু পালাবে না, মইটা দুলে ওঠে, তিন-চারজন সেপাই মইটা টেনে নামাতে চেষ্টা করছে আর বিমলবাবুর লিডারশিপে এরা বাধা দিচ্ছে। নসুকে ও নসুর নীচে আরও কজনকে নিয়ে মইটা দোলে, নসু দুই হাতে, মইটা চেপে ধরে, নীচে তাকিয়ে দেখে আরও কজন সেপাই এসে মইয়ের গোড়া ধাক্কায়। বিমলবাবুর হাত একবার আকাশে, তারপর সামনে সেপাইটার পেটের ভেতরে, ছুরিটা আমূল বিঁধে গেলে সেপাইটা মইয়ের গোড়ায় পড়ে, নসুর ঠিক নিচের ছেলেটি মই থেকে ছিটকে যায়, নসুসহ মইটা দেওয়াল থেকে ডানদিকে, ভলিখেলার কোর্টের আঙিনার দিকে ধীরে ধীরে হড়কায়, হড়কায়, হড়কায়। যেই মইটা হুড়মুড় পড়ে যেতে থাকে, নসু উপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়েই ডান পায়ের গোড়ালি দুই হাতে ধরে মাটিতে গড়িয়ে যায়, মচকে গেছে, 'বিমলবাবু, মইটা টেনে নিন, টেনে নিন' চিৎকারে বিমলবাবু মইয়ের গোড়ায়, মইয়ের গোড়ায় বিমলবাবুর হাতে, মইয়ের মাথা সেপাইদের হতে, টাগ অব ওয়ার, নসু গোড়ালি ছেড়ে মই ধরে ঝুলে পড়ে, 'বিমলবাবু, ওদের পেছন থেকে কোনও অ্যাটাক চালান, নইলে পারবেন না' আকবর আর-কজন তিন নম্বরের পেছন দিয়ে ছুটে যায়, ছাতের সান্ত্রির হাতে রাইফেল ছিল, ভলিখেলার কোর্ট ঘিরে সেপাইরা পজিশন নেয়, নসু এতক্ষণে যেন নিশ্চিত যে তখন সেপাইরা পজিশনে ছিল, তিন দিন ধরে সারাদিন এমন খোলামেলা মই, তবে কি, তবে তো, তবে তো সরকার তাদের পালানোর অ্যাকশন করতে দিচ্ছে, তবে তো এ অ্যাকশন নসুর নয়, হয় টুবলার, নয় সরকারের, যার অ্যাকশন সে বুঝুক, নসু কেন সামলাবে, নসুর কেন গোড়ালি মচকাবে, সেপাইরা মইটা অনেকটা টেনে নিয়ে যেতে পারে, আকবর এখনও কেন রেয়ার অ্যাকশন করে না, ইট তো গেল, কী দিয়ে অ্যাকশন করবে, ইটপাটকেলও তো জড়ো করা নেই, 'স্কোয়াড বানাও অ্যাকশন করো', একটা অ্যাকশন করলেই সবাইকে জড়িয়ে পড়তে হবে', জড়িয়ে তো পড়তে হবে কিন্তু তখন দরকার মতো একটুকরো ইটও পাওয়া যাবে না, কে কাকে জড়ায়, চোখের সামনে এতগুলো এসকেপ ঘটে যায়—অথচ জেলকর্তৃপক্ষ পালটা আক্রমণে এত দেরি করে কেন, প্রাণপণে টানতে টানতে ওরা মইটা নিয়ে চার নম্বরের দেওয়ালে আশ্রয় নেয়, কার লড়াই লড়ছে নসু—টুবলার, জেলারের, না তার—সে জানে না, মইটাকে আপাতত টেনে আনতে হবে, সেপাইয়ের দলটা টিউবওয়েলের পারে পৌঁছে গেছে, চার নম্বরের দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে নসুরা মই টেনে রাখছে, মই টানাটানি করতে করতে নসুদের কি ওরা খোলা মাঠে নিয়ে যেতে চায়, হয়তো খোলা মাঠে রাইফেল নিয়ে সারি দাঁড়িয়ে, আর নসুরা বেরনো মাত্রই ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলি আসবে, সুতরাং কোনওভাবেই চার নম্বরের দেওয়ালের আড়াল ছাড়া হচ্ছে না, হবে না, জীবন দিয়েও মইটা ধরে রাখতে হবে, কিন্তু যদি সেপাইরা মইটা ছেড়ে দেয়, এখন তা হলে সেই মই নিয়ে কি আবার দেয়াল টপকানো হবে, আবার দেওয়াল টপকানো হবে কি যখন নসু জানে না দেওয়াল টপকানো অ্যাকশনটা কার, সরকারের না টুবলার না আর কারও, হঠাৎ সেপাইরা মইয়ের ওই

মাথায় থু থু করে থুতু ছিটিয়ে মইটা যেন ছেড়ে দেয়, বিমলবাবু নসুসহ অন্যান্যরা মইটা খানিকটা টেনে আনতেই আবার সেপাইরা টানতে থাকে, টানতে থাকে আর থু থু করে, তা হলে আকবর রেয়ার অ্যাকশন শুরু করেছে, আকবর সেপাইদের লক্ষ করে কিছু ছুড়ছে, ঢিল নয়, ঢিল পাবে কোথায় তবে হঠাৎ একটা গন্ধ পাওয়া যায়, আকবর তা হলে ওদিক দিয়ে গিয়ে দু নম্বরের পায়খানার ময়লা ছুড়ছে, সেই মযলার আক্রমণের সামনে আর না পেয়ে সেপাইরা এক সঙ্গে একটা হ্যাঁচটা টানে বেশ খানিকটা টেনে নিয়ে মইটাকে টিউবওয়েলের মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ওদিককার দেওয়ালের আড়ালে সরে যায়, আর এটা যেন হাড়ুড় খেলা, অপর পক্ষে খেলোয়াড় লাইন পেরতে না পেরতে তার পেছনে ধাওয়া করতে হবে, সেপাইরা যদি টিউবওয়েলের মাথায় মইটা আটকে দেয় তবে এই মুহূর্তে গিয়ে সেটা খুলতে হবে, যান্ত্রিক নিয়মে মই থেকে নসুর হাত খুলে যায়, চাপা স্বরে বলে, 'টেনে নেবেন'। দুই হাতে দেওযাল আঁকড়ে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নেয় ভলিখেলার কোর্টের ও দিকে কোনও রাইফেল আছে কি না, থালাকাটা ছোরা একটা বিমলবাবু পেছন থেকে নসুর হাতে গুঁজে দেন, না তাকিয়েই হাতটা নসু মুঠো করে ধরে, তারপর একটা পা বাড়িয়ে দেয়, মইটাকে আনুভূমিক বাঁ হাতে রেখে, ডান দিকে সম্পূর্ণ খোলা মাঠ রেখে টিউবওয়েলটার দিকে ছুটতে শুরু করা মাত্র নসুর মনে পড়ে তার ডান গোড়ালি মচকে গেছে, নসু বুঝতে পারে সে ছুটতে পারছে না, কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় নেই, ডান হাতের মুঠোয় ছুরিটা সবাইকে দেখিয়ে ধরে, নসু ডান দিকে তাকিয়ে খোলামাঠে একটা নির্জন ভলিনেটের ওপারে জালিকাটা আকাশ থেকে গেটের উপরে সান্ত্রির হাতে রাইফেল পর্যন্ত চোখে ঘুরিয়ে ডান পা-টাকে নেহাত যতটুকু নইলে নয় ব্যবহার করে, চল্লিশ ফুটি মইয়ের মাথার দিকে চলে, ডান গোড়ালি মচকে যাওয়ার শরীরে সেই ছন্দ আর গতিটুকু আসে না যাতে কোথাও থেকে ছুটে আসা বিভলভারের বা রাইফেলের গুলি এড়ানোর আত্মবিশ্বাসটুকু অন্তত কার্যকর হয়, ফলে নসুর কী করুণ চল্লিশ ফুটি দীর্ঘযাত্রায় ল্যাংচানো ডান দিকের এত শূন্য মাঠ, বাঁ দিকে দেওযাল, সামনে ও মাথার উপরে সেপাইদের হাতে লাঠি ও রাইফেল, পেছনে বন্ধুদের হাতে অ্যালুমিনিয়ামের থালাকাটা ছুরি আর পায়খানার ময়লা, মই বেয়ে বেয়ে নসুকে একই সমতল পেরোতে হয়, নসু তো মাত্র কয়েক মিনিট আগেও জানত, এ অ্যাকশন আর অ্যাকশন নয়, এ লড়াই তার লড়াই নয়, নসু তো মাত্র কয়েক মিনিট আগেই দেখেছে ভলিখেলার কোর্টের চারপাশে সেপাইরা পজিশন নিয়েছে, নসু তো এইমাত্র দেখেছে পজিশন নেওয়া সত্ত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ গুলি করেনি, আক্রমণ করেনি, নসু তো এইমাত্র জেনেছে যে এ লড়াই তার লড়াই নয়, এ অ্যাকশন তার অ্যাকশন নয়, স্কোয়াড বানাও অ্যাকশন চালাও, সে স্কোয়াড বানায়নি, সে অ্যাকশন চালায়নি, অ্যাকশন করলেই সবাই জড়িয়ে পড়বে, নসু জড়িয়ে পড়েছে, এই অ্যাকশনে, এই তো সে জড়িয়ে পড়েছে, এই তো সে মইয়ের মাথাটা খুলতে যাচ্ছে, মইয়ের মাথাটা যখন সোজা হবে, মইটা যখন একদিকে টিউবওয়েলের মাথা আর একদিকে বিমলবাবুদের হাতে আটকা থাকার বদলে খাড়া থাকবে, দেওয়ালে, তখন নসু মই বেয়ে উঠবে না, কারণ এ অ্যাকশন নসুর নয়, যদিও এখন নসুর পেছনেই মাঠের সবটা, যদিও এখন নসুর সামনে সেপাইদের মুখগুলো, যদিও এখন নসুকে পাকড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে সেপাইরা, যদিও এখন চারদিকের ভেতর নসুই চলছে, আর সব যেন স্থির, আর নসুর সমস্ত চলাটা জুড়ে পাগলাঘন্টির ঢং ঢং ঢং ঢং যেই বেজে যায়, আর হাতের নাগালের ভেতর শত্রু না থাকলেও নসুর হাতের ছুরিটা বাতাসেই বিদ্ধ হয়ে যায়, পারলে যেন নসু তার মাথাটা কাঁধের ভেতর ঢুকিয়ে নিত, কাঁধ দুটো তার এমনই উঁচু হয়ে থাকে, জখমি পা টা নসুকে পেছু টানে, যতটা ছুটতে পারলে তার আত্মবিশ্বাস আসত ততটা সে ছুটতে পারছে না, মাত্র এই চল্লিশ ফুট রাস্তা পেরোতে এত সময় লাগছে কেন নসুর, ও দিকে যে বিমলবাবুরা অপেক্ষা করে, কখন মই খাড়া উঠবে, তারপর মই বেয়ে তারা উপরে উঠবে, দেওয়ালে, তারপর ঝপ ঝপ, কতগুলো ঝপ ঝপ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ তখন শুনতে পেয়েছিল নসু, দুটো না চারটে, মনে হয়েছিল যেন অসংখ্য, টুবলাকে লাফিয়ে পড়তে সে দেখেছে, এক টুবলাকেই সে দেখেছে লাফিয়ে পড়তে, আর কাউকে দেখেনি, আবার এখন মইটার মাথা খুলে দিলে যারা মই বেয়ে উপরে উঠবে, দেওয়ালে, তারপর দেওয়াল থেকে ঝাঁপাবে তাদের কি চিনতে বা শুনতে পারবে নসু, চিনবে কি, শুনবে

কি, এক অ্যাকশনে, যে অ্যাকশন তার নয়, নসু টিউবওয়েলের মাথায় পৌঁছে যায়, বাঁ হাত দিয়ে সে মইটা টেনে তোলার চেষ্টা করে, পারে না, হ্যান্ডেলে আটকে যায়, ছুরিধরা ডান হাতটা দিয়ে চেষ্টা করে, পারে না, তখন ছুরিটাকে দাঁতে চেপে ধরে দুই হাতে মইটাকে টেনে তুলতে গেলে, দেওয়ালের আড়াল থেকে সেপাইটি যান্ত্রিক এসে বাতাসে শিস তুলে লাঠিটিকে নামিয়ে আনে নসুর মাথার উপর, নসু মাথা সরিয়ে নেয়, লাঠিটা পড়ে তার বাঁ কাঁধের উপর, আর নসুকে ছুটে গিয়ে সেপাইটির তলপেটে ছুরি বসিয়ে দিতে হয়, যেন এটুকু করতেই তার এতদূর আসা, সেপাইটি পুরোনো কোনও অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নসুর পায়ের কাছে পড়ে যায়, নসু গিয়ে পেটে ছোরা চেপে, সে ছোরায় নসু রক্তের, নররক্তের স্বাদ পেয়েছিল, দুই হাতে ঝাঁকিয়ে মইটাকে টিউবওয়েলের মাথাটা থেকে খুলে মাটিতে ফেলে দেয়, আর দেখে বিমলবাবুরা মইটা টেনে নিচ্ছেন, মইটা দেয়ালের গায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে গেল আর মই বেয়ে পর পর একজন দুজন তিনজন বা কজন, নসু জানে না কারণ এ অ্যাকশন নসুর নয়, পর পর উঠে গেলে, নসু তখন ফিরতি পথের মাঝামাঝি জায়গায় ছুটছে, নসু তার সম্পূর্ণ মুক্ত পিছন দিকে একটা প্রতীক্ষিত যুক্তিযুক্ত শব্দ যেন শুনতে পায়, আর তারপরই নসুর মাথার বেশ খানিকটা উপর দিয়ে বাতাস গুলিবিদ্ধ হয় আর নসু মাটিতে শুয়ে পড়ে দেখে মইয়ের প্রায় মাথা থেকে গুলিবিদ্ধ পাখির মতো কেউ বাতাস জুড়ে পড়ে যাচ্ছে, আর নসুর দু পাশ দিয়ে, নসুকে মাড়িয়ে, নসুর উপর দিয়ে প্রতীক্ষিত যুক্তিসিদ্ধ পদক্ষেপ সবুট ছুটে যেতে থাকে, পাগলাঘণ্টি ঢং ঢং ঢং ঢং বেজে যায় এই সমবেত পদক্ষেপ জুড়ে, নসু বুকে হেঁটে এগোতে থাকে, মাত্র এক মিনিট বা তার কম সময় আগে এখানে একটা মই ছিল, এখন নেই, নসুর সহকর্মীরা পায়খানার ময়লা ছিটিয়ে রেয়ার অ্যাকশন করেছিল, সেই ময়লায় বুক পেট হাঁটু পা কপাল ঘষে ঘষে ঘষে নসু এগোচ্ছে, তার বাঁ দিকে তখন অস্ত-আকাশের লালিমায় একটি নিঃসঙ্গ ভলিনেট জালি কাটছে; নসু তার ওয়ার্ডের দরজার কাছে গেলে তিন-চারটি বুটজুতো তাকে এক লাথিতে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা উতরে গেলেও প্রথামত লকআপ হয় না। অনেকক্ষণ আগেই কয়েদিদের ভেতরে ঢুকিয়ে তালা দেওয়া হয়েছে। গনতি হয়নি। রাতের খাবার দেওয়া হয়নি।

চার নম্বরে, নসুদের ওয়ার্ডে, ভেতরে বিছানায় মাত্র দু-একজন গেছে। ব্যারিকেড তৈরির জন্য খাট টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত ঘরটা তছনছ হয়েছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে নসু একবার তাকালে, সমস্তটা অপরিচিত ঠেকেছিল, কারণ ঘরের ভেতরের এ অবস্থাটা তার সামনে ঘটেনি। কয়েকটা চৌকি কাত করা—সেগুলোর জায়গাতেই। আর কয়েকটা চৌকি কাত করা পড়ে আছে দরজা দিয়ে বের করে নেওয়ার পথের এ দিকে ও দিকে। অ্যালুমিনিয়মের থালাকাটা একটা ছোরা মেঝের উপর পড়ে—গোপন জায়গা থেকে ওগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় ছিটকে পড়ে গেছে, হয়তো। যে-চৌকিগুলো বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা হচ্ছিল, সেগুলোর বিছানার চাদর, বালিশ, সতরঞ্জি, তোশক ঘরময় ছড়িয়ে। একটা বালিশ ওয়ার্ডের দরজার উপরে পড়েছিল, যাতায়াতের সময়ও কেউ সেটা সরিয়ে দেয়নি। ঘরময় ছড়ানো এই চাদর, বালিশ, তোশকের উপর দিয়েই সবাই যাতায়াত করে। কারা ওয়ার্ডে এসেছে, নসু খুব হিসেব কষে দেখেনি। কাদের কাথাবার্তা থেকে নানারকম খবর তার কানে এসেছে, 'এগারোজন এসকেপ করেছে', 'তিনজন এসকেপ করেছে', 'আচ্ছা কে কে কাকে কাকে দেখেছ হিসেব কষো', 'ও-সব হিসেব বাদ দাও, 'আমাদের কি কোনও ক্যাজুয়ালটি হয়েছে?' 'আমাদের ক্যাজুয়ালটি হয়েছে', 'নসুদাকে তো আমি নিজে দেখেছি রাইফেলের গুলি খেয়ে পড়ে যেতে', 'নসুদার বডিটা নিয়ে এলে হত, নইলে....', 'ডেসট্রয় করে ফেলবে, বল এসকেপ করেছে', 'তাই নাকি'—যেন, নসুকে ক্যাজুয়ালটি ভেবে যুদ্ধটা অনেক বেশি জমকালো হচ্ছে। 'পুলিশ ক্যাজুয়ালটি কত জন 'পাঁচ-সাতজন বটেই', 'সবগুলোই ফ্যাটাল?' 'নিশ্চয়ই', 'কিন্তু আমাদের যারা ঘরে ফেরে নি?' 'তারা এসকেপ করেছে নিশ্চয়ই।', 'যদি না করে থাকে?', 'তা হলে ক্যাজুয়ালটি! ক রাউন্ড গুলি ছুড়েছে, দেখো শেষ পর্যন্ত কত ক্যাজুয়ালটি বেরয়', 'আমি তো প্রথমটা বুঝতেই পারছিলাম না, ওরা ফায়ার করছিল না কেন।', 'বললেই তো আর ফায়ার করা যায় না, তারপর যদি এসকেপ-কেস প্রমাণ করতে না পারে' 'ও-সব বাদ দাও, পুলিশের হাতে রাইফেল থাকলে, ওরা আবার প্রমাণের অপেক্ষা করবে? 'অ্যাসেম্বলি-

পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠতে পারে', 'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, কয়েকটা লম্বা-চওড়া বক্তৃতায় কী এসে যায়, পুলিশের', 'তা হলে ওরা ঠিক তৈরি হতে পারেনি বা অ্যাসেস করতে পারেনি', 'হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে, কিন্তু এর আগের সবগুলো এসরেপ অ্যাকশনের প্ল্যান ওরা আগে থাকতে জানতে পারল আর এইটিই পারল না? এ-কেমন করে হবে?', 'এবার হয়তো প্ল্যানটা খুব ভালো করে ছকা হয়েছিল, আর গ্রুপটাও হয়তো ছোট ছিল, বা হয়তো প্ল্যানটা আজই মাত্র মিনিট পনেরো আগে বা আধঘণ্টা আগে হয়েছে, তাই কেউ টের পায়নি' বা হয়তো খেলতে খেলতে চোখের ইশারায় প্ল্যানটা হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন, ফলে আমরা যেমন টের পাই নি', 'পুলিশও তেমনি টের পায়নি', 'অ্যাকশন করতে হলে এই রকম একেবারে হঠাৎ অ্যাকশনই করতে হয়, তাহলে সাকসেসের সম্ভাবনা বেশি থাকে', 'একেবারে প্রস্তুতি ছাড়া অ্যাকশন তো ফেলও করতে পারে' "কখনওই নয়, যদি তুমি ঠিক বুঝতে পারো জনতা কী চাইছে, 'জনতা' নিজেই হয়তো সেটা জানে না', 'বিপ্লবীর কাজ সেটা বোঝা ও লিড করা', 'চেয়ারম্যান বলেছেন জলের ভেতর মাছের মতন তা হলে তোমার অ্যাকশন শুরু হওয়া মাত্র জনতা সেটা টেক্‌ আপ করবে', 'আজকের অ্যাকশনটা লিড করল কে', 'ফার্স্ট সিগন্যালটা কে দিল সেটাই বুঝতে পারলাম না', 'একটা চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি জয়ের হাতে মই আর নসুদা সেটা টেনে তুলছে', 'নসুদা মই টেনে তোলেনি, নসুদা ব্যারিকেডের অর্ডার দিয়েছে', 'হ্যাঁ, নসুদা ব্যারিকেডের অর্ডার দিয়েছে', 'তা হলে নসুদারই প্ল্যান বোধ হয়, যে-রকম সুইফট-অ্যাকশন, তাই তো মনে হয়', 'এই গবেষণাগুলো বাদ দিলে হয় না? যত পেটিবুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট। অ্যাকশনটাই বড় কথা। কার অ্যাকশন তা দিয়ে কী হবে 'আমরা জিতলাম না হারলাম', 'আমাদের সবসময়ই জিত'।

আলো তীব্র এসে পড়ে ঘরের ভেতর। আলোটা একটা মোটা ধারায় ঘরের প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত যায়, নসু সেই ধারার নীচে পড়ে যায়, নসুর কোথাও আলো লাগে না, কিন্তু আলোর ছটাতে সেও আভাসিত হয়। নসু তাকিয়ে থাকে মাত্র, একটুও নড়াচড়া করে না। এ-সবই তার জানা, অত্যন্ত বেশি জানা। হাত-পা চালাবার অভ্যেসে এসে যায় যে-প্রথা, অর্থবোধহীন মন্ত্রোচ্চারণে এসে যায় যে-প্রথা, তা অনুসরণ করতে যেমন মনের কোনও উদ্যম দরকার হয় না বা শরীরের কোনও উদ্যোগ, তেমনি এখন নসুর শরীরিক-মানসিক উদ্যম-উদ্যোগ নেই। ওই কথাগুলো হয়ে যাওয়ার পরই এমনি আলো এসে পড়ে আর এই আলোতে সমস্ত কথা বন্ধ হয়ে যায়। নসু জানে না অ্যাকশনটা কার। ইচ্ছে করলে জানতে পারত হয়তো টুবলা, জয় আর ভোম্বলের, হয়তো নসুকেও ওরা প্ল্যানে নিতে চাইছিল, নসু কেটে গেল। হয়তো আর কেউও ছিল। নসু শুধু জানে সে অ্যাকশনটার কোথাও ছিল না, এক মুহূর্তের জন্যও ছিল না। কার্তিকের সার্ভিসটা ফেরত পাঠাবার জন্য লাফ দিয়ে উঠে বাতাসে সে টুবলার সিগন্যাল শুনতে পেয়েছিল। তারপর মাটিতে পড়ে গিয়ে তার তো আর কিছু করার ছিল না, ছুটে যাওয়া ছাড়া। নসু মই খাড়া তুলে দিলেও মইয়ে পা দেয়নি, কিন্তু সে বোধ হয় প্রথমেই চলে যেতে পারত। তার পক্ষে চলে যাওয়াটা সবদিক থেকেই ঠিক হত। এতগুলো কেস আর কার মাথায় ঝুলছে। বাইরে গিয়ে অ্যাকশন সংগঠিত করতে তার মতো আর কে পারবে। বিমলবাবু জোর করে তাকে মইয়ে তুলে দিলেন। তারপর গোড়ালিতে ব্যথা। সেই ব্যথা নিয়ে তাকে ছুটে যেতে হয়েছিল দুপাশে ও সামনে পিছনে খোলা যুদ্ধক্ষেত্রে। খোঁড়া গোড়ালি নিয়েও আর কিছু করার ছিল না নসুর। এখন, খোঁড়া গোড়ালি নিয়ে এইখানে চৌকাঠে পড়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই নসুর, এখন যখন আলো মোটা ধারায় ঘরময় ভাসতে থাকবে, খাড়া চৌকিগুলোর জন্য আলোটা যখন নানা জায়গায় প্রতিহত হবে, খাড়া চৌকির দেয়ালজোড়া ছায়াগুলো চক্রান্তের মতো মনে হবে।

সেই আলোর ধারার দিকে তাকিয়ে থাকে নসু, পুলিশ ফিরে গেছে? এস পি ডি আই জি সাহেবরা কি চলে গিয়েছেন? তলায় কুণ্ডলিত রক্তাক্ত ইউনিফর্ম-সহ মইটার ছবি কি তোলা হয়ে গেচে, পুলিশের ও বিশেষ সংবাদদাতার? যার পেটে নসুকে ছোরা মারতে হয়েছিল, তার ছবিও কি তোলা হয়েছে? এরা কি মারা গেছে? নিহত, দুইজন পুলিশ—এটা ভালো খবর, কিন্তু নিহত যদি না হয়ে থাকে, তা হলে আহতের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়বে? পলাতক আসামির সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়বে? তারপর তাদের একে একে পাওয়া যাবে না—এই হিসেবটা ঠিক রাখতে? স্থানীয় সংবাদ কি পড়া হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই আজকের প্রথম সংবাদ। মুখ্যমন্ত্রী

নিশ্চয়ই তাঁর বিবৃতি দিয়ে ফেলেছেন। নসু দেখতে পায়, আকবর মুখ মোছার জন্য দুই হাত মুখের কাছে তোলে তারপর ওয়াক দিয়ে বমি শুরু করে। ওর হাতময় তো পায়খানার ময়লা।

ঝনঝন শব্দে দরজা খুলে যায়, আলো নিভে যায়। এত উজ্জ্বল আলোর এত হঠাৎ নিভে যাওয়ায় চোখ ধাঁধায়। আর সেই ধাঁধার উপর দিয়ে সিমেন্টের উপর লোহার নালের শব্দের ঝড় ওঠে। পুলিশগুলো ঘরের ভেতর লাফিয়ে ঢোকার সময় নসুর গায়ে বুটের ধাক্কা লাগতে থাকলে, নসু আস্তে তার কাঁধটা সরিয়ে নেয়। তারপর সবুট পাগুলির ছুটে যাওয়ার বাতাস গায়ে লাগাতে লাগাতে নসু ভাবে, এখন কি এই আঁধারে এতগুলো রাইফেলধারী পুলিশের সঙ্গে অ্যাকশন শুরু হবে? শুরু হলে হোক। নসু শুয়ে থেকেও একটু প্রস্তুতি নেয়। শুরু না হলে না হোক। প্রস্তুতি নিয়েও নসু শুয়ে থাকে। ওরা কি অন্ধকারে বেয়নেট চার্জ করছে, তা হলে তো ওদের নিজেদের গায়েই সেটা লেগে যেতে পারে। সিমেন্টের উপর বুটের ছুটে যাওয়ার কোনও আওয়াজ নেই। তা হলে পুলিশ এখন পজিশন নিচ্ছে। এরপর পুলিশ অ্যাকশন করবে। কিন্তু ওরা কতজন আসছে কত, মাত্র এই আঠারোজন আসামির থাকার মতো ঘরে। ওইটুকু ঘরে এতগুলো লোহার নালের আওয়াজের ঝড় নসুকে যেন অবশ করে দেয়। সেই আওয়াজে, সেই লোহার নালের মানুষগুলির দ্রুত ঘন নিশ্বাসে নসু যেন এই জেলখানার বাইরে পৃথিবীর সংবাদ পায়—যেন সেই লোহার নালে নানা দেশের ধুলো আছে। সেই বাইরের পৃথিবীতে তাদের লড়াই চলছিল। খোলা মাঠ ফাঁকা রাস্তা পেরিয়ে পেরিয়ে তারা অলিগলির ভেতরে, ঘরগেরস্থালির ভেতরে লড়াই ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিল। বিপ্লবীর সদাসতর্ক দৃষ্টি থেকে দালাল আর প্রতিবিপ্লবীদের কোথাও পরিত্রাণ নেই; যত নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আক্রমণ তত চতুর। নসুরা ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা নসুদের আশ্রয় দিত, খেতে দিত, লুকিয়ে রাখত, খবর দিত, অথচ নসুরা যখন কোনও বাড়িতে আশ্রয় নিত, তখন বাড়ির লোকরাই নিজ বাড়িতে রাত কাটাত দিন কাটাত যেন নসুদের আশ্রিত, নসুদের হাতে বন্দী। কেউ হয়তো সরকারি অফিসে চাকরি করে, ঘুষ পায়, নেয়। কেউ হয়তো চাকরির উপরও পার্টটাইম, ওভারটাইম পায়। কেউ হয়তো ডাক্তারি ওকালতি করে। কারও হয়তো গোপন সুদি কারবার। কেউ হয়তো পাটের দালাল। ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল নসুরা। তাদের জন্য ঘরে ঘরে আশ্রয়। ঘরে ঘরেই তাদের শত্রু। তাদের লড়াইকে কেউ নিজের লড়াই ভাবেনি। প্রত্যেকেই ভেবেছে নসুদের অস্ত্র তার বিরুদ্ধে তোলা। কারণ প্রত্যেকেরই পেটে লুটের চালের ভাত, প্রত্যেকেরই গায়ে লুটের রক্ত। নসু মিস্ত্রির পাঁচ পাঁচটা খতম অ্যাকশন লিড করেছে—একজন সাব-ইনস্পেক্টর সহ, তিনটি আর্মস ছিনতাই অ্যাকশান লিড করেছে—একটা সি আর পি সহ। কিন্তু এত খতমটতম করেও নসু মিস্ত্রির সেই চৌহদ্দিটাই পেরতে পারল না যার বাইরে সেই মানুষজন থাকে, যারা নসুদের লড়াইটাকে নিজেদের লড়াই ভাবে। উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচে এমনি কতকগুলো উকিল-ডাক্তার-মাস্টার দোকানদার-দালাল খতম করতে করতেই নসুরা এসে এখানে এই জেলখানায় আটকা পড়েছে। আর এই জেলখানায় প্রাচীরের পর প্রাচীর, ঘরের ভেতর ঘর, গরাদের ভেতর গরাদ। এখানে তাদের ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বাইরের দুনিয়াটা পায়ের তলায় লোহার নাল লাগিয়ে হাতে লোহার ফলা বাগিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতর ঢুকছে। নসুরা এখন ঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু নসুরা কি কোনওদিনই বাইরে বেরিয়েছিল, কোনওদিনই?

এখন যে কোনও মুহূর্তে অ্যাকশন শুরু হতে পারে, তাই নসুর শরীরে একটা ক্ষিপ্রতা এসেছিল। ভেতরে ঘরের দুই সীমানা থেকে দুটো শিকারি টর্চলাইট মাঝে মাঝে জ্বলছে আর নিভছে। তারপর হিন্দিতে প্রথম খিস্তিটা শোনার পর নসু আবার গা তলিয়ে দেয়, এই সিমেন্টের উপরই, দরজার পাশে দেওয়ালে এই খাঁজটাতে লাথি মেরে ঘরের ভেতর তাকে ফেলে দেওয়ার পর সে যেখানে আটকে গিয়েছিল। অ্যাকশন হল না। এখন সার্চ শুরু হল। অবশ্য অ্যাকশন বলতে তো এখন হাতাহাতি, পুলিসের টুঁটি টিপে ধরা যাতে রাইফেল বা বেয়নেট চালাতে না পারে। যদি কেউ তেমন একটা অ্যাকশন করতে পারত তাহলে হয় এই সবগুলো পুলিশ কুত্তার মতো পালাত আর নয়তো দেদার গুলি ছুড়ে নিজেদের গুলিতে নিজেরাই মরত, নসুদেরও মারত—এমন নিশ্চিত বিশ্বাসে নসু কথাগুলো ভাবতে পারে যে তার ঠোঁটে হাসির রেখা তৈরি হয়। এমন ডরপোক, মাত্র আঠারোটা আসামি তো থাকে এই ঘরে, তার ভেতর কজন খুন হয়ে গেছে আর কজন

পালিয়েছে কে জানে। এখন বড়োজোর ডজনখানেক আছে, সেই ডজনখানেক আসামিকে সার্চ করতে কমপক্ষে পঞ্চাশজন আর্মড পুলিশ, ঘর অন্ধকার করে নেওয়া, মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালা! সে যে এখানে আছে তা কেউ টের পায়নি, সে এখন ইচ্ছে করলে পা টিপে টিপে গিয়ে পেছন থেকে দরজার পুলিশটার গলা টিপে ধরতে পারে, হ্যাঁ, এই ঘরের ভেতরেও নসুরা পরাক্রান্ত—প্রমাণ হয়ে যাবে, আতঙ্কে গুলি চলবে, গুলিতে তারাও মারা যাবে, মারা গেলে তাদের মনোবল বাড়বে আর পুলিশের মনোবল একেবারে ভেঙে যাবে—একটা অ্যাকশনের পক্ষে সমস্ত যুক্তি একের পর এক অনায়াসে এসে যেতে থাকে আর নসুর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎশিহরন এসে এসে চলে যায়, নসু চোখ বুজে ফেলে—নইলে সে দেখে ফেলবে তার হাতের আওতার ভেতর কোন গলাটা, দুই হাতে নসু মুঠো পাকায়—নইলে তার আঙুলগুলো দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারে। না, আমার কোনও অ্যাকশন নেই, না, আমার কোনও লড়াই নেই, না—দু হাতের পাতায় নসু মুখ ঢাকে। নাকে ঘাসের গন্ধ আসে, দুর্গন্ধিও, তখন বুকে হেঁটেছিল।

'সালে, হাত তুলো উপরমে', টর্চের আলোয় খাড়া করা খাটের ছায়াগুলো দেওয়াল জুড়ে পড়ে। এক পুলিশ একটা খাড়া খাটের উপরে লাথি মারে, ফলে খাটটা সরে যায়। পুলিশটা আবার লাথি মারে, খাটটা আবাব একটু সরে যায়। আর একদিকে লাথি মারে, তাতেও খাটটা সোজা হয় না। তখন নেহাত বাধ্য হয়েই দুজন বাঁ হাতে খাটের কোনাটা ধরে, পা দিয়ে খাটটা যাতে না সরে তেমনিভাবে চাপ দিয়ে খাটটা সোজা করে দেয়। খাটটাকে অমন খাড়া দেখে হয়তো ওদের ভয় ধরেছিল। ওইটুকু একটা খাটের আড়াল আর কী কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, তবু ভয় তো কোনও যুক্তি মেনে চলে না। তারপর এই ঘরের ভেতর শেষ পর্যন্ত ডান হাতে রাইফেল পাশে চেপে ধরে বাঁ হাত লাগিয়ে খাটটা যে সোজা করতে হল, যেন, সেটা বড় বেশি অপমানজনক। তাই সেই পুলিশ দুটি সামনের ছেলেটিকে হুকুম করে, এই সালে সিধা কর।

আসলে, এই পুলিশ দুটি সমস্ত কাজটাতে একটা শৃঙ্খলা আনে। একটি শিকারি টর্চের আড়াল থেকে আদেশ আসে, প্রত্যেককে তাদের খাট ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে; বিছানা ঠিক করতে হবে, তারপর বিছানার পাশে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দু হাত উপরে তুলে দাঁড়াতে হবে। আর দুই সারি খাটের মাঝখানেব ফাঁকটাতে দু দিকে রাইফেল বাগিয়ে পেছনে পেছন লাগানো প্রায় গায়ে গা লাগানো পুলিশ, কয়েক মিনিটের ভেতর সমস্ত ঘরে একটা শৃঙ্খলা এসে যায়। কয়েকটা খাট অগোছালো থেকে যায়—তাদের মালিক নেই। শিকারি টর্চটা সেই খাটগুলো গুনে গুনে যায়, পাঁচ। তার মানে পাঁচজন হয় এসকেপ, না হয় ক্যাজুয়ালটি। না, আমি এসকেপও নই, ক্যাজুয়ালটিও নই, আমি এখানে, আমি নসু মিস্ত্রি।

হাসপাতালে সদ্যোমৃতের বেডের মতো সারি সারি শূন্য শয্যা, দেয়ালে গা লাগানো দুই হাত উপরে তোলা সারিবদ্ধ মানুষ, উদ্যত রাইফেলে সারিবদ্ধ পুলিশ—এই সম্পূর্ণ স্থিরতায় দুটো টর্চ শুয়োরের মতো অন্ধকার খুঁড়ে খুঁড়ে যায়, অন্ধকার থেকে উপড়ে আনে বিছানার ডোরাকাটা চাদর, পাজামা, ইনল্যান্ডের চিঠি, ওষুধের ছোটো শিশি, সিগারেটের খালি প্যাকেট।

পুলিশরা বেরিয়ে যাওবার সময় খুব ধীরভাবেই বেরয়। দরজায় একটা টর্চ ভেতরে, আর একটা টর্চ বাইরে আলো দেখায়। ভেতরের টর্চটা আবার মাঝে মধ্যে দেয়াল দুটো দেখে নেয়, উপরে তোলা সারিবদ্ধ হাত নড়ছে কি না। বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পথে লোহার নালে যেন খানিকটা ছন্দও আসে, যেন, এখন আর কোনও ব্যস্ততা নেই, যেন জানা হয়ে গেছে এদের আর কোনও অস্ত্র গোপন নেই। কিন্তু আমার কবজি, আমার হাতের আঙুল? নসুর মনে অবধারিত পালটা আসে।

এখন এরা আমাদের ভেতর থেকে দু-একজনকে নিয়ে চলে যাবে, এখনও যখন গনতি করল না, তখন এদের হিসেবনিকেশ মিটিয়ে কাল সকালে হিসেব খাতাপত্রে মেলাবে, হিসেব মেলানোয় এত বড়ো সুবিধে যখন ঘোষণা করা যায়, তা হলে কি ওরা নাম ধরে ডাকবে না, নাকি যাদের পাবে তাদেরই নিয়ে যাবে, আমি কি সেজন্যই এখানে বসে আছি, আমাকে দেখতে পায়নি, আমাকে দেখতে পাবে না বলে?

ভেতরের দিকে টর্চটা ফেলে রেখেই লোকটা পিছু হঠে চৌকাঠ পেরয়, দরজা পেরয়, টর্চের আলোতে দেওয়ালে উত্তোলিত হাতের সারি, তখনও, তারপর গরাদ-দেওয়া দরজা ধাতব শব্দে বন্ধ হয় আর গরাদের

ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো দেওয়ালের খাঁজে আটকানো নসুকেই শুধু আলোকিত করে রাখে, তখন থেকে আমি তো শুধু এই জন্যই অপেক্ষায়, নাম ধরে যাতে ডাকতে না হয়, আমাকে শুধু আমাকেই যাতে সবটুকু আলোভরে দেখা যায়।

গরাদের ও পাশ থেকে ফেলা টর্চের আলোয় শরীরময় গরাদের অতিকায় ছায়া নিয়ে নসু উঠে দাঁড়ায়, ধাতব শব্দে তার শরীরের উপর থেকে গরাদের ছায়া সরে যায়, একটা হ্যাঁচকা টানে নসু বাইরে ছিটকে পড়ে, জ্যোৎস্নায় ভলিকোর্টের সীমানায়। অলৌকিক নেটে জ্যোৎস্নায় জালিকাটা। ওই গরাদের ওপারে নসু মৃত ঘোষিত। এখন, রাইফেলের পাহারায়, নসু জানে না, নিজের ছায়ার উপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনও লড়াই, কার লড়াই সে লড়তে চলেছে।

এখন নসুর দুই হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি—কারণ পায়ে বাঁধা শেকলকে হাতকড়া বলা উচিত নয় আর পা-কড়া কথাটার চল নেই। কিন্তু আসলে নসুর হাতেও যা পায়েও তাই। নসুর অভিজ্ঞতায় দুটোই হাতকড়া। নসু শুনেছে হাত পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি দিয়ে রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে পায়ে অন্য ধরনের শেকল থাকার কথা ও হাত-পায়ের দুটো কড়াকে যুক্ত করে একটা ডাণ্ডা থাকার কথা। নসু শুনেছে দমদমে আর প্রেসিডেন্সিতে এরকম ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে কাউকে কাউকে রাখা হয়েছে। আর এক হতে পারে, দেওয়ালের দুই কড়ার সঙ্গে দুই হাত দুই দিকে টেনে নিয়ে হাতকড়া লাগানো। আর একইভাবে দুই পা দুই দিকে টেনে দেওয়ালের দু দিকের কড়ার সঙ্গে লাগানো। নসু শুনেছে, দেওঘরে বা পাটনা জেলে আর অন্ধ্রে কাউকে কাউকে, উচ্চতম নেতৃত্বের কাউকে কাউকে এরকম করে রাখা হয়েছে। নসুকে যখন এই সেকল্যাসন সেলে আনা হল, নসু এই দুই রকম ব্যবস্থার কথাই ভাবছিল। নসু ভাবছিল এখন এটাই তার করণীয়, এই সেকল্যাসন সেলে দিন কাটানো। কিন্তু তাকে এই হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি করে এখানে রেখে দিয়ে যাওয়া হল। পায়ের বেড়িটা পায়ে খুব লাগছে, খুবই লাগছে, পা আর একটু মোটা হলে তো আটকাতই না। ডান পায়ের গোড়ালিটা নিশ্চয়ই ফুলেছে। রাইফেলে ঘেরা নসু যখন এই সেলের দিকে আসছিল, তখন সে হাঁটতে পারছিল না, গোড়ালিতে এত ব্যথা, ফলে পেছনে একবার লাথি পড়ায় নসু নিজের ছায়ার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন গোড়ালির সেই ব্যথা বোধে আসে না। এখনকার সব ব্যথাটাই যেন পায়ে হাতকড়া লাগানো হয়েছে বলে। নইলে, নসুর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, তাদের ওয়ার্ডেও তো সে আসলে একা একাই ছিল, সেই ঘুম থেকে ওঠার পর জয়, ভোম্বল আর টুবলার উপর থেকে সে কেমন চোখ সরিয়ে চোখ বুজেছিল, তারপর খেলা, আসলে তো ওদের কাছ থেকে কাটার জন্যই খেলা, তারপর তাকে লাথি মেরে ওয়ার্ডের ভেতর যে জায়গায় ফেলে দিয়েছিল—প্রায় সেখানেই পড়েছিল, যতক্ষণ না তাকে তুলে নিয়ে এল। এখন, এখানে বসে থাকতে থাকতে নসুর কেবল এই কথাটাই মনে হতে থাকে কেন, তাকে হাতে পায়ে যে সেপাই হাতকড়ি পরালো, সে ভুল করে দুটোই হাতকড়া নিয়ে এসেছে, নাকি এদের পায়ে বাঁধার শেকল নেই-ই।—এই সমস্যাটির সমাধান করাই যে এই মুহূর্তে নসুর সবচেয়ে বড়ো কাজ। বাইরে জ্যোৎস্না, তাই নসুর এই সেলের ভেতরের অন্ধকার অস্পষ্ট। নসুকে যখন এখানে ঢোকানো হল, তখন টর্চের আলোতে সে দেখবার চেষ্টা করেছিল, খুব একটা বুঝে উঠতে পারেনি। মাঠ পেরিয়ে, দু-নম্বরের পেছন দিয়ে, পুরো দু-নম্বরটি ডান হাতিতে রেখে আবার ডান দিকে বেঁকে একটা গরাদের সামনে তাকে আনা হল। নসু ভেবেছিল, গরাদ খুলে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু গরাদ খুলে টর্চ লাইট জ্বেলে চারজন আমর্ড পুলিশ এক সেপাইকে নিয়ে আগে ঢুকল। বাইরে মাঠে দাঁড়িয়ে আরও একটা গরাদ খোলার শব্দ পেয়েছিল। ভেতরের সেপাইয়ের গলায় একটা চিৎকারের মতো শোনা গেলে এরা নসুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। টর্চের আলোতে নসু দেখেছিল সেলের ভেতরে গরাদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে দুই পুলিশ, আর গরাদে রাইফেলের নল ফেলে দুই পুলিশ। এই চার পুলিশের মাঝখানে সেপাইটা হাতে পায়ে কড়া লাগাতে কী রকম অস্বস্তিবোধ করছিল যেন। বিশেষত যখন লোকটা উবু হয়ে বসে নিচু হয়ে পায়ে চাবি লাগাচ্ছিল আর নসু মাথা নুইয়ে দেখছিল। ছোটোবেলায় জুতো কেনার সময় ছাড়া নসু নিজের পায়ের কাছে এত দীর্ঘ নত কাউকে দেখেনি। লোকটির নার্ভাসনেসের জন্যই এখন নসুর মনে হচ্ছে, লোকটি ভুল করে হাতকড়াই

পায়ে পরিয়েছে। পায়ের চাবিটা লাগাতে লোকটার একটু দেরি হয়েছিল। গরাদ দিয়ে ফেলা টর্চের আলোতে সেলের ভেতরে দাঁড়ানো পুলিশ দুটোকে ঘিরে নসুর আর নসুর পায়ের কাছে সেপাইটির অদ্ভুত ছায়া পড়েছিল। পায়ের চাবি লাগিয়ে সেপাইটি তড়াক করে উঠে বাইরে গেল, নসু অপেক্ষায় যে আরও কিছু আসবে; কিন্তু ভিতরের পুলিশ দুটোও বেরিয়ে যেতে গেলে নসু পেছনটা শক্ত করে দাঁড়ায় বেয়নেটের খোঁচা, রাইফেলের বাঁটের মার, নিদেন একটা লাথির অপেক্ষায়। কিন্তু নসুকে অপ্রস্তুত করে ওরা বেরিয়ে যায়। গরাদ বন্ধ করা, বিরাট চাবির গোছার নাড়াচাড়া ইত্যাদিতে বেশ কিছুক্ষণ ধাতব শব্দ উঠতে থাকে। টর্চের আলো আর রাইফেলের নিশানা ছিল নসুর উপরে। তারপর সেপাইটি চলে যায়, হঠাৎ টর্চের আলো নেভা আর একসঙ্গে তিনজোড়া পায়ের ত্রস্ত প্রস্থান নসুকে কান পেতে শুনতে হয়, নসুর তো এখন হাতে-পায়ে হাতকড়া, তবু ওরা ভয় পেল কেন। আর হাতে-পায়ে হাতকড়া না থাকলেও নসু কিছু করত না, কারণ এখন তাকে চুপচাপ বসে থাকার কাজেই রেখে দিয়ে যাওয়া হল। হল যখন, তাই করবে নসু।

এখন নসু দেওয়ালে হেলান দিয়ে, পা-দুটো উঁচু করে, হাত দুটি কোলের উপর রেখে। তার এই সেলটার সামনে গরাদের ওপারে একটুখানি বারান্দা মতো, দে য়ালঘেরা। প্রথমে সামনের এই জায়গাটাতে ঢুকে ডান দিকে বেঁকে তার সেল। নসু ভেবেছিল, এরপরও বোধহয় আরও সেল আছে। কিন্তু পাশেই দেওয়াল, সুতরাং সেল আর নেই, এক যদি ও পাশে থাকে। নসু গরাদ ঘেঁষে বসেছে। কেন। যদি ওদিকের গরাদ দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়, সেইজন্য কি এখনই, এই রাত থেকেই, মাত্র কয়েকঘন্টার ভেতর, নসুর অপেক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

অসংখ্য মশা নসুর মুখ কান নাক হাতের পাতা পায়ের পাতা ছেঁকে ধরে। পায়ের পাতা দুটো ঢেকে জোড়াসনে বসতে গিয়ে নসু বোঝে পারবে না, পায়ের গোড়ালি দুটো বাঁধা যে শিকলে, সেটা অতটা ছড়ায় না। নসু দুই হাত দিয়ে পায়ের পাতা ঢাকতে চেষ্টা পায়, পারে না। তারপর হাঁটুটা থুতনির কাছে এনে হাত দুটো ঘিরে নামিয়ে দিলে কোনওরকমে পায়ের পাতা পায়। মশাগুলো ভন ভন উড়ে গিয়ে আবার হাতের পাতায় এসে বসে, হাতটা একটু ঝাঁকালে উড়ে গিয়ে আবার একে একে বসে। হাঁটুর উপর কপাল মুখ ঘসে নসু মুখের মশা তাড়াতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পেটে আর বুকে চাপ বোধ হয়, তখন নসু হাতটা বের করে আনে। পা টা বিছিয়ে একটু আয়েশ করে নেয়। তারপর শরীরটা ডান দিকে একটু বেকিয়ে দুই হাতে গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ায়। হাতটা মাথার উপর তুলে গরাদের শিক ধরে নসু একটু হাঁটতে চেষ্টা করে—কিন্তু পায়ের কড়ার জন্য আধ-ইঞ্চি মতোও এগোতে পারে না। নিশ্চয়ই সেপাইটা ভুল করেছে। নসু দুই হাতে গরাদ ধরে নিজেকে উঁচু করে খানিকটা এগোয়। আবার উঁচু হয়ে খানিকটা এগোয়। বার পাঁচেক চেষ্টা করে নসু বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছে আসতে পারে। নসু সেইখানে বসে পড়ে।

সেই বিকেল থেকে এত কিছুর পর, সামান্য এই পরিশ্রমেই নসু যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর দেয়ালে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে সে এলিয়ে যায়, তার হাতে পায়ে মুখে মশার অজস্র কামড় সে আর বোধ করে না।

প্রথমে কানে আসে ঝন ঝন ঝন। তারপর নসু চোখ খোলে। সে যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। টর্চের আলো পড়েছে সামনের জায়গাটুকুতে। হকচকিয়ে নড়তেই হাতে পায়ে ব্যথা পায়। নসু শরীরটা ঠিক করে, ধীরে ধীরে উঠে বসার সময়টুকু জুড়ে গরাদের ঠিক সামনে একটা বস্তা মতো কিছু ফেলা হয়, বাইরের গরাদ বন্ধ করার সময়টুকুতে জ্বালানো টর্চের আলোতে নসু শুধু চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেয়েছিল। টর্চের আলো নিভে যাওয়ার আগে নসু গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ায়, গরাদে মুখ চেপে দেখবার চেষ্টা করে। বোঝে মেঝের উপর বসে বসেই দেখার সুবিধে, যদি দেখা যায়। নসু বসে পড়ে, তারপরে গরাদে মুখ চেপে ধরে। কে, কে, কাকে খুন করে এখানে রেখে গেল? এ কি বেঁচে না মরে? একটুখানি আলোর জন্য হাঁপানি রোগীর মতো ছটফটিয়ে নসু দেখে, এখান থেকে সামনের যে গরাদটা সে দেখতে পাচ্ছে না, সেই গরাদ গলে একটা খুব মলিন আলো সামনের দেওয়ালটার কোনায় লেগে আছে। আলোটা চাঁদের না প্রথম সূর্যের নসু বুঝতে পারে না। সে এই একচিলতে মলিন আলোর দিকে নিমেষহীন চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হয়, ওটা আলো নয়, দেওয়ালের নোনার অথবা চটা ওঠার দাগ।

নসু তখন মেঝের উপর শুয়ে পড়ে। তারপর দুই হাত গরাদের ফাঁক গলিয়ে বের করে সামনের লোকটাকে ধরতে চেষ্টা পায়। কিন্তু কনুইয়ের পর হাত এগোয় না। তখন নসু হাত ফিরিয়ে এনে কাত হয়ে পা দুটো বের করার চেষ্টা পায়। হাঁটু পর্যন্তও বেরতে পারে না। নসু পা গুটিয়ে এনে দেয়ালে হেলান দেয়। লোকটা কি বেঁচে আছে? কাকে ওরা মেরে রেখে গেল? একে কি গুম করতে চায়?

দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিজে নিশ্বাস বন্ধ করে নসু সামনের লোকটির নিশ্বাস শোনা যায় কি না পরখ করে। কিন্তু কোনও শব্দ পাওয়া যায় না। একসময় নসুর মনে হয়, আসলে ওখানে কেউ নেই, তাকে ভয় দেখাবার জন্য রক্তে ছোপানো জামাকাপড় হয়তো ফেলে রেখে গেছে। কিছু মশা ভন ভন করে ওখান থেকে উড়ে এসে নসুর সেলের ভেতর ঢোকে, আবার বেরিয়ে যায়। পারলে নসু মশার মুখের রক্ত দেখে জানতে চেষ্টা করত লোকটা বাঁচা কি মরা।

নসুর সহসাই মনে পড়ে যায়, লোকটি যদি বাঁচাই হবে, তাহলে তার এই সেকল্যুসন সেলে একে রেখে যাবে কেন। সামনের ওই লোকটির কাছ থেকে ঠিক তখনই, যেন একটা আওয়াজ আসে, মৃদু একটা কোঁকানির মতো। তা হলে কি লোকটা বেঁচে আছে, জ্ঞান ফিরছে, নাকি মারা গেল, এই এখনই। এতক্ষণে নসু জিজ্ঞাসা করে, 'কে কে', নসুর স্বাভাবিক স্বর সেই নির্জনতায় নসুর নিজের কাছেই ভৌতিক শোনায়। যেন আর কারও কণ্ঠস্বর শুনছে, এমনভাবে নসু আবারও জিজ্ঞাসা করে, 'কে, কে?'

পাঁচ-পাঁচটা মার্ডার অ্যাকশনের লিডার, আজকে একটা পুলিশ মেরেছে, নিশ্চয়ই মরেছে—হিটটা জুত মতোই হয়েছিল, ছ-ছটা মার্ডার অ্যাকশনের লিডার, নসু মিস্তির, মাত্র দেড় দুই হাতের তফাতে লোকটা মরা না জ্যান্ত বুঝতে পারে না। নসু মিস্তির তো দাঁড়িয়ে মরা দেখেনি বা কোনও মৃতদেহ দেখেনি। সে শুধু ছুটেছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তারপর হাতে লোহা তুলে নিয়েছে—পাইপগান বা ছোরা, পরের দিকে শুধুই রিভলভার। তারপর আবার ছুটেছে, শুধু ছুটেছে। ছুটতে ছুটতে নসু মিস্তির এখন এই সেলে। তার হাত দেড় দূরে তাদেরই দলের কেউ 'কে' 'কে', জীবিত না মৃত, 'কে' 'কে'।

যেই হোক, নসু ডাকে, 'কমরেড', যেন কমরেড ডাকলে সাড়া না দেওয়াব কোনও উপায় নেই। আবার খানিকক্ষণ পর ফিসফিস স্বরে নসু ডাকে, 'কমরেড'। আবার খানিকক্ষণ পর নসু ফিসফিস স্বরে ডাকে, 'কমরেড'। এরপর নসু দুই হাতের মাঝখানে হাঁটু ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, সামনের দিকে তাকিয়ে। কমরেড, এখনও নিশ্চয়ই সূর্য ওঠেনি, তা হলে এর ভেতর আলো আরও স্পষ্ট হত। এটা নিশ্চয়ই চাঁদের আলো। পুলিশও ইচ্ছে করলে সূর্য ওঠা বন্ধ করতে পাবে না, তখন আমি জানতে পারব, সামনে কে, বাঁচা না মরা।

নসুকে তখন গরাদের সামনে ও দিকে লোকটার মুখোমুখি বসে থাকতে হয়। হাতপায়ের বেড়ির জন্য নসুর বসার একটিই মাত্র ভঙ্গি হতে পারে, হাঁটু জোড়া করে থুতনির কাছে আনা, তারপর হাঁটুটা ভেতরে নিয়ে হাত দুটো দু পাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া। মশা আসে অজস্র। মশার শব্দ পাখির কলরবের মতো উচ্চকিত হতে পারে, তা নসু এই প্রথম বুঝছে। কপাল, নাক, গলা, ঘাড়, কানের ফুটো, পায়ের পাতা, হাতের পাতা, সমস্ত জায়গায় অজস্র মশা অজস্র হুল ফুটিয়ে নসুর রক্ত শুষে নেয়। উপায়হীন নসুকে গত কয়েকঘণ্টার ভেতরেই অবস্থাটা জেনে যেতে, মেনে নিতে হয়েছে।

গরাদের ওপারে আর একটি মানুষ থাকায় নসুর মনে হয়, তার এই বসে থাকাটা একটা অপেক্ষা হয়ে যায়, অপেক্ষা—সূর্য ওঠার, আলোর, যাতে সে চিনতে পারবে সামনের মানুষটি কে, যাতে সে জানতে পারবে, সামনের মানুষটি বেঁচে না মরে।

এভাবে বসে থাকতে নসুর মেরুদণ্ডে ব্যথা লাগে, বিশেষত মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয় সেখানে টনটন করে, হাত দুটোও টনটনায়, তলপেটে আর বুকে চাপ বোধ হয়, ঘাড়টা খুব ভারী ঠেকে। কিন্তু এভাবে ছাড়া নসুর বসে থাকার উপায় নেই। কারণ তার হাতে-পায়ে বেড়ি। হয়তো সেপাইটির ভুলের জন্য হাতের বেড়ি পায়েও লাগানো হয়েছে বলে পা ফাঁক করার জায়গাটা কয়েক ইঞ্চি, এক বা দুই বা পাঁচ কমে গেছে। কম না হলে হয়তো নসু আরও একরকম ভঙ্গিতে বসতে পারত। তাতে এই অবস্থাটার কোনও বদল ঘটত না।

তাহলেও নসু গরাদের এপারে আর ওই মানুষটি গরাদের ওপারে থাকত। সূর্য উঠলে, আলো হলে, আমি হয়তো মানুষটিকে দেখতে পাব কিন্তু মানুষ যদি আমার কমরেড হয়, এবং নিশ্চয়ই আমার কমরেড— নইলে আমার সেলের সামনে রেখে যাবে কেন, আর আমার কমরেড যদি জীবিত থাকে, একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করে. তা হলেও তার মুখে আমি এক ফোঁটা জল দিতে পারব না।

আর এতক্ষণে যেন নসু বুঝতে পারে, সে জন্যই লোকটিকে তার সামনে ফেলে রেখে গেছে, যাতে নসু তাকে একফোঁটা জলও দিতে না পারে।

এবার এই কথা বুঝে যাওয়ার পর, নসুকে হাতটা বের করে আনতে হয়, পা-টা গরাদের দিকে ছড়িয়ে দেয়, হাত দুটো কোলের উপর। তা হলে লোকটা বেঁচেই আছে, নইলে এখানে ফেলে যেত না, নইলে এক ফোঁটা জল দেওয়ার অক্ষমতায় আমাকে দগ্ধানো হবে কী করে। এক হতে পারে, আমাকে ভয় দেখানো, আমারাও এই পরিণতি হবে। কিন্তু আমার তো কোনও নেই। ভলি খেলার কোর্ট থেকে ছুটে না গেলে হত। ছুটে যাওয়া ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। অ্যাকশনটা আমার নয়। কিন্তু আমার পক্ষে অ্যাকশনে যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই, আর আমি অ্যাকশনে যাবই, এটা হিসেবে রেখেই প্ল্যান করা হয়েছে। কলের মাথায় আটকানো মই খুলে দেওয়ার জন্য আমি ছুটে না যেতে পারতাম। আমি যাবই, এটা হিসেব রেখেই মইটা কলের মাথায় লাগানো হয়েছিল। আমার ওয়ার্ডের ভেতর, আমি চুপচাপ দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। তাতে পরিত্রাণ মিলত না। আমাকে যখন ওয়ার্ড থেকে তুলে আনা হল, আমি জানতাম আমাকে মেরে ফেলা হবে। তার বদলে আমাকে সেই সেকল্যুসন সেলে রাখা হয়েছে। আর একে মারা হয়েছে। এ কে? টুবলা? জয়? ভোম্বল? আকবর? বা আর কেউ। আর কারও সেলের সামনে আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারত, যায়নি, আবার যেতে পারে।

যে অ্যাকশন আমার নয়, সেই অ্যাকশন ঠেকাবার কোনও চেষ্টা করিনি। আমি চেষ্টা করলেও অ্যাকশন ঠেকাতে পারতাম না। তিন দিন ধরে সারাদিন চোখের সামনে চল্লিশ ফুটি মই নাচানো হতে থাকে, যাতে এরকম একটা অ্যাকশন হয়, সেই উদ্দেশ্যেই। তাই অ্যাকশন হয়েছে। তাই অ্যাকশন হতই। গতকালও হতে পারত, আগামিকালও হতে পারত। হলে, আমাকে কোথাও একটা আসতেই হত তো, গরাদের এপারে বা ওপারে। কারণ ও-মই বেয়ে পালানো যায় না। দেওয়াল টপকালেও পালানো যায় না। দু চার বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলেও পালানো যায় না। এরপর ওদের যে দিন যে দিন দরকার, ওরা খবরের কাগজের সংবাদ বানাবে অমুক জায়গা থেকে অমুক সালের অমুক জেল পালানো আসামি গ্রেপ্তার। আগামী কয়েক বছর ধরে যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে, যাকে খুশি তাকে ধরতে, ওরা, আমাদের, জেলের আসামিদের, পালিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে এমন মই রেখে দেয়। দেবে।

আর আমাকে যদি এই সেল থেকে বের করে নিয়ে আবার ওয়ার্ডে রাখে, আগামিকাল দেয়ালের গায়ে যদি আবার মই হেলানো দেখে যে কেউ আবার এসকেপ-অ্যাকশন লিড করে, আমি আবার নিশ্চিত সে অ্যাকশনে যাব, টানটান মই খাড়া ধরব, ছুরি মেরে নইলে টুঁটি টিপে যে বাধা দেবে তাকে মারব। তারপর এই গরাদের হয় এ ধারে নয় ও ধারে পড়ে থাকব। কারণ জেলে থাকলে পালাবার অ্যাকশন করতে হয়।

আমাকে যদি এই সেল থেকে বের করে নিয়ে বাইরে ছেড়ে দেয়, আগামিকালই আমি বাইরে আবার খতম অভিযান চালাব। হয়তো অস্ত্র আর সঙ্গীর অভাবে আমি যাকে মেরে ফেলতে চাই, তাকে সত্যি সত্যি মারতে পারব না, কিন্তু আমার ইচ্ছার শক্তি তাতে একটুও চিড়বে না। কারণ যে আমাকে মারবে তাকে আমি মারব।

কিন্তু এই এসকেপ-অ্যাকশন বা সেই খতম অভিযান, কোনওটাই আমার অ্যাকশন নয়। যেন এই হাত-পা বেঁধে থাকাটা আমার ইচ্ছেয় নয়।

নসু গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ায়। সামনে সেই লোকটি পড়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই নিজের শরীর শক্ত করে নিে নসু পেশিগুলোকে একটু আরাম দেয়। তারপর গরাদ ধরে শরীরটাকে পিছনদিকে একটু

ঝুলিয়ে দেয়। আবার সামনে এগিয়ে আনে। তার শরীরের এতটা নাড়াচাড়ায় মশার দল ভনভন শব্দে উড়তে থাকে। নসুর শরীরের নাড়াচাড়ার গতির সঙ্গে তাল রেখে মশার ভন ভন বাড়ে, কমে।

কিন্তু, এখন সামনে এই বাঁচা বা মরা সহযোদ্ধাটিকে নিয়ে, এককোঁটা জল দেওয়া বা ওর গা থেকে একটা মশা তাড়াবার ক্ষমতাও যখন আমার নেই, আমাকে কী করতে হবে। একে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া হল আমাকে দিয়ে কোনও কাজটি করিয়ে নিতে যা আমাকে বাধ্যত করতে হবে, যা না করার কোনও উপায়ই আমার হাতে রইবে না। একটার পর একটা খতম অভিযান আমাকে চালাতে হয়েছে। সে ছিল আমার বিশ্বাস, পরিবর্তনের এক ও অনন্য পথ। আমার হাতে একমাত্র অস্ত্র। কিন্তু তারপর থেকে সবটাই তো আমাকে অবস্থার ফিকিরে করতে হচ্ছে, মানতে হচ্ছে। এখন এসকেপ-অ্যাকশন হয়েছে। তাতে ঢুকে যাওয়া ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। এখন এই সেকল্যুসন সেলে আছি। কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এখন এই জীবিত বা মৃত সহযোদ্ধার সামনে, আমাকে কী করতে হবে।

গরাদের উপর তার কপালটা নোয়ানো ছিল। মাথাটা তোলা মাত্রই মশা ভনভন উড়ে গেল। হাতটা গরাদ থেকে নামিয়ে আনল। আরও বেশি মশা আরও ভনভন, করে উঠল। কিন্তু অবলম্বনহীন এই দাঁড়িয়ে থাকাতে যেন তার ভরসা নেই। সে আবার গরাদটা ধরে আর টের পায় তার খুব পেচ্ছাপ পেয়েছে। গরাদের ফাঁক দিয়ে পেচ্ছাপের জন্য তৈরি হওয়ার চেষ্টা করতেই নসুর কাছে সহসা স্পষ্ট হয়, এইজন্য, এইজন্য—শুধু এইজন্যই, একে মৃত বা মৃতপ্রায়, আমার সামনে রেখে দিয়ে যাওয়া হল, যাতে এই সেকল্যুসন সেলের নিঃসঙ্গতায় আমার কফ, থুতু বা পেচ্ছাপ দিয়ে আমি আমার সহযোদ্ধাকে, মৃত বা মৃতপ্রায় সহযোদ্ধাকে, অপমান করতে পারি, অপমান করে যাই। জয় হতে পারে, ভোম্বল, টুবলা বা বিমলবাবু বা আকবর হতে পারে, যে কেউ হতে পারে, আমি হতে পারি। আমার নিজের শবদেহের উপর আমাকে পেচ্ছাপ করানো হচ্ছে।

হাতে-পায়ে বেড়ি নিয়ে হাতকড়া বাঁধা দুই হাত মাথার উপর টানটান তুলে নসু দুই হাতের মুঠোয় একটা শিক চেপে ধরে ডান বাহুর পেশির উপর মুখটা চেপে ধরে শরীরে সমস্ত পেশি সংকোচনের চেষ্টা করে, বলে, না।

তারপর, শরীরের নিয়মে একসময় নসুর প্যান্ট ভিজিয়ে শরীর ভিজিয়ে পেচ্ছাপ হয়ে যেতে থাকে। আর জলের নিয়মে জল-গরাদের ফাঁক দিয়ে সেই জীবিত বা মৃতের দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে।

কপাটে করাঘাত

তপোবিজয় ঘোষ

এক ধরনের খুটখুট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভূধরবাবুর। চোখ না খুলে এবং নিশ্বাস বন্ধ রেখে শব্দটার স্বরূপ বুঝতে চাইলেন। প্রথমে মনে হল শব্দটা উপরের পাখা থেকে উঠছে। অনেকদিনের পুরোনো পাখা, মাঝে মাঝে কটকট শব্দ করে। চোখ খুলে অন্ধকারে উপরের দিকে তাকালেন। তখন মনে হল, খাটের তলা থেকে উঠছে। তা হলে কি ইঁদুর? খাটের তলায় রাজ্যের জিনিস স্তূপাকার করা আছে। পুরোনো বাসন, বাক্স-প্যাঁটরা, চালের টিন, গমের টিন। দল বেঁধে ইঁদুরেরা ঘুরে বেড়ায়। ওদের শরীরে লেগে টিন বা তোরঙ্গে নানারকম শব্দ হয়, ভূধরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। বয়সের জন্য এবং অম্ল ও অজীর্ণে ভুগে ভুগে তাঁর ঘুম এখন বড়ো পাতলা। সাধ্যসাধনা করে ডেকে আনতে হয়। একবার ভেঙে গেলে আর ফিরে আসতে চায় না।

কিন্তু শব্দটা ইঁদুরের না। এতক্ষণে পুরোপুরি ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মনে হল, কেউ দরজার কড়া নাড়ছে। কোথায়? এই তিনতলার কোনও ঘরে কি? অথবা দোতলায়? সহসা ভূধরবাবুর শ্রবণশক্তি যেন অতিমাত্রায় প্রখর হয়ে উঠল। সমস্ত ইন্দ্রিয় তীব্র সচেতনতা পেল। মনে হল নীচের তলায় সদর দরজার কড়া ধরে কেউ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। শক্ত সবল হাতের খট্ খট্ কড়ানাড়ার ধাতব শব্দ এই মান্ধাতার আমলের বাড়িটার ঘর-বারান্দা-দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে বন্ধ-কপাটের এ-পাশে ভূধরবাবুর শয়নকক্ষে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে প্রবেশ করছে।...কে কড়া নাড়ছে? এখন রাত কত?

ভূধরবাবুর বয়স্ক কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল। ভ্রূ কুঁচকে গেল। বালিশ থেকে মাথাটা আরও একটু উপরের দিকে তুলে ধরলেন। কেমন একটা ভয়-ভয় দৃষ্টিতে ঘরের নীরন্ধ্র অন্ধকার। অন্ধকারে পাখার গোল মাথা থেকে বিচ্ছুরিত নীল আলোর স্পার্ক লক্ষ করলেন। ডানদিকের হ্রস্ব জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখে সময় অনুমানের চেষ্টা করলেন। খেয়েদেয়ে যখন শুয়েছিলেন তখন রাত এগোরোটা। তারপর ঘণ্টা দুই অন্তত ঘুম আসেনি তাঁর। এখন রাত আড়াইটে-তিনটে। এই নিঝুম নিশুতি রাতে নিস্তব্ধ বাড়িটার সদর-রাস্তার অর্গলবদ্ধ দরজায় কে ঘা দেয়? কে এল এইসময়? একটু বেঁকে ভূধরবাবু স্ত্রীর শরীর দেখার চেষ্টা করলেন। নিঃসাড়ে ঘুমচ্ছে হেমপ্রভাম। সারাদিন খাটাখাটুনির পর ঘুমটা গভীর, নিরুদ্বিগ্ন। ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বুঝলেন, হাত দিয়ে না ঠেললে জাগবার সম্ভাবনা নেই। এখনই তাকে ডাকবেন কি ডাকবেন না, ভাবতে ভাবতে মনোযোগে ভূধরবাবু আরও ক মুহূর্ত শব্দটা শুনলেন। কতক্ষণ ধরে উঠছে কিন্তু কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না। একতলার মানুষগুলো কি মরে গেল! সদর-দরজার পাশেই তো শশাঙ্ক হাজরার ঘর। হাঁপানি টানে তার বুড়ি মা-টা তো সারারাত জেগেই থাকে—

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন ভূধরবাবু। তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল। ঠিক এইসময় অন্ধকারে কোথাও একটা টিকটিকি কুৎসিতভাবে টক্ টক্ করে ডেকে উঠতে এবং খাটের নীচে গোটা তিনেক ইঁদুর একসঙ্গে ছুটোছুটি করে হুল্লোড় বাঁধিয়ে বসতে যেন আরও চমকে উঠলেন। তাঁর দুর্বল বয়স্ক হৃৎপিণ্ড অল্প লাফাতে লাগল, হাত-পা কেমন অবসন্ন বোধ হল। পাশ ফিরে হেমপ্রভাকে মৃদু চাপা গলায় ডাকলেন, 'শুনছ, এই...'

হেমপ্রভার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। অল্পকাল চুপ করে থেকে ভূধরবাবু বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে বিছানায় পিঠ ঘষে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর শরীরে হাত ঠেকালেন, 'এই...'

ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে কিছু একটা ভেবে হেমপ্রভা গোঁ-গোঁ শব্দে গুঙিয়ে পাশ ফিরল। নিঃশব্দ ঘরে গোঙানির শব্দটা এমন বিকৃত অদ্ভুত শোনাল যে ভূধরবাবু আরও বেশি ভয় পেয়ে স্ত্রীর মুখে হাত চাপা দিতে চাইলেন। কিন্তু তাতে আরও জোরে চিৎকার করে উঠতে পারে আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার ডাকলেন, 'শুনছ, এই ধুত্তোরি ছাই, ওঠো না!'

মনে হল হেমপ্রভা শুনতে পেয়েছে। কেননা এবার স্বাভাবিক গলায় 'উ'-জাতীয় একটা-কিছু উচ্চারিত হল এবং নিশ্বাসপতনের ভারী শব্দ ক্রমশ শিথিল এলোমেলো হয়ে গেল। ভূধরবাবু রুদ্ধশ্বাস চাপাগলায় বললেন, 'কারা দরজা ধাক্কাচ্ছে!'

যেন কথাটা অতিশয় ভয়ঙ্কর, যেন বাইরের পৃথিবীতে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, অথবা বন্যার জল লাফিয়ে ঘরে উঠে এসেছে, হেমপ্রভার ঘুম মুহূর্তে ছুটে গেল। খুব দ্রুত বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসে বলল, 'কারা ধাক্কাচ্ছে? কোন্ দরজা?'

ভূধরবাবু বললেন, 'শ্ শ্ শ্, আস্তে!'

হেমপ্রভার মুখ সাদা হয়ে গেল, 'আমাদের দরজা?'

—না, নীচে। ওই শোনো...

হেমপ্রভা কান পাতল। তার শরীরও অল্প অল্প কাঁপছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। গলার স্বর আরও খাদে নামিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ থেকে?'

হ্যাঁ।

—এইরকম শব্দ..?

হ্যাঁ?

—পুলিশ না তো?

—পুলিশ।

—হ্যাঁ, সেবারের মতো...

বলে অন্ধকারেই ভূধরবাবুর হাঁটুর কাছটা খামচে ধরল হেমপ্রভা। ভূধরবাবুর সমস্ত রক্তধারা অকস্মাৎ গতি হারিয়ে বরফের মতো শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন তিনি, এই ভয়ই করছিলেন! এখন স্ত্রীর মুখ থেকে একই আশঙ্কা উচ্চারিত হওয়ামাত্র ভূধরবাবু যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে কাঠের পুতুল হয়ে গেলেন।

সদর-কপাটে করাঘাতের শব্দ প্রবল হয়ে উঠেছে। অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ হাতের আঘাত। কেউ যেন চিৎকাব করে কিছু বলছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

এত রাত্রে এই বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই বাইরে নেই। থাকার কথা নয়। যা দিনকাল! এখানে কার্ফু, ওখানে কুম্বিং, সেখানে গুলি। সন্ধ্যা হতে না হতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক-একটা এলাকার উপর। এখানে-ওখানে পড়ে থাকে মানুষের মৃতদেহ। ভয়ে উত্তেজনায় সারা শহর সন্ধ্যা থেকেই কাঁপে। রাত দশটা বাজতে না বাজতে শহরের সমস্ত কোলাহল থেমে যায়। ট্রাম-বাসের গতি উর্ধ্বশ্বাস পলায়নপর হয়। এই গলিপথগুলো মৃত অজগরেব মতো এঁকেবেঁকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। কদাচিৎ কারও পায়ের শব্দে আশপাশের বাড়ির লোকেরা চমকে ওঠে। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও দরজা জানলা খুলে শোওয়ার সাহস পায় না কেউ। রাতের দিকে জোরে চেঁচিয়ে মা ছেলের নাম ধরে ডাকতে ভয় পায়।

এই পুরোনো ত্রিতল ভাড়াবাড়ির খোপে খোপে যারা থাকে তারা দশটা বাজার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ে। তার কিছু পরে সদর দরজায় খিল দেওয়া হয়। কাঠের শক্ত মজবুত খিল।

এ ব্যবস্থা আগে ছিল না। সারারাত হাট করে খোলা থাকত দরজা। মধ্যরাত পর্যন্ত লোক যাওয়া-আসা করত। অযত্নে অব্যবহারের চওড়া দরজার একটা পাল্লা ভেঙে পড়েছিল, কবজাগুলো জং ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পাড়ায় গোটা দুই খুন হওয়ার পর বাড়ির বাসিন্দারা ভয় পেয়ে যায়। তারপর তিন নম্বর খুনটা এই বাড়ির গায়ে গায়ে হওয়ায় ভয়টা রীতিমত আতঙ্কে পরিণত হয়। নীচের তলার

মনোহর পাল দোতলার কম্পাউন্ডার অনিল দাসকে একদিন ফিসফিস করে বলে, 'রাতে কারা যেন আসে উঠোনে। দাঁড়িয়ে জটলা করে।'

অনিল দাসের মুখে শুকিয়ে ওঠে, 'কারা আসে?'

—কী করে বলব? ভয়ে বেরই না ঘর থেকে।

তিনতলার সরোজবাবুর চাকর বৃন্দাবনও বলে, 'সে দিন আমিও দেখেছি। উঠোনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কারা কথা বলছিল।'

—খালি হাত?

—না বাবু। কী যেন ছিল হাতে, বুঝতে পারিনি...

শুনে মনোহর ও অনিল দুজনেরই বুক কাঁপতে থাকে। কথাটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করার সময় হয় না। তার আগেই ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে যায়; সবাই শোনে, সদর দরজা খোলা পেয়ে গভীর রাতে কারা যেন আসে। উঠোনের বাঁধানো চত্বরে গোল হয়ে বসে শলাপরামর্শ করে। সিগারেটের লাল আগুনে তাদের চোখমুখ চকচক করে। তাদের হাতের কাছে শোয়ানো থাকে লম্বা লোহার রড, বন্দুক, ধারালো তরবারি...

বাসিন্দারা আঁতকে ওঠে, 'কী সর্বনাশ! পুলিশ ঢুকবে ঘরে ঘরে। ঠেঙিয়ে মাথার ঘিলু বের করে দেবে।'

সরোজবাবুর বউ বলে, 'কেন, আমাদের কী দোষ!'

অনিল দাস নীচের থেকে চেঁচায়, 'এখন দোষগুণের বাছ-বিচার নেই বৌদি, পুলিশের ওপর ঢালাও হুকুম, ধরো আর মারো! বউবাচ্চা মানে না।'

এই বাড়ির প্রবীণতম মানুষ ভূধরবাবু। আর বছর খানেকের মধ্যে চাকরি থেকে রিটায়ার করবেন। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র ছেলেকে অনেক কষ্টে ডাক্তারি পাশ করিয়েছেন। সে এখন মুর্শিদাবাদের এক হেলথ সেন্টারে কাজ করে। এ বাড়ির সকলেই ভূধরবাবুকে সমীহ করে। উপদেশ পরামর্শ নিতে আসে। সব শুনে ভূধর বললেন, 'সদর দরজার পাল্লা ঠিক করুন আপনারা, মজবুত খিল লাগান। রাত সাড়ে দশটায় খিল এঁটে দেবেন।'

পরামর্শটা মনোমত হয়। বাড়ির গঠনটা এমন যে বাইরের দরজা বন্ধ করলে ভেতরে ঢুকবার পথ থাকে না। চারদিকে নোনাধরা ইটের দেওয়াল ছোটো ছোটো সেকেলে জানলা নিয়ে সোজা খাড়া হয়ে থাকে। এমনকি দরজার উপরে সিঁড়ির চাতাল থাকায় ওই দিকটাও নিরাপদ। কারও টপকে আসার জো নেই।

পাল্লা মেরামতের জন্য বাড়িওলার কাছে তদ্বির চলে। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা বেঁধে বাড়ির স্বত্ব-স্বামিত্ব এখন হাইকোর্টের রিসিভারের হাতে। কেউ কানে তোলে না। শেষপর্যন্ত ভাড়াটেরাই চাঁদা তুলে নতুন কাঠের পাটা, স্ক্রু, কবজা, লোহার খিল কিনে আনে। বাড়ির ভেতরটা ভাঙাচোরা, চুনবালি খসে খসে পড়ে, দমকা হাওয়ায় জানলা-কপাট থরথর করে কাঁপে। তা কাঁপুক, বাইরের দরজাটা শক্তপোক্ত হোক! এখন সময় বড় ভয়ানক। বাইরের গোলমাল যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা চাই। নইলে কেউ নিরাপদ নয়। সকলেরই ধনমানপ্রাণ বিপন্ন।

ঠিক হয়, রাত এগারোটায় বৃন্দাবন দরজা বন্ধ করবে। তারপর শুয়ে থাকবে সিঁড়ির চাতালে। কেউ ডাকাডাকি করলে সে এই বাড়িরই লোক কি না ভালো করে জেনে-বুঝে দরজা খুলবে। এর জন্যে প্রতি মাসে সে কিছু টাকা পাবে। বাসিন্দারাই দেবে চাঁদা করে।

কয়েক সপ্তাহ নিরুপদ্রবে কাটে। ইতিমধ্যে পাড়ায় পুলিশের চর সন্দেহে নামকরা একটা দাগি গুন্ডা খুন হয়ে যায়। তার লাশটা ভাঙা শিব মন্দিরের কাছে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকে। না অ্যাম্বুলেন্স, না পুলিশভ্যান— কেউ নিতে আসে না। ঘন্টা দুই পরে মিলিটারি এসে ঘিরে ফেলে গোটা পাড়া। শুরু হয়ে যায় ক্যুম্বিং। পাড়ায় ছাত্রদের একটা মেসবাড়ি থেকে গোটা কয়েক ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় ওরা। পরের দিন ভোরবেলা চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায় নিকটবর্তী সদর রাস্তার ধারে, ভবানী মিত্তির লেনের গলিতে।

তারও দু দিন পরে এই বাড়ির সদর দরজার কড়া সশব্দে বেজে ওঠে। চাতাল থেকে সদ্য-ঘুমভাঙা গলায় বৃন্দাবন সাড়া দেয়, 'কে বটে? এত রাতে?' বাইরে থেকে গালিগালাজের সঙ্গে জবাব আসে, 'তোর বাপ, বাঞ্চোত, জল্‌দি খোল, নেহি তো তোড় দেঙ্গে!'

গলা ও ভাষা শুনে বৃন্দাবন খাড়া হয়ে ওঠে। কী করবে ঠিক করতে পারে না। উপরের হরিশ সামন্ত মদ গিলে মাঝে মাঝে মধ্যরাতে এসে দরজা ধাক্কায়। খুলতে দেরি হলে খিস্তিখাস্তা শুরু করে, 'কোন শুয়োরের বাচ্চা দরজা বন্ধ করেছে, কার হুকুমে বন্ধ করেছে, আমি কি শালা মাগনা থাকি! আভি খোল্ দরজা।' কিন্তু এদের হরিশের মতো বেহেড মাতাল মনে হচ্ছে না। ভারী বুটজুতোর খট্‌খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে টর্চের জোরালো আলো ঝিলিক দিচ্ছে। বৃন্দাবন দরজার কাছে এসে খুলল না। ভয় পেয়ে বোকা বনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ইতিমধ্যে দরজায় সবুট পায়ের লাথি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বাজল। টর্চের ঊর্ধ্বমুখী আলো বাড়ির জানলা-দরজায় হিংস্রভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই তীব্র পরিষ্কার আলোর সর্বত্র অবাধ সঞ্চরণ দেখে বৃন্দাবন পায়ে পায়ে পিছিয়ে প্রথমে রামদাস পরে মনোহরের দরজায় ঘা দিয়ে বলল, 'বাবু, উঠুন, উঠুন শিগ্‌গির...'

রাতেরবেলা রামদাস বালবাচ্চা নিয়ে মড়ার মতো ঘুমোয়। তার সাড়া পাওয়া গেল না। মনোহর দরজা খুলে বাইরে এল, 'কী হয়েছে? কারা?'

বৃন্দাবন বলল, 'পুলিশ! ওই শুনুন বুটজুতোর শব্দ!... দরজা খুলব?'

—খুলবি? তা ইয়ে, খুলে দে। আমরা কী করেছি? আমাদের কী দোষ!

—তা হলে খুলছি বাবু?

—হ্যাঁ, খুলে দে! আমরা কী করেছি...

—আপনি একটু দাঁড়িয়ে থাকুন বাবু...

—থাকব? আমি? আচ্ছা, আছি, যা...খুলে দে!

বৃন্দাবন সাহস পেয়ে দরজা খুলতে গেল। তার পেছনে মনোহর। খিল খোলামাত্র দরজার একটা পাল্লা বৃন্দাবনের মুখে এসে আছড়ে পড়ল। তার নাকটা এক পাশে বেঁকে গেল, কপালে কিছু অংশ দেখতে দেখতে জামরুলের মতো ফুলে উঠল। মাথা ঘুরে বৃন্দাবন মাটিতে বসে পড়বার আগে তলপেটে আর একটা সদর্প লাথি এসে তাকে শুইয়ে দিল। কাণ্ড দেখে মনোহর ছুটে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, —'শালা, এতক্ষণ দরজা খুলতে কী হচ্ছিল'—বলে কে যেন রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় মারল। টর্চের ঝলসানো আলোতে মনোহর নিজের ক্ষতস্থানের রক্ত নিজেই টপটপ করে ঝরতে দেখল।

তারপর সারা বাড়ির ঘরবারান্দা জুড়ে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কেউ কিছু ভালো করে বোঝার আগেই উদ্যত রাইফেল আর জোরালো টর্চের মুখোমুখি চোখ বন্ধ করে হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। মেয়ে-বউরা খোলামেলো হয়ে শুয়েছিল, জেগে উঠে শাড়ি-সায়া গুছিয়ে নিতে ভুলে গেল। নিবারণের পিসি বাচ্চার মুখ শক্ত হাতে চেপে ধরে কান্না বন্ধ করতে চাইল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীলবর্ণ মুখে বাচ্চাটা প্রায় শক্ত হয়ে গেল। বুটজুতোর লাথি খেয়ে নীলমণির বেড়ালটা দোতলা থেকে সটান উঠোনে ছিটকে পড়ল। তিনতলার একটা পাখির খাঁচাও উঠোনে ছিটকে পড়া পাখিটা বিকট আর্তনাদ শুরু করল।

আরও কয়েক মুহূর্ত পরে তিনতলার ভুবনমাস্টারের ঘর থেকে বড় ছেলেকে ওরা চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করল। ভুবন বাধা দিতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে একপাশে ছিটকে পড়লেন। তার স্ত্রী বাইরে বেরতেই পারল না, একটা লোমশ পুলিশি হাত তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজার শেকল তুলে দিল। আর্ত চিৎকারের সঙ্গে বন্ধ কপাটে মাথা কুটতে কুটতে সে যখন জ্ঞান হারাল, তখন ভীতবিবর্ণ একরাশ মানুষের মধ্য দিয়ে পশুকে বধ্যভূমিতে টেনে নেওয়ার মতো নিষ্ঠুর পৈশাচিক উল্লাসে কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেটাকে টানতে টানতে ওরা সদর্পে বাড়ির বাইরে চলে গেল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির প্রভাতে এই বাড়ি থেকে

মাইলখানেক দক্ষিণে একটা মাঠ ও পুকুরের মধ্যবর্তী জায়গায় আরও একটি সমবয়স্ক মৃতদেহের সঙ্গে এই ছেলেটিরও গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ আবিষ্কৃত হল।

কদিন ধরে বাড়িটা শোকে-দুঃখে ভয়ে-বেদনায় স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে থাকল। রেডিওতে প্রাত্যহিক খবর ছাড়া গান বাজল না। সন্ধ্যারাতে শশাঙ্কর ঘরে তাসের আসর বসল না। মনোহর একটু খরচ করে ছেলের মুখেভাত দেবে ভেবেছিল, দিনটা পিছিয়ে দিল। সরোজবাবু তাঁর বড়োছেলেকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ভূধরবাবুর পুরোনো বুকের ব্যথা ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় অফিস থেকে কদিন ছুটি নিলেন। ছেলেকে চিঠি দিতে গিয়েও দিলেন না, যদি চলে আসে—কলকাতা নামক এই বধ্যভূমে!

দিনেরবেলায় তেমন সাড়াশব্দ নেই কিন্তু রাত্রির দিকে ভুবনমাস্টারের স্ত্রীর কান্নার শব্দ কখনও নিম্নগ্রামে, কখনও উঁচুপরদায় এই বাড়ির ইট-কাঠ-দরজা-জানলা-আসবাবপত্র ছুঁয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। একটা সকরুণ বিষণ্ণতা ঘরে ঘরে সংক্রামিত হয়ে গেল। কান্নাটা না থামা পর্যন্ত ভূধরবাবু কদিন কিছুতেই ঘুমোতে পারলেন না। হেমপ্রভার চোখেও জল ছলছল করতে লাগল।

বৃন্দাবন জানাল, সে আর নীচে দরজা আগলে শোবে না। পাঁচ কেন পঞ্চাশ টাকা দিলেও না। জীবনের চেয়ে টাকা কী বড়ো! উপায় থাকলে সে এখানকার কাজ ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে যেত—এখানে প্রাণের কোনও দাম নেই।

শেষ পর্যন্ত ভূধরবাবুর মধ্যস্থতায় ঠিক হল, শশাঙ্ক দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে যাবে। রাতে কেউ ডাকাডাকি করলে যার ঘরের লোক সে দরজা খুলে দেবে, অন্য কেউ উঠবে না।

কিন্তু রাত এগারোটার পর এ বাড়ির কোনও লোকই বাইরে থাকল না। এমনকি বদ্ধ মাতাল হরিশও দশটার মধ্যে ঘরে ফিরে কিছুক্ষণ আপন মনে চেঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। শশাঙ্কর প্রতিবেশী বিষ্টু তিন নম্বর শিফটের কাজ শেষ করে বাকি রাতটুকু কারখানাতেই শুয়ে কাটিয়ে দিতে লাগল। বাসিন্দারা বন্ধ দরজার অন্তরালে ঘুমের মধ্যে কখনও বোমা বা ক্র্যাকার, কখনও রাইফেলের গুলি ফাটার প্রচণ্ড শব্দে বউ-ছেলেমেয়েসহ চমকে জেগে উঠে—শব্দটা বাড়ির কত কাছাকাছি তার হিসেব শুরু করল। তারপর কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ নির্বাক থেকে যখন বুঝল এ বাড়ির দরজার কাছে এখনও দলবদ্ধ ভারী বুটজুতোর শব্দ উঠছে না বা কড়া ধরে কেউ বেপরোয়া খট্‌খট্ শব্দ তুলছে না—তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত হয়ে অথচ বুকের গভীরে সন্দেহজনক একটা আতঙ্ক গোপন রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। ওই দরজাটা তাদের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়—অভিজ্ঞতায় তা জানার পরেও কেমন অসহায় দুর্বলভাবে ওরই উপর নির্ভর করে মানসিক স্বস্তি খুঁজতে চাইল।

...বেশ কিছুদিন পরে দরজার কড়া আবার নড়ে উঠেছে। জীর্ণ বাড়িটার ঘরে ঘরে তার প্রতিধ্বনি। হয়তো সবাই জেগেছে, শুনেছে, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র সাড়া নেই। গভীর রাতে গোটা বাড়িটা যেন আরও বেশি ঠাণ্ডা নিঃশব্দ হয়ে গেছে। শুধু প্রাণহীন সেই শীতলতার বুকে ধাতব শব্দের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।...ভূধরবাবু চাপাগলায় বললেন, 'আলোটা জ্বালাই?'

হেমপ্রভা বাধা দিল, 'না, কী দরকার!'

—ঘড়িটা দেখতাম।

—কী হবে? চুপ করে থাকো, কথা বোলো না।

ভূধরবাবু চুপ করে গেলেন।...কাছেই কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছে। রুগ্‌ণ শিশুর কান্নার মতো কেমন কাঁপাকাঁপা গলা। গভীর রাতে এমন করে কুকুর-বেড়ালের কান্না ভালো না। গ্রামে মড়ক লাগে, শহরে দুর্ভিক্ষ আসে, যে গৃহস্থ শোনে তার অমঙ্গল হয়। ভূধরবাবুর বুকের ভেতরে যেন ঝড় বইতে লাগল। স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়ছে। কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। হেমপ্রভাকে একটু জল দিতে বলবেন সে সাহসও নেই। তা হলে সুইচ টিপে আলো জ্বালতে হবে, কুঁজোয়-গ্লাসে ঠনঠন শব্দ হবে। এখন এই মুহূর্তে তাঁরা কেউ আলো জ্বালতে চায় না। কোনও শব্দ তুলতেও চায় না। সেবার মাতাল হরিশের

ঘরে আলো জ্বলতে দেখেই তো বেদম পিটিয়েছিল তাকে। সে নাকি জেগে ছিল, তবু দরজা খোলেনি। মাতালেরা তো মাতাল চেনে না!

একটানা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হেমপ্রভা আবার ফিসফিস করে বলল, 'কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না!'

ভূধরবাবু বললেন, 'কে দেবে?'

—ওরা দরজা ভেঙে ঢুকবে।

—ভেঙে?

—হ্যাঁ!

দুজনেই আবার চুপ করে গেল। সেবারের কথা নতুন করে মনে পড়ল। বিশেষ করে ভুবনমাস্টারের ছেলের কথা। মাঠ থেকে কুড়িয়ে লাশটা আনা হয়েছিল বাড়িতে। রক্তমাখা বীভৎস ক্ষতবিক্ষত দেহ। কেউ যেন সাঁড়াশি দিয়ে গায়ের মাংস খুবলে নিয়েছে, মাথার চুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়েছে, একটা চোখ উপড়ে ফেলেছে। তার ওপর বুক জুড়ে দগদগে গুলির চিহ্ন! মৃতদেহ দেখে ভুবনমাস্টার জ্ঞান হারালেন। ভূধরবাবুও মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। মনোহর তাঁকে ধরে উপরে নিয়ে আসে।

ভূধরবাবু আজও জানেন না ছেলেটা কেন মরল, তার অপরাধ কী! কানাঘুষোয় অবশ্য নানা কথা শুনেছে। তবে এ বাড়ির সকলেরই সন্দেহ, ছেলেটার সঙ্গে নাকি তাদের যোগাযোগ ছিল যারা বন্দুক কেড়ে বেড়ায়, জোতদার-জমিদার-পুলিশ খুন করে। মাস দুই আগে ছেলেটি যে একমাসের জন্য নিখোঁজ হয়েছিল এবং ইদানীং সে যে প্রায়ই রাত্রে ঘরে থাকত না, এ কথাটাও প্রথম জানলেন ভূধরবাবু। ভুবনমাস্টার অবশ্য বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগের দিনও বলে গেছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ, নিরপরাধ, শুধু সন্দেহের বশে...

আসল সত্য কেউ জানে না। ভুবনমাস্টারও জানেন না। সবই অনুমান, শোনা কথা। আদালতে বিচার হলে হয়তো কিছু বোঝা যেত, জানা যেত। কিন্তু তা তো হল না। সাক্ষীসাবুদে দলিলপত্রে তাকে তো অভিযুক্ত করা হল না। বিনা প্রমাণে, বিনা বিচারে তরতাজা একটা ছেলে খুন হয়ে গেল। আর হল তাদেরই হাতে অভিযোগ এনে আদালতে অপরাধ প্রমাণ করার দায়িত্ব যাদের ওপর। এটা কেমন করে হল? কেন হল?

ছেলেটি মরার পর থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন ভূধরবাবু। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। আর না পেয়ে এই শেষ বয়সে থানা-পুলিশ সম্পর্কে কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। রাইফেল হাতে ওদের কাউকে কোথাও দেখামাত্র কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। নাগরিক হিসাবে ওদেরই হাতে তাঁর জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা—কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। রাইফেলধারী এক একটা পুলিশকে এক একটা জীবন্ত ঘাতক বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

না হলে পুলিশের নাম শুনে ভয় পাবেন এমন মানুষ তিনি নন। এক সময় তাঁর চার মামার দুই মামা টেররিস্ট দলের সদস্য ছিলেন। কথায় কথায় ইংরেজের পুলিশ ঢুকত বাসায়। বড়মামাকে কোনওদিন ধরতে পারেনি। সেজমামা ধরা পড়েছিলেন। তিন বছর ধরে আদালতে বিচার হয়েছিল। বিচারে দশ বছর জেলও হয়েছিল। কিন্তু রাজবন্দির সম্মান পেয়েছিলেন সেজমামা। এখনও জীবিত আছেন। মাস গেলে কিছু টাকা যেন ভাতা পান স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসেবে। মাঝে মাঝে সেটা বন্ধ হয়ে গেলে তদ্বির-তদারকের জন্য ভূধরবাবুকে চিঠি দেন। শৈশবে অনেকদিন মামাদের বাসায় কাটিয়েছেন ভূধরবাবু। বিচারের সময় আদালতে গেছেন দু-একবার। তখন তো দেশটা পরাধীন ছিল। এখন এই মুক্ত স্বাধীন-স্বদেশে কী ভয়ঙ্কর নিয়ম চালু হল! বিচার নেই, প্রমাণ নেই, শুধু সন্দেহের বশে, ইচ্ছে হলেই...

সেই কুকুরটা এখনও কাঁদছে। কী কর্কশ করুণ কণ্ঠস্বর! শহরে-গ্রামে একটা মড়ক-মহামারী কি আসন্ন? একটা ভয়ঙ্কর কোনও পরিবর্তন?

দরজায় এখন ক্রুদ্ধ লাথি পড়ছে। ওরা কি ভেঙে ফেলবে? একটা মানুষও উঠবে না? সত্যি সত্যি যদি দরজা ভেঙে ঢোকে...একতলা দোতলা পার হয়ে দলবেঁধে এই তিনতলায় যদি উঠে আসে...

ভাবতে গিয়ে ভূধরবাবুর শিরা-উপশিরা ঝনঝন করে বেজে উঠল। নিজের ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজার দিকে বিপর্যস্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না বলে চোখ জ্বালা করে উঠল। মাথায় অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত ভয় পেতে পেতে এখন ভয়ের অনুভূতিটাই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। তাঁর মনে হল কুকুরের কর্কশ কান্নার সঙ্গে দরজার বুকে প্রবল করাঘাতের শব্দ মিলেমিশে এই ঘরের বায়ুমণ্ডলে ভয়ঙ্কর একটা ধ্বনিবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর শব্দায়মান বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হতে হতে ঘূর্ণিঝড়ের মতো হেমপ্রভাসহ তাঁকে গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসছে।

অনেকটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ভূধরবাবু শরীরটা শক্ত করে ফেললেন। দু হাত মুঠো করে আবার খুলে দিলেন। তারপর সহসা বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলেন নীচে। সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে আলো জ্বালিয়ে ফেললেন। হেমপ্রভা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী করছ! নেভাও, শিগ্‌গির নেভাও...'

ভূধরবাবু উত্তর দিলেন না। স্ত্রীর ভয়ার্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সারা ঘরময় পরিব্যাপ্ত পরিষ্কার উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখলেন। তারপর আবার কান পেতে শুনলেন সেই শব্দটা...

এখনও কি কেউ শোনেনি? ঘরে ঘরে সব মানুষ কি বোবা-কালা? সবাই কেন একসঙ্গে উঠে দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে না? সেবার সবাই যদি একসঙ্গে দাঁড়াত, যদি ঘরে ঘরে বাতি নিভিয়ে খিল দিয়ে কাপুরুষের মতো লুকিয়ে না থাকত, সবাই যদি একজোট হয়ে ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে থানায় যেত, প্রমাণপত্র দাবি করত, আদালতে মামলা তুলতে বলত, তা হলে কি প্রাণে বাঁচত না সে? মরত অমন করে? অন্তত সব জানাজানি তো হত!

আজ কপাটে করাঘাত কার জন্য? কার ছেলেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা? কোন্ ঘরের, কোন্ মায়েব ছেলে?

ভুবনমাস্টারের ছেলের রক্তমাখা মুখটা মনে পড়ল আবার। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলের। দেওয়ালেব দিকে তাকালেন ভূধর। ফ্রেমে বাঁধানো অমলের ছবি। কনভোকেশনের কালো পোশাক পবনে, হাতে গোল করে ধরা সার্টিফিকেট। মুখখানা কচিকাঁচা, টলটলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ভুবনমাস্টারের বউয়েব কান্না শুনলেন, 'ওরা আমার কী সর্বনাশ কবে গেল গো..'

ভূধরবাবু শক্ত সবল হাতে নিজের ঘরের দরজা খুললেন। বিছানা থেকে ত্রস্তভাবে নেমে এসে হেমপ্রভা কী যেন বলল, শুনতে পেলেন না। দরজার খিলটা হাতে নিয়েই বাইরের বারান্দায় এসে অস্থিব উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, 'কে দরজা ধাক্কায়? কে? আমি ভূধর বলছি, ওঠো দেখি তোমরা, ওঠো সব...' □

জনৈক অষ্টাদশীর আত্মবিশ্লেষণ

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

এক

পাপপুণ্যে মোড়া মানুষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মিছিলের পাশ কাটিয়ে আমাকে এখন চলতে হচ্ছে। কারণ, পেছনে একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অশ্লীল হাত কালো রবারের মতো বাড়তে বাড়তে আমাকে ধরতে আসছে। কিন্তু আমাকে ছুঁতে পারছে না, পারবে না আর কোনওদিন। চলতে চলতে শুনতে পাচ্ছি বুকের মধ্যে সেলাইকল চালাবার অবিরাম শব্দ।

অষ্টাদশীর আত্মবিশ্লেষণ

ওপরের কোটেশানটা আমার। আজকের বিশ্রী ঘটনাটা আমার মনের মধ্যে ওই কথাগুলো বসিয়ে দিয়েছে। 'ধনতান্ত্রিক সভ্যতা' কথাটি সহজভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল সুমন্ত্র। স্কুলে এ সব নিয়ে আলোচনা করতেন অর্থনীতির দিদিমণি হৈমদি। আজকের ঘটনাটার জন্য আমার মনটাকে বিক্ষোভ ক্রমশ গিলে খাচ্ছিল। আমার আপাদমস্তক রাগ প্রাথমিক চিকিৎসার মতোই পরিবারের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। পরিবার বলতে আমার বাবা শ্রীযুক্ত প্রতাপ সেনগুপ্ত যিনি অম্বলরোগে ভোগেন, যিনি বি-বি-ডি বাগে পিওনের কাজ করেন, যিনি রাত দশটা পর্যন্ত ধুঁকছেন। আরও একটা অতিরিক্ত কাজ সেরে আমাদের বস্তির ঘরে ফেরেন। একটা ঘর, লোক সাতজন। দিনের বেলায় যে টিনের ঘরে অন্ধকার জন্মগত অধিকার নিয়ে বসে থাকে চিরকাল (চিরকাল কি?), সেই ঘরে ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে মধ্যরাতে বসে থাকতে হয় বর্ষার দিনে পালা করে। সাকুল্যে আমার বাবা মাসে ঘরে তোলেন তিনশ টাকা। সাতজনে চলে কখনও? একমাত্র ভাত ডাল রুটি পোস্ত আর চা খেয়ে টিকে আছি কোনও রকমে। প্রতি মাসে উত্তরবঙ্গের বন্যার মতো জিনিসের দাম বুকের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে বাড়ছে। ছোটোবেলায় প্রায় দিনই মাছ খেতাম। এখন মাছের দাম ছোঁওয়া যায় না। নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে পুঁটি ট্যাংরা আসে বইকী, তাও বেশিরভাগ দিন পচা জোটে।

এগারো ক্লাসে উঠেই স্কুলের পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছে। চিরকাল পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। প্রমোশন আনতে গিয়ে জানতে পারলাম নব্বই টাকা বাকি। এতদিন আমাকে ছাত্রী হিসাবে ভালো ছিলাম বলে দয়া করে পড়তে দিয়েছে, তাও জানিয়ে দিলেন হেডমিস্ট্রেস। নব্বই টাকা বাবার পক্ষে শোধ করা সম্ভব ছিল না, আমি জানতাম। কিন্তু বাবা কেন মিথ্যা বলতেন, আমি প্রতি মাসে মাইনে জুগিয়ে যাচ্ছি খেয়ে না খেয়ে মেয়ের পিছনে। এখন বাবা বললে মুখের ওপর বলতে হয় : কী করেছ আমার জন্য? লেখাপড়া শেখাতে পারলে? একটু ভালো খাবার, একটু ভালো জামাকাপড় দিতে পেরেছে কোনওদিন? কোথাও কোনওদিন এই অন্ধকার গুমটি ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছ? আমার স্কুলের বন্ধু বাবলিদের মতো পুরীতে সমুদ্রের ধারে বা দার্জিলিঙে পাহাড়ের দেশে? কোনওদিন দু-একটা পয়সা দিয়েছ খুশিমতো খাবার কিনে খাব? পারবে কোথাও একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে? পারবে না বাবা। কোনওদিন পারবে না। অতএব চুপ করে থাক। শুধু দেখবে রাতে ঘরে ফিরি কি না।

মাঝে মাঝে ঝগড়া হলে রাগের মাথার দিই শুনিয়ে এ সব কথা। আশ্চর্য, বাবা আমাকে কিছু বলতেন না। বাড়ির সবাইকে তিনি বকেন, অশ্লীল গালাগালি করেন, এমনকি মারধোর করেন। কিন্তু আমাকে না। আমাকে করেন না বলেই, যে দিন আমি রুগ্ণ বাবাকে মুখ করি, সেদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পর রাত

বারোটা-একটায় কেঁদেকেটে বালিশ ভিজিয়ে ফেলি। ভাবি, বাবার কী দোষ? রাগে বলি, জানি বাবার কোনও দোষ নেই, সমাজ ব্যবস্থার দোষ। কারণ বাবা সংগ্রামে বিশ্বাসী, সততায় বিশ্বাসী। কার জন্য কষ্টকে বহন করে চলছে। অথবা হয়তো নিয়তি। কিন্তু নিয়তি আমি মানি না। ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে না। শব্দহীন রাতে জেগে থাকে পাশের ঘরে পিতৃহীন খোঁড়া মেয়েটার সেলাইকল চালাবার অবিরাম শব্দ। সেই শব্দের ভিতর তলিয়ে যেতে যেতে একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

এমনকি আমার মাও আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। অভাবের ফুটোটাকে কীভাবে বুজিয়ে দেওয়া যায় এ নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত। আমরা ডজন হিসাবে পুঁতির মালা গাথি, কখনও ডজন হিসাবে জামার বোতাম লাগাই, কখনও ঠোঙা তৈরি করি, কখনও রুমালে ফুল তুলি। সে সময় হঠাৎ লোকজন এলে সকল কিছু চৌকির নীচে ঢুকিয়ে দরিদ্রতার উজ্জ্বল চিহ্নগুলি ঢেকে রাখি। এবং মধ্যবিত্ত চেহারাটাকে বের করে রাখি। লোকজন বলতে প্রায়দিন আমাদের ঘরে পাড়ার অনেক রকম ছেলের দল আসে। মাঝে মধ্যে দূর সম্পর্কের সচ্ছল আত্মীয়স্বজনরাও আসে নিমন্ত্রণের কার্ড নিয়ে। পাড়ার ছেলেরা কেউ মাকে বউদি বলে, কেউ মাসিমাও বলে। এদের মধ্যে অনেকে ঘরে বসে করার মতো খুচরো কাজ জোগাড় করে এনে দেয়। অনেকের কাছ থেকে মা টাকা ধার চায়। চায় ধার বলেই। কিন্তু শোধ দেয় না। ওরাও জানে শোধ দিতে পারবে না কোনওদিন। কতসময় এভাবে টাকা চেয়ে রেশন তুলতে হয়েছে আমাদের। এদের মধ্যে রতনের দৃষ্টি এবং চলাফেরা আমার খারাপ লাগে। টাকা চাইলেই যেমন করে হোক রতন টাকা জোগাড় করে আনবেই। একবার ভীষণ পেটের যন্ত্রণায় বাবার শরীর নীল হয়ে উঠেছিল। মাসের শেষ, হাতে কয়েকটা খুচরো পয়সা ছাড়া একটাও পয়সা ছিল না। সে সময় রতনই ভিজিট দিয়ে ডাক্তার এনে দিয়েছিল এবং ওষুধপত্র কিনে দিয়েছিল। আর তারপর দিনই রতন দুটো সিনেমার টিকিট কেটে এনে ঘরের মধ্যে সকলের সামনে বলেছিল— 'চলুন বৌদি সিনেমা দেখে আসি। সময় নেই।' মার হাতে ছিল হরলিকসের গ্লাস, গতরাতে রতনই কিনে এনেছিল। বাবার রক্তশূন্য চোখের করুণ ইশারায় আমার হাতে হরলিকসের গ্লাস দিয়ে মা শাড়ি পালটাতে পাশের ঘরে চলে যায়।

আর আমার চোদ্দো বছরের ছোটো বোন ইলু যার শরীর ইতিমধ্যে বেড়ে উঠছে, রোগা হলেও সুন্দর লাগে, যে কর্পোরেশনের স্কুলে বিনা পয়সায় পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে সে আমার ছোটো ভাইবোনদের সামলায়। আমাদের পরিবারে আমার আর মার শরীরের বাঁধন ভালো। আর এই শরীরের বাঁধন আমাকে আর মাকে স্বার্থপর করে তুলেছে। সত্যি কথা বলতে কি গাদা গাদা রুটি আমি আর মা লুকিয়ে লুকিয়ে চায়ের সাথে ভিজিয়ে খেয়ে নিই। আমি প্রায়দিনই লক্ষ করি রতনের লালসার হাতটা রবারের মতো বাড়তে বাড়তে আমাদের ছুঁতে আসছে। 'রবারের মতো হাতকে বাড়িয়ে দেওয়া' কথাটা আমি শিখেছি আমাদের বস্তিবাসী রমলামাসির কাছ থেকে। রমলামাসি ঝিয়ের কাজ করে। রমলামাসি রবারকে 'রবাট' বলে।

রতন সম্পর্কে একদিন মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমাদের মান ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবার কাছে ছোটো হয়ে যাচ্ছি। তোমার ছেলেমেয়েরা বড়ো হচ্ছে। কী দরকার রতনকে প্রশ্রয় দেওয়া। কোনওরকমে তো ডাল ভাত রুটি খেয়ে চলে যাচ্ছে—এ সব পাপ মা।'

মা বলতেন, 'কী পাপ, কী পুণ্য বুঝি না। অভাব আমাদের এ সব বুঝতে দেয় না বুঝলি? এটা জেনে রাখ, রতনকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি।'

মা ঘৃণা শব্দটার ওপর প্রচণ্ডতম জোর দিয়ে উচ্চারণ করতেই আমার মনে ধাক্কা মারে সুমন্ত্রের কথা। সুমন্ত্র একদিন আমাকে বলেছিল, 'জান লীলা, অভাবটা হচ্ছে বন্যার মতো। মান ইজ্জত পাপ পুণ্য সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

আমি বলেছিলাম, 'এর প্রতিকার?'

সুমন্ত্র জবাব দিয়েছিল, 'অভাবটাকে সরিয়ে ফেলা। প্রথমেই পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, কারা অভাবের জন্ম দিচ্ছে। তাদের মেরে ফেলতে হবে, এই তো সহজ কথা। জীবাণুকে মেরে ফেলাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, জিইয়ে রাখা নয়।'

সুমন্ত্র নামটা আমি দ্রুত উচ্চারণ করতে পারি না। সেজন্য আমার মুখ থেকে সর্বদা 'সুমন্ত' বের হয়ে আসে। আমি ভাবি, মা-ও তো সুমন্ত্রের কথাগুলোই বলছে। তা হলে মা-ও কি সুমন্ত্রের কাছ থেকে এ সব শিখছে। কিন্তু শিখে যদি থাকে, গ্রহণ করতে পারছে না কেন? কেন সুমন্ত্রের বিপরীত শক্তি রতনকে প্রশ্রয় দেয়। আমার মনের মধ্যে তখন থেকেই দুটো শক্তির লড়াই শুরু হয়ে যায়। আমার মধ্যেকার এই দুর্বল লড়াই আমাকে আরও বেশি সচেতন, স্বাধীন এবং জেদি করে তোলে। ধীরে ধীরে লড়াইয়ের শিথিলতা আমার মধ্যে একটি স্বপ্ন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একমাত্র এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। আমি কীভাবে এই পচাগলা সমাজে খেয়েদেয়ে বাবার ওপর আর নির্ভর না করে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারি এটাই ছিল আমার একমাত্র স্বপ্ন। কীভাবে এই পাপের সমাজে আমার নির্মল স্বপ্নকে জিইয়ে রাখতে পারি এটাই ছিল আমার এই বয়সের একমাত্র সমস্যা এবং চিন্তা-ভাবনা।

প্রথম থেকেই আমি আমার নিজের অবস্থাটা বুঝে নিতে পেরেছিলাম। লেখাপড়ায় বেশিদূর এগোতে পারিনি। শিক্ষিত সচ্ছল পরিবাব আমাদের নয়, কারণ আমরা বস্তিতে বাস করি। যেহেতু আমরা বস্তিতে থাকি সেহেতু আমরা রুচিবান ভদ্র জীব নই। অর্থ এবং অর্থের পুঁজি আমাদের নেই। জমিজমা ঘরবাড়ি. দেশবাড়ি আমাদের নেই। শুধুমাত্র বাবার একটি অফিস আছে এবং সেই অফিসের যিনি অবাঙালি মালিক তিনি আমাদের কোনওরকমে বেঁচে থাকার অশক্ত সুতোটা ধরে আছেন। ওর মর্জির ওপর আমরা টিকে আছি। অতএব একমাত্র রুগ্ণ পিতৃদেবের শ্রমের বিনিময়ে কিছু পয়সা আমাদের অন্ধকার ঘরে টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। তবুও বাবার বুকের মধ্যে সর্বদা একটা ভয় প্রহরীর মতো জেগে আছে, ভাবে, যে দিন চাকরি থাকবে না, সে দিন আমাদের বস্তির ছয় বাই পাঁচ হাত ঘরটুকুও আর থাকবে না, পথে নেমে আসতে হবে। এমত ভয়টার জন্য সংগ্রামী চেতনা থাকা সত্ত্বেও আমার বাবা কোনওদিন অফিসের ধর্মঘটে বা ঘেরাও যোগ দেয়নি। ও সব থেকে দশ হাত দূরে থেকেছে। আবার অফিসের মালিকের হয়ে দালালি করে বা চুকলি করে উপরে উঠতে চেষ্টা করেনি। অতএব এমত অবস্থায় আমরা সমাজের কোন্ শ্রেণীতে অবস্থান করছি সুমন্ত্রদা?

যাক্, বাজনীতির ব্যাপারটা আমার মাথায় তখনও পরিষ্কাব ছিল না। এ সব ঘটনা আমার জীবনে সুমন্ত্র প্রবেশ করার আগে ঘটেছে। আমি বুঝি, শিক্ষা যখন নেই তখন আমার অফিসে ভালো চাকরি হওয়ার আশা নেই। শিক্ষা এবং পিতৃদেবের অর্থ যখন দুই-ই নেই তখন আমার সামাজিকভাবে বিয়ে হওয়ারও আশা নেই। তবে শরীরটা যখন আছে, তখন শ্রমও আছে এবং ভালোবাসাও আছে। শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে দশ ঘণ্টা খেটে আমাদেব বস্তির লোক বিধবা বিন্দুদি দৈনিক আড়াই টাকা পায় এবং আট বছরের ছেলেকে মানুষ করে। আর সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী আমার বন্ধু বেপাড়ার মেয়ে ভারতী যে কোনও পুরুষের সাথে মিশতে পারে ভালোবাসার জন্য। অতএব আমার সামনে বেঁচে থাকার দুটি পথ খোলা আছে। শ্রমের বিনিময়ে সামান্য কয়েকটা টাকা। সে কটি টাকার বিনিময়ে কোনও রকমে বেঁচেবর্তে থাকা। অথবা স্বাস্থ্যের বিনিময়ে ভালোবাসা প্রত্যাশা করা, এবং বিয়ে-থা করে স্বামী-সন্তান নিয়ে কোনও রকমে ছোট্টসুন্দরভাবে বেঁচে-বর্তে থাকা। অরাজনৈতিক মেয়েরা সাধারণত প্রথমে বেঁচে থাকার জন্য বিশ্বস্তভাবে দ্বিতীয় পথটাই বেছে নেয়। আমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলাম।

শরীর, বিশ্বাস এবং অগাধ ভালোবাসা নিয়ে আমি যাতায়াত শুরু করি আমার পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায়। ভারতীদের পাড়া। আমি থাকি শ্যামবাজার, ভারতী থাকে মানিকতলা। স্কুল থেকেই ভারতী আমার বন্ধু। আগে মাসে দু-একদিন যেতাম। আর এখন প্রায় দিনই যাই, হয় সকালে না হয় বিকেলে। কোনওদিন দু বেলাই। ভারতী অনেক ছেলের সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে ভালো লেগেছে গোপালকে। গোপালের আছে ইলেকট্রিকের দোকান। মাইক, লাইট, পাখা ভাড়া দেয়। ইলেকট্রিকের যাবতীয় বস্তু বিক্রি করে। লেখাপড়া বেশিদূর শেখেনি। দরকার নেই। বিশ্বাস, সততা, নিষ্ঠা ও সংগ্রামশীল মনোভাব এগুলোই আমার কাছে মূল্যবান। লেখাপড়া জানা ছেলেদের সম্পর্কে আমি আর অনভিজ্ঞ নই। ওরাও মেয়েদের মান ইজ্জত দিতে জানে না। বলিষ্ঠ চেহারার গোপলকে আমার ভালো লাগে ওর কথাবার্তায় এবং কাজের প্রতি

নিষ্ঠায়। গোপাল সকল কথা বলে, বিয়ের কথা বলে না। বেড়াবার কথা বলে, সিনেমার কথা বলে, ঘর-সংসারের কথা বলে না। উচ্চারণ করে না ভালোবাসার কথা। বলে না আমার সাথে ওর সম্পর্ক কী হতে পারে। তাই একদিন ভীষণ রেগে গেলাম। হঠাৎ সেই রাগটা প্রকাশ পেয়ে গেল পূর্ণশ্রী সিনেমার অন্ধকার হলের মধ্যে। আমি একটু জোরেই বলে ফেলি—'হাত সরিয়ে নিন। বিয়ে হলে সারাদিন পাবেন—'

চাপা আক্রোশে গোপাল বলল, 'তার মানে? তোমার মতো মেয়েকে আমি বিয়ে করব?'

আমি ঠাস করে গোপালের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলি, 'আমার গায়ে অনেক হাত দিয়েছেন। এই তার পুরস্কার। জানোয়ার লম্পট। ভদ্রচেহারার আড়ালে যে একটা পশু লুকিয়ে আছে বুঝতে পারিনি এতদিন, শেষের কথাগুলি বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে করতে অন্ধকার হল থেকে বাইরে এসে মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস টেনে নিলাম।

আজ এতদিন বাদে বুঝতে পেরেছি আজকের আধুনিক সভ্যতা এই পশুটাকে সৃষ্টি করেছে। বড়োলোকদের কুকুর পোষার মতোই এই সভ্যতার শহুরে নাগরিকেরা ওই পশুটাকে পোষ মানিয়ে রেখেছে। তফাত আছে সামান্য, বড়োলোকেরা গেটের সামনে 'কুকুর হইতে সাবধান' টানিয়ে রাখে। আর শহুরে নোংরাভাবে উপার্জনশীল নাগরিকেরা, যুবকেরা দামি দামি পোশাকের আড়ালে ভদ্র ভদ্র কথাবার্তায় ঢেকে রাখে।

বুকের মধ্যে আবার সেই ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ আওয়াজ শুনতে পাই। পাশের ঘরে পিতৃহীন খোঁড়া মেয়েটার সেলাইকল চালাবার অবিরাম শব্দ। আমি ক্রমশ বুঝতে পারছি, গোপাল অসীম নাগভূষণ এদের কাছে আমি ঘৃণার পাত্র, অবহেলার বস্তু। ওরা শরীরটাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য কিনে নিতে চায় কিংবা এটাই ঠিক আমার শরীরটা কয়েক ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিতে চায়। এর অধিক কোনও মানবিক মূল্য এদের কাছে আশা করা যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি, এই ধনতান্ত্রিক সমাজে লালসার কোলে বসে শিশুর মতো ভালোবাসাব চুষিকাঠি মুখে পুরে বাঁচার স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে হয়। আসলে ওরাও আমার মনে আরও বেশি ঘৃণাবোধ জাগিয়ে দিয়েছে ওদের সম্পর্কে।

এরপর সুমন্ত্রের সাথে আমার আলাপ হয়। সুমন্ত্রের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল বিন্দুদির ঘরে। বিন্দুদির একটি ভাই আছে। কারখানায় কাজ করে এবং রাজনীতি করে। আমরা বিন্দুদির ভাইকে নাটাদা বলি। নাটাদাব বন্ধু সুমন্ত্র। বিন্দুদির ঘরে মাঝে-মধ্যে মিটিং হয়, গোপন মিটিং। সুমন্ত্র সেখানে যাতায়াত করে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, ফরসা একটি ছেলের নাম সুমন্ত্র। চোখে চশমা। ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি, হাত গোটায় না, গলা পর্য্যন্ত বোতাম লাগানো ছেলেটির নাম সুমন্ত্র। পায়ে থাকে হাওয়াই চটি। বিন্দুদি বলেন, গরিব ঘরের ছেলে। মা অসুখে মারা গেছে। একসময় প্রেসিডেন্সিতে পড়ত।

দুই

পাপপুণ্য মোড়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন মিছিলের পাশ কাটিয়ে আমাকে এখন চলতে হচ্ছে। কারণ, পেছনে একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অশ্লীল হাত রবারের মতো বাড়তে বাড়তে আমাকে ধরতে আসছে, কিন্তু ধরতে পারছে না, পারবে না আর কোনওদিন। চলতে চলতে বুকের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি সেলাইকল চালাবার অবিরাম শব্দ।

আজকের ঘটনা অথবা যে কোনও একটি দিনের ঘটনা

গোপাল যে দিন আমার ভালোবাসার সৎ স্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল লালসার ধারাল নখে, সে দিনই সন্ধ্যার পর আমি বিন্দুদির কাছে গেলাম যদি প্লাস্টিকের কারখানায় যে কোনও একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারে এই আশায়। গিয়ে দেখলাম একটা ছোটো ঘরে মিটিং চলছে। আমাদের বস্তিতে যে গোপনে মিটিং হয় সে দিনই প্রথম টের পেলাম। পঞ্চাশঘর বস্তিবাসী আমরা। প্রায় তিনশ লোক। ছোট্ট মিটিং ঘরের চারদিকে চারটি ঘর। বাইরে থেকে ঘরটার হদিস পাওয়া যায় না। বস্তির লোকেরা আমাকে চেনে বলেই ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে বলল—বিন্দুদি ওখানে। গোটা দশেক লোকের মধ্যে এবং ম্লান কমলারঙের হ্যারিকেনের আলোয় সুমন্ত্রকে সহজেই চিনে নিতে পারলাম। এই সুমন্ত্রের সাথে বিন্দুদির ঘরে মাত্র একদিনই আলাপ

হয়েছিল। সে দিন সে আমাকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা কাকে বলে, সমাজের কোন্‌স্তরের মানুষ আমরা, কারা সমাজের অভাব সৃষ্টি করছে এ সব বুঝিয়েছিল। তারপর হঠাৎ নাটাদার ইশারায় ধূমকেতুর মতো চলে গেল। আর কোনওদিন বিন্দুদির ঘরে দেখতে পাইনি সুমন্ত্রকে। অনেকদিন বাদে আজ দেখলাম। চশমার আড়ালে সুমন্ত্রের ঘনকালো চোখ দুটি শাণিত ছুরির ফলার মতো আমূল বিঁধিয়ে দেয় আমার বুকে। একরাশ অন্ধকার বুক থেকে বিষাক্ত রক্তক্ষরণ হয়। যন্ত্রণার উপশম হতেই দেখি পত্রিকার কাগজের উপর তেলমাখা মুড়ি, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা। পাশেই বিন্দুদি চা করছেন। একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন দমকা হাওয়ার মতো আমার বুকের মধ্যে বাঁচার অসহায় স্বপ্নগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে হৃদয় মন সাফ করে দিল। আমি স্বেচ্ছায় বিন্দুদিকে কাজের সাহায্য করতে লাগলাম। সস্তাদরে চায়ের কাপগুলো চা ভর্তি করে নাটাদার হাতে তুলে দিতে লাগলাম। নাটাদা সবাইকে দিতে লাগল।

একটু ভালো সুন্দর নকশা করা কাপ আলাদা করে রেখেছিলাম। ভাবলাম এটা আমি সুমন্ত্রকে দেব নিজে হাতে। কিন্তু পারলাম না। কারণ একরম একটা মিটিংয়ের গাম্ভীর্য আমার সেই ব্যক্তিসুখের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিল। আসলে সহজভাবেই মিটিংয়ের বয়স্ক বক্তার হাতে সেই কাপ তুলে দিলাম। আমার হাত থেকে কাপ নিতে গিয়ে বক্তৃতা একটুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিয়ে বললেন : বসো এখানটায়, শোনো আমাদের কথা। না বুঝলে, জেনে নাও আমাদের কাছ থেকে। কাজে লেগে যাও, তোমাদের বয়সী মেয়েদের আমাদের দরকার আছে।

আশ্চর্য হলাম, আমার মতো মেয়েও এদের কাজে লাগে। অথচ নাগভূষণের কাজে লাগে আমাদের মতো মেয়েদের শরীরটা। এতদিন জেনে এসেছি মেয়েদের মূল্য কী? বয়স্ক লোকটি আমাকে সুমন্ত্রের পাশে বসতে দিল। সুমন্ত্রের পাশে বসে এদের মিটিংয়ের ভিতর দিয়ে আমি অন্য জগতে চলে গেলাম।

ওরা এখন হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট সফল করার কথা আলোচনা করছেন। আমাদের জনসাধারণকে বলতে হবে, গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মঘট হচ্ছে ভণ্ড ধোকাবাজি অপদার্থ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের তীব্র অভিযোগ। সেই ধর্মঘট যারা বানচাল করতে চায়, মনে রাখতে হবে তারা গণতন্ত্রবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। বয়স্ক লোকটির কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিয়ে সুমন্ত্র বলে ওঠে—আচ্ছা কমরেড, আমরা ছাব্বিশ বছর ধরে এভাবে ধর্মঘট পালন করে এসেছি। এমনকি আটচল্লিশ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধও হয়েছে। লাখ লাখ লোকের সমাবেশে আমরা এইসব কথা জনতাদের বলেছি, বুঝিয়েছি। কিন্তু আমরা কী পেয়েছি? বলুন কমরেড। চালের দাম কমেছে? গমের দাম কমেছে? ডাল তেল মাছ তরিতরকারি এ সবের দাম কমেছে?

গম্ভীর হয়ে বয়স্ক লোক জবাব দেয়, তা হলে কী করতে হবে?

এ কথার, প্রেসিডেন্সির মেধাবী ছাত্র সুমন্ত্র উত্তর দেয়, 'সেটা আপনারাই ঠিক করুন। উনিশশো একাত্তর সালের পর থেকে আমাদের লাইন পালটানো উচিত ছিল। এরপর সুমন্ত্র মাও, লেনিন, চারু মজুমদার এদের কথা বলে একটা কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছিল।'

সুমন্ত্রকে পুলিশ ধরেছিল একাত্তরে। পরে ছেড়ে দেয়। এমন সময় নাটা বলল, 'কমরেড সুমন্ত্রের কথা আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। তবে আশু প্রয়োজন সরকারের সাথে মোকাবিলা করতে ধর্মঘটকে সফল করে তোলা। আপনারা জানেন কমরেড, সরকার জোর করে ধর্মঘট বন্ধ করতে চাইছেন। তাদের হাতেই তো আইন। আইন প্রয়োগ করে সারা ভারত থেকে ধর্মঘট বেআইনি করে দিক। সারা ভারতে তাপ্পি-মারা, রং চটে যাওয়া গণতন্ত্রের মুখোশটা খসে গিয়ে ফ্যাসিজমের বীভৎস মুখটা তা হলে বের হয়ে পড়বে। তবে সাবধানে থাকবেন কমরেডরা, মিথ্যা জাল ফেলে ওরা আমাদের থানার লক আপে পুরতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে বাদল, গনা, অনিমেষকে নিয়ে গেছে। বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ওরা ধরা পড়ল।

সুমন্ত্রের পাশে বসে ছিল অধীর। সে বলে উঠল—'নাটাদা আপনার ওপর পুলিশের নজর আছে। একটু ছুতো পেলেই।' নাটাদা বলে, 'আমি জানি। যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়, তোমরা আছ। তোমাদের মতো হাজার হাজার ছেলেরা আছে। যাক পাড়ায় যেন গণ্ডগোল না হয়। গণ্ডগোলের জন্য অনেকে ওত পেতে আছে।' অধীর বলে, 'আমাদের বস্তির সকলেই তৈরি। মেয়েরাও বাদ নেই। আপনি সাবধানে থাকবেন।'

আমি চুপচাপ ওদের আলোচনা শুনছিলাম। ভাবছিলাম, এরা কেউ আমার মতো নিজের নিজের সমস্যার

কথা ভাবছে না। সবাই সমাজের গরিবদের কথা ভাবছে। কমিউনিস্টদের চিন্তাভাবনাই আলাদা। কীভাবে গরিবদের চিরকালীন অভাব অনটন দূর করা যায় সে সকল কথা এরা আলোচনা করছে। ওরা আগামী দিনের সংগ্রামের কথা ভাবছে। সুমন্ত্র হে, তোমার তো ঐ অতটুকু বয়স, তুমি কি ভালোবাসার কথা ভাবছ না? আমি ওদের কথা কিছু বুঝি, কিছু বুঝতে পারি না। সে জন্য বোধ হয় স্বার্থপরতা আমাকে ঘিরে ধরে। সুমন্ত্রের প্রতি আমার আকর্ষণ একহাঁটু কাদার মতো অন্ধকারে আটকে যাওয়া বুকের ভিতর থেকে পচা বিষাক্ত রক্তক্ষরণ ঘটায়। আমি সে দিন সুমন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে রাত সাড়ে দশটায় ঘরে ফিরি। মা বাবা ভাইবোন আমার জন্য সবাই জেগে আছে। একটা অস্থির আতঙ্ক ওদের চিন্তা-ভাবনাকে ঘিরে রেখেছে। আমি ঘরে ঢুকতেই হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় বাবা এই প্রথম খেকিয়ে উঠলেন, 'রাত করে ঘরে ঢুকতে শিখেছিস, পয়সা উপায় করতে শিখিসনি? বুড়ো বাপকে তো মরার পথে টেনে এনেছিস, আর কী চাস! একেবারে মেরে ফেলতে?'

আঠারো বছরের একটি মেয়েকে জন্মদাতার এ সব কুৎসিত কথাবার্তাগুলো মৃত্যুর দুয়ারে আমাকেও ঠেলে নিয়ে যায় বইকী। কিন্তু আমাকে পারবে না আত্মহত্যার পথে নিয়ে যেতে। আমি বাঁচার পথ বুঝতে পেরেছি। আত্মহত্যাকে আমি ঘৃণা করি। মনে মনে বলি, না বাবা তোমার ওই সব অক্ষুদ্র কথাবার্তা আমাকে আত্মহত্যার অভিমানী পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারবে না। বরং তোমাব মুখে যারা ওই সব নোংরা কথাবার্তা জুগিয়েছে সেই সব শয়তানের মুখোমুখি আমি একবার দাঁড়াতে চাই, দেখতে চাই তারা কেমন শক্তিশালী। আমি বুঝতে পারছি, এই সভ্য সমাজের কর্তামশাইরা যারা সমাজের শীর্ষে বসে শোষণের নাইলনের সুতোটা ধরে রেখে আমাদের পুতুলের মতো খেলাচ্ছে, ওরাই তোমার মুখে ওই সব ইতর ভাষা জুগিয়েছে। ওবাই তোমাকে আর্থিক অক্ষম করে রেখেছে যার জন্য তুমি আমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারছ না। দিতে না পারার তীব্র বেদনাব ভাষা বিকৃত হয় বুঝতে পারি। অবশেষে আমার যৌবনের শেষ আলোটুকু নিয়ে চলাফেরা করি। আর শোষকেরা এবং শোষকের দালালরা চাকরির ফাঁদ পেতে সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের যৌবনের শেষ আলোটুকু নিংড়ে নিয়ে পাঠিয়ে দেয় সোনাগাছিতে অথবা গড়ের মাঠের মুক্ত হাওয়ার অন্ধকারের আড়ালে অথবা চৌবঙ্গির চাপা অলিতে গলিতে। অবশেষে এইভাবে আমরা সভ্যতার মুখোশ ফাউন্ডেশন মেখে আড়ালে বেশ্যাবৃত্তি চালাই। কিন্তু আর নয়। এর পরিবর্তন চাই। শুধু একবার ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠতে চাই—**সাবধান। এই দেখ, আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে।**

তিন

ক্রমশ চিন্তার ডালপালা আমার নিদ্রাসুখকে আড়াল করে রাখে। পাশের ঘরে পিতৃহীন খোঁড়া মেয়েটা সেলাই কল চালিয়ে যাচ্ছে। আমি শুনতে পাই সেলাইকলের অবিরাম শব্দ। ....একটানা ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ শব্দের ভিতর দিয়ে রাত নুলো লোকের মতো এগোতে থাকে।

এরপর বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি। বিছানায় ছটফট করতে করতে উঠে বসি। ভোরবেলাকার ক্ষুধার্ত কাকের একটানা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। শুনতে শুনতে আবার শুয়ে চোখ বুঝি। একটা প্রচণ্ড শব্দ হয় ঘরের মধ্যে। ঘুম ঘুম চোখে লক্ষ করি, বহুদিনের ফাটা একটা কাঁসার বাটি ইলুর হাত থেকে পড়ে গিয়ে দু টুকরো হয়ে যায়। ওটা ছিল মায়ের বিয়ের বাটি। বাবার হাতে ফাটে এবং ইলুর হাতে দু টুকরো হয়। ইলু এখন মার হাতে মার খাচ্ছে। ইলুর চুলের গোছা মায়ের শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে। ইলু ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। মাকে বলি—নতুন একটা নিশ্চয়ই হবে আবার। মেরে কী হবে? ছেড়ে দাও। বলতেই মা আমার ওপর রাগ বাড়াল। মা রেগে গিয়ে চেঁচাতে থাকে—'চুপ কর ধুমসি মাগি। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল উনি উঠলেন। একগাদা রুটি গিলে বের হবেন। গতরটা দেখলে—' মা এরপর কন্যা সম্পর্কে একটা যে অশ্লীল ইঙ্গিত করল সেটা আমি আর স্পষ্ট শুনতে পেলাম না, কারণ বস্তির পাশে সদ্য তৈরি নতুন বাড়ি থেকে হঠাৎ খুব জোরে সংবাদ পরিবেশনে ব্যস্ত রেডিওর গমগম আওয়াজ শুনতে পাই—'আজ এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে গতকাল প্রকাশ্য দিবালোকে একশত সশস্ত্র নকশাল যুবকের আক্রমণে বরিশাল জেলায় হারতা পুলিশ ফাঁড়ির একজন পুলিশ নিহত ও অপর দুজন আহত হয়েছে। এই যুবকদল প্রহরা দের

পরাভূত করে অস্ত্রাগার থেকে বারোটি রাইফেল, চারটি মেশিনগান ও বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ *নিয়ে যায়। পুলিশ কিছু সময় বাধা দেয়, কিন্তু পরে তারা আত্মসমর্পণ করে।'*

এমন সময় বাবা বাজার নিয়ে ঘরে ঢোকে। বলতে বলতে ঢোকে—'কী দাম কী দাম। সব অগ্নিমূল্য। এরপর উপোস করতে হবে! একটা কোনও প্রতিবাদ নেই। শালারা যা চাইবে তাই দেব। তারপর আবার আমাদেরই ওপর চোখরাঙানি। আর সহ্য হয় না। অথচ বরিশালে—মনে পড়ে হ্যাগো—'

ইতিমধ্যে আমি ঘর থেকে বের হয়ে যাই।

বাবার মেজাজ একটু ভালো থাকলেই মার কাছে দেশের কথা তুলে বক্তৃতা শুরু করে। আমার শুনতে ভালো লাগে না। এ যেন আসলে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আজকের এই অগ্নিমূল্যের থাপ্পড়টা হজম করা। মাকেও আমি আজ কিছু বললাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি এই মায়ের বেটি হই, তবে যেমন করেই হোক আজ পয়সা কামিয়ে আনব। হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম সেরে সত্যি সত্যি বের হলাম। কিছু মুখে তুললাম না। স্থির করলাম ভারতীদের বাড়ি যাব। অনেকবার ভারতী আমাকে বলেছে, ওর এক চাঁদমামা আছে। চাঁদমামার আছে প্লাস্টিকের এবং ইমিটেশন অলঙ্কারের কারখানা। অনেক মেয়েরা সেখানে কাজ করে। ষাট সত্তর পায় কেউ। আবার অনেকে একশো দেড়শো পায়। এ সব কথা তুলে ভারতী অনেকবার আমাকে বলেছে, 'চল্ তোকে চাঁদমামার কাছ নিয়ে যাই। তোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' আমি তখন গা করিনি। কারণ আমার চোখে ছিল তখন ভালোবাসার অতল স্বপ্ন। তা ছাড়া ভারতীর এতবেশি গরজকে আমি সন্দেহের চোখে খানিকটা দেখেছিলাম। এবার আর কোনও সন্দেহ নয়। 'দেখা যাক না' এরকম বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে খালি পেটে সাতসকালে ভারতীদের বাড়ি রওনা হই। আর মনে মনে, আমার পিতৃভূমি বরিশালের যুবকদের অভিনন্দন জানাই। ভারতীদের বাড়ি গিয়ে দেখি, ভারতী শাড়ি ইস্ত্রি করছিল। ভারতী আমাকে দেখে বিস্ময় ফেলে দিয়ে বললে, 'কী ব্যাপার, এত সকালে।' 'এই এমনি' উত্তর দিয়েই বলি, 'ইস্ত্রি করছিস? যাবি নাকি কোথাও?' ভারতী বলল, 'করে রাখলাম। শুনলাম তোদের পাড়ায় ধরপাকড় চলছে।' বললাম ভারতীকে, 'দুজন নকশালকে তুলেছে। তবে আর সুবিধা করতে পারবে না।' ভারতী ইস্ত্রি করে যাচ্ছে। কীভাবে চাঁদমামার কথাটি তুলব ভাবছি। খাটের ওপর একটা সেক্সের পত্রিকা ছিল। ওটা তুলে নিয়ে দু-একটা পাতা অনামনস্কভাবে ওলটাতে ওলটাতে বললাম, 'তোর স্বভাব আর পালটালো না। এ সব ঘরে রাখিস? পড়িস কেন এ সব? লজ্জা করে না!'

ভারতী সহজ উত্তর দেয়, 'লজ্জা করলে আমাদের চলবে কেন? তিন তিনটে বোন। বাপ শালা কারও বিয়ে দিতে পারবে? এই তো বাড়িটা সম্বল। কোনও রকমে ভাড়ার পয়সায় দিন চলে। সারাজীবন বাপ চাকরি করল না। ঠাটবাট বজায় রেখে চলতে তো হবে। ছেলেদের মন রাখতে ও সব নিয়ে রাখতে হয়।'

এ সব আলোচনা করতে করতে চাঁদমামার প্রসঙ্গটি চলে আসে। কারণ বর্তমানে চাঁদমামার সাথে একটি ক্ষুধার্ত পরিবারের মুখ জড়িয়ে পড়তে চাইছে। আমি বলেই ফেললাম, 'চাঁদমামার মন বুঝি ওভাবেই রাখিস?'

ভারতী ফিক করে হাসল। হেসে আমার দিকে তাকাল। আমাকে হাসতে হল। বললে, 'চাঁদমামা খুব ভালোছেলে, আলাপ করলো? চল না একদিন।' ভারতী শাড়িটা ভাঁজ করে তুলে রাখে। আমি মুখে হাসির টুকরো লাগিয়ে রেখে বলি, 'যেতেই এসেছি।' তারপর মুখের হাসিটুকু গিলে ফেলে বলি, 'মার বকুনি সহ্য করতে পারছি না। শুধু বকুনি নয় ভারতী, নোংরা নোংরা কথাবার্তা। এখন আমার যে কোনও একটা কাজ দরকার।' তারপর আমি সহজভাবে আগ্রহ প্রকাশ করে বলি, 'আমি যাব চাঁদমামার কাছে। আজই যেতে চাই। চাঁদমামার হাতে পায়ে ধরে বলব আমাকে যে কোনও একটি কাজ দিন। আজ নিয়ে যাবি?'

ভারতী এবার আমার দিকে তাকায়। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর হাসিমুখটা মুছে গেছে। আর ভারতী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চোখের জলটা মুছে ফেল লীলা। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আমার আজই যাওয়ার কথা আছে। বইটা ফেরত দিতে হবে। পাঁচটার সময় আসিস।'

আমি একটু সভয়ে করুণভাবে বললাম, 'হ্যারে, দেবে তো!' ভারতী আশ্বাস দিয়ে বলল, 'চেপে ধরলে না করতে পারবে না। দেখা যাক।' 'তা হলে আমি চলি এখন। খিদে পেয়েছে।' আমি উঠতেই ভারতী আমাকে

বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বোস। মুড়ি আনছি।' আমি বসলাম। ভারতী আবার বকতে শুরু করল, 'গোপাল শালা, আরেকটা মেয়েকে।' ভারতী যাতে গোপাল প্রসঙ্গটা আর টানতে না পারে সে জন্য চট করে বললাম, 'বাদ দে। আমার ভাল্লাগে না।'

আচারের তেল দিয়ে মেখে মুড়ি খেয়ে আমি ভারতীদের ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার মুখে বললাম, 'তা হলে চাঁদমামাকে ফোনে বলে রাখিস।'

কোনও দিকে নজর না দিয়ে আনমনা হাঁটছিলাম। কিন্তু কীভাবে, নজর আটকে গেল সুমন্ত্রের শরীরে। দেখলাম দূর থেকে সুমন্ত্র বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে। ময়লা জামা-পাজামা, হাতে বিড়ি। চোখেমুখে সর্বদা ঘৃণার স্পষ্ট ছাপ। একা। কথা বলার এই আমার সুযোগ। আমি সুমন্ত্রকে দেখছি আর এগোচ্ছি। বুকের মধ্যে তবলায় দু আঙুলের মৃদু গুরু গুরু বোল। দেখলাম একটা টু-বি বাস আসছে। আমি খুবই তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকি, যদি বাসটায় সুমন্ত্র উঠে পড়ে এই ভয়ে। দ্রুত হাঁটতে গিয়ে স্যান্ডেলের স্ট্রাপ ছিঁড়ে যায়। অবশেষে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে সুমন্ত্রের কাছে পৌঁছই। বাসটা তখনও আসছে। মোড় ঘুরছে। সুমন্ত্রকে বলি, 'চিনতে পারছেন?'

মুখ থেকে বিড়িটা হাতে নিয়ে বলল, 'ভালোই চিনতে পারছি।'

হেসে বললাম, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

সুমন্ত্র গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'ধর্মঘটের জন্য আমাদের ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। থানায় পুরেছে। আপাতত অন্য মুলুকে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি।'

আমি এবার না হেসে বলি, 'আমাদের বস্তি থেকে কয়েকজনকে তুলেছে। নাটাদা তো দু দিন ধবে কারখানার আশপাশে আছে।'

সুমন্ত্র বলল, 'জানি। বিশেষ কাজে আজ ঘবে আসার কথা। বারণ করতে যাচ্ছি। কোথায় গিয়েছিলেন।'

এবার হেসে বলি, 'চাকরির খোঁজে।'

সুমন্ত্র কিছু বলল না। শুধু বলল, 'বাস আসছে।'

হায় আজ যদি আমার কিছু পয়সা থাকত, তা হলে বলতাম, 'চলুন, খানিকটা বসে একটু চা-পান কবা যাক। কিন্তু বলতে পারলাম না। সময় বিন্দু বিন্দু চলে যাচ্ছে। এই তো সুযোগ। আমি এখন সুমন্ত্রকে কী বলতে পারি? আমার সেই যোগ্যতা কোথায়? রতন গোপালের মতো পুরুষদের আমি টসকে দিতে পারি। পারি না সুমন্ত্রদের মতো ছেলেদেরকে। ওরা ভীষণ, অথচ আমার বলতে এখন ভীষণ ইচ্ছা . চলুন না। একটু বেড়ানো যাক। বলতে ইচ্ছে : সুমন্ত্র হে আমাকে নিয়ে চলো। তোমার সাথে আমিও যেতে রাজি যে কোন মুলুকে। আমার ভীষণতম বলতে ইচ্ছে : তোমার বুকের মধ্যে যে সুন্দর পৃথিবীটা লুকিয়ে আছে সেখানে আমাকে একটু স্থান দাও। কিন্তু আমি একটিও কথা বলতে পারলাম না। অথচ বুকের মধ্যে বন্দি কথাগুলো বের হয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। সেমত অবস্থায় আমি বুকে যন্ত্রণা বোধ করি। এমন সময বাসটা এসে যায়। আসতে আসতে থেমে যায়। ওঠার আগে সুমন্ত্র আমাকে বলে যায়, 'আবার আমাদেব দেখা হবে। তোমাকে আমাদের দরকার।

বাসটা ছেড়ে দিল। সুমন্ত্রকে নিয়ে দুর্ধর্ষ বাসটা চলে গেল। স্টপেজ কয়েক মুহূর্তে ফাঁকা। শুধু আমি একা। আমার বুকের মধ্যে একটি অসহায় নারী চিৎকার করে ওঠে।

নিজেকে সামলে নিলাম। আমাদের সামলে নিতে হয়। আর তখনই মনে হল, সুমন্ত্র হঠাৎ যাওয়ার সময আচমকা ওই কথা বলে গেল কেন। হঠাৎ নিজেকে ছোটো মনে হল। কিন্তু সুমন্ত্রের কাছে ছোটোবড়ো কোনও ব্যাপার নেই। সুমন্ত্রকে ভুলে থাকার জন্য চাঁদমামার কথা ভাবতে ভাবতে বিকেলকে স্বাগত জানাবার জন্য সময়কে তাড়াতে লাগলাম।

ঘরে ফিরে কোনও কথা বলি না। পাশের ঘরে সেলাই কলের অবিরাম শব্দ শুনতে পাই। ছোটো ছোটো দুই ভাই একটা রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, কাড়াকাড়ি থেকে মারামারি। আমাকে দেখে একটু সামলে নিল। কোনও কথা না বলে ওদের হাত থেকে রুটি নিয়ে সমান করে দিলাম। ওরা নুন এনে নুন দিয়ে রুটি খেতে লাগল। একটা ভাই বলে উঠল, 'রাক্ষস, সকালবেলা সব গুড়টুকু খেয়ে চলে গেছে।'

—গুড় ছিল নাকি? বাটিতে একটুখানি লেগে ছিল। ছোটো ভাইটি বলে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, যদি চাকরিটা পেয়ে যাই, ভাইবোনদের পেট ভরে খাওয়াতে হবে আগে। ওরা বহুদিন পেট ভরে কিছু খেতে পায় না। অভাব আমাদের স্বার্থপর করে তুলেছে। যে যার ভাগের চেয়ে বেশি খেয়ে নিয়ে পরের কথা ভাবতে আমরা ভুলে গেছি, তা না হলে আমিই বা কেন মাঝে মাঝে অনেক রুটি একেবারে খেয়ে ফেলি। মা-ও লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে নেয়, আমি দেখেছি। বাড়ির মধ্যে আমি আর মা-ই বেশি স্বার্থপর। ভাবতে গিয়ে চোখে জল আসে। চোখের জলের ভিতর দিয়ে চাঁদমামার বিকেল এসে যায়।

আমি পুনরায় ঘর থেকে বের হই। ভারতীদের বাড়ি যাই। যেমন করেই হোক কাজটা আমাকে বাগাতে হবে। দেখি ভারতী খুব সেজেছে। সাজার মধ্যে অশ্লীলতার ছাপ আছে। সাজলেও নিম্নমধ্যবিত্ত চেহারাটা ঢাকা যায় না।

আমাকে দেখে ভারতী বললে, 'তুই কী সেজেছিস রে? ওভাবে সাজলে চাকরি হয়? যত স্মার্ট হবি, তত ভরসা পাবি। ছাড় ছাড়।' একটি কথা বলেই ভারতী আমাকে দুর্বল করে দিল। সেই কথাটা চাকরি পাওয়ার কথা। ভারতীর মতো সাজতে আমার ভালো লাগে না। কেমন যেন সর্বদা মনে হয়, আমরা খেতে পাই না বলে অর্থাৎ আমরা গরিব বলে, অশ্লীল নকল সাজ সেজে বেটাছেলেদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। এবং ওদের পয়সায় বড়োলোকি স্ফূর্তিতে যোগ দেওয়ার কাঙালপনা দেখাচ্ছি। কারণ ওই সব বড়োলোকি স্ফূর্তি আমাদের জীবনে কোনওদিন আসবে না, মনে মনে বাস্তবটা সত্য জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই বাস্তব সত্যটার জন্য জানি না কেন আমাদের জীবনে সুখ শান্তি আসবে না। 'নে পর'—হঠাৎ ভারতীর কথায় চিন্তা-ভাবনা নক্ষত্রের মতো ছিটকে চলে যায়। 'তোর ব্লাউজটার সাথে মানাবে ভালো।' চাকরির চিন্তা আমাকে দুর্বল করে দেয়। আমিও দেখতে চাই আবাব দুর্বলতা আমাকে কতদূর নিয়ে যায়। আমার মনের দৃঢ়তাবও পরীক্ষার প্রয়োজন। দেখি, কোথায় এবং কখন ব্রেক কষব এবং পারব কি না। দুর্বলতাই বোধ হয় কিছু কিছু মানুষকে জেদি করে তোলে। তাই আমি জেদ ধরে বললাম, 'দেখবি আমার সাজ, দেখ তাহলে। চাকরি আমাকে পেতেই হবে।'

এই বলে আমি সাজতে শুরু করলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি নিজেকে সাজালাম। চুল খুলে, মুখ ধুয়ে আবার সাজলাম। অবশেষে ভারতী আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বললে, 'তোর হবে। চাঁদমামা তোর ওই সজ্জিত রূপ প্রত্যেকদিন দেখার জন্যই তোকে কারখানায় রেখে দেবে।'

হ্যাঁ, আমি সেজেছি। ভারতীর চেয়েও অশ্লীল সেজেছি। আমার শরীরের প্রতিটি ভাঁজ আমি ফুটিয়ে তুলেছি। কামনার তুলিতে টানটান প্রতিটি ভাঁজে পুরুষের কামনার চোখ বিদ্ধ হয়ে থাকবে। সহজেই ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তারপর ভারতীকে বলি, 'চেয়ে দ্যাখ, আমি সাজতে পারি। সাজি না, ঘৃণা করি বলে।' ভারতী পাশের ঘর থেকে হাইহিল জুতো চেয়ে নিয়ে এসে বলল, 'পর।' আমি আমার ছেঁড়া চটি রেখে পরলাম। আমি লম্বা, আমাকে আরও লম্বা লাগল। হাইহিল জুতোর জন্য হাঁটার সময় আমার নরম শরীরে ঢেউ খেলতে থাকবে। ভারতীর এই কথাও আমাকে শুনতে হচ্ছে এখন।

অবশেষে আমরা রাস্তায় চলে এলাম। এসে কলেজ স্ট্রিটের ট্রাম ধরার জন্য শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়ালাম। এখানে সকালে সুমন্ত্র ছিল, আমি ছিলাম। তখন আমি সাধারণ পোশাকে ছিলাম। এখন আমি সুন্দর সেজেছি। সুমন্ত্র যদি এখন দেখত, আমাকে কী ভাবত? সুমন্ত্রের মতো বুদ্ধিতীক্ষ্ণ তরুণেরা এমন অশ্লীল সজ্জিত পোশাকের মধ্যে অসামাজিক গূঢ় অর্থ বের করত। ক্রমশ এবং ক্রমশ সুমন্ত্র সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা আমাকে গম্ভীর করে তোলে। ভাবি, আমি কি কোথাও আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি?

ট্রাম এল। আমরা ট্রামেই উঠলাম। পাশাপাশি বসলাম। বসতেই হঠাৎ মাথায় চিন্তা এল : চাঁদমামা লোকটা কেমন হবে?

ভারতীর হাবভাব দেখে কেমন যেন একটা অশ্লীল সন্দেহ আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠছে; অথচ কাল রাত থেকে যে কোনও একটি চাকরি পাওয়ার বিশ্রী মোহ আমার মনকে জড়িয়ে রেখেছিল রঙিন পরদা দিয়ে। 'দেখাই যাক না'—এরকম একটা বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে আমি শান্ত হয়ে গেলাম। শান্ত

হয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। যদি মানুষের ভিড়ের মধ্যে সুমন্ত্রকে আরও একবার খুঁজে নিতে পারে আমার শেষবারের মতো উজ্জ্বল চোখ। আর একবার মাত্র।

ভাবতীকে বলি মৃদুস্বরে, 'দেরি হবে না তো?

ভারতী উত্তর দেয়, 'একটু দেরি না-হয় হল।

—না না, তুই বুঝতে পারছিস না। সকাল সকাল ঘরে ফিরতে হবে। পাড়ায় আজ গন্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা, আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলি।

এরকম টুকরো টুকরো কথার মাঝখানে ট্রাম এসে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থামে। ভারতী আর আমি নামার জন্য উঠি। ভারতীই আমার টিকিট কাটে। ট্রামের পাদানির মুখে নামার সময় একজন স্বাস্থ্যবান ভদ্রমুখো যুবক আমার শরীরে হাত দেয়। আমি ভয়ঙ্কর রাগে একবার শয়তানের চোখের দিকে তাকাতেই শয়তান উদাসীন গর্তে ধূর্ত শিয়ালের মতো মুখ ঢুকিয়ে দেয়। নামতেই ভারতী বলে, 'কী হয়েছে রে?' আমি শয়তানের দিকে আঙ্গুল তুলে বলি, 'ওই রাস্কেলটা।'

ট্রাম চলে যেতেই ভারতীর পিছু পিছু আমি রাস্তা পার হই। এবং একটা সুন্দর মডেলের নীল নীল রঙের মোটরগাড়ির সামনে দাঁড়াই। গাড়ির দরজার সামনে সাদা ব্যানলনের গেঞ্জি আর সাদা টেরিন প্যান্টে সজ্জিত একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ওর সামনে ভারতী দাঁড়িয়ে বলল, 'এই আমার বন্ধু। লীলা নাম। আর ইনি হচ্ছেন চাঁদমামা।'

ভদ্রলোক শব্দ না করে হাসছে। ওর চাহনি, ওর হাসি সহজ সরল নয়, আমি এটুকু বুঝলাম। আমি প্রতি নমস্কার করতেই চাঁদমামা পানের পিচ ফেলে বললেন, 'আমার আসল নাম নাগভূষণ। আসুন।' বলেই নাগভূষণ গাড়ির সামনের দরজা খুলল। দেখলাম সামনের দরজায় আমারই সমবয়সী একজন মেয়ে। নাগভূষণের ইশারায় সে নেমে এল। আপত্তি জানালাম। বললাম, 'আমি পেছনেই বসছি।'

নাগভূষণ বলল, 'তাহলে ভারতী তুমি এসো।'

ভারতী দ্বিধা না করে চাঁদমামার পাশে গিয়ে বসল। আমি আর অন্য মেয়েটি পিছনে বসলাম। আমি মৌখিক আলাপ করতে গিয়ে স্পষ্ট বলি, 'আপনি নন্-বেঙ্গলি?'

চাঁদমামা পানের পিচ ফেলে হেসে বলে। 'আপত্তি আছে নাকি?'

আমি আরও স্পষ্ট করে বলি, 'আপত্তি থাকবে কেন? এমনি বললাম। রাগ করলেন না তো?' আমার পাশের মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। অসভ্যের মতো সেজেগুজে বসে আছে। পুনরায় অশ্লীল সন্দেহটা খোঁচা মেরে দিল আমার বুকে বল্লমের মতো।

গাড়ি স্টার্ট নেয় এবং চলতে থাকে উত্তর দিকে। এমন সময় নাগভূষণ পুনরায় শুরু করে, 'আপনি তো বেশ অল্প বয়সেই বড়ো বড়ো কথা বলতে শিখে গেছেন।'

আমি ঘৃণাকে বুকে চেপে উত্তর দিই, 'খিদের জ্বালা আমাদের শেখায়। যাক্, চাকরির কথা বলুন। না পেলে চলছে না। যদি দয়া করে—'

নাগভূষণের বুকের মধ্যে অপর নাগভূষণ বিকট অট্টহাস্য করে। কারণ দয়া করে 'খেতে পাচ্ছি না, যে কেউ বাঁচান' মেয়েদের মুখ থেকে এ সব কথা শুনলে জৈবিক ক্ষুধাটা তীব্র হয় এবং এ সব অসহায় নারীদের মুহূর্তেই কামনার খাঁচাকলে আটকে ফেলা যায়। লীলার কথা শুনে নাগভূষণ উত্তর দেয় না। নাগভূষণ গম্ভীর হয়। যেন লীলার সমস্যায় ভীষণভাবে চিন্তিত। গাড়ির স্পিড একটু বাড়িয়ে দেয়। তারপর একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্যহাতে সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটে রাখে। এবং কায়দা করে আগুন ধরায়। আমার পাশের মেয়েটার সামনে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বলে, 'চলবে নাকি?' মেয়েটি একটা সিগারেট টেনে নেয়। তারপর চাঁদমামার জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে আগুন ধরায়। মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়ে সিগারেট টানে। নাগভূষণের গাড়ি বিবেকানন্দ রোডের দিকে মোড় ঘোরে। ইতিমধ্যে নাগভূষণ ভারতীকে কাছে টেনে নিয়েছে। আমি মুহূর্তে মুহূর্তে চোখ ঘুরিয়ে সবই দেখতে পাই। আমি পায়ের ওপর পা তুলে গালে হাত দিয়ে এক চোখ বাইরে এবং এক চোখ ভিতরে রেখে সবই লক্ষ করছি। ওরা কি আমাকে উত্তেজিত করতে চাইছে, ওরা

কি আমাকে অশ্লীল সুখের জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে, ওরা জানে না পরিবর্তে আমার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা রক্তবিন্দুর মতো দানা বেঁধে উঠে। তারপর সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ মোড়ে গিরিশ পার্কের পশ্চিমে হঠাৎ নাগভূষণের গাড়ি থেমে যায়। আর গাড়ির সামনেই আরও একটি মেয়েকে দেখতে পাই। বেলবটম এবং বব্‌ড্‌হেয়ার গার্ল, কাঁধে লম্বা ব্যাগ, আমার পাশের মেয়েটি দরজা খুলে দিল। সে উঠল। পুনরায় গাড়ি স্টার্ট নেয় এবং দক্ষিণ দিকে চলতে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি ভারতীকে স্পষ্ট বলে উঠি, 'আমার চাকরির দরকার নেই। গাড়ি থামাতে বল, আমি নামব।' ভারতী নাগভূষণের শরীরের কাছ থেকে এবার একটু সরে এসে বলল, 'আরে চল না, ভয় নেই, আমরা তো আছি। চাকরি হবে। আজই অ্যাডভ্যান্স পেয়ে যাবি।'

নাগভূষণ সিগারেটটা ঠোঁটে রেখে বলল—'আমি এখনই তোমাকে কুড়ি টাকা দিচ্ছি।' তারপর ভারতীকে বলে, 'ভারতী, পকেট থেকে পার্সটা বের করে ওকে দাও তো এখনই।' আমি আবার দৃঢ় হই, 'আমি বলছি ভারতী, আমাকে নামিয়ে দিতে বল।'

ভারতী ইতিমধ্যে চাঁদমামার পকেট থেকে পার্সটা বের করেছে।

নাগভূষণ পুনরায় বলে, 'ভারতী ওকে দাওনা, বিশ ত্রিশ চল্লিশ—'

টাকার অঙ্কের সাথে সাথে আমার জেদও বাড়তে থাকে আগুনের শিখার মতো। —'আমি বেশ্যা নই নাগভূষণ। যদি না নামিয়ে দেন আমি চেঁচাব।'

ভারতী-সহ দুজন মেয়ে আমার কথা শুনে রেগে গেল। 'বেশ্যা' কথাটি ওদের মনে লেগেছে। ওরা বলল, 'চাঁদমামা আপনি গাড়ি চালিয়ে যান। প্রথম প্রথম, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।' আমি ভয় পাই না। সুমন্ত্রের চোখ দুটো বুকের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে। এবার আমি প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, 'ভারতী মনে রেখো, দরজার হাতলে আমার হাত। যদি না থামাও আমি এখুনি দরজা খুলে ঝাঁপ দেব, চেঁচাব।'

আমি গাড়ির দরজার হাতলটাকে শক্ত করে চেপে ধরলাম। আর তখনই মহাজাতি সদন পেরিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়িটা আচমকা ব্রেক কষে। ইতিমধ্যে আমি দরজা খুলে ফেলেছি। আমি দ্রুত নামলাম। নেমে শ্যামবাজারের দিকে হাঁটতে থাকি। পিছন ফিরে একবারও তাকাইনি। একবার কানে আসে ভারতীর কণ্ঠস্বর, 'বাস ভাড়াটা নিয়ে যা।' পয়সা নেওয়া দূরে থাক, আমি অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, ভারতী আমার বন্ধু, এত নীচে নেমে গেছে। এতদিনে বুঝতে পারলাম, এত দামি শাড়ি ব্লাউজ ওর কী করে হয়। কী করে হাত ঘড়িটা পেল। কিন্তু চাঁদমামা এবং ওদের স্বভাবের কথা সহজভাবে না বলে ভারতী আমার স্কুল-জীবন থেকে বন্ধু হয়ে চাকরির লোভ দেখিয়ে কেন আমাকে প্রতারণা করল? আর আমি এত সহজভাবে ঠকলাম। আমি কি পারি না ভারতীকে ওই লাইন থেকে ফিরিয়ে আনতে? আমাকে ঠকাবার প্রতিশোধ ওকে ঘৃণা না করে ওকে ওই লাইন থেকে সরিয়ে নিতে চাই। আমি শাড়ি ব্লাউজ ফেরত দিতে যাব না। দেখি, ও নিতে আসে কি না।

পাপপুণ্যে মোড়া মানুষের ছিন্নভিন্ন মিছিলের পাশ কাটিয়ে আমাকে এখন সচেতনভাবে চলতে হচ্ছে। কারণ জানি, পেছনে একটা আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অশ্লীল কালো হাত রবারের মতো বাড়তে বাড়তে আমাকে ধরতে আসছে। কিন্তু আমাকে ছুঁতে পারছে না, পারবে না আর কোনওদিন।

যতই আমি দ্রুত হাঁটছি ততই আমি আমার মনের চারদিকে শুনতে পাচ্ছি পিতৃহীন খোঁড়া মেয়েটার সেলাইকল চালাবার অবিরাম শব্দ ঘর্‌র্‌র্‌ ঘর্‌র্‌র্‌।

আপাতত তিন নম্বর রাস্তায় অষ্টাদশীর চলাফেরা

এই স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে আমার মতো মেয়েদের কোনও নিরাপত্তা নেই। সামান্য একটা চাকরি সহজভাবে শ্রমের বিনিময়ে এই দেশে পাওয়া যায় না। পরিবর্তে পাওয়া যায় বেশ্যাগিরির চাকরি। ভালোবাসা, আমার আশা নেই। এখন আমাকে একমাত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আগুনের মতো উজ্জ্বল চোখ, সুমন্ত্রের চোখ। শাণিত অস্ত্রের মতো দুটি চোখ, তারপর ছয়টি, তারপর দশটি, তারপর একশোটি, তারপর হাজার হাজার আগুনের মতো উজ্জ্বল চোখ।

মা, আমি বুঝতে শিখেছি, এই দেশে তুমি আমি বাবা বিন্দুদি নাটাদা রমলামাসি সুমন্ত্র বাদল অধীর পিতৃহীন খোঁড়া মেয়েটা সবাই এক শ্রেণীর মানুষ। এরকম আমাদের মতো শ্রেণীর মানুষ কোটি কোটি ছড়িয়ে আছে আমাদের শহরে গ্রামে। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি। রমলামাসি, প্রয়োজন হলে আমি তোমার কাজের মধ্যেও ফিরে আসব। নাটাদা আমাকে তুমি মালা গাঁথার কাজে লাগাও। হোক নগণ্য কাজ, যেন গরম ভাত ফুটিয়ে খেতে পারি। সুমন্ত্র আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমার কাজকে চাই। ভেঙে ফেলতে চাই এই আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, এই অসভ্য সভ্যতা। আজকের এই ঘটনা আমার মনে বিক্ষোভের ঝড় তুলছে। অনেকের কাছে এই ঘটনা হয়তো সামান্য, আমার কাছে নয়। যাদের কাছে সামান্য, তারা নাগভূষণদের দালাল।

পাড়ার গলিতে ঢুকেই দেখি গলির মুখে দু গাড়ি পুলিশ ভ্যান এবং একটি জিপ শীতল হেয়ার কাটিং সেলুনের গায়ে। আমি একটা গাড়ির পাশ কাটিয়ে অন্য গলিতে ঢুকে পড়ি। সে গলি ঘুরেই আমাদের পাড়ায় চলে আসি। সেখান থেকে দেখতে পাই আমাদের বস্তির অনেক মেয়ে বউরা এমনকি বুড়িরাও বস্তির অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে পুলিশ সি-আর-পিদের সামনে জড়ো হচ্ছে একজন, দুজন, তিনজন দলে দলে। বস্তির মেয়ে, বউদের প্রত্যেকের হাতে দা বটি লোহার বড-লাঠি এমনকি ঝাঁটা-ছুরি কাঁচি-খুন্তি পর্যন্ত। কুমারী মেয়েদের চেয়ে রোগাসোগা বউ এবং বিধবাদের দলে বেশি দেখলাম। আমাদের মেয়েরা চিৎকাব করছে— তোমরা আমাদের অনেক ছেলেকে বিনা কারণে ধরে নিয়েছ। অনেককে মেবে ফেলছ। কিন্তু এবার আর পাববে না। এবার আমাদের মেরে ফেলে তবে তোমরা নাটাকে ধরতে পারবে।

ওরা দলে দলে পুলিশের সম্মুখীন হচ্ছে দেখতে পেয়ে পুলিশের বড়োকর্তা বললেন, 'নাটাব নামে অভিযোগ আছে। বল কোথায় নাটা?'

এমন সময় শুনতে পাই আমার মায়ের গলা। সবাব সামনে মা। মা এগোচ্ছে। মায়ের হাতে একটা ধাবালো বটি। মা বলছে, 'নাটা এখানে নেই। তোমরা বিন্দুকে ছেড়ে দাও।'

দেখতে পাই দূর থেকে। বিন্দুদিকে পুলিশরা গাড়িতে তুলে নিচ্ছে। একজন মহিলা পুলিশ হঠাৎ বিন্দুদির পিছনদিকে একটা লাথি মেরে বসল। বিন্দুদি জালঘেরা কালোগাড়ির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

সেই দৃশ্য দেখে আমার শরীরের রক্ত খই ফোটার মতো ছটফট কবতে লাগল। শুধু তাই নয়, আমাদেব দলের মধ্যে হই চই শুরু হল। সবাই পুলিশদের আক্রমণ করতে ছুটল। ইতিমধ্যে পুলিশের ভ্যান স্টার্ট নেয। আমার মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে মহিলা পুলিশের গলাটা কামড়ে ধরি। এবং ছুটতে আরম্ভ করলাম দলের সাথে। পুলিশ ভ্যান চলতে শুরু করেছে। অবশেষে একটা বন্দুকের আওয়াজ হল। আমরা একটু থমকে গেলাম এই ভেবে আমাদের কারওর গায়ে গুলি লাগল কি না। বুঝলাম নেহাতই ওটা ফাঁকা আওয়াজ। তারপর দেখলাম পুলিশের বড়োকর্তা জিপে উঠলেন। বড়োকর্তার পিছু পিছু যে উঠল তাকে দেখে আমি অবাক হলাম, সে হচ্ছে আমাদের রতন। পরিষ্কার বুঝে নিলাম, তা হলে আজকের ঘটনার ভিলেন নায়ক রতন। পরে জেনে নিলাম রতনের সাহায্যে পুলিশ নাটাদাদের ঘরে ঢোকে। না পেয়ে একজন মহিলা পুলিশ বিন্দুদিকে ঘর থেকে টেনে বের করে। এই খবর পেয়ে বস্তির সকল মেয়েই হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে ঘর থেকে কাজ ফেলে বের হয়ে আসে বিন্দুদিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য।

নাগভূষণের প্রতি আমার ঘৃণা জমা হচ্ছিল, আর এখন রতনের প্রতি আমার ঘৃণা ফেটে পড়তে চেয়েছিল। তাই আমি মার হাত থেকে বটি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম জিপটার কাছে। কিন্তু হঠাৎ ফাঁকা আওয়াজ আমাকে মুহূর্তের জন্য দমিয়ে দিয়েছিল। আর সেই মুহূর্তে পুলিশের চামচে জিপে করে পালিয়েছে কিন্তু এখন আমাকে গোপনে নিঃশব্দে বছরের পর বছর প্রতিশোধের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মনে মনে বিন্দুদিকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে স্বগত উক্তি করলাম : বিন্দুদি তুমি চলে গেলেও তোমার কাজকর্ম থেমে থাকবে না।

আমি আপাতত আমার বস্তিবাসী শত শত মেয়ে-বউ-বুড়িদের সাথে মিশে গিয়ে মিছিলে যোগ দিয়ে বিন্দুদিকে ফিরিয়ে আনতে থানার দিকে এগোতে লাগলাম। আমার পাশে পিতৃহীন খোঁড়া মেয়েটি চলছে। এবং পিতৃহীন খোঁড়া মেয়েটার উষ্ণ হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা আছে বিন্দুদির আট বছরের ছেলের হাত। ']

একচক্রা নগরে

রাম রায়

আপনারা যাঁরা মহাভারত পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার অন্তর্গত এই কাহিনীটি ভুলে যাননি। জতুগৃহ-ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বারণাবত থেকে পালিয়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন। ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একসময় একচক্রা নামে এক নগরে এসে পৌঁছলেন। একচক্রা নগরের তখন খুব দুঃসময়। বক নামে এক স্বেচ্ছাচারী ভয়ঙ্কর রাক্ষস মহাত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এই নগরে। প্রতিদিন এই রাক্ষসের অতৃপ্ত খিদে মেটাতে প্রতি পরিবার পিছু একজনকে পালাক্রমে তার আহার হিসেবে পাঠাতে হত। পাণ্ডবরা সে দিন যে দরিদ্র পরিবারটির ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে পরিবারটির পালা ছিল বক রাক্ষসের খাদ্য হিসেবে পরিবারের একজনকে পাঠাবার। বাড়িতে কান্নার শব্দ শুনে পাণ্ডবরা ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন এবং মধ্যম পুত্র ভীমকে পাঠিয়ে বক রাক্ষসকে বধ করে তাঁরা নগরে শান্তি আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এই কাহিনী সবাই কাল্পনিক কাহিনী বলেই জানে। এতদিন আমিও এটাই বিশ্বাস করতুম। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে তা আকস্মিক বা কাল্পনিক নয়। বক মারা যায়নি। সে তার বিশ্বগ্রাসী খিদে, কুৎসিত লালসা, অমানবিক হিংসা নিয়ে আজও একচক্রা নগরে তার স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে।

একচক্রা নগরে আমি বিদেশি। পাণ্ডবের মতো ঠিক অজ্ঞাতবাস নয়—তবে বলা যায় কিছুটা আত্মগোপনের জন্যেই এখানে আমার আসা। আমি যে দিন এখানে আসি সে দিন রাতেই রাক্ষস এক মহাভোজ লাগিয়েছিল। ট্রেন থেকে নেমে দেখি নগরে ঢোকার কোনও গাড়ি নেই। যে দু-একজন ছিল, তারা মোটা টাকার প্রতিশ্রুতিতেও আমাকে একচক্রা নগরে পৌঁছে দিতে চাইল না।

নগরের মুখে ঢুকতেই দেখি রাস্তাগুলো জনশূন্য। আতঙ্কে নগরের বাসিন্দারা ঘরে নিরাপদ আশ্রয় ঢুকে গেছে। দোকানপাট বন্ধ; গাড়ি-ঘোড়া অচল। এমনকি আপিস-আদালতগুলোও ফাঁকা—ধুধু। মানুষ ভয় পেয়েছে।

দিন সবে ফুরিয়েছে। সূর্যের দেহ থেকে ঝরা রক্তের দাগ মহাশূন্যে লেগে আছে। কিন্তু চারপাশ এতই নিস্তব্ধ, মনে হচ্ছে সৃষ্টির আদি অন্ধকার যেন এখনও ঘোচেনি। হাঁটতে শুরু করি। একজন পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল—আপনি কোথায় যাবেন?

—আপাতত সামনের দিকেই হাঁটতে চাই।

—আপনি কি জানেন না, আপনি একচক্রা নগরের দিকেই যেতে চাইছেন?

—হ্যাঁ জানি। তাতে কী? এর কোনও জবাব পেলুম না। বলতে কি, একটা উদ্বেগ, ভয় নিয়েই এগুতে থাকি। শহরের সব বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। মানুষের অস্তিত্বের কোনও সাড়া-শব্দ সেখানে নেই। রাস্তার বাতিগুলোও নেভানো। পথে জনমনুষ্য নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া কেবল হিস্ হিস্ শব্দে বয়ে যাচ্ছে। একি কোনও যুদ্ধের প্রাক্-প্রস্তুতি, না মানুষ সত্যি ভয়ে বিবরে সেঁধিয়েছে?

প্রথমদিন রাতে আমি এরকম এক অনুভূতি নিয়ে একচক্রা নগরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার এ সংস্কার বদ্ধমূল হল, একজন কেউ আমার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তার চাউনির শীতল স্পর্শে আমার শরীরের রক্ত-মাংস ভেদ করে হাড় অব্দি ছুঁয়ে যাচ্ছে। শহরের মাথায় কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার; তবুও মনে হচ্ছে আর-এক-অন্ধকার সে অন্ধকারকেও গ্রাস করেছে।

রাত্রির তখন তৃতীয় যাম। আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে এই অনুমান করলুম। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। খুট করে কোথায় যেন শব্দ হল। সেই অতি ক্ষীণ শব্দও আমার ভেতর প্রবল ধাক্কা দিল। আমি গন্ধ পেলাম একটা ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কিছু ঘটতে চলেছে—আর তখনই সেই রাক্ষসের গর্জন আর সেই হতভাগা যে তার খাদ্য হয়ে এসেছে আর অন্তিম আর্তনাদ রাতের শীতল স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিল। আমি মট মট করে হাড় চিবনোর শব্দ পেলুম। বক রাক্ষসের গর্জন এবং যার মাংস সে ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছিল তার প্রাণান্ত আর্তনাদ আমার স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে দিচ্ছিল।

না। সে রাতে কেউ আমার জন্যে ঘরের দরজা খুলে রাখেনি। পরের দিন সকালবেলা রোদের তাপে আমার ঘুম ভাঙে। চেয়ে দেখি, আমি এক শিশুপার্কের ভেতর শুয়ে আছি। রাত কাটাবার এটাই নিরাপদ জায়গা ভেবেছিলুম বোধ হয়।

পার্কটা পরিত্যক্ত। শিশুরা এখানে আর খেলতে আসে না। ঘুম ভেঙে মনে হল, আমার আহার এবং মানুষের সঙ্গ আগে দরকার। কাল প্রাক্-সন্ধ্যায় নগরে ঢোকার মুখে সেই শেষ মানুষের মুখ দেখেছিলুম। তারপর এখনও অব্দি মানুষের মুখ দেখা পরের কথা, তাদের অস্তিত্বের কোনও একটি শব্দও কানে ঢোকেনি। মানুষ কি এ শহরে নেই? তারা কি সব এ শহর ছেড়ে চলে গেছে?

আমি পার্ক থেকে বাইরে এলাম। হাঁটতে শুরু করলাম ফাঁকা রাস্তাগুলো দিয়ে। রাস্তাগুলোয় মানুষ নেই বললেই হয়। যে দু-একজনকে দেখছি তারা তাড়াতাড়ি ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে গলির ভেতব ঢুকে যাচ্ছে। বাজার-দোকান বন্ধ। সেখানে লোকজনও নেই। একটি শহরের জীবনযাত্রা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে আমিও গলির ভেতর ঢুকে পড়লুম। সুড়ঙ্গের মতো সরু গলি। দু-পাশের বড়ো বড়ো বহুতল বাড়িগুলোর ছায়া দিনের বেলাতেও গলিগুলো অন্ধকার করে রেখেছে। তবু এখানে যেন মানুষি-অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। ঠুক-ঠাক আসবাবের শব্দ। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ছাদের মাথায় চিমনিগুলোতে। কোনও বন্ধ জানলার ফাঁক থেকে আলোর টুকরো চোখে এসে বিঁধছে হঠাৎ। আর কান পাতলে মানুষের গলার চাপা গুঞ্জনও শোনা যায়।

একটা বাড়িব মধ্যে যেন কান্নার শব্দ পেলুম। বুক চাপড়ে তারস্বরে মেয়ে বাচ্চারা কাঁদছে। আমাকে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দেখি শুধু আমিই নই, আমার মতো আরও দু-একজন দাঁড়িয়ে আছে। আগে একজন বৃদ্ধ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর একজন অমনি তাকে অনুসরণ করল। এইভাবে একজন ঢুকতেই সব্বাই যেন একের সঙ্গে অপরের গিঁট দিয়ে বাঁধা. পুরো দলটা ভেতরে ঢুকে এল।

আমি দেখলুম, বাড়ির শিশু থেকে বৃদ্ধরা পর্যন্ত কাঁদছে। তবে মেয়েরাই বেশি চেঁচিয়ে কাঁদছে। কাউকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই। সকলের মুখ ভয়ে পাংশু। বৃদ্ধ বলল—তা হলে এ বাড়ি থেকেও একজন গেল।

আমি গত রাতের বিভীষিকার কথা স্মবণ করলুম। সেই আর্ত মানুষী চিৎকার, হাড় চিবনোর শব্দ,—আতঙ্কের ঠাণ্ডা স্পর্শ আমায় ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিল আবার। বৃদ্ধ আবার স্বগতোক্তির মতো বলল—এবাব কার পালা আসবে কে জানে?

যারা শোকার্ত পরিবারটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ফিস ফিস আলোচনায় জানলুম, গত রাতে এই পরিবার থেকে বক রাক্ষসের খাদ্য হিসেবে এক যুবককে পাঠানো হয়েছিল। যুবকটি খুবই মেধাবী, উচ্চ আদর্শসম্পন্ন ছিল। এভাবে তার জীবন বলিদান সকলকেই শোকবিহ্বল কবেছে। আমি বৃদ্ধকে প্রশ্ন কবলুম—এভাবে কতজন জীবন দিয়েছে?

—হিসেব নেই।

—কাগজে কিছু রিপোর্ট দেখেছি।

—সব মিথ্যে।

—কয়েক হাজার?

—তার চেয়ে ঢের বেশি।

আমরা যেমনভাবে বাড়িটায় ঢুকেছিলুম, ঠিক তেমনভাবেই বেরিয়ে এলাম। কেউ কিছু করলুম না। বোধ

হয় এই অনিবার্যতা ঠেকাতে কারওরই করার কিছু নেই। পেছনে রেখে আসি কান্না। সঙ্গে নিয়ে যাই বিভীষিকা। বিহ্বলতা। বিষণ্ণতা।

বেশ কিছুদিন আশ্রয়হীন অবস্থায় একচক্রা নগরে আমাকে থাকতে হয়েছিল। না, একজনও আমাকে মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই দেয়নি। ভরসা ছিল সেই পরিত্যক্ত শিশুপার্কটি। কেবল মাথা ছাওয়া একটি শেডের নীচে সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার পর রাতে আত্মগোপন করে থাকি। আর প্রতি রাতেই বিভীষিকা দেখানো ঘটনাগুলো ঘটে যেত। একটা রাতের জন্যেও তার ক্ষান্তি ছিল না।

একচক্রা নগরের মানুষগুলো বড়ো স্বার্থপর। প্রত্যেকে নিজের ছাড়া আর কারও কথা চিন্তা করে না। আসলে এই ভয়াবহ দুর্যোগ তাদের মনুষ্যত্ব নিংড়ে নিয়েছিল। তারা সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে চাইত না। গাছের পাতা নড়লেও ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। এ এক ধরনের অন্তর্জগতের মহামারী। হয়, এ সময়ে এরকমই হয়।

একদিন দেখলাম রাস্তায় মাইকে মিউজিক বাজিয়ে একদঙ্গল ছেলে উদ্দাম নাচছে। এই বিপর্যস্ত নগরে তাদের কিছু করার নেই বলেই নাচছে। নৈরাশ্যের শিকার ওরা। হতাশা ওদের রক্তে-মজ্জায়।

প্রতিদিন বেশ্যালয়ে, শৌণ্ডিকালয়ে ভিড় উপচে পড়ছে। মানুষ আজ একা; আবার একা থাকতেও ভয় করে; তাই এই উদ্দামতা, উচ্ছৃঙ্খলতা।

আমার সব থেকে অসুবিধে হল খাবার জোগাড় করতে। সারা শহর ঢুঁড়লেও খাবার পাওয়া যায় না। রাশি রাশি খাবার বক রাক্ষসের পেট ভরাতে চলে যাচ্ছে। যা অবশিষ্ট থাকে তা গোপনে চলে যাচ্ছে শহরের অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে।

এইরকম এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ একদিন পেলাম। তিনি প্রশাসন বিভাগে উচ্চ পদে কাজ করেন। দেখেই বোঝা যায় যে লোকটি অপদার্থ। তাঁকে সরাসরি আমার অবস্থার কথা বললুম। তিনি আমাকে আগে অনেকক্ষণ দেখলেন, তারপর জানালেন, কিছু কাজের বিনিময়ে তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, কারণ কিছুদিন আগেই তাঁর বাড়ির চাকরটিকে বকের খাবার হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তবে আমার পেট ভরাবার ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন না, তা নিজেকেই করে নিতে হবে। তিনি এ কথাও বললেন—প্রয়োজন হলে তোমাকেও বক রাক্ষসের কাছে পাঠানো হবে। আমি তাতেই রাজি হলুম।

সরকারি আমলার বাড়িতে উদয়াস্ত খেটে খাই। তিনজন চাকরের কাজ একা করা। বিশ্রামের অবসর নেই। তবু বলব আমলা লোকটি ভাল, অন্তত মৌখিক ব্যবহারে তিনি আমার ওপর খুবই সহানুভূতিশীল।

রাত্রিবেলায় বার হই খাবারের অন্বেষণে। বিপদের ঝুঁকি থাকে, তবু বার হই। বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর সামনে ময়লা ফেলার হৌজগুলোতে প্রথমে খুঁজে দেখি। প্রতিদিন কিছু উচ্ছিষ্ট জমে এগুলোতে। কোন কারণে জানি না, শহরে কুকুরের সংখ্যা খুব কমে গেছে। কাগজে পড়েছিলাম পাঁঠার মাংসের সঙ্গে কুকুরের মাংস মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে আমরা পাঁঠার মাংস ভেবে যা খাচ্ছি, তা আসলে কুকুরের মাংস। সে যাই হোক, কুকুর নেই বলেই কুকুরের খাদ্য এই উচ্ছিষ্ট, হৌজগুলোতে নির্বিঘ্নে ঘেঁটে দেখতে পারি। কখনও রুটির টুকরো, পচা বাঁধাকপির পাতা, পচা আপেল জুটে যায় ভাগ্যে। একদিন একটুকরো মাংস-লাগা হাড় পেলুম। হৌজের পাশে বসে পরম ক্ষুধায় তা চিবোতে থাকলুম।

সব দিন আমি একাই এগুলোর ভাগীদার নই। আমার মতো একচক্রা নগরে আরও অনেকেই আছে। এখানেও খাবারে টান পড়ে। অধিকার, বখরা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে।

যে দিন হৌজগুলোতে পাঁশ ঘেঁটেও কিছু পাওয়া যায় না, সে দিন সরকারি গুদামগুলোর দিকে চলে যাই। এগুলির সন্ধান সম্প্রতি পেয়েছি। বস্তা-বস্তা চাল, গম সম্পূর্ণ অরক্ষিত পড়ে থাকে। রোদে পুড়ছে। জলে পচছে। এখানে খাদ্য এভাবে অপচয় হয় জানতুম না। আমি ভয়ে ভয়ে এখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করি। ক্রমে ভয় ভাঙে। স্বচ্ছন্দে যতটা পারি সংগ্রহ করি। একদিন বেশ খানিকটা আনলে পরের দিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

এখানেও সেই ভাগীদার জুটল। সেই অধিকারের বিরোধ। ব্যাপারটা খাদ্য-রক্ষীদের কানে পৌঁছল। ফলে

আমাদের অনেকেই প্রাণ হারাল। গুদামে ওইসব খাদ্য বেশিদিন থাকল না। টন টন খাদ্য লরি, টেম্পো চড়ে একদিন চলে গেল। বকের খিদে মেটাতে কী বিপুল পরিমাণ খাদ্যই না অপচয় হচ্ছে!

এক ধরনের বিষণ্ণতায় ভুগছি। এ রোগ আমি বহন করে আনিনি। এ রোগ একচক্রা নগরবাসীদের। ওদের অন্তর্জগতে এ অসুখ এপিডেমিকের মতো। আমি এখানে থেকে অল্পদিনের মধ্যে সংক্রামিত হলুম।

নির্লিপ্ত বসে থাকি। কিছুই ভাল লাগে না। আগ্রহ, কৌতূহল নিভে যাচ্ছে। আতঙ্ক নিত্যসঙ্গী। আর এটা সে দিন থেকেই শুরু হয়েছে যে দিন আমি ওই সরকারি আমলার বাড়িতে কাজ নিয়েছি কেবল আশ্রয়ের বিনিময়ে, আর এই আত্মসমর্পণ করে বসেছি—ওব বাড়িব পালা আবার এলে আমি বিনা প্রতিবাদে তাদের একজন হয়ে বকের কাছে যাব।

আমি প্রতিদিন ঘুমের মধ্যে রাক্ষসকে স্বপ্নে দেখি। সে এক রক্তমাখা অন্ধকাব। বিশাল গহ্বরের মতো। আমাব হাড়-মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে সে। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় আমার। অনুভব করি গলা শুকিয়ে গেছে। টিপ টিপ শব্দ হচ্ছে বুকের ভেতর। এত ঘেমে যাই, দেহটা মনে হয়, আগুনে ঝলসানো বেগুন। সে দিন আর কিছু করতে পারি না। নেশাখোবের মতো বসে ঢুলি। খুব উত্তেজক কিছু খুঁজি, না পেয়ে বিষণ্ণ হই। এটাই আমার রোগ। এটাই একচক্রা নগরবাসীদের রোগ।

কজন সঙ্গী জুটে গেল আমার। হৌজগুলোতে খাবার খুঁজতে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ। তিনজন মানুষ এক জায়গায় হলেই তারা বসে আলাপ করে। যে দিন হৌজগুলো ঘেঁটে কিছুই জোটে না—সে দিন আমরা এক জায়গায় গিয়ে বসি। নিজেদের দুঃখগুলোকে ভাগাভাগি করে খাই।

আমি এরকম এক অবসরে আমার সঙ্গীদের পঞ্চপাণ্ডব ও বক রাক্ষসের কাহিনীটা শোনালুম। তারা খুব আগ্রহ নিয়ে কাহিনীটি শুনল এবং ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হল। একজন সঙ্গী জিজ্ঞেস কবল—কাহিনীটি সত্যি? আমি ভেবে বললুম—তা জানি না। তবে সত্যি হলেও হতে পারে। পুরাণের অনেক গল্প কল্পিত নয় বলে শুনেছি। এটাও সে বকম হবে।

পরের দিন আরও কজন সঙ্গী আমার বাড়ল। আসলে এরা আমাব মুখ থেকে ওই কাহিনী আবার শোনার জন্যে এসেছে। আমি মহাভাবত থেকে পড়া কাহিনী বলে যাই। কোনও রং চড়াই না। কোনও আবেগও থাকে না আমার বলার মধ্যে। ওরা যথেষ্ট আবেগ প্রকাশ করে। সেই একই প্রশ্ন—কাহিনীটি সত্যি? যেন আমি এই কাহিনীর সত্যতা না মানলেও ওরা প্রশ্নের তাড়নায় আমার মুখ দিয়ে 'সত্যি' এই শব্দটি বলিয়ে নিতে চায।

প্রতিদিন দু-একজন করে বাড়ে। এইভাবে আমাব চারপাশে ভিড জমে যায়। এটা ঠিক, আমি একচক্রা নগবের মানুষদের অন্তর বোধ হয় যেন অজান্তে স্পর্শ কবে ফেলেছি। আর এটা ওদের অন্তহীন বিষণ্ণ জগতে অভিনব অভিজ্ঞতা বটে!

বাড়িওয়ালা সরকারি আমলাটি বলল—তুমি কী সব মিথ্যে যেন রটাচ্ছ?

—মিথ্যে কোনওটাই নয়।

—তুমি বিশ্বাস করো মহাভারতের ওই কাহিনীটি সত্যি?

আমি সবাসরি এর কোনও উত্তর দিলুম না। দু-চারটে এমন কথা বললুম যার অর্থ, ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পাবে। তিনি আমাকে অনেকক্ষণ দেখলেন। পরে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগলেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না আমার কথাগুলো তাঁর মধ্যে কি রাগ সঞ্চারিত করল? আমি ভাবি—আমি মিথ্যে বললুম কি না। যে বিশ্বাসের জোরে মুখের কথাটি সত্যি হয়, সেই বিশ্বাস আমি পেয়েছি কি?

রাস্তায়, মাঠে, পার্কে এখন আমার নিত্যদিনের কাজ হল এই কাহিনী কথকঠাকুরের মতো গেয়ে যাওয়া। যুধিষ্ঠিরেব সত্যবাদিতা, অর্জুনের পৌরুষ, ভীমের বলবত্তার কথা বলতে বলতে আমার ভেতর এক অদৃষ্টপূর্ব উদ্দীপনা আসে। শ্রোতারাও এতে খুব উৎসাহ পায়। একটা প্রচার সমিতি তৈবি হল। তারা আমার কথাগুলো প্রতিদিন প্রচার করতে থাকল।

একচক্রা নগরে বেশ বলশালী এক যুবক ছিল। অদৃষ্টের এমন পরিহাস—তারও নাম ছিল চারু মজুমদার।

একদিন সদম্ভে সে ঘোষণা করল—আমরা যাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছি—সে সেই। বক রাক্ষসকে বধ করে মানুষের এই সঙ্কটকাল সে-ই মোচন করবে।

সে-ও একটা দল করল। এবং নিজের প্রচার চালাতে লাগল। সে এতই নির্বোধ, এতই আত্মদম্ভে হঠকারী হয়ে উঠল, একদিন সত্যিই সে বক রাক্ষসকে বধ করতে গেল। সে দিন সারারাত তার পরিত্রাহি চিৎকার শুনলুম। বক তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল।

এরপর রাক্ষস রাগে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, সে শুধু মানুষ মেরে খায় না—মরা মানুষের মাথার খুলি, হাড়-গোড় ছুড়ে ছুড়ে যত্রতত্র শহরের ভেতর ফেলতে লাগল।

সে মন্দির অপবিত্র করল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাঙল। বকের ঘোরতর দৌরাত্ম্যে কেবল সাধারণ মানুষ নয়, নগরের প্রশাসক পর্যন্ত বিচলিত হলেন। তাঁরা ঘন ঘন মিটিং করতে লাগলেন। মিটিঙে যত না আলোচনা হল, তারা চেয়ে বেশি ভূরিভোজ হল। শেষে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন, বক ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্যে আমিই পরোক্ষে দায়ী। বকের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্যে আমাকে তাড়াতাড়ি তার কাছে পাঠানো হোক।

এই প্রস্তাব সকলে মেনে নিলেও, আমার আশ্রয়দাতা আমলা-প্রভু মেনে নিলেন না। তিনি আইনের কিছু কথা তুললেন। দেখলুম, সভার অধিকাংশ সভ্য এবার তার যুক্তি স্বীকার করল। তখন ঠিক হল, আমাকে বকের খাদ্য না করে মুর্দাফরাশের কাজ করানো হবে।

এই মিটিঙের পর আমলার বাড়িতে আর আশ্রয় পেলুম না। আমাকে সেই শিশুপার্কেই ফিরে আসতে হল।

রাতে আমি শিশুপার্কের ছাউনির নীচে শুয়ে থাকি, দিনের বেলা নগরের রাস্তায় বার হই। আমার প্রথম কাজ হল নগরের রাস্তাগুলো পরিষ্কার রাখা। প্রতিদিন বক রাস্তাগুলো নোংরা করে দেয়। মানুষের হাড়গোড়, নাড়িভুঁড়ি সে ফেলে যায়। পচা মাংস, হাড়ের স্তূপ জমে উঠেছে। নরকের দুর্গন্ধকেও হার মানায় সেগুলো।

আমি প্রতিদিন হাড়গুলোকে এক জায়গায় জড়ো করি। পচা মাংসের স্তূপ জ্বালিয়ে দিই। রক্তের দাগ জলে ধুয়ে ফেলি।

এ কাজে আমার সেই সঙ্গীরা সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। তারা আমাকে অবিশ্বাস করছে। তাদের ক্ষোভ, আমি যে কাহিনী এতদিন ধরে শুনিয়েছি তাদের তা আদৌ সত্যি নয়। মহাভারত মিথ্যে। তার কাহিনীগুলোও মিথ্যে। আমি স্রেফ ভাঁওতা দিয়েছি তাদের।

আমি ওদের বিশ্বাস করাতে পারলুম না মহাভারতের কাহিনীগুলো বাস্তব সত্য এটা আমি বলতে চাইনি। আমি কেবল একটা বিশ্বাসের জগৎ ওদের মনের ভেতর তৈরি করে দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ঘটনাটা অন্যরকম হয়ে গেল।

একচক্রা নগর আবার তার বিষণ্ণতার জগতে তলিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার কাজে কোনওদিন ক্ষান্তি দিতে পারি না। যে শাস্তি আমার উপর বর্তেছে, তাতে ফাঁকি দেওয়ার কোনও উপায় নেই। প্রতিদিন রাস্তা আমার পরিষ্কার করে যেতেই হয়।

এইভাবে কোথায় যেন আমার মধ্যে এক যুদ্ধ শুরু হল। এই প্রাত্যহিক আবর্জনা ফেলার কাজে আমি নিজের ভেতর কোথায় যেন জিতে যেতে শুরু করেছি। আমার ব্যর্থতা বিষণ্ণতা হেবে যাচ্ছিল। আমি আর বক রাক্ষসকে ভয় করি না।

একদিন রাস্তা সাফ করতে করতে হৌজখানার সামনে দাঁড়িয়ে গেলুম। পোড়া কাঠের কালি দিয়ে হৌজের দেয়ালে কে লিখে রেখেছে : পাণ্ডবরা আসছে।

আমি সে দিন পার্কে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, পাণ্ডবরা কি অলীক? তা যদি হয় তবে যুগ যুগ ধরে কাহিনী বেঁচে আছে কীভাবে? না, আমি বিশ্বাস হারাতে চাই না। যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, অর্জুনের পৌরুষ, ভীমের বলবত্তা আমায় গভীরভাবে ভাবিত করল।

শিশুপার্কে সেই শেডের নীচে শুয়ে আমি একদিন বকের দুঃস্বপ্ন আর দেখলুম না। স্বপ্ন দেখলুম, এই শিশুপার্ক শিশুদের কোমল কোলাহলে আবার ভরে উঠেছে। □

মানুষের মুখ

দিব্যেন্দু পালিত

বাড়ি পৌঁছে বিভূতি শুনল অজয় তখনও ফেরেনি। সন্ধের আগে কেউ এসে ডেকেছিল; অজয় তখন খাচ্ছে। ডাক শুনে মুখের খাবার ফেলে চটপট বেরিয়ে যায়। কিছু পরে খেয়াল হতে দরজা খুলে প্রথমে বাসন্তী, তারপর মণিকা বাইরে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। আজকাল এমনিতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে থাকে; আশঙ্কা ও দুর্ভাবনায় আজ আরও বেশি ফাঁকা লাগছিল। শোনা যাচ্ছে পাইপগানের গুলিতে আজও একজন মারা গেছে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরেছিল বিভূতি। বাসরাস্তা থেকে আধ মাইল গলি পেরিয়ে আসতে আসতে বারদুয়েক মানুষের গলার শব্দ পেয়েছিল, কয়েকটা কুকুর এবং একটি পাগল ছাড়া আব কাউকে চোখে পড়েনি। হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনেছিল বড়োরাস্তায় দাঁড়িয়ে। অন্ধকাব গলিব দিকে তাকিয়ে তখনই ভেবেছিল বিভূতি—সে কোনও অন্যায় করেনি, কোনওদিন কারও পিছনে লাগেনি। ন্যায়ত তার খুন হওয়ার কোনও কারণ নেই। এই ভেবে ঘড়িটা হাত থেকে খুলে পকেটে রেখেছিল।

এখন মণিকার কথা শুনে সামান্য আশ্চর্য হল না। উদাসীন গলায় শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছিল?'

মণিকা জানে না। দুপুরে বেরিয়ে, বিকেলের ডাকের চিঠি হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল অজয়। এলাহাবাদ থেকে মা কণিকার বিয়েব কথা লিখেছে। মণিকা তখন চিঠি পড়তেই ব্যস্ত ছিল। বাসন্তীর কথায় হুঁশ হয়। অজয় আবার বেরিয়ে যাবে এবং আর ফিববে না জানলে দরজায় পাহারা দিত।

এত কথা বিভূতিকে বলা যায় না। বলেই বা লাভ কী!

'গলা শুনে তো মনে হল শীতল।'

'কোন শীতল?'

'দোতলা লাল বাড়িটাতে থাকে। অজুর বন্ধু—'

'শীতল কী করে হবে!' বসতে বসতে বিভূতি বলল, 'গত রবিবার ওকে পুলিশে ধবে নিয়ে গেছে।'

মণিকা আর কিছু বলতে পারল না। আশঙ্কা থেকে শীতলের নামটা মুখে এসেছিল—যদি বিভূতিকে কোনও ক্লু দেওয়া যায়। অজয় সম্পর্কে আলাদা কোনও জ্বালা অনুভব না করলেও এই ব্যাপারে সে পুরোপুবি নির্বিকার থাকতে পারেনি। সন্ধে থেকে এতটা সময় পর্যন্ত শ্বশুর-শাশুড়িকে সামলেছে, অজয়ের ছোটো দীপককে আটকে রেখেছে ঘরে। পাশের বাড়ির বিশ্বনাথ বিভূতির সমবয়সী এবং বন্ধু, তাকেও খবরটা দিতে গিয়েছিল, যদি কিছু করা যায়। খুনের খবরটা সেখানেই শোনে। 'বিভূতি ফিরলে একবার খবর দেবেন।' বিশ্বনাথ বলল, 'এর মধ্যে না ফিরলে একটা কিছু করা যাবে।' এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

বিশ্বনাথের কথাটা স্বামীকে বলে দরজার পর্দা টানতে গেল মণিকা। তারপর বলল, 'কোথায় আর যাবে! নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তুমি যেন আর এত রাত্তিরে গোঁয়ারতুমি করে খুঁজতে বেরিও না।'

বিভূতি উচ্চবাচ্য করল না। দূরে পর পর বিস্ফোরণের শব্দে তার কাঁধ দুটো সামান্য নুয়ে এল। মনে হল গলাটা শুকিয়ে আসছে।

এই নিয়ে এ পাড়ায় খুনের সংখ্যা সাতে দাঁড়াল। অন্যান্য পাড়া নিয়ে অনেক বেশি হবে। হিসেবটা মনে থাকে না। খুনটুন এখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে—এত স্বাভাবিক যে সকালে উঠে কাগজে খুনের খবর না পেলে স্নায়ুগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে কেমন, স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করে বিভূতি। শুধু মৃত্যু ও গণ্ডগোলের সংবাদের জন্যে আজকাল সকালে ও রাতে সে নিচু স্বরে আকাশবাণীর খবর শোনে। রাস্তা দিয়ে হাঁটে খুব

সাবধানে, ভিড় বাঁচিয়ে, নিজেকে একটুও আহত না করে। হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করে বুকের মধ্যে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে হৃৎপিণ্ড। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সে হঠাৎ জীবনের মর্ম বুঝতে শিখেছে।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে থাকল বিভূতি। বারান্দা থেকে ভেসে আসা ননীমাধবের কাশি শুনল। শুকনো কাশি; উত্তেজনা বা পেট গরম হলে এরকম হয়। নিজের ঘরে ঢোকার আগে প্যাসেজে ইজিচেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিল বাবাকে—অন্ধকারে বিবস্ত্র পড়ে থাকার ধরন দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আটটার বেশি রাত হলেই স্বভাবে বলে ওঠে এত রাত হল! আজ বলেনি। যত রাতই হোক, সে তবু ফিরে এসেছে। অজু ফেরেনি।

নিজের ভিতর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল বিভূতি। রক্তাক্ত ছুরিসমেত শীতলকে পুলিশে ধরার পর অজু সম্পর্কেও কিছুটা দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল মনে। পারতপক্ষে বাড়ি থেকে না বেরনোর জন্যে সাবধান করে দিয়েছিল অজুকে। সতেরো বছরের ব্যবধান থেকে কোনও উপদেশ লক্ষ্যে পৌঁছয় বলে মনে হয় না। চাপা হাসিতে অজুর ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছিল অল্প। তা হলেও এরকম হবে ভাবেনি। আশঙ্কার অনুভূতিটা এখন কীভাবে প্রকাশ করবে বুঝতে পারল না।

এখন বেরতে হবে ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুদিন থেকেই নিজেকে প্রাণপণে ভালবাসতে শুরু করেছে বিভূতি। এই ভালবাসা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দেয় তাকে। সাঁইত্রিশ বছর পেরিয়ে এল—অর্ধেকের বেশি—এখন ক্রমশ এগিয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে। আজকাল সে চা খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, রোজ সকালে ডিম খায় একটি করে। একবুক ঠাণ্ডা ডাবের লোভে টিফিনে অফিস থেকে দূরে চলে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। অফিস থেকে ফেরার পথে ইতিমধ্যে একদিন মিষ্টির দোকানে ঢুকে দুশো রাবড়ি কিনে খেয়েছিল। আগের দিন রাতে তাদের অফিসের পরেশ দাস খুন হয়।

মণিকা ফিরে এল। থমথমে মুখ। টেবিলের ওপর নিঃশব্দে খাবারের প্লেট নামাতে দেখে বিভূতি জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, এত রাতে খাবার কেন?'

মণিকা জবাব দিল না। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বলল, 'চা খাবে?'

'না।'

'বেরতে হলে এই বেলা ঘুরে এসো। যেতেই যখন হবে—'

বলতে বলতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মণিকা।

বিভূতি জানত তাকে বেরতে হবে। জানত, অজু সম্পর্কে শেষ সংবাদ আনার দায়িত্ব তার। ননীমাধবের ঘন ঘন শুকনো কাশি, এত কাণ্ডের পরেও বাসন্তীর কিছু না বলা এবং মণিকার বিরক্ত মুখ, এ-সব তাকে সচেতন করার জন্যে। এতক্ষণ বসে বসে সে অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় হাঁটছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে বোমার শব্দ নেই, ভিড় ও জটলা নেই, লোকজনের ছুটোছুটি নেই—নিরাকার জলের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে বিভূতি। জলের ভিতর ছুড়ে-দেওয়া পয়সাটা খুঁজে আনতে হবে। না হলে কাশি থামবে না ননীমাধবের, বাসন্তী মুখ দেখাবে না এবং ক্রমশ ক্রুর হয়ে উঠবে মণিকা। সে যেখান দিয়ে হাঁটবে, ছায়ার মতো গোটা সংসারের দুর্ভাবনা অনুসরণ করবে তাকে।

মণিকা ঠিকই বলেছিল, বিভূতি ভাবল, যেতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়া ভাল।

ভাবামাত্র উঠে দাঁড়াল বিভূতি। উঠতে গিয়ে হাঁটু দুটো কেঁপে উঠল ঈষৎ। গলায় শুকনো ভাবটা যাচ্ছে না। বিছানার একপাশে কাত হয়ে ঘুমচ্ছে তার বছর দুয়েকের মেয়ে। বড়োটির বয়স নয়; গোলমাল শুরু হওয়ার মুখে মণিকা তার ছেলেকে বালিগঞ্জে দাদার কাছে রেখে এসেছে—ও দিকে উপদ্রব কম। এই মুহূর্তে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভূতি ভাবল, কপালে থাকলে অজু না ফিরুক, সে নিশ্চিত ফিরে আসবে। এবং নিশ্বাস চাপল।

মণিকা ঘরে ঢুকেছিল। বিভূতি বেরচ্ছে দেখে বলল, 'খেলে না?'

'না।'

মণিকা চুপ করে গেল। তারপর বিভূতির গড়িমসি ভাব দেখে বলল, 'বিশ্বনাথবাবুকে ডেকে নিও।'

তাড়াতাড়ি ফেরার কথাটা আর বলল না। একটু আগে বাসন্তীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, ছেলেপিলেকে শাসনে না রাখলে এরকমই হয়। একজনের দায় আর একজনকে ভুগতে হবে কেন! বাসন্তী কম কথার মানুষ। বলেছিল, 'ছেলে তো আমারও।' মণিকা আর এগোতে পারেনি। ননীমাধব মরলে বাড়ির অংশ পাবে, না হলে বিভূতিকে আলাদা থাকার পরামর্শ দিত।

বিভূতি বেরিয়ে যেতে ঘরে দাঁড়িয়ে মণিকা ভাবল, সত্যি সত্যিই যদি অজু না ফেরে! দীপকের বয়স বারো, সাবালক হতে এখনও অনেক দেরি। বাসন্তীর সঙ্গে কথাবার্তায় এরপর তাকে আর একটু সাবধান হতে হবে।

বিভূতি বুঝতে পারল না রাস্তায় বেরবার আগেই কেন সে বারবার রাস্তায় পৌঁছে যাচ্ছে! প্রাণের মায়া! এমন যদি হয় সে অজুর খোঁজে বেরল এবং আর ফিরল না! একটু আগে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় ভরে উঠেছিল বুক—সে কি নিজের জন্যে! এই চিন্তায় গলা ঘেমে উঠল। জিভে দাঁত বসিয়ে নিজেকে অনুভব করল বিভূতি।

'টর্চ লাগবে?'

জায়গাটা অন্ধকার। দু-প্রান্তের আলো নিভিয়ে মনের ভারসাম্য বজায় রাখছে ননীমাধব। বেসামাল মনে হলে কাশছে। কথা শুনে মনে হবে এতক্ষণ তার রওনা হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

'টর্চ কী হবে!'

দাঁড়াবে না ভেবেও দাঁড়িয়ে পড়ল বিভূতি। ননীমাধব সম্ভবত আরও কিছু বলবে।

'তোর যত হয়রানি!' স্টেজ ভাবলে বিভূতি এখন স্টেজে একা। নেপথ্য থেকে শিরশিরে গলার ননীমাধব বলল, 'হারামের নুন বোঝে না! ঘরের লোকের সামান্য দায়িত্ব নিতে পারে না, এরা নাকি সমাজ বদলাবে!'

'এ সব ভেবে লাভ কী!'

'না, লাভ কিছু নেই। তবে—', থেমে বলল ননীমাধব, 'আছে কি নেই এ খবরটা তো পাওয়া দরকার।'

বিভূতির মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীর ঠাণ্ডা নেমে গেল। চিন্তাটা এতক্ষণ ক্রিমির মতো উত্যক্ত করছিল তাকে। বাঁচিয়ে দিল ননীমাধব। কথা শুনে মনে হচ্ছে ননীমাধব তৈরি, শুধু খবরটা পেতে চায়। অজুকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাকে নিতে হচ্ছে না।

স্তব্ধ হাত বাড়িয়ে ননীমাধব বলল, 'টর্চটা রাখো।'

তেলোয় ঠাণ্ডা ধাতুর স্পর্শে চিনচিন করে ওঠে রক্ত। যেমনই হোক, এটাকে অবলম্বন বলে ধরা যায়। অন্ধকারে ননীমাধবের মুখের একটা আদল ধরা পড়ে মাত্র। ইচ্ছে করলে এখন টর্চের আলো ফেলে চোখের ওপর কাঁচাপাকা ভুরু নামানো ননীমাধবের কঠিন মুখটা দেখে নিতে পারে। বিশ্বাস হয় না এই লোকটিই তার জন্মদাতা! কিংবা বলা যায়, নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছ কেন! এখনও কিছুদিন আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল।

না, থাক। ননীমাধব ভয় পাবে।

শক্ত মুঠোয় টর্চটা চেপে ধরল বিভূতি। উত্তেজনাটা থিতিয়ে আসতে দিল।

'সন্ধের আগে বেরিয়েছে শুনলাম। আমাকে একটা ফোন করলে না কেন!'

'নিজে বেরিয়েছিলাম।' গলা পর্যন্ত কাশি উঠে এল ননীবাধবের। সম্ভবত সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। সামলে নিয়ে বলল, 'ফোন করব কোত্থেকে! দোকানপাট সব হুটহাট বন্ধ হয়ে গেল!'

'বিশুদের বাড়িতে ফোন আছে—'

ননীমাধব জবাব দিল না। শুনল কি না বোঝা গেল না। মাথাটা হেঁট করে সামনের দিকে ঠেলে দিল অল্প। তারপর হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে খাড়া উঠে দাঁড়াল।

'তোর বেরতে ভয় করছে?'

ঋজু, স্পষ্ট উচ্চারণ। যেন কুড়ি বছর পিছিয়ে গিয়ে কথা বলল ননীমাধব, এত কৈফিয়ত চাইছ কেন! এতক্ষণের অভিজ্ঞতা দিয়ে একে মেলানো যায় না।

নিজেকে গুটিয়ে নিল বিভূতি।

"ভয় পাওয়ার কথা হচ্ছে না। চার ঘণ্টা পরে আমি তাকে কোথায় খুঁজব!"

'খুঁজতে হবে না। পারলে থানায় একটা খবর দিয়ে এসো।'

আর কিছু শুনতে চাইল না ননীমাধব। হেঁটে গেল আস্তে আস্তে। হয়তো এরপর বাসন্তীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে; কিছু বলতে চাইবে, পারবে না। তারপর দু আঙুলে রগ টিপে ধরে বসে পড়বে। এখন কিছু বলার সময় নয়। তাকে বেরতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বিভূতি তার গভীর একাকিত্ব টের পেল। জ্যোৎস্নায় অবারিত কুকুরগুলো কেউ জেগে কেউ ঝিমিয়ে বিচরণ করছে সন্তর্পণে। শীত শেষ হয়ে আসছে। খুচরো হাওয়ায় কপালের ঘাম শুকিয়ে এল। আজ বিকেলে যার মৃত্যু হল, মনে হচ্ছে ছুঁয়ে-যাওয়া আলগা হাওয়ায় মিশে আছে তার নিশ্বাস। যারা খুন হয়, মৃত্যুর আগে তারা কোন কথা ভাবে! যারা খুন করে, খুন করব আগে তারা কোন কথা ভাবে! একটি মুহূর্তে এসে তারা কি পরস্পরকে চিনতে পারে! ইতিমধ্যে যদি অজুকে খুন করা হয়ে থাকে, তা হলে......, পরবর্তী ভাবনা এসে বিভূতির কণ্ঠরোধ করল, তার হাত-পা শিথিল হয়ে এল এবং স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল, এক চাঁই বরফের চাপে কাপড়ের নীচে তার পুরুষাঙ্গ ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে।

ইচ্ছে করলে বিভূতি এখন ফিরে যেতে পারে। দরজায় কান লাগিয়ে বসে আছে মণিকা; পায়ের শব্দে ছুটে এসে দরজা খুলবে। অজু ফিরবে না, বা খুন হতে পারে, এমন ধারণার ভিত্তি নেই এটা ঠিক, ফিরে গেলে ননীমাধবও কিছু বলবে না। বললেও করার কিছু নেই। বাড়িটা তুমি বানিয়েছ, তোমার কর্তৃত্ব বলতে ওইটুকু। কিন্তু, আমি চাকরি করি, সংসারের যাবতীয় ঝামেলা এখন আমাকেই পোহাতে হয়—অজুকে নয়; ভেবে দেখো, অজুর চেয়ে আমার জীবনের দাম অনেক বেশি। এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করল বিভূতি। কিন্তু, যাকে জোর পাওয়া বলে, পেল না। চোখের সামনে তেলতেলে মুখ নিয়ে বারবার ফিরে আসছে অজু। বলা যায় না. অজু হয়তো এখনও বেঁচে আছে। এই মুহূর্তে সে হয়তো বিভূতিরই আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে—ছোটোবেলায় পুকুরের জলে ডুবতে ডুবতে যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দাদা...!' সেইরকম, বা অনুরূপ কোনও প্রার্থনায় নুয়ে আসছে ক্রমশ। এ সময় বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার।

বিভূতির শরীর ফুঁড়ে তিরতির করে ঘাম বেরতে থাকল। তখন আর এখন—দুজনের মধ্যে তফাত অনেক। তখন সঞ্চয় ছিল ঢের বেশি, অজু না বললেও সমস্ত পেশি জড়ো করে ঝাঁপ দিতে পারত। জীবনের বিভিন্ন স্বাদ—গার্হস্থ্য ও শারীরিক নানারকম স্বাদ—তাকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে বাঁচার দিকে। এ দুরবস্থা থেকে অজুই তাকে বাঁচাতে পারে, যদি সে এক্ষুনি ফিরে আসে।

বিপন্ন চোখ তুলে সামনে তাকাল বিভূতি। বহু দূর পর্যন্ত রাস্তা পড়ে আছে শব্দহীন, এলোমেলো হাওয়ার ঘষা লেগে পিচের ওপর শব্দ উঠছে খসখস। একটা শালপাতা উড়তে উড়তে তার পায়ের কাছে সরে এল। বাঁদিকে ঘুরে রাস্তাটা যেখানে পুকুরের দিকে চলে গেছে, মনে হচ্ছে সেখান দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হেঁটে গেল কয়েকজন। ক মুহূর্ত পরে চাকা ঘষটাতে ঘষটাতে ছুটে গেল টালমাটাল একটা গাড়ি। সম্ভবত পুলিশের গাড়ি—নিঃশব্দ কৌতূহলে কুকুরগুলো দৌড়ে গেল সে দিকে। দূরে পর পর বিস্ফোরণের শব্দ। ভারী রোলারের মতো ফাঁকা রাস্তাটা গড়াতে গড়াতে ঢুকে পড়ল বিভূতির বুকের মধ্যে। অজু ফিরল না।

বিভূতি হাঁটতে শুরু করল। সে এখন আর কিছুই ভাবছে না। বিশ্বনাথ বলেছিল খবর দিতে। আপাতত, ভাবল, বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে বেরবে। তারপর থানায় যাবে বা যা হোক কিছু করবে। বিশ্বনাথ সঙ্গে থাকলে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম; অতর্কিত আক্রমণে তাদের মধ্যে যে কেউই খুন হতে পারে। বিশ্বনাথের কিছু হলে সে দুঃখ বোধ করবে ঠিকই, কিন্তু, নিজে তো বাঁচবে!

দরজায় কলিং বেল টিপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বিভূতি। জানলা বন্ধ। দৃশ্যমান নয় বলেই ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত নিশুতি ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয়। আবার বেল টিপতে আলোর সুইচের শব্দ হল। মৃত্যু সম্ভাবনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলোও সম্ভবত প্রখর হয়ে উঠেছে. না হলে এত সূক্ষ্ম শব্দটা কানে পৌঁছুত না।

'কে?'

'আমি।'

জানালা খুলে গেল। বিভূতি চিনতে পারল না।

'বিশ্বনাথ আছে তো?'

'দেখছি?'

পায়ের নীচে মাটি খুঁজল বিভূতি। এখন প্রতিটি মুহূর্তই মনে হচ্ছে মূল্যবান। বাড়ি ফিরে ঘড়িটা তুলে দিয়েছিল মণিকার হাতে। তখনও দশটা বাজেনি। সাধারণত তার ফিরতে এত রাত হয় না। সহকর্মী পরেশ দাসের মৃত্যু উপলক্ষে ছুটির পর শোকসভা বসেছিল। ভাঙতে ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। বেরিয়ে শুনল নর্থে হাঙ্গামা, ট্রাম-বাস বন্ধ। তখন কী করবে না করবে ভাবতে ভাবতে শিয়ালদার দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। স্টেশনে পৌঁছে হঠাৎ খেয়াল হল, ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির দিকে অনেকটা হাঁটতে হবে তাকে। বিপজ্জনক রাস্তা—অফিসে আসার সময় ও দিকে পুলিশের গাড়ি ও মিলিটারি কনভয় ছুটে যেতে দেখেছিল। যদি কোনও কারণে ধরে বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যায়, কবে এবং কী অবস্থায় ছাড়বে বলা যায় না। ইত্যাদি ভেবে সে আবার হাঁটতে শুরু করে। অনেকটা এগিয়ে একটা পাবলিক বাস পায় এবং উঠে পড়ে। পরেশ দাস না মরলে তার এই হয়রানি হত না।

'ওর তো খুব জ্বর।'

রাত কত বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তা ও অন্ধকারের দিকে পিছন ফিরে বাণীকে দেখল বিভূতি।

'জ্বর!'

কপালে গোল সিঁদুরের টিপ ধেবড়ে গিয়ে নাক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। নাকের তলায় ও চিবুকে বিজবিজ করছে ঘাম। সম্ভবত মশারির ভিতর থেকে উঠে এল বাণী। শিকের ফাঁকে মুখটা ঠেলে দিতে মৃদু উত্তেজনা শুরু হল বিভূতির বুকে। চার দিন পরে মণিকা আজ চুলে তেল দিয়েছিল, সিঁদুর পরেছিল গাঢ় করে। দরজা বন্ধ করার আগে হঠাৎই গা-ঘেঁষে এসেছিল। বিভূতি না ফেরা পর্যন্ত বসে বসে হাই তুলবে।

'মণিকা আসেনি?'

'হ্যাঁ।' আঁচল টেনে গলায় জড়াল বাণী, 'তখন থেকেই জ্বর। ঘুমুচ্ছে। না হলে বেরুত।'

সোজাসুজি বাণীর মুখে চোখ রাখল বিভূতি। ইচ্ছে করল ক্রূর হতে। ফরসা ঘামে ভেজা কপালে সিঁদুর, না রক্ত! ইচ্ছে করল ফিরে যেতে। সে যতক্ষণ না ফিরবে ননীমাধবরা জেগে থাকবে। না, সে ধরা পড়তে চায় না।

বিশ্বনাথ বেরুবে না। রাত জুড়ে ঘুমলে জ্বর ছেড়ে যাবে—কাল সকালে দাড়ি কামিয়ে অফিসে যেতে অসুবিধে হবে না কোনও। যে যার নিজের নিয়মে চলছে। তার কোনও নিয়ম নেই। আপাতত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেল।

'মণিকা আপনাকে ছাড়ল!'

অন্ধকারে টর্চের আলো ফেললে ফুটে বেরয় দগদগে ক্ষত। খুব দূর দিয়ে ট্রেন চলে যায় হুড়মুড় করে—ছমছমে হাওয়ায় গা ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে আসা কুকুরগুলো ছুটে যায় আবার। দূরত্বময় তাদের ডাকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন শালপাতা ও কাগজের কুচির উড়ে যাওয়ার সম্পর্ক থাকে না কোনও। প্রতিটি শব্দই মনে হয় অপরিচিত আক্রমণের রহস্যে ভরা।

জবাব না দিয়ে রাস্তায় নেমে এল বিভূতি। আলো নিভে যাওয়ার পর এখন সবকিছুই অসম্ভব প্রকৃতিস্থ, অসম্ভব শীতল; মনে হয় পৃথিবীর শেষতম মানুষ হেঁটে গেছে এই রাস্তা দিয়ে। বিপ্লব আসছে, কথাটা প্রায়ই কানে আসে—হয়তো এই পথেই বিপ্লব আসবে। বিভূতি এ সব বোঝে না। সে পড়ে থাকে গভীর অনিশ্চিতির মধ্যে। হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে মেরুদণ্ড।

পরেশ দাস অন্তর্হিত হওয়ার পরের দিন ভোরে বাড়ির দরজায় চটের থলিতে ঢাকা তার কাটামুণ্ডু পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ এল কুকুর নিয়ে। কাটামুণ্ডের ঘ্রাণ নিয়ে দুলতে দুলতে কুকুরটা চলে যায় অনেক দূর পর্যন্ত—যেখানে ওর বিচ্ছিন্ন ধড়টি পাওয়া যায়। এ সব গল্প বিভূতি শুনেছে অফিসে বসে। নির্জীব শিশুকে কোলে

তোলার মতো করে স্বামীর কাটামুণ্ডুটি বুকে তুলে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়েছিল পরেশের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। মাস দুয়েকের মধ্যেই বাচ্চা হবে তার। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল, 'মুণ্ডু বলেই এমনটি করা সম্ভব হয়েছিল। বেশ বড়োসড় শরীর পরেশের, ভারী ধড় ওভাবে তোলা মেয়েমানুষের কাজ নয়।'

আকস্মিক ভয়ে টর্চটা পড়ে গেল বিভূতির হাত থেকে। সামনে দুধের ডিপো। পাশ দিয়ে ঘোড়ার নালের মতো বেঁকে গেছে গলিটা। কিছুদূর গিয়ে আবার মুখ তুলেছে বাসরাস্তায়। বাঁক ধরে এগোলে পুকুর, শিবমন্দির, তার পরেই কিছুটা ফাঁকা জমি। এক সময় পুকুরসমেত জমিটা কেনার সাধ হয়েছিল ননীমাধবের। দু মেয়ের বিয়ে দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হল। তারপর কিছুদিন ওই পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকত মাছের আশায়। সুচতুর মাছের দল সম্ভবত দিনের পর দিন ফাঁকি দিয়ে গেছে তাকে—এখন আর ও মুখো হয় না।

মনে হচ্ছে কারা যেন গলির ভিতর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। একদলা কফের মতো হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এল বিভূতির। একবার ভাবল শব্দের মুখোমুখি হওয়ার আগেই ছুটে বড়োরাস্তার দিকে এগোবে। সাহস হল না। রাত্রে ওখানে পুলিশ পিকেট থাকে।

ত্রস্ত পায়ে ডিপোর পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে সরে গেল বিভূতি—ভাল হয় যদি অন্ধকারে এখন সে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনজন যুবককে ডিপোর সামনে দিয়ে ছুটে যেতে দেখল। টর্চটা ছিটকে পড়ল দূরে—না, সে নিরাপদেই আছে। কুকুরের চিৎকার থেমে যাওয়ার পর ঘর্মাক্ত শরীরে দ্রুত গলির ভিতর ঢুকে পড়ল বিভূতি। সম্ভবত এ যাত্রা বেঁচে গেল। বাকি রাস্তাটুকু যেতে পারলে থানায় পৌঁছুবে এবং অজুর খবব দিয়ে বলবে, দয়া করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন। ইতিমধ্যে অজু ফিরে এলে ভাল। না হলে ননীমাধবকে বলবে, আর কিছু করার ছিল না। আমাকে ছেড়ে দাও।

দ্রুত হাঁটতে লাগল বিভূতি। গামে ভেজা সর্ব শরীরে এখন সে প্রচণ্ড জোর পাচ্ছে। হালকা জ্যোৎস্নায় জড়ানো পুকুরটা পেরিয়ে খুব সহজে পৌঁছে গেল শিবমন্দিরের কাছাকাছি। শিবমন্দির পেরতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তে অসাড় হয়ে এল হাত-পা। চাপা গোঙানির শব্দ। চোখ তুলে দেখল মন্দিরের পাশে নিমগাছের গোড়া বরাবর পড়ে আছে একটা শরীর! মাথাটা নড়ছে অল্প, 'আঃ, আঃ', মাঝে মাঝে শব্দ উঠছে মুখ থেকে।

'অজু!' ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করে উঠল বিভূতি। শব্দটা কান পর্যন্ত পৌঁছল না! দেখে মনে হয় যুবক। না, অজু নয়। অজুর মাথার চুল এত ছোটো নয়, শরীর এমন লম্বা নয়। আর একটা ফাঁড়া পেরিয়ে এল বিভূতি। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে চলে যেতে হবে।

যুবকটি পেট থেকে হাত তুলল। জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত জ্যান্ত তার চোখ। মুখ বিকৃত করে একবার ঘাড় তোলার চেষ্টা করল, পারল না। শুকনো জিভে ঠোঁট চাটতে চাটতে কোনওরকমে বলল, 'বাঁচান!' তারপর, 'জল—আঃ, একটু জল—'

কথাটা শুনেও শুনল না বিভূতি। বিস্ফারিত চোখে ও শুধু দেখল হাঁ-করা পেটের ভিতর থেকে যুবকটির দলা পাকানো নাড়িভুঁড়ি ঢলে পড়েছে মাটির দিকে। অন্ত্রের চেহারা এরকমই হয়—গলায় থুতু টেনে বিভূতি ভাবল, বলা যায় না, যারা খুন করেছে, তারা, বা আর কেউ এখানে এসে পড়তে পারে। নিশ্বাসে কাঁচা রক্ত ও অন্ত্রের ঝাঁঝাল গন্ধ উঠে এল বিভূতির। বলা যায় না, গন্ধটা হয়তো তার শরীরেও ছড়িয়ে পড়ছে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, হয়তো এই গন্ধই তাকে শনাক্ত করবে। এই ভেবে সে অন্ধের মতো ছুটতে শুরু করল।

আলো পেল বড়োরাস্তায় পৌঁছে। তার সামনে দিয়ে একটা খালি বাস চলে গেল। অনতিদূরে খড়ের আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসেছে রিকশাওয়ালারা। ডানদিকে পুলিশ পিকেট এবং বাঁদিকে থানা। থেমে দাঁড়িয়ে বুকভর্তি হাওয়া টানল বিভূতি। এবং ভাবল, অজু হলে সে নিশ্চয়ই ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করত। ভাবল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ পাড়ায় খুনের সংখ্যা সাত থেকে আটে দাঁড়াবে। একদিনে কি দুটোর বেশি খুন হওয়া সম্ভব! ভাবল, অজু হয়তো নিরাপদেই আছে, হয়তো ফিরে আসবে।

এইসব ভেবে এতক্ষণে স্বাভাবিক মানুষের মতো রাস্তার ধারে নর্দমায় পেচ্ছাপ করতে বসল বিভূতি। □

গণতন্ত্র এবং গোপাল কাহার

মণি মুখোপাধ্যায়

ছিন্নদলিতকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। নিকটবর্তী আঙ্গিনায় তাহাদের গুটিকয় শিশুসন্তান ধূলায় কর্দমে লাফাইয়া কাঁদিয়া অস্থির করিতেছে। উহাদের তৈজসপত্রহীন ভগ্নগৃহ। উহাদের দেহ অস্থিচর্মসার। উহাদের সম্মুখে বাংলাদেশের নিষ্করুণ বর্ষাকাল। উহাদের সম্মুখে ক্ষুধা। অথচ কী অনির্বচনীয় পরিহাস—এই সময়, এই দম্পতির আঙ্গিনার সন্নিকটস্থ বৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষের মাথায় যাইবার কালে অপরাহ্ন শেষবারের মতো হাসিয়া উঠিল।

আসলে লোকটির নাম গোপাল কাহার। সে জন্মাবধি দরিদ্র বলে, সকল সময় ক্ষুধায় কাতর বলে, মনের দিক থেকে সে সকল সময়েই একটু অপ্রস্তুত। কোনও বিষয়কে পরিষ্কার করে বুঝতে তার যথেষ্ট সময় দরকার হয়। এবং সেই সময়ের মধ্যেই আর একটা নতুন বিষয় এসে পুরোনোটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে সমস্তক্ষণই তাকে মনে হয় এলোমেলো।

আজ যখন সে বাড়ি ঢোকে, তখন তাকে আরও বেশি এলোমেলো মনে হচ্ছিল।

গেল বছর বর্ষার মরসুমের আগে তারা এ তল্লাটের গরিবগুরবো মানুষগুলি মিলেঝুলে, মিটিং মিছিল করে বড়ো জোতদার প্রসন্ন হালদার মশায়ের রেললাইন বরাবর কিছু বেনাম জমি দখল করেছিল। সব্বাই মিলে সে সব ভাগজোক করে চাষ-আবাদ চালাচ্ছিল। মাস চারেকের খোরাকি আসছিল ঘরে। বাদবাকি মাসগুলি জনমজুর খেটে, একবেলা খেয়ে, বউ পরের বাড়ি ভানা কোটা করে কোনও রকম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এবারের বর্ষার মরসুম এসে যাওয়াতে, গত রাতভর টানা বাদলা পড়াতে, সে দেখতে গিয়েছিল জমিতে জল দাঁড়িয়েছে কি না।

জমির কাছাকাছি আসতেই একটা অদ্ভুত হাঁক শুনে সে থমকে দাঁড়াল।

—অ্যাই কাহারের বাচ্চা!

স্বভাব মতো গোপাল খুব হকচকিয়ে গেল। কয়েক মিনিট কিছুই তার নজরে এল না। তারপর বেশ ভালো করে তাকিয়ে দেখল, রেললাইনের নাবালে ছাতা হাতে প্রসন্ন হালদার মশাই বৃহৎ কেঁদো বাঘের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। লাঠি-শড়কি হাতে তাঁর চারপাশে দশ-বারো জন লোক। গোপাল আরও ঘাবড়ে গেল।

লোকগুলার মধ্য থেকে কে একজন হেঁকে বলল, 'কিরে, চাষ করবি?'

দুবার মাথা চুলকে ঢোক গিলে গোপাল বলল, 'তাই এলুম, জমিনে জল ডেঁড়িয়েছে কিনা দেখবার জন্যি।'

ওপাশের গলাটা যেন বেশ রঙ্গ করার ভঙ্গিতে আবার হেঁকে বলল, 'তা দেখ্। জমিনে জলও ডেঁড়িয়েছে, আমরাও ডেঁড়িয়েছি। চাষ কর্।'

গোপাল আরও ঘাবড়ে গেল। তার মনের ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গেল! সে জমির দিকে দু পা বাড়াতেই ওপাশ থেকে শড়কি উঁচিয়ে দুজন তেড়ে এল।

—শালা কাহারের বাচ্চা।

গোপাল আর দেরি করল না। বাবলা বনের ভিতর দিয়ে টেনে দৌড় লাগাল। আর পরিষ্কার শুনতে পেল, পিছনে বৃহৎ কেঁদো বাঘের মতো প্রসন্ন হালদার মশাই গাঁক্ গাঁক্ করে হাসছেন।

বড়ো বড়ো করে দম নেওয়ার ফাঁকে পাড়ায় এসে ঘটনাটা সবাইকে বুঝিয়ে বলল গোপাল। শুনে সকলের চোখেমুখে আষাঢ়ের আকাশ কালো হয়ে এল।

—উঁয়ারা উচ্ছেদ চাইছেন।

—সব্বোনাশ! তেবে?

—উ বেলা সমিতিকে সব জানাই চলো।

অবশেষে সেটাই সাব্যস্ত হল। ও বেলা সবাই মিলে কৃষক সমিতির কাছে উপায়ের সন্ধান করতে যাবে।

গোপাল বাড়িমুখো হল। তার মন খুব এলোমেলো হয়ে গেল। বারো মাসের মধ্যে গেল বছর যে চার মাসটা নিশ্চিন্দি ছিল, এবারে সেটাও ওই অনিশ্চিন্দি আট মাসের দলে ভিড়ে গেল। তা হলে উপায়! দাদে রোদ লাগার মতো গোপালের মাথার ভিতরটা চিড়বিড়িয়ে উঠল।

গোপাল যখন নিজের উঠোনে ঢুকল বেলা তখন তিন প্রহর পার। বাচ্চাগুলি উঠোনের ধুলো-কাদায় কাঁদছিল। বউ ভাঙা বেড়োর গায়ে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। গোপাল এক পলক ছবিটা দেখে নিয়ে বলল, 'উয়াদের খেঁতে দিস্ নাই?'

—কুথা থিকে দুবো! বউয়ের গলায় বেশ ঝাঁঝ।

—কেনে, ভানা কোটায় যাস্ নাই আজ?

—গিয়েলম্।

তেবে?

—উয়ারা মোকে দে আর ভানা কোটা কবাবেক নাই।

—কেনে—কেনে?

—বললেক, তু গোপাল কাহারের বউ বটে, তোকে দে আর ভানা কোটা করাবোক নাই। হালদার মশাইর মানা আছে।

চড়াক্ করে মেজাজ উঠে গেল গোপালের। আর বউ-ছেলেপিলের উপর মেজাজ নিলে পাল্টার ভয় নেই বলে মেজাজটা হল দ্বিগুণ। বউয়ের পিঠে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিল গোপাল। আর বউয়ের বাতাস চেরা চিল-চিৎকারটা কানে যেতেই উঠোনের কাচ্ছাবাচ্ছা কটাকে ঘা কতক বেশ ঠেঙিয়ে দিল।

তারপর গুম হয়ে বসে রইল ঘরের মধ্যে।

এই অবধি এই রকম।

তারপরেই একটা অন্য রকম ব্যাপার ঘটে গেল গোপাল কাহারের ভাঙা বাড়িতে।

প্রথমে একজন। তার পিছনে আরও একজন। তারপরে আরও। এবং তার পিছন পিছন আরও কিছু। ওই দিক থেকেই এলেন ওরা, যেদিকটায় তেঁতুল গাছ। মস্ত তেঁতুল গাছের দিগ্-বেড়োনো ছায়াখানা আগাম সন্ধ্যে ঘনিয়ে তুলেছে গোপালের উঠোনে, ভাঙা ঘরে। গোপাল কিছু ঠাহর করতে পারল না। ও বেলার বিষম ঘটনায়, সারাদিনের ক্ষুধায় ক্লান্ত শরীরটা গুলিয়ে উঠল। গায়ে কাঁটা দিল গোপালের তবে কি ভর সন্ধেতেই ওনারা নামলেন তেঁতুল গাছ থেকে। কিন্তু ইতিপূর্বে তো কোনওদিন গোপাল ওনাদের অস্তিত্ব টের পায়নি। তা হলে হেতম ওঝাকে ডেকে ঝাড়ফুক্ মন্তর করানো যেত। গোপাল তার বউয়ের দিকে ঘন হয়ে বসল।

ব্যাপারটা নজরে এসেছিল বউয়েরও। ক্ষুধায় দুঃখে রাগে অপমানে মারের জ্বালায় চট করে কোনও জিনিসকে মালুম করে উঠতে পারছে না। সব চাইতে করুণ অবস্থা বাচ্চাগুলির। খাঁচার দোরগোড়ায় লোভী শিয়াল ওত পেতে থাকলে যেমন মুরগির পাল এক কোণায় গিয়ে তালগোল পাকিয়ে থাকে, দিগম্বর বাচ্চাগুলি তেমনি উঠোনের এক কোণায় জড়সড় হয়ে ভয়ার্ত চোখ মেলে দেখতে লাগল ব্যাপার-স্যাপার।

—কাম্ আউট! বাহার নিকালো। অ্যাই শুয়ারের বাচ্চা, বাইরে আয়।

আর তৎক্ষণাৎ গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। একটি বাজখাঁই চিৎকারে গোপাল কাহার এবং তার বউয়ের চোখ থেকে তাবৎ অন্ধকার মুছে গেল।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল গোপালের বউ, 'ও মাগো—এ যে পুলুশ।'

পুলুশ! সব্বোনাশ! গোপালের হৃৎপিণ্ডটি খাঁচার বাইরে আসার জন্য বার দুয়েক টেনে লাফ মারল। তারপর ব্যর্থ হয়ে নিজের জায়গায় বসে হাঁপাতে লাগল। এ নির্ঘাত প্রসন্ন হালদার মশায়ের কীর্তি। এতে আর কোনও ভুল নেই! চোখে আবার অন্ধকার দেখল গোপাল।

উঠোনে সটান নেমে এসে হাতজোড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় গোপাল বলল, 'এজ্ঞে, আমি কিছুই করি নাই। উয়ারা আমাকে শড়কি দেখালেক, আমি টেনে বাবলা বনের ভিতর দিয়ে ছুটে এলাম। এজ্ঞে, আমি টু শব্দটি করি নাই।'

টুপির তলায় মোটা ভুরু কুঁচকে ও সি সাহেব একটা ধাড়ি বাজের মতো গোপালের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। লোকটা আসলে কী বলতে চাইছে। কয়েক দিনের ভিতরে এরকম ধরনের কোনও কেস তার হাতে এসেছে বলে তো মনে পড়ছে না। ভুরু জোড়া আরও কুঁচকে স্মরণশক্তিকে অধিক তীক্ষ্ণ করতে চাইল ও সি সাহেব।

আর ঠিক তখনই সাব ইনস্পেক্টর মল্লিক কানের কাছে মুখ এনে চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, 'ইয়েস স্যার, গত মাসের এগারো তারিখে কুঁদপুরের বাবলা বনে আমাদের আই বি-র যে লোকটা শড়কির ঘায়ে খুন হয়েছিল, আপনার মনে আছে?'

—ইয়েস, ইয়েস! —কুঁচকানো ভুরু মুহূর্তে টান হয়ে উঠল ও সি সাহেবের।

মল্লিক আবার বলল, 'লোকটা ডেফিনিটলি ওই ঘটনার সঙ্গে ইনভল্ভড। হঠাৎ রেডেড হওয়াতে ভয়ে কনফেস করে ফেলেছে।'

মল্লিকের বুদ্ধিতে চমকিত হল ও সি সাহেব। কালবিলম্ব না করে চওড়া গলায় হাঁকড়ে উঠল, 'পাকড়ো ইসকো।'

মুহূর্তে তিন দিক থেকে তিনটি রাইফেলের নল এসে গোপাল কাহারের শীর্ণ শরীরে ঠেকল। নলের শীতল স্পর্শে গোপালের রক্তের গভীরে একটা দারুণ ভয় শিরশির করে উঠল। চোখ বুজবার আগে অল্প আলোয় গোপাল দেখল শেওলা রঙের জামা-প্যান্ট পরা একদঙ্গল লোক তার ভাঙা বাড়ির চারদিকটা বেড়ো দিয়ে আছে। হাতে একটা করে নল বাগিয়ে ধরা।

সার্চ করো। উত্তেজিত গলায় হাঁকড়ে উঠল ও সি সাহেব।

জনা পাঁচেক ঝাঁপিয়ে পড়ল গোপালের ভাঙা ঘরে। আর্ত চিৎকার করে গোপালের বউ উঠোনে আছড়ে পড়ল। বাচ্চাগুলি মাকে জড়িয়ে ধরে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

ও সি সাহেব আবার ধমকে উঠল, 'অ্যাই মাগি, চুপ্ কর!'

ততক্ষণে গোপালের খানতিনেক ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর ছিটকে এসে পড়ল উঠোনের জলে-কাদায়। রাইফেলের বাঁটের ঘায়ে চুরমার হয়ে যেতে লাগল মাটির হাঁড়ি-কলসি। একদিকের বেড়ো খুলে গেল। এনামেলের সামান্য থালাবাটিগুলি তুবড়ো গেল বুটের লাথিতে।

হঠাৎ উত্তেজিত মল্লিক ছুটে এল। হাতের মধ্যে কী একটা দলা পাকানো জিনিস।

—দেখুন স্যার, দেখুন!

—কী ওটা? ও সি সাহেব আবার ভুরু কোঁচকাল।

টর্চ ফেলে হাতের দলা পাকানো কাগজটাকে টানটান করে মেলে ধরল মল্লিক।

—এই দেখুন স্যার, পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ। এই লোকটার বাড়িতে ম্যাপ থাকার কী জাস্টিফায়েড কারণ আছে? লেখাপড়া না জানা মূর্খ লোক! অথচ এই ম্যাপটা। এবার ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে লিঙ্ক করুন তো?

—ইয়েস্—ইয়েস্! বিষম উত্তেজিতভাবে মাথার টুপি খুলে আবার পরল ও সি সাহেব।

—হাউ ডেন্‌জারাস্ ফর ডেমোক্রেসি! ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে পুরল মল্লিক!

—রাইট-রাইট।

—ঠিক এজন্যই আমি স্যার, কোম্বিং অপারেশনের পক্ষপাতী। গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক মালগুলিকে সহজেই টেনে বার করা যায়।

—ফোর্স উইথড্র করো। চলো ব্যাক করি।

—এই চল্! একটা সবুট লাথি এসে পড়ল গোপালের পাছায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে গোপাল হাউমাউ করে বলল, 'এজ্ঞে, মা কালীর দিব্বি, আমি কিছু করি নাই! উঁয়ারা শড়কি দেখালেক, আমি ছুট্টে পালালাম। আমি কিছু করি নাই!'

—চোপ্!

টেনেহিঁচড়ে ওরা গোপাল কাহারকে কালো গাড়িতে নিয়ে তুলল। গ্রামের ভিজে বাতাসে পেট্রোলের গন্ধ ছেড়ে পুলিশ-মিলিটারির গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গল।

গোপাল কাহারের বাড়িতে তখন কান্নার রোল।

—অ্যাই, তোর নাম বল্?

গোপাল হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসেছিল। তার পেটের জ্বালা এখন শরীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কপালের দু জায়গা আস্ত সুপুরির মতো ফুলে গেছে। নীচের ঠোঁটটা বেশ কিছুটা কাটা। পাঁজরের কাছ থেকে একটু চিনচিনে ব্যথা বুকময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকটায় কিছুটা কান্নাকাটি করেছিল গোপাল। দুটো চোখই এখন চোত মাসের ডোবার মতো খরখরে শুকনো। যন্ত্রণার ফাঁকে ফাঁকে বউ-ছেলেমেয়ের কথা ভাবছিল গোপাল। আর সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, তার দোষটা কোথায়।

—অ্যাই, তোর নাম বল্?

সামনের টেবিল চেয়ারে সাব-ইনস্পেক্টর মল্লিক এবং ও সি সাহেব বসে আছে। টেবিলের অন্য দিকে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা এক বাবু। মল্লিকের হাতে কলম। সামনে একটা লম্বা খাতা খোলা।

এজ্ঞে, গোপাল কাহার। গোপালের গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছিল বলে তার আওয়াজটা খুব কর্কশ শোনাল।

তিনজন মুখ চাওয়াচায়ি করল।

মল্লিক বলল, 'এখনও বেটার তেজ দেখেছেন!'

টুপিহীন ও সি সাহেব তার মসৃণ টাকের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'গণতন্ত্রের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক!'

ধোপদুরস্ত বাবু কেতাদুরস্ত গলায় বলল, 'এদের ঠাণ্ডা না করলে এ দেশের গণতন্ত্রের বারোটা বাজল বলে।'

সাত তাড়াতাড়ি ও সি সাহেব বলল, 'আপনি ভাববেন না জগৎবাবু। এই সিস্টেমে চললে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাটাদের আমরা ঠাণ্ডা করে দেব।'

গোপাল এ সব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। গোটা ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে তার সরল মস্তিষ্ক আরও পারম্পর্যহীন হয়ে যেতে লাগল।

—অ্যাই ব্যাটা, তোর আসল নামটা বল্? চেয়ার ঘুরিয়ে গোপালের মুখোমুখি হল মল্লিক।

প্রশ্নটা মাথায় ঢুকল না গোপালের। আসল আর নকল কী! নাম তো তার একটাই! কাটা ঠোঁট ফাঁক করে সে বোবাদৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—অ্যাই উল্লুক, তোর আসল নামটা বলতে পারছিস না? মেঝের উপর অধৈর্য জুতো ঠুকল মল্লিক।

এজ্ঞে, গোপাল কাহার।

এটা তো নকল নাম। আসল নামটা কী?'

আমার বাপ এজ্ঞে, ওই নামটিই রেখ্‌লো। গাঁয়ের লোক ডেকে শুধান কেনে?

চোপ্ শালা! রসিকতা হচ্ছে?

গোপাল আরও ঘাবড়ে গেল। সে তো বাবুদের সঙ্গে রসিকতা করে নাই। আর রসিকতা করার মতো

শরীর মনের অবস্থাও তার নয়। এবং অবস্থা থাকলেও পুলিশের সঙ্গে রসিকতার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

দাঁতে দাঁত চেপে চোখ ছোটো করে ও সি সাহেব বলল, 'দাওয়াই না দিলে এ শালাদের কাছ থেকে একটা কথাও বার করা যাবে না।'

মল্লিক চোখের ইশারা করতেই এতক্ষণ গোপালের দু পাশে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা সিপাই দুটো নড়ে উঠল। সোজা দুটো লাথি এসে পড়ল গোপালের পাঁজরে। 'আঁক্' করে একটা আর্ত শব্দের সঙ্গে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল গোপাল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল গোপালের। তার মধ্যেই কোনও রকমে উচ্চারণ করল, 'বলছি এজ্ঞে, বলছি।'

মল্লিক কলম হাতে সোজা হয়ে বসল। ও সি সাহেবের ক্রূর বাজপাখির মতো ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল।

হাঁ করে বড়ো বড়ো দম নিল গোপাল। দম চাপা গলায় বলল, 'এজ্ঞে পেথমে বাপ আমার নাম রেখেছিল আকাল। আমি যে সময় হলেম সেবার আকাল ছেল কিনা, তাই।'

—তারপর সুযোগ মতো আমাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তুই নামটা পালটে নিলি, তাই না? একটা ভুরুব মাথা হ্যাঁচ্‌কা টানে উপরে তুলে গোপালের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল মল্লিক।

—এজ্ঞে, আমি নয়, আমার মা। বইললে, ওই অলুক্ষনে নামে ছেলেকে আমি ডাকতে পারবনি। আজ থিকা ওকে আমি গোপাল বলে ডাকব।

গোপালের কথা শেষ হতে না হতেই টেবিল চাপড়ে ধমকে উঠল ও সি সাহেব, 'চোপ রও উল্লুক। তোর পরিবারের ইতিহাস শুনতে বসিনি আমরা।' তারপর ধোপদুরস্ত বাবুব দিকে ফিরে বলল, 'দেখছেন তো স্যার, কী রকম হারামি।'

বাবুটি ব্যাজার মুখে বলল, এরাই গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে।

—মা কালীর দিব্বি বাবু, আমি কারু সব্বোনাশ করি নাই।

—না, সব্বোনাশ করি নাই! শালা তুমি একটি বাস্তু ঘুঘু!

গোঙানো গলায় গোপাল বলল, 'বিশ্বাস কবেন বাবু, আমি ওনার সব্বোনাশ করি নাই।'

—কার? একটা নতুন কিছুব সম্ভাবনায় চমকিত ও সি সাহেব এবং মল্লিক টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল।

গোপাল বলল, 'ওই যে—কী নাম বইললেন, গণতন্ত্র না কী। বিশ্বাস করেন বাবু, ওনাকে আমি চিনিও না। কুন দিন দেখি নাই। কোথায় থাকেন, তাও জানিনে!'

তিনজন আবার পরস্পরের দিকে তাকাল।

মল্লিক বলল, 'কী রকম নিখুঁত অভিনয় করছে, দেখছেন তো স্যার?' তারপর ঝটাং করে উঠে এসে চুলের মুঠো ধরল গোপালের। বারকতক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তোর মতো হারামির পেট থেকে কী করে কথা টেনে বার করতে হয়, তা আমি জানি।'—তারপর একটা সিপাইকে বলল, 'যাদব কো বোলাও।'

যাদব এল। মুগুর ভাজা প্রকাণ্ড শরীর। চোখের ইশারায় গোপালকে দেখিয়ে মল্লিক বলল, 'ইস্‌কো দেখো।'

দেখার মানে বোঝবার আগেই কাজ শুরু হয়ে গেল। গোপালের বাঁ হাতটা পিছন দিক দিয়ে মুচড়ে আস্তে আস্তে চাপ বাড়াতে লাগল যাদব। ক্রমাগত চাপে গোপালের মুখ বিকৃত হয়ে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছে, কাঁধ থেকে বুঝি হাতটা ছিঁড়ে আসবে।

খুব কঠিন, ক্রুদ্ধ গলায় মল্লিক বলল, 'এবার বল্, বাবলা বনের ভিতর কী করছিলি তুই?'

যন্ত্রণায় কাতর গোপাল কোনওক্রমে কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলল, 'এজ্ঞে, ওরা শড়কি দেখাতেই আমি বাবলা বনের ভেতর দে ছুটটে এলুম।'

তুই খালি ছুটে এলি? কিছু করিসনি না?

—না বাবু, আমি কিছু করি নাই!

—তবে কে করল?

—কেউ কিছু করে নাই বাবু।

—লোকটা অমনি অমনি পটাং করে মরে গেল?

—কেউ ত মরে নাই বাবু।

শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে এ আর এক যন্ত্রণায় পেয়ে বসল গোপালকে। এ এক বিষম বিপদ হয়েছে তার। কী জানতে চাইছে এরা তার কাছে! দিকচিহ্নহীন এক অকূল পাথারে সে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। হাত পা ছুড়ে যত সে উদ্ধারের চেষ্টা করছে, এরা তাকে ততই ঠেলে দিচ্ছে অতলে। মল্লিক ইশারা করতেই যাদব আবার হাতের চাপ বাড়াল।

'আঁ—আঁ—আঁ!' —রক্তের মধ্যে যন্ত্রণাটা যেন ঝন্‌ঝনিয়ে বাজতে লাগল গোপালের পুরোনো বাজের মতো ও সি সাহেব টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে বলল, 'বল্‌, শুয়ারের বাচ্চা বল, কে কে ছিল সেখানে? কারা কারা শড়কি দেখলো? তাদের নাম কী?'

হাতের যন্ত্রণা শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে টনটন করে বাজছে গোপালের। তার বিস্ফারিত চোখের ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে অন্ধকার ঢুকে যাচ্ছে। আর তিনটে হিংস্র জানোয়ার যেন অন্ধকারে ভিতর থেকে মুখ বার করে কান ফাটানো গর্জন করছে, 'নাম বল্‌, তাদের নাম বল্‌!' অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে গোপাল কোনওক্রমে উচ্চারণ করল, 'প্রসন্ন হালদার!'

ঘরে বজ্রপতন হলেও বোধ হয় এত বিস্ময় ছিল না। তিনজন তিনজনের দিকে তাকাল। হারামজাদা বলে কী! প্রসন্ন হালদার। লোকটা যে কত বড়ো শয়তান এবং ফেরেব্‌বাজ তা বুঝতে আর কারু বাকি থাকল না। তা না হলে প্রসন্ন হালদারের মতো লোককে এর সঙ্গে জড়াতে চায় বেটা!

মল্লিক বলল, 'দেখলেন তো স্যার, কত বড়ো ঘুঘু!'

ও সি সাহেব নাভিমূল থেকে একটি শব্দ পরিত্যাগ কবল, 'হুম্‌!'

ধোপ দুরস্ত বাবু খুব সাবধানে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ন্‌না, এ দেশে গণতন্ত্রের মরার আর বেশি বাকি নেই!'

কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি ও সি সাহেব বলল 'কিছু ভাববেন না স্যার, গণতন্ত্রকে আমরা বাঁচাবই।'

বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

তারপর চলে যাওয়ার আগে বেশ থিয়েটারি ঢঙে বলল, 'মনে রাখবেন, আমাদের গণতন্ত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র।'

শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত মল্লিক হাঁক দিল 'পানি লে আও।'

বালতি করে জল এল।

মুখে ঝাপ্‌টা লাগাও!

গোপাল কাহারের চোখেমুখে জলের ঝাপ্‌টা চলল।

ও সি সাহেব আর মল্লিক টিফিন সেরে এল বাইরে থেকে। এটা আর কিছু নয়, গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য নতুন উদ্যম গ্রহণ মাত্র।

—কিরে, জ্ঞান ফিরল?

—থোড়া থোড়া সাব।

যাদবের পরিচর্যায় আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরছিল গোপালের। আসলে ঝাপ্‌টার জল তার হাঁ করা মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে, মরুভূমির মতো শুকনো কণ্ঠনালীকে ভিজিয়ে পাকস্থলীর হা হা করা শূন্যতায় বিন্দু বিন্দু জমা হচ্ছিল। আর তাই তাকে ক্ষুধা যন্ত্রণায় মূর্ছিত অন্ধকার থেকে চেতনার নরক যন্ত্রণায় পৌঁছে দিচ্ছিল।

হঠাৎ হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে বসল, গোপাল, গণতন্ত্রকে আমি চিনি না বাবু। উয়াকে কুন দিন দেখি নাই! কুথায় থাকে তাও আমি জানি না।'

চোপ্, শালা! ন্যাকা চৈতন!' মল্লিক গর্জন করে উঠল। তারপর ভাঁজ খুলে ম্যাপটা গোপালের চোখের সামনে মেলে ধরে বলল, 'এটা কী?'

গোপাল কোনও জবাব দিল না। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। দু-একবার চেষ্টা করেও বাঁ হাতটা নাড়াতে পারল না গোপাল। মনে হল, হাতটা শরীর থেকে বাদ চলে গেছে। যাওয়ার আগে তার কোষে কোষে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে একটা যন্ত্রণার বিষ। সেই বিষ তার শরীরময় চক্কর দিয়ে ফিরছিল। মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল তার দেহটা।

হাতের রুল দিয়ে গোপালের কপালে একটা ঠোক্কর মেরে মল্লিক আবার চেঁচাল, 'বল্, এটা কী?'

ভাঙা ঘরঘরে গলায় গোপাল বলল, 'কাগজ।'

—কাগজ! হারামি, তুই জানিস্ না এটা কী? ম্যাপ দেগে সারাদেশে গণতন্ত্রের বারোটা বাজাচ্ছিস, আর এটা কী জানিস না!'

ও সি সাহেব বলল, 'কোথায় পেয়েছিস এটা?'

—অ্যাঁ! চোখ দুটো কে যেন জোর করে বুজিয়ে দিচ্ছে গোপালের। সে প্রাণপণে টেনে খুলে রাখতে চাইল।

—কোথায় পেয়েছিস বল?' ও সি সাহেবের প্রচণ্ড গর্জনে আশরীর চমকে উঠল গোপাল।

—এজ্ঞে আমার দশ বছুরে ছেলে নে এয়েছিল ইচকুল থেকে। আচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে গোপাল বিড়োবিড়ো করে বলল।

—কেন?

—ইচকুলের বাগান থিকে পিয়ারা খেয়েছিল,—দপ্তরি কুঞ্জ মেরেছিল উঁয়াকে।' থেমে দম নিয়ে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে গোপাল বলল, 'ছোটো ছেলে—সেই রাগে ইচকুল থিকে সরিয়ে নে এয়েছিল ওটা।'

—শালা ঘুঘু, এখনও গল্প বানিয়ে আমাদের বুদ্ধু বানাচ্ছিস! হারামি! মল্লিকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। মহান গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সে রুল হাতে গোপাল কাহারের শীর্ণ শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পরিশ্রান্ত মল্লিক এক সময় কপালের ঘাম মুছে উঠে দাঁড়াল হাতের রুলটা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'নে, এটাকে লক্-আপে ঢোকা।'

থানার লক্-আপে তিনটে ছিঁচকে চোর, একজন গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার, দুজন ভবঘুরের সঙ্গে গোপাল কাহারের মূর্ছিত দেহটাকে নামিয়ে রেখে গেল কনস্টেবলেরা।

আর এমনই অদ্ভুত ব্যাপার, থানা লক-আপের লোহার গরাদ ডিঙিয়ে পরদিন ভোরের প্রথম আলো গোপাল কাহারের জ্বরে আতপ্ত, ব্যথায় জর্জরিত, লাঞ্ছিত দেহের উপর এসে পড়ল। এত সব কাণ্ডের পর তাব মৃত্যু হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু গোপাল কাহার কি সহজে মরে? জন্ম থেকে তাকে ক্ষুধায় মারছে, প্রকৃতি মারছে, কুচক্রী মানুষ মারছে। মারের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ সহজাত।

আর সেই সহজাত প্রতিরোধেই সে স্যাঁতসেঁতে মেঝে থেকে মাথাটা ইঞ্চি দুয়েক তুলে কোনও মতে উচ্চারণ করল, 'জল'।

এক কোণায় একটা পুরোনো বালতিতে কে জানে কতদিনের বাসি ময়লা জল পড়েছিল। গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার অতি কষ্টে উঠে গিয়ে, কেননা তারও শিরদাঁড়াটা ব্যথায় টনটন করছিল, একটা মাটির ভাঁড়ে করে সেই ময়লা জলই গোপাল কাহারের মুখের সামনে ধরল।

জল খেয়ে গোপাল মাথা গুঁজে রইল। এর মধ্যেই তার মনে হল, যে জল দিল সে কালকের মতো কেউ নয়। ভিন্ন মানুষ। আর তখনই গোপাল একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বলল, 'গণতন্ত্র কী বাবু?'

গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার হকচকিয়ে গেল। এ আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার। গণতন্ত্র! এ-সময় এখানে!

গোপাল তার প্রকাণ্ড ফোলা মুখ থুঁতনির কাছে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত, কাটা ঠোঁট নিয়ে আবার বিড়োবিড়ো করে জিজ্ঞাসা করল, 'গণতন্ত্র কী বাবু?'

প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার কী ভাবল কে জানে। কয়েক মুহূর্ত স্থির অপলক চোখে গোপালের বিপর্যস্ত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কেন জানি একটু ম্লান হেসে বলল, 'গণতন্ত্র! সকলে সমানভাবে খেয়ে পরে বাঁচবে, দেশে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকবে, সবাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে, তার নামই গণতন্ত্র।'

গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে গোপাল আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

অবশেষে দীর্ঘ সাত মাস অতিক্রান্ত হইবার পর বিনা বিচারে বন্দী গোপাল কাহার সদর জেলখানা হইতে মুক্তি পাইল। তাহার বাঁ হাতখানি কাটিয়া বাদ দিতে হইয়াছে। বাহিরে আসিয়া বড়ো বড়ো করিয়া সে নিঃশ্বাস টানিল। সম্ভবত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, যে বায়ুমণ্ডল এবং সূর্যালোক সে ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহা এখনও সেই রূপই আছে কি না।

সে সিদ্ধান্ত করিল, প্রথমে বাড়ি যাইবে। বউ-ছেলেমেয়ের বাঁচা-মরার সংবাদ লইবে। তাহার পর সোজা সমিতির অফিসে।

কেননা, সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, যে গণতন্ত্রের জন্য সে বাঁ হাতখানি সেলামি দিয়াছে, সেই গণতন্ত্রকে ভাঙিয়া সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্রের জন্য সে তাহার দক্ষিণ হাতখানিও সেলামি দিবে। □

তরাইয়ের মা

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

হুইশল দিয়ে ট্রেনটি ছেড়ে দিল। দ্রুত ছুটে চলা ইলেকট্রিক ট্রেনের পিছনের লাল আলোটা অতি দ্রুত হারিয়ে গেল দূরের অন্ধকারের মধ্যে। শান্তনু চুপ করে সে দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেননা যাত্রীরা চলে গেলে তবে সে আস্তে আস্তে যাবে তার গন্তব্যস্থলের দিকে।

কোথায় যাচ্ছে সে? ভাবতে গিয়েই ভাবনাগুলো জলতরঙ্গের মতো নানা দিক থেকে বুকের পাড়ে এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। নিজেকে থামাল শান্তনু।

প্ল্যাটফর্মে যাত্রী খুব একটা ছিল না অবশ্য। ছুটির দিন। মফস্‌সল শহর। তার উপর একটানা কদিন চলছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। মাঘ মাসের বোধ হয় মাঝামাঝি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। ধারালো ছুরির ফলার মতো উত্তরের বাতাস বইছে এলোমেলো। আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখা ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের স্তূপের মতো মেঘ জমাট হয়ে রয়েছে আকাশে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। প্ল্যাটফর্মের চারদিকে দেখতে দেখতে এগোল শান্তনু। শেডের আলোগুলো জ্বলছে না। গত রাতের প্রবল ঝড়ের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে সারা প্ল্যাটফর্মে। শুকনো পাতার এলোমেলো ছন্নছাড়া জটলা। জলের দাগ, কাদা। পরিত্যক্ত মাটির ভাঁড়। সামনেই ওভারব্রিজ। বুকের মধ্যে হঠাৎ আটকে যাওয়া নিশ্বাসের মতো অস্বস্তিকর নীরবতা।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল শান্তনু। না। সন্দেহভাজন কোনও লোক ধারে-কাছে নাই। চারদিকে একটা আলো-আঁধারি। ওভারব্রিজের মাঝামাঝি এসে শান্তনু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। দূরে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত। মনে হচ্ছে একটা অন্ধকার সমুদ্র। কান পাতলে অন্ধকার ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাবে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটা যেন অপলকভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। শান্তনুর কাঁজটাকে দেখছে। যেন শান্তনুর মনের গোপনে লুকিয়ে থাকা উদ্দেশ্যটাকে পড়ে নিচ্ছে। ময়লা চাদরটাকে ভালো করে মাথায় গলায় জড়াল শান্তনু। মনটা তার ক্রমশ যেন আরও ভারী হয়ে উঠছে। অনুভবের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা বেদনা কালো ধোঁয়ার মতো ক্রমাগত পাক খেয়ে মাথার ভিতরে চিন্তায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাথাটাকে জোরে ঝাঁকিয়ে নিল সে। দমকা উত্তরের বাতাসের একটা ঝাপটা বেতের মতো আছড়ে পড়ল তার মুখে। না। খুব বেশি সময় নেই। কাজ মিটিয়ে আজ রাতেই ফিরতে হবে তাকে। দৃঢ় পদক্ষেপে ওভারব্রিজ পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নামল শান্তনু। স্ট্যান্ডে অল্প কয়েকখানা রিকশা ছিল। একটাতে উঠে বসল সে। গন্তব্যস্থান জানিয়ে দিল।

দীর্ঘ এক বছর বাদে কল্যাণদের বাড়িতে যাচ্ছে সে। কল্যাণের মায়ের মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। পুনরায় অস্বস্তি জাগল। সেই হাসি হাসি স্নিগ্ধ মুখ। স্নেহে আর ভালোবাসায় ভরা দিঘির মতো চোখ। কল্যাণের বাবা মারা গেছেন বছর কয়েক আগে। কাকা দেখাশুনা করেন। আছে এক ছোটো ভাই আর এক বোন। অযত্ন বর্ধিত দাড়ির মাঝে অন্যমনস্কের মতো আঙুল চালাতে চালাতে আশপাশ দেখতে লাগল সে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় টুকরো টুকরো আলোকিত দেওয়াল সরে সরে যাচ্ছে। চুনকাম করা দেওয়ালে অসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে জেগে জেগে উঠছে স্লোগানগুলি। এক একটি বুলেটের মতো। দুনিয়ার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর তার পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করুন। নকশালবাড়ির আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও। একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করবে। ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থা। ...গণফৌজ ছাড়া জনগণের আর কিছুই নেই...

এসে গেছি বাবু--

চমক ভাঙল শান্তনুর। নেমে পড়ল রিকশা থেকে। ভাড়া মিটিয়ে দিল। সামনেই গলিটা যেন ওর দিকে কতদিনের পরিচয় নিয়ে থমকে চেয়ে আছে। রাস্তায় আলো নেই। উনুনের ধোঁয়া বেরিয়ে চারদিকে অস্পষ্ট কুয়াশার মতো ঝুলে রয়েছে। বুকের মধ্যে কি ধোঁয়াটা ঢুকে পড়ছে? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? পা দুটো অসম্ভব ভারী লাগছে কি? বড়োরাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা ফালি যেন এসে পড়েছে গলির প্রবেশপথের বাড়ির দেওয়ালে। লাল কয়েকটা শব্দ যেন মাঘ মাসের এই তীব্র শীতকে প্রচণ্ড উপেক্ষা করে আগামী ভবিষ্যতের লাল ফুলের মতো ফুটে রয়েছে। বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। এটা ১৯৭০। মনে মনে ভাবল শান্তনু। এগিয়ে চলল গলির কাদাভর্তি ভাঙাচোরা জলজমা গর্ত মাড়িয়ে কল্যাণদের বাড়ির দিকে।

বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ভাবল, তারপর কড়া নাড়ল।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। হ্যারিকেন হাতে এসে দাঁড়ালেন মা। কল্যাণের মা। —'কে?'

হ্যারিকেনের আলোয় প্রথমে চিনতে পারলেন না। চাদরটাকে মাথা থেকে খুলে কাঁধে ফেলে দিল শান্তনু।

—মাসিমা, আমি শান্তনু।

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মায়ের মুখ। —'এসো বাবা, এসো। কতদিন পরে এলে।' আলো দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন শান্তনুকে। 'ভিজে গেছ তো? যা দুর্যোগ চলছে। একটা শুকনো কাপড় দেব?'

—না, না। লাগবে না। সে রকম কিছু ভিজিনি। এ দিকে একটু এসেছিলাম। ভাবলাম দেখা করেই যাই আপনার সঙ্গে।

—ভালো করেছ বাবা। মাঝে মাঝে এসো। না হলে মনটা ফাঁকা হয়ে থাকে। এখানে আজকের রাতটা কাটিয়ে যাও না।

—না মাসিমা। জরুরি কাজ আছে। আজ আর থাকা যাবে না। আর একদিন এসে থেকে যাবখন।

মায়ের মুখ একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—তোমার চেহারাটা আগের থেকে খারাপ হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হয় না তো তোমাদের। আমি জানি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মা।

—বাচ্চু বাবলিকে দেখছি না? বলল শান্তনু। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় গোটা ঘরটাকে একটা অয়েল পেন্টিঙের মতো লাগছে। সাদামাঠা যে কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের শোওয়ার ঘরের ছবি একই।

—ওরা মাস্টারের কাছে পড়তে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।

পুরোনো বাড়ির পুরোনো জানলার পাল্লা হঠাৎ আসা উত্তরের দমকা হিমেল বাতাসে সজোরে খুলে গেল। টেবিলে রাখা হ্যারিকেনের শিখা দপদপ করে উঠল।

—তুমি বসো বাবা, আমি চা করে আনি। মা পাশের ঘরে গেলেন। 'রুটি তরকারি করা আছে। খেয়ে যেও।' —মা বললেন রান্নাঘর থেকে।

কী করবে বুঝতে পারছিল না শান্তনু। এ ঘর তার বহু পরিচিত। কলেজের দিনগুলোর কত দিনরাত কেটে গেছে কল্যাণের সঙ্গে এ ঘরে। কত স্বপ্ন, কত ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখত তারা। কিন্তু বুঝত না। এ দেশে এই ব্যবস্থায় কোনও স্বপ্নই পূরণ হবে না। এ দেশ জুড়ে এক মৃত্যুফাঁদ পাতা। তারপর এল শ্রদ্ধেয় নেতার মহান আহ্বান। জানতে পারল কোন পথে মুক্তি আসবে। ডাক এল গ্রামে চলো। হাজার হাজার তরুণের সঙ্গে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মহান মুক্তিযজ্ঞে। সেই থেকে গ্রামে......

রান্নাঘরে উনুনের উপর চাপানো জলের দিকে চেয়ে চুপ করে চেয়ে বসে আছেন মা। ভাবছিলেন। একটা সোয়েটার বুনছিলেন ছেলের জন্যে। যেখানে থাকে সেখানে প্রচণ্ড শীত। কোনও গরম জামা নিয়ে যায়নি সঙ্গে করে। ওকে জানিয়েছিলেন চিঠিতে। 'তোমার জন্য একটা সোয়েটার বুনছি। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ হতে পারে। কেউ যদি এ দিকে আসে একবার দেখা করতে বোলো। তার হাতে পাঠিয়ে দেব।' উত্তরে ছেলে জানিয়েছিল—'মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। সোয়েটার পাঠাবে বলেছ—কী হবে। আমি যে ভূমিহীন

খেত-মজুরদের সঙ্গে থাকি—তাদের পরনে সামান্য কাপড়ও জোটানো দায়। আমি এদের সঙ্গে শীত-গ্রীষ্ম-দুঃখ-কষ্ট অনাহারের সঙ্গী হয়ে উঠেছি। একাত্ম হয়ে উঠতে চেষ্টা করছি এদের রোজকার জীবনের সঙ্গে। আমি এদের একজন। যে দিন এদের সকলের গায়ে গরম জামা তুলে দিতে পারব সে দিন আমিও পরব। বরং তুমি পাঠিয়ে দিও। এদের কোনও একজনের কাজে লাগে কি না দেখব। আমার জন্যে ভেবো না। এখানে—সারা পশ্চিম বাংলায়—সারা ভারতে লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে আছেন কোটি কোটি জনম দুঃখিনী মা। তুমিও তাদেরই একজন। সেই অশ্রুমুখী জননীর দুঃখ চিরতরে মুছিয়ে দিতে আমরা বিপ্লবের কাজে ঝাঁপ দিয়েছি। মাগো এ যুগ যে আমাদের..........বিপ্লবের আত্মত্যাগের।'

চা তৈরি করে ফেললেন মা। ভাবলেন ভালোই হয়েছে। সোয়েটারটাও বোনা শেষ হয়ে গেছে। ছেলেটি এসেছে ঠিক সময়ে। প্রায়ান্ধকার ঘরে মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশের দিকে চেয়ে শান্তনু বসেছিল চুপ করে। বড়ো কঠিন কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। পার্টির আঞ্চলিক কমিটির নির্দেশেই এসেছে সে। সারা পশ্চিম বাংলায় জ্বলে উঠেছে বিপ্লবের আগুন। ছড়িয়ে পড়েছে আসমুদ্র হিমাচলে। নকশালবাড়ি—এই নামে সারা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গ্রামের জোতদার আর তার পা-চাটা কুকুররা আজ বিশ্বাসঘাতক সংশোধনবাদীদের রাতের দুঃস্বপ্ন। কলেজের ছাত্রফ্রন্টের সংশোধনবাদী নেতারা অনেক চেষ্টা করেছিল তাদের দমিয়ে দিতে। পারেনি দু বছর হয়েছে। কত নতুন অভিজ্ঞতা। কত মানুষ। সামনে জ্বলছে বিপ্লবের রক্তমশাল। জেগে উঠেছে গোটা দেশ। কাঁপছে মাটি, আকাশ আর অরণ্য। শান্তনু ভাবে—এগিয়ে যেতে হবে সামনে। প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে। কিন্তু কীভাবে বলবে মাসিমাকে?

—নাও বাবা খেয়ে নাও। মায়ের আসার আওয়াজে শান্তনু সংবিৎ ফিরে পেল। মেঝেতে অ্যালুমিনিয়মের থালায় রুটি আর তরকারি রাখা হয়েছে। এখনও সন্ধ্যা পুরো উত্তীর্ণ হয়নি মনে হয়। দূরে দূরে বাড়িতে মঙ্গলশঙ্খ ভেসে আসছে। অনেক দূরে পুরোনো শিবের মন্দিরে আরতি হচ্ছে। কাঁসর ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। তা ছাড়া গোটা এলাকা নিস্তব্ধ। শুধু দমকা বাতাসের ধাক্কায় পুরোনো জীর্ণ বাড়ির ঘুণধরা দরজা-জানলায় শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

মা পাশে বসলেন। সব কথা হারিয়ে যাচ্ছে শান্তনুর। কী বলবে সেই ভেবে পাচ্ছে না। কোথা থেকে শুরু করবে? হ্যারিকেনের আলো পড়েছে মায়ের মুখে। স্নেহ আর ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক মা। বয়েসের রেখা পড়েছে কপালে, গালে। মুখের মানচিত্রে জমে রয়েছে অসংখ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের দারিদ্রদৈন্যের দীর্ঘ ইতিহাস।

—আপনি ভালো আছেন মাসিমা। জোর করে কথা বলল শান্তনু। রুটি তরকারি গলায় আটকে যাচ্ছিল। জল দিয়ে গিলল।

—আমাদের আর ভালো থাকা। তোমরা ভালো থাকলেই ভালো থাকবে মায়েরা।

মাথার মধ্যে যেন সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধছে। এই শীতের সন্ধ্যায় কান গরম হচ্ছে টের পেল শান্তনু। চোখটা জ্বালা করছে কেন? ঝাপসা কুয়াশা যেন ঘিরে ধরছে হ্যারিকেনের চিমনিটাকে। সারাটা পথ নিজেকে তৈরি করে আনল সে......অথচ ঠিক সময়ে এত অসহায় হয়ে পড়ছে কেন সে? সে একজন বিপ্লবী। তার এ দুর্বলতা সাজে না। অথচ ভেতরটা যেন গলে যাচ্ছে মোমের মতো। মায়ের প্রত্যাশাভরা গভীর চোখ যেন তার মনের গভীরে এক স্পর্শকাতর জায়গাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সামান্য সংক্ষিপ্ত এক বার্তা এত ভয়ঙ্কর, এত কঠিন হতে পারে তা বুঝতে পারেনি সে আগে।

—তুমি এখন কোথায় আছ? মা চোখ তুলে চাইলেন।

শান্তনু সুযোগ পেল। খুব দ্রুত বলে চলল গাঁয়ের অবস্থা। ব্যাখ্যা করল দেশের পরিস্থিতি। বলল—'মাসিমা, আমরা একা নই। আমাদের মতো হাজার হাজার তরুণ এগিয়ে এসেছে বিপ্লবের কাজে। আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের প্রেরণা জোগাবে।

মা হাসলেন। যেন একরাশ আকাশ ঝরে পড়ল সে হাসিতে।—আমরা সাদাসিধে মানুষ। সব কথা বুঝতেও পারি না। তবে বুঝি তোমরা একটা বড়ো আদর্শের টানে এগিয়ে গেছ। ....মা থেমে গেলেন। পায়ের

শব্দ এল গলিতে। পড়ে ফিরছে বাচ্চু আর বাবলি। হুড়মুড় করে ঢুকে ওরা থমকে গেল। তারপর চলে গেল পাশের ঘরে বইটা রাখতে। ওদের চোখে অজস্র কৌতূহল।

কোনও রকমে খাওয়া শেষ করল শান্তনু। সে সিদ্ধান্ত করে ফেলল। যে কাজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল সে তা আজ পালন করতে পারল না। সে দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে সাময়িকভাবে হলেও। হেরে গেছে শান্তনু।

ভারতের মানচিত্রের মতো মায়ের মুখ। হ্যারিকেনের চঞ্চল আলোকশিখা কাঁপছে সেই মাটিতে চঞ্চল ঢেউয়ের মতো। শান্তনু শৈশবে মাকে হারিয়েছে। সেই হারানো মায়ের মুখ আর গ্রামের মাটির বাড়ির গাঢ় অন্ধকারে ভূমিহীন খেতমজুরের মায়ের মুখ অবিকল এক। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

নীরবে চা-টা খেয়ে নিল সে। রান্নাঘরের দরজার পাশে মেঝেতে পাশাপাশি বসে তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কল্যাণের দুই ভাইবোন। বুকের মধ্যে ধূপের ধোঁয়ার মতো যন্ত্রণাটা আবার পাকিয়ে উঠছে। ওরা এতক্ষণে চিনতে পেরেছে।

—মাসিমা, আমি তা হলে উঠি। উঠে পড়ল শান্তনু।

—আবার এসো বাবা। এ দিকে এলে ঘুরে যেও একবার। সব সময় তোমাদের কথা মনে পড়ে। শরীরের দিকে নজর রেখো।

ময়লা চাদরটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল শান্তনু।

হঠাৎ কী যেন ভাবলেন মা। বললেন, ‘একটু দাঁড়াও।’ তারপর চৌকির তলা থেকে টেনে আনলেন একটি পুরোনো তোরঙ্গ। খুলে বার করলেন একটা কাগজের প্যাকেট।

—এতে একটা সোয়েটার আছে। ......থামলেন..... ‘খোকন শেষ চিঠিতে লিখেছিল—কোনও গরিব খেতমজুরকে দেবে.......আমি খোকনের জন্যে বুনেছিলাম—মা বললেন।

শান্তনু স্তব্ধ। পা যেন মাটিতে আটকে গেছে।

মা কাছে এলেন। আস্তে আস্তে সস্নেহে হাত ছোঁয়ালেন ওর মাথায়। তাঁর উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে তার গালে।—সে নেই........আমি বুঝতে পেরেছি.....মা বলে চললেন। শান্তনুর মনে হল যেন কোনও এক দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে মায়ের কণ্ঠস্বর।......সে শহিদ হয়েছে। যাদের কাছে সে ছিল......সেই ভূমিহীন গরিব খেতমজুরদের কাছে পাঠিয়ে দাও এই জামাটা......মনে করব আমার খোকনই পরেছে—তারাও যে আমার খোকনেরই মতো.......মা থামলেন।

মুহূর্তে কী যেন ঘটে গেল। না বলা কথা আর কষ্টের সব অনুভূতি ভেঙে একাকার হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল শান্তনু মন্ত্রমুগ্ধের মতো। তার বুকের মধ্যে এতক্ষণের আটকে থাকা কষ্টকর নিশ্বাসটা যেন এক নিমেষে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়ে গেল। সে হাত বাড়িয়ে নিলে প্যাকেটটা। সে দেখতে পেল তার সামনে হ্যারিকেনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক মা। বিশাল। তাঁর মাথা ছুঁয়েছে আকাশ, পা ছুঁয়েছে ধরণীতল। ক্রমশ বেড়ে উঠছেন তিনি। ঘর ছাড়িয়ে গলি। আকাশ আর সমুদ্রের মতো। নতজানু হয়ে মাসিমার পা ছুঁল শান্তনু। আশীর্বাদ করুন। বিপ্লবের কাজে যেন আপনার খোকনের মতো.......

দ্রুত গলিতে চলে এল শান্তনু। .....চকিতে এক পলক মুখ ফিরিয়ে দেখল হ্যারিকেন উঁচুতে তুলে আলো দেখাচ্ছেন মা তার হাঁটার পথে। দৃঢ় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা, তরাইয়ের মা। □

যাত্রা

জীবন সরকার

আকাশ ঘন নীল। ছবির মতো সাদা মেঘের টুকরো ভাসছে। আকাশের কোনও পরিবর্তন নেই। সেই অতীতে শিশুচোখে যেমন দেখেছিলাম, আজও তাই। কোথাও একটু ওলট-পালট নেই।

দূরে কোথায় যেন বিসর্জনের বাজনা বাজছে। সময় হয়ে এল। যাত্রার সেই শুভ মুহূর্তটি আজও এসে দাঁড়াবে দোরের কাছে। আজও বরদাকান্ত তাঁকে স্বাগত জানাবেন দু হাত বাড়িয়ে কালের ভাঙাগড়াকে উপেক্ষা করে। বাড়ির ভেতরে এসে কাকে যেন খুঁজলেন বরদাকান্ত। তারপর ডাকলেন—বউমা।

বিস্তৃতবক্ষ উন্নতকায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বরদাকান্তের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এখনও যেন আড়িয়ালখাঁর গর্জনের আভাস। বড়োবউ পাশের ঘরে ছিলেন। ডাক শুনে বের হয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে বললেন—কী বাবা।

—সময় হয়ে এল মা, যাত্রার আয়োজন করতে হয় যে।

বড়োবউ সবই জানেন। শাশুড়ির মৃত্যুর পর তিনিই এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী। এ সব দায়দায়িত্ব এখন তাঁরই। এতদিন এই দুখানা হাত শত কর্তব্যে বিব্রত থেকেও হত না; বরং মনে হয়েছে এ যেন তাঁর নারী জীবনের এক বিশেষ মর্যাদা। কিন্তু আজ কোথায় যেন হতাশা। কোথায় যেন ক্লান্তির মেঘ। বুক জুড়ে কিসের যেন এক শূন্যতা। তবু শ্বশুরের আদেশকে উপেক্ষা করার শক্তি নেই তাঁর। বলার ক্ষমতা নেই, আমি আজ ক্লান্ত বাবা; বরং প্রতিবারের মতো আজও তিনি বললেন, এখনই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বাবা। চটিতে শব্দ তুলে আবার বারান্দায় ফিরে গেলেন। পরিবারের এই প্রাচীন প্রথাটিকে বরদাকান্ত এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন। পালন করেন এই জন্য যে এই প্রথাটির সঙ্গে পরিবারের একটা পুরোনো আভিজাত্যবোধ জড়িয়ে আছে। এবং লুকিয়ে আছে বুঝি বনেদি এক অহঙ্কারও। মহাপূজার শেষে বিজয়া দশমীর দিনটি রাজা-মহারাজারা মৃগয়া ও যুদ্ধযাত্রার পক্ষে পুণ্যলগ্ন বলে বিবেচনা করতেন একদা।

পূর্বপুরুষের সেই ধারাটিকে উত্তর-পুরুষের কর্তব্য হিসেবে এখনও সযত্নে লালন করেন বরদাকান্ত। তাই বাইরের নাটমন্দিরে যখন মহাপূজার বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠত তখন অন্দরমহলে যুদ্ধ অথবা মৃগয়া যাত্রার জন্য একটা সাজ সাজ রব পড়ে যেত। বরদাকান্ত এই রকম এক রাজবংশের উত্তরপুরুষ। তাঁর দেহে এখনও ক্ষত্রিয়ের রক্ত পূর্ণ মাত্রায় বহমান। সুতরাং বংশের সেই প্রাচীন প্রথাটিকে পালন করে বুকের মধ্যে এখনও তিনি গর্বের উত্তাপ অনুভব করেন।

মাঝের বড়ো ঘরটিতে সার সার পিঁড়ি পাতা হয়েছে। মাঝখানে একটি বিশেষ আসন। সেখানে বরদাকান্ত বসবেন। তাঁর দুই পাশে বড়ো দুই ছেলে অমলাকান্ত ও সুরমাকান্ত। তাঁদের দুই পাশে আর দুই ছেলে বিজন আর অমিতেশ। পিছনের সারিতে তাঁর পৌত্র-দৌহিত্রের মেলা। পিঁড়ির সামনে একটি বড়ো পিতলের কলস মঙ্গলচিহ্ন এঁকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপরে বিল্বপত্র, আম্রপল্লব। একধারে প্রাচীন এক প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। মঙ্গলকলসের সামনে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছোট্ট একটা মূর্তি। প্রতিমা ধরনের বিশাল থালাটি তার একপাশে পড়ে।

থালার উপরে বেলের পাতা, খাগের কলম, ধানদূর্বা ইত্যাদি সাজানো। বাঁদিকে বিচিত্র কারুকাজ করা পিতলের একটি মলিন ঝাঁপির মধ্যে পরিবারের কিছু পুরোনো সম্পদ। সিঁদুর-মাখানো কয়েকখানা মুঘল আমলের মোহর। বিরলকেশ ইংরেজ রাজার মস্তকশোভিত কিছু মুদ্রা ও পূর্বতন গৃহদেবতার কিছু সোনা-রুপার গহনা। অনুষ্ঠানের শেষে এইসব সোনা সম্পদ স্পর্শ করে যাত্রা আরম্ভ করতে হয়।

বয়েস হয়েছে বরদাকান্তের। জীবনে অনেক উত্থানপতন, অনেক ভাঙাগড়া দেখতে দেখতে আজ তিনি অবসন্ন। পুরনো দিনের স্মৃতিরা ভিড় করে তাকে যন্ত্রণা দেয়। বিশেষ করে এই রকম উৎসবের দিনে অতীত যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। জানলা দিয়ে বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে দেন বরদাকান্ত।

কত প্রতিপত্তি। বিরাট রাজপ্রাসাদ, কত মানুষ। ঘোড়ায় চড়ে যখন বের হতেন সকলেই কুর্নিশ জানাতেন। যেমনি দেখতে ছিলেন তেমনি শৌখিন। টানা টানা চোখ। উন্নত নাক। পাট করা চুল। সরু করে গোঁফ ছাঁটা। কলকাতা থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি ধুইয়ে আনাতেন। একবার বরদাকান্তের শখ হল ঘোড়ার লেজে আতর মাখিয়ে রাস্তায় বার হবেন। সেই আতরের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করলেন। চোখ ফিরে আসে। বুকের ব্যথা বেড়ে যায়। টাকাকে কাগজ ভেবে উড়িয়েছেন হাওয়ায়। দুই হাতে দান করেছেন গরিব দুঃখীদের। আজ টাকার জন্যে হাপিত্যেশ করেন।

অদৃষ্টের কী পরিহাস! বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। অবশ্যি এখন বড়োবউমা নিজের হাতে জামাকাপড় কেচে দেন। তাঁরা অনেকেই হয়তো ভোলেননি। চেহারায় সেই জৌলুস নেই। নেই মাথার চুল। গাল ভেঙে পড়েছে। অবশ্যি যৌবনকালে যে জৌলুস ছিল এখনও সেই চিহ্ন একেবারে দুর্লভ নয়। এত দারিদ্রের মধ্যেও তার ছাপ যায়নি।

বরদাকান্ত পায়ে পায়ে যেন সেই অতীতের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই প্রথম যৌবনের উত্তাল দিনগুলি যেন কথা কয়ে উঠছে তাঁর সঙ্গে। সংসারের দায়িত্ব তখন বরদাকান্তের উপর। মা তখন জীবিত। মায়ের কথা মনে পড়তেই চোখ দুটো যেন জলে ভরে এল।

বরদাকান্ত কাপড়ের আঁচল দিয়ে নিজের মুখটা একটু মুছলেন। এই মাতৃপূজার সেই বিশাল আয়োজনের কথা ভাবতে ভাল লাগে। বাইরে থেকে সব আত্মীয় এসে জড়ো হতেন। একটা ঢাক নয়, পঁচিশটা ঢাকে যখন একসঙ্গে কাঠি পড়ত তখন সারা গ্রাম যেন বাজনার তালে তালে কেঁপে উঠত। পাঁঠা বলি হত। মোষ বলি হত। পূজার কদিন এক বিরাট যজ্ঞ। মহোৎসব।

বড়ো বউমার ডাকে যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন বরদাকান্ত। বরদাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন কমললতা। তারপর ইতস্তত করে বললেন, ও দিকের পাড়ায় গণ্ডগোল। বরদাকান্তের এতক্ষণে খেয়াল হল বিসর্জনের সেই বাজনা যেন আর শোনা যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলেন, গণ্ডগোল কিসের। ইতিমধ্যে বড়ো ছেলেও এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। তিনিই বললেন, প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে গণ্ডগোল বাবা। এর মধ্যে কি আমাদের যাত্রায় বের হওয়া ঠিক হবে।

বরদাকান্ত মুহূর্তে আনমনা হলেন। খবর রটল সেবার বিজয়া দশমীর দিন দাঙ্গা বাধবে দক্ষিণ পাড়ার মোল্লাবাড়ির সঙ্গে। মোল্লাবাড়িতে মসজিদ আছে। সেই বাড়ির সামনে দিয়ে বিসর্জনের নৌকা যেতে দেবে না ঢাক বাজিয়ে।

মসজিদে যদি ঢাকের শব্দ যায় তা হলে গুনাহ। বরদাকান্ত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চিরদিন এইভাবে যাচ্ছে। আজ দেশ স্বাধীন। তবে কেন এই বাধা। বরদাকান্ত গোপন কুঠুরি থেকে বন্দুক বার করে আনলেন। স্ত্রীকে বললেন—যাত্রার আয়োজন করো। বাধা যে আসবে এই রকম একটা খবর এসেছিল। কারণ দেশ স্বাধীন হলেও বরদাকান্তর দেশ এখন বিদেশ। এখন তাঁর মাতৃভূমির প্রতি কোনও অধিকার নেই। কিন্তু পারিবারিক প্রাচীন আভিজাত্যবোধ অন্ধ। বারমহলে বেরিয়ে হুকুম করলেন, তৈরি হও।

একে একে বাড়ির পুরুষেরা যুদ্ধের বেশে সাজলেন। ঘরের গৃহকর্ত্রী বরণডালা সাজিয়ে সামনে রাখলেন। বরদাকান্ত এক একজনকে ডেকে মঙ্গলাচরণ করলেন। তারপর খাগের কলম হাতে নিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে পুরোনো সোনার মোহর হাত দিয়ে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ির মেয়েরা উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করল। বরদাকান্ত নৌকা ছাড়লেন। ঢাক বেজে উঠল গম গম করে। বাড়ির মেয়েরা ছাদে উঠলেন। নৌকার মাঝি গলুইতে জল দিতে দিতে বদর বদর বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। সামনের নৌকায় বরদাকান্ত। লোকজন নিয়ে পিছনে প্রতিমার নৌকা।

পিতার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলেন অমলাকান্ত। বরদাকান্ত সেটা লক্ষ করে সংবিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, যাত্রা তো বন্ধ রাখা যায় না বাবা। এই যাত্রা নিয়ে অনেক অঘটন ঘটেছে, তবু

বন্ধ হয়নি। পুত্র, পুত্রবধূ চলে যাচ্ছিলেন। বরদাকান্ত বললেন, আমি আর বেশিদিন এই পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করব না। যতদিন আছি, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হোক এটা আমি চাই না। তোমরা জানো না বুক আমার ভেঙে গেছে। তবু বংশের গৌরব রক্ষা আমাকে করতেই হবে। বরদাকান্ত আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে বসলেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন বরদাকান্ত।

আগে এই কলোনিটা জংলা গাছে ভর্তি ছিল। দেশ ভাগ হওয়ার পর ক্রমে ক্রমেই ঘরবাড়ি তৈরি হল। রাস্তা তৈরি হল। এখন তো জমজমাট। কত জেলার লোক যে এখানে আছে কে কার খবর রাখে। প্রত্যেক বাড়ির প্লট ভাগ করা। একটু হেঁটে গেলেই বাজার। কারও কারও বাড়িতে এখনও ইলেকট্রিক আলো আসেনি। এর মধ্যে অনেকেই দালান তুলে ফেলেছে। হই-হট্টগোল লেগেই রয়েছে। কারও সঙ্গে বনিবনা নেই। কেমন যেন একটা পর পর ভাব।

বরদাকান্ত কারও সঙ্গেই কথা বলেন না। জানলার পাশে বসে দেশের কথা ভাবেন। বিশাল বাড়ি ফেলে এই বাক্সের খোপে বন্দী। কমললতা শ্বশুরকে জানলার পাশে দেখে কিছুই বলতে পারেন না। কী বলবেন? নিজে কি এত কাজ করেছেন আগে? এখানে এসে নিজেকেই সব কিছু করতে হয়। রান্না থেকে আরম্ভ করে বাড়ির যাবতীয় কাজ। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু মেনে নিয়েছেন কমললতা। আস্তে আস্তে কমললতা আবার বললেন, আপনি তৈরি হয়ে নিন বাবা। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, তৈরি হতে হবে। যাত্রার জন্যে বিশেষ সাজে সাজতে হবে বরদাকান্তকে। এই ধারায় তাঁর পূর্বপুরুষের স্মৃতি মিশে আছে।

বিসর্জনের বাজনা বাজে বুকের মধ্যে। বরদাকান্ত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। কেন যেন আজ পা দুখানা কাঁপছে। বউমাকে কি তাঁর হাতখানা ধরে সাহায্য করতে বলবেন?

বরদাকান্ত বললেন—হ্যাঁ মা, আমি এবার তৈরি হয়ে নিই। তুমি খোকাকে ডাকো। কমললতা চলে গেলেন।

বরদাকান্ত দুঃখকে ভয় করতে শেখেননি। তিনি চিরকাল নিজের প্রতাপ নিয়েই বেঁচেছেন। আজ যেন সে প্রতাপ ভেঙে খান খান। এই দুখানা অক্ষম হাতে আজ শুধু ব্যর্থতার চিহ্ন। শুধু পরাজয়ের গ্লানি। কিন্তু পরাজয়কে মেনে নেওয়া বরদাকান্তের চরিত্রে লেখা ছিল না। না, তিনি ভাঙবেন না।

আয়োজন সম্পূর্ণ করে বারবার ছেলেদের তাগাদা করে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে বড়োবউ কমললতা বরদাকান্তকে ফের খবর দিলেন। বললেন, ছেলেরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর অপেক্ষা করছেন। বড়োবউমার ডাক শুনে ফিরে এলেন অন্য জগৎ থেকে। চোখ ছলছল। বড়োবউমা তা লক্ষ না করেই ব্যস্ততায় চলে গেলেন। বরদাকান্ত প্রতিবারই ভাবেন এইবারই বোধ হয় তাঁর শেষ যাত্রা।

কিন্তু বছর ঘুরে এই দিনটি এলে নিজেকে তিনি বড়ো গর্বিত বোধ করেন। পরিবারের প্রধান পুরুষ হিসেবে তাঁর গৌরব আর একবার স্বীকৃত হয়ে যায়। বরদাকান্ত ধীরে ধীরে উঠে কমললতার রাখা পাট পাট ইস্ত্রি করা নতুন ধুতি-পাঞ্জাবিখানা পরে নেন। পরে ছড়ি হাতে নিয়ে নাতিদের ডাকতে ডাকতে মাঝের ঘরে এসে দাঁড়ান। ছেলে-বউ-মেয়েরা, নাতি-নাতনিরা সবাই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। বরদাকান্ত তাঁর নিজের আসনটি গ্রহণ করলেন। পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রেরা তাঁদের আসনে বসে পড়ল।

বরদাকান্ত এক এক করে পুত্রদের নামে মঙ্গলাচরণ করলেন। পরে পিছনে নাতি-দৌহিত্রদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন থেমে পড়লেন। মুহূর্তে বিশাল ঘরখানার আবহাওয়া কেমন ভারী হয়ে উঠল। কোথায় যেন একটা শূন্যতা। কী যেন নেই। পাগলা হাওয়ায় খস খস করে একটা আম্রপল্লবের পাতা পড়ে গেল মঙ্গলকলসির মাথা থেকে। বৃদ্ধ একটা বুক-চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, দিব্য নেই। কথাটা সকলের বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলল। সকলে যেন আরও নীরব হয়ে গেল। চাপা দীর্ঘশ্বাসে ঘরখানা যেন গুমোট হয়ে উঠল। কমললতা মুখ তুলে স্বামী অমলাকান্তের দিকে তাকালেন। অমলাকান্ত সুরমাকান্তর দিকে।

কোথায় যেন কী একটা এলোমেলো হয়ে গেছে। দিব্য, দিব্যকান্ত বরদাকান্তর প্রথম নাতি। অমলাকান্তের বড়ো ছেলে। বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে চেহারা। আঠারো বছরের তরুণ দিব্যকান্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম সারির ছাত্রদের একজন। আচার আচরণে সর্বজনপ্রিয়। দিব্যকান্তর চেহারায় বরদাকান্ত তাঁর প্রবল প্রভাবান্বিত পিতামহের আদল খুঁজে পান। বরদাকান্তের একান্ত বিশ্বাস ছিল, দিব্যকান্ত থেকেই আবার তাঁদের পরিবারের

সুনাম প্রতিপত্তি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হবে। কিন্তু ঈশ্বর বিমুখ। এই অল্প বয়সেই ছেলেটা অন্য রকম হয়ে গেল। বরদাকান্ত শুনেছেন কী এক রাজনৈতিক দলের কর্মী বলে পুলিশের ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে তাঁর নামে। মাস তিনেক ধরে সে অ্যাবস্কন্ডিং।

নাতিদের দিকে তাকিয়ে বরদাকান্ত একটু সময় না থেমে পারলেন না। দিব্যকান্ত তাঁর আদরের প্রিয় সম্পদ ছিল। বরদাকান্ত আবার মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করলেন।

বাইরে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। বড় করুণ, অশ্রুসিক্ত।

মুহূর্তে একটা তীব্র হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে দরজায় সজোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ এল। পরক্ষণে ভারী বুটের লাথি। অমলাকান্ত সুরমাকান্ত কমললতা সবাই টানটান হয়ে উঠলেন। বরদাকান্ত ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! সুরমাকান্ত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। ঝটিতি কনস্টেবলসহ দুজন পুলিশ অফিসার এসে দাঁড়ান ঘরের সামনে। নাতিদের ঘাড় ডিঙিয়ে মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে একেবারে মঙ্গলকলসের পাশে উদ্যত রিভলভার এক পুলিশ অফিসার বরদাকান্তর মুখোমুখি।

বললেন, মাফ করবেন। আমরা দিব্যকান্ত ওরফে রতন ওরফে রাজা ওরফে ফর্মাভোলাকে চাই। ব্যাপারটা বুঝে নিতে কিছু সময় লাগল বরদাকান্তের। বললেন—দিব্যকান্ত আমার নাতি। আর ওইসব নামে কেউ এখানে থাকে না। শুনেছি তার নামে নাকি পুলিশের ওয়ারেন্ট আছে।

পাশের ঘরে দুমদাম কী স্বব টেনে নামাবার শব্দ আসছে। বাথরুমে কলঘরে সর্বত্র আলো জ্বেলে যেন একটা হুটোপুটি লেগে গেছে। পুলিশ অফিসারটি বলল, আমাদের কাছে খবর আছে দিব্যকান্ত এই বাড়িতে এসেছে। বরদাকান্ত বিরক্ত হলেন। বললেন—আমি তার পিতামহ। এই বাড়ির গৃহকর্তা। আমি বলছি এখানে নেই। পুলিশ অফিসারটি বিনীতভাবে বলল—আমরা সমস্ত বাড়িটা একবার সার্চ করতে চাই। বিরক্ত ক্ষুণ্ণ ববদাকান্ত এবার ছেলেদের ডাকলেন—অমল—সুরমা। বস্তুত বাড়িখানা পুলিশেরা তছনছ করে ফেছে। ছেলেদের একধারে টেনে সরিয়ে দিয়েছে। মেয়েদের শব্দ করতে নিষেধ করে বারান্দায় জড়ো করেছে। খাট-বিছানা বাক্সপত্র সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। ছোটো বাচ্চারা একসঙ্গে কান্না শুরু করে দিয়েছে। মেয়েরা ভয়ে আতঙ্কে মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কমললতা এর ব্যতিক্রম।

অসমাপ্ত যাত্রা রেখে উঠে পড়লেন বরদাকান্ত।

ধীব পায়ে বাইরে বেবিয়ে এলেন তিনি। সমস্ত বাড়িটা পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। তিনখানা পুলিশের বড়ো ভ্যান কিছু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবেশীদেব দরজা জানলা একেবারে পাট পাট স্তব্ধ। কিছু উলঙ্গ ভিখিরি ছেলে মুখে হাত দিয়ে হাঁ করে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। বরদাকান্ত বাইরে আসতেই দুজন কনস্টেবল সচকিত হয়ে উঠল। আগের পুলিশ অফিসারটি দৌড়ে বাইরে এল। কর্কশ গলায় বলল—বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। গেলে বিপদ হবে। বরদাকান্ত আবার মাঝের ঘরে ফিরে মঙ্গলকলসের মুখোমুখি স্থির হয়ে বসলেন।

—বাবা।

কমললতার হঠাৎ আর্ত চিৎকারে সংবিৎ ফিরে প্যন বৃদ্ধ বরদাকান্ত। সমস্ত বাড়িটা জুড়ে একটা কান্নার মহারোল। সামনে তাকিয়ে দেখেন দুজন কনস্টেবল দিব্যকান্তকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

পিছনে উদ্যত রিভলভার সেই পুলিশ অফিসারটি। দিব্যর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলেন বরদাকান্ত। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের মধ্যেও তার টকটকে ফরসা মুখখানা ঝকঝক করছে।

অবিন্যস্ত চুল। টানা-হেঁচড়ায় পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে একদিকে নেমে গিয়েছে। দিব্যকান্ত ডাকল—দাদু। বরদাকান্ত একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দিব্যকান্তের মুখের দিকে।

উদ্ধত রাজকীয় ভঙ্গিতে দীপ্ত দিব্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বড়ো তৃপ্ত বোধ করেন বৃদ্ধ। দিব্যর মাথায় হাত রেখে ধীরে ধীরে যাত্রার মঙ্গলাচরণ শুরু করেন .বরদাকান্ত।

দিব্যকে টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাড়ির ভিতরে কান্নার রোল আরও বাড়ছে। দিব্যকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে যাত্রার মঙ্গলাচরণ করতে থাকেন বরদাকান্ত। □

অন্যমুখ

শংকর সেনগুপ্ত

রেখা বাড়ি থেকে পরে আসা শাড়িটা ছেড়ে ইউনিফর্মটা পরে নিল। ওদের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট একটু অন্য ধরনের। একটা সেন্ট্রাল মনিটরিং টেবিল আছে। যেখানে পাঁচ থেকে ছজন সিস্টার থাকে। আর সেটা ঘিরে রোগীদের কেবিন। প্রতিটি কেবিনে আবার একজন করে সিস্টার প্রত্যেক রোগীদের জন্য। সেখানেও আবার একটা করে মনিটরিং টিভি সেট বসানো আছে। রেখার দায়িত্ব এমনই একটা কেবিনের। রেখা রোগীর কাগজপত্র সব বুঝে নেয়। এই হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যাই বলা হোক না কেন, এখানে সকলেই ভি আই পি। রোগীরা শহরের ও সমাজের অভিজাত ও পয়সাওয়ালা ঘরের মানুষজন। এখানে কাজকর্মের ঢঙ বা সিস্টেম একেবারেই আলাদা; কোনওরকম ফাঁকি বা অবহেলা সহ্য করা হয় না।

রেখা অবিশ্যি এই কাজ করছে পঁচিশ বছরের উপর। একটি শিশুপুত্র কোলে নিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে সাদা থানে আবৃত হয়ে যখন বিশ্বসংসারের দিকে তাকিয়েছিল তখন ওর কতই বা বয়স। মূলধন বলতে কিছুই ছিল না। তাড়াতাড়ি ট্রেনিংটা নিয়ে এক আত্মীয়ের তদ্‌বিরে এই লাইনে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু কাজটা নিয়েছিল প্রবল নিষ্ঠায়। একদিকে বেঁচে থাকার তীব্র তাগাদা এবং ছেলেকে মানুষ করার চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে নিজের প্রোফেশানে দক্ষ হয়ে ওঠা, রেখার পক্ষে ব্যাপারটা খুব সহজেই ঘটে যায়নি। কিন্তু তবু রেখা ঘটনার রাশ ধরতে পেরেছিল। কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে সয় না। আর বিশেষ করে এই প্রোফেশানে সে প্রশ্ন ওঠেই না। নার্সিং ওর কাছে একটা চাকরিমাত্র নয়—এটা যেন ওর জীবনের ধর্মও।

আজ যে রোগীটি এসেছে তার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। হৃদ্‌যন্ত্র প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত। ইউরিনেও প্রবলেম আছে। ইউরিয়া হাই। অন্যান্য আর সমস্যা আছে। ওষুধ, ইনজেকশান ও অন্যান্য কী কী করণীয় আছে রেখা সেগুলো দেখে নেয়। রক্তের চাপের অবস্থাও ভালো নয়। পালস্-বিট ফ্লাকচুয়েটিং। বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছুই বলা যাবে না। রেখা রোগীর মুখের দিকে তাকায়! শরীরের ভিতরে এক তুমুল রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের হদিসটা বুঝে নেয়। ড্রিপের দিকে নজর দেয়। ড্রিপটা ঠিকমতো চলছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়। মনিটরিং সেটটির দিকে তাকিয়ে রেখার মনটা খারাপ হয়ে যায়। রেখাগুলি ভীষণ ভঙ্গুর, যেতে যেতে ছন্দহীন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। এই মনিটরিং সেটের ওপর দৃষ্টি দিলে রেখা যেন কী এক অদ্ভুত উদাসীনতায় আক্রান্ত হয়। এই প্রোফেশানে আসার পর জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে আগের মতো চঞ্চল হয় না। কিন্তু যখনই যুদ্ধরত মানুষের হৃৎস্পন্দনের মুখোমুখি হয় রেখা, একই সঙ্গে উদাসীন ও বিচলিত বোধ করে। হায় মানুষ! কী এক সূক্ষ্ম রেখায় তুমি ঝুলছ! মাটির প্রদীপ যেন-বা, এক টালমাটাল ঝড়ের সম্মুখীন—কখনও বা নিভে আসছে, কখনও-বা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তারই মধ্যে খেলা করে তার স্বপ্ন, সংসার আশা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, দ্বেষ, প্রেম, হিংসা ও প্রতিশোধ। রেখা চেয়ারে বসে রোগীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুমের ছোঁয়া পায়। সেটা ঠেকাতে উঠে গিয়ে ক্যাথিটারটা ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নেয়।

রেখা ঘুমিয়েছিল। অপালা ঘরে ঢোকে। কাপড়ের ব্যাগটা চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে। ঘুমন্ত রেখার দিকে তাকায়। মৃদুস্বরে ডাকে, মাসিমা, বেলা তো অনেক হল, উঠবে না?

বারদুয়েক ডাকায় রেখা চোখ মেলে তাকায়। তারপর মাথাটি অপালার দিকে কাত করে বলল, 'তোর স্কুল হয়ে গেল!'

—হবে না! বেলা কত হল তোমার খেয়াল আছে? মণির মা কি রান্না করে গেছে?

রেখা আবার উপুড় হয়ে শোয় : মণির মা রান্না করে গেছে, তুই আজ এখানে খাবি তো?

—বারে! আমি তো তোমায় বলেই গেস্‌লাম। আমার জন্য চাল নাওনি?

রেখা বলল, নিয়েছি।

কথাটা বলে রেখা অপালার মুখের দিকে তাকায়। সারা মুখ ঘর্মাক্ত। চূর্ণ কুন্তল গালে লেপটে রয়েছে, একটা সাধারণ শাড়ি শরীরটা ঘিরে রেখেছে, সংবৃত করে বাঁধা চুল। ডিমেলো মুখে বড়ো বড়ো আয়ত চক্ষুজোড়া যেন বড়ো বেশি জীবন্ত। তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা ঠোঁট, আর কিছুটা প্রশস্ত ললাটের দীর্ঘাঙ্গী অপালাকে সুন্দরীই বলা চলে। কিন্তু মুখমণ্ডলে ফুটে রয়েছে উদাসীন বিষণ্ণতা।

অপালার এই রূপ রেখার মোটেই ভালো লাগে না। কেন জানি ওর নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। অপালাকে অনেক বুঝিয়েছে। এভাবে নয়—একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হ্‌। জীবন তো এক বহমান স্রোত। কোনও এক পুরনো ঘটনার স্মৃতি আঁকড়ে জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া নিছক মূর্খামি। রেখা শুয়ে শুয়ে অপালাকে দেখছিল আর ভাবছিল ওর সঙ্গে অপালার যোগাযোগ রয়ে যাওয়াতেই কিনা মেয়েটা এভাবে নিজেকে আটকে রেখেছে।

অপালা হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পাশের খাটটাতে এসে বসল। রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, আজ কি তোমার শরীর ভালো নেই?

অপালা রেখাকে মাসিমা বলেই ডাকে, কিন্তু মাঝে মাঝেই আপন খেয়ালে আবার মা বলেও ডাকে। অপালা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি করছে, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। রেখা জানে অপালা বিদূষী। কিন্তু সে বোঝে না মেয়েটা কেন এই রকম করে। ওর চালাকিটা বোঝে। কী লাভ? আমিও কষ্ট পাই তুইও কষ্ট পাস। মা বলে ডেকে আমার পুরনো মুহূর্ত কি ফিরিয়ে দিতে পারবি, না পারবি নিজের পুরনো মুহূর্ত ফিরিয়ে আনতে? রেখা ভাবে—তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ, এ কথা অপালাকে সে বলেছে। অপালা উদাসীন চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে—কোনও কথা বা তর্ক কিছুই করেনি।

রেখা অপালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয়, না, আমি ঠিকই আছি। আসলে আজ একটু ঘুম পাচ্ছিল।

অপালা বালিশে ঠেস দিয়ে রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার তো এ মাস পুরোটাই নাইট ডিউটি?'

রেখা আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসল। —হ্যাঁ, এই তো সবে আরম্ভ হল। তবে আমার আর দিনরাত্রি!

কথা বলতে বলতে রেখা চুল খুলে দিল। চিরুনিটা খাট-সংলগ্ন টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আঁচড়াতে লাগল। পাকা চুলে মাথা ভরে গিয়েছে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎই রোগীটির কথা মনে পড়ে গেল। বাহাত্তর ঘণ্টা পার না হলে কিছুই বলা যাবে না। চব্বিশ ঘণ্টার অর্ধেকটাই যাদের রোগী ঘাঁটতে চলে যায় বাড়ি ফিরে তাদের আর সে সব মনে রাখতে নেই।

কিন্তু রেখা পারে না। কিছু কিছু রোগী আছে যারা বাড়িতেও হানা দেয়। কালকের রোগীর কথাটা মনে আসতেই রেখা বলে ওঠে, 'জানিস অপু, কাল না একজন নতুন রোগী এসেছে। রাতটা মোটেও ভালো যায়নি।'

—তো তোমার কী করার আছে? তুমি তো তোমার কর্তব্য করে এসেছ।

—আমি আমার কর্তব্য সেরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু সেটাই সব নয়!

অপালা রেখার মুখের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে। নিচু স্বরে বলল, 'কথাটা কী? কোন ভি আই পি পেশেন্ট?'

—আমাদের এখানে তো সবাই ভি আই পি।

—নিশ্চয় কোনও তফাত আছে। কি কোনও ফিল্মাস্টার, না মন্ত্রী-টন্ত্রী?

—না। মনে হয় বড়োগোছের একজন পুলিশ অফিসার। নার্সিংহোমে বিশেষ যত্ন দেওয়ার উপদেশও আছে।

অপালা রেখার কথা শুনে আরও নিচুস্বরে 'ওহ' বলল।

কিন্তু রেখার পুলিশ অফিসার বলার মধ্যে যে ভাবটা কাজ করছিল সেটা অপালার কানে বাজল। সেটা তো খানিকটা স্বাভাবিক। অপালা নিজেকেও বোঝার চেষ্টা করল। 'বড়োগোছের পুলিশ অফিসার' কথাটি ওকেও ছুঁয়ে যায়নি। যাক্‌গে। কিন্তু মাসিমার মনের ভাবটা ইঙ্গিতে ধরে নিল। এ দিকে আবার লোকটির জন্যও চিন্তিত। রাতটা মোটেও ভালো যায়নি। ওর রাতটা ভালো যায়নি তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যাথা কিসের! রোগীদের জন্য এতখানি মরমী মন বিভিন্ন কারণে কমে এসেছে। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে বেশি সচেতন বলে অপালার তাই মনে হয়।

—বড়ো মাপের বলছ, পুলিশ কমিশনার নাকি?

—না। তা নয়। তবে ওই কাছাকাছিই হবে বোধ হয়।

—কী নাম বাবুর? কথাটা জিগ্যেস করেই অপালা বালিশটা ঠিক করে রেখাধ উলটোদিকে মুখ করে শরীরটা এলিয়ে দিল।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই রেখা হাত বাড়িয়ে জবাকুসুমের শিশিটা টেনে নিয়েছিল। অল্প কিছু তেল হাতের তালুতে নিয়ে মাথার মাঝখানে চেপে ধরল। তারপর আঙুলের ডগায় তেল মাখিয়ে চুলের গোড়ায় চালান করতে লাগল।

—কী মল্লিক যেন! মুহূর্তের জন্য ভেবে বলে মনে পড়েছে—গোপেন মল্লিক।

অপালা কাত হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়েছিল। সে এখন রেখার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। গোপেন মল্লিক নামটা অপালার কানে প্রবেশ করল। কথাটা মস্তিষ্কে পৌঁছে গেল। অপালার ভিতরে এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল। দু হাত দূরে বসে রেখা বিন্দুমাত্র টের পেল না। গোপেন মল্লিক? কোন গোপেন মল্লিক? অপালার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ও যেন রেখার দিকে কাত হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলল। এ কী নাম শোনাল মাসিমা। কতদিন হয়েছে! কত প্রহর পার হয়ে গেছে। কত শীত-বসন্ত পালাবদল করেছে। দীর্ঘ পনের বছর। কিন্তু অপালার কাছে কালকের ঘটনার মতো টাটকা হয়ে রয়েছে। আর ও নাম তো অপালা ভুলতে পারবে না। ও নাম সকলের মনে থাকার কথাও নয়। এমনকি কে গোপেন, কেন গোপেনের নাম মনে থাকবে সেটা তো মাসিমার কাছেও অজানা। ছবির মিছিল, ঘটনার মিছিল, কথার মিছিল, শপথের মিছিল সব মিলিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অপালার ভিতরে এক শ্বাসরোধকারী তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেই গোপেনই হবে। অপালা মনে মনে হিসেব করে ফেলল—তখন যদি গোপেনের চল্লিশের মতো বয়স হয়ে থাকে, এখন তা হলে নিশ্চয় পঞ্চান্নর কোঠায়। ওর মতো কৃতী অফিসার এতদিনে তো পুলিশ কমিশনারের কাছাকাছি থাকারই কথা। কৃতী অফিসার! অপালা দাঁতে দাঁত ঘষে শব্দহীন উচ্চারণ করল, কৃতী অফিসার! নিশ্চয়ই ওই শয়তানটাই হবে। অপালার স্মরণে আসে মাঝে আরও দুই-একটা কেসে গোপেনের নাম লিডিং নিউজ হয়ে কাগজে এসেছে। ও ছাড়া ওটা অন্য কেউ হতে পারে না। ঘুমন্ত ঘটনা যেন অকস্মাৎ ধুম-উদ্‌গিরণ করতে শুরু করেছে, জ্বলন্ত আগুনের স্পর্শে অপালা তীব্রশক্তিতে চেপে ধরে। গোপেনের নামটা সকলে জানে না। তীর্থঙ্করদের সে দিনের সেই দলটার মধ্যে যে তিনজন বেঁচে এসেছিল তাদের মুখেই অপালা শুনেছে। সেই ঘটনা, সেই দৃশ্য, সেই নায়ক, কোনওটাই রেখাকে সে কোনওদিন বলেনি। পনেরো বছর গড়িয়ে গেছে। হাহা করা সময়। কিন্তু তবু সেই সময় রেখা বা অপালা কাউকেই গিলে খেতে পারছে না। বিশেষ করে অপালা। নিজস্ব কায়দায় তীর্থঙ্করের শপথ বয়ে নিয়ে চলেছে। তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। এ আগুনের কথা কাউকে বলা যায় না। সমর মিত্রের কাছ থেকে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অপালা শুনেছিল।

তখন কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছিল নদীর ওপর, হাওড়া ব্রিজের ওপর, সারা ফোর্ট উইলিয়ামের বাহির চত্বরে।

ময়দানে ঘাসের আগায় শিশির টলটল করছিল। উষা তখন সদ্য ফুটছে। কাক ডাকছে, নদীর পাড়ে বাঁধা ডিঙি-নৌকা জোয়ারের দাপটে দুলছে।

তোমরা মুক্ত। তোমরা সব সোনার ছেলেরা মুক্ত। তোমরা দেশের গৌরব। গরিবেরা, শোষিত মানুষেরা তোমাদের জন্য কাঁদছে। তোমরা চলে যাও ওদের মধ্যে। যাও সোনার ছেলেরা। বিপ্লব সম্পন্ন করো। সরকার উৎখাত কর। তোমরা মুক্ত। রাস্তা পার হয়ে যে যার মতো চতুর্দিকে দৌড়ে পালাও।

তীর্থঙ্কর সেই কুয়াশাময় জগৎটা দেখছিল। ভাবছিল এই শেষ দেখা। জোয়ারের জল পাড়ে আছড়ে পড়ছিল। ডিঙি-নৌকা ও কয়েকটা লঞ্চ ভীষণভাবে দুলছিল। সাভারকারের গল্পটা একবার বিদ্যুতের মতো খেলে যায়। ও হিসেব নেয়—যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে নদীর পাড় অবধি ওবা পৌঁছতে দেবে কি না। আর ঠিক তাই হল। ওদের মধ্যে থেকে কাজল ও হারু নদীর পাড়ের দিকে দৌড় মারল। কাজল ও হারুর বাড়ি ছিল শিবপুরে, হাওড়ার ছেলে। ভেবেছিল নদীটা পার হয়ে যেতে পারলেই শিবপুর। ঝলকে ঝলকে আগুন ঝলসে উঠেছিল। 'কুত্তার বাচ্চারা, সরকার উৎখাত করবি?' তীর্থ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পাবেনি। দৌড়ে ভূলুণ্ঠিত হারু ও কাজলের কাছে গিয়েছিল। বিস্ফারিত চোখে অবাক বিস্ময়ে কাজলের ঠোঁট নড়ছিল। কাজলকে কোলে নিয়ে তীর্থ কুয়াশাসিক্ত রাজপথে বসে পড়েছিল। ও ঘাড় ঘুরিয়েছিল সেই পিশাচের দলের দিকে। ঘৃণা ও অসহায়তার এক মহান ছবি ফুটেছিল তীর্থর মুখে। সমর বলেছিল তারপরেই তিনটি আগুনের গোলা ছুটে গিয়েছিল। তীর্থর ললাট, বুক-পেট লক্ষ করে। তুষের আগুনের মতো পুষে রেখেছিল। তখন যেন আচমকা এক শব্দে ও ঝড়ে সেই আগুন লেলিহান শিখায় দাউ দাউ জ্বলে উঠল। অপালা আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে রেখার মুখের দিকে তাকাল—মনে হল পনেরো বছর পর যেন ফিরে তাকাল।

—কী অপু, কী হল তোর? তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?

—ন্‌না, আমি ঠিক আছি—তুমি স্নানটা সেরে নাও।

—স্নান আমি সারব কিন্তু গোপেন মল্লিকের নামটা শুনে তুই অমন চুপ করে গেলি কেন? তোব চোখ-মুখেব চেহারাটাও যেন কেমন পালটে গেল!

অপালা লজ্জা পায়। বোঝে লেলিহান শিখা চোখেমুখে প্রকাশ পেয়ে গেছে—না, না, ও কিছু নয। তুমি স্নানটা সেরে নাও।

—স্নান আমি সারছি। কিন্তু গোপেন মল্লিকের নামটা শুনে অমন চুপ মেরে গেলি কেন? তুই কি ওকে চিনিস? ও কি তোদের পরিচিত?

অপালা দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে। এই নারীর কাছে আর এ সব কথা চেপে রাখাব কোনও মানে হয় না। এটা একটা সুযোগ। এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলে না। এই নাবীকে সব বলতে হবে।

—মাসিমা, গোপেন মল্লিককে শুধু আমি না, অনেকেই চেনে। পনেরো বছব পার হয়ে গেলেও, জগৎ-সংসার অন্যখাতে বয়ে চললেও আমবা ওকে কী করে ভুলি?

—তোরা সত্যি ওকে চিনিস?

—হ্যাঁ চিনি, গোপেনই তীর্থর হত্যাকারী। গোপেন মল্লিকের রিভলভাবের গুলিতেই ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তীর্থর দেহ।

রেখা স্থাণুবৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। রেখাব হাত লেগে জবাকুসুম তেলের শিশিটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে খানখান হয়ে যায়। পনেরো বছর ধরে একটা শোক ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তিলতিল করে সয়ে নিচ্ছিল। ভেবেছিল সময়ই সব গহ্বর পূর্ণ করে দেবে। চলমান জগৎ তাই বলছিল। শোক ধরে রেখে রেখা কী করবে? 'তোমাকে তো চলতে হবে। তোমার অন্নের চিন্তা যে তোমারই'—কতবার মনে হয়েছে নিজেকে শেষ করে দিই। কিন্তু ওভাবে তো তীর্থের মায়ের মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। যেদিন তীর্থ বাড়ি থেকে চলে গেল সে দিনই বুঝেছিল নিজের হাতে গড়া স্বপ্নটায় ফাটল ধরে গেল। কয়েক বছরের মধ্যেই তীর্থর মৃতদেহটা ওর হাতে এসে পৌঁছেছিল।

তীর্থর দেহটা নিয়ে ভেবেছিল কত লোকের সেবাই না তাকে করতে হয়—কত অসুস্থ, কত আর্তের। কিন্তু তার মায়ের হাত থেকে একফোঁটা ওষুধও পেল না। অকাল বৈধব্যের পর থেকে এই নার্সিংয়ের চাকরি। এই দিয়েই ওর স্বপ্নকে গড়ে তুলেছিল—প্রহরে প্রহরে। কিন্তু ওর গড়ে তোলা স্বপ্ন তার নিজেরই স্বপ্নের তাড়নায় রেখার স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে গেল। তারপর এই দীর্ঘ সময় জুড়ে সেবা—অসুস্থের সেবা। রেখা ভেবেছিল এই শোক সহ্য করা সম্ভব হবে না। কিন্তু আশ্চর্য জীবন! ও ভেবেছিল ওর পক্ষে আর চাকরি করা সম্ভব হবে না। কিন্তু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ও নিজেই নিজেকে দেখল। ও আবার উঠল, চলল, ফিরল ও ধীরে ধীরে আবারও চাকরিতে বের হল। দেহ মনে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে ও ভেবেছিল আর বোধ হয় উঠে চলে খেতে পারবে না। কিন্তু জীবন ও সময় যেন সব শোককে তিলতিল করে গ্রাস করছিল।

আস্তে আস্তে শোক বুঝিবা ধূসর হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই শোক বুঝি কখনও শেষ হয় না। সময় কি এই শোকের ফণাকে মাটিতে নামিয়ে রাখে? অপু এটা কী শোনাল! রেখা ভিতরে ভিতরে এক ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের গতিপথ আবিষ্কার কবতে থাকে। ঘটনার কী বিচিত্র বিন্যাস! তীর্থর হত্যাকারী গোপেন ইনটেনসিভ কেয়ারে ওরই কাছে, ওরই যত্নে জীবনে ফিরে আসতে চাইছে।

অপু, তুই কী করে জানিস গোপেনই তীর্থর হত্যাকারী বা এই গোপেনই সেই গোপেন?

গোপেনই তীর্থর হত্যাকারী—কথাটা শোনামাত্র রেখার চঞ্চলতা, ভিতরের ঝড়ের ঝাপ্টা অপু স্থির চোখে দেখছিল। দেখতে দেখতে সে ভেবে নিচ্ছিল পুরনো কনট্যাক্টগুলোর যেগুলো এখনও লিভিং, যেখান থেকে কাল-পরশুর মধ্যে সে গোপেনের ব্যাপারটা একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে নিতে পারবে। পুরনো বন্ধুরা, যারা এখনও বিপরীতমুখী স্রোতের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাদেব সঙ্গে অপুর যোগাযোগ এখনও জীবন্ত। ও নির্দিষ্ট করে তীর্থর হত্যাকারী খুঁজছিল না। যে সিস্টেম পালটাবার জন্য তীর্থ ও তার বন্ধুরা প্রাণ দিল, ও সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে এবং ওটাকে পালটে দেওয়ার শপথে ও আজ অবিচল, অবশ্যই নিজের সীমাবদ্ধতাব মধ্যে। কিন্তু আজ যখন একটা সুযোগ এসে গেছে—তখন এতবড়ো ঘাতক অত্যাচারীকে কোনওভাবেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওই নারীকে উদ্দীপিত করতে হবে। অপালা মেঝের দিকে তাকিযে দেখে ঘব জুড়ে কাচেব টুকরো। ও খানিকটা উঁচুস্বরে রেখাকে বলে, 'মাটিতে নামবে না। ঘুর জুড়ে কাচের টুকরো। পা কাটতে পারে, রক্ত পড়বে।'

রেখা ঘরের মেঝের দিকে তাকায়। অপালার কথা শুনে ওর দিকে চোখ রাখে—অপু, তোব পা কেটে রক্ত ঝরবে না?

আমার তো রক্ত ঝবছেই! নতুন করে আর কীই বা ঝরবে?

অপুর কথায় রেখা চমকে যায়। কী বলতে চায় মেয়েটি? কীভাবে ও নিজেকে? ও কি রেখাকে দুঃখ দিতে চায়? এখনও রেখার জন্য দুঃখ জমা আছে! এই মুহূর্তে গোপেনের সংবাদে তার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। আর এক্ষুনিই মেয়েটা বলছে তার তো রক্ত ঝরছেই। রেখা নিজেকে দমন করতে পারে না—এক উদ্গত কান্না ও ক্রোধ একাকার হয়ে যেতে চায়। তীব্রস্বরে বলে ওঠে 'অপু, ভুলে যাস না তীর্থ আমার একমাত্র সন্তান ছিল। তুই কি বলতে চাস আমার রক্ত ঝরছে না?'

—মাসিমা, তুমিও ভুলে যেও না তীর্থ আমার স্বামী।

কথাটা বলেই অপালা রেখার দিকে তাকায়। ও স্পষ্ট বুঝতে পারে কথাটা যথাস্থানে বিদ্ধ হয়েছে। ও জানে এই নারী ধিকিধিকি শোকের আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তাই তো ওকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। ওর তো কেউ নেই। একা, একদম একা। কিন্তু আজ যখন একটা সুযোগ ঘটনাক্রমে এসে গেছে....ভাবনাটা দ্রুত লাগামছাড়া ঝোড়ো মেঘের মতো ওর মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হিয়ার ইজ আ চান্স টু রিটালিয়েট—অ্যাট লিস্ট ফর ওয়ান্স! কথাটা নিজের মনেই আবৃত্তি করে নেয়। এই নারীই পারে—সুযোগটা ওঁর কাছেই এসেছে। গোপেন একটা মানুষখেকো বাঘ। গোপেন শুধু কাজল, তীর্থ, হারুরই হত্যাকারী নয়। সেই গোপেন এখন ইনটেনসিভ কেয়ারে মাসিমার তত্ত্বাবধানে। মাসিকে উদ্দীপিত করতে হবে। ধিকিধিকি আগুনটাকে উস্কে দেওয়া। মাসিকে তাই এমন একটা কথা বলতে ইতস্তত করলেও ওকে জাগাতে হলে

এ ছাড়া উপায় নেই। অপালা নিজের ভিতরে দাবানলের সন্ধান পেয়ে যায় : মাসিমা, তুমি আমার কথায় দুঃখ কোরো না। আমি একশোভাগ নিশ্চিত—এটা সেই গোপেন যে তীর্থকে নিজের হাতে হত্যা করেছিল।

রেখা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অপালার দিকে। রেখার মনে হতে থাকে অপুর যেন চোখমুখের চেহারায় কিছুক্ষণের মধ্যেই রূপান্তর ঘটে গেছে। আর তারই মধ্যে এমন একটা কথা বলল যা রেখার মধ্যেও প্রলয় ঘটিয়ে দিল।

অপালার লেলিহান শিখার স্পর্শ রেখা নিজের মধ্যে পেতে থাকে। 'ভুলে যেও না তীর্থ আমার স্বামী'! রেখা স্তব্ধ হয়ে যায়। কতবার অপুকে বলেছে—এবার তুই একটা বিয়ে কর। এভাবে থাকাটা অন্যায় ও অর্থহীন। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে বিয়ে দেব। অপু বলেছিল, 'মাগো, বিয়ে একটা সমস্যা নয়। ওটা তো সেরকম সঙ্গী পেলে যখন তখনই করা যায়। কিন্তু কাজটা পড়ে রইল।' কী এক দুর্মর নেশা—কাজটা পড়ে রইল। কী অদ্ভুত উদাসীনতা নিজের প্রতি। রেখার মন এক গভীর দ্বন্দ্বে ও দুঃখে আবর্তিত হতে থাকে। এক অজানা ভবিতব্য যেন তাকে পা ধরে টানতে চাইছে। এই মেয়েটা কি তার থেকেও বেশি আগুন ধরে রেখেছে? কী চায়—ও?

—অপু, কী চাস তুই? পরিষ্কার করে বল।

—মাসিমা, গোপেন যখন এমন একটা পরিস্থিতিতে অভাবিতভাবে হাতে এসেই গেছে, তখন এটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওকে হত্যা করতে হবে। এবং তোমাকেই সেটা করতে হবে—ইনটেনসিভ কেয়ারেই।

রেখা ওর কথায় ঘাবড়ে যায়। ও ভেবে পায় না গোপেনের নাম শোনা থেকে দ্রুত রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে অপালার কথায়-চেহারায়-প্রকাশে। ও ভেবে পায় না, অপু কি পাগল হয়ে গেল?

—তুই কী বলছিস অপু! ও আমার রোগী। ওর এমনিতেই অবস্থা ভালো নয়। আর আমি ওর নার্স। আমারই কেয়ারে ও আছে। তুই একবারও কি ভাবছিস তুই কী কথা বলছিস?

—আমি ভেবেচিন্তেই বলছি। হ্যাঁ, তোমাকেই করতে হবে। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে সেবার ছলে তোমাকেই করতে হবে।

দুলে ওঠে পৃথিবী। দুলে ওঠে বিশ্বসংসার। সমস্ত ঘরদোর দুলতে থাকে। দুলতে থাকে রেখা। রেখার মন ও মস্তিষ্ক যেন কাজ করতে চাইছে না। প্রতিদিনের মতো একটা রোগী, সে হয়ে উঠল গোপেন মল্লিক, যে কিনা তীর্থর হত্যাকারী! আর অপু বলছে ওকে হত্যা করতে হবে। আর সেটা করতে হবে সেবার ছলনায়! ওষুধের পরিবর্তে বুলেট দিয়ে? ওহ্ না! রেখার মস্তিষ্কে নিচ্ছে না। সবকিছু দুলছে। অপু, এ কী পরীক্ষায় তুই আমায় ফেললি। এ যে সম্ভব নয়। রেখা দুলতে দুলতে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। অপু, সম্ভব নয়—এ তুই কী বলছিস। গত পঁচিশ বছর ধরে সেবাধর্মে আছি। অপু, তুই তো জানিস এটা আমার চাকরিমাত্র নয়, এটা যে আমার ধর্মও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কিন্তু তোমার ধর্ম কি সে দিন পেরেছিল তোমার একমাত্র সন্তানকে কুকুরের মতো মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে?

—ঠিকই, আমি পারিনি তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু সে তো তার ধর্মেই স্থির ছিল। আর এই একটা গোপেনকে মেরেই বা তোদের কী লাভ হবে—আমি তো তীর্থকে ফিরে পাব না।

অপু বোঝে রেখা মানতে চাইছে না। ওঁকে বোঝাতে হবে। ওঁর মতো করে যুক্তিজাল বিস্তার করতে হবে। ওঁর মোহমুক্তি ঘটাতে হবে। অপালা বলে যেতে থাকে, 'লাভ নিশ্চয় আছে। তোমার পুত্রের হত্যাকারী শাস্তি পাক, এটাকে তুমি লাভ মনে করো না? মাসি, তুমি তো জানোই গোপেন আমাদের উদ্দিষ্ট ছিল না। আমরা সিস্টেমের বিরুদ্ধেই লড়ছি। তুমি তো জানো ওরা বিচারাধীন আসামি ছিল। ওদের প্রচলিত আইন, ন্যায়, নীতি, ধর্ম কোনওটাই তো বলে না বিচারাধীন আসামিকে কুকুরের মতো গুলি করে মারতে হবে। তুমি তীর্থের হত্যার ডিটেলটা জানো না, তাই পেশা ও ধর্মের দ্বন্দ্বে দুলছ।'

অপুর একনাগাড়ে কথাগুলি রেখা মনপ্রাণ দিয়ে শুনছিল। অপুর কথা শুনছিল আর মেলাবার চেষ্টা করছিল। অন্যদিকে অপুর দহনের বিস্তার ওকে ক্রমাগতই আশ্চর্য করছিল। সত্যিই তো, অপু তো খুঁজে

পেতে গোপেনকে বার করেনি আর গত পনেরো বছরে এ নিয়ে কোনও আলোচনাও ফাঁদেনি, বিচারাধীন বন্দি তীর্থকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল। কাগজে, রেডিওতে ফলাও করে বলা হয়েছিল—এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করার সময় বাইরের কিছু সমাজবিরোধী ভ্যান আক্রমণ করলে বন্দিরা তাদের সহায়তায় রক্ষিবাহিনীকে কাবু করার চেষ্টা করে। তাতে রক্ষীরা গুলি চালায়। অপু বলছে, তুমি কি ডিটেলস জানো? ওর বেশি ডিটেলস জানার মতো শক্তি ওর ছিল না। অনেক পরে যখন অপুকে জিজ্ঞেস করেছিল তখন অপু বলেছিল—রেখা যা অপুও তাই জানে. তীর্থর হত্যার ডিটেলস।

—অপু, তীর্থকে ওরা কীভাবে মেরেছিল?

—ওরা তীর্থ, হারু ও কাজলকে এক শীতার্ত রাত্রির শেষযামে জেল থেকে তুলে নিয়ে গঙ্গার পাড়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কুয়াশা তখন জড়িয়েছিল ময়দান, জেটি আর গঙ্গার পাড় জুড়ে। মায়াবী গলায় গোপেন বলেছিল, বাছারা, তোমাদের একটা সুযোগ দিচ্ছি—পালাও!—ওরা বুঝে গেল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কাজল ও হারু এঁকেবেঁকে দৌড় শুরু করেছিল। ভেবেছিল যদি নদী ওদের আশ্রয় দেয়। তীর্থর পাশে দাঁড়ানো গোপেনের রিভলভার থেকে ঝলকে ঝলকে আগুন ছুটে গিয়েছিল। তীর্থ ছুটে গিয়ে রক্তনদীর মাঝ থেকে নিজের কোলে তুলে নিয়েছিল হারু ও কাজলের দেহ দুটি। তীর্থ ঘাড় ঘুরিযে পেছনের জগৎটাকে দেখতে চাইছিল.......আর তখনই গোপেনের রিভলভার গর্জে উঠেছিল তীর্থকে লক্ষ করে.......

রেখা চিৎকার করে ওঠে—আর নয় অপু, আর নয়। দুই হাতে মুখ ঢেকে গমকে গমকে ফুলে উঠতে থাকে রেখা। রেখার দেহমন জুড়ে এক বৃষ্টি-সম্ভাবিত মেঘ বহুদিন ধরে পুঞ্জিত হয়েছিল। কান্না থামলে মুখ তুলে তাকায় অপুর দিকে। অপুও নিশ্চুপ রেখাব দিকে তাকিয়ে আছে। অপু যেন এক নির্মোহ দ্রৌপদী—যে কিনা রক্তের ঋণ রক্তেই শোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওর সমস্ত বোধ আর শক্তি যেন রেখাতে সংক্রামিত করতে পেরে কিছুটা শান্তিবোধ করে। অন্যদিকে রেখার অভ্যন্তরে খাণ্ডব-দাহন শুরু হয়েছে। রেখা নিশ্চুপ, অপু দেখতে দেখতে আবারও এক উদ্‌গত কান্নার কম্পন অনুভব করে। —'ওহ্‌! অপু, তুই বড়ো নিষ্ঠুর। তুই আমাকে এ কোথায় ফেলে দিলি! আমি তীর্থর গর্ভধারিণী বটে কিন্তু তীর্থ যে আমার থেকে অনেক বড়ো। আমি ছোটো সুখ ঘিরে শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম। আর তীর্থ, আমারই তীর্থ আমাব স্বপ্নকে খানখান করে দিয়ে বলল,—মাগো আমার বড়ো সুখ লাগে। তোমার এই দুঃখের ছবিটা আমি সর্বত্র দেখে ফেলেছি—আমার যে নিস্তার নেই মা। আর তীর্থ, তোর স্বপ্নকে যে রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দিল সে এখন আমারই হাতের মুঠোয়। কিন্তু তীর্থ, তুই তো দেখে গেছিস ওই শুভ্র গাউন আর মাথায় ক্যাপ পরলেই আমাব মনের মধ্যে এক অন্য ভাব এসে যায়। আর সেই ভাব যে কী এক নিঃসীম আনন্দের তরঙ্গ সৃষ্টি করে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে, তা আমি কী করে বোঝাই অপালাকে।

রেখা অপালার দিকে তাকিয়ে বলে. 'অপু, একটা কথা বলব?'

অপালা বোঝে এই নারী দুলছে। এক মর্মান্তিক টানাপোড়েনে দুলছে। অপালা বোঝে ও নিরন্তর শাসনে ভিতরের অস্থিরতাকে সামাল দিতে চাইছে। অস্ফুট স্বরে রেখাকে বলে, 'বলো মাসি, এটা আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?'

—অপু, বলছিলাম আমার মায়ের মন বলছে, প্রতিশোধ। এতবড়ো অত্যাচারী শুধু আমারই কোল শূন্য করেনি, বহু সংসারকেই ভাসিয়েছে ও। ও শাস্তি না পেয়ে গেলে পাপ হবে। তীর্থর আত্মা শান্তি পাবে না। কিন্তু অন্য কোনও ভাবে, অন্য কোনওখানে ওর কিছু করা যায় না? আমার মায়ের মন বলছে এই সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। কিন্তু আমার মানুষের মনটা বড়ো বাধা দিচ্ছে। অসুস্থ ও আর্তরা বাঁচার কী করুণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমার কাছে আসে; ঈশ্বরের কাছে কী করুণ আবেদন—বাঁচাও হে ঈশ্বর, এইবারটি বাঁচাও, আর আমি যেন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত হয়ে। আমি ওদের সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দেই; ওষুধে ওষুধে ওদের যন্ত্রণা উপশম করার চেষ্টা করি, ডুবন্ত মানুষগুলিকে বলি, ঈশ্বর নিশ্চয় তোমাকে বাঁচাবেন। ওরা শান্তি পায়, শক্তি পায়, ওরা ঘুমোয়। হয়তো কেউ আর জেগে ওঠে না। অপু, আমার মানুষের মনটা বলছে.....রেখা থেমে যায়।

অপু অবাক বিস্ময়ে এই নারীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওঁর অনুভূতি কোনও শাসনই মানতে চাইছে না। সাধারণ এক নারী এই শক্তি, এই ভাব কোথা থেকে পায়! ও কি হেরে যাবে ওঁর কাছে? তীর্থ, দেখে যাও, তোমার মাকে আমি মোটিভেট করতে পারছি না। কী ভয়ঙ্কর শক্তি ওঁর! বোঝা যায় তীর্থরই মা। যে প্রেমে ও নিষ্ঠায় এই নারী কথা বলছে, তীর্থ, আমার মনে হয় তারই আর এক রূপে বা বিভঙ্গে তুমি ফেরার হয়ে গেলে। তুমি বলতে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়', আর এই পাষাণি কী এক অন্ধ বোধে বা কী এক অবুঝ প্রেমে তোমার হত্যাকারীর মুখোমুখি হয়েও পাষাণটাকে ছুড়ে ফেলতে চাইছে না। অপালা আবেগে থিরথির কাঁপতে থাকে। ওর অনুভূতি পাগলা ঘোড়ার শক্তিতে বাঁধন ছিঁড়তে চলেছে। ওর অস্তিত্ব জুড়ে সর্বস্ব হারাবার এক কান্নার অনুরণন শুনতে পায়। ওর মায়াময় চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে ওঠে। কাঁদতে ভালোও লাগে না অপালার। কিন্তু এই কান্না অপ্রতিরোধ্য, একে জোর করে থামানোরও কোনও মানে হয় না। অপালা চাপাস্বরে বলতে থাকে : মাগো........

রেখা থমকে যায়। সেই ডাক, যা কিনা অপালা অহরহ ডাকে না। রেখার আবারও বলতে ইচ্ছে করে— মা বলে ডাকিস না তুই—মাসিমাই বল। তোর এই নিষ্ঠুরতা আর সহ্য হয় না।

—মাগো! তুমি মানুষের মনের কথা বলছ, ঠিক আছে। খালি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, মায়ের মন বুঝি মানুষের নয়? ওটা কি কোনও পশুর? ঠিক আছে, কাজটা আমিই করব এবং ঐখানেই। তোমাকে ওর দায় নিতে হবে না।

রেখার কোষে কোষে নীল বিদ্যুৎ খেলে যায়। সব কিছু ভুলে চিৎকার করে উঠে আছড়ে পড়ে অপালার কোলে। অপালার কাছে দৌড়ে যেতে মেঝেয় পড়ে থাকা কাচে পা কেটে রক্ত ঝরতে থাকে।

—ন্না—ন্না—কক্ষনো নয়। আমি তোকে হারাতে রাজি নই। —রেখা ও অপালা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নিজেদেরই উদ্‌গত কান্নায় পরস্পরকে ভিজিয়ে দিতে থাকে।

রেখা গোপেনের ব্লাড প্রেশারটা চেক-আপ করে। ডাক্তারের রিপোর্টটা দেখে নয়. পেচ্ছাপের অবস্থাটা এখনও ভালোও নয়। দুদিন হল চোখ মেলে চেয়েছে। মুখ বেশ খানিকটা বেঁকে গেছে। বিকেলের সিস্টার রাত্তিরের লিকুইড খাইয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ পড়ে গিয়েছে, ব্লাড প্রেশারটা চেক-আপ করতে করতে রেখা ডান হাতের আঙুলগুলি দেখছিল, দীর্ঘবাহুর গোপেনের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক থ্যাবড়ো ও মোটা। এই আঙুলগুলোই ট্রিগারটা চেপে ধরেছিল। রেখা শায়িত গোপেনকে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছিল। ছ'ফুটের ওপর দীর্ঘদেহী মানুষটা এখনও অর্ধচৈতন্যে রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুঝছে। মাঝে মাঝে অন্তর্গত যন্ত্রণায় শব্দ করে উঠছে। চেতনার জগতে ফিরে আসার এক স'গ্রাম চলছে। রেখা আন্দাজ করতে চেষ্টা করে— কত বয়স হবে? কার্ড দেখলেই বোঝা যাবে। মনে হয় রেখার থেকে কিছু ছোটই হবে। রেখা টিভি স্ক্রিনটার দিকে তাকায়। আগের থেকে অনেক স্টেবল হয়েছে।

এই মানুষটাই তীর্থ, হারু, কাজলকে হত্যা করেছিল। অপু বলে ও আরও অনেককে মেরেছে। আশ্চর্য, পুলিশ তো আর ভিন্ন গ্রহের মানুষ নয়! আমাদেরই ঘর থেকে উঠে আসা মানুষের দল। সিস্টেম? রেখা ভাবে সিস্টেমের কী প্রচণ্ড দাবি! কেউ কেউ আবার সিস্টেমের বাইরে চলে গিয়ে আরও ভয়ঙ্কর দানবে পরিণত হয়ে যায়—সিস্টেমকেই খুশি ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সন্ত্রাস। লোকজনকে এমন ভয় পাইতে দিতে হবে যাতে সমগ্র প্রজন্মটাই ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে।

রেখা পর্দায় ফুটে ওঠা হার্টের গতিপথের কিছু রিপোর্ট লিখে রাখে। তারপর চেয়ারে বসে গোপেনের দিকে নির্নিমেষ তাকায়। মনে মনে তাকে উদ্দেশ করে কথা বলতে থাকে যেন।

গোপেন, পুত্রশোক ভোলা যায় না। বছরের পর বছর যে স্বপ্নকে ঘিরে দিন গুজরান করছিলাম, যে চারাগাছটায় নিদারুণ মমতায় শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটিয়েছিলাম. এক নিমেষে তোমার নিক্ষিপ্ত কয়েকটি সিসের দলায় ফুটিফাটা হয়ে ছিন্নভিন্ন হল। শুধু আমার স্বপ্নটাই চৌচির হয়ে গেল তাই নয়, তীর্থর স্বপ্নটাও নিজেরই রক্তের নদীতে ভেসে গেল। তীর্থ আমার। তার রক্তাক্ত হাঁ-করা মুখ কোনও সময়ই ধূসর করে

দিতে পারবে না। গোপেন, ও বোধ হয় শেষ সময় একটু জলের জন্য হাঁ করেছিল, তাই না? তোমার সৃষ্টি করা ক্ষত থেকে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে যে ঝরনার সৃষ্টি হয়েছিল—তা বোধ হয় তীর্থর নাকে-চোখে-মুখে ঢুকে পড়েছিল?

ঠিক এই সময় গোপেন নিমীলিত চোখে শব্দ করে, জল! শব্দটা অস্পষ্ট বেরিয়ে আসতে চায়। রেখা মুহূর্তের চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসে ফিডিং-কাপটা তুলে নিয়ে বিন্দু বিন্দু জল গোপেনের হাঁ-করা মুখে ঢালতে থাকে। গোপেন কয়েকবার ঢোক গিলে মুখটা বন্ধ করে ঘাড়টা কাত করে।

দীর্ঘ নয় মাস থেকে নিজের রক্তে লালন করছিলাম যাকে, নিজেরই রক্তের নির্যাস দিয়ে প্রহরের পর প্রহর জুড়ে সৃষ্টি করতে হয়েছিল, সে তো তারই শরীরের অন্যরূপ। তাই তো একে আত্মজ বলে। আর তাকেই কি না রাজপথে নিয়ে কুকুরের মতো গুলি মেরেছে এই গোপেন! এক ভোরের ছবি তাকে আন্দোলিত করে। ওহ্ ঘৃণা! অপু, তুইই ঠিক—ঘৃণা। আমার তীর্থ এক ফোঁটা জলের জন্য মুখটা হাঁ করেছিল, আর সেখানেই ঢুকে যাচ্ছিল তারই শরীর থেকে উৎসারিত রক্তের ধারা। অহো ঈশ্বর! ও তো আমারই রক্তের ধারা। গোপেন, তোমাকে ছাড়া হবে না। তোমার নিস্তার নেই। তুমি ক্ষমার যোগ্য নও। তুমি মানুষ নও। সেবাই আমার চাকরি। সেবা তো এখন আমার ধর্মও বটে। অসুস্থ ক্লিষ্ট মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে হাসি ফোটানোই তো আমার ধর্ম! গোপেন, তুমি কিন্তু সম্মুখ-সমরে আমার পুত্রকে মারোনি, বন্দি পুত্রকে ঘুম ভাঙিয়ে কারাগার থেকে তুলে নিয়ে এসে হত্যা করেছিলে। ন্‌না, আমার ধর্মের অহঙ্কারে যদি তোমাকে ক্ষমা করি তা হলে নিজেকেই অস্বীকার করা হয়। আসলে এক অহঙ্কার। এক অহঙ্কারের কাছে নতজানু হয়ে পড়ছি। চেয়ারে বসে থাকা রেখা টিভি স্ক্রিন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চোখ বন্ধ করে।

মাগো—আজ বহুদিন পরে তোমায় লিখছি। জানি আমার সিদ্ধান্তে তুমি ভীষণ আপসেট। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি মানুষ হতে চাই। তুমিই তো নিরন্তর কানের কাছে বছরের পর বছর বলে এসেছ 'তীর্থ মানুষ হ'। আমি জানি না তুমি কেমন মানুষ হতে বলেছিলে। আজ আমার মনে হচ্ছে সত্যি বুঝি আমি মানুষ হওয়ার পথে পা ফেলেছি। আমি জানি তুমি হয়তো বলবে ও তো কমিউনিস্ট মানুষ। তুমি বিশ্বাস কর মা—কমিউনিজম হচ্ছে মানবতার এক সর্বোচ্চ রূপ। কমিউনিজম মানুষকে ভালোবাসে মানুষেরই জন্যে। অল্প কিছু মানুষ, যারা পরের শ্রমে নিজেদের উচ্ছল আনন্দে ভরে রাখতে তৎপর, তারাই একমাত্র এর বাইরে। তোমায় আমি তত্ত্বকথা বলব না—ও তুমি বুঝবেও না। কিন্তু জানো মা, আমি এখন যেখানে আছি সেখানকার মানুষেরা সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন ভাত খেতে পায়। সেই ভাতের গন্ধ—চাকরি থেকে ফিরে এসে যখন ভাত বসাতে আর সেই ভাতের গন্ধ কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ত—তখন কিন্তু এই গন্ধের ব্যাপ্তি ও মাদকতা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি। তুমি একটা কথা বলতে—'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। তখন সেই কথার তাৎপর্য গভীরে ধরতে না পারলেও আজ বুঝতে পারি সত্যি 'অন্ন' শব্দটার কী ভয়ংকর প্রসার।

আমার চিঠির উত্তর পাব না জানি। কারণ আমি এখনও তোমাকে ঠিকানা দেওয়ার মতো অবস্থায় আসিনি। জানো মা. আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছি। আসলে এই গ্রামের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছি। তাদের সঙ্গে শ্রম করি, তাদের দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ করি। তাদের জীবনকে গভীরে বোঝার চেষ্টা করি। একটা কথা বলি—এখানে আমার তো অনেক অসুবিধে হওয়ার কথা। আমি যেখান থেকে এসেছি তার সঙ্গে এ জীবনের আকাশ-পাতাল তফাত। অসুবিধে সবই কাটিয়ে উঠেছি। ওটা আজ আর কোনও ব্যাপারই নয়। একটা জায়গায় আমার সুখ। এরা আমায় গ্রহণ করেছে। ওদের এই গ্রহণের আমি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারব? ভয়ংকর রকমের অদৃষ্টবাদ ও হতাশার মধ্যেও হিমালয়ের মতো সুপ্ত সম্ভাবনার বীজ বহন করে চলেছে এইসব মানুষ। আসলে মানুষকে সমগ্রভাবে ভালোবাসার এক ভীষণ মজার উপলব্ধি এদের মধ্যে। বুঝতে পারছি, মানুষকে ভালোবাসা—যেন এক বিরাট মজা।

মজা! গোপেনের শরীরটা দুলে ওঠে। শরীরের ভিতরেরই কোনও অস্বস্তিতে ছোটো একটা শব্দ ওঠে। রেখা চোখ মেলে তাকায়। পিঁপড়ের সারির মতো রেখারা বয়ে চলেছে—গোপেনের বেঁচে থাকার কম্পনকে জানান দিচ্ছে। মজা! তীর্থ, তুই এক ভয়ংকর মজায় ডুবলি, যা তোকেও বাঁচতে দিল না। শুধুই কি তাই? আমার মজাটুকু—যা সম্বল করে আমি হাঁটি-হাঁটি পা-পা চলছিলাম—সেটাকেও এক দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর যে লোকটা তা উড়িয়ে দিল সেই মানুষটাও অদ্ভুত এক ঘটনাপ্রবাহে আমারই কাছে সেবাপ্রার্থী। তীর্থ, এও কি ভয়ংকর মজা হয়ে দাঁড়াল না? ওই গোপেন তোর ও আমার স্বপ্নকে খুন করেছে, বন্দি অবস্থায় তোকে খুন করেছে, আর আজ ও নিজেই বন্দি আমার কাছে, অন্য এক পরিস্থিতিতে।

তোর বাবা ফেলে চলে গেল। একা ভীষণ একা। আমার সমস্ত একাকিত্ব কাটাতে লাগলাম তোকে ঘিরে। ঘরের বাইরে পা রাখলাম তোর ও আমার জীবন-রসদের সংগ্রহে। কিন্তু আমার মন হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী। বাইরের জগতের কলরব, জীবনের অন্যসব কলতান, জীবনের গভীর সব রহস্য—সব কিছু দূরে সরিয়ে রাখলাম—আমার বোধের বহুদূরে। পেশাটা পেশা থাকল না। সত্যি বলি তীর্থ, যাতে অন্য সব বঞ্চনার খাদে আবর্তিত না হই—সেই ভেবে ফ্লোরেন্সের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠাই ধর্ম মানলাম আর একদিকে রইলি তুই। অন্তরের ভিতরটা দেখতে থাকল তোর বেড়ে ওঠা—শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের শ্যামল গৌরবে তুই ফুটে উঠলি। কী অসীম বিস্ময়! আমার অন্য সব কিছু বিসর্জনের জন্য যদি বা বিন্দুমাত্র আক্ষেপ ছিল, তা ভেসে গেল তোকে আবাহনের মধ্যে। তুই গোলগাল থেকে ভাঙতে আরম্ভ করলি। তুই ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি। তোর হাত, পা, শরীরের সমস্ত অংশ দীর্ঘতর হয়ে উঠতে লাগল। কৈশোর ও যৌবনের মধ্যবর্তী এক ভাঙনের অবয়ব—তোর গলার স্বর পরিবর্তিত হল, আমি যেন অনীশের গলার স্বর শুনতে লাগলাম তোব কথাবার্তার ঢঙে, কাশির শব্দ, হাসির হিল্লোল সবকিছুর মধ্যেই যেন অনীশের ছায়া দেখতে শুরু করলাম। তোর মধ্যে আমারই স্বপ্ন দুলে দুলে ফেঁপে উঠতে থাকল! ঠোঁটে ও গালে কালো রেশমের মতো সুতো ফুটে উঠল, তুই চুলে ব্যাকব্রাশ করতে করতে যৌবনে পা রাখলি। আর তখন থেকেই তোর মধ্যে এক পরিবর্তন শুরু হল। যৌবনেব প্রারম্ভ থেকেই চোখে-মুখে এক প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ ভাব নিয়ে আসলি। আমি ভাবলুম এ সব ভনিতা। তুইও স্বপ্ন দেখছিলি। কিন্তু সেই স্বপ্নের চরিত্রটা আমি বুঝলাম না। আসলে তুই গভীর দুঃখের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিলি। বোধ হয় এক বঞ্চিতের সঙ্গে ঘর করতে করতে সারা দুনিয়ার বঞ্চিতেব কাছাকাছি চলে গেলি।

কিন্তু তীর্থ, আমি যে ভয়ঙ্কব দোটানায় প'ড়েছি। আমার সাত রাজার ধন এক মানিক—তোকে যে শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে বন্দি অবস্থায় হত্যা করেছে সেই জল্লাদই আজ বিপর্যস্ত এক শরীর নিয়ে আমার কাছে বন্দি। একে ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু আমি যে ফ্লোরেন্সের মন্ত্রশিষ্যা। অপু বলছে, নাউ অর নেভার। অপু আরও বলেছে—আমি অপারগ হলে ও নিজের হাতে ব্যাপারটাব ভার নেবে! অপুকে আমি হারাতে রাজি নই। তা ছাড়া গোপেনের সঙ্গে দেনা-পাওনা মেটাবার প্রথম ভাগীদার আমিই। কিন্তু এভাবে নয়, এখানে নয়। তীর্থ তুই-ই বল। এখানে, এভাবে তোর মা হয়ে আমি কি পারি? কিন্তু এই সুযোগও যে ছাড়া চলে না। তীর্থ, আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি—কিন্তু তোকেই বলি—সঙ্গে সঙ্গে অপুকে নতুন করে আবিষ্কার করছি। বোঝাই যায় না চারদিকের কুটিল স্রোতের মধ্যে কীভাবে হৃদয়ের ভিতরে এক শপথকে অমলিন বয়ে বেড়োচ্ছে। কী এক অলৌকিক আলো ওকে যেন তপস্বিনীর মতো করে তুলেছে। তীর্থ, কী নির্ভুল তোর নির্বাচন! আমাকে যুগপৎ লজ্জা ও আনন্দের শিহরন দিচ্ছে, তারই পিঠে উঠে আসছে এক হাহাকার, যা মায়ের হৃদয়ে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে বলছে—ওই ড্রিপের বোতলটা ছুড়ে ফেলে দে, ক্যাথিটার হেঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দে, গোপেনকে ছিন্ন কাগজের টুকরোর মতো জানলার বাইরে দিয়ে অনন্ত আকাশে উড়িয়ে দে। কিন্তু যেই গোপেনের ছেলের মুখ, তার কন্যার মুখ, তার নাতনির মুখ উৎকর্ণ জিজ্ঞাসায় ভেসে আসছে—সিস্টার, আপনি কেমন বুঝছেন—অমনি ফ্লোরেন্সের ছবিটা চলে আসে মাথায়। দৃষ্টি চলে যায় নিজের ইউনিফর্মের দিকে। এক মানুষের মন যেন সেই ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়ে বলে, রেখা শান্ত হও। কিন্তু কোথায় যেন শব্দ ওঠে—পাপ। এই শান্ত হয়ে থাকাও পাপ। সেই শব্দ আমার

সমগ্র অস্তিত্বে এক সঙ্গীতের মতো বেজে চলতে থাকে, আমাকে স্থিরভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। কিন্তু আমার যা করার এখানেই করতে হবে।

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, আবার খানিক বাদেই শুকনো খটখটে হয়ে উঠছে। এইরকমই চলছে সকাল থেকেই। রেখা নাইট ডিউটি দিয়ে এসে খেয়েদেয়ে ঘুমুচ্ছে। অপালা বাইরে বেরিয়েছিল, কিছুক্ষণ হল ঘরে ফিরেছে। রল্যাঁর একটা বই পড়ছিল। মাঝে মাঝেই আড়চোখে রেখাকে দেখছে। যেন রেখার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায়। বিগত কয়েক বছরে অপালা ভিতরের অস্বস্তিকে দমন করার এক সহজাত শক্তি অর্জন করেছে। ও নিজেও ভেবে পায় না কখন সে এই শক্তি আত্মস্থ করেছে, তীর্থর নৃশংস মৃত্যু ওর বোধের জগতে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। অপালা নিদ্রিতা রেখার দিকে তাকায়। বইয়ের মধ্যে ঠিকঠিক মনটা খেলাতে পারছে না। প্রায় বন্ধ্যা সময় চলছিল। ঢিমেতালে, ইতস্তত কখনও-সখনও আলোর ঝলকানি। বহু পাখি নীড়ে ফিরে রোমন্থন করছে। তারই মধ্যে আচম্বিতে গোপেনের উদয় এই দুই নারীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে, পুত্রহারা নারী এক মানবিকতায় আক্রান্ত। ও নিজেও অন্য এক মানবিকতার উদ্বেল। ওর নিজের মানবিকতা বলছে রক্তের ঋণ রক্তেই শোধ হবে। তার জন্য স্থান, কাল, পাত্র বিচারের সময় নেই! সুযোগ বারবার আসে না—আর ওই নারী, সেও বদলা চায়। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছে, সকলেই গোপেনের নাম শুনে চমকে গেছে। প্রত্যেকের একই মত। ওকে যদি শাস্তি না দেওয়া যায়, ভবিষ্যতেও বিচারাধীন বন্দিদের এইভাবে হত্যার প্রবণতা থাকবে। কিন্তু রেখা দুলছে। ভীষণভাবে দুলছে! অপালা নিদ্রিতা রেখার দিকে তাকায় বিস্ময়ে। কোথা থেকে এতখানি শক্তি ও বিচার পেল। বলে কি না মানুষের মন! অপু ভাবে, কী মোক্ষম কথা—। কিন্তু কথাটা রেখার কাছে শুধু কথা নয়। নিজের পুত্রের হত্যাকারীর সামনে দাঁড়িয়ে যে নারী এ কথা বলতে পারে তার ভিতরে নিশ্চিত এক প্রচণ্ড শক্তি কাজ করছে। অপালা ভেবে লজ্জা পায় কত সময় আমরা সাধারণদের অবজ্ঞা করি, না জেনে। আসলে রেখা ততখানি সাধারণ নয়। স্বামীর অকালমৃত্যু থেকে তীর্থর হত্যা অবধি যে দুরন্ত ঢেউ ও কুটিল স্রোত ক্রমাগত দুই হাতে যে সরিয়েছে—সে সাধারণ নয়। তবু যেন অপালার বিস্ময় লাগে। বইটা পাশে ফেলে রেখে ঘুমন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই নারী একসময় সুন্দরীই ছিল। কঠিন সময় ও জীবনই তাঁর সর্বাঙ্গে থাবা বসিয়েছে। ঘুমের মধ্যে রেখার বলিরেখা কুঞ্চিত হতে দেখে অপালার হৃদয় মথিত হয়। তীর্থ, আমি দায়ি নই। আমি সকলের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা এখনও লড়ছে তাদের কাছে সমস্যা তুলে ধরেছি। প্রত্যেকেই একমত, ওকে শাস্তি দিতেই হবে—আর সুযোগটা যখন এভাবেই এসে গেছে—তখন সেটা ব্যবহার করতেই হবে। প্রত্যেকেরই এক কথা, বন্দি বিপ্লবীদের ওপর গোপেনের অত্যাচার ওকে এক নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবে এটাতেও সকলেই একমত যে রেখার ওপর এই সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। ও যদি নিজে থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়, তবেই। নতুবা অপালাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তীর্থ—আমি সম্পূর্ণভাবে তৈরি।

এক হিংস্র আওয়াজ আকাশ ফেটে বেরিয়ে এসে অপালাদের ঘরের ওপর দিয়ে সশব্দে দূরে চলে যায়। ঘরের সবকিছু কেঁপে ওঠে। রেখা জেগে যায়।

রেখা চোখ মেলে দেখে অপালা শুয়ে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুমের রেশ কাটাতে কয়েক মুহূর্ত চলে যায়। তারপরেই পাশ ফিরে শোয়, শুয়ে শুয়েই আড়মোড়া ভাঙে, কিছুটা সময় যায়। রেখা আবার অপালার দিকে পাশ ফেরে। অপালা পলকহীন তাকিয়ে আছে। শুয়ে শুয়েই রেখা কথা বলে : রিভলভার এনেছিস? অপালা চুপ করে থাকে। রেখা বলতে থাকে, আমি তো রিভলভার চালাতে জানি না। তোরা গুলি ভর্তি করে দিবি—আর কী করে কী করতে হবে বলে দিবি। শয়তানটার মাথার মধ্যে রিভলভার চেপে ধরে ট্রিগারটা টেনে দেব।

যেভাবে চোখ মেলেই রেখা রিভলভার চাইল, অপালা তাতে অবাক হল না। ও বুঝল বিষয়টা ওদের দুজনের কাছে যতিহীন যন্ত্রণায় চৈতন্যে কাজ করে চলেছে। রেখার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ওর মস্তিষ্কে একটি

একটি করে যেন বিদ্ধ হল। তবু ওকে অচঞ্চল থাকতে হবে। ও উঠে বসল। চুলগুলো কিছুটা গোছ করে রেখার দিকে তাকায় : মাগো, কাজটা তুমি নাই-বা করলে। ওটা আমাকে অন্তত করতে দাও।

এতক্ষণ রেখা শুয়েছিল। এইবার ও উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটা নিয়ে জল খেল, গ্লাসের অবশিষ্ট জল হাতের চেটোয় ফেলে মুখটা ভিজিয়ে নেয়। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'মাগো, এ ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে তর্ক উঠিয়ে লাভ নেই। এটা আমার কাজ—এটা আমাকে করতে দে।'

অপালা যেন 'মা-গো' বলা ডাকের মধ্যে এক মহা-ইঙ্গিত পেয়ে যায়, মনে হয় ও যেন তৈরি, তাই ভিতরে ভিতরে এতখানি উদ্বেল। রেখার সংলাপের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অনুভূতির স্পন্দন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা উচিত নয়।

—মা, আমরা ঠিক করেছি গোপেনকে মারব না।

রেখা চমকে ওঠে। কী আবার এমন হল যে ওদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হচ্ছে? ওরা কি ওর দ্বন্দ্বটাকে ওর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বলেই ধরে নিয়েছে?

—কেন অপু, কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা? এটা কি আমার কথা ভেবে?

—ন্‌না মা—যদি গোপেনকে মেরেই ফেলা হয় তা হলে ওর মতো পিশাচের শাস্তিটার আর ভোগ হল কোথায়? এই মুহূর্তে এমনিতেই ও বিধ্বস্ত—তার মধ্যে যদি ওকে শেষ করে দিই তা হলে ওর শাস্তিটা হল কোথায়?

ও, সেইজন্য! তা হলে কী করতে বলিস?

অপু পায়ে পায়ে উঠে সেল্‌ফ থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নামায়, সেটা খুলে তার থেকে দুটো অ্যাম্পুল বার করে এনে রেখার মুখোমুখি বসে।

—আমাদের ডাক্তার-বন্ধুরা দিয়েছে, ওরা বলেছে এই দুটো যদি মাসিমা মাসকুলার বা ইন্‌ট্রা-ভেনাস, যে ভাবেই হোক পুশ করতে পারেন তা হলে চমৎকার হবে। তার আগে রোগীর বিপি দেখে নিতে হবে ও রোগীর কন্ডিশন একটু উন্নতির পথে থাকলে ভালো হয়।

—এতে কী হবে?

—এই ওষুধে ও এক্ষুনি মরে যাবে না। এই ওষুধে ওর সারা শরীরে পক্ষাঘাত ব্যাপ্ত হবে—ওর মস্তিষ্ক কাজ করবে না। কিন্তু ওর হার্টের সমূহ ক্ষতি হবে না। গোপেন মরবে না, ও বেঁচে থাকবে।

রেখা অপুর মুখের দিকে সহজ সরল দৃষ্টি হেনে শুনে যাচ্ছিল। অপুর প্রতিটি কথা শুনতে শুনতে ও নিজের সঙ্গেও কথা বলছিল : ওহ্! সিদ্ধান্তের এই পরিবর্তন। সেটা তো আমার কাছে আরও কঠিন হল। তোমরা ভাবলে এটাই বুঝি সহজ ও সুদূরপ্রসারী শাস্তি হল। কিন্তু আমি নার্স। আমি ওষুধ খাওয়াই মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে, আর আমি কিনা ইনজেক্ট করব বিষ! ন্‌না। আর বিতর্ক নয়। তীর্থর হত্যাকারীর জন্য আর বিচার নয়। 'তবে তাই হোক।' এক মহামন্দ্রিত সুর রেখার অন্তর জুড়ে বাজতে থাকে—'তবে তাই হোক'।

—ঠিক আছে অপু। ওর তো অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে—ও দুটো দে।

রেখা হাত বাড়িয়ে অ্যাম্পুল দুটো নেয় ও যত্ন করে অফিস ব্যাগে ঢুকিয়ে নাইট ডিউটিতে যাওয়াব জন্য তৈরি হতে থাকে।

হঠাৎই যেন অপু একটা কাঁপনের আভাস পায়। ওর সমগ্র অস্তিত্বটা কাঁপতে থাকে। রেখার এই সহজভাবে নিয়ে নেওয়া ও ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা, কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করা, হিমশীতল ব্যবহার, সমস্ত কিছুই অবিরাম বিহ্বল করে তুলতে থাকে।

অপুর নিষেধ না শুনে ঘন বৃষ্টির মধ্যেই রেখা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। মাঝে বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল, কিন্তু সেটা যেন দম নেওয়ার মতো। সন্ধের আবহবার্তায় বলা হয়েছে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বর্ষণ হবে। আবারও বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। ওয়াটারপ্রুফ খুলে রেখা তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরে নিয়ে

দুপুরের সিস্টারকে রিলিজ করে দেয় ও চার্জ বুঝে নেয়। গোপেনকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে। হার্টের অবস্থাটা আগের থেকে অনেক বেশি স্বাভাবিক। গোপেন অপাঙ্গে রেখার চার্জ নেওয়া দেখে। গোপেনের মনে হয় এই সিস্টারটি যেন অনেক বেশি দরদি, রেখা প্রথমেই চার্টটা দেখে নেয়। তারপরেই কিছু রুটিন কাজকর্ম সেরে নিয়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়, গোপেন রেখার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, 'সিস্টার, আমি কি বাঁচব?'

রেখা গোপেনের মুখে প্রথমেই এই প্রশ্ন শুনে চমকে যায়। ও কি আঁচ করতে পারল নাকি? তারপর নিজেই মৃদু হেসে টুলটা টেনে বিছানায় গা লাগিয়ে বসে, ওর বলতে ইচ্ছে করে অন্য কিছু, অন্য অনেক কিছু, কিন্তু নিজেই নিজেকে শাসন করে নেয়। মৃদু হেসে ওকে জিজ্ঞেস করে, 'কেন এমন ভাবছেন?'

—কেন, সিস্টার, কেন এমন ভাবছি? আপনাকে বলি, ডাক্তারবাবুকে বলতে ভয় হয়, যদি ভুল বোঝেন।

রেখা সামান্য অধীর হয়, 'কেন? আপনি তো এখন বেশ ভালো আছেন!'

—না সিস্টার। চোখ বুজলেই কিছু ছেলের সারি সারি মাথা দেখি।

রেখা ভিতরে ভিতরে চমকে যায়। কী বলছে ও? কী বলত চায়? খালি মাথা, অন্য কিছু নয়!

—সিস্টার, খালি মাথা—সারি সারি মাথা। খালি হাসছে। হাসছে, কোনও কথা বলছে না।

—ওদের চিনতে পারছেন?

—না সিস্টার, চিনতে পারছি না।

রেখা যেন এক আগুনের আঁচ পেতে থাকে, কবন্ধ! কাদের? ন্না, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি ঠিক ভালো হয়ে উঠবেন।

—কিন্তু আমার ডানদিকটা তো তুলতে পারছি না।

রেখা মুহূর্তের জন্য চুপ করে যায়, 'হ্যাঁ, আপনার ডানদিকটা পড়ে গেছে—কিন্তু ডাক্তারবাবু বলেছেন ওটা ভবিষ্যতে ভালো হয়ে যাবে।'

—না সিস্টার, আমি আর ভালো হব না।

রেখা আলোচনা অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে, 'আজ আপনার ছেলে এসেছিল।'

—হ্যাঁ। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী ওরা সবাই এসেছিল। কিন্তু ওরা বোঝে না—আমি আর ভালো হয়ে উঠতে পারি না।

কী হয়েছে আজ রেখার? সব কথাতেই কেঁপে উঠতে চাইছে? —আপনার একই ছেলে?

—এক ছেলে দুই মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে আগেই দিয়েছি, ছেলের বিয়েও দিয়েছি। ছেলের ঘরে এক নাতিও আছে, কিন্তু সিস্টার, আমার ডানদিকটা থাম হয়ে গেল। চোখও বুজতে পারছি না। চোখ বুজলেই হাসি আর সারি সারি মুণ্ডুর মিছিল, সিস্টার, আমাকে ঘুমের ওষুধ দিন।

রেখা নির্নিমেষ চোখে গোপেনকে দেখছিল। ওর মুখে ভাষা ফুটে উঠতে চায় না। তুমি কবন্ধ দেখছ, হাসি শুনছ কিন্তু চিনতে পারছ না! অপু, আমি একশ ভাগ নিশ্চিন্ত হলাম। দেব, তোমাকে ঘুমের ওষুধই দেব।

শ্রাবণের শেষ বরিষন। সমস্ত শহরে প্রাণের অস্তিত্ব ভীষণভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, অন্যদিন রাতে যানবাহনের আওয়াজ থাকে। আজ তাও নেই। এত বড়ো নার্সিং হোমটাও যেন সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে আছে। শুধু ইনটেনসিভগুলিতে নরম আলো জ্বলছে। মূল টেবিলগুলিতে দুজন সিস্টার মনিটরিংয়ে খরদৃষ্টি দিয়ে বসে আছেন। গোপেন গভীর ঘুমে অচৈতন্য। রেখা সাধারণ মাত্রায় ঘুমের ওষুধ দেয়নি। শক্তিশালী ও স্বাভাবিক মাত্রার তিনগুণ বেশি দিয়েছে, যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে না হয়। মনের চঞ্চলতা রুখতে ব্যাগ থেকে 'গীতা'র ছোট সংস্করণটা বের করে পড়তে থাকে, 'গীতা' ওর বহুদিনের সঙ্গী, অঝোর বারিধারায় বাইরের তাপমাত্রা যথেষ্ট হ্রাস হলেও রেখার ভিতরে ক্রমাগত উল্কাপাত ঘটে চলেছে। রাত এখন তৃতীয় যামে পা রেখেছে। রেখা 'গীতা'র পাতায় মন দেয়।

রেখা বোঝে আজ মনের গতিকে বাগ মানানো সম্ভব নয়। তবু প্রাণপণে 'গীতা'তে মন অর্পণ করে। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥' কিন্তু মন মানে না। আমি যে ধর্মে থাকছি না! ঋণ, রক্তের ঋণ। হে ঈশ্বর, কর্তব্য ও ঋণ একাকার হয়ে যাচ্ছে। শাস্তি আমাকে দিতেই হবে কিন্তু ধর্ম যে আমাকে দুর্বল করছে। বৃষ্টি আরও গভীর শব্দে আকাশ মেঘশূন্য করার প্রতিশ্রুতি জানাতে থাকে। হে কৃষ্ণ, তুমিই বল, বিচারাধীন বন্দি আর চিকিৎসাধীন রোগী কি সমার্থক? হে বিষ্ণু, তুমি কী বলবে? মানুষের মন না মায়ের মন। আমার তিলতিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্নকে যে কৃতান্ত রক্তের নদীতে ভাসাল তাকেই-বা ক্ষমা করি কীভাবে। না, দুর্বলতা নয়, আজ আর কোনও দুর্বলতা নয়। টি ভি মনিটরের দিকে রেখা তাকায়। গোপেনের হার্টের কম্পন কী সুন্দর ও বিন্যস্ত! না, আর দেরি নয়। রাত এখন তিনটে। 'গীতা'টা টেবিলের ওপর রেখে রেখা চটপট কাজ আরম্ভ করে। ড্রয়ারে রাখা ডিসপোজাল সিরিঞ্জটা বার করে তৈরি করে নেয়। ব্যাগ থেকে দুটো অ্যাম্পুল বার করে এক মুহূর্তের জন্য টয়লেটে যায়—হাতটা একটু ডেটল-জলে ধুয়ে নিতে। দেওয়ালে আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়ে ভীষণভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। একি—কার চেহারা! কে ও? ফ্লোরেন্স! ন্‌না।—ন্‌না। "কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে, যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥" রেখা তাড়াতাড়ি রোগীর ঘরে ঢুকে পড়ে। অ্যাম্পুল ভাঙতে থাকে। অ্যাম্পুল ভাঙতে ভাঙতে গোপেনের দিকে তাকায়। সিরিঞ্জটা হাতে নেয় রেখা। ফ্লোরেন্স, তুমি দূরে যাও। ওহো, সেই ছবিটা ভেসে আসে কেন! রেখা সিরিঞ্জ বায়ুশূন্য করে। রেখা বড়ো সাইজের সিরিঞ্জ নিয়েছে। যাতে দুটো অ্যাম্পুলের ওষুধ সিরিঞ্জে ধরে যায়। রেখা ওষুধের নামটা দ্রুত পড়ে নেয়। সিরিঞ্জ বায়ুশূন্য করার পর ঘন ওষুধ টানতে থাকে। আবারও ছবিটা ফিবে আসে কেন! ফ্লোরেন্সের সেই ছবিটা। যেখানে ফ্লোরেন্স আহত সৈন্যদের মাঝখানে একটা মোমবাতির মতো দীপ্যমান দাঁড়িয়ে আছে!

ওহ্! ওষুধ টানতে এত সময় আজ কেন নিচ্ছে? রেখা ওষুধ টেনে সিরিঞ্জটা তুলে আলোর সামনে ধরে স্পিরিটে ভেজা তুলোটা আচ্ছন্ন গোপেনের বাহুতে ঘষে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় ও। নিজের দিকে তাকায়। যতখানি দেখা যায় ততখানিই দেখে নিজেকে। আবারও সেই অমোঘ ছবি প্রবল বৃষ্টির শব্দের মধ্যে মর্মান্তিকভাবে ফিরে আসে রেখার সমস্ত চৈতন্যে। রেখা এই আক্রমণ থেকে বাঁচবার আশায় দ্রুত সিরিঞ্জটা আবারও তুলে ধরে। শেষবারের মতো বায়ুশূন্য করার জন্য নিজের বুড়ো আঙুলে আলতো অন্তিম চাপ দেয়। কিন্তু রেখা বুড়ো আঙুল আর সরাতে পারে না। সেই আলতো ও অন্তিম চাপ কালকে হরণ করে নিরন্তর যতিহীন চেপে বসতে থাকে। ফলত সিরিঞ্জ উপচে যে বিষ গোপেনের রক্তেব সর্বত্র পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেই বিষ টপটপ উপচে পড়ে, গড়িয়ে যেতে থাকে রেখার আঙুল, হাত, বিছানার চাদরে।

যেন শেষবর্ষণ শুরু হয়। সেই বারিরাশির সীমাহীন, চরাচর বিস্তারিত প্রকম্পিত শব্দে রেখার আর্ত চিৎকার অপুর কানে পৌঁছায় না। □

নেকড়ে

সমীরকান্তি বিশ্বাস

আমি যেখানে থাকি সে জায়গাটা শহর নয়, শহরতলি। কলকাতার কাছেই শহরতলির এই অঞ্চলে কয়েক পুরুষ ধরে যারা বাস করছে তাদের অনেকেই নেকড়ের নাম শুনলে প্যান্ট পায়জামা ও কাপড়ে পেচ্ছাপ করে ফেলে। নেকড়ে এখন আর আগের মতো না। তবু নেকড়েকে এত ভয়! কেউ কেউ নেকড়েকে আর ভয় করে না। দশজনের মধ্যে নজন ভয় করে। একজন ভয় করে না। নেকড়ের আসল নাম হরিদাস। ওর মা-র দেওয়া নাম। মা-র ঠাকুর-দেবতায় অগাধ ভক্তি। সারাদিনই মুখে লেগে রয়েছে, হরি, হরি! আরও বেশি করে হরি-নাম করার জন্য ছেলের নাম রাখলেন, হরিদাস। ডাকার সময় বলতেন, হরি। নেকড়ের বাবা বলতেন, হরে। পাড়ার ছেলেরা-বুড়োরাও বলত, হরে। কিন্তু ও নাম হারিয়েছে। বড়ো হয়ে ও হয়েছে নেকড়ে। বড়ো হয়ে অনেকেই অনেক কিছু হয়। হরে হয়েছে নেকড়ে। পাড়ার ছেলেরা-বুড়োরা প্রথমে তো অবাক, ন্যালাখ্যাপা হরে নেকড়ে হয়েছে! কিছুদিন পর তারা মনেই করতে পারে না, ঠিক কবে থেকে তারা হরেকে নেকড়ে ভেবে ভয় পেতে শুরু করেছে! আমার ছেলে হরি আমার মনের মতো কিছু না হয়ে নেকড়ে হয়েছে—এই ভেবে দুঃখে দুঃখে নেকড়ের বাবা মারা গেলেন। শোকে-দুঃখে নেকড়ের মা-ও মারা গেলেন।

নেকড়ের দিন ফুরিয়েছে। নেকড়ে এখন আর সে-নেকড়ে না। অথচ নেকড়েকে দেখলেই ভয়, একরকম ভয়ে কারওর পা, গা ও হাত কাঁপতে শুরু করে, ঘামতে থাকে। এখন নেকড়েকে ভয় করার কোনও মানে হয় না, অনেকে তা জানে না।

অনেক দিন উধাও হয়ে থাকার পর নেকড়ে আবার পাড়ায় ফিরেছে। প্রায় বছরখানেক অন্য কোথাও কাটিয়ে নেকড়ে আবার ফিরেছে। অনেকেরই পুরনো কথা মনে পড়ে, সামনা-সামনি নেকড়েকে দেখলে জ্বরে-পড়া রোগীর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, কোনও রোগ-শোকের বালাই নেই এমন মানুষের ভয়ে জ্বর হয়। নেকড়ে এতদিন কোথায় ছিল! কেউ জানে না। সাহস করে কেউ জানতে চায় না। কিছুদিন পর অনেকেই জানতে পারে, ওর একটা হাত নেই। কী করে এমন হয়েছে! কেউ জানে না। সাহস করে কেউ জানতে চায় না। নেকড়ের একটা হাত কেটে ফেলা হয়েছে, বাঁ হাত। কবজি পর্যন্ত দস্তানা আঁটা নকল হাতটা আসল হাতের মতো দোলাতে দোলাতে সে পাড়ার রাস্তায় পায়চারি করে, ঘুরে বেড়ায়—তখন কেউ কেউ ফিস্‌ফিস করে বলে, 'নেকড়ে বাঁ হাত খুইয়েছে তো কী হয়েছে। ডান হাত তো ভাল, এক হাতেই নেকড়ে এখনও বাঘের খেলা দেখাতে পারে।'

নেকড়ে আবার ফিরে আসতে অনেকেই ভয় পায়। কেউ কেউ পাড়া ছেড়ে পালায়। কেউ কেউ ভাবে, দু-চারদিনের মধ্যেই পালিয়ে যাবে। কারওর কারওর রাতে ভালো ঘুম হয় না। বাবা-রা, মা-রা ছেলেমেয়েদের কাছছাড়া করতে ভয় পায়। বউরা স্বামীদের সাবধান করে। স্বামীরা বাজার করতে বেরিয়ে রেশন দোকানের লাইনে দাঁড়ায়, রেশন আনতে বেরিয়ে বাজার চলে যায়, অফিসে যেতে গিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, টালা যেতে টালিগঞ্জের ট্রামে চড়ে—এইভাবেই সবকিছু ওলোটপালট হয়ে যায়।

নেকড়েকে অনেকেই ভয় করে। কেউ কেউ এখন আর ওকে ভয় পায় না। কুড়িজনের মধ্যে আঠারোজনই ওকে ভয় করে. দু-জন ভয় করে না।

নেকড়ে ফিরে আসার পর একদিন আমাদের আড্ডায় হাজির হয়। সে দিন সকলেরই ছুটি বলে আড্ডায় অনেকেই হাজির। রাম খারাপ, যদু ভালো, যদুর ভোরে ঘুম ভাঙে, রামের দেরিতে, রাম বাজার করে না, যদু করে, যদু কম খায়, রাম বেশি, হরির জামাকাপড় ফরসা, মধুর ময়লা, হরি লেখাপড়া জানে, মধু মূর্খ, রামেব অফিস দশটায়, যায় বারোটায়, যদুর অফিস দশটায়, যায়ও দশটায়, শ্যামের মেয়ের বড়ো অসুখ, ডাক্তার দেখাবার টাকা নেই, শ্যাম টাকা ধার করতে বেরিয়েছে, শুধু আড্ডা না দিয়ে একটা নাটক-টাটক করলে তো হয়, অকশন বা কন্ট্রাক্টের কমপিটিশন করলেও খারাপ হয় না, দাবার কথাও ভাবা যাক ইত্যাদি ও অন্যান্য মামুলি-খেজুরে আলাপে আড্ডা জমজমাট—হঠাৎ দেখি নেকড়ে দাঁড়িয়ে। কাছেই। ওকে দেখেই আমরা ঘামতে থাকি। ভয়, একরকম ভয়েই আমাদের এ-অবস্থা। আমরা বলার মতো কথা খুঁজে পাই না। ও দাঁত বের করে হাসে। হাসতেই থাকে। আমরা আরও ভয় পাই। আরও ঘামি। ভয়ে ঘেমে নেয়ে একশা। দেখি, নেকড়ের অনেক দাঁত নেই। পড়ে গেছে! দেখি আর ঘামি। দেখি, ওর কপালের বাঁ দিকটায় বাঁ চোখের ওপরে একটা ফুটো। এই ফুটো দিয়ে ও সিগারেটের ধোঁয়া বের করে—দেখি আর ঘামি। হঠাৎ, একজন প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলে। ভয়, একরকম ভয়েই তার এ-অবস্থা। নেকড়ে ভাবে, এখনও আমার দাপট আছে! ভাবতে ভাবতে আমাদের আড্ডা ছেড়ে চলে যায়, অন্ধকারে মিশে যায়। আড্ডার কয়েকজন ভয় পায়নি, ঘামেনি। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নেকড়েকে দেখেছে। তিরিশজনের মধ্যে সাতাশজন ভয় পেয়েছে, ঘেমেছে। তিনজন ভয় পায়নি, ঘামেনি।

নেকড়েব যৌবন ফুরিয়েছে। চল্লিশ পার-হওয়া নেকড়ে এখন আর গায়ে-গতরে তেমন না, আগের মতো না। এখন সে এত রোগা যে কণ্ঠার হাড় দেখা যায়, স্পষ্ট। নেকড়ের শরীরে অনেকরকম অভিজ্ঞতাব ছাপ, অনেক পাপ কাজ করার ছাপ তার চোখে-মুখে স্পষ্ট। মানুষ মারার অভিজ্ঞতা, মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা, ছুরি খাওয়া, গুলি লেগে জখম হওয়া, ছুরি মারা—এমন আরও। হোল্ডার থেকে বালব খুলে আনার মতো চোখের মণি উপড়ে আনতে হাতের তেলো-আঙুলের বিশেষ মুদ্রা। নেকড়ের নিজের চেষ্টায় শেখা কায়দা।

এখন নেকড়ের মনে সুখ নেই। তার অনেক দুঃখ। কারওর চোখ উপড়ে আনার মতো অত জোর আব তার নেই। ও এখন কারওব বুকে ছুরি বসাতে পারে না, ছুরির বাঁট ঠিক মতো ধরতে পারে না, ফসকে যায়। ও এখন বোমা ছুড়তে পারে না। রামকে মারতে শ্যামের গায়ে বোমা ছোড়ে। নেকড়ে এখন ভালো করে মুঠো পাকিয়ে চেম্বার ধরতে পারে না। রামকে গুলি করতে শ্যামকে গুলি করে। তা ছাড়া, চেম্বারটাও হাতছাড়া। নেকড়ের এ অবস্থার কথা অনেকেই জানে না। কেউ কেউ জানে।

নেকড়ে এখন বড় অসহায়—সবাই না, কেউ কেউ বুঝতে পারে, নেকড়ের একটা পা নেই, বাঁ পা। নেকড়ের বাঁ পা যে নকল তা বোঝার জো নেই। কেউ কেউ ফিসফিস করে বলে, নেকড়ের বাঁ পা খুইয়েছে তো কী হয়েছে, ডান পা তো ভালো, একটা পা দিয়েই নেকড়ে এখনও ভেলকি দেখাতে পারে—ভয়, ভয় একরকম ভয়েই তাদের এ-অবস্থা। আগের মতো এখনও অনেকেই বলে, 'নেকড়েকে ঘাঁটিও না, নেকড়ের পেছনে..... আছে—তারা কিছুতেই ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। নেকড়েকে ঘাঁটিও না, ওর পেছনে.... আছে, নেকড়েকে ঘাঁটিওনা, ওর পেছনে আছে..... ভয়-পাওয়া মানুষদের এ-সব কথার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, তারা যা দেখেছে, তা কিছুতেই ভুলতে পারে না, তাদের চোখের সামনেই হয়েছে, দিনেরবেলাই, 'এই শালা, কালকেই আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাবি' বলতে বলতে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে ছেলেদের হাত। অনেকেই দেখেছে। কেউই টু শব্দটি করেনি। তখন নেকড়ের ভয়ে অনেক ছেলেই পাড়া-ছাড়া। পালিয়ে-যাওয়া ছেলেদের কেউ কেউ ফিরেছে। কেউ কেউ ফেরেনি। কেউ কেউ কোনওদিন ফিরবে না।

নেকড়ের এখনকার দুরবস্থার কথা কজন জানে। অনেকেই জানে না। কেউ কেউ জানে। কজন জানে, নেকড়ে রাতে নেকড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে লটারির টিকিট কেনে। অনেকেই জানে না। কেউ কেউ জানে। জানে, নেকড়ে রাতে ঘুমোতে পারে না। ভয়, ভয়, একরকম ভয়ে সে ঘুমোতে পারে না। ঠিক ঘুমিয়ে থাকা নয়, আবার ঠিক জেগে থাকাও নয়—এমন একটা অবস্থায় তার রাত কাটে। কিন্তু, তার দিন কাটতেই চায় না। এ-সব খবর অনেকেই রাখে না। কেউ কেউ রাখে—তারা আর নেকড়েকে ভয় পায় না। চল্লিশজনের মধ্যে ছত্রিশজন এখনও নেকড়েকে ভয় করে। চারজন ভয় করে না।

নেকড়েকে এখনও যারা ভয় করে তারা আগের আগের ঘটনাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারে না। হাতিবাবুর নাতনির আঁচল ধরে কে টেনেছিল! নেকড়েই তো! না, নেকড়ের চেলারা! হাতিবাবুর সুন্দরী নাতনিকে তারা ল্যাংটো করে ফেলেছিল—দিনের আলোতেই হয়েছিল ঘটনাটা। কেউ টু শব্দটি করেনি। এ-সব অনেকেই ভুলতে পারে না। 'স্‌শালা, বল, আমাদের বাড়ির দেওয়ালে কে লিখেছে, নেকড়ের মাথা চাই, নেকড়েকে খতম কর, স্‌শালা নকশা.......' বলতে বলতে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে যাদের হাত তাদের অপরাধ, তারা সমাজকে নতুন করে সাজাতে চায়। তাদের হাত ভেঙে ফেলার মটমট আওয়াজ ও নেকড়েদের হাসির বিচ্ছিরি শব্দ—অনেকেই দেখছে। কেউ টু শব্দটি করেনি।

এখন নেকড়ের দিন শেষ। তার বড় দুর্দশা। কিন্তু অনেকেই তা জানে না। কেউ কেউ জানে—তারা আর নেকড়েকে দেখে ভয় পায় না। একশোজনের মধ্যে নব্বইজন নেকড়েকে ভয় করে। দশজন নেকড়েকে আর ভয় করে না—তারা নেকড়ের সবকিছু জেনে ফেলেছে। এই দশজন একদিন নেকড়েকে তাড়া করে। তাড়া-খাওয়া নেকড়ে ছুটতে ছুটতে—

শহরতলির যেখানে ময়লা খালের শুরু, সেখানে আমাদের পাড়া শেষ। কেউ কেউ নয়, একদিন সবাই দেখল, সেখানে নেকড়ে মরে পড়ে রয়েছে। তখন ভোর। লালে-ফিরোজায় মাখামাখি আকাশ। হাঁ-মুখ নেকড়ের জিভটা অনেকটা বের করা, মনে হয়, কেউ টেনে বের করে দিয়েছে। চোখের গুলি দুটো নেই। মনে হয়, কেউ উপড়ে ফেলেছে। মুখটা থ্যাঁতলানো। হাত, পা ও গা-র মাংস জায়গা জায়গা থেকে খুবলে নেওয়া হয়েছে। মরে যাওয়ার পর আরও ভয় পাওয়ার মতো চেহারা হয়েছে তার। নেকড়ের মড়া দেখে কেউ বলে, বেচারা! কেউ ফিসফিস করে, বেচারা আবার কী, জানো না, নেকড়ে কত ছেলের চোখের মণি উপড়ে এনেছে! একজন হঠাৎ বলে ফেলে, আহারে! অনেকেই একসঙ্গে ফিসফিস করে বলে, 'আহারে আবার কী, জাননা, নেকড়ে কত ছেলের জিভ টেনে বের করে এনেছে।

নেকড়ের মড়া নিয়ে কোনও শোকমিছিল বেরল না। কেউই বলল না, নেকড়ে শহিদ হয়েছে, ওকে মনে রাখার জন্য শহিদ বেদি তৈরি করতে হবে। অনেকেই বলল, নেকড়ে যাদের খুন করেছে তাদের নামে এবার শহিদ-বেদি তৈরি হবে যা নেকড়ের ভয়ে এতদিন হয়নি।

সেদিন নেকড়ের মড়া অনেক বেলা পর্যন্ত ময়লা খালের পাড়ে পড়েই রইল। □

চিহ্ন

হীরালাল চক্রবর্তী

সকালবেলা কাগজ খুলতেই চমকে গেলাম।

একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় মাঝারি আকারের সংবাদটি যেন দাউ দাউ করছে।

শিরোনাম : পিস্তলের গুলিতে আসামির আত্মহত্যা। বিববণে দিয়েছে, নিহত গুণীন্দ্র রায় ডুয়ার্সের একজন ফেরারি আসামি। পুলিশের নজর এড়িয়ে বহুকাল সে আত্মগোপন করেছিল। অবশেষে একটি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কলকাতাব একটি পুরোনো বাড়িতে হানা দেওয়ায় আসামি নিজের পিস্তলে গলায় গুলি করে। পুলিশেব ধারণা আসামি পালাবার কোনও চেষ্টা না করেই আত্মহত্যা করেছে। তাকে সম্পূর্ণ মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার স্ত্রী রূপা রায় পালিয়ে গেছে।

যে কোনও পাঠকের কাছে আজকাল এ সংবাদের তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু আমার সমস্ত শরীর যেন বরফ হয়ে গেল। এ কী কবে সম্ভব! শুধুমাত্র ধরা পড়বার ভয়ে গুনিন আত্মহত্যা কবল আর রূপা গেল পালিয়ে! জীবনের সঙ্গে এতবড়ো চ্যালেঞ্জ করেও শেষ পর্যন্ত ওরা পিছিয়ে গেল এইভাবে?

মাথাটা আমার ঝিমঝিম করে উঠল। ওরা তো এভাবে হাবতে চায়নি। বিশেষ করে রূপাব মতো মেয়ে যে এমন করে পালিয়ে যাবে, ভাবতেও বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম।

এই সে দিনও ঠাট্টার ছলে প্রশ্ন কবতে বলেছিল—এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে সন্তুবাবু? যখন ওর ধর্ম মেনে নিয়েছি পথ তো মেনে নিতেই হবে। পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই ওঠে না।

বলেছিলাম—ও যদি কোনওদিন ধরা পড়ে আপনি কী করবেন?

—নিজেকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারব না।

মাত্র সাতদিন আগেও দেখে এসেছি ওদের দাম্পত্য ছবিটা। বড়ো দুঃখের আর কষ্টের ছবি সেটা। জীবনের যে পথটায় ওরা নেমে এসেছিল তা সত্য হোক মিথ্যা হোক, বড়ো কঠিন তার পরীক্ষা। অথচ কী নিদারুণ ধৈর্যে স্নেহে মমতায় পরস্পরের বুকের উত্তাপে মনের শান্তিতে ওদের বেঁচে থাকতে দেখেছি।

মনে পড়ছে গুনিন একদিন বলেছিল—তোবা গোঁড়ারা শুনলে হয়তো চমকে উঠবি, রূপাকে আমি বিয়ে করিনি। অর্থাৎ যে অর্থে তোরা বিয়ে বলিস তা হয়নি। এমনকি মালা বদলও নয়। অথচ আমরা দুজনে দুজনের কাছে বাঁধা হয়ে গেছি। তাকে স্বামী-স্ত্রী হওয়া বলে কি? কী বলে জানি না। যদি তার চেয়েও বেশি কিছু থাকে তো তাই। মনের কাছে আমাদের কোনও ফাঁকি নেই। কুড়িতলা বিল্ডিঙেব ভিতের মতোই তা শক্ত আর মজবুত।

ওদের বিয়ে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। এমনকি চমকেও উঠিনি। সত্যি বলতে কি ওদের ওই অতি ভয়ঙ্কর দুর্দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মনে হয়েছিল গুনিন যত ভুলই করুক, যত দুঃখই টেনে আনুক জীবনে, তবুও ওর বাঁচার সার্থকতা রূপাকে পেয়ে। রূপা না হলে গুনিনের অস্তিত্বের হিসেবই হয়তো মেলানো কঠিন হত আজ।

ভাবতে পারি না সেই রূপাই শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদে অসহায় অসুস্থ গুনিনকে ফেলে একজন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো পালিয়ে যায় কেমন করে! যদি সেই গোপন নথিপত্রের প্রশ্ন থাকত, যে ওগুলোর জন্যই সে পালাতে বাধ্য হয়েছে, তাও নয়। ওগুলোর কোনও মূল্যই রূপার কাছে ছিল না। গুনিনকে অহেতুক উদ্বিগ্নতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই ওগুলো আমার হাতে তুলে দিয়েছিল সে। সাতদিন আগে আমি সেগুলো

নিয়ে এসেছি। তা হলে? রূপা কি শেষ পর্যন্ত বাঁচার মোহ ছাড়তে পারেনি? তাই কি এতদিনের সেবা ক'ষ্ট প্রতিজ্ঞা পায়ে মাড়িয়ে পালিয়ে গেল?

আশ্চর্য মানুষের মন!

চুপচাপ ভাবতে লাগলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি অভিভূত। মনের মধ্যে একটা পোকা ক্রমাগত যন্ত্রণা দিতে লাগল। ওদের মত বা পথ হয়তো আমি মানি না কিন্তু ওদের জীবনের মধ্যে এসে আমি চমকে গিয়েছিলাম। জীবনকে দাম দেওয়ার মতো এতবড়ো নিষ্ঠুরতা বোধ হয় সংসারে আর কিছুই নেই। হয়তো জীবনকে ভালো না বাসলে এ মূল্য দেওয়া যায় না। কিন্তু নিষ্ঠার এমন অপচয়, বিশ্বাসের এত বড়ো আত্মহনন আমাকে আঘাত করে। গুনিনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি অনেক।

—তোদের এ পথ ভুল। এমনি করে দেশে বিপ্লব আসতে পারে না।

—পারে।

গুনিন তর্ক করে। প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে থাকে তার মুখ। সে বলে—এ ছাড়া বাঁচার পথ আর সামনে নেই।

আমি বলি—বিশ্বাস করি না। প্রস্তুতিহীন সংগ্রাম বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে টেবিলে ঘুঁষি মেরে বলে—মানুষ প্রস্তুতই আছে, শুধু নেতৃত্ব নেই।

—ঘোড়ার ডিম।

গুনিনকে ভালোবাসতাম। কিন্তু মন দিয়ে কোনও দিন ওর মতকে বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই যখন ওর কথা ভাবি একটা গভীর দুঃখে বুকটা টন টন করে ওঠে।

আজ ভাবি এই পরিণতি ডেকে আনার কী দরকার ছিল? এমনিভাবে জীবনকে শেষ করে দেওয়ার অধিকার কি তার আছে? আর রূপা? সে তো সেই সাধারণ সত্যের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। লোভ আকাঙ্ক্ষা ভীরুতার উপরে তো সে উঠতে পারল না! বেচারা গুনিন!

কত কথাই মনে পড়তে লাগল। বিচ্ছিন্ন স্মৃতিগুলো যেন ভিড় করে সামনে এসে দাঁড়াল।

একদিন সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে দেখি গুনিনের চিঠি। ঠিক চিঠি নয় চিরকুটের মতো। লেখাটাও গুনিনের নয়, মেয়েলি হাতের। লেখা : সন্তু আমি ফিরে এসেছি। নীচের ঠিকানা মতো অবশ্যই চলে আসিস সন্ধের পর। দোতলার ডানদিকে একেবারে শেষ ঘরখানা। খুব জরুরি। গুনিন।

মনে মনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। আর দেরি সইল না। তখুনি ছুটলাম। একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গলির মধ্যে দম-বন্ধ-হওয়া ঘরে আচমকাই ওকে দেখে ভয়ানক চমকে গেলাম। এই কি গুনিন। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল আর দাড়িতে মন হচ্ছিল যেন বহুকাল ও কোনও অন্ধকার খুপরিতে বন্দী ছিল। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হাত দুটো শীর্ণ শীর্ণ রগের সুতো দিয়ে প্যাঁচানো।

—চমকে গেলি? এর চেয়েও বড়ো বড়ো চমকানো জিনিস রোজ এ দেশে পয়দা হচ্ছে।

বললাম—এমন হল কী করে? অ্যাদ্দিন ছিলি কোথায়?

ও বললে—বলছি। তার আগে রূপার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। রূপা আমার স্ত্রী।

রূপা বললে—আর আপনার কথা ওর কাছে এত বেশি শুনেছি যে নতুন করে পরিচয়ের দরকার নেই। বসুন, চা করে আনি।

রূপা চলে যায়। গুনিন বলে—দমটা এখনও আছে কেবল ওর জন্যেই। নইলে বেঁচে থাকার কথা নয়।

—কিন্তু এমন হল কী করে?

—ও হাসল। হোয়ার দেয়ার ইজ এ লাইফ দেয়ার ইজ এ স্ট্রাগল। বিশ্বাসের শক্তিতে এখনও দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু যাক ওকথা, যে জন্যে তোকে ডেকেছি—

হঠাৎ থেমে ও চুপ করে রইল। তারপর এক নিশ্বাসে বললে—এখানে আত্মগোপন করে আছি। কদ্দিন থাকতে পারব জানি না। তোকে একটা কাজ করতে হবে। খুব কঠিন কাজ। তোকে ছাড়া আর কাউকে বলা যায় না। আমি জানি আমাদের পথ তুই মানিস না, কিন্তু এও জানি আমার সঙ্গে বেইমানিও করবি না। জীবন থাকতে এ কথা প্রকাশ করবি না, এমনকি বউয়ের কাছেও না।

অধৈর্য হয়ে বললাম—কথাটা কী বল না।

ও কতক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। শেষে বললে—কয়েকটা ম্যাপ, অ্যাড্রেস আর কিছু গোপন নির্দেশপত্র নিয়ে তোকে নর্থ বেঙ্গল যেতে হবে। পারবি না?

আমি চুপ করে রইলাম। এ যে কী অসম্ভব ব্যাপার তা ওকে বোঝানো কঠিন। ও বললে—পারতেই হবে। নইলে সব বানচাল হয়ে যাবে। বিভূতিদা হয়তো পাগলের মতো জঙ্গল খুবলে ফেলছে।

রূপা চা দিল। চা খেলাম। কিন্তু একটা কথাও বললাম না। গুনিন অস্থিরভাবে বলে—বল্, তাড়াতাড়ি বল্।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী? বিভূতিদাই বা কে আর কেনই বা যাব? সব খুলে বল।

—হু। তা হলে শোন—

ওর কথা শুনতে শুনতে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে গেল। গুনিন না হলে হয়তো একটা বানানো গল্প বলেই মনে করতাম। ওকে যতটা জানি বানিয়ে বলার স্বভাব ওর নয়। তা ছাড়া ওর জীবনটার দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস করারও উপায় ছিল না।

ও যা বলল তা সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই যে, ঘুরতে ঘুরতে ডুয়ার্সের একটা চা-বাগানে গিয়ে হাজির হয় ও। এবং একটা নিতান্ত পরিশ্রমের কাজও জুটে যায়। কিন্তু ক মাস যেতে না যেতেই মন বিষিয়ে ওঠে ওখানকার অফিসারগুলোর বিরুদ্ধে। যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ-স্ফূর্তি সব তাদের একচেটিয়া। আর শ্রমিকরা শুধু উদয়াস্তের যন্ত্র। ন্যায্য পাওনাব বদলে ছাঁটাইয়ের ভয়। শ্রমিকদের দিকে তাকাবাব মতো তেমন শ্রমিক সংগঠনও সেখানে নেই। যা-ও আছে, তা মালিকদের তোষণের কাজে ব্যস্ত, শ্রমিকদের সুখ-দুঃখ বোঝবার মতো সেখানে কেউ নেই।

এই সব দেখেশুনে ওর মেজাজ তেতে উঠল। অতীন বর্মন ছিল ওর সহকর্মী। সে-ই একদিন ওকে বিভূতিদার কাছে নিয়ে গিয়ে দীক্ষা নেওয়ায়। অনেক বাজিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভূতি ওকে দলে ভর্তি করে নেন। তারপর বিভূতিদার নিদেশে ওরা চা-বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়। সমস্ত চা-বাগানে অফিসারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোই ছিল এই নির্দেশের উদ্দেশ্য। যাতে চা-শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পেয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয।

এর ক দিন পরেই অতীন অস্ত্রসমেত বীরপাড়ার কাছে ধরা পড়ে গেল। পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় গুলি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে অতীন। আর সে ওঠে না।

রাগে আক্রোশে মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে ওঠে গুনিনের। রূপার চোখে জল, তবু সে হাত চেপে ধরে গুনিনের—না!

—না রূপা। জীবন দিয়ে যা বিশ্বাস করি তা আমাকে পুরোপুরি এখন করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

—কিন্তু—

রূপার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে নামে।

—তোমাকে আমি ভুলব না রূপা। যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয়ই ফিরব। যেতে আমাকে হবেই। মাথায় আগুন জ্বলছে।

রূপার হাত ছাড়িয়ে অন্ধকারে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় গুনিন। রূপার চোখের জলের মধ্যে ঘরের জিনিস ভাসতে থাকে।

একা নিস্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন আর গুনিনের স্পর্শ করা জিনিসগুলোর মাঝখ

তারপর অনেকদিন গুনিনের খোঁজ নেই। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে চা কোয়ার্টার্সের মাঠে দুজন অফিসারের কাটা মুণ্ডু গড়িয়ে পড়ল। রূপা জানত গুনিন আছে ওর মধ্যে।

প্রতি রাত্রে গুনিনের আশায় রূপা জেগে বসে থাকে। কখনও কখনও বাতাসের ঘায়ে দরজা নড়ে উঠলে সে চমকে ওঠে। দরজা খুলে হতাশ হয়ে দেখে কেউ নেই, শুধু অন্ধকার মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু গুনিন আসবে। যদি বেঁচে থাকে নিশ্চয়ই সে আসবে। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো আসবে না। আসা কি সহজ?

কিন্তু একদিন সত্যিই গুনিন এল। তবে আর এক গুনিন। আহত বিপর্যস্ত অসহায় গুনিন। পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে কোনওমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে কিন্তু আঘাত এড়াতে পারেনি। পায়ের হাড়ে গুলি লেগেছে। দু দিন একটা জঙ্গলের গর্তে পড়ে ছিল।

রূপার সামনে সমস্ত পৃথিবী তখন দুলছে। কী করবে সে? আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি ভোর হতে। অসহায় মানুষটার সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন ওর হাতে। কী করবে এখন রূপা? কোথায় যাবে ওকে নিয়ে? পালাবে? কিন্তু কোথায়? কেমন করে পালাবে? কিছুই তার মাথায় ঢোকে না।

অথচ ভাববারও আর সময় নেই। রূপা আর ভাবতে পারল না। দিনের আলো ফোটবার আগে গুনিনকে নিয়ে পালাতে না পারলে সে ধরা পড়বে।

রূপা আর দেরি করে না। গুনিনকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

তারপর সে কী অমানুষিক জীবন শুরু হল ভাবা যায় না। একটা গণ্ডগ্রামের গোপন আশ্রয়ে রূপার সেবা আর অখ্যাত এক ডাক্তারের আন্তরিক চিকিৎসায় গুনিন একটু সুস্থ হল। কিন্তু শরীরের সমস্ত রস যেন শুষে নিল ক মাসের যুদ্ধ। ডান পা-টা অকেজো হয়ে গেল জন্মের মতো।

তবু রূপার মনের তাপ আর আন্তরিক সেবায় কষ্টের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। সেখান থেকে হঠাৎ একদিন পালাতে হয় পুলিশের ভয়ে।

পরিশ্রম অনাহার দুশ্চিন্তায় দুজনের অবস্থাই তখন শোচনীয়। কিন্তু রূপা বুঝি মরণপণ করেছে গুনিনের জন্য। গুনিনকে সে হারতে দেবে না। গুনিন বুঝতে পারে না মেয়েটা কিসের জোরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের একটু হাসির যে কত মূল্য, কত উজ্জীবন শক্তি সে অনুভব করত সে সময়। তোরসার তীরের সেই নির্জন আস্তানাটা যখন তার নির্বাসনের দ্বীপের মতো মনে হত, তখন বালিশের নীচের থেকে কতকগুলো কাগজ টেনে এনে অস্থিরভাবে বিড়বিড় করত—এগুলো বিভূতিদাকে পৌঁছে দিতে হবে। কী করে দেব?

রূপা সস্নেহে মাথায় হাত রাখত। বেঁচে যখন আছ নিশ্চয় ফেরত দেবে। অত ভাবছ কেন?

কিন্তু কবে দেব? এ যে বড়ো জরুরি জিনিস। পার্টির ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওঃ, আর মাত্র একটা দিন বাকি ছিল। তারপরই আমরা থানা আক্রমণ করতাম।

—থাক, আর ও কথা ভেবে কী হবে?

তার রুক্ষ চুলের মধ্যে হাত বোলায় রূপা। সে টের পায় গুনিনের চোখ জলে ভাসছে। গুনিন কি কাঁদছে? পরাজয়ের কান্না? রূপা সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না। কোনও সান্ত্বনার ভাষা নেই।

সেখান থেকেও আচমকা একদিন সরতে হল। খেয়ার মাঝি লুকিয়ে খবর দেয় তোমরা পালাও, পুলিশ খুঁজছে।

কিন্তু এখানে এসেও কি স্বস্তি আছে! একটা খাঁচায় যেন বন্দী হয়ে গেছে সে। বেরবার উপায় নেই যতই বোঝে, ততই ছটফটিয়ে ওঠে। কে বিভূতিদার কাছে কাগজগুলোকে পৌঁছে দেবে? ভাবতে ভাবতে আমার কথাই ওর মনে এল। আমার পক্ষে নাকি এটা সম্ভব।

সব শুনে আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও বললে—পারবি না? যদি না পারিস তো চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে। বল পারবি—বল?

চিরকালের অধৈর্য গুনিন সব কথা এক দমে শেষ করে হাঁপাতে লাগল। আমি বললাম, অত উত্তেজিত হোস না। একটু চুপচাপ বোস।

উঠে আসবার সময় বলে—পরশু আসিস। সব রেডি করে রাখব।

ও ধরেই নিয়েছে আমি রাজি। হয়তো মুখের দিকে চেয়ে রূপা কিছু টের পেয়েছিল। আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল।

বললে—আমি জানি আপনি খুব ভাবনায় পড়েছেন। পড়াই স্বাভাবিক কিন্তু যা অসম্ভব তা নিয়ে অযথা ভেবে কী লাভ? আপনাকে যেতে হবে না। তবে রাজি হয়ে যাবেন।

একটু থেমে বললে, বিভূতিদার কাছে যাওয়া, কাগজ পৌঁছে দেওয়া, সবই ছেলেমানুষি ব্যাপার। বিভূতিদা চার মাস আগে ধরা পড়েছেন! ওকে জানাইনি। আঘাত দিলে হয়তো আর ওকে পাব না।

বলতে গিয়ে রূপার গলাটা ভেঙে গেল। আমি বললাম—ওকে আমি ভালোবাসি। এর বেশি আর একটা কথাও আমি বলতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে।

রূপার কথা ভাববার আর প্রবৃত্তি হল না। সমস্ত মনটা তার বিরুদ্ধে ধিক্কার দিতে লাগল।

ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ঢুকতেই থমকে গেলাম। রূপা বসে আছে। আমাকে দেখেই মুখ তুলে তাকাল। চমকে যাওয়ারই কথা। এই কি রূপা! দু দিনেই যেন বুড়ি হয়ে গেছে। তবুও মায়া হল না। মনটা যেন আরও জ্বলে উঠল।

জিভের ডগায় সমস্ত বিষ জড়ো করে বললাম—এখনও এখানে আছেন? পুলিশ ধবলে?

কোথায় যাব বলুন? আপনার সঙ্গে দেখা না করে তো যেতে পারি না।

—আমার সঙ্গে কী? স্বরটা বেশ কর্কশই শোনাল। বেশ করেছেন! গভীর বিশ্বাসের ভালোবাসার উপযুক্ত জবাবই দিয়েছেন। আর কী চাই?

রূপা আমার মুখের উপর কতক্ষণ চেয়ে রইল চুপ করে। তারপর ধীরে ধীরে বললে—পিস্তলটা ওর বালিশের নীচেই রাখা ছিল। ওর হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করিনি। ও যখন গুলি করল তখন পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। পালানো ছাড়া আর কী উপায় ছিল বলুন?

—হ্যাঁ, এক যাত্রায় পৃথক ফল করতে এ ছাড়া উপায় কী? জিভ না হয়ে যদি তরবারি হত তার গলাটা নেমে যেত। কিন্তু রূপার তাতে কোনও ভাবান্তর হল না। সে তেমনি বিষণ্ণ গলায় বললে—সেটাই ছিল আমার একমাত্র পথ।

আর সহ্য হল না।

বললাম—আসলে আদর্শ-ফাদর্শের চেয়ে সাধারণ সুখটাই হল আপনার কাছে সত্যি? বড়ো বড়ো কথা আসলে সবই লোক দেখানো? অসহ্য লাগছিল, চলে যেতেন লুকিয়ে। ও তো এমনিতেই মরে যেত। পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার কী দরকার ছিল?

কী জানি! যখন বুঝলাম গুলিটা ওর পরে আমার বুকে রাখা উচিত তখন হঠাৎই সমস্ত মন আমার বিদ্রোহ করে উঠল। ভেতর থেকে কে যেন বললে, মাতৃত্বকে এত বড়ো অপমান করার অধিকার কারও নেই। যার আদর্শ ভালোবাসায় জীবন সঁপে দিয়েছ তারই বংশধরকে খুন করার অধিকার তোমার নেই। ওর চিহ্ন মুছে ফেলতে তুমি পারো না।

কে যেন শপাং করে আমার মুখে আঘাত করল। রূপা দু হাতে মুখ ঢেকে এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ওকে কিছু বলতে পারলাম না। শুধু উপুড় হওয়া শরীরটার দিকে অসহায় বিপন্ন মুখে তাকিয়ে বসে রইলাম।

একটু পরে ও চোখ মুছে সোজা হয়ে বললে—ওর সন্তানকে আমি বাঁচিয়ে রাখব সন্তুবাবু। ওর সন্তানকে অন্তত যেন সত্য পথে তৈরি করতে পারি। কাগজগুলো আপনি পুড়িয়ে ফেলবেন।

বললাম—কোথায় যাবেন?

—তা জানি না। কিন্তু কোথাও তো যেতেই হবে। তিল তিল করে তৈরি করতে হবে সত্যকে। বাঁচতে আমাকে হবেই।

ও উঠে দাঁড়াল। আর কিছু জিজ্ঞাসা করার স্পর্ধা আমার হল না।

অন্ধকার নিঃশব্দ গলিটায় ও নেমে যাওয়ার পরেও আমি পাথরের মতো বসে রইলাম। ■

শবসাধনা

শৈবাল মিত্র

ঘরের মাঝখানে জ্বলছে দুটো জোরালো স্পট লাইট। মেঝেটা ভেসে যাচ্ছে আলোয়। আগুনের মতো চোখঝলসানো সে আলো।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বেঞ্চে সুমন বসে আছে। সে জায়গাটা অন্ধকার। ধোঁয়াটে অন্ধকারে সুমনকে আবছা দেখা যায়। জোরালো আলোর ঠিক নীচে দুটো টেবিল। কিছুটা ছাড়াছাড়া। দুটো টেবিলের ওপর একটা লোহার রড। সেই রড থেকে শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে ব্রততী ঝুলছে। ব্রততীর ভাঁজকরা হাঁটুর মধ্যে রয়েছে রডটা। গোড়ালি আর উরু শক্ত করে বাঁধা, যাতে ও পড়ে না যায়। ব্রততীর শাড়িটা একটা টেবিলের ওপর তালপাকানো পড়ে আছে। ব্রততীর পরনে এখন শুধু একটা শায়া, ব্রততীর এখন জ্ঞান নেই। সুমন সুস্থ স্বাভাবিক। গায়ে আঁচড় পড়েনি তার। ইন্সপেক্টর সমাদ্দার জানে এই কেসে মারধোরে কাজ হবে না। ঘণ্টাচারেক আগে সমাদ্দার নিজের বাহিনী নিয়ে সুমনকে ধরেছে। ছোঁড়াটা যেন পাঁকাল মাছ, মুঠোয় এসেও বেশ কয়েকবার ফসকে গেছে। রাগে সমদ্দারের শরীর রি-রি করে। আপাতত সেটা জমা থাকে। এখন আসল খবরটা চাই। সকালের আগেই জানা দরকার।

সুমনের ধরা পড়ার কথা প্রচার হয়ে গেলে বড়ো শিকারটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেটা দলের চাঁই। তাকে ধরতেই হবে। সে লোকটার যথার্থ হদিস এই সুমনই দিতে পারে। তাই সুমন ধরা পড়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর স্ত্রী ব্রততীকেও তুলে আনতে হয়েছে। যে পুজোয় যে মন্ত্র! অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ইন্সপেক্টরকে শিখতে হয়েছে এ সব।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘরের দরজার পাশে পাখার তলায় চেয়ারে ইন্সপেক্টর বসল। রুমালে কপালের ঘাম মুছে ব্রততী আর সুমনের দিকে পরপর তাকাল। সামনের টেবিলের ড্রয়ার খুলে রামের বোতলটা বার করে সমাদ্দার দেখল মাল প্রায় শেষ। বোতলে মুখ লাগিয়ে দু চুমুক খেল। আজকাল আর গলা জ্বলে না।

স্কুলে পড়ার সময় প্রথম মদ খেয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল বাবার কাছে। তারপর সে কী বেদম মার! ঠোঁট, মুখ ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। অথচ বাবা নিজে হপ্তায় সাতদিন মাল টেনে চুরচুর হয়ে থাকত। কী এক রাগে সমাদ্দারের শরীর টাটিয়ে ওঠে। প্রায় খালি হয়ে আসা বোতলটা নিয়ে আবার গলায় ঢালে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের বেতটা হাওয়ায় একপাক ঘুরিয়ে নেয়। হাওয়ায় শিসধ্বনি জাগে সুঁই, সুঁ....ই।

সুমন লক্ষ করছে তাকে। কিন্তু ব্রততীর দিকে তাকাচ্ছে না। সমাদ্দার ভাবে, আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওষুধ ধরবে। তখন পায়ে লুটিয়ে পড়ার পথ পাবে না।

এখন প্রায় রাত একটা। চারপাশ চুপচাপ, অন্ধকার। শুধু এই বিরাট লাল বাড়িটির তিনতলার দুটো হলঘরে আলো জ্বলছে। নীচের রাস্তায় দু-একটা গাড়ির শব্দ। ইন্সপেক্টর সমাদ্দার খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে ধোঁয়া আর কুয়াশায় চাপবাঁধা অন্ধকার। অন্ধকারই ভালো। অন্ধকার না হলে এ সব কাজ হয় না। রাত ঘন হলে মানুষের স্নায়ু শিরা ক্লান্ত, অসাড় হয়ে যায়। মনের দৃঢ়তা, বিশ্বাসের কাঠিন্য তখন গুঁড়িয়ে দিতে সময় লাগে না। তা ছাড়া মাঝরাতে ঘুমিয়ে পড়ে মানুষজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট বোবা হয়ে যায়। মরা মানুষের মুখের মতো এই নীরবতাকে জ্যান্ত মানুষ ভয় পায়।

চেয়ারের কাছে ফিরে এল সমাদ্দার। টেবিলে ব্রততী ঝুলছে। দরজার কাছে সুমন বসে আছে ছায়ার

মতো। তার কোমরে দড়ি, হাতে শেকল। তাকে পাহারা দিচ্ছে দুজন। দুজনেই পকেটের মধ্যে হাত পুরে শক্ত করে ধরে আছে নিজেদের রিভলভার। ইন্সপেক্টর সমাদ্দারের হাসি পেল। এত ভয়! মনে হল, এখন এই অন্ধকার, নিস্তব্ধ পৃথিবীতে সে একাই বেঁচে আছে। রসিকতা করে সে দিন সহকর্মীদের কে যেন একজন বলেছিল যে মাঝরাতে এই ঘরটাকে অন্ধকার শ্মশানে জ্বলন্ত চিতার মতো দেখায়। কথাটা মনে পড়তে সমাদ্দার হাসল। ভাবল, এই শ্মশান জাগিয়ে আমি একা শবসাধনা করছি। আমি এই লালবাড়ির কাপালিক।

আবার বাবার কথা মনে পড়ল সমাদ্দারের। বাবাও নিজেকে বলত, তন্ত্রসাধক. কাপালিক। নেশার ঝোঁকে কখনও আওড়াত ষটচক্রভেদের মন্ত্র। ও সব তন্ত্রমন্ত্র সেই ছেলেবেলায় সমাদ্দার বুঝত না। তবে দেশের বাড়িতে কালীপুজোর সময় বাবার পাঁঠাবলি দেওয়ার দৃশ্যটা আজও ওর মনে আছে। বাবার হাতে থাকত লাল সিঁদুর মাখা রামদা. কপালে লাল সিঁদুরের তৈলাক্ত টিপ। মুণ্ডহীন পাঁঠার গর্দান থেকে গলগল করে রক্ত বার হওয়ার ছবিটা ও ভুলতে পারে না।

ইন্সপেক্টর সমাদ্দার হাতের ঘড়ি দেখল। পাহারাদার দুজন ভয়ে আড়ষ্ট। এরা কেন যে মরতে চাকরি করে কে জানে! এই সব ছিঁচকে মশা, মাছিগুলোকে এত ভয়! গত দেড় বছরে মশা মাছির মতোই ইন্সপেক্টর এদের মেরেছে। আঙুল গুনে হিসেবটাও মেলাতে গেল। কিন্তু আঙুলে অত জায়গা হবে কেন?

সমাদ্দারের বাবা ছিল নামকরা শিকারি। হাতের নিশানা নাকি বড় একটা ফসকাত না। নেশাটেশার জন্যে বেশি বয়েসে একটু কাহিল দেখাত। হাত কাঁপত তখন। সমাদ্দারের মনে হল সে নিজেও এখন একজন শিকারি। তবে এ শিকারটার নেশা আরও জমজমাট। সমাদ্দার প্রায়ই ভাবে, এই সব ঝামেলা চুকে গেলে কী করবে সে! সারাদিন ছটফট করে বেড়াতে হবে তখন। আজকাল রাতেও আর তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। জোলো সংসার, বউ, মেয়ে। বিরক্তি এসে গেছে। কোনও উত্তেজনা নেই জীবনে। দিনেরবেলায় বাড়ি থাকলে এখন বউ, মেয়েকে পেটাতে ইচ্ছে হয়। তাই বাড়ি ফিরেই সমাদ্দার শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে খানিকটা নিরাপদ, নিশ্চিন্ত লাগে।

পাশের ঘর থেকে চিৎকারের শব্দ এল। দু জন সাইজ হচ্ছে ওখানে। নিভে যাওয়া চুরুটটা ইন্সপেক্টর সমাদ্দার এবার ধরাল। দেখল, ব্রততীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। হাওয়ায় চাবুকটা একপলক ঘুরিয়ে ব্রততীর পায়ের পাতায় ইন্সপেক্টর সেটা চালাল কয়েকবার। ভাঙা গলায় মেয়েটা কাতরাতে থাকল।

ও প্রেগ্‌নান্ট, অন্তঃসত্ত্বা—অন্ধকার থেকে চাপা গলায় সুমন বলে উঠল।

ইন্সপেক্টর থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল—'আগে বলেননি কেন? ছিঃ ছিঃ।' নিজেকে ধিক্কার দিল ইন্সপেক্টর। তার গলায় অনুশোচনা। কিন্তু ব্রততীকে টেবিল থেকে নামাল না। পকেটের নোটবুক আর কলমটা হাতে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল সুমনের দিকে। বলল—এতক্ষণ ধরে এই নিরীহ মেয়েটা বেকার হয়রানি হল। এবার ঠিকানাটা বলুন।

ইন্সপেক্টর সমাদ্দার তাকাল সুমনের দিকে। নিথর, নিস্পন্দ সুমনের কাছ থেকে কোনও সাড়া পেল না। পাথরে খোদাই মূর্তির মতো সুমনের মুখ। আবছা অন্ধকারে সেই মুখের কোনও রেখা ইন্সপেক্টরের নজরে পড়ল না। ভেতরটা রাগে তেতে উঠছে।

কে করল আপনার বউয়ের এই অবস্থা—বাঁকা গলায় ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল সুমনকে।

সুমন আগের মতো চুপ। জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে, ধরা যায় না। নিজের মনে সমাদ্দার একটা খিস্তি করল সুমনকে। শুয়োরের বাচ্চা এখনই পায়ে পড়বে ইন্সপেক্টর ভাবল। তারপর সুমনকে শুনিয়ে বলল—'ওই মেয়েটার পেটে যে আছে, সে যে আপনার সন্তান নয় এটা বোঝা গেল। নিজের বাচ্চা হলে, মায়া, দরদ থাকত।'

পাহারাদারদের দুটো হাত এখন সুমনের কাঁধে। ধারালো আলোর দিকে ওর দু চোখ আটকে রাখা দরকার। অন্ধকার থেকে কড়া আলোর দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকলে চোখে, মাথায় ঝিম ধরে, প্রতিরোধ গলে যায়। ইন্সপেক্টর হুঙ্কার দিল—চোখ যেন সরে না যায়।

ব্রততীর এখন আর হুঁশ নেই। শায়াটা উঠে গেছে হাঁটুর কাছে। আধবোজা চোখ। চোখের পাতার লালচে অংশটা দেখা যায়। ইন্সপেক্টর চুরুট টানে। 'স্বামী এবং পিতা হিসেবে একটা কর্তব্য আছে আপনার'—ইন্সপেক্টর বোঝাতে চাইল সুমনকে। এক সেকেন্ড থেমে যোগ করল—'অবশ্য আপনিই বাবা কি না সেটা আমার জানা নেই।

সুমন সাড়া দিল না। জ্বলন্ত চুরুটটা দাঁতে কামড়ে ইন্সপেক্টর গিয়ে দাঁড়াল ব্রততীর টেবিলের পাশে। জ্বলন্ত চুরুটটা চেপে ধরল ব্রততীর পায়ের পাতায়। একটা গোঙানি দলা পাকিয়ে উঠল। তারপর ব্রততীর আর সাড়া নেই।

ইন্সপেক্টর বুঝল ব্রততী বেহুঁশ হয়েছে। সুমন তাকিয়ে আছে আলোকিত এই টেবিলের দিকে। আবছা আলো ছুঁয়ে আছে সুমনের চোখমুখ। সুমনকে অনেকটা ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুর মতো দেখায়। পাহারাদারকে ব্রততীর চোখেমুখে জল দিতে বলে চেয়ারে বসে ইন্সপেক্টর বাকি রামটা শেষ করল। আজ নেশাটা ঠিক জুতসই হচ্ছে না। বড় বেগ দিচ্ছে ছোড়াটা। এরকম দুটো কেসের অভিজ্ঞতা ইন্সপেক্টর সমাদ্দারের আছে। বেশিরভাগ ভেড়ুয়া। ঘায়েল করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। সামান্য চোখ রাঙানিতেই কাজ হয়। কিন্তু সুমনের মতো বেয়াদপি আর দুঃসাহস আগে কেউ দেখায়নি। কপালে মুখে মিনমিনে ঘাম। সমাদ্দার রুমালে মুখ মুছল। এক পলক তাকাল সুমনের দিকে। ঘাড় উঁচু করে সুমন বসে আছে। কী উদ্ধত, বেপরোয়া ভঙ্গি। সুমনের শক্ত, ছুঁচলো চোয়াল, চোখা নাক, হাতের চওড়া কবজি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ইন্সপেক্টরের মনে হল—ছেলেটা যেন লোহার তৈরি। ওদের দলে এরকম দু-দশজন আছে। সাদামাটা, নিরীহ চেহারা অথচ ভয়ঙ্কর, ক্ষুরধার।

ইন্সপেক্টর সমাদ্দারের বুকের চাপা রাগটা বুনো মোষের মতো গর্জাতে থাকল। আপন মনে বিড়বিড় করল—তুমি চ্যালেঞ্জ করছ আমাকে? লড়তে চাও আমার সঙ্গে?

ব্রততীর দিকে তাকিয়ে সমাদ্দার বুঝল—জ্ঞান ফিরেছে। দুটো চোখ খোলা, শ্বাস পড়ছে নিয়মিত।

—কথা বলবেন স্বামীর সঙ্গে। ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল ব্রততীকে।

—ইন্সপেক্টরের প্রশ্ন ব্রততী বুঝতে পাবল না। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল।

আপনি মা হতে চলেছেন, সেটা আগে বলেননি কেন—

গলায় সহানুভূতি নিয়ে সমাদ্দার প্রশ্ন করল ব্রততীকে। ব্রততী নির্বাক। অর্থহীন দুর্বোধ্য ধ্বনিপুঞ্জ তার চেতনায় কোনও সাড়া জাগাল না। একইভাবে বোবার মতো সে তাকিয়ে থাকল ইন্সপেক্টর সমাদ্দারের দিকে। গরম হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের মাথা। ও ভাবল, এরা দুজন আমাকে অপদস্থ, হেয় করতে চাইছে। সেটা হবে না।

কড়া গলায় ইন্সপেক্টর সমাদ্দার ডিউটি সিপাইকে হুকুম দিল—পালটি খাওয়াও।

ব্রততীর পিঠটা ধরে সিপাই রডের ওপর চক্কর লাগায়। তিন চারবার ঘুরে যায় ব্রততী। একটা চাপা গোঙানি বার হতে থাকে। কাজ হয় না কোনও। ইন্সপেক্টর সমাদ্দার খেপে ওঠে। ব্রততীর ব্লাউজ, অন্তর্বাস টেনে ছিঁড়ে ফেলে। শায়া ছাড়া ব্রততীর শরীরে এখন কোনও পোশাক নেই। ইন্সপেক্টর দেখল সুমন তাকিয়ে আছে ব্রততীর দিকে। চুরুটে ঘনঘন টান দিয়ে দগদগে আগুনটা ইন্সপেক্টর সমাদ্দার এবার চেপে ধরল ব্রততীর অনাবৃত নরম বুকে। একবার, দুবার তিনবার। ব্রততীব শরীরটা কুঁকড়ে যায়, হিক্কা ওঠে। শায়া ভিজে গিয়ে খানিকটা দলাপাকানো কালচে রক্ত মেঝেতে ঝরে পড়ে। 'গর্ভস্রাব হয়ে গেল দেখছি'—উঁচু গলায় ইন্সপেক্টর বলল। কিন্তু কাকে শোনাল খবরটা! বেঞ্চের দিকে চোখ পড়তে ইন্সপেক্টর সমাদ্দার দেখল, সেখানে সুমন নেই। 'পাহারা'—ভীত, ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল ইন্সপেক্টরণ 'জি' সাব—দুজন পাহারাওলা সাড়া দিল। চোখের ভুল। পাহারা দুজন একভাবে শক্ত করে সুমনকে ধরে বসে আছে। কোথাও কোনও গলদ বা ত্রুটি নেই। তবু যে কেন এমন দৃষ্টিবিভ্রম হল, সমাদ্দার বুঝতে পারল না।

বাইরে থেকে ইন্সপেক্টর পালিত এসে ঘরে ঢুকল। ভেতরটা ভালো করে দেখে এগিয়ে গেল ব্রততীর

দিকে। জিজ্ঞেস করল—'মেয়েটা মারা গেল নাকি?' না—ইন্সপেক্টর সমাদ্দার জবাব দিল—'এরা সহজে মরে না।'

—এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, ক্ষুণ্ণ গলায় ইন্সপেক্টর পালিত বলল, 'আসামির বদলে তার বউকে ধরে টানা-হেঁচড়ার কোনও মানে হয় না। সব কাজে বাগড়া দেওয়া পালিতের স্বভাব। তাই ওর সঙ্গে পারতপক্ষে সমাদ্দার ডিউটি নিতে চায় না। ভেতরে রাগ জমলেও সেটা চেপে গম্ভীর গলায় সুমনকে দেখিয়ে সমাদ্দার জানাল 'ওর মুখ খুলতেই করতে হচ্ছে এ সব।'

ইন্সপেক্টর পালিত বিরক্ত মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকার, নীরবতা ঘন হয়। পাশের ঘরেও কোনও আওয়াজ নেই।

সুমনের একগুঁয়েমি আর পালিতের নাক গলানোয় সমাদ্দার চটেছিল। ব্রততীর দিকে আর না এগিয়ে ইন্সপেক্টর সমাদ্দার ডিউটি সিপাইকে বলল 'নীচে যাও, ভ্যান বার করতে বলো।'

—বেরবে নাকি জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর পালিত।

—হুঁ।

দু-এক সেকেন্ড উসখুস করে ইন্সপেক্টর পালিত ব্রততীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রড থেকে ব্রততীকে নামিয়ে শুইয়ে দিল টেবিলের ওপর। ব্রততীর তালপাকানো শাড়িটা খুলে ঢেকে দিল তার শরীর।

আদিখ্যেতা, সমাদ্দার ভাবল, চিমটি কাটছে আমাকে। হেরে যাওয়ার চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে চাগাড় দিল ওর মাথায়। একটা সে দিনের ছোকরা ওকে চিৎপাত করে দেবে, এটা ভাবতেই জ্বালা করে উঠল সমাদ্দারের বুক। আমি হারব না, তা হলে এই সহকর্মীরাই হাসবে আমাকে দেখে।

ব্রততীর জ্ঞান এখনও ফেরেনি।

—কোথায় চললে, জানতে চাইল ইন্সপেক্টর পালিত।

—হাওয়া খেতে। চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে জবাব দিল সমাদ্দার। কালো গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভার আর নিজের মাঝখানে সুমনকে বসাল ইন্সপেক্টর সমাদ্দার। হেমন্তের রাত। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ। রাস্তায় সামান্য ধোঁয়া আর কুয়াশা। ইন্সপেক্টর দেখল, সুমন পাথরের মতো চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। রাস্তা নয়, আকাশ নয়, অন্যকিছু সে দেখছে। ছেলেটা ওভাবে তাকিয়ে আছে কেন? ও কি অন্ধ? পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছে?

জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলে সমাদ্দারের শীত শীত করে। একটা মতলব নিয়েই ও গাড়িতে তুলেছিল সুমনকে। কিন্তু সেটা কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। পকেটের রিভলভারটা দিয়ে সে খোঁচা দিল সুমনকে। তারপর শুরু করল, 'বড় বাজে ব্যাপাব এসব। বিশ্বাস করুন, আমার একদম ভালো লাগে না। কিন্তু যা করছেন আপনারা ... ...। এভাবে কিছু হয় না। এগুলো স্রেফ হুজুগ। দুচারজন মিলে একটু হইহই করে কী লাভ? আপনাদের পাশে কেউ নেই। কেউ চায় না আপনাদের।

কথার মাঝখানে ইন্সপেক্টর সমাদ্দারের হঠাৎ মনে হল যে তার পাশে কেউ নেই। জায়গাটা খালি, সুমন কখন যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। সমাদ্দারের বুকের স্পন্দন থেমে গেল। একটু নড়ে চড়ে বসে সুমনের শরীরটা ও অনুভব করল। লোহার মতো শক্ত, টানটান হয়ে সুমন বসে আছে। ছুঁচলো চিবুক, চোখা নাক আর চাওড়া কবজিতে গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার আলো। পাশে বসে থেকেও সুমন যেন এ পৃথিবীতে নেই। সুমনের শরীর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো কী যেন বেরচ্ছে। সেই শীতল হাওয়ার সুতো সুমনের চারপাশে বরফের মতো জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর সমাদ্দার ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ওর সব পরিকল্পনা ধসে যায়। হেরে যাওয়ার যন্ত্রণাটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ও চুরুট ধরায়। ময়দান চলো—ইন্সপেক্টর হুকুম দিল ড্রাইভারকে। রেসকোর্সের পাশে ময়দানের ভেতর কালো ভ্যানটা দাঁড়াল। পাহারাদাররা গাড়ি থেকে নামাল সুমনকে। চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে ইন্সপেক্টর সমাদ্দার বলল, 'সময় আছে এখনও, ভেবে দেখুন।'

ওপাশ থেকে কোনও জবাব এল না। ইন্সপেক্টরের নিজের গলা ফাঁকা মাঠে প্রতিধ্বনি তোলে। শেকল

আর দড়ি বাঁধা সুমন ভিজে ঘাসের ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দেখে। পাহারাদাররা চুপিসাড়ে সুমনের পাশ থেকে সরে যেতে ইন্সপেক্টর সমাদ্দার রিভলভারের ঘোড়া টিপল।

কিছু পরে দড়ি আর হাতকড়া নিয়ে একজন পাহারাদার ভ্যানে ফিরে এল। ড্রাইভারের পাশে বসে নিভে যাওয়া চুরুট ধরাল সমাদ্দার। অন্ধকার রাস্তায় ভ্যান চলতে থাকলে ইন্সপেক্টরের মনে হল, তার আর ড্রাইভারের মাঝখানে সুমন বসে আছে। সুমনের চারপাশে ঠাণ্ডা বরফের দেওয়াল। শীতল হাওয়া ছুঁচের মতো গায়ে বেঁধে। সুমন তাকে দরজার দিকে ক্রমাগত ঠেসে ধরছে। ইন্সপেক্টর সরে যায়। নির্জন, ফাঁকা রাজপথে হুহু করে গাড়ি ছুটছে। আড়চোখে তাকিয়ে ড্রাইভার বলল, 'জারা সামালকে'। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ইন্সপেক্টর সমাদ্দার আবার গাড়ির ভেতরের দিকে সরে বসল। শরীরটা কয়েক দিন ভালো যাচ্ছে না, সমাদ্দার ভাবল, ছুটি নেওয়া দরকার।

—জলদি চালাও। সমাদ্দার নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে।

মনে পড়ল, বাবা কাটা পড়েছিল ট্রেনের চাকায়, অপঘাত মৃত্যু। ভেতরে সরতে সরতে সমাদ্দার প্রায় ড্রাইভারের কোলের কাছে গিয়ে বসল। দুজনের মাঝখানে এক আঙুল জায়গাও ও খাল রাখতে চায় না।

সেই বড়ো বাড়িটার অন্ধকার, ফাঁকা চৌহদ্দিতে গাড়িটা আবার ফিরে এল। ইন্সপেক্টর সমাদ্দার এসে দাঁড়াল তিনতলার সেই ঘরে। ঘরে ব্রততী নেই। বোধ হয় ডাক্তারের জিম্মায় পালিত পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে। জোরালো আলোয় আচমকা ঘরে ঢুকে সমাদ্দারের চোখ দুটো টনটন করে। টেবিলের ওপর থেকে রামের বোতলটা নিয়ে ও গলায় ঢালল। বোতল খালি। সামনে চোখ পড়তেই সমাদ্দার দেখল দরজার কাছে সেই বেঞ্চিতে সুমন বসে আছে। ছুঁচলো চোয়াল, একাগ্র দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল আলোর দিকে। আতঙ্কে সমাদ্দারের শরীর কেঁপে উঠল। হাতের খালি বোতলটা সুমনকে লক্ষ করে ছুড়ে মারল। কাচ ভাঙার শব্দ হল ঝনঝন করে। কিন্তু কোথায় সুমন? দু হাতে চোখ রগড়ে সমাদ্দার দেখল, বেঞ্চি খালি, কেউ নেই। ঘাড়ের ওপর হঠাৎ সেই শীতল হাওয়ার স্পর্শে সমাদ্দার লাফিয়ে উঠল। সামনে জমে থাকা রক্তে পা পড়ল। ওর পিছলে গেল পা। টাল সামলে জুতোর রক্ত মোছার জন্যে পা ঘসল মেঝেতে। পা ঘসার সঙ্গে সঙ্গে সেই আধশুকনো চটচটে রক্ত তরল আলতার মতো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। পায়ের রক্ত উঠল না। মেঝেতে পা ঠুকে, দাপাদাপি করে জুতোর লেগে থাকা রক্ত সমাদ্দার মুছে ফেলতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই সে রক্ত ওঠে না। ইন্সপেক্টরের পায়ের তলার মাটি সন্তানসম্ভবার পেটের মতো ধড়ফড় করে। সমাদ্দার দৌড়ে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়। সেই হিম, ঠাণ্ডা, ঘন অন্ধকার।

দারুণ ভয়ে সমাদ্দার চেঁচাল—পাহারা... ...।

লাল বাড়ির তিনতলায় কার্নিশ থেকে একটা কালো পেঁচা অন্ধকারের দিকে উড়ে গেল। □

পারমাণবিক চুক্তি এবং নীলাদ্রির কোলকাতায় বুদ্ধপূর্ণিমা

সুনীল দাশ

অন্ধকারে একটা মৃতদেহের ওপর পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি পায়ের পাতা সরিয়ে নিল। দেহটা এখনও ঠান্ডা হয়নি। রক্ত জমে আছে চারপাশে। চটির তলায় এবং নীলাদ্রির পায়ের পাতার ওপর কয়েকটি আঙুলে রক্ত লেগে গেল সম্ভবত। সে আরও খানিকটা দেওয়াল ঘেঁষে এল। অন্ধকারে আরও মিশে গেল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখের ওপর অন্ধকার হালকা করে নিল। দেখল, একটু একটু করে চারপাশটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। খানিক আগে সংবাদপত্রের অফিস থেকে বেরিয়ে মনের তলায় একটা ফিচারের কাঠামো গড়তে গড়তে এ দিকটায় সে এসেছিল, ইচ্ছা ছিল বাড়ি ফেরার আগে কৃষ্ণাদের ওখানে যাবে একবার। বাড়ি ফিরে প্রতিদিনের মতন একটা স্নিগ্ধ স্নান সেরে লেখা নিয়ে বসবে। যা কিছু কুৎসিত, যা কিছু অস্থির সব সরিয়ে ফেলে এক অনন্তপূর্ণের দিকে তার মন ফিরিয়ে নেবে। পূর্ণ চাঁদের আলোর কোমলতায়, নরম রঙের মতন শব্দগুলো সাজিয়ে যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে, সে বড় রাস্তা ছেড়ে, ছোটো রাস্তার পেভমেন্ট দিয়ে এগোচ্ছিল। পথের দু পাশে যারা পাকা বাড়ির গা-ঘেঁষে সংসার বিছিয়েছে, তাদের গায়ে যাতে পা না পড়ে সেজন্য তাকে বারবার নেমে আসতে হচ্ছিল। গাড়ি সারানোর পুরনো কারখানাটার সামনে আসতেই দেখল একটা গোলমাল শুরু হয়েছে। নিমেষে আলো নিভে গেল। নীলাদ্রি ভাঙা গেটটা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল কারখানাটার ভেতরে।

এখন, ভাঙা মোটরটার পাশ থেকে মুখ বার কবে সে ভালো করে দেখে নিল, মৃতের সংখ্যা এক নয়, তিন এবং চতুর্থটি আরও কিছু সময় জীবিত থাকবে বলে মনে হয়। নীলাদ্রি চতুর্থ দেহটির থেকে গোঙানির শব্দ শুনতে পায়, অন্ধকারে বুক ঘষে দেহটা নড়ে উঠতে চায় দু-একবার। গোঙানিটা শুনে নীলাদ্রির ভেতরটা কীরকম যেন শিথিল হয়ে আসে। পাছে শব্দ হয় তাই জড় করে নিশ্বাস নামাতে পারে না বুক থেকে। ভাঙা মোটর এবং মধ্যবর্তী দেওয়ালের ফাঁকটুকুতে পুরনো ময়লার মতন এঁটে থাকার চেষ্টা করে। যে কোনও মুহূর্তে চোখে পড়লে তার শরীরটাও মৃতদেহের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে শুধু।

আজ না বুদ্ধপূর্ণিমা। চাঁদ ওঠেনি কেন! আকাশে কি খুব মেঘ করেছে? যারা খানিক আগে এখান থেকে একটা জখম ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, তারা কি আবাব ফিরে আসবে? কটা বাজল এখন? পুলিশ কি এ ধারটায় আসবে? রাস্তায় বক্তের দাগ পড়েনি?—তার মাথার মধ্যে প্রশ্নগুলো জড়াজড়ি করে, ঠেলাঠেলি করে, শরীরের ভেতরে বাইরে একটা গুমোট ভাব হাঁসফাঁস করে অনবরত।

যে ছেলেটাকে ওরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল, সে বেঁচে যাবে হয়তো। গুলিটা তার কাঁধে লেগেছে। তাই ওরা ওকে নিয়ে গেল। কিন্তু এই ছেলেটার বাঁচার কোনও আশা নেই। দু তিনটে গুলি পাঁজরা ফুটো করে দিয়েছে। অল্প কিছু সময় পরে এখানেই ও ঠান্ডা হতে শুরু করে দেবে। তখন, খানিক আগেও বেঁচে ওটার জন্যে ছেলেটা বড় করুণভাবে ডাকছিল। দলের জন্য একটি লোকের বাঁ পায়ের কাছে লুটিয়ে বলেছিল, 'আমায় নিয়ে চল নিতুদা, গুলি দুটো বার করে নিলে আমি বেঁচে যাব। আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমায় ফেলে রেখে যেও না।' নীলাদ্রির বুকের বাতাস ভারী হয়ে আসছিল। বুকের মধ্যে গুলি লাগার পরও মানুষ

এভাবে কথা বলে কী করে। অন্ধকারে দম চেপে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি ছেলেটির দলের দু-একজন যুবকের কথা বুঝতে পারছিল। তাদের কণ্ঠস্বরে খানিকটা দুর্বলতার আভাস ফুটে উঠেছে।

—নিতুদা চলো, নন্তুকে নিয়ে যাই; বলা যায় না, শমুর মতন বেঁচে যেতে পারে।

—শক্ত হতে শেখ পরি, এখন একটা সেকেন্ড নষ্ট করা মানে সবাই মরা। ওদের নিতুদার কণ্ঠস্বরে কোনও দুর্বলতার আভাস পর্যন্ত নেই।

—তোমরা শ্যামলকে নিয়ে যাও, আমি নন্তুকে ঠিক নিয়ে যাব।

—পরি এখন দুর্বল হওয়ার সময় নয়। চাপা এবং কঠোর কণ্ঠস্বর, আদেশের মতন।

তারপর কী হল?

পরি কি একবার অন্ধকারে নন্তুর রক্তে-ভাসা দেহটার দিকে তাকাল? তখন নন্তুর জ্ঞান ছিল পুরোপুরি? নীলাদ্রি শুধু শুনল কতকগুলি পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর পেরল আরও খানিকটা সময়। কাতরাতে কাতরাতে নন্তু ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে। মরে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে কী ভাবছে নন্তু? গলার স্বর শুনে মনে হয় বয়স বেশি নয়। সতেরো আঠারো হবে হয়তো। তার ভাই রঞ্জনের বয়স। এই মুহূর্তে আঠারো বছরের দেখা পৃথিবীটাকে কি মনে হচ্ছে ওর? ঘেন্না, ঘেন্না। এই চারপাশ, তার চারপাশে সতেরো-আঠারো বছর জুড়ে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষদের জন্যে, সমস্ত অনুভব ছাপিয়ে ঘেন্না করা ছাড়া, দারুণভাবে তীব্র ঘৃণা করা ছাড়া আর কোনও দৃষ্টি সঞ্চয় হয়েছে তার? এ মাটিতে ঠিক মতন কেউ কি আর পা রাখতে পারে? এ বাতাসে বিষ টেনে বেঁচে থাকার মতন এক নিদারুণ জ্বালায় ফিরে আসতে ইচ্ছে করে কার? তবে কেন নন্তু আর একবার বেঁচে উঠতে চাইল।

আজ না বুদ্ধপূর্ণিমা। আজ চাঁদ ওঠেনি কেন?

নীলাদ্রির বড় ইচ্ছে করছিল নন্তুর মুখটা দেখতে। কোন পৃথিবীতে তুই বেঁচে উঠতে চাস রে নন্তু! তোর পৃথিবীটাকে তুই তো এখন খুঁজে পাসনি। জীবনের শেষ সময়টুকু যখন শিয়রে এসে দাঁড়ায় তখন কি ভীষণভাবে বেঁচে থাকাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে? নষ্ট কাঠামোকে বদল করবার সাধে আরও একবার জীবনে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে! পুরনো গাড়ি সারানোর কারখানাটার অন্ধকারে মৃত আর প্রায়মৃত মানুষদের পাশাপাশি নীলাদ্রি—একজন জীবিত মানুষ, সারাক্ষণ নিজের অসহায়তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সারাক্ষণ নিজের বেঁচে থাকাকে প্রাণপণ চেষ্টায় লুকিয়ে রাখে; নিমেষ গোনে, কান পেতে থাকে অন্য কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কি না। সেই ভারী বাতাস, সেই নিরালোক চারপাশ, শিয়রে মরণ এলে কিশোরের কণ্ঠস্বর, একটু একটু করে, চুঁয়ে চুঁয়ে তার রক্তের মধ্যে মিশতে থাকে যেন। গুলির শব্দ, বারুদের গন্ধ, গেট পেরিয়ে পায়ের পাতায় লাগা রক্তের ছোঁয়া, অনু, পল, দণ্ড, সময়, ভেঙে ভেঙে, গলে গলে তার অনুভবে একাকার হয়ে আসে। শহর কোলকাতা সময়ের অন্য পারে ফিরে যায়। নববাবুবিলাস পেরিয়ে পল্লি সুতানুটি, তা ছাড়িয়ে আরও দূর মনসার ভাসানে। সম্ভবত ভুলে দেখতে হয় একদা সে কোনও এক বয়সে এঙ্গেলস্ পড়ে বিমুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মনে পড়ে নাকি এক সময়ে সাধ ছিল চে-র জীবনায়নে এক কাব্যনাট্য লিখি। ভুলে যেতে হয় নিজের কণ্ঠস্বর; আমাদের রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে নিবিড় হয়ে আছেন তাঁর ইতিহাস চেতনায়; কালের যাত্রাপথ চিহ্নিত করতে করতে ঠাকুরবাড়ির নীলরক্তের যে মানুষ খোয়াইয়ের পাড়ে এসে কালান্তর বিশ্লেষণ করে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে নীলাদ্রির বুকের তলায় নস্ট্যালজিয়া শিরশির করে ওঠে।

"প্রাকৃতিক নিয়মের স্বাধীনতার স্বপ্নের মধ্যে মুক্তি গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে এই নিয়মের জ্ঞানের ওপর। সম্ভাবনার মধ্যে এই জ্ঞান যথাযথ কাজ করে একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।" এখন কি তার ভাবার সময় আছে যে এঙ্গেলস তো আজও তার প্রিয় লেখকদের একজন! তবে চারপাশ এমন শিথিল হয়ে আসে কেন? দু হাত দূরে এ আঠারো বছরের বেঁচে থাকা ওই রক্তে কার ঋণ মিটিয়ে দিতে চায়? চটি পেরিয়ে নীলাদ্রির পায়ের পাতার রক্ত শুকোয় আর টানটান হয়ে ভীষণ সতর্কতায় অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে আটাশ বছরটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে যেতে চায়।

কে বলবে আজ বুদ্ধপূর্ণিমা! ওপাশের কালো আকাশটা ক্রমে লাতিন আমেরিকার রিলিফ ম্যাপ হয়ে উঠছে। বড়ো গুমোট। হাঁপ ধরে আসে। পুরনো এই বন্ধ কারখানার আনাচেকানাচে সাপখোপ নেই তো!

আবার এক সঙ্গে অনেকগুলো পায়ের দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল। নীলাদ্রি শরীরটাকে আরও টানটান করে নেয়, আরও ঘন করে অন্ধকারে মিশে থাকে।

এ কী! একজনের হাতে যে একটা টর্চ। আলোটা এসে পড়ছে এখানে—সেখানে। একটু উঁচু করে কোনাকুনি ধরলেই নীলাদ্রির মুখে এসে পড়বে সরাসরি। তারপর? তারপরই জনাকয়েক ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। টেনেহিঁচড়ে মেঝেতে ফেলবে কিংবা ফেলার আগেই বুকে, পিঠে, তলপেটে কিংবা কণ্ঠ নালীতে ধারালো অস্ত্রটা বারকয়েক টেনে দেবে। আর তখন, মৃত্যুর সেই পূর্ব মুহূর্তটিতে নন্তুর মতন নীলাদ্রিরও তখন বাঁচার ইচ্ছটা তীব্র হয়ে উঠবে। উঠে দাঁড়াতে চাইবে। অতর্কিত তার গগন ঠাকুরের আঁকা একটা ছবি মনে এল কেন? একটা কালো ঘোড়ার পিঠে একজন রাজপুরুষ—সারা অঙ্গ কালো পোশাকে ঢেকে এগিয়ে চলেছে।

—এখানে কটা লাশ পড়ে?

—চারটে মোটা।

—আরগুলো?

—সে-সবগুলো জখম ছিল, বোদয় শালারা পাচার দিয়েচে।

—ভালো করে দেকে নে, আমাদের কেউ নেই তো।

—নাহ্। আমাদের মোট দুটোই—আর নেই।

—অ্যাই। ওই লাশটা লড়চে মনে হচ্চে না!

—এখনও শালা খতম হয়নি।

—সেঁটে দে।

একজন এগিয়ে গেল নন্তুর দিকে। কিন্তু তার আগেই বাইরে বোমার আওয়াজ, ফায়ারিঙের শব্দ। টর্চের আলোটা নিভে গেল। নীলাদ্রির পায়ের পাতার অল্প খানিকটা দূর দিয়ে আলোব বৃত্তটা ঘুরে গেল। পায়ের তলা থেকে একটা কাঁপন শিরশির করে তার মাথার দিকে ছুটে গেল। চারপাশ আবার চুপ। ওরা সবাই দ্রুত ফিরে যাচ্ছে। যেতে যেতে ওদের মধ্যে একজন বলল, 'কি অন্ধকাররে বাবা। আজ কি আমাবস্যে!'

—তাই হবে। অন্যদিন তো এমনি থাকে না। ওরা চলে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার পর নন্তু আরও একবার গোঙালো। বুক ঘষে এগোল আর একহাত। ওরা কেউ কিচ্ছু জানে না, রাতটাকে ওরা অমাবস্যা বলছে! অথচ আজ পূর্ণিমা। হে অনন্তপূর্ণ। নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী। কপিলাবস্তুর সেই পূর্ণিমায় কি চাঁদ উঠেছিল গগনে! একটা বড়ো চাঁদ। আকাশ ভাসানো আলোয় কি পূর্ণ চাঁদের মায়া ছিল?

নন্তু হয়তো চোখ মেলে এই আঁধারে শেষবারের মতন চারপাশটা দেখে নিচ্ছে। নন্তু, চারপাশটাকে তুই না বদল করতে চেয়েছিলি? কে কাকে বদল করবে! মানুষ না মানুষের চারপাশ?

"দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর উপনিবেশের দেশগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সেখানকার বণিকশ্রেণীর সহযোগিতায় শিল্পায়নের নামে ভোগ্যপণ্য আমদানি করার ব্যবস্থা পালটানো হল। এল শিল্পায়ন নীতির আড়ালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাড়তি মূলধনের আয়োজন। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নেমেছিল যে সব ইউরোপীয় দেশ—তাদের তুলনায় পরোক্ষভাবে লিপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি এগিয়ে চলেছে।

নতুন আন্তর্জাতিক আর্থিক-নীতি অনুসারে অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্যের নামে এ সব দেশে যে ধরনের শিল্প প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে—তাতে অনুন্নত দেশগুলোর যেমন আর্থিক বা প্রকৃত শিল্পায়ন ঘটছে না, তেমনি এর ফলে উন্নত দেশগুলোতে—উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্পায়নের বাজার এবং মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ স্থায়ী করবার কাজও চলছে।"—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে যে প্রবন্ধ সে লিখেছে, সেই সব দিনকে, ভাবনাচিন্তা আবেগে যুক্তিতে যেন অন্য জন্মের মনে হয়।

এখন সে স্থির হয়ে চিন্তা করে, কৃষ্ণার বাড়ি যাওয়ার পথে কেন এমন দুঃসহ সময়ের মধ্যে গেঁথে থাকতে হয়। এরপর ফিরে গিয়ে সে আর কোমল আলোর মতন শব্দের কেয়ারি সাজাবে কেমন করে। কৃষ্ণাকে কথা দেওয়া ছিল, যাওয়া হল না। এখন আর কথা রাখা যায় না। আমার কৈশোরের, যৌবনের কাছে, হে সময়, যা কিছু কথা দিয়েছি তোমায়, মুখ ফিরিয়ে বলি, আজ সব ফিরিয়ে নিয়ে যাই। কথা ভেঙে যায়। মানুষের আবাসভূমিতে অপরাধের মানদণ্ড বদল হয়ে যায়। সূর্যমন্ত্র মনে পড়ে না। নাকি অন্য এক ভয়ঙ্কর চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়ে গেছে? কোমল আলোর মতন শব্দতরঙ্গ রচনার আড়ালে কী এক নির্মম ঋণপত্র লিখে দিতে হয়, আমৃত্যু উচ্চারণ করি বন্দির বন্দনা? আমার কৈশোর, আমার যৌবন সমস্ত প্রজ্ঞা তোমাকে লক্ষ করে? চুক্তিমতন আমরা সবাই এ উপমহাদেশে, অপিচ এ উপনিবেশে ঠিকঠাক বেঁচেবর্তে আছি। অণুতে পরমাণুতে, অবয়বে কিবা অনুভবে যথোচিত দায়বদ্ধ আছি।

নীলাদ্রির মনে হয়, তারও কি কোনও একদিন লাশ পড়ে গিয়েছিল? সেও কি কোনওদিন নন্তুর মতন অদৃশ্য সব গুলির আঘাতে পরবাস পৃথিবীর মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে বলেছিল, হে মহাজীবন, ক্লেদাক্ত জীবন, হে আমার ঔপনিষদিক সত্তা, হে আমার ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনধারার গর্ভস্রাব. একটিবার আমায় বেঁচে থাকার সুযোগ দাও।

তারপর? তারপর, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নামে মানুষের পছন্দমতন বেঁচে থাকার জগতে! নতুন দলিল পাট্টা। ইচ্ছারা নিলাম ডাকে। প্রভুত্বের হাত বদল হয়। বেঁচে থাকুন। বাঁচতে দিন। হিংস্রতার কোনও ক্ষমা নেই। হিংস্রতা বর্জন করুন। বিকশিত করো প্রেম-পদ্ম চির মধু নিষ্যন্দ। হে অনন্তপূর্ণ। ও আমার চাঁদের আলো।

আজ বুদ্ধপূর্ণিমা।

নীলাদ্রির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। একি। ছেলেটা যে গোঙাতে গোঙাতে তার আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, ওকি মরতে মরতে নীলাদ্রির নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওকি বুঝতে পেরেছে ওর কাছাকাছি এখনও একজন জীবন্ত মানুষ নিশ্বাস ফেলছে। যার দিকে ও বাঁচার জন্যে শেষ বারের মতন হাত বাড়াবে। ওকি তাই আরও এগিয়ে আসছে? নীলাদ্রি ভীষণভাবে ঘামতে শুরু করল।

হঠাৎ নীলাদ্রির পায়ের ওপর দিয়ে কী একটা চলে গেল। ইঁদুর না ছুঁচো? এখানে, এই অন্ধকারে, সাপখোপ থাকারই কথা। গুলি ছোরার চেয়ে সাপকে আরও বেশি ভয় করে তার। নীলাদ্রির এবার যেন স্থির বিশ্বাস হল তার পায়ের পাতার কাছাকাছি কোথাও একটা সাপ চলে বেড়াচ্ছে। ঘামে তার গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে। নীলাদ্রি শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সেই দেওয়াল আর ভাঙা মোটরটার মধ্যবর্তী অল্প জায়গা থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল।

আর বেরিয়ে আসার সঙ্গে একটা রক্তে ভেজা হাত তার পায়ের ওপর এসে পড়ল। পা আঁকড়ে ধরল। নীলাদ্রি পা সরাতে পারল না, ওখানেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন কী করবে নীলাদ্রি! মুমূর্ষু ছেলেটার হাতের বেড় থেকে পা-টা সরিয়ে নেবে? না যদি নেয়, তবে এইভাবেই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এ-ছাড়া আর সে কীই বা করতে পারে! নন্তুকে পাঁজাকোলা করে বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে যেতে পারে! কোনও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তরুণ এই ছেলেটাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করতে পারে। মানুষ হিসেবে এটুকু তো তার করণীয় ছিল। হ্যাঁ, ছিল বইকী, ছিল, কিন্তু এখন...

এখন নীলাদ্রি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে অন্ধকার পাক খেয়ে যায়। নীলাদ্রির এখন বিবেকের ঘরে ঢুকে টানটান হয়ে শুয়ে থাকতে মন চায়। অথচ নন্তুর রক্তে ভেজা হাত তার পায়ের পাতায় থিরথির করে কাঁপছে যে।

হায়রে কিশোর, মাঝে মাঝে কঠিন পাথরের ফাঁকে ঘাসফুলের শিষের মতন ইচ্ছা ফুটে ওঠে, তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই। এই নিরন্তর শবযাত্রা, মহাশ্মশানের অন্তিম অগ্নিকাণ্ডের দিকে প্রতিদিন—প্রতিক্ষণ অমোঘ পদক্ষেপ, বেঁচে থাকা অন্য নাম তার। ইচ্ছে করে আমিও তোমার মতো করতলে হৃৎপিণ্ড নিয়ে নাচানাচি করি। দে দোল দোল। দে দো দোল।

তোমার কি গাঢ় ঘুম এল?

"দ্বাপর যুগ সমাপ্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশে অধর্মের জন্ম হইল। মিথ্যা হইল অধর্মের সহধর্মিণী। দম্ভ তাহাদের পুত্র। দম্ভ আপন সহোদরা মায়াকে বিবাহ করিল এবং তাহাদের লোভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। লোভও ভগিনী-গমন করে, ফলত তাহাদের ক্রোধ নামে এক পুত্র এবং হিংসা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। পূর্বপুরুষের ন্যায় অস্থির ক্রোধ ভগিনী হিংসার যোনিতে রমণ করিলে, হিংসার গর্ভসঞ্চার হইল। সেই গর্ভে কলি ভ্রূণরূপে আশ্রয় লাভ করে। কলিও তাহার নিজ ভগিনী দ্বিরুক্তিকে বিবাহ করে। তাহাতে ভয় নামে এক পুত্র এবং মৃত্যু নামে এক কন্যার জন্ম হইল।"

এই জন্মের জন্যে, এই অস্থির ক্রোধে-হিংসায় বারংবার কোনও গর্ভ-সঞ্চার ঘটে যায়। এই ভয়, এই মৃত্যু—এমন নিরালোক আমার এ উপমহাদেশে কার কণ্ঠস্বর বারবার ফিরে যায়! রক্তের ভেতরে রক্ত থেমে যায় নন্তু, অনুভবের ভেতরে অনুভব স্থির হয়ে থাকে। এই ভয় আর মৃত্যুর চক্রব্যূহ রচনা করে এ কোন বধ্যভূমিতে এসেছিস তুই! এখানে কি কলকাতা প্রতিদিন সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে ভেসে যায়—তবে প্রেমসুধারস পাব।

—কৃষ্ণা।

—বলো।

—কৃষ্ণা, তোমার কখন মনে হয় না, আমরা কেউ যখন আর নিজের ইচ্ছামতন বেঁচে থাকতে পারছি না; পছন্দ-মতন জীবনটার মধ্যে প্রবেশ করার সমস্ত দরজা বন্ধ; তখন প্রতিদিন এই চৌকাঠে মাথা ঠুকে মরার আপসকে জীবন বলে গ্রহণ করা এক ধরনের অন্যায়?

—তাই কি? এই গ্রহণকে তো আমাদের ইচ্ছার মধ্যে যাওয়ার পথের কষ্ট বলে মনে করব আমরা। বরং, জীবন থেকে সরে গেলে অন্যায়কে আরও বেশি করে মেনে নিচ্ছি মনে হয়।

—একে তুমি পথ বলো কৃষ্ণা। প্রতিদিন এইভাবে নিজের টেনে-হিঁচড়ে বেঁচে থাকার চারপাশে কেন্নোর মতন পাকিয়ে পাকিয়ে কুঁকড়ে যাওয়াকে তোমার সাময়িক বলে মনে হয় এখন। এই পাঁক থেকে আমরা কেউ বেরতে পারব না, কোনওদিন বেরতে পারব না।

—তা হলে? তা হলে কোথায় পালাবে? পালানো মানে তো আরও বেশি করে পাঁকটার মধ্যে চলে যাওয়া।

—ভেবে পাই না, তারও পরে কেন আমাদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

—এই না সেদিন তুমি বললে, আমাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছাটার মধ্যে দিয়েই আমরা একটু একটু করে বেঁচে থাকি।

—ওটা আমার কাছে সব চেয়ে গোলমেলে কথা। সব চেয়ে বড়ো ধাঁধার কথা। বেঁচে থাকা আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা—গাছ আর বীজের উৎপত্তির দ্বন্দ্বের মতন সবকিছুকে গুলিয়ে দেয়। এখন সময়টা তো সবকিছু লুঠ হয়ে যাওয়ার। সমস্ত ইচ্ছার।

—আমরা কোনও কিছুই ভাঙতে পারি না বলে বারবার বিষণ্ণতার মধ্যে ফিরে আসি।

—অথচ আমাদের কৈশোর ছিল। সাধ ছিল চারপাশ বদল করে নেব।

—এখন আমরা কোথায় এসেছি? যৌবন শব্দটাকে বড়ো অনাত্মীয় মনে হয়।

—আমাদের কৈশোর পেরিয়ে গেলে মৃত-কৈশোরের শুরু হয়। অথচ কথা ছিল, অনেক আগেই কোনও একদিন আমরা যৌবনে পৌঁছব। কী আশ্চর্য! আটাশ-বসন্তে এসে আজও এই মৃত কৈশোর বহন করে চলেছি।

—আমরা তো বাঁচতে চেয়েছিলাম, নীলাদ্রি!

আমি বেঁচে উঠব নিতুদা, আমায় ফেলে রেখে যেও না।

আজ না বুদ্ধপূর্ণিমা! চাঁদ ওঠেনি কেন?

নন্তুর রক্তেভেজা হাত এখনও নীলাদ্রির পায়ের পাতা আঁকড়ে রয়েছে। নীলাদ্রি জানে, সে নন্তুকে বাঁচাতে পারে না। নীলাদ্রি তবু পা সরাতেও পারে না।

বেঁচে থাকুন। বাঁচতে দিন। বাঁচার মেরুদণ্ডের ওপর কোলকাতা পাক খায়। কবে তার কোলকাতা রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে ভেসেছিল। মনে পড়ে না কোনোওদিন তার কৈশোরকালও একদা রক্তে ভেসে গেছে কিনা।

সে বুঝতে পারে, এইভাবে মুমূর্ষু ছেলেটার হাত তার পায়ের ওপর আঁকড়ে থাকলে সে পা সরাতে পারবে না কিছুতেই। তাই স্থির হয়ে থেকে ক্রমশ বিপদ বেড়ে ওঠার উৎকণ্ঠা অনুভব করে ভেতরে অস্থিরতা পাক খায়। নিজের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি সত্তাটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বড়ো অসহায় বোধ করে নীলাদ্রি।

কিন্তু অল্প কিছু সময় পরেই নন্তুর গোঙানি থেমে যায়। নন্তুর শরীর নিথর হয়ে আসে। হাতের আঙুল কঠিন হয়ে ওঠে। সতেরো-আঠারো বছরের কিশোরটি মাটিতে মুখ গুঁজে মরে থাকে। সে মরে যায় বলে নীলাদ্রি খুব সহজেই বেঁচে যায়।

নীলাদ্রি আর কৃষ্ণার বাড়ি যায় না, নিজের বাড়ির পথে ফিরে যায়। বাথরুমে অনেক সময় ব্যয় করে পুরনো ময়লার মতন জমে থাকা ঘামের গন্ধ ধোয়, শরীর শীতল করে। ঘাড়ে পিঠে পাউডার দেয়।

"রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের উদ্বোধনী বার্তায় সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট বলেছেন, গত বছর অস্ত্রের জন্যে বিশ্বে বিশ হাজার চারশ কোটি ডলার অর্থ খরচ করা হয়েছে। উন্নয়নশীল সকল রাষ্ট্রের এক বছরের সম্মিলিত আয় এই অঙ্কের সমান হয়ে থাকে। তিনি প্রশ্ন করেন, বিশ্বের জনগণ আর কতদিন এই ব্যয় সহ্য করবেন।"—রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে দিতে দিতে নীলাদ্রি ভাবে, ফরাসি ভাষায় 'ন্যাকা' শব্দটির যথার্থ পরিভাষা কী হবে। তারপর সে বারান্দার আলোটা জ্বালাতে গিয়ে মনে করে, গত তিনদিন যাবৎ সুইচটা খারাপ হয়ে আছে।

চেয়ার টেনে অন্ধকারে বসে ফিচারটাকে মনের তলায় গুছিয়ে আনার চেষ্টা করে। সে আব একবার আকাশের দিকে তাকায়। কোথাও চাঁদ নেই। তার লেখায় চাঁদটা কিংবা চাঁদের আলোটা যেন এখানকার আকাশটাতে কোনও দিনও ছিল না। রিলিফ ম্যাপের মতন আকাশটা ভেঙে আছে। তবু ধোঁয়াটে মেঘ সরেনি। হঠাৎ কেন যেন মনে হয়, কলকাতায় এখন মেঘের ছায়া নামেনি; বরং উলটো, কলকাতা ছায়া বিছিয়েছে আকাশটার ওপর। এমন সময় কৃষ্ণা ফোন করল।

—কী হল? এলে না যে?

—আটকে পড়লাম কৃষ্ণা, উপায় থাকল না।

—কোথায় আটকালে?

—আপাতত অন্ধকার বারান্দাটাতে, আমার লেখার ঘরের মুখোমুখি।

'—'

—বড়ো বিপদে পড়েছি কৃষ্ণা।

—বিপদ? কীসের বিপদ?

—ফিচার লেখার একটা চুক্তি নিয়ে এসেছি। কালকেই লেখাটা দিতে হবে।

—বারান্দা থেকে আপনার লেখার ঘরের দূরত্ব কপা মশাই।

—এই আট-দশ পা হবে বড়ো জোর। তার বেশি নয়।

—তা হলে আর কী, এবার কলমটা নিয়ে ঢুকে পড়ুন।

—ঢুকতে পারছি না, আটকে যাচ্ছি।

—কেন, কি হল আবার।

—তেমন কিছু নয়, শুধু একটা মৃতদেহ।

—কী বললে?

—যতবার ঢুকতে যাচ্ছি, ততবারই অন্ধকারে একটা মৃতদেহের ওপর বারবার—পা পড়ে যাচ্ছে। □

মাংস বিনিময় হল

[সরোজ দত্ত-র মৃত্যুতে]

সুবিমল মিশ্র

তেরঙ্গা বাজপতাকাগুলোর মধ্য দিয়ে ও যখন লাল ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে যাচ্ছিল, তখন একদিন ওকে ঘবে বন্দি কবে রাখা হল। তারপব নিশ্চিহ্ন কবে ফেলা হল ওব দেহের টুকরোগুলো। [বুকফাটা চিৎকার কবে] ভগবান বক্ষে কব। সে কিছুক্ষণেব জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। ও-ও তার সঙ্গে যায়।

উপস্থিত ছায়ামূর্তিগুলো বলল · আমরা পুলিশ, সি আই ডি, তোমাব ঘব সার্চ করব।

—আপনাদের পরিচয়পত্র দেখি, সার্চ ওয়াবেন্ট দেখি।

লোকগুলো বলল আমবা সি আই ডি। আমাদের আইডেনটিটি লাগে না, সার্চ-ওয়াবেন্ট লাগে না।

ঠিক এই সময় পুবসভাব মেয়ব-উপদেষ্টা-পবিষদের চেযাবম্যান জানান, 'খাবাপ মাংস খেযে রক্তের অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন এমন লোকেব সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আইন না মেনে কলকাতা জুড়ে বিক্রি হচ্ছে মাংস—পচা, বাসি বোগজীবাণু-ভর্তি প্লেট প্লেট মাংস। অসুস্থ গরু মোষ পাঁঠা শুয়োর—মাংস খেযে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন অনেকেই।

শেষ বাতে দুজন বক্ষী লকআপেব ভেতবে ঢুকে আবার টেনে তুলল ট্যারামাস্টাবকে। সি আই ডি অফিসার প্রভাত বাসু টেবিলেব উপব পা তুলে দিযেছেন—গা এলিযে বসেছেন চেযাবে। ট্যাবামাস্টারকে এনে দাঁড় কবিযে দিলে—সে দাঁড়াতে পারছে না—তাব গুহ্যদেশে একটা বেটন পুরে দেওয়া হয়েছিল সন্ধে রাত্তিরে—প্রভাত বাসু বলছেন · অ্যা'ম স্যবি ট্যাবামাস্টাব, আমি তোমাব মুখের সামনে থেকে পা-টা নামিয়ে নিতে পাবছি না। অ্যা'ম টায়ার্ড। যু কেন মিট।

ট্যারামাস্টার সোজা হযে দাঁড়াতে পাবছেন না। তিনি কোনওক্রমে উলটোদিকের চেযাবটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। প্রভাত বাসু ট্যাবামাস্টারেব মুখেব দিকে পা তুলে বসে কয়েক মিনিট এভাবে। নীরবতা।

ট্যারামাস্টার আর নিজেকে সোজা রাখতে পারছেন না। তাঁর এই অবস্থা দেখে প্রভাত বাসু তারিয়ে তারিযে কথা চিবচ্ছেন : বলো ট্যারামাস্টাব, তুমি কী বলবে।

ট্যারামাস্টাব কোনওক্রমে বলছেন আপনারা অনুগ্রহ কবে বলুন কী শুনতে চান। আমি সহযোগিতা করব।

অভিযোগ এসেছে কলকাতা জুড়ে ছড়িযে থাকা কসাইখানাগুলির অব্যবস্থা সম্পর্কে।

কিছু নাগরিকের বক্তব্য : এইসব কসাইখানা অস্বাস্থ্যকর। চাদ্দিকে মৃত পশুর নাড়িভুঁড়ি। রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। ৩০০ বছরের পুরোনো এই কসাইখানাটি সমাজ-বিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

কয়েকজন লোক ঘরে ঢুকে পড়ল হুড়মুড় কবে—তাঁদের একজনের হাতে উদ্যত রিভলভার।

ট্যারামাস্টার বলল . আপনারা কারা? কাকে খোঁজ করছেন?

—ট্যারামাস্টারকে খোঁজ করছি।

—আমিই ট্যারামাস্টার, বলুন কী বলবেন।

—আমাদের সঙ্গে চলুন, বাইরে জিপ অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু আপনারা কারা?

—আমরা কারা—চুল্লুগোপাল সমঝে দে না আমরা কারা—তাদের মধ্যে একজন আরেকজনকে ঠেলা দিল। তার হাত নিশপিশ করছে।

—আপনারা যে পুলিশ তার কী প্রমাণ আছে—আইডেনটিটি দেখান।

—আইডেনটিটি দেখবি হারামির বাচ্চা—চুল্লুগোপাল যার নাম সে পেটে টাই করে এক লাথি কশাল—আমাদের আইডেন......

ট্যারামাস্টার পড়ে গেল উলটে। দু হাতে পেট চেপে আছে। ডান কশ বেয়ে একটা সরু রেখা, রক্তের.......

পুরসভার এক অফিসার বললেন, 'শহরের বিক্রীত মাংসের খুব অল্প অংশই তাঁরা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পান। পুরসভার কসাইখানায় দৈনিক প্রায় ৩৫০টি গরু-মোষ এবং ৪০০ ছোটো-প্রাণী কাটা হয়। তাঁদের দাবি এগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনওভাবেই ক্ষতিকর নয়। তাঁদের মাংসের গায়ে রাবার স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হয়। শহরে বিক্রীত অন্যান্য মাংস, রাশি রাশি মাংস, কতখানি নিরাপদ তাঁরা তা জানেন না। তাতে তাঁদের কোনও রাবার স্ট্যাম্প থাকে না।'

—আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে? কী অভিযোগ? আমি কি কোনও অপরাধ করেছি? যদি করে থাকি তা হলে আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে আপনাকে তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা জানাতে হবে।

এদের মধ্যে যার মুখচোখ খানিকটা ভদ্রলোকেদের মতো দেখায়, এখনও, সে, পুলিশের পোশাক পরা সে ট্যারামাস্টারের বুকের উপর রিভলভার তুলে ধরে ধমকের সুরে বলল : আপনার সঙ্গে তর্ক কবার সময় আমাদের নেই......

কথাগুলো বলতে বলতে ট্যারামাস্টারের কলার ধরে হিঁড় হিড় করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল তারা।

কলকাতার কসাইখানাগুলো সম্পর্কে অনেক অভিযোগ। জলাভাবে কসাইখানা শ-খানেক বছর ধরে পরিষ্কার হয় না। কোণে কোণে তার জমে আছে নিরীহ প্রাণীগুলির হাড়, নাড়িভুঁড়ি, খুরের অংশ, ইতস্তত লোম। প্রতিদিন সেখানে প্রয়োজন তিরিশ হাজার গ্যালন জল। পাওয়া যায় দশ গ্যালনের মতো। আশেপাশের আবর্জনা থেকে মাংসের টুকরো, নাড়িভুঁড়ি পাওয়ার আশায় গরিব মানুষেরা ভোররাত থেকেই এসে জড়ো হয়। এক টুকরো টাটকা হাড় বা এক খামচে নাড়িভুঁড়ি পাওয়ার স্বপ্নে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। আগে তারা নিজেদের মধ্যে এ সব নিয়ে মারামারি করতো, কথায় কথায়, এখন তা করে না। একমনে আবর্জনার টাঁই ঘেঁটে বেড়ায়। ওটাই এখন ওদের খাদ্যসংগ্রহ প্রণালী, উপায়। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ করে, মরে, কিন্তু একজন মরলে তার জায়গায় পাঁচ জন আসে। কসাইখানার কিছু কর্মী এবং স্থানীয় কিছু মস্তান তাদের সম্বন্ধে খুব উৎসাহী এবং নিয়মিত তোলা আদায় করে তারা।

ট্যারামাস্টারকে একটা জিপে করে নিয়ে গিয়ে আলিপুর কোর্টের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হল দুটো পর্যন্ত। কেউ জানল না। বেলা দুটোর সময় বলা হল, কোনও আইনজীবী নেই সুতরাং তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হোক। ট্যারামাস্টারকে ১০ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে তুলে দেওয়ায় নির্দেশ দেওয়া হয়। সূর্য ডুবে যায়।

পুরসভার চিফ হেলথ অফিসার জানালেন, কলকাতা কসাইখানা বহু বছর ধরে মেরামত হচ্ছে না। নিকাশি ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, পরীক্ষাগার এইসব খুব খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তিনি স্বীকার করলেন এবং আশার

কথা শোনালেন, সম্প্রতি তাঁরা এইসব অব্যবস্থা দূর করতে হাত দিয়েছেন। বিপজ্জনক যা কিছু, সারাই করা হচ্ছে। নিয়মকানুন মেনে গরু মোষ কাটার ব্যাপারগুলি দেখাশোনার জন্য কিছু কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হতে পারে। সব মাংসে রাবার-স্ট্যাম্প লাগানো হবে।

—আপনি কি পার্টি করেন?

—বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাস করি। ভারতের কোনও রাজনৈতিক দলকেই সমর্থন করি না। তবে প্রতিটি দলেরই কিছু না কিছু ভালো কাজ থাকে। সেগুলোকে সমর্থন করি।

—নকশাল মুভমেন্টকে আপনি সমর্থন করেন? .

—যে কোনও মুভমেন্ট যদি কোনও ঘুণধরা সিস্টেমকে পালটানোর জন্য ভালো কিছু করতে চায়, সেটা যদি ভুল পথও হয় তবু সেটা যারা করছে তাদের ডেডিকেশনকে আমি সমর্থন করি। নকশালদের মধ্যে যে ডেডিকেটেড ছেলের অভাব ছিল না, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

—সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে অথবা বন্দুকের নলে...........কোন্ পদ্ধতিতে রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

—সংসদীয় পথে তো কোনওদিন সামাজিক পরিবর্তন আসেনি।

এর পর আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না। বিশেষ পুলিশ পাহারায় তাকে, ট্যারামাস্টারকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

গরু মোষের দেহাবশেষ কিছুই পড়ে থাকে না। সেগুলো চুবি হওয়ার ব্যাপারটি ঠিক নয়। চামড়া, শিং, খুব, নাড়িভুঁড়ি সব—সব বিক্রি হয়ে যায়। তাই মৃতপ্রাণীর শরীরাংশ পচে অসুখ ছড়াবার অভিযোগ ভিত্তিহীন। এমনকি পশুর রক্তও চুক্তি অনুযায়ী একটি সংস্থাকে বিক্রি কবা হয। প্রতিবছব ওই সংস্থা এ কাবণে পুবসভাকে টাকা দেয়। কলকাতা কসাইখানা কোনও সময়েই সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য নয়। ও সব রটনা।

রাজ্যেব স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন কবা হলে তিনি বলেন . কসাইখানা তথা শহবেব মাংস বিক্রিব বিষযটি দেখাশোনার দাযিত্ব পুরসভাব। অসুখ-বিসুখের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে রাজ্য সরকার খতিয়ে দেখবে, তাব আগে চেঁচামেচির কী আছে.

ট্যারামাস্টারেব আব কোনও খবর নেই। □

ঠিকানা জানা নেই

সুব্রত নিয়োগী

বৃদ্ধা মহিলাটিকে এ পাড়ার সবাই প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পেত। কখনও থলে হাতে বাজার করে ফিরছে, কখনও ঘরের ভেতর দু-চারটে বাচ্চা ছেলেমেয়েকে কী সব পড়া দেখিয়ে দিচ্ছে। কখনও বা ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসত রান্না করার ছ্যাঁকছুঁক শব্দ। পীতাম্বর পাত্র লেন দিয়ে শর্টকাট করে ট্রামরাস্তায় আসতে গেলে ওই বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হবে প্রত্যেক পথচারীকে। বাঁক নেওয়ার সময় চোখে পড়েই যাবে। পুরনো বাড়ি। নোনা ধরা দেওয়াল। পলেস্তরা খসে পড়েছে। বেরিয়ে পড়েছে ইটের নড়বড়ে দাঁত। ঝরে পড়ছে সুরকির গুঁড়ো।

প্রথম থেকেই মহিলাটিকে আমার চেনা মনে হত। কোথায় যেন দেখেছি তাকে। দূর থেকে দেখেছি বলে কখনও পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়নি।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছি বৃদ্ধাটি আধ-ময়লা সাদা থান পরে উবু হয়ে বসে তরকারি কাটছে আপনমনে। কখনও বা জানলা দিয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে দেখছে মেঘের আনাগোনা। তার চারপাশে দুইএকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক কোনও দ্বিতীয় প্রাণী চোখে পড়েনি। আসলে এই সামান্য বৃদ্ধা মহিলাটি সম্বন্ধে কারও কোনও আগ্রহ ছিল না। মনে হয়, বৃদ্ধাটিরও কোনও মানুষ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ নেই। বড় নিষ্প্রয়োজনভাবে বেঁচে আছে রমণীটি।

হঠাৎই সেদিন পীতাম্বর পাত্র লেনের বাঁকের মুখে একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম তার। বাজারের থলে হাতে শ্লথগতিতে এগিয়ে আসছে সেই মহিলা।

বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে দলে দলে পাখিরা মালার মতো উড়ে যাচ্ছে সূর্যের দিকে। গলির ভেতর চুপি চুপি ঢুকে পড়ছে অন্ধকার। গলির ল্যাম্পপোস্টগুলো এই বিকেলবেলায় কে যেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। ক্ষীণ আলোর নীচে ক্ষয়ে যাওয়া চেহারার বৃদ্ধাটিকে দেখলাম আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো নিষ্প্রভ হলেও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে হঠাৎই বলে ওঠে, 'কে বাবুয়া, না?'

আমি প্রায় চমকে উঠি। স্মৃতি তোলপাড় করে ওঠে আমার। এ নামে কে ডাকে। আমার এই আটত্রিশ বছর বয়সে আমাকে কেউ আর 'বাবুয়া' বলে ডাকে না। হঠাৎ কোনও পুরনো বন্ধু পেছন থেকে আমার ওই ছেলেবেলার নাম ধরে ডাকলে বড় অবাক হই এখন। ভালোও লাগে।

বৃদ্ধা মহিলাটি আবার আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সঙ্কোচহীনভাবে বলল, 'তুই বাবুয়া তো? তোকে রোজ এ গলি দিয়ে যেতে দেখি। তোকে আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। মুখের আদলটা সেই ছোটোবেলার মতোই আছে। একই রকম আছে, একেবারেই পালটায়নি। তবুও ভেবেছিলাম, তোকে একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করব।'

খুব কাছ থেকে মহিলাটিকে দেখতে পেলাম এবার। ফরসা মুখের ত্বক কোঁচকানো। মাথায় সাদা থানের ঘোমটা। ঘোমটা সরে গেলে দেখা যায় চুলে ছোটো করে ছাঁটা। তবুও চিনতে ভুল হয় না আমার।

শোভানাকাকিমা!

সিনেমার ছবির মতো শৈশব ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার সেই সময় তার বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ নিয়ে আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। আমার তখন কতই বা বয়স। বারো-তেরো হবে।

শোভানাকাকিমার স্বামীকে আমরা মৃদুলকাকা বলে ডাকতাম। মৃদুলকাকা আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাজনীতিতে। গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করতে গিয়ে মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। কোর্টের বিচারে মৃদুলকাকার দুবছরের জেল হয়। জেলের ভেতর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয় মৃদুলকাকাকে। তখন শোভনাকাকিমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি মৃদুলকাকার। মৃদুলকাকার সামনের সারির দুটি দাঁত ছিল না। বাঁধায়ওনি মৃদুলকাকা।

কাকিমাকে মৃদুলকাকার দাঁতের কথা জিজ্ঞেস করলে কাকিমা হাসত। কোনও উত্তর দিত না। পরে জেনেছি, জেলের ভেতর অনশন করতে গিয়ে জোর করে খাবার খাওয়ানোর সময় মৃদুলকাকার দাঁত দুটো খোয়া যায়। আরও জেনেছি, জেলের ভেতর ইলেকট্রিক শক দেওয়ার ফলে মৃদুলকাকার যৌনক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মৃদুলকাকা যদি চাইতেন, তবে নিদেনপক্ষে একটা এম এল এ হওয়া কেউ আটকাতে পারত না, এমনকি মন্ত্রীও হতে পারতেন। মৃদুলকাকা তা চাননি। চেয়েছিলেন এক সাধারণ ভারতবাসী হয়ে বেঁচে থাকতে। তাই বেছে নিয়েছিলেন সামান্য এক ওষুধ কারখানার তুচ্ছ চাকরি। অগণিত দীন মানুষের একজন হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন মৃদুলকাকা। আর শোভনাকাকিমা চেয়েছিল, অকিঞ্চিৎকর এক মানুষের স্ত্রী হয়ে রোমাঞ্চহীনভাবে জীবনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিতে।

আমরা ছোটোরা কাকিমাকে দারুণ ভালোবাসতাম। কাকিমা কেমন নরম স্বরে কথা বলত। আমাদেব সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করত যেন সে আমাদের বন্ধু। কাকিমা কাছে এলে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগত। এখনও জানি না কাকিমা কোনও সুরভি ব্যবহার করত কি না। কাকিমার লেখাপড়া কতদূব ছিল জানি না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথেব গান গেয়ে উঠত দুই-এক কলি।

মৃদুলকাকাদের বলবার মতো গালভরা ঐশ্বর্য ছিল না। ছিল না সন্তান-সন্ততি। তাঁদের চাহিদা ছিল খুবই সীমিত। মৃদুলকাকার মা কিছু টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন। কলকাতার কাছে বারুইপুরে একটা ছোট্টো জমি কিনেছিলেন মৃদুলকাকা। জমি কেনার সব টাকা দিতে পারেননি বলে মৃদুলকাকা তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে জমিটা কিনেছিলেন। সেই জমির ওপর ছোট্ট এক বাড়ি তৈরি করেছিলেন মৃদুলকাকা। সেই বাড়ির একটা ঘরে শ্রমিক-কৃষকদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের গান ও লেখাপড়া শেখাতেন শোভনাকাকিমা।

—তুমি কেমন আছ বলো কাকিমা? তুমি এ বাড়িতে কেন? তোমাদের নিজেদের বাড়ি ছিল তো বারুইপুরে? তুমি কি সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছ'

একবাশ প্রশ্নের সামনে ফেলে দিলাম ছেলেবেলায় দেখা কাকিমাকে এত বছর বাদে এই কলকাতায়।

শোভনাকাকিমা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'কী হবে ও সব শুনে। এতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা, তোর কথা কিছু শুনি! সেই যে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়ার পর বারুইপুর ছাড়লি আর তো দেখাই হল না। তবে তোর মুখটা ভুলিনি। না হলে তোকে তো চিনতেই পারতাম না।'

—এবার তোমার খবর দাও কাকিমা। তোমার এ রকম চেহারা, আমি তো চিনতেই পারিনি।

রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত লোক হেঁটে যাচ্ছে। ঠুংঠুং শব্দ করে একটা রিকশাও চলে গেল। স্কুল ইউনিফর্ম পরা এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলে হইহই করে স্কুল বাস উঠে পড়ছে। রাস্তার একধাবে চলে এল ওবা দুজনে।

—তোর মৃদুলকাকা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার দুঃখ-কষ্টের শুরু। যদিও কাউকে জানতে দিইনি। এই কয় বছরে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছি শুধু। আমার বাড়ির অংশ তোর মৃদুলকাকার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলের কাছে জলের দরে বিক্রি করে এসেছি। ওখানে থাকা যাচ্ছিল না। অন্তত আমার মতো মানুষের ওখানে থাকা সম্ভব নয়। ওদের ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে যে ভাষায় কথা বলত, যে ব্যবহার করত তুই ভাবতে পারবি না রে বাবুয়া। আমি ওখানে থাকলে মরে যেতাম।

আমি বললাম, 'তা বলে, তুমি তোমার ওয়ারিশন ছেড়ে দিয়ে এভাবে চলে আসবে?'

—অনেক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই বাড়ির একটা ঘরে ঠাঁই নিয়েছি। বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দেখিয়ে দিই। গানও শেখাই একটু-আধটু। ওরা বিনা ভাড়ায় থাকতে দিয়েছে।

—তোমার খাওয়া-দাওয়া?

তোর কাকার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আর বারুইপুরের বাড়ি বিক্রির টাকা পোস্ট অফিসে খাটিয়ে যে সুদ পাই তাতেই দিন চলে যায় কোনওমতে।

—তোমাকে কি ওরা আজীবন থাকতে দেবে? বাকি জীবনটা তোমার কীভাবে কাটবে শোভনাকাকিমা?

—না, ওরা আমাকে ঘর ছাড়ার নোটিস দিয়েছে। ওদের পরিবার বড় হচ্ছে, ওদেরও জায়গার দরকার।

সামনের ছোট্ট পার্কের ল্যাম্পপোস্টগুলো জ্বলে উঠল। বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে আবছা মানুষের ছায়া। শিশুদের চিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। পার্কের গাছ-গাছালির মাথায় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

—চল না, ওই পার্কের ভেতর গিয়ে বসি দুজনে। এতদিন পরে দেখা কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

দুজনে ধীর পায়ে পার্কের লোহার গেট পেরিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম।

দুজনে পাশাপাশি অনেক বছর বাদে বসে আছি। ল্যাম্পপোস্ট ঘিরে আবছা-কুয়াশা। অবিরাম পাখিদের কিচিরমিচিরের মধ্যে আমিই প্রথম কথা বললাম, 'এবার কোথায় যাবে তুমি কাকিমা? বাকি জীবন কি শুধু ঘুরে ঘুরেই বেড়াবে! এক জায়গায় থিতু হবে না?'

—চলে যাব কোথাও। তুই এ নিয়ে চিন্তা করিস না বাবুয়া। বলে সেই আগের মতোই হাসতে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'কাকিমা, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে? আমাদের পরিবারের একজন হয়ে—বাবা-মা তো সেই কবেই গত হয়েছেন। তুমি যদি থাকো আমাদের মানে আমার আর আমার বউয়ের ভালো লাগবে। ছেলেমেয়েরাও ভালোবাসবে তোমাকে।'

—দূর বোকা, তুই রাজি হলে কি হবে, তোর বউ আছে না—ছেলেমেয়ে।

—তা হলে, চলো তোমাকে একটা ওল্ড এজ হোমে রেখে আসি। অনেকের সঙ্গে সেখানে থাকবে। ভালো লাগবে। আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে সেখানে।

—আমার আর মানুষের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে না রে। এই কয়েক বছরে মানুষ কত পালটে গিয়েছে! আমি কারুকে চিনতে পারি না। চেনা লোককেও কেমন অচেনা মনে হয়। সেই সব সরল কিন্তু একরোখা মানুষেরা কোথায়।

আমি চুপ করে থাকি। কী উত্তর দেব বুঝতে পারি না। এ কথার কোনও উত্তর হয় না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে শোভনাকাকিমা বলে, 'তোর বারুইপুরের কথা মনে আছে বাবুয়া?'

—হ্যাঁ, কেন মনে থাকবে না। তোমাদের বাড়িটা বড়ো সুন্দর ছিল। রাস্তার একপাশে ঘন বাঁশবন। অন্য পাশে জাম, বাবলা, পেয়ারাগাছের সারি। বাঁশগাছ নুয়ে পড়েছে রাস্তায়। বাসরাস্তা থেকে তোমাদের বাড়ি যাওয়ার পায়ে হাঁটা পথ ধরে যেতে যেতে চোখে পড়ত পুকুর-ডোবা। একটা-দুটো নয়, অসংখ্য। কোনও পুকুরের জলের ওপর কচুরিপানার পুরু সবুজ চাদর। কোথাও কিনারা ঘেঁষে জলঝাঁঝি, কলমির দাম। কচুরিপানার জঙ্গলের ভেতর আঁকাবাঁকা জলের রেখায় ভেসে বেড়াত হাঁসের দল। বাতাসে হাঁসের গায়ের গন্ধ। ওখান থেকে চলে আসার পর আর বারুইপুর যাওয়া হয়নি। আসলে আর ভালো লাগে না যেতে।

কাকিমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কুঞ্চিত চোখে হাসির রেখা।—'তুই সেই আগের মতোই রয়ে গেছিস। এতটুকু পালটাসনি—এখনও ছবি আঁকিস?'

—না, সে সব সেই কবে চুকিয়ে দিয়েছি।

—আর তোর ছেলেমেয়েরা কেউ?

—না, ওদের যা পড়ার চাপ, ও সব করার সময় কোথায়। তুমি পালটানোর কথা বলছ, তুমি কিন্তু বেশ পালটে গেছ। তোমাকে তো আমি চিনতেই পারিনি প্রথমে। ভুরুর ওপরে কাটা দাগটা দেখে তবে চিনলাম।

কাকিমা হাসে।—'মনে হয়, এই তো সে দিন আমি এক-কাপড়ে তোর মৃদুলকাকার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ওই রকম আদর্শবান মানুষ আর দেখলাম না। আমাকে যখন বিয়ে করে তখন তোর কাকা আশি টাকা মাইনের ছোট্ট এক ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করে।

—তোমার কথা ছোটবেলায় আমরা কিছুই জানতাম না। আচ্ছা, তোমার বাপের বাড়ির কেউ নেই?

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। পার্কের ঘাসে বা বেঞ্চিতে বসে থাকা লোকজন কখনই উঠে গেছে। দূরে একটি বেঞ্চিতে এক যুবক-যুবতী ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে তখনও।

—আমার বাবা অসমের দরঙে হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। বড় গোঁড়া ছিলেন তিনি। কলকাতায় মাসির বাড়িতে বেড়াতে এসে তোর মৃদুলকাকার সঙ্গে হঠাৎই আলাপ। বিয়ের পর একদিনের জন্যও বাপের বাড়ি যাইনি। বাবা মারা যাওয়ার পর ভাইয়েরাও কোনও সম্পর্ক রাখেনি। বিয়ের রেজিস্ট্রির দিন বন্ধুদের মোগলাই আর আলুর দম খাইয়েছিল তোর মৃদুলকাকা। ওর অনিশ্চিত জীবনযাত্রার জন্য ও বিয়ে করতে চায়নি প্রথমে। বন্ধুরাই বিয়ের জন্য জোর করে।

ট্রামরাস্তা থেকে গাড়িঘোড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। একটা হলুদ ট্যাক্সি এসে থামল পার্কের খুব কাছে। ট্যাক্সি থেকে নামল একজোড়া নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা। পাশ দিয়ে ঠুংঠুং ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা চলে যায়। রিকশায় প্রবীণ এক মদ্যপ সওয়ারি। পার্কের ধারের বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় আলো। টিভিতে নেপালি গান পরিত্রাহি বেজে চলেছে ঘরে ঘরে।

সে দিনের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে আজ। তখন শীতকাল। চারপাশের গাছ-গাছালিতে তখনও কুয়াশা আবছাভাবে লেগে আছে। দিনের আলো ফুটব ফুটব করছে। কে যেন ঘুম ভাঙিয়ে খবর দিল মৃদুলকাকা পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। আমি কাউকে কিছু না বলে দিনের আলো ফুটবার আগেই পৌঁছে যাই মৃদুলকাকার বাড়ি। বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি জলপাইরঙা পোশাক আর মাথায় জাল বিছানো হেলমেট পরা মিলিটারির দল ঘিরে ফেলেছে ছোট্ট বস্তিটাকে। চলছে কম্বিং অপারেশন।

বেলা বাড়তে পুলিশ-মিলিটারি চলে যেতেই আমি মৃদুলকাকার বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। শোভনাকাকিমা নেই। পুলিশ কাকিমাকে নিয়ে গিয়েছে মৃদুলকাকার লাশ শনাক্ত করার জন্য। পরে আমরা ছোটরা জেনেছিলাম বারুইপুরের কাছে এক ধানখেতের ভেতর মৃদুলকাকা আর তার দুজন সঙ্গীর লাশ পড়েছিল। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে মৃদুলকাকার মৃত্যু হয়।

শোভনাকাকিমার চোখ দুটি স্থির। চশমার আড়ালে ঘোলাটে মণি দুটো অচঞ্চল। যেন অন্য কোথাও তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে।

কাকিমাকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা এত বছর পরে তুমি বল তো সত্যিই কি মৃদুলকাকা পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা যায়?'

—তোরা সবাই ভুল জানতিস বাবুয়া। গভীর রাতে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে ওরা হরিনাভি যাচ্ছিল। কোনও এক গোপন মিটিংয়ের খবর পুলিশ আগেই জেনে ফেলেছিল। লেভেল ক্রসিংয়ের দিকে বন্দুক তাক করে অসংখ্য পুলিশ লুকিয়েছিল অন্ধকারে জল-জঙ্গলের ভেতর। তোর কাকা দলবল নিয়ে রেললাইনে পা দিতেই গুলির ঝাঁক এসে পড়ল ওদের ওপর। লাশ চেনাতে নিয়ে গেলে দেখেছিলাম তোর মৃদুলকাকার শরীরে পঁচিশটি গুলির দাগ।

শোভনাকাকিমার মুখ কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মুহূর্তেও মধ্যে। মুখের একপাশে রাস্তার আলো, অন্য পাশে অন্ধকার। মনে হল, কাকিমার চোখের কোণে জলের রেখা।

কাকিমা বলেই চলল, 'বহুদিন পরে তোর মৃদুলকাকাকে দেখলাম আবার। ওর পরনে ছিল চেক লুঙি আর ফতুয়া। ফতুয়ার ওপরে সবুজ জহরকোট। গলায় ক্যাটকেটে রঙের এক মাফলার। ইচ্ছে ছিল, শ্মশানে যাওয়ার আগে ওকে সাজিয়ে দেব ভালো করে। পরিয়ে দেব গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি, কপালে দেব চন্দনের ফোঁটা। শরীরের পঁচিশটি গুলির দাগ ঢেকে দেব রক্তগোলাপের পাপড়ি দিয়ে। সারা শরীরে ঢেলে দেব অগুরুর শিশি। জ্বালিয়ে দেব সুগন্ধি ধূপকাঠি। মাথার দু পাশে থাকবে সাদা রজনীগন্ধার তোড়া, কিন্তু কিছুই পারিনি রে বাবুয়া। পুলিশ তোর মৃদুলকাকার লাশ ছুঁতে দেয়নি আমাকে। পুলিশ সর্বক্ষণ ওর মৃত শরীরকে ঘিরে ছিল। চুল্লিতে ছাই না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশের দল। বড় অনাদরে তোর মৃদুলকাকাকে মরতে হয়েছিল।'

খুব কাছ দিয়ে বজবজের লাইন চলে গেছে। এইমাত্র রেললাইন কাঁপিয়ে ঝমঝমিয়ে একটা ট্রেন কালীঘাট স্টেশনের দিকে চলে যায়। ট্রেনের শব্দে শোভনাকাকিমার শেষের দিকের কথাগুলো হারিয়ে যায়। আমরা দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ট্রেনের চলে যাওয়ার শব্দ শুনি।

একসময় শোভনাকাকিমাকে ঘিরে থাকত অনেক লোক। কত লোককে যে দিনে হাতে তৈরি আটার রুটি খাইয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তখন দিনে-রাত্রে উত্তেজনা ছিল। ছিল কম্বিং রেড অ্যাকশন। এখন রোমাঞ্চহীন এবং নিস্তরঙ্গ জীবন বয়ে চলেছে মৃদুলকাকার স্ত্রী।

ট্রেনের শব্দ থেমে গেলে বলি, তুমি বৃদ্ধাবাসেই চলো কাকিমা। ওরা তোমাকে বেশিদিন এখানে থাকতে দেবে না। তুমি যদি বলো, আমি তোমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ঝাড়গ্রামে আমার পরিচিত একজনের একটা ওল্ড এজ হোম আছে। খুব সস্তায় করে দিতে পারব। শুনেছি, পাশেই আদিবাসী মেয়েদের একটা অরফানেজ আছে। ওখানকার মেয়েদের গান শেখালে তোমার কিছুই লাগবে না।'

সে দিন ছিল রবিবার। কাকিমাকে বলেছিলাম, 'ঠিক ভোর পাঁচটায় তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে তুমি রাস্তায় মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

কথামত কাকিমা হাতে একটা ছোট্ট টিনের স্যুটকেস নিয়ে সেই সাতসকালে এসে দাঁড়িয়েছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশে। বাইরে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। কুয়াশায় চারদিকে ছেয়ে আছে। তিন হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। গাড়িগুলো হেডলাইট জ্বালিয়ে আসছে আর যাচ্ছে। কাকিমার গায়ে জড়ানো আছে সামান্য একটা শাল।

আমি কাকিমার সামনে দাঁড়াতেই কাকিমা বলল, 'এসে গেছিস বাবুয়া, চল।'

ট্যাক্সিতে উঠে শোভনাকাকিমা বলল, 'তোর বউকে নিয়ে এলি না কেন রে বাবুয়া। বেশ পরিচয় হত। আজকালকার মেয়েদের আমার বড়ো ভালোলাগে। আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধি ধরে ওরা। স্বাধীনতাও অনেক। নিজেরা চাকরি করছে, ছেলেমেয়ে মানুষ করছে, একা সংসার সামলাচ্ছে। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোকে দেখতে বেশ লাগে।'

ঝাড়গ্রাম স্টেশনে ট্রেন থেকে যখন নামলাম তখন সকাল নটা সাড়ে নটা হবে। অথচ চারদিকে মেঘ জমে আছে। অন্ধকার হয়ে গেছে রাস্তাঘাট। অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও। কিন্তু রাস্তায় কোনও যানবাহনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আকাশ কালো হয়েছে এসেছে। মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। অকাল বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা ভিজিয়ে দিচ্ছে মাটি।

বৃষ্টিতে, ঠান্ডায় শরীর অসাড় হয়ে আসছে। শোভনাকাকিমা থরথর করে কাঁপছে শীতে। কাকিমা আমার একটা হাত চেপে ধরে অন্ধকারে পথ চলছে। আমার অন্য হাতে কাকিমার স্যুটকেস। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমাকে আঁকড়ে ধরছে কাকিমা। যেন আমিই তার একমাত্র আশ্রয়। যেন আমিই তাকে নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে মুক্তি দিতে পারি।

জনমানবহীন রাস্তায় হঠাৎ, দেবদূতের মতো একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, এখানে জয়ন্তী বৃদ্ধাবাস বলে সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধাদের একটা থাকবার জায়গা আছে না? কোথায় বলতে পারেন?'

ভদ্রগোছের লোকটি বলে, 'কেন থাকবে না। হেঁটে যান কিছুটা। আজ তো রিকশা পাবেন না। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে কিছুদূর গেলে দেখবেন বাঁদিকে একটা সিনেমা হল। সিনেমা হল পেরুলে দেখতে পাবেন জঙ্গলের শুরু। সেখান থেকে দু-কদম এগুলেই ওল্ডহোম।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কদ্দূর?'

লোকটা বৃষ্টির মধ্যে চলে যেতে যেতে বলে, 'বেশিদূর নয়।'

শোভনাকাকিমা আর আমি দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছি একেবারে। মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কাকিমাকে কোনওরকমে একটা বন্ধ দোকানের শেডের নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি বৃদ্ধাবাস খুঁজতে বের হই।

চারদিকের শাল-মহুয়ার জঙ্গল থেকে সবুজ জল নেমে যাচ্ছে মাটিতে। হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে মহুয়ার চিটচিটে গন্ধ।

বৃষ্টিতে ভিজে শোভনাকাকিমাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। জরাগ্রস্ত শরীরে লেপটে আছে গায়ের কাপড়। শালটা ভিজে চুপচুপে। ঠকঠক করে কাঁপছে কাকিমা।

কাকিমাকে একা রেখে আমি যখন বৃদ্ধাবাস খুঁজতে বের হই, কাকিমা বলল, 'বুঝলি বাবু, সারাজীবন এক চিলতে জায়গার জন্য যুদ্ধ করে এসেছি। মেয়েদের কাছে জায়গা হারানো প্রায় মৃত্যুর শামিল।'

ক্রমশ অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। বোঝা যাচ্ছে না দিন না রাত্রি। অপ্রতিরোধ্য বাতাস সঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে এসে প্রবল বেগে শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অবিরাম বর্ষণ, বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের গর্জন আর প্রাণিশূন্য রাস্তা একাকী হাঁটতে হাঁটতে আমি বৃদ্ধাবাসের দিকে এগিয়ে যাই। শোভনা কাকিমাব কাছে আমার কৈশোরের অনেক ঋণ জমা আছে।

জঙ্গল ক্রমশ ভয়ঙ্কর মূর্তি নিচ্ছে। জঙ্গলের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ভারীট্রাক দূরন্ত বেগে ছুটে যাছে। তাদের হেডলাইটের আলো ভেজা রাস্তায় পড়ে চকচক করছে। আমিও চোখ ঠিকরে ঠিকরে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। যেমন কবে হোক কাকিমাকে একটা স্থায়ী ঠিকানা জোগাড় করে দিতেই হবে। যেমন করে হোক।

মহুয়ার দোকানে এই সাতসকালে বৃষ্টির মধ্যে দোকানিকে ঘিরে চার-পাঁচজন আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ। গোঙানির সুরে এক দুর্বোধ্য গান গাইছে ওরা। গানের ভাষাটা বোঝবার চেষ্টা করি আমি। কিন্তু একটি বর্ণও বুঝতে পারি না। তবে সুর শুনে মনে হচ্ছিল, কোনও দেশাত্মবোধক গান গাইছে ওরা। গানের সুরটা কেমন উদ্দীপ্ত করে।

বৃদ্ধাবাসে পৌঁছে বন্ধুব চিঠি দেখাতে ম্যানেজার একটা ছাপানো ফর্ম দিয়ে বলল,' মহিলাটিকে নিয়ে আসুন আর এই ফর্মটা ওঁনাকে দিয়ে ফিল-আপ করিয়ে নিন। আর কোনও লোকাল ডাক্তারকে দিয়ে একটা হার্টের ই-সি-জি করিয়ে নিয়ে রিপোর্ট জমা দিন। এই ফর্মালিটিগুলো না করলে তো ওঁনাকে এখুনি ভর্তি করাতে পারছি না।' তারপর ইংরেজিতে বলল, 'কাইন্ডলি বিয়ার উইথ আস।'

ইচ্ছে হল, সাঁটিয়ে লোকটাকে এক থাপ্পড় কষাই। শালা, নিয়ম ফলাচ্ছে।

আমি ফিরে আসার সময় লোকটা বলল, ওঁর কোনও স্কিন ডিজিজ-টিজিস নেই তো? পরে কিন্তু বড়ো ঝামেলা হয়।

বৃষ্টি কমে এসেছে। আমি ফর্মটা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ফিরে যাই কাকিমার কাছে। চায়ের দোকান থেকে ভেসে আসছে আদিবাসীদেব গোঙানি সুরে গান। নাকে এসে লাগছে তরল মহুয়ার চিটচিটে গন্ধ।

ফিরে এসে দেকি, যে বন্ধ দোকানে শেডের নীচে কাকিমাকে অপেক্ষা করতে বলে এসেছিলাম সেখানে শোভনাকাকিমা নেই। কাছেপিঠে কোথাও নেই। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি কাকিমাকে। আশপাশের মানুষজনকে জিজ্ঞেস করি, তারাও কিছু বলতে পারে না। আমি অভিমানী গলায় চেঁচিয়ে ডাকতে থাকি, কা—কি—মা, শো—ভ—না কাকিমা—আ—আ—।

আমার চারপাশে কোথা থেকে এক দঙ্গল লোক এসে ভিড় করে। লোকগুলো এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে!

বৃষ্টিতে আপাদমস্তক ভেজা একজন বয়স্ক মানুষ পরিত্রাহি চেঁচিযে চলেছে—এ দৃশ্যে তারা রগড় পেল। একটা রাস্তার কুকুর আমার দেখাদেখি আকাশের দিকে মুখ করে করুণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। লোকগুলো কুকুরের চিৎকার শুনে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে থাকে।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। বৃষ্টির শব্দও আর নেই।

দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজছে দূরে কোথাও। সাঁওতালপল্লিতে আজ উৎসব হবে। □

আজ কাল পরশুর গল্প

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

পেছনের দিকে হেলান দিয়ে বিড়িটা ধরিয়ে আরাম করে একটা টান দিল অনাদি। কাজ ভালো হল কিনা ভাবল। কিন্তু কী আর করা যায়—সেই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে স্টেশনের হোটেলে খাওয়ার পাট চুকিয়ে গাড়িতে এসে বসে আছে—একটাও প্যাসেঞ্জার নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল—গাড়িতে বসে বসেই হাঁক মেরে মন্টুর দোকানের ছোকরাটাকে চা দিতে বলেছিল অনাদি। চা খেল ওখানেই। বড়ো ঢিলে ঢিলে লাগে শরীরটা আজকাল। বসলে উঠে নড়তে ইচ্ছা করে না আর। বসে বসেই প্রায় ঘুম এসে গেছিল অনাদির। এমন সময় এল লোকটা। অনাদির হাতের উপরের দিকে আলতো করে হাত দিয়ে ডেকেছিল আস্তে আস্তে। 'সন্তোষপুরের বাজার কতটা হবে এখান থেকে ভাই?' —জানতে চাইল। ইচ্ছে—গাড়িটা ভাড়া নেওয়ার, সাহস করে বলেনি আর কি, ঘুরিয়ে জানতে চেয়েছিল। অনাদি গা করেনি বিশেষ। 'মাইল দশেক হবে', আলতো করে উত্তরটা দিয়েছিল। এবং তারপরই লোকটার মুখের দিকে চোখ পড়ল তার। একটু থমকে গেছিল অনাদি। অনেকটা কাঁচাপাকা দাড়ি, আধময়লা জামাকাপড়ে লোকটাকে যেন কীরকম লেগেছিল। মুখটা চিন্তিত মনে হয়েছিল খুব। একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'যাবেন আপনি?' একটু যেন উজ্জ্বল হল লোকটার চোখ দুটো। 'নিয়ে যাবে?' —এখুনি উঠে বসতে পারলে বাঁচে যেন। 'পুরো ভাড়া দিতে হবে'—গম্ভীর হল একটু অনাদি—'শেয়ারের গাড়ি এ সব, দশজন নিয়ে যাই এক এক বারে, মাথা পিছু তিনটাকা নিই। আপনি একা নিলে পঁচিশ দিতে হবে অন্তত।' 'পঁচিশ?' —একটু যেন দমে গেল লোকটা, তারপরেই বলল, 'ঠিক আছে, তাই পাবে। আমাকে রাতের আগেই পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু।' 'তা যাবেন পৌঁছে সাতটার মধ্যেই; এখন তো সাড়ে পাঁচটা মোটে'; লোকটাকে আশ্বাস দিয়েছিল অনাদি। 'তা হলে দুমিনিট দাঁড়াও আমি আসছি'—মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেছিল লোকটা। দূর থেকেই অনাদি দেখল স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো আর একজনকে কী যেন বলতে বলতে একটু এগিয়ে গেল, বোধ হয় খবর দিল গাড়ি পাওয়া গেছে, পৌঁছে যাব ঠিক।

এরই ফাঁকে ঘটল ব্যাপারটা। বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে অনাদি ভাবছিল কাজটা ঠিক হল কি না, সন্তোষপুরের প্যাসেঞ্জার নেওয়াটা। লোকটা সন্তোষপুর যাচ্ছে বলল। অনাদি যা ভেবেছে তা যদি ঠিক হয় তা হলে খুব মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে অনাদি। সন্তোষপুরের মিটিং আজ। ওই সাতটাতেই শুরু হওয়ার কথা, লোকটা তার মধ্যেই পৌঁছতে চাইছে। রেলে কাজ করে যারা তাদের কোয়ার্টারও ওই দিকে। আর দু দিন মোটে বাকি—তারপরেই ধর্মঘট শুরু হচ্ছে ওদের। অনাদি শুনেছে ব্যাপারটা, এই স্টেশনেই শুনেছে। স্টেশনে গেলে যে কেউ শুনতে পাবে এখন—চারদিকে পোস্টার—দাবি—এখানে ওখানে ছোটো ছোটো জটলা চলছেই সারাদিন। স্টেশন মাস্টার গুপ্তদা, টিকিট কালেক্টর বাবু, পয়েন্টম্যান রামবিরিজ, আরও সবাই বলাবলি করছে কদিন ধরে—সবারই ভরসা ওই সন্তোষপুর। এ তল্লাটে রেল চলাচল বাতিল করতে হলে সন্তোষপুরই তা করবে। ইউনিয়নের ঘাঁটি ওটা—ওদের অনেক লোক ওখানে। আশেপাশের বহু স্টেশনকে একদম কানা করে দিতে পারে সন্তোষপুর। ওইখানেই কারখানা—কোয়ার্টার, সব। সেখানে মিটিং—একেবারে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আর কি। জোয়ানমদ্দ মজুররা হাজির হবে সব। সেখানে যাচ্ছে লোকটা। যাচ্ছে যখন বক্তৃতা করবে নিশ্চয়ই। হ্যান্ডবিলে বেরিয়েছে নামটা। অনেকদিন পরে দেখল অনাদি, মুখটা আবছা মনে ছিল—হঠাৎ দেখে ঠাহর করে উঠতে পারেনি ঠিক বছর তিনেক আগেই সে চলে গিয়েছিল এ তল্লাট ছেড়ে। লোকে বলত

মাস্টার, আসলে নাম ছিল অবিনাশ। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ এখন, হঠাৎ দেখলে চেনা যাবে না। অনাদি শুনেছিল ওর নামে ওয়ারেন্ট, পুলিশ খুঁজছে—খুঁজছে আরও অনেকে। হাতে পেলে ওকে টুকরো টুকরো করতে বেশি দেরি করবে না ওরা।

মিনিট দুয়েকও হয়নি লোকটা গেছে। পেছন দিকে একটা জোর হাঁক শুনল অনাদি। 'ওই একটা গাড়ি রয়েছে জগাদা—ওঃ শালা, বরাত জোর খুব'—বলতে বলতে এগিয়ে এল দলটা। জনা আটেক লোক, ছেলেই বলা যায়। এ তল্লাটের নয়, কাউকেই চিনল না অনাদি। না—চেনা বেরল একজন ওই জগাদা—জগন্নাথ কর। সন্তোষপুরেরই লোক। হালের মাতব্বর, গ্রামের মাথা আজকাল। ওই শেষবার ভোটের পর থেকেই লোক জেনেছে জগন্নাথকে। আগে রেশনের দোকান ছিল একটা, এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে আরও। বাস হয়েছে খান দুই—আরও নানান সব কারবার। সেই জগন্নাথই এগিয়ে এল এবার। দরজার হ্যান্ডেল ধরে চাপ দিল, তারপর বললে, 'সন্তোষপুরে পৌঁছে দেবে ভাই—ভাড়া যা লাগে দেব।' 'এ গাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে'—মুখটা শক্ত করে অনাদি বললে। 'চুপ শালা, ভাড়া হয়ে গেছে কী—জগাদা বলছে—যেখানে বলছে সেখানে যাবি'—পাশ থেকে এগিয়ে এল একজন। চাপা প্যান্ট পরেছে একটা, গায়ে রঙিন গেঞ্জি। জগন্নাথ থামাল তাকে। চাপা গলায় বলল, 'এখানে গোলমাল করিস না বিল্লু, না নিয়ে গেলে উপায় নেই।' 'আপনি সরে যান জগাদা, ও শালা কী কবে নেওয়াতে হয় আমি জানি, ওর বাপ নিয়ে যাবে।' 'এ গাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে'—অনাদি শক্ত গলায় বলল আবার। ততক্ষণে উঠে পড়েছে সব। জগন্নাথ এবার ঠান্ডা গলায় বলল, 'চল বাবা চল—তোকে ডবল ভাড়া দিয়ে দেব। কলকাতা থেকে বাবুরা এসেছে, একদিন ফুর্তি করবে—বেড়াবে—তুই আর মাটি করিস না।' অনাদি দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছিল। এ লোকগুলোর হাবভাব ভালো ঠেকছে না। ফুর্তি করতে এসেছে! ফুর্তি করতে এসেছ তো এখানে কী? এখানে ফুর্তি করতে কেউ আসে? ফুর্তি করবার জায়গা এটা? চেহারা দেখলে তো একটাকেও কিন্তু ভদ্রলোক মনে হয় না। সাজগোজের বাহার তো লপেট্টা মার্কা। ফুর্তি করতে এসেছ তো হাতে কী ওগুলো তোমাদের......ও লোকটাকে আবার কথা দেওয়া হয়ে গেল। এখুনি হয়তো এসে যাবে.......কী হবে কে জানে। অনাদি বলল, 'সত্তর টাকা ভাড়া লাগবে জগাবাবু।' 'তাই পাবি, তাই পাবি, এখন নে তাড়াতাড়ি চল দেখি।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। অনাদি দেখতে পেল গাড়িতে লোক দেখে একটু যেন সতর্ক। তবুও এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। এক্ষুনি এসে নিজের দাবি নিয়ে জুলুম করবে নাকি। তা করতে দেবে না অনাদি। কাছে এগিয়ে আসতে চোখের ইশারায় ওকে এগিয়ে যেতে বলল তাড়াতাড়ি। অবাক হয়ে তাকাল লোকটা, তারপর পা বাড়াল রাস্তার দিকে। জগন্নাথ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গুছিয়ে বসল গাড়িতে—খেয়ালই করল না এ সব। আটজন বসল কোনওরকমে সামনে পিছনে মিলিয়ে। 'এ শালা কি গাড়ি মাইরি—দম বন্ধ হয়ে মরে যাব নাকি?' জগার পাশের ছেলেটা সিগারেট ধরাল একটা। 'ব্যাগগুলো ঠিক করে ধরিস, গাড়ির মধ্যে বিপদ-টিপদ বাধাসনি বাপু।' জগন্নাথ সাবধান করল চাপা গলায়, চোখে কালো চশমাওয়ালা ছেলেটাকে। এতগুলো ব্যাগে কী আছে কে জানে! এদের মতলব খুব ভালো মনে হচ্ছে না অনাদির।

গাড়ি ছাড়ল। রাস্তার দিকে সতর্ক চোখ রেখে গাড়ি ছেড়ে দিল অনাদি। ঝামেলা শালা বাড়ছেই। এখন আবার খুঁজে পেতে হবে লোকটাকে। বেশি দূর যেতে হল না—সামান্য এগিয়েই একটা চৌমাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাশে গিয়ে সজোরে ব্রেক কষল অনাদি। 'আয় পঞ্চু, উঠে আয়—আপনারা একটু এ দিকে চেপে বসুন'—পেছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জগন্নাথকে বলল, 'আমার অ্যাসিস্টেন্ট।' পেছনের থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, এর মধ্যে আবার অ্যাসিস্টেন্ট—আগে তো বলোনি বাপ!' 'কী করব—দূরপাল্লার পথ যেতে হয়, সঙ্গে লোক না থাকলে চলে না।' অনাদি বিড়ি ধরাল। আবার একটা স্টার্ট। দিল গাড়িতে।

অনাদির মুখ গম্ভীর হচ্ছিল ক্রমশই। আড়চোখে একবার মাস্টারের দিকে তাকাল। ভাবলেশহীন মুখ, বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। পেছনের সিটে ছোঁড়াগুলো সিগারেট টানছে অনবরত। হঠাৎ কানে এল অনাদির—'ওখানে সব ঠিকমত বলা আছে তো জগাদা?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গেলেই দেখতে পাবি। হালদারবাবুকে বলা আছে সব—সাতটায় শুরু হওয়ার কথা ওদের। সব বলা আছে, লোক চিনিয়ে দেওয়ার ভার ওরা

নিয়েছে। হালদারবাবু নিজে থাকবে, কেষ্ট থাকবে, কোনও চিন্তা নেই।' 'না—সে শালা ঠিক কাজ ম্যানেজ করে নেব। দমদম দু-চারটে আওয়াজ করলেই ধর্মঘটের মিটিং মাথায় উঠে যাবে শালাদের—মাল যা এনেছি না জগাদা। কলকাত্তাই সেরা জিনিস—একটা শুনবেন আওয়াজ?' ইশারায় অনাদিকে দেখিয়ে চুপ করতে বলল জগন্নাথ। বিশ্রী শব্দ করে হেসে উঠল ছেলেটা। অনাদি শুনতে পেল সব। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে মুখটা ঘুরিয়ে সোজা তাকাল অবিনাশের দিকে—অবিনাশের দৃষ্টি আর বাইরের দিকে নেই। 'কোন্ শালা যেন বক্তৃতা দেবে জগাদা ওদের মিটিংয়ে—খুব নাকি জবরদস্ত লোক'। 'ওকেই তো ঘায়েল করতে হবে, ওই অবিনাশকে—খুব ধুরন্ধর লোক' ....বিশ্রী শব্দ করে বাঁক নিল গাড়িটা—এখান থেকে হাই রোড ধরে মাইল তিনেক গেলে তবে সন্তোষপুরের রাস্তা।

'এ শালা কি গাড়ি চলছে মাইরি, পৌঁছতে তো রাতভোর হয়ে যাবে। মিটিং শেষ হয়ে যাবে শালা।' 'চালা, চালা বাবা, একটু টেনে চালা'—জগন্নাথ বলল পেছন থেকে। 'চেষ্টা তো করছি স্যার, পুরানো গাড়ি'—একটু যেন বিনয়ের সাথে কবুল করল অনাদি।

বাইরের দিকে চোখ রেখে বসেছিল অবিনাশ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে এখন। অনেক পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে চারদিক থেকে। আর দু দিন হাতে সময়। পরশু থেকে শুরু হয়ে যাবে ধর্মঘট, ভারত জুড়ে রেলের চাকা অচল হয়ে যাবে। এর মধ্যে সারতে হবে যা কিছু কাজ। আজকের মিটিংয়ের উপরেই নির্ভর করছে অনেক কিছু। এ অঞ্চলের সমস্ত দায়িত্ব অবিনাশের। সে জানে পুলিশ গুন্ডারা তৎপর। মিটিং শেষ পর্যন্ত হতে পারবে তো? অবিনাশ মুখ ঘুরিয়ে অনাদির দিকে তাকাল একবার। চিনতে পেরেছে মনে হচ্ছে। লোকটা বিপদে ফেলবে না তো? এই শয়তানগুলো এসে না জুটলে এতটা ভয়ের কিছু ছিল না। অনাদিও মুখ ঘোরাল এই দিকে। চোখাচোখি হল দুজনের। দুজনেই তাকিয়ে থাকল দুজনের দিকে কিছুক্ষণ। কী ভাবছে লোকটা কে জানে? এরা যাচ্ছে ওই মিটিং ভাঙতে—তাকে চিনতে পারেনি জগন্নাথ—সেই জগন্নাথ—একই গ্রামের ছেলে, এখন সে মাতব্বর সেজে ধর্মঘট ভাঙছে। এখানে লোক পায়নি—শহর থেকে মস্তান ধরে এনেছে। কী হবে শেষ পর্যন্ত, গভীর চিন্তায় অবিনাশ ডুবে গেল। বিশাল এক পুকুরের ধার দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। জলের মধ্যে অল্প হাওয়ায় তির তির করে ঢেউ ভাঙছে। শেষ সূর্যের আলোয় লাল হয়ে আছে জলটা। অবিনাশ সে দিকে তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ পারা যায়। বিশ্রী একটা শব্দ করে থেমে গেল গাড়িটা—হুঁশ ফিরে এল অবিনাশের। 'কী হল—কী হল? এখানে থামলি যে'—জগন্নাথের ব্যস্ত আওয়াজ শোনা গেল, ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে অনাদি। ইঞ্জিনের ঢাকনা তুলে এটা ওটা নাড়ল একটু। পেছনে গিয়ে অবিনাশকে ডাকল, 'নেমে আয় না শালা—বাবুদের পৌঁছতে হবে না! গাড়ি গড়বড় করছে আর তুমি শালা নবাবপুত্তুরের মতো বসে আছ।' কোনও কথা না বলে নেমে এল অবিনাশ। গাড়ির তলায় চট পেতে শুয়ে পড়ল অনাদি। রাস্তায় বসে পড়ে অবিনাশ সাহায্য করল তাকে। টুকটাক কাজ সেরে বেরিয়ে এল অনাদি। আওয়াজ করল জোরে কয়েকটা। কী হয়েছিল জানল না কেউ। গাড়ি চলতে শুরু করল আবার।

এখান থেকে সোজা আর খানিক পথ গেলে বটতলার মোড়। সেখান থেকে একটা সন্তোষপুরের রাস্তা সোজা—অন্যটা দিয়েও যাওয়া যায়, গোকুলপুর হয়ে ঘুর পড়ে অনেক। বটতলার মোড়ে এসে গাড়ি ঘোরাল অনাদি। পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল জগন্নাথ, 'একি—এদিকে কোথায় যাচ্ছিস—শালা—আমাদের ফাঁসাবার মতলব।' 'ওদিকে রাস্তা বন্ধ স্যার, কাল রাত থেকে—খুঁড়ে ফেলেছে রাস্তা, খিরাইয়ের ব্রিজ সারানো হচ্ছে, এই ঘুরেই যেতে হবে।' '.........তুই শালা ডোবাবি—চালা, চালা—জোরসে চালা, যে করেই হোক পৌঁছতে হবে মিটিংয়ের আগেই।'

গাড়ি ছাড়ল আবার। সোজা পথ চলে গেছে অনেক দূর। অন্ধকার ঘন হয়ে নামছে ক্রমশ। এ রাস্তায় জনবসতি বিশেষ নেই। দু পাশেই জঙ্গল—অজস্র জোনাকির আলো ঠিকরে ঠিকরে বেরচ্ছে সেখানে থেকে। জঙ্গল পেরিয়ে চাষের মাঠ—বহুদূর পর্যন্ত। তারপর গ্রাম—তারও পরে সন্তোষপুর। গাড়ির মধ্যে নিস্তব্ধ দশজন লোক। একটানা ইঞ্জিনের শব্দ উঠছে শুধু। শান্ত গম্ভীর মুখে অবিনাশ তাকিয়েছিল। বাইরের দিকে। ফস্ করে আওয়াজ হল, দেশলাই জ্বলে উঠল একটা। অবিনাশের পাশের ছেলেটা নিঃশব্দে একটা সিগারেট

ধরাল। এবং তারপরেই ঘটল ঘটনাটা। গতিটা আগেই কমে এসেছিল—কোনওরকমে যেতে যেতে শেষপর্যন্ত থেমে গেল গাড়িটা। হই হই করে উঠল জগন্নাথের দলবল। 'কী রে শালা, তোর গাড়ি তো দু পা যেতে না যেতেই হোঁচট খায়।' আবার নামল অনাদি এবং এবার এসে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'তেল ফুরিয়ে গেছে স্যার।' 'তেল না নিয়ে বেরোস কেন শালা—আজ শেষ করেই ফেলব তোকে', কলারটা চেপে ধরে দুম করে এক ঘুষি বসিয়ে দিল অনাদির মুখে এক মস্তান। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল জগন্নাথ, 'কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? দেখ্ দেখি বাবা কী বিপদে ফেললি। এখন উপায়? যেখান থেকে পারিস তেল নিয়ে আয় শালা, না হলে তোর লাশ পুঁতে রেখে যাব এখানে?' পেছনের ক্যারিয়ার থেকে পুরোনো টিন বার করল অনাদি। অবিনাশকে ডাকল, তারপর বলল, 'আপনারা বসুন গাড়িতে। অনেকটা পথ। যত জোরে পারি যাব-আসব। পৌঁছে দেব আপনাদের ঠিক।' 'ঠিক আছে যা তুই, চট্‌পট্ ফিরিস। আমরা অপেক্ষা করছি।'

জঙ্গল পেরিয়ে চাষের মাঠে নামল দুজনে। এতক্ষণে খুশিতে উজ্জ্বল অনাদির মুখ। ফিস ফিস করে বলল, 'এ ছাড়া আর উপায় কি ছিল মাস্টার?' চমকে অবিনাশ তাকাল অনাদির দিকে। 'শালা রাস্তায় শুয়ে তেলের ট্যাঙ্ক ফুটো করে দিয়েছি না! তেল ভর্তি না করে অনাদি ড্রাইভার রাস্তার বেরয় না। এখন তোমাকে পৌঁছে দিই। এখান থেকে আল ধরে ধরে সোজা পৌঁছে যাব সন্তোষপুরের বাজারে। পনের মিনিটও লাগবে না। মিটিং চটপট সেরে তুমি ফিরে যাও মাস্টার। সাবধানে যেও। ও শালারা উঠে পড়ে লেগেছে তোমার ধর্মঘট ভাঙার জন্যে। তারপর তেল নিয়ে ফিরে, পাকা রাস্তা ধরে সন্তোষপুর পৌঁছতে মাঝরাত হয়ে যাবে আমার। ওই—ওই আলো দেখা যাচ্ছে, ওই হল সন্তোষপুরের বাজারের আলো। এই পথ ধরে সোজা গিয়ে ডান হাতে উঠবে—ওখান থেকে বামুনপাড়া পেরিয়ে বাজারের মাঠ—সাবধানে যেও মাস্টার, তোমাদের হাতে সময় আর বেশি নেই।' 'আর তুমি?' 'আমি যাই, তেল নিয়ে নিই ঘোষপাড়ার পেট্রোল পাম্প থেকে—অনেক দূরের পথ—আমি চললাম মাস্টার—তুমি এগোও।' □

আততায়ী

দুলেন্দ্র ভৌমিক

বুকের মধ্যে ব্যথাটা আবার অনুভব করল সুনীল। ঘুমের মধ্যে সেই ব্যথাটা ছিল কি না সেটা বুঝতে পারেনি। হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে বাঁ দিকের বুকে সেই চিনচিনে যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়ছে। সুনীল দোতলার খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে শ্রাবণের ঘোলাটে আকাশ। অন্ধকারে ডুবে গেছে চাঁদের আলো। সুনীল আস্তে আস্তে উঠে বসল। ব্যথাটা বাড়ছে। এই ব্যথাটুকু নিয়ে নতুন করে কোনও দুশ্চিন্তা হল না। পুরুলিয়ার জেলে থাকতেই মাঝে-মাঝে এই ব্যথাটা উঠতও। তখনও তার কোনও দুশ্চিন্তা হয়নি। পুলিশ যাকে বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়ালের মতো এক জেল থেকে আর এক জেলে ক্রমাগত চালান করেছে, সামান্য অজুহাতে যাকে শাস্তি পেতে হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু যার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থেকে আবার উধাও হয়ে গেছে, সামান্য বুকের ব্যথা নিয়ে তার ভাবনা করার সময় থাকে না।

জেলের ভেতরে তার কোনও কষ্ট হয়নি। তার জন্যে যখনই যে ব্যবস্থা হয়েছে সে তাই মেনে নিয়েছে। কষ্টটা আরম্ভ হয়েছে কিছুদিন আগে। পুরুলিয়া থেকে আলিপুর জেলে আসবার পর মা একদিন দেখা করতে গিয়েছিল। মায়েদের চোখে-মুখে সব সময়ই এক ধরনের কষ্ট আর দুর্ভাবনা লেগে থাকে। সে দিনও ছিল। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। সুনীলের চাইতে তার মা আরও ভালোভাবে জানে জেল খাটা তাদের বংশে কোনও নতুন ঘটনা নয়। সুখী মানুষরা যেমন মাঝে-মধ্যে পুরী, দার্জিলিং কিংবা নৈনিতাল বেড়াতে যায়, সুনীলদের পরিবারের কেউ কেউ তেমন বছরে একবার করে জেলে যায়। এটা শুরু হয়েছিল ঠাকুরদা আদিত্য চৌধুরিকে দিয়ে। গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন তাঁর ধাতে সয়নি। তিনি যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলন সমিতিতে। তাঁর ধারণা ছিল গাল পেতে দিলে শাসকরা চড় মেরেই হাত গুটিয়ে নেয়, না, গলাও টিপে ধরে। বাঁচবার জন্যই রক্তপাত দরকার। মৃত্যুকে ভয় করলে জীবনকে ভালোবাসা যায় না। সে বার এক বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে আদিত্য চৌধুরিরা দল বেঁধে গিয়েছিলেন ট্রেজারিতে আগুন দিতে। সুনীল তখন জন্মায়নি। বাবা অনিল চৌধুরির মুখ থেকে শুধু জেনেছিল, সে রাত্রে ট্রেজারিতে আগুন ধরিয়ে আদিত্য চৌধুরির দল বায়ুবেগে ছুটে গিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাডসনের বাংলোয়। তখন সেখানে ইংরেজ ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে হাডসনেব মস্ত উৎসব। বাড়ির পেছনে ব্রহ্মপুত্র। আদিত্য চৌধুরিরা বোধ হয় ভেবেছিলেন খান চারেক হাতবোমা ফেলেই ব্রিটিশরাজকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যাবে। চারটে বোমার মধ্যে মাত্র দুটো ওঁরা ছুড়তে পেরেছিলেন। তারপরেই গোরা পল্টনদের পালটা আক্রমণ।

নদীর ঘাটে ডিঙি রাখা ছিল। সেই ডিঙি করে পালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওপারে গিয়ে ভোর রাত্রে ধরা পড়ে গেলেন আদিত্য চৌধুরি আর তার দলবল। জেলা শহর থেকে অপরাধীদের চালান দেওয়া হল দমদম জেলে। জেলের মেয়াদ কাটিয়ে বেরিয়ে আসার পনেরো দিন পরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাজে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে আবার জেল। সেই জেল থেকে ফিরলেন অসুখ নিয়ে। প্রথমে জ্বর। তারপর রক্তবমিতে আদিত্য চৌধুরি মারা গেলেন। মরবার আগে বাবাকে নাকি বলে গিয়েছিলেন, ইংরেজ জাতিটা খুব সভ্য, শিক্ষিত। কিন্তু শাসক, আর সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এ সব শিক্ষা আর সভ্যতার কোনও দাম নেই। দুনিয়ার সব শাসকদের একটাই চরিত্র—শোষণ করা। তুই এর বিরুদ্ধে লড়াই করিস।

আদিত্য চৌধুরির পরামর্শেই কি না কে জানে, স্বাধীনতার পর বাবা যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই স্বাধীনতা শুধু ক্ষমতা বদলের স্বাধীনতা। ভারতের মানুষের সার্বভৌম স্বাধীনতা বলতে

যা বোঝায় এটা তা নয়। ইংরেজ শাসনে একজন দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষক যেভাবে জীবন কাটাত এখনও ঠিক সেইভাবেই কাটায়। অনিল চৌধুরির বিশ্বাস তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল বিপর্যয়ের মুখে। সরকারি চাকরি খুইয়ে, স্কুল শিক্ষকের চাকরির সামান্য বেতন অবলম্বন করে তিনি যোগ দিয়েছিলেন তেভাগা আন্দোলনে। স্বাধীন ভারতে আন্দোলন করার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল অনিল চৌধুরিকে। তারপর খাদ্য আন্দোলনে আর একবার। শেষবার জেলে গিয়েছিলেন বোধ হয় আর এক খাদ্য আন্দোলনে। বারাসতে নুরুল ইসলাম মরেছে পুলিশের গুলিতে। সুনীলের দিব্যি মনে আছে সে সব কথা। মাঝরাত্রে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল পুলিশ। মা দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'কাকে চাই?'

পুলিশ উত্তর দেওয়ার আগেই বাবা বলেছিলেন, 'আমি তৈরি আছি। শুধু জামাটা পরে নিতে দিন।'

দুই চোখে আক্রোশ নিয়ে সুনীল দেখছিল বাবার চলে যাওয়ার দৃশ্যটি। বাবা যেতে গিয়ে তার দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন, 'খোকা, ভয় পাসনি। হয়তো তোকেও একদিন জেলে যেতে হবে। শাসকরা সব সময় নিরপেক্ষ জনতা পছন্দ করে। এই সমাজে নিরপেক্ষতা এক ধরনের ভণ্ড আত্মতুষ্টি। তোরা ছাত্র আন্দোলন চালিয়ে যাস।'

মধ্যরাতের অন্ধকারকে ফালা ফালা করে পুলিশ জিপের হেড লাইটের আলো জ্বলে উঠল। জিপ গাড়িটা নির্জন রাস্তা দিয়ে অনেকটা পথ সোজা গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিল। সুনীল নীলরঙের র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে যতক্ষণ দেখা গেল পুলিশ জিপের পেছনের লাল আলোটা দেখল।

তাদের বাড়ির দরজায় সেই পুলিশ জিপ চলে যাওয়ার পর অনেককাল আর কোনও পুলিশের গাড়ি আসেনি। অনেককাল পরে আবার যখন এল তখন অনিল চৌধুরির জন্য নয়।

সুনীল বিছানার উপর উঠে বসেছিল। এবার মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে জানলার সামনে গেল। বাইরে রাত ফুরিয়ে আসছে বোধ হয়। আকাশে মেঘ থাকায় ঠিক বোঝা গেল না। ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে সে শুধু আরাম অনুভব করল। তার মনে হচ্ছিল ঘরের আলো জ্বেলে নিজেকে একবার ভালো করে দেখে। তার চোখে-মুখে কি এমন কিছু আছে যা দেখে তাকে ভীতিকর মনে হতে পারে? কাল সন্ধ্যেবেলা সে যখন বাড়িতে এল তখন তার মুখের দিকে দিদি আর ওর ছোটো ছেলে টুকাই অমন করে তাকিয়েছিল কেন? টুকাইকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল সুনীল। টুকাই ভয় পেয়ে মার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দিদি কোনও কথা না বলে টুকাইকে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেল।

বাবা শুধু চোখ তুলে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কখন রিলিজ করল?'

সুনীল ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'চারটে দশ-এ।'

মা বলল, 'খোকা চা খাবি না, শরবত করে দেব?'

সুনীল জামাটা খুলতে খুলতে জবাব দিল, 'পারলে একটু চা দাও। তার আগে এক গ্লাস ঠান্ডা জল।'

মা চলে যাওয়ার পর সুনীল বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পার্টি নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়াতে খুশি হয়েছে?'

অনিল চৌধুরি অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, 'সে সব প্রসঙ্গ থাক। ও তর্ক তো আগেও অনেকবার হয়েছে. তুমি তোমার বিশ্বাসমত চলতে চাইলে আমি বাধা দেব না।'

সুনীল জামাটা সোফার ওপর রেখে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। মা জলের গ্লাস নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে. সুনীল এক চুমুকে জলটুকু খেয়ে পরম তৃপ্তিতে 'আঃ' বলে গ্লাসটা মার হাতে ফিরিয়ে দিল।

মা সুধা চৌধুরি ছেলের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোদের খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয়ই খুব খারাপ ছিল।'

সুনীল ম্লান হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'খারাপই তো থাকবে। আমাদের তো ট্রিট্ করা হয়েছে অ্যান্টিসোস্যাল মানে সমাজবিরোধী হিসাবে।'

চশমার ভেতর অনিল চৌধুরির দুই চোখ কুঁচকে গেল। সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, 'দিস ইজ আনফেয়ার। তোমাদের রাজনৈতিক মত এবং পথের সঙ্গে আমার তফাত থাকতে পারে কিন্তু তোমরা তো

রাজনৈতিক বন্দি, পলিটিক্যাল প্রিজনার। সরকার সেই স্বীকৃতিটুকু কেন দেবে না। বিদেশি সরকার যতবার বাবাকে ধরেছে ততবার রাজনৈতিক বন্দি হিসাবেই ট্রিট করেছে। বিধানবাবু আর প্রফুল্লবাবুর আমলে আমি যতবার জেলে গেছি রাজনৈতিক বন্দির প্রাপ্য মর্যাদাটুকু আমি পেয়েছি। এরা সেটুকু দিচ্ছে না কেন? তোমরা কি চোর, ডাকাত না গুন্ডা।'

সুনীল সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল। সেইভাবেই জবাব দিল, 'ওদের বিচারে হয়তো তাই।'

বাবার চোখ-মুখে তখনও ঘৃণা আর বিরক্তি লেগে ছিল। সুনীল সেই মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না। সে জানে এরকমটাই হয়। প্রথম যে দিন অ্যান্টিসোস্যাল হিসেবে তাকে 'সেলে' ঢোকানো হল সে দিনই সে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিন্তু কোনও ফল হয়নি। পুরুলিয়াতে তাকে রাখা হয়েছিল কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে। তখন প্রতিবাদ করার ইচ্ছেও হয়নি তার। শুধু এক বুক আক্রোশ নিয়ে সে চারদিকে তাকিয়েছিল। তখনও তার বিশ্বাস ছিল, জেলের মধ্যে তাকে যেখানে-যেভাবেই রাখা হোক না কেন জেলের বাইরে তার বন্ধুরা বোধহয় তখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আলিপুরে সে জানতে পারল বাইরে কোথাও কোনও পরিবর্তন হয়নি। তার বন্ধুরা, যারা একসঙ্গে জঙ্গলে দিন-রাত্রি কাটিয়েছে তাদের মধ্যে দুজন মুচলেকা দিয়ে নিজেদের নিরাপদ রেখেছে।

খবরটা বিশ্বাস করার মতো নয়। সে বিশ্বাস করতে চায়নি। সে জানে, রাজনীতিতে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। কিউবাতেই ঘটেছিল। শাসকদল বেতারে, সংবাদপত্রে একাধিকবার প্রচার করেছিল ফিদেল কাস্ত্রো ধরা পড়েছেন কিংবা মারা গেছেন। এ বড়ো পুরোনো কায়দা। সুনীল এ সব কথায় কান দেয়নি। এবার মনে হল কথাটা ভালোভাবে যাচাই করা দরকার। ওদের সঙ্গে দেখা করাও জরুরি।

সুনীল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সঞ্জয়, গোপাল ওদের খবর কী?'

বাবা উত্তর দিলেন না। মা বললেন, 'ওরা আর আসে না। ওরা দুজনে এখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ঘর-সংসারে মন দিয়েছে।'

কথাটা সুনীলের বুকে ধাক্কা দিল। ঘর-সংসারে মন দিয়েছে কথাটার মানে কী? ওরা কি বিয়ে-থা করে সংসার করছে? তা করুক, সংসারের মধ্যে থেকেও তো রাজনীতি করা যায়। সুনীল বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবা গম্ভীর হয়ে আছেন।

সুনীল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের কোনও খবর রাখ?'

বাবা স্থির চোখে সুনীলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। পরে প্রায় স্বগতোক্তির মতো গলায় বললেন, 'তোমার বন্ধুদের খবর আমি জানি না। শুধু জানি ওরা জেলে যায়নি।'

বাইরে একটু একটু করে আলো ফুটছে। সুনীল জানলা থেকে সরে এল। আজ একবার বন্ধুদের খোঁজে তাকে বেরুতে হবে। ওদের জানার কথা নয় যে জেল থেকে সুনীল ফিরে এসেছে। ওদের পাঁচজনের দলটা ছিল পঞ্চপাণ্ডবের মতো। পাঁচজনের মধ্যে দিব্যেন্দু ঘাটশিলার জঙ্গলে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে গিয়ে আগেই মারা গিয়েছিল। গুলি লেগেছিল ডান কাঁধে। তখন আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়া ঘাটশিলার জঙ্গলে নেমে আসছে। গুলি খেয়ে দিব্যেন্দু হঠাৎ ছিটকে উঠে গড়িয়ে গিয়েছিল কয়েক হাত। তারপর চাপা আর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেছিল, 'সুনীল, তুই ওদের নিয়ে পালা। আমি লড়ে যাচ্ছি। ধরা পড়লে সব ভেস্তে যাবে।'

দিব্যেন্দুকে অন্ধকার জঙ্গলে ফেলে রেখে খাড়ির মধ্য দিয়ে ওরা পালিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে। দিব্যেন্দুর লাশ আর ফিরে পায়নি। পরে কাগজে দেখেছে পুলিশ সেই লাশ পাঠিয়ে দিয়েছিল কলকাতায়। বাকি চারজনের মধ্যে সুনীল ধরা পড়ল নিজের বাড়িতে। ধরা পড়ার আগে বোঝেনি, ধরা পড়ার পর বুঝেছিল, তাকে ধরিয়ে দেওয়া হল। দিবাকর, তার সব চাইতে বিশ্বস্ত বন্ধু, তাদের পঞ্চপাণ্ডবের একজন, তারই চক্রান্তে সুনীল ধরা পড়ে গেল।

সুনীলের বুকের মধ্যে আক্রোশ থমথম করতে থাকে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। কেন, কীসের লোভে দিবাকর এমন করল সে কথা সুনীল জানে না। সে শুধু জানে, বিশ্বাসঘাতকতার কোনও ক্ষমা নেই। দিবাকরকে

ক্ষমা করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তারও আগে বাকি দুজন, অর্থাৎ সঞ্জয় আর গোপালের হদিসটা নেওয়া দরকার। ওদের কাছ থেকে দিবাকরের বিশ্বাসঘাতকতার আরও কিছু খবর হয়তো পাওয়া যাবে। ওরা নিশ্চয়ই এতদিনে বদলা নিয়েছে। না নিয়ে থাকলে এবার সেই দায়িত্ব সুনীলের।

দুই

সঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়ে বোঝা গেল এখন আর ওরা এখানে থাকে না। ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে সল্ট লেকে ফ্ল্যাট কিনেছে সঞ্জয়। খবরটা বিশ্বাস করা শক্ত, অথচ অবিশ্বাসও করা যাচ্ছে না। এ বাড়ির নতুন ভাড়াটে বউ সল্ট লেকের ঠিকানা দিতে পারল না। সুনীল বাসে চেপে বরানগর এল। গোপালকে এখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এটা ওদের ভাড়া বাড়ি নয়, পৈতৃক বাড়ি। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় ফি হপ্তায় একবার দুবার করে এ বাড়িতে এসে আড্ডা দিয়ে গেছে। ওদের দোতলার ওপর একটা চিলেকোঠা আছে। সেই ঘরে বসলে গঙ্গা দেখা যেত। জানলা খুলে দিলে দামাল ছেলের মতো হুই হুই করে ছুটে আসত ঠান্ডা বাতাস। সুনীলের মনে আছে ওই চিলেকোঠায় বসেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, না, এভাবে চলবে না। সংসদীয় রাজনীতির হাড়িকাঠে গলা সঁপে দিলে আর একটা শাসকগোষ্ঠীর জন্ম হয় কিন্তু দেশে বিপ্লব আসে না। বিপ্লব মানেই আমূল সংস্কার। আমূল সংস্কার ছাড়া এই দেশের মানুষদের মানুষের মতো বাঁচা সম্ভব হবে না। দেশের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষরা নিজেদের অজ্ঞাতেই ক্রমে ক্রমে দাসে পরিণত হবে। জগৎজোড়া দরিদ্র মানুষদের দাসে পরিণত করার সমস্ত কৌশল আর চক্রান্ত এখানেও শুরু হয়ে যাবে। গোপালকে সে দিন দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দিবোন্দু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'উত্তেজনা দরকার কিন্তু সেটাকে শাসন করতে জানা চাই। শুধু উত্তেজনা আর আবেগ দিয়ে বিপ্লব হয় না। তার জন্য দরকার রাজনৈতিক শিক্ষা, সংযম, আর কর্মপদ্ধতির যথার্থ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ।'

এগুলো অর্জন করতে বছর তিনেক সময় পেয়েছিল ওরা। তারপরেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে লাগল। যেন উত্তাল সময়ের স্রোতে ওরা ভেসে গেল। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার আগের দিন মীরার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সুনীল। মীরার মুখ গম্ভীর, থমথমে এবং বিষণ্ণ।

সুনীল বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

মীরার থমথমে কণ্ঠস্বরে গভীর অভিমান জড়ানো ছিল। মীরা বলল, 'কোনও দরকার ছিল না।'

সুনীল জানত এরকমটাই ঘটবে। দিব্যেন্দু গত রাত্রে বাসে ওঠবার সময় ওকে বলেছিল, তবুও নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার আগে তোর নিজের একবার দেখা করা উচিত। আমার মনে হয় ও তোকে ভালোবাসে। তোরও নিশ্চয়ই একটা অন্যরকম টান আছে।'

সুনীল তার অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা দিব্যেন্দুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন আর ঠিক বুঝতে পারি না। তুই মীরাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতিস।'

দিব্যেন্দু সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দূর পাগল। হাজার হোক আমি ওর দাদা। ওকে লজ্জায় ফেলে লাভ কী!'

সুনীল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মীরাকে দেখতে দেখতে দিব্যেন্দুর কথাগুলো ভাবল। এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার হয়তো দরকার নেই, কিন্তু আমার আছে। তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই, শুনবে?'

মীরা কোনও উত্তর না দিয়ে সুনীলের চোখের দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সুনীল চোখ নামিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই দিব্যেন্দুর মুখে শুনেছ আমরা কী করতে চলেছি। আমাদের উদ্দেশ্যটা কী। এই কাজে আর দশজনের মতো ব্যক্তিগত আবেগ,.অনুরাগ অথবা......'

মীরা হাত তুলে সুনীলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'প্লিজ, বক্তৃতা শুনতে চাই না। ছোড়দার মুখে এত বেশি শুনেছি যে আর ভালো লাগবে না। তার চেয়ে আমি যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দাও।'

সুনীল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে উলটো করে বসল। অর্থাৎ যে দিকটায় হেলান দেওয়ার কথা সেই দিকটা তার সামনে। দুপাশে পা রেখে চেয়ারের পেছনের অংশ, এখন যেটা তার সামনে তার ওপর চিবুক রেখে অনুগত ছাত্রের মতো বলল, 'বল।'

মীরা তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'তুমি এম এ পরীক্ষা দেবে না ঠিক করেছ?'

সুনীল নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, 'কোনও লাভ নেই। ওতে আমার জ্ঞান বাড়বে না, চাকরি করার একটা সার্টিফিকেট বড়োজোর পেতে পারি।'

মীরা একইভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানো তোমার রেজাল্ট কত ভালো। তুমি পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই।'

সুনীল একইভাবে বলল, 'হয়তো পেতাম। কিন্তু তার চাইতে বেশি কিছু নয়। হয়তো বাবা কিংবা মামাদের সুপারিশে ভালো মাইনের একটা চাকরিও পেতাম। তারপর বিয়ে, হনিমুন, সন্তান উৎপাদন, পুজোয় বেড়ানো আর চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা।'

মীরা এগিয়ে এসে সুনীলের হাত ধরল, 'তুমি এ সব চাও না?'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুনীল বলল, 'না। এগুলোর কোনও পজিটিভ অর্থ নেই আমার কাছে। জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে। জীবন একটা নিরন্তর সংগ্রাম। আমরা চাই মানুষের—'

মীরা হাত তুলে সুনীলের মুখে চাপা দিল। মীরার চোখ ভিজে আসছে। সুনীল মীরাকে দেখছে অনেকদিন। কিন্তু এভাবে তার চোখের দিকে কখনও তাকায়নি। তার মনে হল মেয়েদের চোখে বুঝি এক ধরনের রহস্যময় মায়াবী কাজল লাগানো থাকে। হয়তো মীরারও আছে। মীরার চোখ তাকে টানছে—যেমন করে মধ্যরাতের সমুদ্র একাকী দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে টানে।

সুনীলের চোখে চোখ রেখে আর্দ্র গলায় মীরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে চাও না?'

সুনীলের বুকের মধ্যে যেন ঢেউ ভেঙে পড়ল। সে এরকম কোনও পরিস্থিতির কথা আদৌ ভাবেনি। মীরার চোখের দিকে তাকাতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সে মুখের ওপর থেকে মীরার হাত নামিয়ে দিয়ে বলল, 'চাই, চাইতাম। কিন্তু এখন আর তার কোনও মূল্য নেই। আমাকে চলে যেতে হবে অনিশ্চিত জীবনে। তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমাকে আর নতুন করে কোনও কষ্ট দিতে চাই না। তোমার জন্য অন্য জীবন অপেক্ষা করছে।'

মীরা মাথা নামিয়ে ফেলল। তার গলা ধরে এসেছে। সে ভেজা গলায় বলল, 'আমি কি তোমার জীবনে যেতে পারি না?'

সুনীল নিজেকে ব্যস্ত রাখবার অছিলায় পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'তোমার দাদা দিব্যেন্দু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।'

মীরার ভেজা চোখে মুহূর্তে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। কঠোর চোখে সুনীলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আর তুমি? তুমি কী পারবে?'

সুনীল দরজায় পিঠ রেখে অস্ফুট উত্তর দিল, 'আমি শুধু তোমাকে মনে রাখব।'

সুনীল আর দাঁড়ায়নি। দরজা পেরতে গিয়ে সে মীরার কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল। কিন্তু পিছু ফিরে এখন মীরাকে দেখার যে কষ্ট সেটা নতুন করে পেতে চাইল না সুনীল।

তিন

বরানগরে গোপালদের বাড়িটা এখন তিনতলা হয়েছে। সেই চিলেকোঠা আর নেই। তিনতলার ওপরে বোধ হয় বাগান-টাগান করেছে। যদিও কোনও মানে হয় না, তবুও ওই চিলেকোঠাটার জন্য সুনীলের দুঃখ হল। সুনীল দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপল। দুবার বেল বাজাবার পর দরজা খুলে গেল। একজন বৃদ্ধার ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখ। মনে হয় ওদের বাড়ির কাজের লোক। সুনীল আগে কখনও ওকে এ বাড়িতে দেখেছে বলে মনে হল না।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

সুনীল একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, 'গোপালবাবু আছেন? গোপাল মজুমদার?'

বৃদ্ধা কোনও উত্তর না নিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুনীল খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় মিনিট দুয়েক বাদে বৃদ্ধা ফিরে এসে বলল, 'আপনি ভেতরে বসুন। উনি আসছেন।'

সুনীল দরজা পেরিয়ে বসবার ঘরে এল। সুখী মানুষদের বসবার ঘর যেমন সাজানো থাকে এই ঘরটাও তেমনি। সুনীল ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে পুরোনো দিনের কথাগুলো ভাবছিল। মিনিট দশেক পরে ঘরে এল গোপাল। ঘরে ঢুকেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠে শুধু বলল, 'তুই?'

সুনীল চট করে জবাব দিল না। গোপালকে আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বলল, 'খুব অবাক হচ্ছিস! ভেবেছিলি সারাটা জীবন জেলেই থাকব, নয়তো মারা যাব।'

গোপাল ভেতরে ভেতরে বিব্রত বোধ করল। আমতা আমতা করে বলল, 'না, মানে, তোর বিরুদ্ধে, যাকগে, কবে এলি?

সুনীল উত্তর দিল, 'কাল সন্ধেবেলা।'

গোপালের পরনে সাফারি স্যুট। গালের দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। ওর গা থেকে পারফিউমের হালকা গন্ধ ভেসে এসে সুনীলের নাকে লাগছে। গোপাল বাঁ হাতে কবজি তুলে ঘড়িতে সময় দেখল। সোনালি ব্যান্ডেব দামি ঘড়ি ওর হাতে।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি?'

সুনীল উত্তর দিল, 'না। তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। তোর সময় হবে?'

গোপাল চেষ্টা করে মুখে হাসি আনল। তারপর বলল, 'আজ একটু ব্যস্ত আছি। মানে কাজের ঝামেলায়.......'

সুনীল ওকে থামিযে দিয়ে বলল, 'তুই এখন কী কাজ করিস?'

গোপাল আবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করছি। আজ একটু তাড়া আছে।'

সুনীল এবার উঠে দাঁড়াল। গোপালের দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'সঞ্জয় কোথায় থাকে? ওর ঠিকানা কী?'

গোপাল ভীত চোখে সুনীলকে দেখতে দেখতে বলল, 'সঞ্জয় বড়ো চাকরি করছে। ওর মামার দৌলতে চাকরিটা পেয়েছে। মাসে হাজার তিনেক টাকা মাইনে প্লাস গাড়ি। বেশ আছে।'

সুনীল বিদ্রূপের দৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুইও তো বেশ আছিস।'

গোপাল টেবিলের ওপর থেকে অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে বলল, 'আমি এখন বেরুব। তুই কোন দিকে যাবি?'

সুনীল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে উত্তর দিল, 'কেন, লিফট দিবি নাকি? তোর গাড়িও আছে নিশ্চয়ই।'

গোপাল যেন লজ্জা পাওয়ার মতো হাসল। হেসে বলল, 'তা একটা আছে। কাজকর্ম করতে গেলে নিজের গাড়ি না হলে কলকাতায় চলে না।'

গোপাল চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছিল। সুনীল ওর কাধে হাত রাখল। সুনীলের পাঁচ আঙুলের শক্ত থাবা এখন গোপালের কাঁধের উপর। গোপাল দাঁড়িয়ে পড়ল। ঢোক গিলে বলল, 'ছাড়, কাঁধে লাগছে? জামাটা নষ্ট হবে?'

সুনীল ছাড়ল না। চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কাঁধের এই খানটাতেই দিব্যেন্দুর গুলি লেগেছিল। দিব্যেন্দু জঙ্গলের মধ্যে একা একা মরেছে। আজ এইটুকুতেই তোর লাগছে?'

নিজের কাঁধটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় হতাশ হয়ে গোপাল ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'সে সব কথা এখন আমি ভাবি না। আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল দিব্যেন্দু। পাঁচটা রাইফেল দিয়ে বিপ্লব হয় না।'

সুনীল এক ঝটকায় গোপালকে ঘুরিয়ে দিয়ে মুখোমুখি হল। খরদৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিপ্লব হয় না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করা যায়। মুচলেকা দেওয়া যায়। বন্ধুকে বিপদে ফেলা যায়।'

গোপাল হাতের অ্যাটাচি নামিয়ে রেখে বলল, 'আমি কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমার ভালো লাগেনি তাই মুচলেকা দিয়ে সরে এসেছি। পুলিশের কাছে আমি তোর সম্পর্কে কোনও কথা বলিনি। যা বলার সঞ্জয় বলেছে।'

সুনীল এমনভাবে হাসল যাতে গোপালের মনে হল তার সারা মুখে কেউ যেন ঘৃণার কুলকুচি ছিটিয়ে দিচ্ছে। অ্যাটাচি তুলে নিয়ে গোপাল গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন বেরুব।'

গোপালের সঙ্গে সঙ্গে সুনীল বাইরে এল। সাদারঙের একটা ফিয়াট ততক্ষণে ওদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গোপাল গাড়িতে ওঠবার আগে উপরে তাকাল। দোতলার গ্রিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে একজন যুবতী। বোধ হয় গোপালের বউ। গোপাল হাত নাড়ল। সুনীল সেই দিকে তাকাল। যেখানে একদা দোতলার চিলেকোঠাটা ছিল।

গাড়িতে বসে গোপাল বলল, 'উপরের বারান্দায় যাকে দেখলি সে আমার বউ। ইচ্ছে করেই আলাপ করলাম না। ওর বাবা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আই জি ছিলেন। গত বছর রিটায়ার করেছেন। আমার কাকার ক্লাসমেট। তোর সম্বন্ধে এত আজগুবি গল্প শুনেছে যে তোকে উর্মিলা হয়তো স্ট্যান্ড করতে পারত না।'

সুনীল বাইরে তাকিয়ে ছিল। উদাস গলায় বলল, 'তোদের সেই চিলেকোঠাটা বোধ হয় ভেঙে ফেলেছিস।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গোপাল বলল, 'হুঁ'।

স্ট্র্যান্ড রোডে পাঁচতলার উপর সঞ্জয়ের অফিস। কাচের দেয়াল দেওয়া আলাদা ঘরে তিনরঙের তিনটি টেলিফোন নিয়ে সঞ্জয় বসে। টেবিলের ওপর ঠান্ডা পানীয়ের দুটো শূন্য বোতল। দরজা ঠেলে সুনীল যখন ঘরে ঢুকল সঞ্জয় তখন ইন্টারকমে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। সুনীলকে চোখের ভঙ্গিতে বসতে বলে সঞ্জয় কথা বলে যেতে লাগল।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে সঞ্জয় বলল, 'ওয়েলকাম সুনীল। একটু আগে গোপাল টেলিফোন করে জানিয়েছে তুই ছাড়া পেয়েছিস। ওর বাড়িতে গেছিস।'

সুনীল টেবিলের পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'আর কিছু।' সঞ্জয় হাসল। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'তুই নাকি খুব রেগে আছিস আমাদের ওপর।' আমি ওকে বললাম, 'ওটা কিছু নয়। ফ্রাস্ট্রেশন থেকে এক ধরনের অ্যাংগার জন্মায়। একটা কাজকম্মে লেগে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সুনীল শান্তগলায় বলল, 'না, আমার কোনও ফ্রাস্ট্রেশন নেই।' সঞ্জয় গলার টাইটা একটু ঢিলে করে বলল, 'এখন কী করবি ঠিক করলি? জেলের খাতায় নাম উঠেছে, সরকারি চাকরি তো পাবি না, সে বয়সও নেই। ব্যবসা-ট্যাবসা কর, গোপাল যেমন করছে।'

সুনীল পেপারওয়েটটা শব্দ করে কাচের টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'তার আগে কিছু হিসেব নিকেশ দরকার।'

সঞ্জয়ের ভ্রূ কুঁচকে গেল। চোখ কুঁচকে সুনীলকে দেখতে দেখতে বলল, 'কীসের হিসেব নিকেশ?'

সুনীল দীপ্ত গলায় জবাব দিল, 'তোদের বেইমানির। তোরা আমাকে একলা ফেলে শহরে চলে গিয়েছিলি কিন্তু আর ফিরে আসিসনি। পুলিশের কাছে আমার সম্পর্কে খবর পাঠিয়েছিলি তোরা। মুচলেকা দিয়ে তোরা পেছন থেকে ছুরি মেরেছিস আমাকে আর আমাদের আন্দোলনকে।'

সঞ্জয় গম্ভীর হতে গিয়েও হাসবার চেষ্টা করল। হাসিটা তেমন ফুটল না। সুনীলের দিকে ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমরা শহরে এসেছিলাম খাবার জোগাড় করতে। কিন্তু সেখানে এসে পুলিশের নজরে পড়ে যাই। আমাদের বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তোকে ভুল খবর দিয়ে বাড়িতে টেনে এনে ধরিয়ে দিয়েছে দিবাকর। সেখানে আমাদের কিছু করার ছিল না। আমরা কিছু জানতেও পারিনি।'

সুনীলের চোয়াল শক্ত হয়ে আসছে। সে চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'দিবাকর কোথায়?'

সঞ্জয় দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'রাসকেলটা তুই ধরা পড়ার পর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আমাদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। পুরোনো বাড়িটাতে নেই। বোধ হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

সুনীল উঠে দাঁড়াল। সঞ্জয় বলল, 'এখন কোথায় যাবি?' সুনীল উত্তর দিল, 'ঠিক জানি না।'

সঞ্জয় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব আমার আর গোপালের পক্ষ থেকে। তুই শুনবি।'

সুনীল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'রিকোয়েস্টটা কী?'

সঞ্জয় একটু ইতস্তত করে বলল. 'তুই হুটহাট করে গোপালের বাড়িতে যাস না। তোর সম্পর্কে তো নানা কথা রটেছে। সবাই তোকে সহ্য করতে পারে না। তুই বরং একটা কাজ-কম্মের ধান্দা দ্যাখ।'

সুনীলের বাঁ দিকের বুকে সেই ব্যথাটা আবার চিনচিন করে উঠল। জানলা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থেকে সে উদাস গলায় বলল, 'আর কিছু?'

সঞ্জয় বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা খুলে ধরতে ধরতে বলল, 'তুই এই অফিসেও আসিস না। চাকরিটা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে বাবা জোগাড় করে দিয়েছেন। আমি এটা খোয়াতে চাই না।'

দরজা দিয়ে চলে যেতে যেতে সুনীল বলল, 'মনে রাখবার চেষ্টা করব।'

চার

কলকাতার বাতাসে গুমোট গরম। শ্রাবণ মাসের আর্দ্রতা দিনের রোদে খুঁজে পাওয়া যায় না। পথ হাঁটতে হাঁটতে সুনীল টের পায় এই জগৎ সংসারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের সর্বাত্মক সংস্কারসাধনে একদা সে যে ব্রত নিয়েছিল সে কথা মনে রাখার দায় কেউ অনুভব করেনি। ঘাটশিলার জঙ্গলে দিব্যেন্দুর রক্ত অনেককাল আগে শুকিয়ে গেছে কিংবা বৃষ্টি না হয় সুবর্ণরেখার জলে সে সব কবে ধুয়ে গেছে। তার রক্তাক্ত স্মৃতি শুধু সুনীলের মনে। সঞ্জয় কিংবা গোপাল কেউ সে সব মনে রাখেনি, রাখতে চায়নি। দিবাকর তাকে ধরিয়ে দিয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে বেঁচেছে। হয়তো কোনও মামা বা কাকাকে ধরে সেও বাঁধা মাইনের চাকরি করে যাচ্ছে। ব্যাপারটা অবাক করে সুনীলকে। ওরা এত সহজে সব ভুলে যেতে পারল কেমন করে? সুনীল বুঝতে পারে পুরোনো বন্ধুরা কেউ আর অতীতের স্মৃতিকে মনে রাখতে চায় না। যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ওরা উঠে এসেছে। ওরা বেঁচে থাকার অন্যতর অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

গত সাতদিনে সে নিজেকে, নিজের চারপাশের জগৎকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে। আত্মীয়স্বজনরা কেউ ভুলেও সুনীলের প্রসঙ্গ তোলেন না। পুরোনো বন্ধুরা তাকে এড়িয়ে চলছে। যেন নিজের জগৎ থেকে সে নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে সে একা এবং নিঃসঙ্গ। তার জন্যে জীবনের সব দরজাই বন্ধ হয়ে আছে। গতকাল মৃত্যুঞ্জয়দার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সুনীল। বেলেঘাটার বস্তি অঞ্চলে এখনও মৃত্যুঞ্জয়দা আগের মতোই একা। সুনীলকে দেখে প্রথমে হেসেছেন তারপর সব শুনে হাসতে হাসতেই বলেছেন, 'পুলিশের চোখে তুই ক্রিমিনাল, অ্যান্টিসোস্যাল। পাঁচ বছর জেলখাটা লোক। সমাজে তোর মর্যাদা হবে কেন?'

সুনীল চুপ করে বসে ছিল। মৃত্যুঞ্জয়দা পোড়া বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, 'শৌখিন রাজনীতি দিয়ে দেশের মঙ্গল হয় না। বিপ্লব তো নব্বই মিনিটের ফুটবল খেলা নয়। তোরা খেলা শুরুর আগেই মাঠ ফাঁকা করে ওদের ওয়াকওভার দিয়ে দিলি।'

সুনীল বিষণ্ণ গলায় বলল, 'সঞ্জয় গোপাল ওরা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। ওদের চোখেমুখে একটা ভয় আর অপরাধ।'

মৃত্যুঞ্জয়দা নিজের কাটা পা-খানা দেখিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গেও কেউ সম্পর্ক রাখে না। যে দিন পা কেটে বাদ দিতে হল সে দিন মনে হয়েছিল, আমার একটা পা গুলিতে গেছে যাক। লক্ষ লক্ষ পায়ের মিছিল আমাকে ঠিক সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। আমাকে ফেলে রেখে সবাই

অন্য পথে চলে গেল। তোরও তাই। সঞ্জয় আর গোপাল তোকে একা রেখে শহরে এসে আত্মসমর্পণ করল। পেছন থেকে মদত দেওয়ার লোক ছিল তাই কোনও শাস্তি পেল না। আর দিবাকর! বড়ো অবাক লাগে। ছেলেটা শেষে পুলিশের ইনফর্মারের কাজ করল!' মৃত্যুঞ্জয়দা অবাক হতে গিয়ে বোবা হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পর দু চোখে আগুন ঝরিয়ে বললেন, 'পায়ে জোর থাকলে ওদের আমি গুলি করে মেরে ফেলতাম। বেইমানের কোনও, ক্ষমা নেই।'

মৃত্যুঞ্জয়দার কথাটা সুনীলের মনেও এসেছে। যতবার মনে পড়েছে বুকের মধ্যে চিনচিনে কষ্টটা ততবার ফিরে এসেছে। গতকাল গোপাল অফিসে থেকেও তার সঙ্গে দেখা করেনি। পাশের বাড়ির ছেলেরা বাড়ির সামনে আপনমনে দিব্যি খেলা করে কিন্তু সুনীলকে দেখলেই ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা দেয়। দিদির ছোট্টো মেয়েটা ভয় পাওয়া চোখে দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই একছুটে মায়ের পিঠের আড়ালে গিয়ে মুখ লুকোয়। সুনীল ভেবে পায় না, সে কাদের জন্যে জীবন বাজি রেখে লড়াই করতে গিয়েছিল। যাদের জন্য সুখের স্বর্গ গড়তে চেয়েছিল তাদের চোখে সে নেহাত একটা খুনে বা ডাকাত ছাড়া আর কিছু নয়। বহরমপুর জেলে একজন ডাকাতকে সে দেখেছিল। সাধারণ মানুষের মতো চেহারা। অত্যন্ত উগ্র মেজাজ। সুনীলকে সে বলেছিল, 'সমাজটা বড় অদ্ভুত। যত অপরাধ করো, যতক্ষণ ধরা না পড়ছ ততক্ষণ তুমি ভদ্রলোক। একবার সাজা হলে সমাজে তোমার ঠাঁই নেই। তখন ফিরতে চাইলেও ফেরা যায় না। ঘরেব মানুষ, পাড়া পড়শি এবং পুলিশ সবার চোখে পুরোনো পাপের স্মৃতিটাই একমাত্র সত্য পরিচয় হয়ে বেঁচে থাকে, আর সব মিথ্যে।'

সুনীল বুঝতে পারে, পুলিশের খাতায় তার যেমন সমাজবিরোধী পরিচয়টাই সত্য তেমনই বুঝি সত্য তার সমাজের কাছে। তার রাজনৈতিক বিশ্বাস, সংগ্রামের সত্যতা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের কথা কেউ মনে রাখেনি। অথচ সঞ্জয়, গোপাল আর দিবাকরদের সমাজ মেনে নিয়েছে।

সুনীলের বুকের মধ্যে রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে। তার মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়দা এবং দিব্যেন্দুর কথাই ঠিক। বেইমানদের আগে সরাতে না পারলে বিপ্লবের সরণি তৈরি করা যায় না। ওরা সব সময় নৌকোর তলায় ফুটো করে রাখে। মাঝ গাঙে গিয়ে নৌকো যখন ডোবে তখন আর করার কিছু থাকে না।

সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে এল সুনীল। শরীরে একটা ক্লান্তি টের পাচ্ছে। মাথা ধরে আছে বিকেল থেকে। হয়তো জ্বর আসবে। গায়ে জল ছোঁয়ালে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে ওঠে। মুখ ধুয়ে ঘরে আসতেই বাবা বললেন, 'লোকাল থানার ওসি তোমার খোঁজে এসেছিলেন। কাল সকালে একবার দেখা কোরো।'

সুনীল খুব একটা অবাক হল না। নিস্পৃহগলায় জানতে চাইল, 'কেন?'

অনিলবাবু থেমে যাওয়া টেবিল ঘড়িটার দম দিতে দিতে বললেন, 'সব কথা আমাকে খুলে বলেননি। হয়তো তোমাকে বলবেন। ওঁদের কাছে ইনফরমেশন আছে তুমি নাকি আবার সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করছ। অস্ত্র শস্ত্র জোগাড় করছ।'

সুনীল মনে মনে হাসল। তোয়ালেটা দড়ির উপর রাখতে রাখতে বলল, 'মানুষের চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র আর কিছু নেই। সেই অস্ত্রই তো জং ধরে ভোঁতা হয়ে গেছে।'

সুনীল চলে যাচ্ছিল। বাবার ডাকে পিছু ফিরল। বাবা বললেন, 'তোমার মা খুব উদ্বেগে আছে। সে জানতে চায় তুমি ঘর-সংসারে মন দেবে কি না, যেমন দিয়েছে তোমার সহযোদ্ধারা।' সুনীল এক মুহূর্ত ভাবল। পরে বলল, 'তোমাদের সংসারে টাকার খুব দরকার তাই না?'

বাবা ঘড়িটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'দারিদ্র্যে আমি অভ্যস্ত। স্কুলের চাকরিটা এখনও আছে। দুটো কোচিং ক্লাসও করছি। আমার এর চাইতে বেশি প্রয়োজন নেই।' তুমি নিজের জন্য কোনও প্রয়োজন অনুভব করো না?'

সুনীল মুখ না তুলেও বুঝল বাবা তার উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন। সুনীল লম্বা করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি বুঝি তা হলে ভাবব।'

সকালে থানা থেকে সুনীল ছাড়া পেল ঘণ্টা দেড়েক বাদে। বাইরে তখন ঝকঝকে রোদ। সুনীলের বুকের মধ্যেও ঝকমক করে জ্বলছে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ। থানার দারোগা স্পষ্টই বলেছে, 'আপনার পুরোনো বন্ধুদের সূত্রেই খবর পেয়েছি রাষ্ট্রের এবং সমাজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপনি এখনও বিপজ্জনক। সংগঠন তৈরি করার চিন্তা ছেড়ে কাজের ধান্দা দেখুন। নইলে কিন্তু আপনাকে আমরা আর স্পেয়ার করব না।'

সুনীল থানা থেকে সোজা মৃত্যুঞ্জয়দার বাড়িতে গেল। সেখান থেকে সন্ধের পর বাড়ি ফিরে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল। সারারাত্রে তাকে খাবার জন্যে কেউ ডাকতে এল না। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুনীল অনেকদিন পর মীরাকে স্বপ্নে দেখল। মীরা এখন দিবাকরের বউ। বিয়েটা সুনীলই দিয়েছিল। দিবাকরের অ্যাজমার কষ্ট ছিল। শীতকালে বড়ো কাহিল হয়ে পড়ত। তাই ওকে রাখা হয়েছিল বাইরে। ও শুধু খবর পৌঁছে দিত। নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার আগেই সুনীল ধরতে পেরেছিল মীরার উপর দিবাকরের একটা দুর্বলতা আছে। কিন্তু কোনও দিন প্রকাশ করেনি। মীরা তখন দিবাকরের কাজে সাহায্য করত। দিবাকরকে মীরা পছন্দ করত কিন্তু ওকে বিয়ে করার কথা কখনও ভাবেনি। বিয়ের প্রস্তাবটা দিল সুনীল। সুনীলের সারা গায়ে তখন র‍্যাশ বেরিয়েছে। দিবাকর ওকে লুকিয়ে বেখেছে তালতলার একটা বাড়িতে। সেই বাড়িতেই সুনীল মীরাকে বলল, 'দিবাকর তোমাকে ভালোবাসে, তুমি ওকে বিয়ে করলে আমি খুশি হব।'

মীরা জোড়া ভ্রু তুলে বলেছিল, 'তোমাকে খুশি করাই তো আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ নয়। তা ছাড়া তুমি ভাবছ কেমন করে তুমি যা বলবে তাই আমি মেনে নেব?'

সুনীল গলায় আবেগ জড়িয়ে বলেছিল, 'আমাকে ভালোবাসো তাই আমার জন্যে তুমি মেনে নেবে এটুকু তো আশা করতে পারি।'

মীরা চুপ করে ছিল। সুনীল ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'আমার জীবন অনিশ্চিত। তাই আমি চাই দিবাকরকে তুমি বিয়ে কব। ও তোমাকে ভালোবাসে। দিবাকর আমারই অর্ধেক অংশ। প্লিজ, তুমি ওকে হতাশ কোরো না।'

মীরার চোখ ভারী হয়ে উঠল। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'আমার জীবনটা নিয়ে নাই বা বিপ্লব করলে। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।'

সুনীল উঠে বসে আবার মীরার হাত ধরেছিল। কাতর গলায় অনুরোধ কবে বলেছিল, 'আমি দিবাকরকে কথা দিয়েছি। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না—প্লিজ মীবা আমাকে কথা দাও। মনে কবো কোনও অসহায় ভিখারিকে তুমি করুণা করছ।'

মীরা কোনও কথা বলেনি। ওর বড়ো বড়ো দুই চোখেব কোলে কান্না থইথই করে উঠেছিল।

কলকাতায় থাকতে থাকতেই ওদের বিয়েটা হয়েছিল বিয়ের রাত্রে সুনীলের অনুরোধে মীরা গান গেয়েছিল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।'

সেইরাত্রেই দিবাকর আর মীরাকে রেখে ওরা ঘাটশিলা চলে গিয়েছিল। ঘাটশিলাতে দিবাকরই খবব দিয়েছিল মীরা মা হয়েছে। ওর ছেলের নাম রেখেছে বরুণ। ধরা পড়বার আগে কলকাতায় এলেই দিবাকরেব ওখানে উঠত সুনীল। ছেলেটা ছুটে এসে দিবাকরের কোলে উঠত। যখন কথা ফুটল, তখন ডাকত, 'আঙ্কেল, ও আঙ্কেল, আমার টফি কই?'

মীরাকে তখন চেনা যেত না। সে পাশে দাঁড়িয়ে হাসত। মেয়েরা বিযের পর যতটা বদলায় মা হওয়ার পর তার দ্বিগুণ বদলে যায়। মীরা কলেজে চাকরি পেয়ে গেছে। ছেলেটাকে নিজেই সন্ধ্যাবেলা পড়াতে বসায়। বরুণ যখন বলে, 'আঙ্কেল, তুমি যে আমার জন্যে সত্যিকারের ঘোড়া আনবে বলেছিলে, আনলে না তো?'

সুনীল মুগ্ধ চোখে বরুণকে দেখতে দেখতে বলে, 'আরেকটু বড়ো হও। ঘোড়ায় চড়ে তো তোমায় শিবাজির মতো যুদ্ধ করতে হবে। আমি তোমাকে যুদ্ধ শিখিয়ে দেব।'

বরুণ খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠত। আর মীরা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, 'খোকা, এই আঙ্কেলকে একদম বিশ্বাস করবি না। বিশ্বাস করলেই ঠকবি। ও শুধু আশা দিতে জানে, পূর্ণ করতে পারে না।'

সুনীল অপরাধীর মতো শুধু হাসত।

ঘুম ভাঙার পর মীরা আর বরুণের সঙ্গে সঙ্গে তার দিবাকরকেও মনে পড়ল। সেই দিবাকর, যে তাকে মিথ্যে খবর দিয়ে বাড়িতে এনেছিল। বলেছিল, 'তোর বাবার ভীষণ অসুখ। হয়তো বাঁচবে না। আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুই একবার দেখা করে আয়। তোর কোনও ভয় নেই। কেউ জানবে না।'

দিবাকরের ব্যবস্থার প্রতি ভরসা ছিল সুনীলের। খবর পেয়ে রাত্রিবেলা বাড়ি এল। ঘরে পা দিতেই সে চমকে গেল। বাবা বিছানায় শুয়ে টেবল ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ছেন।

সুনীল আহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাকি খুব শরীর খারাপ? আমাকে দেখা করতে খবর পাঠিয়েছ?'

বাবা চশমা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই, না তো! আমি দিব্যি ভালো আছি। তা ছাড়া আমার তরফ থেকে তোমাকে তো কোনও খবর দেইনি।'

সুনীল সঙ্গে সঙ্গে বিপদের গন্ধ পেয়ে গেল। কিছু ভেবে ওঠবার আগেই দরজায় ধাক্কা। সুনীল পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল। বাবা এগিয়ে এসে বললেন, 'ডোন্ট ডু দিস। আমার মনে হয় তুমি জালে ধরা পড়েছ। এখন এ সব করা হঠকারিতা হবে।'

মা জানলা থেকে ফিরে এসে বলল, 'বাড়ির চারপাশে পুলিশ।'

বাবা অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'জানতাম। এটা প্ল্যান করে করা হয়েছে।'

সুনীল অসহায়ভাবে কপালে চাপড় মারল। অনিলবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ওটা তোমার কাছে থাকলে বিপদ বাড়বে। আমায় দাও। কুইক!'

সুনীল পিস্তলটা বাবার হাতে তুলে দিল। বাবা পিস্তলটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন। পরক্ষণেই দেওয়ালে টাঙানো বিবেকানন্দের ফটোর পেছনে রেখে তিনি লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। মা দরজা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে জনা ছয়েক পুলিশ ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকেই পুলিশ সুনীলকে পেয়ে গেল। পরম উল্লাসে জিপগাড়িতে তুলে নিয়ে ওরা চলে গেল দশ মিনিটের মধ্যেই।

সুনীল মনে মনে ভাবল, সেই পিস্তল নিশ্চয়ই বাবা ফেলে দেননি। এই বাড়িতেই কোথাও না কোথাও আছে। শুধু খুঁজে দেখতে যা সময় লাগবে।

পাঁচ

দিন দশেকের মধ্যেই শহর তোলপাড় হয়ে উঠল। সকালবেলা কাগজ হাতে নিয়ে অনিলবাবু চোখের চশমা খুলে দ্রুত ভেতরের ঘরে এলেন। স্ত্রীকে কড়া গলায় ধমক দিয়ে বললেন, 'সুনীল কোথায়?'

সুধা রান্নাঘরে ভাতের ফ্যান গালছিল। ভাতের হাঁড়িটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কেন, কী হয়েছে?'

অধৈর্য গলায় অনিলবাবু বললেন, 'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। খোকা কোথায়?

সুধা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাল সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে নাও ফিরতে পারে।''

হাতের কাগজটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে অনিলবাবু দ্রুত শোওয়াব ঘরে এলেন। খাটের উপর থেকে প্রথমে বালিশ আর তোশক তারপর মোটা জাজিমটা তুলে ধরে বললেন, 'এটা একটু ধরো।'

ভয়ে এবং অধীর উত্তেজনায় সুধা এগিয়ে এসে দু হাতে জাজিমটা তুলে ধরে থাকল। অনিলবাবু শতরঞ্চি সরিয়ে খাটের দিকে তাকালেন। খাটের উপর ছোট্টো একটা খোপ। প্রায় কবজি পরিমাণ সাইজ। সেই খোপের তালাটা ভাঙা। অনিলবাবু সেই খোপের তালাটা খুলে দেখলেন সেখানে কিছু নেই। শুধু এক খণ্ড কাগজ। তাতে লেখা, 'বাবা, আমার জিনিস আমি নিলাম। এখন ঐটাই আমার কমরেড।'

অনিল চৌধুরি ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লেন। বিমূঢ় সুধার হাত থেকে জাজিমটা ধপাস করে বিছানার উপর পড়ল।

সুধা চিঠিটা পড়ে বলল, 'ওতে তো গুলি ছিল না।'

অনিলবাবু হতাশ গলায় বললেন, 'ওটা জোগাড় করা কঠিন কাজ নয়।'

সুধা ফিসফিস করে বলল, 'ওকি আবার আন্দোলন করতে যাচ্ছে?' অনিলবাবু জবাব দিলেন না। উঠে গিয়ে কাগজটা এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রথম পাতার চারের কলমের খবরটা পড়, নীচের দিকে।'

সুধা পড়তে গিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। 'মজুমদার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক গোপাল মজুমদার গতরাত্রে মারা গেছেন। তার মৃতদেহ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বরাহনগরের গঙ্গার ঘাটে পাওয়া গেছে। আততায়ী সম্ভবত কাছ থেকে তার গলায় গুলি করেছে। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ সন্দেহ করছে এটি উগ্রপন্থীদের কাজ।'

সুধা বিস্ফারিত চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। অনিলবাবু দেওয়ালে হেলান দিয়ে অবসন্ন গলায় বললেন, 'এটা খোকারই কাজ। ও বোধ হয় বদলা নিচ্ছে। পুলিশ নির্ঘাত ওর সন্ধানে এ বাড়িতে আসবে। আমার হুকুম রইল, ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে দিও না।'

কিন্তু তিনদিনের মধ্যেও সুনীল আর এ বাড়িতে এল না। সুধার মধ্যে উদ্বেগ হচ্ছিল কিন্তু স্বামীর সামনে সেটা প্রকাশ কবতে পারছিলেন না। আবার ঠিক চারদিনের মাথায় হিন্দুস্থান জুট অ্যান্ড লেদার কর্পোরেশনের পার্সোনেল ম্যানেজার সঞ্জয় দত্তের গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হল। এখানেও আততায়ী গুলি করেছে বাঁ পাশ থেকে মৃত ব্যক্তির গলায। একই সপ্তাহে দুটো খুন একই ধরনের। পুলিস এবারও উগ্রপন্থীদের কাজ বলে অনুমান করেছে। দ্বিতীয় খুনের খবর বেরবার পর পুলিশ সুনীলের খোঁজে এসেছিল। অনিলবাবু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'ছেলের সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। কাজ-কর্মের খোঁজে সে একদিন সকালে বেরিয়ে যায়, এখনও পর্যন্ত ফিরে আসেনি।'

সুনীল ফিরে এলে যেন পুলিশকে জানানো হয় এমন নির্দেশ দিয়ে দারোগা চলে গেলেন। অনিলবাবু বিলক্ষণ জানেন, পুলিশ তার খবর দেওয়ার অপেক্ষায় থাকবে না। এই বাড়ির ওপর এখন থেকে তাদের কড়া নজরদারি চলবে।

সুধা ভেতরের অস্থির উদ্বেগ চেপে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় খোকা নিজে হাতে খুন করেছে?'

অনিলবাবু গম্ভীরমুখে জবাব দিলেন. 'অবিশ্বাস্য কিছু নয়।'

সুধা বাঁ হাতে চোখের কোল থেকে জল মুছে নিয়ে বলল, 'এর থেকে জেলে থাকা ঢের ভালো ছিল। এখন বাইরে বেরিয়ে অশান্তি করে বেড়াচ্ছে।

অনিলবাবু নিঃশব্দে পাযচারি করতে করতে বললেন, 'ওকেও এমনি কবে বেঘোরে একদিন প্রাণ দিতে হবে। ইডিয়টটা জানে না, একা-একা বিপ্লব হয় না, কোনও দিন কোনও দেশে হয়নি।'

সুধা চুপ করে থাকেন। তার মনে পড়ে যেতে থাকল খোকার কথা। স্কুলের কোনও পরীক্ষায় কোনওদিন দ্বিতীয় হয়নি। স্কুল ফাইনালে এক লাখ চল্লিশ হাজার ছেলের মধ্যে খোকা সেকেন্ড হয়েছিল। কলেজে ঢোকার পর থেকেই ওর মাথার পোকা নড়ে উঠল। সুধা কাউকে দোষ দেন না। এটা তাঁর অদৃষ্টের লিখন। শ্বশুর, স্বামী আর একমাত্র ছেলে এরা কেউ অন্য দশজনের মতো হল না। নিজেদের সংসারের দিকে তাকাল না, কোনও শখ-আহ্লাদ মেটাল না শুধু অলীক একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজেদের জীবনের পরমায়ু শেষ করে ফেলল। কে মনে রেখেছে আদিত্য চৌধুরিকে? কে আগ বাড়িয়ে নাম করে অনিল চৌধুরির। যে চাকরিটা রাজনীতি করার জন্য খুইয়েছে সেটা থাকলে চার হাজার টাকা মাইনে হয়ে যেত এতদিনে। রিটায়ার করার সময় দেড়-দু লাখ টাকা নিয়ে ঘরে আসতে পারত। সবার জন্যে সুখের স্বর্গ বানাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত চোখের জল আর দিবা-রাত্রির উৎকণ্ঠা সম্বল হয়েছে সুধার।

সুধা গোপনে চোখের জল মুছে ভাবে তার খোকা কেন অন্যরকম হল না। ওর মতো ছেলের ভালো চাকরির অভাব হত না। ছোটো বোন নিভার ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরি করে। গত বছর ছেলের বিয়ে দিয়েছে নিভা। সাজানো সংসারে গর্বিত পায়ে নিভা ঘুরে বেড়ায। মেয়ের বাড়ি গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠাবার সময় নিভার ননদ সুধাকে প্রশ্ন করেছিল, 'বড়দি, তোমার ছেলের বিয়ে দেবে না?'

সুধা উত্তর দিতে পারেনি। নিভা চোখের ইশারায় ননদকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আগে জেল থেকে ফিরুক। ওটা ওদের বংশগত ব্যাধি।'

আড়ালে ডেকে নিভা বলেছিল, 'জেল থেকে ফিরলে ছেলেটার মতি ফেরাও, দিদি। নইলে ভবিষ্যতে খুনে-ডাকাত হয়ে যাবে। অত বিপ্লব-টিপ্লব করতে হবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ঢের হয়েছে, আর দরকার নেই।'

সুধা দাঁতে দাঁত চেপে সব শুনে গেছে। বিয়েবাড়ির উৎসবে তার মন বসেনি। তার বুকের মধ্যে একটা অসীম শূন্যতা নিয়ে কেবল খ্যাপা হাওয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস উঠে আসছিল। শরীর খারাপের অছিলায় সুধা চলে এসেছিল বোনের বাড়ি থেকে। খোকা ফেরার পর কেউ খোকার খোঁজে এ-বাড়িতে একবারও আসেনি। সুধা বুঝতে পারে আত্মীয়স্বজনরা তার খোকাকে সহ্য করতে পারে না। তবু কেন, কীসের জন্য খোকা সবার হয়ে লড়াই করতে যায়?

সুধা কান্না চাপতে গিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বাইরে তখন আকাশ কালো করে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। সেই সঙ্গে শেষ শ্রাবণের মাতাল হাওয়া।

ছয়

হু হু শব্দে আছড়ে পড়ছে বাতাস। গাছ-গাছালির মাথার ঝুঁটি ধরে কাঁপিয়ে দিচ্ছে হাওয়া। অন্ধকার আকাশ ফুটো হয়ে তীক্ষ্ণবেগে নেমে আসছে বৃষ্টি। ঝড়ের মুখে-মুখেই রাস্তার আলো নিভে গেছে। চারপাশ অন্ধকার এবং নির্জন।

এই দুর্যোগের মধ্যে ঘরের দরজায় প্রথমে আস্তে আস্তে পরে অসহিষ্ণু এবং অধৈর্য হাতে দরজার কড়া নাড়ল কেউ। মীরা বসবার ঘরে বসে আলমারির বই গোছাচ্ছিল। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে সে দরজার দিকে তাকাল। ভেতর থেকে প্রশ্ন করল, 'কে?'

মীরা উত্তরের অপেক্ষা করল না। দরজা খুলে দিতেই ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গে উড়ে এল এক ঝাঁক বৃষ্টি। আর তারই মধ্যে সর্বাঙ্গ ভেজা অবস্থায় দরজার পাশ থেকে একলাফে ঘরে এল সুনীল।

প্রথমে চমকে গিয়েছিল মীরা। সুনীলই দরজা বন্ধ করে দিল। মীরা হ্যারিকেনটা তুলে ধরে বলল, 'তুমি! হঠাৎ এ সময়ে?'

সুনীলের চোখের দৃষ্টি কঠোর এবং ধারালো। তার ভেজা দাড়ি থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে বুকের উপর। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে বলল, 'দিবাকর কোথায়?'

মীরার বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। সুনীলের প্রশ্নটা ধারালো ইস্পাতের ফলার মতো তাকে বিদ্ধ করেছে। সে হ্যারিকেনটা নামিয়ে রেখে বলল, বহুকাল পরে এলে। বসতে না চাও জোর করব না। ভেজা জামাটা অন্তত খুলে দাও।'

সুনীল মীরার মুখের ওপর থেকে চোখ সরালো না। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আগের মতোই বলল, 'আমার সময় কম। দিবাকর কোথায়?' মীরার চোখ আগের চাইতে তীক্ষ্ণ হল। সুনীলকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, 'ওর সঙ্গে তোমার কীসের দরকার?'

সুনীল অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি আসিনি। আমি জানতে চাই দিবাকর কোথায়? ওর সঙ্গে আমার হিসেব মেটাবার পালা এইবার শুরু হবে।'

মীরা টেবিলের দিকে সরে গেল। তার পা কাঁপছে। সুনীলের চোখের আগুন তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সে অস্ফুটে বলল, 'কীসের হিসেব?'

ঘৃণায় মুখ বেঁকে গেল সুনীলের। তীব্র গলায় বলল, 'তুমি জানো না, কীসের হিসেব, বেইমানির হিসেব। আমার সময় নেই, মীরা। আমি ওকে দেখতে চাই।'

মীরা নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল। গলার স্বর স্বাভাবিক করে বলল, 'এখন তোমার মাথার

ঠিক নেই, তোমার চোখে আমি সর্বনাশের আগুন দেখছি। তুমি হয়তো জানো না, দিবাকর তোমাকে—'

অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে টেবিলে চাপড় মেরে মীরাকে থামিয়ে দিয়ে সুনীল বলল, 'কোনও সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি আজ চেষ্টা করলেও দিবাকরকে আড়াল করতে পারবে না। তুমি বলো সে কোথায়?'

'মীরা জেদের গলায় বলল, 'যদি না বলি।'

সুনীল সামান্য হাসল। বাঁ হাতে দাড়ির উপর থেকে জল মুছে নিয়ে বলল, 'তা হলেও দিবাকরকে তুমি বাঁচাতে পারবে না। হয়তো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমাকে খুন করতে হবে।'

মীরা তার আহত চোখ তুলে বলল, 'পারবে?'

সুনীল ডান হাতটা পকেট টেনে বাইরে আনল। তার হাতে এখন উদ্যত পিস্তল। তার মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

মীরার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব শব্দ উঠছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

পাশের ঘর থেকে 'মা, কার সঙ্গে কথা বলছ' বলতে বলতে ছুটে এল দিবাকরের ছেলে বরুণ। সুনীলকে দেখেই সে চিনল, ঝাঁপিয়ে পড়ল সুনীলের কোলের কাছে, 'আঙ্কেল, আমার টফি এনেছ? এতদিন আসনি কেন?'

বরুণের গলার আওয়াজ পেয়েই সুনীল পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়েছিল। বরুণ এখন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সুনীলের ডান হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। সে হাত বার করতে পারছে না।

বরুণ সুনীলকে ছেড়ে দিয়ে মীরাকে বলল, 'মা, তুমি কেমন গো! আঙ্কেল তো ভিজে গেছে। আমি বাবার প্যান্ট-জমা নিয়ে আসছি।'

বরুণ চলে যাচ্ছিল। সুনীল বলল, 'তোমার বাবা কোথায়?'

বরুণ হাত তুলে পাশের ঘরটা দেখাতে যাচ্ছিল। মীরা ছেলেকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ব্যস্ত গলায় বলল, 'ও কিছু জানে না।'

সুনীল পাশের ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকাল। দরজার উপর ফিকে গোলাপি রঙের পর্দা। সুনীল এগিয়ে যাচ্ছিল। মীরা তার আগে গিয়ে দরজা আড়াল করে দাঁড়াল। দুই হাত দুইদিকে ছড়িয়ে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'না, তুমি ও ঘরে যাবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না।'

সুনীল দীপ্ত ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতটা পকেট থেকে টেনে আবার সামনে আনল। পিস্তলটা সামনে ধরে বলল, 'সামনের বাধা সরাবার কায়দা আমি জানি। আমাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। ওর প্রাপ্য শাস্তি ওকে পেতেই হবে।'

মীরা গলায় ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'কীসের শাস্তি?'

সুনীল তার চোখ সরাল না; চোখের ভাষা বদলাল না। আগের মতোই বলল, 'বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে পুলিশের জালে ধরিয়ে দেওয়ার শাস্তি।'

মীরা এবার কাতর গলায় বলল, 'তুমি বিশ্বাস করো এ সব?'

সুনীল আগের মতোই ঠোঁট চেপে হাসল। নিষ্ঠুর এবং ব্যঙ্গের হাসি।

মীরার শরীর কাঁপছিল। শরীর ক্রমশ দুর্বল মনে হচ্ছে। নিজের ভেতর সাহস খুঁজতে খুঁজতে সে বলল, 'সঞ্জয় আর গোপালকে কি তা হলে তুমিই খুন করেছ?'

সুনীল বিরক্ত গলায় বলল, 'সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব না। এটাই আমার শেষ কাজ। তারপর যা বলবার আমি পুলিশের কাছে বলব। খুন না করে পাঁচ বছর খুনির সাজা পেয়েছি। এবার সত্যিকারের খুন করে সেই সাজা পেতে চাই। তুমি সরে দাঁড়াও।'

মীরা দরজা থেকে সরল না । দু হাতে দরজা আগলে অস্থির গলায় বলল, 'আমাকে না মেরে তুমি ও ঘরে যেতে পারবে না।'

সুনীল দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিদ্রূপের গলায় বলল, 'খুব পতিব্রতা হয়েছ তো। সহমরণে যেতে যদি না চাও তা হলে দরজা ছেড়ে দাঁড়াও। আমি একবার বিশ্বাসঘাতকটার সামনে যেতে চাই।'

মীরা এবার আহত বাঘিনির মতো তীব্র চোখে সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বিশ্বাসঘাতক নও? তুমি আমাকে ঠকাওনি? কথা দিয়ে পরে দূরে সরে যাওনি? অথচ তোমার কথা রাখতে আমি ওকে বিয়ে করেছি। তোমার শাস্তি হবে না?'

সুনীল এ কথার হঠাৎ কোনও জবাব খুঁজে পেল না। বাঁ হাত দিয়ে মীরাকে টেনে সরিয়ে দেওয়াব জন্যে সে হাত বাড়াল। বরুণ মায়ের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে। সে এগিয়ে এসে সুনীলের হাঁটু চেপে ধরে বলল, 'আঙ্কেল, তুমি বাবাকে মেরো না। আঙ্কেল আমাকে আর কোনওদিন টফি দিতে হবে না। আমার জন্যে ঘোড়া আনতে হবে না। তুমি আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দাও।'

সুনীল একমুহূর্ত স্থির থেকে বরুণকে দেখল। তারপর দু হাতে বরুণকে তুলে টেবিলের উপর জোর করে বসিয়ে দিল। টেবিলের উপর কিছু বইখাতা ছড়ানো ছিল। তার পাশে একটা টেপরেকর্ডার। বরুণ কিছুতেই সুনীলের হাত ছাড়ছে না। ওকে ছাড়াতে না পারলে সুনীলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুনীল এবার জোর খাটালো। ওর হাতের ধাক্কায় বরুণ ছিটকে টেবিল থেকে গড়িয়ে যাচ্ছিল। সুনীল সে দিকে তাকাল না। ক্ষিপ্রহাতে মীরাকে একটানে দরজা থেকে সরিয়ে দিয়ে সে ঘরের পর্দা তুলে ধরল। ঘরের মধ্যে কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। দিবাকর পিছনে বালিশ দিয়ে স্থাণুর মতো উদগ্রীব হয়ে বসে। সে তাকিয়ে আছে সুনীলের দিকে। সুনীলের হাতে উদ্যত পিস্তল। দিবাকর টেবিলের উপর থেকে একটা স্লেট তুলে ওকে দেখাল। চক দিয়ে তাতে লেখা, "সুনীল, আমি তোর প্রতীক্ষায় বসে আছি। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দে। তোর হাতে আমার মৃত্যু হোক।"

বাইরের ঘরে টেবিল থেকে পড়ে গিয়েছিল বরুণ। ওর পায়ের ধাক্কায় হ্যারিকেনটা মেঝেতে উলটে পড়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। বরুণ অন্ধকারে টেবিল হাতড়াতে গিয়ে না জেনে টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপে ধরেছে।

সুনীল স্লেটটা বাঁহাতে নিয়ে দিবাকরের বিছানার উপর ছুড়ে দিয়ে এক পা এগোতেই পাশের ঘর থেকে অন্ধকারে টেপে মীরার গান ভেসে এল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।' অবিশ্বাস্য একটি মুহূর্ত যেন।

সুনীলের হাত মুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল। যেন সারকারামার মতো পর পর ভেসে আসতে লাগল কয়েকটা ছবি। যেন দমকা হাওয়ায় হঠাৎ উড়ে উড়ে যাচ্ছে পুরোনো অ্যালবামের কয়েকটা পাতা। দিবাকব আর মীরাব বিয়ে! বরুণকে কোলে তুলে নাচাচ্ছে সুনীল। মীরা সুনীলের মুখে রসগোল্লা পুরে দিয়ে বলছে, 'ছেলে যেন লেখাপড়ায় তোমার মতো হয় শুধু এইটুকু আশীর্বাদ করো।' বরুণ ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধবছে সুনীলেব। দিবাকর আর সুনীল কলেজ ক্যানটিনে এক থালায় ভাত খাচ্ছে। সুনীল অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে মীরা বলল, 'কী হল গুলি চালাও। তোমার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সুনীল ডাকল, 'দিবাকর, কীসের লোভে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলি? কী পেয়েছিস তার বিনিময়ে?'

দিবাকর উত্তর দিল না। স্লেটটা কুড়িয়ে নিয়ে লিখতে লাগল। সুনীল মীরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিবাকর কথা বলছে না কেন?'

মীরা যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিচ্ছে এমন গলায় বলল, 'ও কথা বলতে পারে না।'

দিবাকর স্লেটটা তুলে সুনীলকে দেখাল। দিবাকর লিখেছে, "সুনীল, আমার গলায় ক্যানসার। 'রে' দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন পরেই হয়তো মরব। তার চেয়ে ঢের ভালো তোর হাতে মরা। তুই গুলি চালা।"

মীরা ঠিক এই সময় অদ্ভুত আচরণ করল। বিছানায় বসে দিবাকরকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে ডাকল, 'খোকা—খোকা।'

অন্ধকার ঘর থেকে বরুণ ছুটে এল। মীরা বলল, 'তুই আমার পাশে বোস। সুনীল, তোমার পিস্তলে তিনটে গুলি আছে তো?'

ঝট করে সুনীলের মনে হল সে একবার দিবাকর, মীরা আর বরুণের ছবি তুলে দিয়েছিল। ওরা ঠিক এমন করেই পাশাপাশি বসে ছিল। সে দিন সুনীলের হাতে ক্যামেরা ছিল, এখন পিস্তল।

সুনীল ভেতরে ভেতরে দুর্বল হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, মীরা কিংবা বরুণ তার লক্ষ্য নয়। অথচ ওরা এক অদৃশ্য শক্তিতে দিবাকরকে আড়াল করছে। এই শক্তিটার নাম কী? এই আড়াল সে সহজে ভেদ করতে পারবে না। তার মনে হল, দিবাকর নয়, তার উদ্যত পিস্তলের সামনে একজন মা, একজন বাবা আর তাদের একমাত্র বংশধর । সুনীল পিস্তল নামাল না। এক পা সরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বলল, 'তুই আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে ধরিয়ে দিলি? তুই পুলিশের ইনফর্মার হয়ে গেলি?'

দিবাকর জবাব দিতে পারল না। সে মুখ তুলে মীরার দিকে তাকাল। তার ঘোলাটে এবং যন্ত্রণায় করুণ হয়ে আসা চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

মীরা বলল, 'ও তোমার কথা জবাব দিতে পারবে না। জবাবটা আমার কাছ থেকে শুনে নাও। বিশ্বাস করা না করা তোমার উপর।'

সুনীল বলল, 'আগে শুনি।'

মীরা বলল. 'সঞ্জয় এল সন্ধেবেলা। বলল পুলিশ ওদের ফলো করছে। ওদের পক্ষে সুনীলের সঙ্গে যোগাযোগ করা মুশকিল। সুনীলের বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। বাঁচবার আশা নেই। ওরা ডাক্তারের রিপোর্ট দেখাল। ও যেন সুনীলকে খবর দেয়। সুনীলের নিরাপত্তার দায়িত্ব ওদের। দিবাকর খবর পাঠিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। পুলিশ ওকে সামনের রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায়। খোকাকে নিয়ে আমি তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম কাকাবাবুকে দেখতে। আমাদেরও ওরা থানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে। আমরা বুঝতে পারি, তোমার বিপদ আসছে। কিন্তু তখন কিছু করার নেই। তুমি অ্যারেস্ট হওয়ার পর আমরা ছাড়া পাই। পরে জেনেছি সঞ্জয় আর গোপালকে পুলিশ ধরেছিল। ওদের শর্ত দিয়েছিল যদি সুনীলকে ধরিয়ে দিতে পারে তা হলে ওদের ওপর থেকে সমস্ত চার্জ তুলে নেবে। গোপালের বউ ঊর্মিলার বাবাই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। উনি গোপালের কাকার বন্ধু। তোমাকে ধরিয়ে দেওয়ার কোনও ইচ্ছে দিবাকরের ছিল না। তোমার মতো দিবাকরও না-জেনে, শুধু বিশ্বাস করে ট্র্যাপে পা দিয়েছিল।'

কথা বলতে বলতে মীরা উত্তেজিতভাবে উঠে গেল। আলমারির ভেতর থেকে একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স এনে তার ঢাকনা খুলে বার করল দুটো চিঠি। সুনীলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইটা হচ্ছে ডাক্তারের সেই মিথ্যা-রিপোর্ট. যেটা গোপাল জাল করেছিল পুলিশের সাহায্যে। আর তুমি ধরা পড়ার পর দিবাকরকে লেখা সঞ্জয়ের চিঠি।'

সুনীল চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগল, 'প্রিয় দিবাকর, সুনীলের খুব লম্বা মেয়াদের জেল হবে। তোর জন্যেই পুলিশ সুনীলকে ধরতে পেরেছে বলে পুলিশ তোর কাছে কৃতজ্ঞ। গোপালের কাকাকে বলেছি, তিনি তাঁর বন্ধুকে দিয়ে তোর উপর থেকেও সমস্ত চার্জ তুলে নেবেন। বিয়ে-থা করেছিস, ছেলের বাপও হয়েছিস এখন এ সব পাগলামি মানায় না।'

সুনীল চিঠিটা ফেরত দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে বৃষ্টি বোধ হয় থেমেছে। সুনীল বাঁ হাত দিয়ে জানলার একটা পাল্লা খুলে দেখল আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

মীরা কাঠের বাক্সে চিঠিটা রাখতে রাখতে বলল, 'তবুও আমরা নিরাপদ ছিলাম না। ক্রমাগত বাড়ি বদলেছি। সহজে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইত না। ঊর্মিলাকে গোপাল বিয়ে করার পর আমাদের উপর থেকে চার্জ উঠল। আমি ভেবেছিলাম আলিপুরে যখন এসেছ তখন একবার দেখা করি। কিন্তু অনুমতি পাইনি। আমি জানি না এ সব কথা তুমি বিশ্বাস করবে কি না।'

সুনীল দিবাকরের টেবিলের দিকে তাকাল। স্ট্যান্ডে দুটো ফটো। একটা সুনীলের হাতে তোলা দিবাকর, মীরা আর বরুণের ছবি। আরেকটা মীরার হাতে তোলা সুনীল আর দিবাকরের ছবি।

সুনীল চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দিবাকরের দিকে তাকাল। দিবাকর স্লেটে লিখছে 'মীরার সব কথা সত্যি। আমি না জেনে ঠকেছি। তবু তুই আমায় ক্ষমা করিস না। আমি মরতে চাই।'

সুনীল স্থির চোখে দিবাকরকে দেখল। তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তার চোখ জ্বালা করছে। সে পিস্তল হাতে এগিয়ে এল। বরুণের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'খোকা, আমার কাছে টফি নেই। এইটা আছে। এবার থেকে এটা তোমার কাছে থাকবে।'

মীরা শিউরে উঠে বলল, 'ওর মধ্যে গুলি নেই?'

সুনীল হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। খোকার হাতে কি ভোঁতা অস্ত্র দিতে পারি। ওতে তিনটে গুলি ছিল। দুটো খরচ হয়েছে কিন্তু একটা থেকে গেছে আগামিদিনের জন্যে। ওটা আমি খোকাকে দিলাম। তোমরা ওকে অস্ত্রের ব্যবহারটা শিখিয়ে দিও।'

সুনীল চলে যাচ্ছিল। বাইরে দুর্যোগ কেটে গেছে। মীরা ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

সুনীল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মিষ্টি করে হাসল। বলল, 'থানায়। দুটো খুনের দায়িত্ব নিজে নিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়দা হয়তো কাল সকালে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। ওঁর আগে আমাকে যেতে হবে।'

সুনীল দরজা পেরতে গিয়ে থামল। মীরা দরজায় দাঁড়িয়ে। বাইরের দুর্যোগ কেটে গিয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে নারকেলগাছের মাথায় । তারই ক্ষীণ আলো মীরার চিবুকে।

সুনীল গাঢ় গলায় বলল, 'যদি কখনও ফিরে আসি তা হলে আবার দেখা হবে। তোমাদের আমার মনে থাকবে।'

সুনীল বাগানের গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে হাত নাড়ল তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মীরার মনে হল, সুনীল এতক্ষণ শুধু খুনের ভয় দেখিয়েছে কিন্তু খুন করতে পারেনি। এইবার সে সত্যিই খুন করে মৃতদেহ পেছনে রেখে হেঁটে গেল।

এখন এই লাশ বয়ে বেড়াতে হবে মীরাকে—যতদিন বাঁচবে ততদিন বুকের হিমঘরে লাশটা থেকে যাবে।

মীরা অন্ধকারেই চোখ বুঝল। শুধু অন্ধকারই জানল, মীরার দু চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। □

সবুজ দ্বীপের মাঝি

বারিদবরণ চক্রবর্তী

নকুলকে দেখেই বিভাসের খুন এবং খুনি সম্পর্কিত চালু কথাটাই মনে এসে যায়,—খুনি যতদিন পরেই হোক না কেন অকুস্থলে আসবেই।

যদিও সে দিন আজকের নকুল ছিল না; ছিল দশ-বারো বছরের একটা ছেলেমাত্র, ধড়ের তুলনায় বিশাল মাথা, খ্যাংড়া কাটির মতো হাত পা, সর্বাঙ্গে খোসপাঁচড়া—সময় পেলেই খস্‌খস্ করে চুলকাত। আজ আঠারো বছর পর সেই নকুলকে চেনা সম্ভবই ছিল না, তবুও কেমন করে যেন চিনে ফেলে বিভাস।

সেই গুখানিযা গ্রাম;—সেই কোলবিল, সেই শ্মশান, সেই নিতাই হালদারের ছেলে নকুল হালদার। যে নিতাইকে সে..........ভাবতে গিয়েই এই শীতেও বিভাসের মেরুদণ্ড বেয়ে ঘাম নামতে থাকে।

না, খুন সেটা নয়; যাকে বলে মার্ডার সেটা কখনই তা ছিল না। ঠিকই কাটা কলাগাছের মতো সপাটে লাশটা পড়ে গিয়েছিল, লাল গলগলে রক্ত গড়াতে গড়াতে পিচ রঙা হয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছিল; তবুও কোনও অর্থে সেটা চলতি খুন ছিল না! —দীর্ঘ আঠারোটা বছর ধরে বিভাস এইভাবে নিজেকে বুঝিয়ে এলেও আজ এই মুহূর্তে দু অক্ষরের খুন কথাটাই চারদিকে পাক খেতে খেতে তার দিকে তাড়া করে আসে।

না, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। সে চিনতে পারলেও কোনওভাবেই তাকে নকুলের চেনার কথা নয়; তবুও যতটা পারা যায় দূরত্ব-রক্ষা করার জন্য। তিরতিরে জলের দিকে চোখ নামিয়ে আঙুলে আঁকিবুঁকি কেটেই চলে।

—তখন থেকে জলে চোখ রেখে কী দেখছেন? সেই কোলবিলে কী আর আছে, পাটঝাঁঝি-কাঁটাঝাঁঝি-গেঁড়ি-গলি-নোংরা গাছপালা শ্যাওলায় ভরা। নিয়ম বেঁধে এখন চুন দিয়ে জলের তলা মাজা হয়, মহুয়ার খোল ছড়ানো হয়। রোদ্দুর একেবারে খেলে যায় নীচের পাঁকমাটি অব্দি। টলটলে জল দেখেও বুঝতে পারছেন না।

বিভাসের মুখ তুলে চোখে চোখ রাখতেই হয়। বাজে ভয়টাকে দূরে ছুড়ে ফেলবার মতো করেই এক গণ্ডূষ জল চারিদিকে ছড়িয়েও দেয় খেলার ভঙ্গিতে। 'আপনার ঝোলার মধ্যে গামছা কি লুঙ্গিটুঙ্গি নেই? ঝপাৎ করে একটা ঝাঁপ দিয়ে ডিঙির খুঁটটা ধরে ভেসে চলুন না, দেখবেন কী ভালোই না লাগে! মাঘ মাস, শীত করবে ঠিকই, তবুও মজা পাবেন। —আপনি তো সাঁতার জানেন।'

—কী করে তুমি জানলে আমি সাঁতার জানি?

সেই ভয়টাই আবার গোঁত খেয়ে ফিরে আসে। দাঁড় টানতে টানতে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড় থামিয়ে ঘস্‌ঘস্ করে উরোতটা চুলকে নিয়ে নকুল বলে ওঠে, 'আমরা তো মৎস্যজীবী মানুষ। জলের সঙ্গে আমাদের জন্ম থেকেই ভাবসাব। আমরা বুঝি জলের সঙ্গে কার কেমনতর সম্পর্ক। আপনার সঙ্গে জলের ভাব বন্ধুত্ব না থাকলে আপনিভাবে নিশ্চিন্তে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলতেই পারতেন না। গুটি মেরে এসে বসতেন একেবারে ডিঙির মধ্যিখানে।'

জোরে সশব্দে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে বিভাসের বুকের ভেতর থেকে। এত জোরে যে, কিছুটা বিব্রত হয়ে ওঠে। বিব্রত ভাবটা চাপা দেওয়ার জন্যেই ফুরফুরে ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'তোমাদের এই বিলটা কিন্তু বেশ ভালোই নকুল, মাছচাষের একেবারে আইডিয়াল। তোমাদের ওই গোটা গ্রামটাই তো জেলেদের, কী বলো।'

—আপনি তো সব জানেনই দেখছি।

নকুলের কাটাছাঁটা কথার ধরনধারণে বিভাস বুঝতে পারে, কথা বাদ দিয়ে নিজের মধ্যেই সে নিজে নিবিষ্ট হয়ে কিছুর একটা হদিস পেতে চাইছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই নিবিষ্টতাকে টলিয়ে দেওয়ার জন্যেই বলে ওঠে,—

—গল্পটল্প কিছু একটা করো না?—

—গল্প!

—মানে এই সব জায়গা-টায়গার। সব জায়গারই তো কিছু না কিছু গল্প থাকে।

—তাহলে তো এই কোলবিলেরই গল্প বলতে হয়।

—বলো, বলো। তাই বলো।

—গল্প মানে ইতিহাস। কিন্তু সে সবে গল্প আপনি শুনবেন? নতুন করে?

কাপড় সরিয়ে ডান উরোতটা নকুল ঘসঘস করে চুলকে নেয়। আঠারো বছর আগে নকুল খোসপাঁচড়ার জ্বালায় হাত-পা চুলকাত। এখনও কেন চুলকায়? বিভাসের দু চোয়াল কড় কড় করে বেজে ওঠে;—না, কোনও আঁচড়েই পারবে না। আঠারো বছরের পুরনো পুরু পর্দা তুলে ফেলতে পারবে না।

আমাকে দেখে কি তোমার এতই পণ্ডিত বলে মনে হচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলার সমস্ত নদী-খালবিলের বৃত্তান্ত জানি। না হে না। কিছুই জানি না। সবই আমার কাছে নতুন।

—তবে শুনুন। আমার মতো করেই আমি বলি, আগে এই বিরাট কোলবিলটা ছিল মহাজনেরই তাঁবে, আমরা মাছমারারা তাদের কাছেই গতর খাটতাম.—তেন্দের হাতে থাকলে মারধর উৎপাত যেমন যেমন থাকে সবই ছিল। সাতষট্টি সালের সেই প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা সবাই গিয়ে কেঁদে পড়ল হরেকৃষ্ণ কোঙারের কাছে; বলল এই কোলবিল তো গঙ্গারই একটা। দিশহারানো দহ বই অন্য কিছু তো নয়;—সেই রানি রাসমণির সময় থেকেই গঙ্গার নিঃশর্ত ভোগদখলের অধিকারী জেলেমাঝি। খামোখা কেন মহাজন ব্যাপারিদের হাতে নির্যাতন পোয়াতে হবে? দিন আমাদের হাতে দখলি স্বত্ব লিখে। তিনি বললেন, 'বুঝদার হও—রানির সেই সব লেখাজোখা দলিলপত্র কিছুই নেই, এখন সবই সরকারের খাস। সরকারের খাসজমির বন্দোবস্ত দিতে হয় টেন্ডার ডেকে, টেন্ডার মানে বোঝো তো—দরাদরির হাঁকাহাঁকির চিঠিচাপাটি—সেখানে যে বেশি মূল্য দিতে কবুল করে তাকেই বাঁধাসময়ের জন্যে মালিকানা ছেড়ে দিতে হয়। যদি তোমরা বিনা পয়সায় ভোগদখলের মতলব ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র খাজনায়—ধরো কিনা বছরে একর পিছু দশ টাকা এমনি তরো কিছু একটা! —তবে রাতারাতি নোটিস করে তোমাদের দিয়ে দিতে পারি. নিজেরা ভাবো, ভেবেচিন্তে একাট্টা হয়ে আমার কাছে এসো। সেই হল কিনা কোলবিলের একালের সূত্রপাত।'

এ গল্প বিভাস শুনতে চায় না, তবু কার্যগতিকে এই গল্পের মধ্যেই পড়তে হয়। বিল ছেড়ে ডিঙি এবার গঙ্গার বুকে এসে পড়ে।

গল্প থামিয়ে নকুল আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করে।

ওই যে—ওই,—দ্বীপ চরনোয়াপাড়া,—আপনারা সেই সবুজ দ্বীপ,—আমাদেরও সবুজদ্বীপ,—সবুজ মানেই তো স্বপ্ন! খাসা নামটা কিন্তু দিয়েছেন।'

নড়েচড়ে ওঠে বিভাস চক্রবর্তী। এই দ্বীপই তার আজকের গন্তব্য। কিছুদিন ধরেই দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এই চরভূমির খবর শুনে আসছিল। কলকাতার কাছেই; হুগলির বলাগড় পেরোলেই যে গঙ্গা,—সেই গঙ্গার বুকেই জেগেছে এই চরজমি,—মানুষের পা এখনও তেমন করে পড়েনি,—যদিও এরই মধ্যে সরকারি লোকজনেরা আসাযাওয়া শুরু করে দিয়েছে—পরিকল্পনা করেছে নতুন একটা ট্যুরিস্ট স্পট গড়বার। খবরের কাগজেই খবর ছিল, সোমড়াবাজার স্টেশনে নেমে শুখনিয়া ঘাটে এলেই নৌকো পাওয়া যাবে,—আর সেই নৌকোই পৌঁছে দেবে চরনোয়াপাড়ায়। সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর অশান্ত দিনগুলোর পর থেকে বিশেষত গত দশ-বারো বছর ধরে এই ঘোরাঘুরির নেশাটাই বিভাসকে কেমন যেন পেয়ে বসেছে। কাছে কি দূরে,—এই নিয়ে কোনও বাছবিচার নেই; নতুন জায়গা হলে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যায়।

যদিও যত না নতুন চরভূমির টান, তার থেকে অনেক বেশি টান লেগেছিল শুখনিয়া নামটাতে। আজকের পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে কেমন যেন দুদ্দাড় করে ছুটে এসেছিল সাতাশ-আটাশের সেই সব দিন।

পথ ধরে ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল শুখনিয়া ঘাটে। দেখা হয়ে গিয়েছিল নকুলের সঙ্গে, দুএকটা মামুলি কথার পিঠে বেরিয়ে পড়েছিল তার পরিচয়,—নিতাই হালদারেরই সে ছেলে। তেমন করে কিছু বোঝবার আগেই ডিঙি ভেসে গিয়েছিল।

খবরে তো পড়েছিলাম, এখানে আর অনেক লোকজন আসে, অনেক পানসি নৌকো দাঁড়িয়ে থাকে। কই তেমন কিছু দেখলাম না?

—ছুটি-পরবের দিনে একটু-আধটু ভিড় হলে তবেই দুচারটে ডিঙি এসে দাঁড়ায়, তা না হলে এমন কিছু নয়। ইংরিজি বছর শুরুর দিনে ঘাটে বেশকিছু ডিঙি নৌকো জড়ো হয়েছিল। আসলে এ ঘাটের মাঝি বলতে আমিই;—চরে কাজকাম তো হচ্ছে—ডাঙা থেকে ডি-এম, এস-ডি-ও, বি-ডি-ও, পঞ্চায়েতের নেতাদের আমিই নিয়ে যাই। বাঁধা মাইনে আমার। উপরি হয় আপনাদের মতো মানুষদের পারাপার করিয়ে।

নোঙর ছুড়ে ডিঙি বেঁধে ফেলে নকুল।

পিছু না ফিরেও বুঝতে পারে বিভাস তার পেছন পেছন এগিয়ে আসছে নকুল। এড়ানো যাবে না, এড়াতে চাওয়া উচিতও হবে না, বিশেষত এই নির্জন ভূখণ্ডে ঠিক এই মুহূর্তে কেউ কোথাও নেই-ও। ফিরে যাওয়ার জন্যে সে এবং তার ডিঙি ছাড়া অন্য সম্বলও নেই। চারদিকের জল, জলের গভীরতা মেপেজুপে নেওয়ার জন্যে এ দিকে তাকাতেই কাঁ-কাঁ-কাঁ ডাক ছাড়তে ছাড়তে লম্বা গলার সাদায় নীলে মেশানো একটা একটা পাখি উড়ে যায়, —অন্য সময় হলে বক না হাঁস এই নিয়ে জল্পনা করত কিন্তু এখন শুধু ডাকে—

—নকুল।

—বলুন।

মতলব ভেঁজে নয়, অনর্গল গল্প করে যাবে। যদি তার মনের মধ্যে স্মৃতির কিছু দাগ থেকেই থাকে, তবে সেখান থেকে কোনও ছবি আর ফুটবে না, গল্পে গল্পে তাকে চাপা দিয়ে দেবে।

—তোমাদের এই দ্বীপ তো একেবারেই নতুন, না?

—আটাত্তর সালের বন্যাতেই জেগেছে।

—তা এরই মধ্যে তো দেখছি বেশ গাছপালা লাগিয়েছ, দিব্যি তারা বেড়েও উঠেছে।

—গত বছরেও কোমর সমান ছিল, ভাদ্দর আশ্বিনের পর থেকেই লক্‌লক্‌ করে বাড়তে বাড়তে মাথা ছাড়িয়ে গেছে—যদিও এরা প্রায় সবই ইউক্যালিপটাস—একটু তাড়াতাড়িই বাড়ে।

সব ইউক্যালিপটাস হবে কেন? বেশ কিছু আকাশমণিও আছে,—তো, ওটা আকাশমণিরই জঙ্গল।

—আকাশমণি!

হ্যাঁ আকাশমণি। ইউক্যালিপটাস আর আকাশমণি অনেকটা একরকম হলেও দুয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। আকাশমণির ঢের বেশি ফ্যাকড়া বেরয়, পাতাগুলো হয় বেশ পুরু ঘন কালচে, এবং ডগাগুলোও ইউক্যালিপটাসের মতো তেলতেলা হয় না।

—জানি আপনাকে পরখ করছিলাম।

—কীসের পরখ?

বিভাসের গলার স্বর কর্কশ হয়ে ওঠে।

—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, আপনার সব কিছুতেই যেন গ্রামের একটা ছোঁয়া আছে,—আপনাকে দেখে আমার ছেলেবয়সের—

—বাঃ। তোমার মজার সিদ্ধান্ত তো। গাছপালা চিনলেই গ্রামগঞ্জের মানুষ হতে হবে? শুধু গাছপালা কেন, আমি অনেক রকম পাখিও চিনি জানো,—ওই তো ওই তো একটা হাট্টিমা বসে আছে,—ওই তো একটা টি টি,—বেশ তো এখানে অনেক রেয়ার স্পেসিসের পাখি আছে।

প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার জন্যে আকাশমণি মরিয়া হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা! ছেলেবেলা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সব স্মৃতি অদ্ভুত উদ্ভটভাবে কেউ কেউ ধরে রাখতে পারে।

—ওই পশ্চিমের দিকটায় একটা অর্জুনের জঙ্গল গড়ে তোলা হচ্ছে, কয়েকটা ঝুঁটিভরত ওখানে এসে বাসা বেঁধেছে,—দেখবেন তো চলুন।

—চলো, চলো।

উচ্ছ্বাসে বাহুল্যে লাট্টুর মতো ঘুরে গিয়ে মাটি থেকে একটা ঢেলা তুলে নিয়ে সামনের গাছটার দিকে ছুড়ে দেয়। আর তখনই শুধু ওই গাছটাই নয়, পাশাপাশি সব কটি গাছই যেন হাসিতে খিলখিল করে ওঠে,—আকাশ ঢেকে দেয় শুধু ডানাঝাপটানো হাঁসের পাখা, লাল, সাদা, খয়েরি, মেটে,—গাছটায় বুঝি পাতা ছিল না, কেবল হাঁসই ছিল।

এত কিছুর মধ্যে থেকেও বিভাস কিন্তু নকুলকে লক্ষ করতে ভোলে না।

হঠাৎই অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠে, 'নকুল তুমি এখন কী করবে? আমি ভাবছি এই ঝাউগাছগুলোর ছায়ায় চোখ বুজিয়ে পড়ে থাকব, পারলে দেব একটা ছোট্ট করে ঘুম,—ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।' কিন্তু চোখ বুজিয়ে ঘণ্টাখানেকও পড়ে থাকতে পারে না। কুয়াশা কুয়াশা অস্পষ্ট আবছা অবয়ব থেকে ক্রমশ স্পষ্ট চেহারায় তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায় নিতাই হালদার; মগজটা বেয়াড়া রকমের কৌতূহলী হয়ে ওঠে,—ছেঁড়াখোড়া স্মৃতিগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চায় সেদিনের নকুলের চেহারাটা।

ধড়মড় করে উঠে বসে।

—উঠলেন যে!

—চোখে আলো এসে বিঁধছে।

তা তো বিঁধবেই, একেবারে যে খোলা আকাশ। গাছগুলোও তো তেমন বড় হয়নি, যা কিছু দেখছেন সবই তো দুবছরের কাণ্ডকারখানায় গড়ে উঠেছে, আর পাঁচটা বছর যেতে দিন না, দেখবেন কত কী? আমরা মানে শুখনিয়া-সোমড়া-বলাগড়ের মানুষজনেরা একেবারে মায়েব সেবা করার মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছি এই দ্বীপের নানা কাজকর্মে,—আজ ছুটির দিন, তাই চাক্ষুষ করতে পারলেন না সেই সব কাজকর্ম। পঞ্চায়েত কাজের জন্যে চোদ্দো টাকা করে রোজ দেয় ঠিকই, কিন্তু টাকা তো বড় কথা নয়,—বড় কথা স্বপ্ন—এখানে আমরা সবাই কাজ করি সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই,—আলো জ্বলবে, সাঁকো হবে, নতুন দোকানপাট বসবে যারা বেড়াতে আসবে তাদের জন্যে, ঘেরাটোপের ছোট ছোট কোঠা হবে, গঙ্গার বুক জুড়ে ভাসবে ফুলকাটা সামিয়ানা টাঙানো বোটনৌকো।—মানুষের সরগরমে আমাদের এই সোমড়া স্টেশনে জোড়ালাইন বসে যাবে।

—বাঃ, বেশ স্বপ্নের ঘোরে কথা বলতে পারো তো।

—স্বপ্নই তো। স্বপ্ন দেখারই তো সময় এসেছে,—বুক জুড়ে স্বপ্ন দেখা, আর হাতেপায়ে কাজ করে যাওয়া,—এখন তারই তো সময়।

—তা নয় এসেছে। কিন্তু আমারও যে পেট জ্বলতে শুরু করেছে। লক্ষ্মী ছেলেটি যাও না ডিঙিটা নিয়ে একবার স্টেশনের দোকানে!

—ঝোলায় করে কিছু আনেননি?

না।

সে-কী! এখানে যারা আসে তারা সোমড়া-বলাগড় কিংবা করোলা থেকে খাওয়াদাওয়ার কিছু তো নিয়েই আসে। ঠিক আছে,—আমি কিছু একটার ব্যবস্থা করছি,—আমার ডিঙিতে মুড়ি আছে,—আর—?

ত্বরিত পায়ে নকুল অদৃশ্য হয়ে যায়।

তুরন্তে বিভাসও মেরুদণ্ড চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই অবসরে যতটুকু পারা যায় ফুসফুস ভর্তি করে অক্সিজেন নিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে টানা টানা নিশ্বাস নিয়ে নেয়, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে জলের পারে এগিয়ে চলে। কিন্তু জল, জল কোথায়? পথ কোথায়? সব কিছু আড়াল করে ভাসতে থাকে ডানা আর ডানা, ডানে বাঁয়ে শুধু আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে ডানার ঝাপট, তাকে সতর্ক পাহারায় ঘিরে রাখার জন্যেই যেন এক অলৌকিক ভয়ঙ্কর ব্যূহ রচনা হয়ে যায়।

এই দিকে আসুন।

মানে।

আপনার জন্যে এই সব যে আনলাম। মুড়ি, আর যেত থেকে দুটো বেগুন ছিঁড়ে পুড়িয়ে আনলাম।

—বেগুন!

—পঞ্চায়েত এখানকার জমিতে খেতির মতো একটু করেছে। ওই দেখুন না। কপি-বেগুন বেশ কিছু কিছু ফলেছে; —আর আপনি বেগুনপোড়া তা খেতে ভালোইবাসেন।

—আমি!

—হ্যাঁ, আপনি। পোড়া কয়লা নয়, ধকধক করে নকুলের চোখ জ্বলতে থাকে।

প্রথমে বিভাস ভাবে ছলনার জাল বিস্তার করে এবারও এড়িয়ে যাবে, বা সরাসরি অস্বীকার করে রুখে উঠবে, কিন্তু দুটোর কোনওটাই পারে না।

—তা হলে তুমি আমাকে চিনেই ফেলেছ দেখছি!

—অনেক আগেই।

—আমিও।

—দেখে তো মনে হচ্ছিল না। কেবল না চিনতেই চাইছিলেন।

—চেনা দিয়ে লাভ কী হত? খামোখা খুঁড়ে তোমার দুঃখই জাগাতাম।

সপ্রতিভায় ঝলসে ওঠে বিভাস। চিনতে পেরেছে তো পারুক না; শুধু তো চিনতে পারাই, —আর তো বেশি কিছু নয়!

—সত্যি সে সব দিনের কথা ভাবলে বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। তখন তুমি কত ছোট্ট ছিলে।'

মুড়ির জন্যে পঁচিশ পয়সা আর ওই বেগুনের জন্যে এক টাকা,—এক টাকা পঁচিশ দিন,— পঞ্চায়েত এখানকার আনাজপাতি সবই বিক্রি করে তো। ছেলেবেলায় সবাই-ই ছোট থাকে, সে সব কথা বাদ দিন।

—ঠিকই তো। পুরনো সে সব দিনের যত অঘটনের কথা না বলে এখনকার কথাই বলো।

—এখনকার কথা?

—মানে তোমাদের এই দ্বীপের কথাই বলো না?

—দ্বীপ।

—হ্যাঁ দ্বীপ।

নতুন করে ভাবনাচিন্তার আব কোনও অবসব না দিয়েই বিভাস হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে দ্বীপ সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ না হতে হতেই ক্রমশ গাছের ঝুপরি ঝুপরি ছায়াগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার মতো হয়ে উঠতে থাকে। পাখপাখালির ডাকাডাকি, লাফালাফি, চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে হুলুস্থুল শুরু হয়ে যায়। পাব সংলগ্ন বদ্ধ জলাটায় ঝুপঝুপ করে এসে বসতে থাকে হাঁসের ঝাঁকের মধ্যে নতুন নতুন হাঁসের ঝাঁক।

নকুল বলে, 'এবার আমাদের ফিরতে হবে।'

ছপছপ করে দাঁড়ের শব্দ ওঠে। তিরের মতো গতিতে ডিঙি এগিয়ে চলে। দেখতে দেখতে কাছে-দূরের ঝাপসা ঝাপসা সব কিছু উধাও হয়ে গিয়ে একটা ভারী পর্দা কোথা থেকে যেন নেমে আসে, এই সময়টাকে আরও ভয়ানক করে তোলে আকাশটা—তারাগুলোও এখন তেমন ফোটে না। হঠাৎই ভরাট গলায় ছটফট করে ওঠে নকুল, 'এই কোলবিলের ওপর দিয়ে যখন দাঁড় টানতে টানতে যাই, তখন এক এক সময় বুকের মধ্যে থেকে একটা কথা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—আমার মরা বাপের উদ্দেশে চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করে,—বাপ, তুমি কী বোকা ছিলে গো, তুমি কী করে চেয়েছিলে খাজনাপত্তর না দিয়ে তখন তখনই জাল ফেলবার চিরদিনের দখলিস্বত্ব,—তুমি তোমার মাছমারা ভাই-বন্ধুদের শলাপরামর্শ বুঝলে না,—দিনকাল খতিয়ে দেখলে না, ভেসে গেলে শহুরে হুজুগে ছেলেছোকরা আর মতলববাজ ধেড়েদের ধোঁকায়।'

গঙ্গার ওপারে রানাঘাটের দিকটায় সারি সারি আলো জ্বলে ওঠে। একটা আলোর ছটা এক দিক হতে অন্যদিকে ছুটে ছুটে যায়। বিভাসের গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হযে ফাটে। খসখসে গলায় জানতে চায়, 'নকুল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—ইটভাটার ঘাটে, মানে শ্মশানঘাটে।

—শ্মশানঘাটে কেন?

উত্তর নয়, নকুলের ধারালো দৃষ্টিটাই অন্ধকার ফুঁড়ে বিভাসের চোখে এসে বেঁধে। দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে ওঠে, 'শ্মশানঘাটে কেন?'

—বারে! একদিন নিজের কমরেড কীভাবে কোন জায়গায় বেঘোরে মরে পড়েছিল, —সে জায়গাটা পর্যন্ত দেখবেন না!

—নকুল, তুমি আমাকে নিয়ে কী করতে চাও?

—আমি! আপনাকে?

ডিঙিটা ভীষণভাবে দুলে ওঠে। বিভাস মিনিটখানেক কোনও সাড়াশব্দই পায় না, শুধু বিকট একটা ফোঁসফোঁসে আওয়াজ শোনে। তবে কি কুমির? তবে যে জানত যেখানে শুশুকের পাল ঘোরে সে তল্লাটে কোনও.... ঝোলা থেকে চটপট টর্চটা বেরে করে আলো জ্বালতেই দেখে শুঁড় উঁচিয়ে মত্ত হস্তীর মতো বিশাল দাঁড়টাকে মাথাব ওপর তুলে নকুল দাঁড়িয়ে আছে।

—নকুল!

আছড়ে পড়াব ভঙ্গিতেই বসে পড়ে নকুল। ডিঙিটা আবার দুলে ওঠে,— দুলতে দুলতে শান্ত হয়ে গেলে দাঁড়ের টানে আবার ডিঙি ভেসে চলে।

—নামুন।

—অ্যাঁ!

—নামুন।

তেড়িয়া হয়ে ওঠে নকুল।

—আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—আমাব হাত ধরুন।

দ্বিরুক্তির সুযোগ না রেখে খপ্‌ করে বিভাসের হাতটা চেপে ধরে।

নকুল!

—চলুন।

—কোথায় যাব?

—যেখানে আমি যাব।—টর্চটা জ্বালুন।—চিনতে পারছেন?

বিভাস নিশ্বাস নিতে ভুলে যায়। হাত থেকে ছোঁ দিয়ে টর্চটাকে টেনে নিয়ে আরতি করার মতো চাবদিকে আলো ছড়িয়ে দিয়ে নকুল বলে ওঠে, 'এই সেই বুড়ো বটগাছটা, আমার হাবাগোবা দামাল বাপটার গলাকাটা লাশটা যেখানে পড়েছিল। সে দিন আমি কিছু বুঝিনি,—অনেকদিন পর—একটু একটু করে বুঝতে শুব করে শেষ পর্যন্ত সবটা বুঝেছি; ধীরে ধীরে সব হিসেবটা মিলে গেছে,—শহর ছেড়ে কেন-ই বা আসতেন—বাপের সঙ্গে কীসের শলাপরামর্শ করতেন—চুপিসাড়ে মধ্যে মধ্যে কেনই বা বেরিয়ে যেতেন। —আচ্ছা আমার বাপটার কসুর কী ছিল বলুন তো। সে তার ভুল বুঝতে পেরে ভাই বন্ধুদের মধ্যে ফিরে আসতে চাইছিল, এই তো?'

—নকুল!

—জানেন, আপনাকে চেনার পর থেকেই আমার মধ্যে কী ঝড়তুফান শুরু হয়ে গেছে। দু পা এগোচ্ছি তো চার পা পিছিয়ে যাচ্ছি। কিছুতেই ভুলতে পারছি না বাপের সেই খুনিটাকে, আবার কিছুতেই ভুলতে পারছি না চর নোয়াপাড়ার ওই সবুজ স্বপ্নটাকে। ভুলতে পারছি না, ওই নতুন দ্বীপটাকে গড়ে তোলার কাজে আমি নিজেকে একেবারেই বিলিয়ে দিয়েছি—এমন কিছু কাজ আমি করতে পারি না যাতে ওই গড়ার কাজ একটা দিনের জন্যে হলেও থমকে যায়।

—মানে—মানে—

—সোমড়া স্টেশনে নেমে নজর করেছিলেন, এ পাশের ছোট চায়ের দোকানটাকে? ইংরিজি বছর শুরুর দিনে ওই দোকানটাতে বিক্রি হয়েছিল আড়াইশো কাপ চা। বুঝতে পারছেন আড়াইশো কাপ কী করে বিক্রি হল? মানুষের যে ঢল নেমেছিল ওই সবুজ দ্বীপে।—আমি যে পারছি না—কিছুতেই পারছি না, সেই সবুজ দ্বীপটায় আপনার রক্তের দাগ লাগাতে,—আপনাকে নিয়ে কী করি?—কী করি বলুন তো? □

বাল্মীকির মা

মিহির ভট্টাচার্য

এখন মুনশিডাঙার মোড় বললে কেউ চিনবে না। বলতে হবে রানি রোডের মোড়। রানি রোড, গাঙ্গুলিপাড়া, কালাচাঁদ পতিতুণ্ড লেন, সিমলাইপাড়া—এ সব ছিল হিন্দু পাড়া। মুনশিডাঙার মোড় থেকে পুব দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মুসলমানদের ঘরবাড়ি, পতিত জমি, ধোপাপুকুর, চাষের খেত। এগুলো রাজা মণীন্দ্র রোডের উত্তরে। দক্ষিণে টালা পার্ক, জিমখানা, আর্মড পুলিশ ব্যারাক, ভেটিরিনারি কলেজ আর অনাথ দেবের বাগানের দু দিকে কয়েকটা হিন্দু বাড়ি। একদম পশ্চিমে বিটি বোডের উপর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রাজবাড়ি। এখানে এখন মুসলমানদের চিহ্ন হিসেবে পড়ে আছে মুনশিডাঙার মসজিদ, নিয়াজের দখল হয়ে যাওয়া জমি। দেশভাগের পর মুসলমানরা কাশীপুর বা বেলগাছিয়ার মুসলিম বস্তিতে সরে গেছে। দখল হয়ে গেছে তাদের জমি। গড়ে উঠেছে রিফিউজি বস্তি বা বস্তির মতো কলোনি। তা ছাড়াও অঞ্চলটা পালটে গেছে। নতুন নতুন চোখধাঁধানো বাড়িতে, নতুন পয়সাওয়ালা চোখধাঁধানো মানুষেরা খেত, পতিত, বাগান, কাম্প, ধোপাপুকুর, ধানকলের মাঠ হজম করে নতুন নাম দিয়ে দিয়েছে জায়গাগুলোর।

পুববাংলা থেকে মানুষের প্রথম ঢেউ এসে যে সব জায়গায় প্রথম থিতোয় তার মধ্যে মুনশিডাঙার মসজিদের পেছনের জমি একটা। এ-ও সেই নিয়াজের জমি। এরপরেই হাতিবাগানের মিত্তিরদের জমি। সেখানে তাদের একটা বাড়িও আছে। একতলা। এখন ভেঙে পড়ছে, তবু আছে। মসজিদের পেছনের জায়গাটা যারা দখল করে বসতি গেড়েছে তারা প্রায় সকলেই ঢাকা জেলার একই অঞ্চলেব লোক। প্রথম প্রথম তাদেব বাড়ির মাথায় লাউডগা, কুমড়োডগা লতিয়ে উঠেছিল। বাড়ির সামনে জায়গা পেয়েছিল যে কোনও একটা গাছ। এখন তারা শহুরে। লাউডগা, কুমড়োডগা শুকিয়ে গেছে। গাছগুলো অযত্নেও টিকে আছে। শুধু একটা পেয়ারা গাছ যত্ন পায়। পাড়ার হার্মাদ ছেলেরাও সাহস পায় না তার ডাল ভাঙতে, পাতা ছিঁড়তে, ফল পাড়তে। সেই গাছের গোড়ায়, মণীন্দ্র রোডের দিকে মুখ করে একটা জলচৌকির মাপে, সেরকম উঁচু একটা বেদি আছে। এক প্রৌঢ়া রোজ দুপুরবেলা থালায় ভাত সাজিয়ে, চারপাশে ব্যঞ্জন দিয়ে ওই বেদিতে এনে রাখে। হাঁটু মুড়ে বসে একটা হাঁটুর ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে। কতক্ষণ তার ঠিক নেই। একেক দিন একেক সময় উঠে পড়ে। ভাতের থালাটা হাতে নিয়ে কী যেন বলতে বলতে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। আশপাশের পুরোনো বাসিন্দারা এখন লক্ষ করেও লক্ষ করে না। তাদের বুকের মধ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস থমকে থাকে। সকলের সেই শ্বাস কখন নিঃশব্দে বেরিয়ে চরাচরের দীর্ঘশ্বাসে মিশে পেয়ারা গাছের পাতা ঝির ঝির কাঁপিয়ে বয়ে চলে।

ওই প্রৌঢ়া রতুর মা। রতুর নাম শুনলে এখনও পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া, দত্তবাগান, বীরপাড়া, সিমলাইপাড়া, সেভেন ট্যাঙ্কস্, শেঠবাগানের মানুষ কেমন সতর্ক হয়ে যায়। ছিপছিপে কালো চেহারা, গভীর কালো দুটো চোখ-মুখে সারল্যের ছাপ কিন্তু ডাকাতে স্বভাব। পুরো নাম রত্নাকর চক্রবর্তী। ওর বাবা মহেশ্বর চক্রবর্তী কোনও দিন কোনও কাজ করেনি। এখনও করে না। দখল করা জায়গায় ওদের যে বাড়ি সেটাও তার করা নয়। দেশে থাকতে সে ছিল ঘরজামাই। রতুর দাদু তাঁর আদরের একমাত্র মেয়েকে ভালো বংশ দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন আর শর্ত করে নিয়েছিলেন জামাই তাঁর বাড়িতেই থাকবে। তাঁর ছিল প্রচুর সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি। শিষ্য যজমানের সংখ্যা অনেক। থাকলে কী হবে। স্ত্রী গত। দুই ছেলে বড়ে। মেয়ে ছোটো। ছেলে

দুজনই হার্মাদ। যজন যাজন শিখতে চায় না। বিষয়-আশয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু বোন বলতে অজ্ঞান। নাম অমল আর বিমল।

তারপর দেশভাগ। রতুর মামারা বোনের মর্যাদা হারাবার ভয়ে রাতারাতি সবাইকে নিয়ে পালিয়ে এল। জায়গা দখল করে বাড়ি করল। ওর বাবা নির্বিকার ঘরজামাই। আগে যেমন কাজকর্ম না করে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে খেত তেমনিই কাটাতে লাগল। মামাদের আর বিয়ে হল না। কলকাতায় এসে রুজি-রোজগারের রাস্তা না পেয়ে হার্মাদ অমল আর বিমল মারদাঙ্গার জীবন বেছে নিল। প্রথম প্রথম আশপাশের কলকারখানার ইউনিয়নের উপর হামলার কাজ করত। একটা থেকে আরেকটা হয়। ধীরে ধীরে দু ভাই গুণ্ডা হিসেবে নাম করে ফেলল। অমল বেশি। বিমল কম।

রতু যখন ছোটো সেই সময় একদিন অমল অন্য একদল গুণ্ডার হাতে খুন হয়ে গেল। সে ছিল গোঁয়ার গোবিন্দ। গায়ে মোষের মতো জোর। সেই জোরে সব মেটাতে চাইত। পাঁচ-ছ বছরের রতু মায়ের হাত ধরে সেদিন মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিল। ওর বড়ে মামার অসুরের মতো পেটানো স্বাস্থ্যের শরীরটা পাড়ার ছেলেরা মর্গ থেকে বয়ে এনেছে। দূর থেকে ছুড়ে মারা বোমায় দেহের খানিকটা উড়ে গেছে। ঝলসে গেছে আশপাশের চামড়া। দাদু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিথর। মার শরীরটা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর বাবা ধারেকাছে কোথাও নেই। পলাতক। হয়তো টালা পার্কে তাসের আড্ডায়। লোকটা এরকমই। ছোটোমামা বিমল গা ঢাকা দিয়েছে। তার উপর আক্রমণ হওয়ার ভয় আছে। ওদের পরিবারের সামনে অনিশ্চয়তা।

সেদিন ছোটো রতু নিজেদের অসহায়তা বুঝতে পেরেছিল কি না কেউ জানে না। তবে অমলের মৃতদেহ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ সে মায়ের কাছে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। একবার মা-র মুখের দিকে. আরেকবার দাদুর মুখের দিকে, পড়শিদের মুখের দিকে, তারপর বড়েমামার শায়িত দেহের দিকে ঘুরে ফিরে দেখছিল। হয়তো ওর মনে বড়েমামার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এমনিতে সে বাড়িতেই থাকত কম। থাকলেও তেমন কথা বলত না। যা দু-একটা তা ওর মাকেই বলত। কিন্তু দাদুর মনে শান্তি ছিল না। তাঁর জ্বালা অধঃপতনে। বস্তিতে বাস, ছেলেদুটো গুণ্ডা-বদমাশ, মানুষের কাছ থেকে দেশের মতো মর্যাদা পান না। তিনি ভাবেন—ছেলেরা কাজকর্ম জোটাতে পারলে অন্তত কিছুটা মান-সম্মান ফিরতে পারে। তাই মামারা বাড়িতে ঢুকলেই দাদু মুখ খুলতেন—'আমার মহাপাপ! সারল্যার জানকী ভট্‌চাইজ্যের পোলারা কি না গুণ্ডা-বদমাইশ। সক্কলের কাম জোটে তগো জোটে না ক্যান? মামাবাড়ির দোষ! সেগুলানে লুটপাট কইর‍্যা খাইতো। সেই নরানাং মাতুলক্রম।'

রতুর মামারা যতই দুর্দান্ত হোক না কেন কোনওদিন দাদুর মুখে মুখে কথা বলেনি। তারা মুখ বুজে শুনে যেত। মাঝে মাঝে বড়ো মামা কেমন কাতরভাবে ওর মাকে শোনাত—"বুনডি, তুই-ই ক! বাবায় যে অ্যাতো রাগ করে তার কোনও মানে হয়। কেউ আমাগো কামকাজ দিবো না। এই রকম মাইর-ধইর কইরাই খাইতে হইবো আমাগো।"

বড়োমামার মৃত্যুর কথা শুনে ওর মা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। দাদু বাড়ির ভেতরে ঢুকে নিজের চৌকিতে উঠে বসেছিলেন। বাবা সারাদিন বাড়িতে ঢোকেনি। উনুন জ্বলেনি। পাশের বাড়ির গাঙ্গুলিদের বড়ে বউ একসময় এসে ওকে নিয়ে গেছে। সে-ই স্নান-খাওয়া করিয়েছে। দাদুকে, মাকে তারা খাওয়াতে চেয়েছিল। পারেনি। শুধু রাতেরবেলা বিছানায় শুয়ে সে প্রশ্ন করেছিল—'ছোটোমামা আসবে না?' রাতে বিমলের পাশে শোয়া অভ্যেস। মা তখন ছোড়দার চিন্তায় আকুল। ছেলের প্রশ্নে অতিকষ্টে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেও কান্নাভাঙা আওয়াজ লুকোতে পারল না—'তুই ঘুমা। ছোটো মামায় আইবে নে!' রতু মার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। কেউ বলতে পারবে না জীবন সম্পর্কে ও সেদিন কী শিখেছিল।

বিমল প্রায় তিন-চার মাস পাড়াছাড়া হয়ে রইল। তবু সময়মতো লোক মারফত বাড়ির খরচ পালিয়ে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত পাড়ার এক রাজনৈতিক নেতার মধ্যস্থতায় প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাংয়ের সঙ্গে মিউচুয়াল হল। বিমল স্বাধীন গুণ্ডা থেকে ওই রাজনৈতিক নেতার চামচা গুণ্ডা হয়ে গেল। থানার ও সি, স্থানীয় সি আই ডি কর্মচারী

আর ওই রাজনৈতিক নেতার কাছে বিমল ওয়াদা করল ও নিজে থেকে কোনও অপারেশন করবে না। বিনিময়ে ও একটা ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটির চাকরি পেল।

বড়োমামার মৃত্যুর পর দিনসাতেক ওর দাদু জবুথবু হয়ে কাটালেন। তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। ওঁর মধ্যে কেমন একটা ভরগ্রস্তের ভাব। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠেন। রতুকে সব সময় কাছে কাছে রাখেন। একেক সময় আবেগে নাতিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন—'দাদু, তুই আমার রত্নাকর। বল্ দাদু, তুই মামাদের মতো দস্যু রত্নাকর হবি না? বল্, তুই বাল্মীকি হবি?'

রতু কথার গভীরে যেতে পারে না। শব্দগুলো ওর চেতনায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু দাদুর আবেগটা বোঝে। বোঝে দাদু তার কাছে কিছু চাইছে। শিশু মন আবেগে সাড়া দেয়। মাথা নেড়ে বলে—'আমি বাল্মীকি হব।'

বাল্মীকি হওয়ার জন্য তাকে স্কুলে পাঠানো হয়। ছোটোমামা চাকরি করে। পাড়ায় সে ঠাণ্ডা। কিন্তু বেলঘরিয়ার একটা দলে ভিড়ে গেছে। গুণ্ডামির উটকো রোজগার ছাড়তে পারে না। সে বড়ো ভয়ঙ্কর নেশা। আরেক বড়ো নেশা লোকের মনের ভয়।

রতুর যখন বছর চোদ্দো বয়স ওর দাদু মারা গেলেন। পরিবারে এই দ্বিতীয় মৃত্যু ওর উপর কী প্রভাব ফেলল কে জানে। ও হঠাৎই পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে ঘুরে বেড়োতে শুরু করল। পয়সা রোজগারের ধান্দা না থাকলেও মারপিটে ওর স্বাভাবিক প্রবণতা। ধীরে ধীরে অল্পবয়েসি একটা দল ওর চারপাশে গড়ে উঠল। ওর ছোটোমামার পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক নেতা একদিন যেচে ওকে ডেকে কথা বললেন। অমল-বিমলের ভাগনে বলে বেশ স্নেহ আর আদরের সুরে ওকে আপন ভাব দেখালেন। ওদের পাড়ার সাদা পোশাকের পুলিশের লোক শচীন বাগচি একদিন নিমাই সাহার পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান খেতে খেতে ওর পিঠে হাত রেখে গল্প করল। ওদের পাড়ার টপ রংবাজ শিলু বিমলের বন্ধু। সে-ও একদিন বলল—'কি রে ভাগনে, কেলাবে যাস না কেন? রোজ আসবি।'

লোকমুখে রতুর মা সে খবর পায়। ছেলেকে চেপে ধরে। সে রুক্ষ স্বরে উত্তর দেয়—'আমি কি স্কুলে যাচ্ছি না? পড়াশুনাও তো করছি!'

ব্যাপারটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি হইচই করে বিমল। সে আজকাল কোনও কোনও দিন মাতাল অবস্থায় বাড়ি ঢোকে। আগে ভুলেও আসত না। সে বোন আর ভাগনের উপর দারুণ হম্বিতম্বি করল—'আমাগো জীবন তো গ্যাছে! কী করুম, ভাইগ্যার ফ্যার। কিন্তু তুই ক্যান সেই রাস্তা ধরতেছস। আমাগো খাওয়াব উপায় ছিল না। তোর অসুবিদাটা কোথায়? ফ্যার যদি তোরে অগো লগে দেখি তয়ালে তোর অ্যাকদিন কী আমার অ্যাকদিন!'

রতু চুপ। মামার হম্বিতম্বির বিরুদ্ধে টুঁ ফাঁ করল না। কিন্তু নিজেও পালটাল না। এ জন্য একদিন মার খেল বিমলেব হাতে। বিমল খ্যাপার মতো বিবেচনা না করে তেড়েমেরে শিলুর বাড়ির দরজায় হাজির হল। ওকে ডাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে বলল—'তুই আমার কইল্‌জায় হাত দিছস ক্যান?'

শিলু খুব ঠাণ্ডা মাথার মস্তান। তাই সে আজও বেঁচে। তার হাল ঢিলে হয়নি। এখনকার উঠতি মস্তানেরাও সমীহ করে। সে বিমলের দিকে বরফ চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীর গলায় বলল—'তুই শালা বরাবর মাথামোটা বাঙাল রয়ে গেলি। তোর ভাগনে অনেক সেয়ানা। নিজে না হতে পারলে দুনিয়ায় কেউ কাউকে মস্তান বানাতে পারে? তুই রতুকে ঠেকাতে পারবি?'

বিমল যতখানি তেড়েফুঁড়ে এসেছিল ঠিক ততখানিই চুপসে গিয়ে বলল—'তুই তো অরে দাবড়োানি লাগইতে পারস!'

শিলু কোনও জবাব দিল না।

ছোটোমামার হাতে মার খেয়ে রতু কোনও শব্দ করেনি। মার ঠেকাবার চেষ্টাও করেনি। দাদার হাতে ছেকে মার খেতে দেখে রতুর মার অন্তরে মোচড় দিল। সে রাতেরবেলা শোয়া ছেলের পাশে বসে গায়ে

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল—'তয় কি দস্যু রত্নাকরই হবি? তোর দাদুর আত্মাডা তো কাইন্দা কাইন্দা মরবো?'

রতু হঠাৎই ছেলেমানুষের মতো মা-র কোলে মাথা রেখে বলল—'না মা, আমি এখন থেকে শুধুই পড়াশুনা করব।'

ও নিজের চালচালন পাল্টায়। সঙ্গী-সাথিদের এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। পুরোপুরি পারে না। তবে যখনই মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে সামলে নেয় নিজেকে। কিন্তু একটা ঘটনায় সব তছনছ হয়ে গেল।

বিমল মার্ডার কেসে ধরা পড়ল। বেলঘরিয়ায় একজন স্ত্রীলোককে হত্যার দায়ে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেল। ওই স্ত্রীলোকটিকে ও পুষত। সে ওর আড়ালে অন্য আরেকজনের সঙ্গে পিরিত করত। বিমল তক্কে তক্কে থেকে দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে যায়। দুজনকেই খুন করার চেষ্টা করেছিল। লোকটা নেপালার কোপ খেয়েও পালিয়ে যেতে পেরেছে। চোট লেগেছে কাঁধে। স্ত্রীলোকটি পালাতে পারেনি। তার গলা নামিয়ে দিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ায় বিমল চাকরি থেকেও সাসপেন্ড হয়ে গেল। তার রাজনৈতিক দাদা সমস্ত ব্যাপারটা থেকে হাত ধুয়ে বসে রইলেন। তিনি রতু আর তার মাকে সাফ বলে দিলেন—'এ তো ক্রিমিনাল কেস! এতে আমি জড়াতে পারি না। পলিটিকাল মার্ডার হলে আলাদা কথা।' তারপর তিনি খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। মুখটা প্রসন্ন করে রতুকে বললেন—'ভাগনে, তোর মা-র আসার কী দরকার। তুই একবার বরং সন্ধের পর, না থাক সন্ধেবেলা হবে না, কাল সকালে দেখা করিস। এখন তো তোদের খাওয়া-পরা নিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে। তার উপর বিমলের কেস!'

হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি রতু। সারাক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে নেতার দিকে তাকিয়েছিল। মুখ ভাবলেশহীন। ওর মা-র মুখেচোখে কাতরতা আর অনুনয়-বিনয়ের ছাপ ছিল। নেতার কথা শুনতে শুনতে সে ভঙ্গি পালটে গিয়ে রাগের ছাপ ফুটে উঠল। কিন্তু তার কোনও বহিঃপ্রকাশ ঘটল না। ওরা দুজনে চুপচাপ উঠে এল।

রতু সকালে নেতার কাছে যায়নি। সে আবার পুরোমাত্রায় শিলুর দলের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করল। সরকারি দলের ওই নেতার সঙ্গে শিলুর সম্পর্ক ভালো না। সে বিরোধীদের সঙ্গেও নেই। নিজের বুদ্ধির জোরে চলে। থানা হাতে! বিরোধীদের সঙ্গে গেলে রোজগারপাতির সম্ভাবনা কম। ওরা শ্রমিকের পক্ষে। কিন্তু পয়সা তো দেয় মালিকরা। পয়সা আসে বেআইনি কাজে, ওয়াগন ভাঙায়, মালপাচারে। রতু অবশ্য বিরোধী দলের ছেলেদের সঙ্গেও ঘোরাফেরা করে।

রতু দস্যু রত্নাকার হয়ে গেল। বিমল কয়েদ থাকলেও সংসারের চাকা আগের মতোই চলতে লাগল। মামাদের মতো সে-ও বাড়িতে ফেরে না। ওর মা অস্থির হয়ে ওঠে। সে প্রায়ই ছটফটিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। অকারণ মণীন্দ্র রোড, রানি রোড, গাঙ্গুলিপাড়ায় চক্কর দেয়। পনেরো নম্বরের রাস্তায় হাঁটে। রতুর বাবা নির্বিকার। সে তার সুখ, অকর্মণ্যতা আর আড্ডা নিয়ে দিনযাপন করে। সময়মতো স্নান-খাওয়া আর রাতে শোওয়া—এটুকুই তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক। রতুর মা যে দিন যে দিন সামনে বসিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে পারে সে দিনই বলে—'ভাইগ্যের ফ্যারে তুইও দাদাগো মতো দস্যু হইয়া গেলি। উপায় তো নাই! কিন্তু তোর দাদু বড়ো কষ্ট পায়!'

বিমলের সাজা হয়ে গেল। রতুদের লাগানো উকিল খুব খেটেছে। বিমলের সাজাও তাই কম। সাত বছরের সশ্রম কয়েদ। এ দিকে রতুর উপর পুলিশি হামলা হতে শুরু করেছে। শিলু আর শচীন বাগচির প্রোটেকশনে ও বেঁচে যাচ্ছে। পুলিশ লাগানোর পেছনে সরকারি রাজনৈতিক দাদার হাত যে কাজ করছে এ খবর ও জেনে গেছে। পাড়ার মস্তান নামে পরিচিত হয়ে গেল। ওর ছাত্রজীবন শেষ। ভদ্রবাড়ির সহপাঠীরা, বন্ধুরা ওকে দেখে সমীহ করে। এড়িয়ে চলে। এতে ওর ভেতরটা আর পাথুরে হয়ে যায়।

এমনি করেই হয়তো দিন চলে যেত। হয়তো একসময় মস্তানির খেসারত হিসেবে বিপক্ষ গুন্ডাদের হাতে খুন অথবা শিলুর মতো ধূর্ততার জোরে বেঁচে থাকত। কিন্তু রতু সত্যি সত্যিই সেই প্রাচীনকালের দস্যু রত্নাকবের মতো সংসারের জন্য সমাজবিরোধী। শ্রমিকদের পক্ষের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ও

এটুকু বুঝেছে যে রিফিউজিদের সঙ্গে দেশনেতারা অন্যায় করেছে। ওর মামাদের বা ওর মেহনত করে বেঁচে থাকার পথ রাখেনি সমাজ। তাই ভোটের সময় সে শ্রমিকদের পক্ষের দলের পাশে রইল। ওর মামার রাজনৈতিক দাদা এবারে আর কবজির জোরে নির্বাচন করতে পারলেন না। সরকার-বিরোধী দল রাজ্যে ক্ষমতায় এল। ওদের পাড়ায় উদ্দীপনা। মামার রাজনৈতিক দাদা হেরে গেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁর দলের অনেক ছেলে আস্তে আস্তে বিরোধীদের দিকে ভিড়তে শুরু করল। তাদের মধ্যে ক্যাম্পবাগান, দত্তবাগান এলাকার অনেক মস্তান ছেলেও ছিল। নির্বাচনের ছ মাস যেতে না যেতে নিজের দলের কাছে রতুর পুরোনো গুরুত্ব কমে গেল। নেতারা ওকে আগের মতো খাতির করে না। ও এখন তাদের কাছে আর পাঁচজনের একজন।

নতুন সরকার আসার কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রমিক দলের পুরোনো আর নতুন বহু কর্মী নেতাদের অধঃপতন হয়েছে বলে বিদ্রোহ করল। দার্জিলিংঙের পাহাড়ের কোলে নতুন সূর্য উঠেছে। তার রশ্মিতে তারা সারা দেশকে আলোকিত করতে চাইল। সূর্যের ঠিকানার খোঁজে গোটা দেশের প্রান্তে প্রান্তে জীবন্ত মানুষেরা ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে, জলে-জঙ্গলে, খেতে-খামারে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের গলায় আওয়াজ—সময় এসেছে এবার তৈরি হও। সেই আওয়াজ রত্নাকরের মনের কন্দরে প্রতিধ্বনিত হল। ও বুঝল—ব্যবস্থাকে না বদলালে দস্যু থেকে বাল্মীকি হতে পারবে না।

রতুর দিন-রাত পালটে গেল। খেতে আসার ঠিক নেই। রাতে বাড়ি ফেরা অনিশ্চিত। দিনকে দিন চারদিকে ভয়ের ভাব বেড়ো চলল। নতুন সরকার, তাদের দল, পুরোনো-সরকারি দল সবাই সূর্যসন্ধানী ছেলেগুলোর মুণ্ডপাত করতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে সর্বত্র মারদাঙ্গা, বোমাবাজি, খুন-খারাপি। ওরা নাকি সব সমাজবিরোধী, খুনি। ওরা নাকি নিরীহ মানুষকে মারছে। কাগজে, রেডিওতে, বক্তৃতায় এ সব শুনতে শুনতে যাদের জন্য সূর্যের সন্ধান সেই সব সাধারণ লোক ওই ছেলেদের ভয় পেতে শুরু করল। ছেলেগুলোও কেমন অস্থির। যা করার নয় তাই করছে। কুঁড়িতে ফুল হতে না দিয়ে পাপড়ি ফোটাতে চাইছে। রতুও কেমন ছটফটে। একদিন লুকিয়ে রাতেরবেলা বাড়ি এল। মা-র হাতের রান্না খেতে খেতে বলল—'মা, দাদু আর কষ্ট পাবে না। এবার আমি সত্যি সত্যি বাল্মীকি হয়ে যাচ্ছি।'

—কিন্তু তুই বাড়িতে আসস না ক্যান? ছোড়দা খবর পাঠাইছে। শিগগির ছাড়া পাইতে পারে। তোরে সাবধানে থাকতে কইছে। সময় নাকি খুব খারাপ। হ্যাঁ রে, তোর কোনও আপদ-বিপদ হইবো না তো?

—ছোটোমামা ছাড়া পাবে? তার মেয়াদ শেষ হতে তো বাকি।

—কী জানি। সেই রকম কথাই তো জানাইছে। মুখার্জিদাও একই কথা কইছে। ঠিক কইরা ক তো মুখার্জিদা তোর উপর চটছে ক্যান? তুই অ্যাখন ঠিক কী করস?

মুখার্জিদা বিমলের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকের নাম। তিনি এসে রতুর মাকে ভয় দেখিয়ে গেছেন। ইঙ্গিতে জানিয়েছেন ছেলের জীবন যেতে পারে। মার কথা শুনে রতু চিন্তান্বিত হল। মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী খুঁজছে। হঠাৎ সে গলা নিচু করে ফিসফিসিয়ে বলল—'শোন্, মুখার্জিদা যখন গাইল পাড়ছে তখনই বুঝছি তুই কোনও ভালো কাজে লাগছস। কর, সেই কামই কর। বাড়িতে আসনের দরকার নেই। তুই সাবধানে থাকিস, বাইচা থাকিস। আমাগো য্যামন-ত্যামন কইরা চইলা যাইবো।'

রতু অন্য কিছু ভেবে থাকলেও বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। পুলিস ওদের বাড়ি সার্চ করেছে। মুখার্জিদার দৌলতে তছনছ করেনি। এ সময় ওর মা-বাবা খুব কষ্টে কাটিয়েছে। পয়সা-কড়ির অভাব। মাঝে মাঝে অপরিচিত কচিমুখের এক একটা ছেলে আসে। সামান্য কয়েকটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। রতুর মা ছেলের খবর জানতে চায়। প্রতিবারই জবাব পায়—'উনি ভালো আছেন মাসীমা। আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করেছেন।'

রতুর মা-র বুকে মোচড় দেয়। পা দুটো ছেলেদের পেছন পেছন পৌঁছতে চায় ওর কাছে। সামলে নেয় নিজেকে। চারদিকের হালচাল দেখে সে বুঝতে পেরেছে তার ছেলের জীবন আর নিরাপদ নয়। কতদিন

ছেলের মুখটা দেখেনি। সে আপন মনে ছেলের চিন্তা করে। রানি রোডের মুখে কিছু না ঘটলেও কাছাকাছি নিত্য মারদাঙ্গা। মাঝে মাঝে রাস্তাঘাটের আলো নিভে যায়। কচি কচি ছেলেদের মুখচোখের চেহারা পালটে গেছে। রায়টের সময় যেমন হিন্দু-মুসলমান জোয়ানদের চেহারা পালটে গিয়েছিল সেরকম। অথচ নেতাদের মুখে কোনও উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। মুখার্জিদা খুশি খুশি। তিনি সকলকে বলে বেড়োচ্ছেন—'দেখেছেন, আমরা ক্ষমতায় না থাকলে কী হয়।'

রতুর মার এক নতুন উপসর্গ হল। দুপুরে ভাতের থালা নিয়ে খেতে বসে হঠাৎই থেমে যায়। আর খায় না। জল ঢেলে উঠে যায়।

বিমল ছাড়া পেয়ে বাড়ি এল। এসে প্রথমেই রতুর ব্যাপারে বোনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিগ্‌গেস করল। জেল খেটে সে আর আগের মতো নেই। চেহারায়, ভাবে, ভঙ্গিতে একটা খুনে লক্ষণ। বোন-ভগ্নিপতির ওপর বিচ্ছিরি হম্বিতম্বি করল সে। অস্থিরভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। রতুর দলের ছেলেদের বিরুদ্ধে বিমল উঠে-পড়ে লাগল। ওকে মুখার্জিদা সেই শর্তেই মেয়াদ মকুব করিয়ে ছাড়িয়ে এনেছেন। সে বাড়িতে ফেরে। কিন্তু এক মিনিটও তিষ্ঠোতে পারে না। নানাভাবে ভাগনের খোঁজ করে, খবর পায় না।

রতুর মা-র ভরসা ছিল—ছোড়দা যতই হম্বিতম্বি করুক ছেলের খোঁজ সে বার করবেই। কিন্তু দিনের পর দিন যায়। ছোড়দার মুখে কালির ছোপ পড়ে। চেহারায় কেমন ক্লান্তি, বয়সের ছাপ। চোখ দুটো ধক ধক করে। রতুর মা লোকের কাছে শুনেছে তার ছোড়দা আশপাশের এলাকা থেকে রতুর দলের ছেলেদের পুলিশের ব্যাকিংয়ে পাড়াছাড়া করেছে অথবা খতম করেছে। তার যত রাগ ওদের ওপর। ওরাই তার ভাগনেকে বিগড়েছে। কিন্তু সে তো তার ছোড়দার মতো ভাবতে পারছে না! রতু যা বলেছে তাতে তো খারাপ কোনও কাজ নয়। আর কাউকে যাতে দস্যু হতে না হয় ওরা তো তার চেষ্টাই করছে।

রাজ্যে আবার নির্বাচন এল। মুখার্জিদার দল জিতল। বিমল খুব ব্যস্ত। শিলু আবার ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নতুন সরকার আসতেই পুলিশ, মিলিটারি, বিমল, শিলু সব জায়গায় রতুর দলের ছেলেদের উপর হামলা করতে লাগল। কাগজে ছবি বেরয় কচি কচি তরুণ ছেলেদের মৃতদেহের, গঙ্গায় ভেসে যাওয়া লাশের, দলবদ্ধ শবদেহের। পাড়া ঘিরে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে মিলিটারি। রতুদের পাড়া ঘেরেনি। কিন্তু ওদের দলের ছেলেরা পলাতক। আর কেউ রতুর মা-র সঙ্গে দেখা করতে আসে না। সে সকলের কথা শুনে সব বুঝতে চেষ্টা করে। রেডিও শোনে। পড়তে জানে না তবু খবরের কাগজ দেখে। ছবি দেখে যদি চেনা যায়।

রতুর কোনও খবর নেই। ওর মা মাঝে মাঝেই দুঃস্বপ্ন দেখে। ছেলের চোখে ঘুম নেই। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়োচ্ছে। তার মুখে দু-মুঠো ভাত জোটে না। মনে পড়তেই তার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখনই একটা থালায় ভাত সাজায়, ব্যঞ্জন দেয়। থালা হাতে বেরিয়ে রাস্তার মুখে দাঁড়ায়। কবে কোনও একদিন থেকে সে ওই পেয়ারা গাছের গোড়ায় বেদিতে থালা নামিয়ে রাখতে শুরু করেছে। ওটা তার ছেলের লাগানো গাছ। ওই বেদি তার মামারা বাঁধিয়ে দিয়েছিল। কবে আর একদিন থেকে ভাতের থালাটা তুলে নিয়ে বিড় বিড় করতে করতে চলে যায়। কেউ যদি কান পেতে শোনে, সে শুনতে পাবে রতুর মা বলছে—'অ রতু, রতু রে, তুই কি বাল্মীকি হইতে গিয়া উই ঢিবির নীচে চাপা পইড়া গেলি? কিন্তু আমার যে গলা দিয়া ভাত নামে না!" □

মুক্তিপণ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের শহরে, স্টেশন এলাকার আবাসন কেন্দ্রে শ্রীঅতুলচন্দ্র বিশ্বাস—জিলা গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার—দোতলার একটি ফ্ল্যাটে বাস করেন। চেহারায় ভদ্রলোককে মনে হয় কোনও সরকারি অফিসের পাতি কেরানি। ঢোলা পাতলুন, বোতামখোলা ময়লা হাওয়াই শার্ট, হাতে ছোট্ট একটি চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে রাস্তায় হাঁটেন হেলেদুলে, ঘাড়টি সামান্য নামিয়ে। ডিম্বাকার মুখমণ্ডলে নাকটি ঈষৎ চাপা, রোদ-জলে চামড়া তামাটে কর্কশ। কপালে চুল নেমে থাকে, চোখের তারা হলদেটে লাল, কোটরের চারধারে বিস্তৃত গভীর কালো পোঁচ। বেঞ্চিতে ব্যাগটি রেখে নিরীহ ভঙ্গিতে যখন চায়ের দোকানে চতুর সারল্যে খবরের কাগজ পড়েন, কেউ ঘুণাক্ষরে আন্দাজ করতে পারবে না মানুষটির কোমরে ছয়ঘড়ার একটি রিভলভার গোঁজা।

কথা বলার সময় উনি চোখজোড়া ঈষৎ বন্ধ রাখতে ভালোবাসেন। বাসায় ওঁর সুন্দরী স্ত্রী কিন্তু ভয়ানক বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে দেখা যায় বিকেলের দিকে সাদামাটা পোশাকে থলি হাতে স্টেশন রোডের দোকান-টোকানে। মুখে হাসি নেই। হালকা প্রসাধনের আড়ালে দুঃখের ছায়া। বড়ো ছেলেটি স্বভাবে উচ্ছল, মুখচোখ মায়ের মতো। নাটক লেখা, অভিনয় ইত্যাকার ব্যাপারে দারুণ ঝোঁক।

গতকাল রাত সাড়ে নটায় অতুল বিশ্বাস আপন পুত্রকে গুলি করতে গেছলেন।

সত্তরের প্রথম ভাগে ভদ্রলোকের চান খাওয়া এবং ঘুমোবার ফুরসত ছিল না। রাতের পর রাত কেটেছে মদ আর টেনশনে, টেনশন আর মদে। বাসায় ঢোকেন কিংবা বেরন কখন, পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীরাও টের পেত না। রাস্তায় নামতেন সাবধানে। চেহারার সুবিধের জন্য গোয়েন্দা অফিসারটির নাম যত ছড়ানো ছিল শহরে, চাক্ষুষ চিনে ফেলার সম্ভাবনা তুলনায় খুব কম। ফলে, ক্বচিৎ কখনও কখনও, কারও সন্ধানে, মানুষটিকে দেখা যেত চায়ের দোকানে নিরীহ খদ্দের হিসেবে।

তিন কামরার ফ্ল্যাটে, বউ ছেলেকে ঢুকতে দেন না নিজের ঘরে। কিংবা বলা যায়, ও ঘরে ঢুকতে স্ত্রীর ঘৃণা ও ধিক্কার আসে। ঝিয়ের মারফত খাবার চলে যায় টেবিলে, থাকে ঢাকা অবস্থায়। ঘরে আছে একটি খাট, টেবিল এবং দেয়ালে টাঙানো মা কালীর মস্ত প্রতিকৃতি। উনি দরজা ভেজিয়ে ধূপকাঠি জ্বালান, বাসী মালা সরিয়ে টাটকা মালা পরান, আবেগে 'মা' 'মা' মন্ত্রধ্বনির পর নিঃশব্দে চলে মদ্যপানের আয়োজন।

সত্তরের প্রথম দিকে, স্ত্রী লক্ষ করত, ফ্ল্যাটে সাধারণত দু ধরনের মানুষের ভিড়। প্রথম দলে থাকত ওঁর ধর্মীয় সম্পর্কের আপনজনরা, দ্বিতীয় ধরনে প্রিয়জনের জীবনভিক্ষার্থী, আতঙ্কিত কিছু মানুষজন। ধর্মীয় সম্পর্কের মানুষরা সটান ঢুকে যেত ওঁর ঘরে কোনও অনুমতি ছাড়াই, আর দ্বিতীয় দল করুণমুখে অপেক্ষা করত বাথরুমের পাশে ফালি জায়গাটুকুতে। প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষ থাকলে, অতুল বিশ্বাস আধো চোখ বোজা অবস্থায় নিষ্ঠুর সারল্যে খিস্তি করতেন; মহিলা হলে হেসে বলতেন—ছেলে ঠিক ফিরে যাবে ঘরে! আমি কী করতে পারি, মা! সব ওঁর ইচ্ছে!

ফুঁপিয়ে কিংবা নিঃশব্দে চোখের জল গড়ালে, উনি ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে বলতেন—কী মুশকিল! কেঁদে কী হবে? টাকা আছে?

সোনার বালা, চুড়ি, উপাচারের পুঁটুলি-সহ কাঁপা হাতজোড়ায় মিনতি থাকত—আপনি বাপ! যেমন করেই হোক প্রাণটুকু ভিক্ষে চাই ছেলের!

—তোমরা ভুল করো মা! আমরা কেউ নই; স্রেফ আইনরক্ষক। ছেলে তোমার সোনার টুকরো কী করে জানো?

—না।

অতুল বিশ্বাসের স্ত্রী দেখেছে, গয়নাগাটি টাকাপয়সার বদলে কত মা, স্ত্রী ছেলে কিংবা স্বামীর জন্য ব্যর্থ চোখের জল ফেলে গেছে।

ধর্মসম্পর্কের মহিলারা সরাসরি ওর ঘরে ঢুকলেই, স্ত্রী সজাগ কানে শুনতে পেত, স্বামী বলছে—এসো পারুল। এ সাত দিন কোথায় ছিলে? গীতার খবর কী?

—তারাপীঠ ঘুরে এলাম, দাদা!

—মহাশ্মশানে?

—হ্যাঁ, অমাবস্যা ছিল। অনেকদিন যাইনি।

হঠাৎ 'মা' 'মা' ঘরকাঁপানো আওয়াজ।

—যোগিনী রূপ কি সব অমাবস্যায় দেখা মেলে?

—মায়ের কৃপা থাকলে হয় দাদা।

বিচিত্র চেহারা ও পোশাকের কত যে মহিলা আসত ঠিক নেই। দু-তিনদিন থাকত কেউ কেউ। মাঝে মাঝে আবার ও ঘরে নানান রাজনৈতিক মানুষের মিলন ঘটত। স্ত্রী কিংবা পুত্রের তখন ধারকাছে থাকাও নিষেধ। বার বার বিশ্বাসমশাই দরজা খুলে চারধার উঁকি দিয়ে দেখতেন। খুব সন্দিগ্ধচিত্তের মানুষ তো, এমনকি নিজের ছায়াতেও আস্থাহীন।

অতুল বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতেও ওই সব ধর্মীয় সম্পর্কের মহিলারা আসত অবাধে; ঘরের বিছানা সাজিয়ে, মায়ের প্রতিকৃতিতে ধূপ, মালা সাজিয়ে বসে থাকত সম্মোহনী দৃষ্টিতে। বিশ্বাসমশাই হয়তো ফিরে এলেন গভীর রাতে।

—আজ এত দেরি হল, দাদা?

—গীতা নাকি? কখন এসেছিস?

—কখন থেকে আপনার আশায় পথ চেয়ে আছি! গীতার স্বরে অভিমান।

—কী করব বল! আজ চারটে শিকার ছিল। শুয়োরের বাচ্চাদের তুলে নিয়ে ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে। ভয়ে গাড়ি ছেড়ে নামতে চায় না। সেয়ানা! তবু পালিয়েছে একটা!

কোমর থেকে রিভলভারটা খুলে ড্রয়ারে রেখে, অতুল বিশ্বাস গীতার মুখে মোহিনী দৃষ্টিতে সামান্য হাসেন।

—ভয় পাচ্ছিস আমায়?

—কেন? গুরুর কাছে ভয় কিসের?

—ভরসাও বা কোথায়! শ্মশান বিচরণ করে এলাম, মাথার কি ঠিক আছে! ভালো করে কারণবারি সাজা।

বিশ্বাস আস্তে গীতার সুউচ্চ বুকদুটো খাবলে 'একটু শান্তি চাই রে—কিছু ভালো লাগে না' বলতে, গীতা ওর ঘর্মাক্ত পোশাকটা ছাড়িয়ে দেয়।

—গুরু বলে যখন মানিস, নৈবেদ্য দিতে হয় যে?

—সব কিছুই তোমার নৈবেদ্য। গীতা বিশ্বাসের গালে টোকা মারে।

—হ্যাঁ, কিছু না আদায় করে কাউকে মুক্তি দিই না আমি। দেখিস না, কত মানুষ চোখের জল ফেলতে আসে! টাকা, গয়না, দেহ ভেট দিয়ে যায়! অতুল বিশ্বাসের লাল চোখজোড়া হাসে।

—একটু চুপ করবে এখন? বিশ্রাম নাও।

—বিশ্রাম? ওই বেটির পায়ের তলে যে দিন যাব। ....তার আগে নয়। মাকালীর দিকে অতুল বিশ্বাস কিছুক্ষণের জন্য তন্ময়।

পাশের ঘরে বিছানায় স্ত্রী। নিদ্রাহীন। সারারাত দুর্ভাগ্য ও আত্মগ্লানিতে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। শেষে একদিন, বাসার মধ্যে এ সব অনাচারে মুখ ফুটে আপত্তি তুলতেই, অতুল বিশ্বাস লাথি কষিয়ে বলেন—ফ্ল্যাট আমার। ভালো না লাগলে চলে যেতে পারিস।

—অসভ্য! লম্পট! মুখোশ খুলে দেব তোমার!

—কিছু লাভ নেই। আমি কে জানিস? দরকার হলে গুলি করব তোকে।

সেই থেকে স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপ বন্ধ। সহবাসের নিয়ম কবেই তুলে দিয়েছে অতুল বিশ্বাস নিজে। দোষটা নাকি স্ত্রীর। মদের গন্ধ একেবারে অসহ্য বলে, কেউ বিছানায় ও অবস্থায় তাকে জড়িয়ে আদর করবে, বরদাস্ত করতে পারে না।

কয়েক বছর আগে, অতুল বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত হয়ে, সে রাতেই হেসে স্ত্রীকে বলেছিলেন—ঠিক আছে, যে দিন মদ ছাড়তে পারব, ডেকো আমায়। সে সুযোগ হয়নি আর।

অতুল বিশ্বাসের ছেলের নাম প্রবাল। স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসমশাইয়ের এইসব মানসিক দ্বন্দ্বের পর্বে, প্রবল নাবালক, বুঝবার বয়সে পৌঁছয়নি। তবু, বালক হৃদয়ের গভীরে বাবা-মায়ের সম্পর্ক ছাপ ফেলেছিল পাকাপাকি। ফলে বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে পিতার প্রতি ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ নির্দিষ্ট রূপ নিচ্ছিল। বিশ্বাস বোঝেননি তা; অপত্যস্নেহ—গার্হস্থ্য সম্পর্কে অবনতি ঘটলেও—মাঝে মাঝে দুর্বল করে ফেলত তখনও। যত রাতই হোক, একবার প্রবালের বিছানায় উঁকি দিয়ে গেছেন, ডিউটি থেকে ফিরে। একরাশ নরম কালো চুল নিয়ে ছেলে ঘুমোচ্ছে অকাতরে; নিষ্পাপ, নিরীহ ভঙ্গিতে। ছেলের স্কুলেও মাঝে মাঝে গেছেন, খোঁজ নিয়েছেন পড়াশুনোর, ভালো ফলের জন্য প্রাইভেট টিউটর ঠিক করতে কত দিন বসেছেন হেডস্যারের মুখোমুখি।

কিন্তু সত্তরের সেই শ্মশানচারিতার দিনে, গভীর রাতে দু-চারটিকে ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দিয়ে, ভোঁতা আচ্ছন্ন মেজাজে বাসায় ঢুকেও প্রবালের বিছানায় স্নেহ-দৃষ্টি দিতে ছাড়তেন না। কে ও? কালো নরম চুলের বদলে দাড়িমণ্ডিত শক্ত চোয়ালে কে বিছানায় শুয়ে আছে? শুয়ে থাকা তো নয়, যেন সেলটার নিয়েছে। প্রবাল ঘুমন্ত পাশ ফিরতে, চমক ভাঙত। বুকে বাজত, সন্দেহ উঁকি দিত, নিজের ছেলে গোপনে আগুন নিয়ে খেলছে না তো!

সেই দশক চলে যেতে, মুক্তি দেওয়ার চাপ যখন অতুল বিশ্বাসের হালকা হয়ে এসেছে, ধর্মের প্রীতি প্রবল হয়ে ওঠে। দিনরাত মদে চুর, কালীর আরাধনার উপসঙ্গ বাড়ে দিন দিন এবং জুটতে শুরু করে বিভিন্ন জেলা থেকে নানান ভক্তবোনেরা। রাতের পর রাত ওই ঘরটিতে ভিড় লেগে থাকে।

প্রবালের এখন প্রতিবাদের বয়স, করেও। সরাসরি নয় যদিও, এ ঘরে মায়ের কাছে তড়পায়।

—এ সব চলছে কী ঘরের মধ্যে?

—জানি না।

—কিচ্ছু বলবে না তুমি?

—বললাম তো জানি না।

—জানবে না কেন?

—আমি এ সংসারের ঝি। অধিকার কোথায়?

—পড়ে আছ কেন এখানে? আমার সঙ্গে চলো।

—তা হয় না, প্রবাল।

—কেন?

—এখন এ সব দেখেই আমার সুখ।

মায়ের হেঁয়ালিপনা প্রবালের কাছে অসহ্য। বাসায় বেশিক্ষণ থাকে না; পাড়া, ক্লাব, থিয়েটার এবং বাকি সময় ব্যস্ত চাকরি নিয়ে। মাঝে মাঝে যখন বাপের দৃষ্টিকটু সম্পর্ক অশালীন হয়ে ওঠে, ছেলে চেঁচায় মায়ের কাছে। পিতৃপরিচয় এখন তার কাছে অসহনীয় বোঝা, কিছুটা কলঙ্কও বা। বাপকে ঘেন্না করে, মাঝে মাঝে অবাধ্য জিঘাংসা কুরে কুরে খায় প্রবালকে।

চাকরি থেকে অবসরের বয়সও অতুল বিশ্বাসের কাছে এসেছে। নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত তিনি। এখন আর রাতবিরেতে রিভলভার নিয়ে ঘোরেন না। কেবল ভক্তবোনদের নিয়ে বিভিন্ন পীঠস্থান আর ফ্ল্যাটে নিজের ঘরটিতে দরজা ভেজিয়ে গেলাস-বোতলে কারণবারি পান করেন মায়ের নামে।

সে দিন প্রবাল বাসায় ছিল। ও ঘরে ভক্তবোনের টুকটাক কথার টুকরো, হাসি। হঠাৎ অসহ্য ঠেকতে, দরজা ঠেলে দাঁড়াল ঘরের সামনে। দেখতে পায়, বিছানায় বাবা অতুল বিশ্বাস কালো গাট্টাগোট্টা এক বিধবা মহিলাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়ে, সবে বেদিতে যোগাসনে গুরুভক্তির নৈবেদ্য নিতে প্রস্তুত।

চরমমুহূর্তের অভাবিত বাধায়, মহিলা চিৎকারে একলাফে খাটের নীচে। আর স্খলিত লুঙ্গির প্যাঁচ কষতে কষতে অতুল বিশ্বাসের ঘোর লাল চোখজোড়া স্থির, কঠিন।

—তুমি?

—এ সব কী?

—বেরোও শুয়োরের বাচ্চা!

—বাবা!

প্রবালের মা ভয়ে ছুটে এসে, দু হাতে জড়িয়ে ছেলেকে টেনে আনতে, ছিন্ন-পাশের চেষ্টায় প্রবাল উত্তেজিত চেঁচায়—বন্ধ করবে কি না? এ সব চলবে না এখানে।

অতুল বিশ্বাস এ সব প্রশ্নের জবাব দিলেন না। স্যাট্ করে ড্রয়ার টেনে লোডেড রিভলভারটি বার করে, পুরনো দিনের গভীর রাতের গলায় বললেন—পালা! চলে যা!

মমতাঘন, উদার এই শব্দগুলোর ঐতিহাসিক ক্রূরতা প্রবাল জানে বলেই, চকিত ভয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। অতুল বিশ্বাস ছাড়েন না। প্রস্তুত মানসিকতায় আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট বিপদ টের পেয়ে অসহায় কাঁপা স্বরে ছেলে বলল—বাবা! বাবা আমি!

নির্লিপ্ত শীতল গলায় উত্তর আসে—ক্লোজরেঞ্জে অমন বাপ ডাক বহু শুনেছি।

মা একদৌড়ে বাইরের দরজাটা খুলে দিতেই, প্রবাল ছুট দেয়। চতুর ক্ষিপ্রতায় কাছে চলে আসেন অতুল বিশ্বাস। অনুপায় প্রবাল, সিঁড়ি বেয়ে পালাবার সুযোগ হারিয়ে, একতল্লার কার্নিশে লাফ মেরে আত্মরক্ষা করে কোনও ক্রমে।

—কোথায় পালাবে? এ বাসায় ঢুকতেই হবে। বসে রইলাম আমি।

সত্যিই সারারাত চেয়ার টেনে অস্ত্রটা হাতে বসে রইলেন অতুল বিশ্বাস, ছেলের অপেক্ষায়। আশপাশের মানুষ জানতে পারল না ব্যাপারটা। স্ত্রী ভয়ে পাথর।

ভোর হলে, স্বামী যখন নড়ল না, স্ত্রী বাথরুমের পাশের ফালিতে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে প্রাণভিক্ষা চাইল ছেলের। হঠাৎ অতুল বিশ্বাসের মনে আসে পুরনো দিনের কথা। কিন্তু গয়না, টাকা কিংবা দেহ—কী আদায় করবেন স্ত্রীর কাছ থেকে? ঝানু আইনরক্ষক হিসেবে ওগুলোর আর প্রয়োজন নেই তার।

হঠাৎ বললেন—বেশ, কান্না থামা। কী দিবি? নির্বাক স্ত্রীকে হেসে বললেন—কথা দে, আমার ঘরে দিনরাত যা খুশি চলবে, হাসিমুখে মেনে নিবি? তুই, তোর ছেলে সামান্য ডিসটার্ব করবি না?

নিশ্চল স্ত্রীর হুহু কান্নায় নীরব সম্মতি ছিল।

অস্ত্রটি নামিয়ে অতুল বিশ্বাস বললেন—যা, ছেলেকে ফিরতে বল।

আপন স্ত্রী হলেও কিছুর বিনিময় ছাড়া তিনি ছেলের মুক্তিপণ ভিক্ষা দিলেন না। □

ছোটো বকুলপুরের পরের কথা

সিদ্ধার্থ সাহা

প্রস্তাবনা

ছোটো বকুলপুরের যাত্রী দিবাকর দাস সঙ্গিনী আন্নাকে নিয়ে রওনা দিয়েছিল ছোটো বকুলপুরের সংগ্রামী কমরেডদের উদ্দেশে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয় না, কেননা সম্পত্তি ব্যবস্থার ধারকবাহক এবং রক্ষকদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এবং খুবই সম্ভব যে, সে ও আন্না বদ্‌মায়েশদের হাতে উপহসিত ও যারপরনাই লাঞ্ছিত হয়েছিল। তারপর.........গোটা দুই দশক কেটে গেছে। এতদিনে বহু ঘটনার আবর্তন হয়েছে। এবারে পরিবর্তিত অবস্থায় দুজন যাত্রী রিদেপুর পৌঁছুবে বলে পথের দেবতার হাতছানিতে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো মেখেছে। বর্তমান সময়ে অবশ্য এই দুজন যাত্রী অনেক বেশি সমৃদ্ধ আগের তুলনায়; কালসচেতন তাদের সঙ্গে আছে বহুদিনেব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

রিদেপুর যাত্রিদ্বয়ের ঘটনাটি নিম্নরূপ :—

ঘটনা

বহরমপুর স্টেশনে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসার মুখে ট্রেনগাড়িটা অনেক লোকের সঙ্গে গোপাল আর হেমন্তকে নামিয়ে দিয়ে গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বহরমপুর শহরের পিচ-রাস্তায় পা রাখে গোপাল আর হেমন্ত। রাস্তার দু ধারে দোকানের সারি।

হেমন্ত নিজে বিড়ি ধরায়। গোপালকে একটা বাড়িয়ে দেয়। গোপাল হেমন্তর বিড়ির আগুনে নিজেরটা ধরায় এবং প্রথম একটি সুখটান দিয়ে বলে ঃ এখেনে কোথায় য্যানো যেতি হবে আমাদের?

হেমন্ত বিড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলে : বরমপুর কোর্টের কাছি। যতীন উকিলের সঙ্গি দ্যাখা করতি হবে।

—তারপর?

—হেই সে দিক পানে যেতি হবে।

—সে দিক পানে?

—আহো। তুই বড়ো হাঁদাপনা। সাগরদিঘি ছাইড়ো কী যেন গেরামটা...রিদেপুর।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রিদেপুর।

আবার গোপাল আর হেমন্ত শহর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে। এবার তারা আর কথা বলে না। তাদের কথা ফুরিয়ে গেছে। তারা কেবল বিড়ি টানে। যতীন উকিলের হদিস করতে করতে সন্ধ্যা উতরে গেল। বৈঠকখানায় সবেমাত্র কী সব লিখবে বলে বাঁধা-খাতা খুলে বসেছে যতীন মুখার্জি ওরফে যতীন উকিল, আর ঠিক সেই সময়েই যতীন মুখার্জির ছোটো ছেলে গিয়ে বাবাকে নিবেদন করল : বাবা, দুজন লোক তোমাকে খুঁজছেন।

—আঃ। জ্বালাতন। স্বভাবতই বিরক্ত হলেন যতীন উকিল। একটা কাজ সারবেন ভাবছিলেন, আর কিনা.....বললেন : কারা রে, চিনিস?

—না বাবা। খুবই অচেনা। কক্ষনো দেখিনি। তোমার কাছে কত লোক আসেন, এদের কখনও দেখিনি। দেখে তো মনে হয় চাষাভুষো লোক। হয়তো কোনও ফ্যাসাদে পড়েছে—

—হবে। নিয়ে আয় সঙ্গে করে। যতীনবাবু খাতাটা টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন।

যতীনের ছেলে গোপাল আর হেমন্তকে বাবার কাছে নিয়ে এল। যতীন বললেন : আপনারা?

—আমরা।

হেমন্ত পকেট হাতড়ে একটা ছোটো কাগজ বার করে। উকিলবাবুর হাতে সেটা তুলে দেয়। কাগজটা দুভাঁজ করে মোড়া। অতি সন্তর্পণে যতীন চিঠির ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরেন। চশমাটা হাত দিয়ে নাকের উপর ঠিকভাবে বসিয়ে দিতে দিতে তিনি চিঠিটা পড়েন। চিঠির বিষয় জেনে তাঁর যে খুব একটা মুখের ভাব বদলাল তা মনে হয় না। তিনি কেবল মুখে একটি হুঁম্ শব্দ করলেন। তারপর ছেলেকে নির্দেশ দিলেন : জোছন, এরা দুজনে অনেক দূর থেকে আসছেন। আজ আমাদের এখানে থাকবেন। আজকের রাতটার মতন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাকে গিয়ে বলো।

—আচ্ছা। জোছন চলে যায়।

যতীন উকিল বলেন : বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

ঘরে বেশ কয়েকটি চেয়ার এ দিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেখে বেশ বোঝা যায় নিত্যই এ ঘরে অনেক লোকের সমাগম ঘটে থাকে। তবে, উকিলদের যেমন স্টাডিরুম থাকে এ ঘরটা সে রকম নয় কোনও মতেই। কেননা ঘরে কোনও আলমারি নেই এবং বইয়ের কোনও অস্তিত্বও নেই। এমনকি দৈনিক কাগজটিও ঘরের একমাত্র কাঠের টেবিলের উপরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গোপাল, হেমন্ত সামনের দুখানি চেয়ার টেনে যতীনবাবুর মুখোমুখি বসল। যতীনবাবু এবার কেন জানি ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন : সব জেনেশুনেই আসছেন তো আপনারা?

গোপাল, হেমন্ত হাসে। যতীনবাবু তা লক্ষ করেন। বলেন : ভালো। জানলা দিয়ে দূরের কোনও কিছু বুঝি নিরীক্ষণ করেন। তারপর যেন একটু আড়মোড়া ভেঙে বলেন : এবার কিন্তু আপনাদের হাঁটা পথে যেতে হবে। আর কোনও বাহন জুটবে না। তারপর তিনি গোপাল-হেমন্তকে কনে দেখার মতন করে যেন হাতড়ে হাতড়ে দেখেন। ঘরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। দেখতে কোনও অসুবিধা হয় না। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেন বলেন : বোঁচকা-বুঁচকি সঙ্গে আছে দেখছি। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। ভালো। গোপাল, হেমন্ত দুজনেরই কোলে একটি করে বোঁচকা। যতীনবাবুর কথায় তারা নিজেদের পা গুলো মাথা নিচু করে দেখে এবং হাসে।

গোপাল বলে : আপনার কোনও ভয় নাই তো?

—আমার? তা কি বলা যায়! কোথা দিয়ে, কোন্ ফাঁক-ফুকুর দিয়ে যে কী ঘটে যাবে তা কে জানে। ও নিয়ে ভাবার কথা তো আমাদের নয়। আমাদের দরকার কাজ করে যাওয়া।

—তা ঠিক। হেমন্ত সায় দিয়ে বিড়ি বার করে। জোছন আসে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে এটা জানিয়ে সে চলে যায়।

যতীন বলেন : চলুন, ভেতরের ঘরে যাই। হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে।

গোপাল-হেমন্তকে নিয়ে যতীনবাবু ভেতরে চলে যান।

পরদিন দুপুর। মাঠ ভেঙে চলেছে দুজন। ধুধু মাঠ, মাথার উপর প্রখর রোদ। আগুন ঢালছে। পায়ে চলা বালির পথ গরম হয়ে গেছে। হাঁটা অসাধ্য। দুজনের পা পুড়ে যাচ্ছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে ফাটে। গোপাল-হেমন্ত উভয়েরই মনে হয় তারা যেন সাহারা মরুভূমিতে দুই দুঃসাহসী অভিযাত্রী। গোপাল বলে : ভারী গরম।

হেমন্ত বলে : কিন্তুক, সন্ধের মধ্যেই গেরামে ঢুকতি হবে। নইলে শুনলি নে শালোরা কী যেন গইড়েছে......

—কী আবার গইড়বে শালোরা? ডিফ্‌ফেন্স পাট্টি, বুঝিস না?

গোপাল, হেমন্ত হাঁটে। কথা বললে দম ফুরিয়ে যাবে, গতি হারিয়ে যাবে। তাই ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ করে যতটা জোরে সম্ভব হাঁটতে থাকে। কেননা সময়ও তো বাঁধা। সন্ধ্যা নামার আগেই যদি ওরা রিদেপুর পৌঁছে যেতে পারে তা হলে সব রকমের ঝক্কিঝামেলার হাত থেকে বেঁচে যাবে। নইলে বড়ো রকমের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তাদের। টর্চের আলো, দশ-বিশটা চোখের ছোবল, শত কথার

হুল—এ সব সহ্য করতে হবে। এইজন্যে বাক্যব্যয় ও কালক্ষেপ না করে গোপাল-হেমন্ত বুক ভরে দম নিয়ে হাঁটতে থাকে। তবে হাঁটা বলা ঠিক হবে না। ওরা তো হাঁটছে না। মূলত ওরা ছুটছে।

চৈত্রদিনের নিদারুণ দুপুরটা মানুষের পক্ষে যতটা পরিমাণে উপেক্ষা করা সম্ভব তার সবটা প্রদর্শন করেও গোপাল-হেমন্ত শেষরক্ষা করতে পারল না। রিদেপুর তখনও দু-তিন ক্রোশ দূরে। একটা ক্যানেলের কাঠের পুলের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা দুজনে দিনমণিকে অস্ত যেতে দেখল। অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করল যখন ওরা প্রায় গ্রামে ঢোকে ঢোকে। আর তখনই ওদের কানে এল মিষ্টি শাঁখের আওয়াজ।

হেমন্ত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এখন প্রদীপ জ্বইল্ল।

গোপাল বেকুব বেকুব ভাব করে বলে : শালোরা এবারে ধইরব্যে।

—ঠিক।

গোপাল, হেমন্ত রিদেপুর ঢোকার সরু গলিটায় পা রাখে বিনা বাধায়। ওরা এগুতে থাকে। বুকের ভেতরে অবশ্য একটা কাঁপুনি ধরে গেছে ইতিমধ্যেই। ওরা নিজেরাই কান পেতে স্পষ্ট শুনতে পায় বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘাই পড়ছে অবিরতভাবে। তবু, ওরা নিরীহ মুখে হাঁটতে থাকে। উভয়ের শরীরে ক্লান্তি আব দারিদ্র্যের অবশ্য স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

বেশিদূর অবশ্য এগোতে হয়নি। অন্ধকার এখনও ওদের দুজনের শরীরকে আলাদা করেনি, এমনই পাতলা অন্ধকার যে ওরা দুজন পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সেই সময়ই একটি পুকুড়পাড়ে ঝাকড়া মাথাওযালা এক গাছের নীচে থেকে মানুষের গলা ভেসে আসে ওদের কানে। —মদন হে, দুটি বেজন্মার বাচ্ছা আসতেছে মনে হয়। ততক্ষণে রাস্তার মধ্যিখানে এসে দাঁড়ায় দশ-বারোজন পুরুষ মানুষ। ঠাহর করা যায় হাতে ওদের অস্ত্র আছে। লাঠিসোটা তো বটেই।

—থামো হে। তোমরা দুজন কারা? বাজখাঁই গলার ধাক্কায় চলমান গোপাল-হেমন্তকে থামতে হয়। বুকের মধ্যিখান থেকে বোঁচকা তুলে এনে ওরা মাথায় রাখে। অন্ধকারেই পরস্পরের চোখাচোখি করে। মুকাবিলা কইরত্যে হবে বে। মুকাবিলা। একজন এগিয়ে এসে মোটা গলায় বলে : সম্বন্ধীরা কারা? আসতিছ কোথা থেকে? যেতিছ কোথা?

গোপাল বলে : একসঙ্গি এতগুলি কথার জবাব দিতি হবে?

—হ্যাঁ দিতি হবে। হাজারটা কথার জবাব দিতি হবে।

—তা'লে কই। হেমন্ত এক-পা এগোয়। মোরা আসতিছি করতা, সেই শহব থিকি।

—শ-হ-র! কোন্ শহর বে শালো?

—এই—এই, গালমন্দ লয়। ভদ্রভাবে সারচ্ কইরবে করো, অভব্যতা লয়।

– না! গালমন্দ কইরব্যে না। আমার বোনাইরে।

—তা ঠিক আছে হে। কোন্ শহর তো কইলে না?

- -সে গিয়ে কেশ্‌নগর থ্যে।

—ক্যানো ক্যানো? কেশ্‌নগর থ্যে আমাদের এই পোড়া গাঁয়ে ক্যানো হে?

—কাজের জন্যি।

—কাজের জন্যি? আমাদের রিদেপুর কাম মেলে? এ তো শুনি নাই গো হরেকেষ্টদা।

—নন্দ। অ্যাদ্দিন শোনো নাই। এইবারে শুইনবে। কালে কালে কত শুইনবে। একদিন শুইনবে—

—আঃ থামো তো, হরেকেষ্ট। তা কুটুমদের তো দেখতি খারাপ লয়। ভদ্দরলোকের পোলারা গ-রি-ব সাইজছে? অ্যাঁ?

—কার কাছে যাও গো?

—নিবারণ মিস্তিরি।

—নি-বা-র-ণ মি-স্তি-রি।

—হ্যাঁ গো। নিবারণ মিস্তিরি। কেশ্‌নগরে তার সঙ্গি কাজ কইরেছি যে। তেনায় কইলেন রিদেপুর যাস্। কাম মিইলবে।

—সতে? মোটা গলার হাঁক।

হাঁককে অনুসরণ করে ভিড়ের মধ্যে থেকে কিশোর বয়সী একটি পাকা বেতের শরীর বেরিয়ে আসে।

—কী বলো হরেকেষ্ট খুড়ো?

—বলি, তোর নিবারণ মিস্তিরি গাঁয়ে আছে?

—হ্যাঁ গো খুড়ো, বুড়া মিস্তিরিটা তো আজই আমাদের বাড়ির কাজে লাইগ ছিল। সন্ধ্যা অবধি তারে আমি—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে সতে। তা নিবারণ মিস্তিরি কী কামের কথা তোমাগের দুটাকে বইল্যাছে?

—মিস্তিরি কইছিল, হেমন্ত বলে, রিদেপুরে কামের অভাব নাই। অনেকগুলি কোঠাবাড়ি উইঠব। কিছু মেরামতের কামও আছে। বুড়া মিস্তিরি আসল কাইজ কইরবে, আমরা তারি মদত—

—হইছে, হইছে। কোঠাবাড়ির কথাটা মিথ্যা লয়। কইছে ঠিকই। সতে?

—বলেন।

—এই দুইটারে তো সেই লোক মনে হয় না। বড়োবাবু যাদের কথা দিনরাত্র পাড়েন। বীরভূম বাঁকুড়ার নতুন মাইনসের কোনও গন্ধ তো এদের শরীলে পাই না রে। বড়ো ধোঁকা লাইগত্যেছে।

—ধোঁকার কী আছে নন্দ? এরা গরিব, খাইট্যা খায়, এদের আটকায়ে লাভ?

লোকগুলি দ্বিধায় পড়ে। কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে সময় লাগছে তাদের। মানুষ দুটি অচেনা বটে, কিন্তু যেভাবে জেরা করা হয়েছে তার সদুত্তর দিয়েছে তো বটে। তবে? কিন্তু সেই লোকগুলা যারা নতুন মানুষ নাম পেয়েছে, যারা এই জেলায় নাকি শয়ে শয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাজের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে, তারাও তো অচেনা, যদিও তাদের দুটি পা, দুটি হাত, দুটি কান, একটি নাসিকা এবং এই অঞ্চলের মানুষের মতোই তারাও অসহনীয়ভাবে উৎপীড়িত, দারিদ্র্যভারে তাদের শরীরও গেছে নুয়ে, মন হয়ে গেয়েছে শুষ্কং। রিদেপুর ডিফেন্স পার্টির লোকেরা হিসাব মেলাতে পারে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় এবং কেবল নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। এই অবস্থাটা উপস্থিত সকলেরই অসহ্য লাগে। হেমন্ত বলে : তা'লে আমরা যাই?

—যাই? বিরোধীরা যেন সচকিত হয়। একজন ঝাঁপিয়ে উঠে বলে : হ্যাঁ রে শালো, যাই। ক্যানো অন্য কুথাও কাম নাই। মরতি আলি তো আলি, এই গাঁয়ে আলি? দেশ কি উজাড় হয়্যা গেছে?

গোপাল যেন বুকের ভেতরটায় ভরসা পায়। সাহস সঞ্চয় করে বলে : উজাড় হয় নাই গো বোনাই। জ্বইল্যা খাঁক হয়্যা গ্যাছে?

—হ। তাই হইছে বটে। ভিড়ের মধ্য থেকে মিহি গলায় কে যেন সায় দেয়।

সেই মোটা গলার হাঁক। —সতে, এই দুইট্যা বলদরে নিবারণ মিস্তিরির লাঙ্গলে জুইত্যে দ্যে আয়। —যাও গো কুটুমেরা, আমাদের সতের সাথে যাও নিবারণ মিস্তিরির ঠাঁয়।

রাত এখন বেড়ে গেছে। অন্ধকার বাঁশ, কাঁঠাল, আম, জাম, শিরীষ গাছে ঘন হয়েছে। আকাশে তারাও অসংখ্য। সামনের পুকুরের গাবগাছটায় জোনাকি পোকার হাজার পিদিম। ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতান ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। চলতে চলতে হেমন্ত বলে : গোপাল রে, গাছটা কেমন সাইজছে দ্যাখ।

—সাইজছে না রে। গোপাল হাসে আর বলে : সাজাইছেক।

—ওই হইল।

চাঁদ এখন অনেকখানি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মাঠ কেবল শস্যহীন, কিন্তু আলোয় যেন স্নান করছে। সাদা ফুটফুটে, দুধ-স্নান। গোপাল পরম নিশ্চিন্তে বিড়ি বার করে দেশলাই কাঠিতে ফস্ করে ধরায়। আর দুটি বিড়ি হেমন্ত ও সতের দিকের আগিয়ে দেয়। পরম আত্মীয়তায় সতে বিড়ি ধরিয়ে বলে : সুকান্ত দারুণ লিখ্যাছে, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ ঝলসানো রুটি।

মাঠের উপর দিয়ে ছুটে এসে এক দমকা বাতাস তিনজনের গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল : চৈত্র মাসের রাতে অ্যাতো শীত করত্যাছে কেন, অ্যাঁ?

পরিশিষ্ট

আমাদের গল্প এখানেই শেষ করা যেতে পারত। কিন্তু জ্যামিতিক কারণে সেটা করা ঠিক হবে না বলে মনে হচ্ছে। এতক্ষণ আমরা বস্তুর একপিঠ দর্শন করেছি; বস্তুর তো আর একপিঠও আছে। সেটা অবলোকন করা বা সেই ব্যাপারে অন্তত চেষ্টা করার তো কোনও কসুর থাকতে পারে না। অতএব আসুন, আমরা ও পিঠটায় চর্মচক্ষু নিক্ষেপ করি।

ডি এম অফিসে আজকাল একটা অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছে। দিনের অধিকাংশ সময়টাই ডি এমের ঘরে এস পি, এস ডি ও, বিভিন্ন অফিসারের আগমন ও নির্গমন। সর্বক্ষণই যেন কী একটা শলাপরামর্শ চলেছে তাদের মধ্যে। একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায় লক্ষ করলেই। উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের বাইরেটা দেখলে খুবই শক্ত মনে হয় কিন্তু একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে কিসে যেন এদের ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। এই যে ব্যস্ততা, দ্রুত চলাফেরা, সন্ত্রস্ত আচার-আচরণ, এ থেকেই প্রমাণিত হয় ওরা কোনও চাবুকের মার খাচ্ছে। ওদের চোখেমুখে উদ্বেগেব ছাপ খুবই স্পষ্ট।

দুপুরের দিকে ডি এম অফিসের দুই ধোপদুরস্ত কেরানিবাবু প্রত্যহেব টিফিন-কার্য সেরে চেনা পানের দোকানে যায় পান খেতে। দোক্তা পান মুখে ফেলে একজন অপরজনকে বলে : জানো রমেশ, সাহেবদের অবস্থা বড়ো কাহিল। সঙ্গিনও বলতে পাবো।

রমেশ নামের কেরানিবাবুটি প্রথম পিক ফেলে বলে : কেন হে দেবেন?

দেবেন বলে : রিদেপুর টিট করেছে।

—রিদেপুর? কেন রিঁদেপুর টিট করেছে কেন?

শেষ নির্যাসটুকু ভেতরপানে চালান করে দিয়ে দেবেন বলে : শোনো তা হলে! যেমনটা শুনেছি তেমনটাই বলছি তোমায়। সে দিন ডি এমের ঘবে দরকাবি একটা ফাইল নিয়ে ঢুকতে গিয়ে শুনি এস পি ডি এমকে বলছেন : মিস্টার ব্যানার্জি আর শেষবক্ষা হল না।

রীতিমতোন হতাশা আমাদের এস পি সাহেবের কণ্ঠস্ববে।

—কেন? এ কথা বলছেন কেন মিস্টার দত্ত? ডি এম জানতে চান।

—রিদেপুব আমাদের তাক করেছে। মিস্টার ব্যানার্জি, আমরা বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। যে কোনও সময়ে।

ডি এম বলে ওঠেন : কেন, আমরা যে এত ব্যবস্থা করলাম, ডিফেন্স পার্টি যে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে দিলাম। আমাদের সকলেই তো সজাগ আছে। তা হলে এমন হবে কেন, মিস্টার দত্ত?

কিছুক্ষণ মিস্টার দত্তের মুখে কোনও কথা নেই। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদের কথা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছিল। শোনার খুবই লোভ হচ্ছিল। অবশেষে মিস্টার দত্তের গলা আবার পেলাম। এস পি বলছেন : হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি, ভাবনা তো ওইখানেই। কী করে সম্ভব হল ওদের পক্ষে? আমরা তো কোনও ত্রুটি রাখিনি। যতখানি সাবধান হওয়া দরকার ততখানি সাবধান হয়েছি। বরং আগ বাড়িয়ে অনেক বাড়াবাড়িও তো করেছি আমরা। ভিয়েতনামে মার্কিনিরা গ্রামগুলিকে যেমন—

এবার ডি এম তাঁকে বাধা দিয়েই নিজেই বলে উঠলেন : বলুন, ওরা আমাদের বোকা বানিয়েছে।

প্রায় নিষ্প্রভ কণ্ঠে এস পি বলেন : তাই তো দেখছি।

দেবেন রমেশকে বলে : এই অবধি! এতে কী আন্দাজ করে রমেশ?

—বুঝলাম জ্বইলবে!

—হ্যাঁ হে জ্বইলবে। ফাইটবে রিদেপুর।

দুই কেরানিবাবু নিজেদের অফিস ঘরের চেয়ারে যখন ফিরলেন তখন দেওয়াল ঘড়িতে তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। বাইরে তখন বারান্দায় এবং লনে ছায়া দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। □

রতনলাল

স্বপন চক্রবর্তী

মাঠে এখনও লাঙল পড়েনি। ভেদলাগুলো শুকিয়ে রয়েছে মাটির সঙ্গে। আর কবে তোলা হবে। এ দিকে তো আকাশে জল আসার সময় এসে গেল। কার যেন জমিটা?' গোঁসাইয়ের? খানিকক্ষণ এ ধার ও ধার চোখ চালিয়ে সে বুঝল জমিটা গোঁসাইয়ের। মনে মনে ভাবল সে কাল গোঁসাইকে পাকড়ে মাঠে আনতে হবে। সে আর গোঁসাই সব ভেদলা তুলে ফেলবে। পারব না? তার সন্দেহ হল। ঠিক দুপুরবেলায় নিজের ছায়া দেখল সে। তার শরীরের ছায়াটা এখন বাড়ছে। তার কাছে এখন ছায়া ও শরীরের পার্থক্যটাই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হল ইতিহাসটাকে বদলে দেওয়া। ঘুম আসার আগে পর্যন্তই এই কথা ভাবে সে। সে মানে রতনলাল।

হিসাব কষলে বাষট্টিতেই তার জন্ম। সেই দেশব্যাপী যখন জরুরি অবস্থা। চিন-ভারতের যুদ্ধের জন্য গাঁ উজাড় করে ভূমিহীন চাষি পরিবারের ছেলেরা দু দিনের ট্রেনিং নিয়েই রাতারাতি সৈনিক বনে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল লাদাকে। রতনলালেরও সৈনিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঠিক এই রকম নয়। কারণ ওই সময়ই তার মাথার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল 'লাল ফৌজ' কথাটা। এর জন্য রতনলালের বাড়িও সার্চ হয়। অনেকটা দূর মফস্‌সলের বাইরের গ্রাম থেকেও তার নাম লর্ড সিনহা রোডে ফাইলবন্দী হয়। এতেও রতনের সুখ ছিল। কারণ প্রকৃতপক্ষে আর পাঁচজন যুবকের মতো সে নিজেকে সুখী গৃহস্থ করতে চায়নি। কিন্তু কথায় আছে সুখ নাকি চঞ্চলা। তাই সুখ ভেঙে যায় তার। পার্টি ভাঙল। সে শুনল, দুটি নতুন কথা—রুশের চর, চীনের পঞ্চম বাহিনী। তারপর একটানা নির্বাচনী লড়াই। সাতষট্টিতে কি? না ঠিক সাতষট্টিতে নয় আরও এগিয়ে এসে রতনলাল এ কাজে ইস্তফা দিল। সে ব্রাঞ্চ কমিটিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল এতে মোহই বাড়ছে, কমছে না।

'জনস্বার্থ বিরোধী সংবিধানের মধ্য দিয়ে তৈরি করা প্রশাসন কখনই জনগণের মৌল অধিকারের প্রতিষ্ঠা দেয় না। এটা হল গ্রামীণ সরলমতি কৃষকদের ঠকানো আর সামন্তবুর্জোয়াদের মনোরঞ্জনের জন্য গ্রামীণ যাত্রায় ব্যাটাছেলের মেয়ে সেজে নাচার মতোই এক চমক সৃষ্টির প্রয়াস; দেউলিয়াপনা।' আর আশ্চর্য চিঠির শেষে 'অভিনন্দনসহ' কথাটি লিখলেও নিজের নামের আগে কমরেড কথাটি লিখেও সে কালি দিয়ে কেটে দিল।

দু-চারদিন চুপচাপ থাকল সে। প্রথম দিকে তো বাড়ি থেকেই বেরল না। ক্রমশ একঘেয়ে ছক-বাঁধা জীবন তার বিতৃষ্ণা এনে দিল। সে তার মাকে দেখল। দেখল গ্রামের আর সব মা-বউ-ঝিকে। প্রতিটি সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে এমন সংসার পেল না যেখানে দুবেলা উনুনে কাঠপালা পোড়ানো হয়। সে বুঝল গ্রামই তার 'কেন্দ্র'। অচিরেই রতনলাল এক নবীন মাঝি হয়ে উঠল। গন্ধ পেল বাতাসে বারুদের। সময়টা ষাটের দশক। সতেরোজন পাঠানের নবদ্বীপের 'সেন রাজবাড়ি' দখলের মতো রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে, কোথাও কোথাও শুরু হল এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের অভিযান। গ্রামেও যোগাযোগ পায় রতনলাল। রাজনৈতিকভাবে সে সশস্ত্র হয়ে ওঠে, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলতে চায়।

আকাশে আগুন রইরই করছে। চারপাশ থম ধরা। তাব মাথার ওপর বৈদ্যুতিক লাইন। শন শন শব্দ হচ্ছে। তার বাবার কথা মনে পড়ল, 'যেখানে থাইস সাবধানেই থাইস বাবা। বিষ্টুচরণ বড্ড সাঙ্ঘাতিক নোক।

তাছাড়া ওর এহন কত্ত বল।' বাবার কথাগুলো বিশ্বাস করে সে। গ্রামে সব ক'টা ধর্মীয় সংগঠনে চাঁদা দেয় বিষ্টুচরণ। বিষ্টুচরণের মুখ দুদিকে ফেরানো। আর এটাই রতনলালের সব চেয়ে বড়ো বাধা।

মাঠ থেকে রোদের ঝিল্লি উঠেছে। দূরের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। আলপথ দিয়ে দ্রুত চলতে চলতে সে আলপথের নীচে কোথাও কোথাও সবুজের চিহ্ন দেখতে পায়।

দেশে সবুজ বিপ্লব হয়ে গেছে। বিষ্টুচরণের মতো লোকেরা বদলে গেছে। লাঙল ফেলে দিয়ে ট্রাক্টর নিয়ে মাঠে নামে তারা। ট্রাক্টরের সামনে ওড়ে তেরঙ্গা। দমন, পীড়ন নামে গ্রামে-গঞ্জে। রতনলালও ধরা পড়ে। ছাড়া আটাত্তরের শেষের দিকে। বাইরে এসে সব শোনে সে। জয়প্রকাশের গলায় মালা দিতে হয়নি বলে খানিকটা তার গর্বও হয়। আলপথের দু পাশের জমিতে সার দেওয়া হয়েছে। মাটির গন্ধটাও কেমন যেন বদলে গেছে। সবুজ বিপ্লবের উচ্ছিষ্ট জমিগুলো দেখতে দেখতে সে মাঠান জমি ছেড়ে বড়োরাস্তায় উঠে পড়ে।

ফুড ফর ওয়ার্কের রাস্তা। সোজা চলে গেছে মামুদপুর। রাস্তার কাজে রতনও জন দেয়। সতর্ক হয় পঞ্চায়েত। তাদের কাছে খবর আসে রতন রাস্তার কাজ নিয়ে ঘোটরা পাকাচ্ছে। পঞ্চায়েত কাজ বন্ধ করে রতনকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। না পেরে শাসায়ও। তা শাসাক। জন্মকাল থেকেই রতনলাল এ সবের সঙ্গে পরিচিত। তাই সে এ সব চালাকি আর শাসানিকে বুড়ো আঙুল দেখায়। এ সব সমস্যা তার কাছে কোনও সমস্যাই নয়। তার অতি সাম্প্রতিক সমস্যা হল তার বাড়ি। তাদের চার চালার নীচে বসে সাঁঝবেলায় হোমল্যান্ডের কথা তুলেছিল রমেন মণ্ডল। সম্পর্কে সে তাদের জ্ঞাতি। বলেছিল, 'পিত্তিপুরুষের বাস্তভিটা-জমি ফেলায়ে এয়েছি। ও জমির হক আমরা ছাড়বনি। মোরা সীমান্ত ডিঙাবই।'

রতনলাল শোনে। আড়চোখে দাওয়ার দু-চারজন লোকের উপর চোখ চালায়। দেখে তার মা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে হোমল্যান্ডের গল্প শুনছে। মাকে এ সময় তার অচেনা বলে মনে হয়।

তারও ইচ্ছা সীমান্তের বেড়া না থাকুক। পাখির মতো মানুষের নিষেধ যেন না থাকে। মানুষে মানুষে সুন্দর বোঝাপড়া হোক। প্রত্যেকে মিলেমিশে হোক এক মানুষ। এ জন্য সীমান্তের বেড়া সে ভাঙতে চায় কিন্তু হোমল্যান্ডের চক্রান্তকারী, স্বাধীনতার পেনশনভোগী রমেন মণ্ডলের মতো নয়। সে জানে যারা হোমল্যান্ডের ধুয়া তুলেছে তারা স্বার্থপর, সরকারের দালাল। ওরা ও দেশে থেকেও যেমন এ দেশে থেকেও তেমন পরদেশি। এরা সীমান্তকে আক্রমণ করে সীমান্তকে টিকিয়ে রাখার জন্য। সে বলে, 'তা কাকা ভালো। কিন্তু বলেন দিনি কংগ্রেসিরা কেন এ দেশেরই সংবিধানকেই আক্রমণ করতি গেল।' সবার চোখ চলে যায় রতনলালের দিকে। রতনলালের বাবার কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে : থামবি রতন। বলছিনে গুরুজনের মুখের উপর চোপা করতি লাই।

রতন থেমে যায়। মায়ের দিকে তাকায় যেখানে দুটো চোখ সম্ভাব্য সচ্ছলতার আশায় পিদিম হয়ে জ্বলছে। আক্ষেপে দাওয়া ছেড়ে চলে যায় সে। সে বোঝে এভাবেই স্বৈরাচার বেঁচে থাকে।

বাতাস ছাড়ে এ সময়। হাওয়া উলটোদিকে বয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি যেন বিপরীতমুখী হাওয়া তুলে আসল লক্ষ্যটাকে আড়াল করে দিতে চাচ্ছে। গ্রাম আজ তাই শান্ত! শ্রেণী সংগ্রাম নয়, বরগা-আপস। এরা সব কৃষকের আক্রোশ থেকে জমিদারদের রক্ষা করার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। এরা পারিবারিক শাসনকে প্রশ্রয় দেয়, স্বৈরতন্ত্রের গাঁটছড়ার সঙ্গে এরা বাঁধা। সে বোঝে, 'প্রতিটা পদক্ষেপ এখন সতর্কতার।' মাস্টারদার কথাটা মনে পড়ল তার।

মাঠ ভেঙে রতনলাল মামুদপুরের রাস্তায় উঠতেই কার সঙ্গে যেন ঠোকা লাগল তার। রতনলাল চিনতে পারল না। অন্ধকার এখন সরের মতো ঘন হচ্ছে। দু হাতের বাইরের জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে না। দ্রুত পা চালাতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে উনিশশো বিরাশির কোনও এক সন্ধ্যায় মা-র মুখটা মনে পড়ে গেল তার। মা-র কথা মনে আসতেই মামুদপুরের দিকে দৌড়তে শুরু করল সে। অনভ্যাসে

গলাটা শুকিয়ে উঠল তার। খানিকক্ষণ হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে সে দেখল মামুদপুরের আলো। বাতাস টানতে টানতে সে হালকাভাবে হাঁটতে লাগল। ঠিক তখনই আচমকা কারা যেন ঘিরে ধরল তাকে। রতনের কাছে এ সব নতুন নয়। সে মুখোমুখি হল। অন্ধকারে চোখ চালিয়ে দেখল বিষ্টুচরণ, অন্যসব বিরোধী সমিতির লোক এক হয়ে তার চারপাশের বৃত্ত ছোটো করে আনছে।

সামনের লোকটাকে ধাক্কা মেরে পালাতে যেতেই সে লক্ষ করল লোকটা কখন যেন তার পেটের মধ্যে চাকুটা চালিয়ে টেনে দিয়েছে। দু হাত দিয়ে পেটটাকে চেপে ধরে 'ফুড ফর ওয়ার্কের রাস্তায়' লুটিয়ে পড়বার আগে সে তীব্রভাবে চিৎকার করে উঠল 'মা-স্টা-র-দা'।

রাস্তার ধুলোতে লুটিয়ে পড়তেই হাত দিয়ে সে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রাখতে পারল না। পাড়ের ঢাল বেয়ে একদিকে গড়িয়ে গেল সে। তার চোখে এখন অন্ধকার নেই। ক্রমশ তার চোখের ভিতর ভোরের রং ফুটতে শুরু করল। সে দেখল একটা পাখি সীমানা পেরিয়ে ওপারে উড়ে যাচ্ছে। মাস্টারদার মতো এক একজন সীমানার বেড়া ভেঙে দিয়ে ক্রমশ আকাশেব দিকে উঠে যাচ্ছে। তার মার মুখটা মনে পড়ল। মার মুখটা মনে আসতেই রতন দেখল তার চারপাশে এখন অনেক লোক। সে দেখল তার মাথার নীচে মাস্টারদাব বিশ্বস্ত হাত। হাসিতে মুখটা ভরে উঠল তার। সে বলল, 'কাল গোঁসাইয়ের জমিতে ভেদল তুলতে হবে। আমরা যে শেষদিন অবধি ওদের সঙ্গে থাকব তার আস্থা অর্জন করা দরকার।' রতনলাল আরও কিছু বলার চেষ্টা করল, পারল না। তার মাথাটা এলো হয়ে এল।

উনিশশো বিরাশির কোনও এক সন্ধ্যায় নিহত রতনলাল মাস্টারদার হাত থেকে মাথা তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মামুদপুর আর বেশি দূরে নেই। রতনলালের কাঁধে বসার জন্য সেই পাখিটা ভোর নিয়ে তার পিছনেই উড়ে আসছে। রতনলাল হাঁটছে—। □

প্রথম শনিবার

কমল চক্রবর্তী

উনসত্তরের অধরা রাত্রি

যোগ বলল, তুই তো ভালোই মদ খাস! এখানে পড়ে আছিস কেন? চল আমার সঙ্গে। কলকাতায় চল। তোর কদর হবে। তোকে নিয়ে যাব।

আমি চুপ করে থাকি। মিনু প্যাটেলের বিশাল ভাটিখানা। মদের সঙ্গে গরম লিট্টি, পুদিনার চাটনি, মুলো। হ্যারিকেনের আলো পড়েছে মদ চকচকে চোখে, মুখে মদ্যপের সেঁকা পাঁপড়ে। কখনও স্ল্যাগ ডাম্পিং-য়ের আলোয় লাল হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর তরল।

—আমি তো কলকাতা চিনি না।

হাবা চোখে অন্ধকার।

—ওটা আবার চেনার কী? ট্রেন থেকে নামবি, নদী পার হয়ে ভিড়ে মিশে যাবি। কফি হাউসে গিয়ে একটা ইনফিউশন নিবি আর আমার নাম করে বসে থাকবি। আধ ঘণ্টা। ব্যাস পর পর তিন দিন। সব চেনা হয়ে যাবে। কলকাতার আরম্ভ কফি হাউসে, শেষও। ওটা আমার ঠিকানা, চিঠিও আসে। যোগেন বললেই হল।

—এত ছোটো শহর! এ তো আমাদের শহরেও। ফার্নেসে শুরু, ফার্নেসেই শেষ।

সিগারেট ধরিয়ে দিশিতে লম্বা চুমুক।

বেশি দূরে নয়, একটা হনুমান মন্দির সম্প্রতি গড়ে উঠছে। ফলে প্রত্যেক সন্ধ্যায় রামনামী করতাল একটু বেশি, ঝিংচাক ঝিংচাক। ওরা বিঘে পাঁচেক জমি ঘিরে সমুখে একটা হনুমান খাড়া করেছে 'ভাঙ্ দেখি' মুদ্রায়। এখনও জমির ভাগবাঁটোয়ারা হয়নি। ফলে গানের দল নিয়মিত। এবং আরও নিয়মিত গাঁজা ও ভাঙের চর্চা। এই এক কল, টাটার জমি ঘিরতে হলে মাটির হনুমান, ব্যাস্।

কখনও কখনও মদের তাল কেটে গেলে, গানের তাল ঢুকে পড়ছে।

—না, কফি হাউস একটা বিশাল পৃথিবী। তুই ওখানে পাগল বদ্রিনাথকেও পাবি, আবার কবি ব্রজেন, সারাদিন চিনি খাচ্ছে, আর ছোটো ছোটো তরুণ কবিকে মুগ্ধ করছে। এ ছাড়া কংগ্রেস, কম্যুউনিস্ট, নকশাল, চোব—ছাড় এত বিবৃতি দিতে ভালো লাগছে না। তুই আয়, এসে একটা ফোন করিস। শনিবার শনিবার এমনিতেই যাই। কফি হাউসে না গেলে মন ভালো থাকে না।

—ওখানে মেয়েরাও আসে?

—আবে কলকাতায় ছেলে-মেয়ে বলে আলাদা কিছু নেই। সব সমান। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

—লিট্টি খাবি? অন্য গান বল। যেটায় ব্যর্থ প্রাণ, আবর্জনা পোড়াও, আগুন লাগাও একটা আছে না, দিদি করত! ওটা বল! খুব ভালো।

—দূর ব্যাটা, যোগ হেসে পেটের জামা খামচে ধরল, —তা'লে 'মরি লো মরি' করি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?

— না, ওটাও না। তুই বরং একটা গণসঙ্গীত, তোর গলায় ভালো মানাবে।

আমার কথার পক্ষেই যোগ, গাইতে লাগল, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

— গানটা তুই বুঝিস। তোর আসে, দু লাইন গেয়ে বলল, —ধর, ধর আমার সঙ্গে, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। যে—তো—মা—য়—

আমি ধরব কী। দুটি টপ গিয়ারে ওঠা অচেনা ছোকরা হাত-পা যেভাবে সামনে এসে নাড়তে লাগল, ভাবাই যায় তারা কোনও একদিন 'মায়ার খেলা' বা 'শ্যামা' দেখেছে।

যোগও ওদের মুদ্রায় আকৃষ্ট হয়ে, দাঁড়িয়ে, হাত-পা নেড়ে বজ্র সেন।

—আরে দাদা তো জমা দিয়া, দূরের অন্ধকার থেকে হাততালি। আমার ভালো লাগে না। বাইরে বেরতে পারলে ভালো। কারণ নেশায় অতিকথন বিশ্রী। যারা মদ খেয়ে মনের কথা বলে, দুঃখের কথা বলে, জমে থাকা, চাপা পড়ে যাওয়া জীবন দেখায়, তাদের ভালো লাগে না। আমি কত আনন্দ, দুঃখ মদ না খেয়েই বলেছি, অভিমান বা রাগ।

যোগ হঠাৎ গান থামলে বলল—শালা রতন আমার লেখা চেপে যাচ্ছে বুঝেছিস। যতবার দিচ্ছি, বলছে অন্য লেখা দে, ব্রতীদার পছন্দ হয়নি। শালা কবিতা আমাকে শেখাচ্ছে? আমার পেচ্ছাব দিয়ে রোজ শত শত ব্রতী, রতন বয়ে যাচ্ছে। শুয়োরের বাচ্চা! আমার গেলাস ফাঁকা কেন? নে ঢাল। গুষ্টির তুষ্টি করেছে।

—আরও খাবি? চল বাড়ি ফিরি।

—সবে তো দু ঢোক খেয়েছি, এখনই ফিরব? আর ফিরব যখন তখন তোকে নিয়ে ফিরব। তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব। কফি হাউস, খালাসিটোলা, সোনাগাছি, হাড়কাটা সব দেখাব। তুই এখানে পড়ে পড়ে পচছিস। চলে আয়, এখানে থাকিস কী করে? একটা মেয়েমানুষ নেই! একটার সঙ্গে আলাপ করালি সেটা তো চিমড়ে, গান শোনাতে ব্যস্ত। শালা এখানে মানুষ থাকে!

এই কথা আমার ভালো লাগে না। চুপ করাতে জানি না। বিরক্ত হলে নিজেই চুপ করে যাই। ভাবি, আজ ফার্নেসে কত লোহা বেরল। বিকেলে শিফটের দেবব্রত, গণেশ, প্যাটেল এখন শেষবারের মতো চার্জ করে টয়লেটে আড্ডা মারছে। ফোরম্যান ব্যানার্জি কী বলল?

—একটু আদাকুচি দিতে পারিস? যোগ আমাকে নিয়ে যাবেই, —তুই সাতদিন থাকলেই বুঝতে পারবি. সঙ্গে একটু নুন দিস।

আমি অন্ধকারে একটা টুঁ মেরে—না, পেঁয়াজকুচি, নুন-লেবু চলবে?

—এই জন্যেই বলি যেখানে আদা নেই সেখানে তোর মতো আদার ব্যাপারি থাকল কী করে। কানুদা বলেন, আগে আদাটা চেনো তবে জাহাজ চিনবে। আমাদের মুশকিল কি জানিস, আমরা জাহাজ নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। অথচ গোটা জীবনে একটা ভোঁ শোনার যোগ্যতাও অর্জন করি না। শালা ব্রতীদা আর চ্যালা রতন, ক্যাপ্টেন আর সারেং। তোদের পাক্কিতে জল মেশানো। নেশা কেটে যাচ্ছে। আরেকটু আনা। ওদের নাম উঠলেই নেশা ছানা কাটে। বুঝবে। হুড়কো।

দেওয়ালের ছোটো গর্তে হাত বাড়িয়ে দিলুম। এলান বলল—আজ এত পিচ্ছেন? বললুম—দোস্ত এসেছে।

নতুন করে গেলাসে ঢালতে ঢালতে বলল, তুই জয়দেব-এ গেছিস?

—না, জয়দেবটা কী?

—আরে ওই তোর বাউলের মেলা, কেঁদুলি। নিয়ে যাব। আমরা তো প্রত্যেকবার যাই। ফেরার পথে বাচ্চুদি, মোহরদির গান শুনে ফিরব। ও একটা ব্যাপার। ভাবতে পারবি না, পুরো খোয়াই উঠে আসবে। সারারাত গোয়ালপাড়ার তাড়ি, গান। অপরেশ আছে, কানুদার ভক্ত। কানুদা তো যাবেই, তোকেও নিয়ে যাব। অপরেশের বোনটা, পৃথা, একটা আস্ত বাঘিনি। তোর মতো লম্বা-চওড়া কিল পেলে শেষ করে দেবে। আমি রোগাসোগা, ধারেকাছেও ঘেঁষি না। তোর সঙ্গে ভিড়িয়ে দেব। চল্ চল্ কাজে লাগি। এত চুপচাপ থাকলে স্প্যাস্টিক সোসাইটিতে নাম লেখাতে হবে। জড় হয়ে যাব। মাল দে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দে।

শনিবার একটু ভিড় থাকে। খালি বোতল থলি থেকে বার করে ভরা নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। চেনাশোনা মানুষের মুখে হ্যারিকেন পড়লে কখনও ভাবনা বদলে যায়, পুটুদা বা অমলের বাবা, ব্যানার্জিবাবু, দয়াময়।

বাঙালি শ্রমিকরা এখনও মদ কেনার ব্যাপারে শক্তসমর্থ হয়নি। দুশ্চিন্তার রাশি চোখেমুখে, অপরাধবোধ। এ সব কি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্খল? অথচ অন্যেরা বোতলের গন্ধেই উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। তাদের দেওয়ালে অবশ্য রামকৃষ্ণের ছবি নেই।

—কলকাতার একটা ব্যাপার আছে, সেটা তুই এখান থেকে বুঝবি না। চল্, আজ তো শনিবার, তাই তো! আজই কফি হাউসে যেতে হয়। পৃথিবীর কোথাও এত লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরয় না। এত মজা। প্রত্যেকটা টেবিল এক একটা সম্পাদকের দফতর। সাহিত্যকেন্দ্র। কত ছেলেপুলে! কবিতার চালাচালি। এ সব বলে বোঝানো যাবে না, পৃথিবীতে নেই।

—শুনেই ভালো লাগছে, প্রত্যেকটা টেবিল এক একটা করে দফতর! কত কবি! কত সম্পাদক! তোরা কী ভালো আছিস। এখানে লাইফ নেই। সারাক্ষণ 'এ'-শিফট, 'বি'-শিফট করে হেজে গেলাম। আমাদের এখানেও একজন কবিতা লেখে, কবি আছে। প্রত্যেক বছর সরস্বতী পুজোয় সে নিজের লেখা পড়ে। তোকে নিয়ে যাব, তার একটা বই আছে।

যোগেন হাসল! —বই আছে! তাই বুঝি! তবে তো জিনিসটা দেখতেই হচ্ছে।

—যখনই কলকাতা থেকে কোনও কবি-সাহিত্যিক আসে তখনই ওকে থাকতে হয়। আমরা কবিতা বুঝি না। আমরা মালা-ফালা গাঁথি, ম্যারাপ বাঁধি।

—তোদের ভাটির মদটা ভালো। কিন্তু তোর নেশা হচ্ছে না কেন? নিয়মিত চলে।

যোগেনের সিগারেট থেকে অচেনা একজন বিড়ি ধরিয়ে নিল।

—না! বলতে পারিস আমরা তিন পুরুষের মদ্যপ।

যোগেন হাঃ হাঃ হেসে আমার উরু খামচে ধরল।

—সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর। ঠাকুরদার নেশা বাবা পায়, বাবারটা আমি। আমার দাদা, মেজদা খায় না। বাড়ির ঐতিহ্যে আমিই বংশধর।

যোগেন ফের হেসে আমার হাত চেপে ধরল। পাছায় একটা লাথি কষাল।

—তোর নেশা হয় না। শালা, হারামি, বলে তিন পুরুষের।

—হয় বইকী। সেটা কথা নয়, কথা হচ্ছে আমার ঠাকুরদার বিপথগামী হওয়ার একটা ছোটো ইতিহাস আছে। পরে কখনও তোকে বলব, এখন মন দিয়ে খাই, ঠিক আছে?

—দূর ব্যাটা, পরে কী রে, আমি তো কালই চলে যাচ্ছি। এখন বল্। ঠাকুরদার পথভ্রষ্টের ইতিহাস শুনি। রস দিয়ে বল্।

—ঠাকুরদা কবরেজি করতেন। বর্ধমানেব চাপাই গ্রামে আদি বাসস্থান। সেখান থেকে যাচ্ছিলেন তোর চাইবাসা। সেটা দশ-পনেরো সাল হবে। তখন তো টাটা স্টেশন নেই, নাম হলগে 'রোড কালিমাটি'। ট্রেন থেকে নামতেই ঠাকুরদার দশাসই চেহারা দেখে এক টুকটুকে সাহেব মুঠো করে ধরে সোজা টাটা কারখানায় নিয়ে গেল। এবং যথেষ্ট পাহারা বসিয়ে চাকরি। মাসটাক গেলে, ঠাকুবদা চা খেতে শেখেন। এবং চায়ের নেশায় আর কোথাও নড়াচড়া হয় না। তখন থেকেই আদিবাসীরা উৎকৃষ্ট মহুয়া নির্মাণে দক্ষ। চারদিকে বনজঙ্গল, ভাল্লুক-উল্লুক আর মহুয়া।

—দারুণ!

—হুঁ। ঠাকুরদার মহুয়াব নেশা মেয়েমানুষে টার্ন নেয়। কারণ ওঁর বিয়ে হয়েছিল সাতে। ঠাকুমা তখন তিন। কিন্তু বাইশ বছরেই ঠাকুমা ছটি বাচ্চা দিয়ে জীর্ণ। চাপাই-এ ছানাপোনা নিয়ে থাকতেন। কিছু জোতজমি, কলাগাছ, নারকেল, সুপুরি, অল্পস্বল্প মাছ আর কুমড়ো অনেক। দু-একটা পানলতাও ছিল। রোগা ঠাকুমা খেতখামার, ছেলেপুলে নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। বছরের বোনাস। এদিকে ঠাকুরদা মহুয়া খেয়ে খেয়ে ব্লাস্ট-ফার্নেসের রাগি ফোরম্যান হয়ে যান। সাহেবরাও ভালোবাসত। ঠাকুরদার দুটি মেয়েমানুষ ছিল। একটি ঘরদোর সাফসুতরা রাখত, অন্যটি রান্না, স্নানের জল। পা টেপা।

—এ সব ডিটেল, ওদের ছেলেপুলে মানে তোর আদিবাসী কাকা-জ্যাঠাদের কোনও খবর আছে!

যোগেন গেলাসে চুমুক দেয়।

—ও অন্য প্রসঙ্গ। বাবা-কাকারা এখানে চাকরি পান। সোজা গ্রাম থেকে কারখানায়। কাকা খান না। খুবই সাত্ত্বিক মানুষ। দীক্ষাও নিয়েছেন। রোজ গায়ত্রী জপেন। বাবা বলতেন, নেশা ভদ্রলোক করবেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মানুষ, নেশা করে। আর করে অশিক্ষিত, অবুঝ। আমরা স্টেটস্‌ম্যান আর কাঁচি সিগারেট দিয়ে জীবন শুরু করেছি। ভদ্রলোক! নেশা একান্ত কর্ম। জীবনের শেষ দিন অব্দি নিমদাঁতন, খড়ম, বাড়িতে ধুতি। কখনও লুঙি বা ব্রাশ ব্যবহার করেননি।

—তোর বাবা!

যোগ হতভম্ব।

—আশিতে যখন গেলেন, তখন দাঁত চুল জিভ সব ঠিক। কিডনি বা গলব্লাডারে পাথর হয়নি, প্রস্টেট অবিকৃত। নো হাইড্রোসিল, নো হার্নিয়া। এমনকি সুগার। আমাকে বলেছিলেন, কখনও ভুলিস না তুই ভদ্রলোকের ছেলে।

—যোগেন, মদ খেয়ে আমি দুবার মাত্র বমি করেছি। একবার স্বপন এসে খবর দিল ভারতীদের বাড়ির পেছনে ডাস্টবিনে ন্যাকড়া জড়ানো একটা রক্তমাখা পুঁটুলি কুকুরে খাচ্ছে; শোনার সঙ্গে সঙ্গে হড় হড় করে। আর একদিন এখানে একটা হোমো, গোপাল, ব্যাটা প্রায়ই রামস্বরূপের সঙ্গে মদটদ খায়। নেচেকুঁদে উঠে যায়। সে দিন শালা একটু বেশি খেয়ে ধপ্‌ করে আমার কোলে বসে পড়ল। গলা জড়িয়ে ওহ্‌। ওর গা থেকে একটা দুর্গন্ধ পেলুম, সে যে কী বীভৎস! ওকে ঝটকায় সরিয়ে দৌড়ে নর্দমায়। এবং ঘণ্টাদুয়েক গাছতলায় অন্ধকারে ঝিমঝিম। আর কখনও বার করিনি। বাবা বলতেন, মদের নেশা প্রকৃতির নেশা, গাছপালার রস থেকে তৈরি আবক। তুমি যদি ভালোবেসে খাও তোমাকে প্রকৃতি নিজস্ব ভুবনে নিয়ে যাবে। আরকে থেকো, আসক্ত হোয়ো না।

—শালা কী বলছিস রে! চল্‌, কলকাতায় চল্‌। আগামী শনিবারই। তোকে কফি হাউস, ছোটো ব্রিস্টল, খালাসিটোলা, সব উপহার দেব। তুই তো রাজা আছিস। তুই এখানে পড়ে থাকবি? একদম বুক করে গেলুম। অ্যাডভান্স দেব। এই যে দাদা, শুনছেন! একটা (ডান বাহু উঁচু করে কনুইয়ের নীচে বাঁ হাতের চেটো) এনে দেবেন! স্যরি দাদা, একটু ইয়ে হয়েছে।

লোকটা এগিয়ে এসে টাকা নিয়ে গেল।

—বাবা বলতেন, তুই ফলের রস, কিংবা আখের রস, কিংবা চালের রস, এই তো খাচ্ছিস। তোকে মত্ত করবে কেন? কেন হাঙ্গামা করবে! তুই তো প্রকৃতির দুলাল। কিন্তু সে সব না বুঝে তুই একটা আস্ত হারামি! নেশাখোর হয়ে যাচ্ছিস, এই পার্থক্য।

সবে বাপ-ঠাকুরদার নস্টালজিয়ায় জমে গেছি, ঠিক সেই সময়ে তীব্র টর্চের আলো। চোখ ঝলসে যায়। পুরো শেড আলো ঘুরে গেল। কারও কারও মুখে।

—এ শালা অসহ্য! তুই আমার সঙ্গে কলকাতায় চল্‌। কুয়োয় থাকবি?

কে জ্বালল টর্চ!

আমি বাইরে এলাম। খানিক দূরে সুবর্ণরেখা. বয়ে যাওয়া আবহমান। হিম পড়ে পাতা ভারী। হাওয়ায় ঈষৎ আর্দ্রতা। কত কথাই মনে পড়ছে। খানিক ভয়। চেনা মৃতদেহ। ভাটির বাইরের অশ্বত্থগুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালাম। আমাদের খাটা পায়খানার গামলার ঠিক উপরে, পাদানির পাশে সমীরের চাইনিজ পিস্তল, কাগজপত্র, আজ যা তিন-চার মাস হল পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা। দুপুরে মা যখন ঘুমোচ্ছে, বোনেরা কলেজে, আমি ডিভান থেকে বার করে একা একা, নাকে গামছা বেঁধে ওখানে পুঁতে রেখেছিলুম। কারণ, পকেটে নিয়ে, সুবর্ণরেখা অবধি গিয়ে, জলে ফেলে দেওয়ার হিম্মত হয়নি।

কারণ ততদিনে সবাই জেনে গেছে, বাঙালি যুবক মাত্রই নকশাল। চেনার মধ্যে বীরেন, মহাদেব হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে। বাঙালি কোয়ার্টার্সে যখন-তখন পুলিশের হানা, কখনও পাঁচ-দশ হাজার ঘুষ দিয়ে হাজত

থেকে ছাড়িয়ে আনা। রুয়াম জঙ্গল ফুঁসে উঠেছে। সুবর্ণরেখার জলে কখনও যুবকের নিস্তরঙ্গ বয়ে যাওয়া শব।

তখনই একদিন অভিজিতের বিত্তবান ডাক্তার বাবা মোটা টাকায় ওকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। বাগাকুদা লেকের পাশে পরপর দু দিন দুটি রুগ্‌ন পুলিশের হাত-পা, মুণ্ডু কাটা লাশ। কিছু দূরে থেমে যাওয়া মুণ্ডু। বাঙালি বাবা-মা ভয়ে রাত কাটাচ্ছে। কখনও বাড়ির দরজায় পুলিশের জিপ থেমে যায়। একদিন লাল সিং আমাকে প্যাকেটটা দিয়ে বলেছিল সমীর দিয়েছে।

ভেতরে পিস্তল, কাগজপত্র। আমার ভালো লাগে না, ভয় পাই, এত মৃতদেহ! মরে যেতে একদম ভালো লাগে না। খেতে ভালোবাসি, ঘুমতে ভালোবাসি।

তার কয়েকদিন পরেই যাদবপুর নবনগর থেকে পিসতুতো ভাই বাদলকে নিয়ে পিসেমশাই এলেন। বোম পড়ে টালি ভেঙে গেছে। যে কোনও দিন বাদল খতম হতে পারে।

পিসেমশাই বললেন, যা বোমাবুমি চলতাছে যে কোনও দিন বাদলরে ঘর থিকা টাইনা নিয়া শেষ করবো।

—বাদল কি পার্টি করে? আমি নিচু গলায়।

—না, ইসে, পার্টি করব ক্যান, জুয়ান পোলাপান। দ্যাখলেই মারণের লিগ্যা হাত কসকায়।

—এখানেও শান্তি নেই পিসেমশাই।

—বাড়ি থিকা টাইনা নিয়া নলি কাটতাছে। কী করুম কও। বাবাকে বললেন, সকলে কইল দুই-চার দিন টাটায় থাইকা আয়, মামারা লাগুর পাইবো না।

রসিক পিসেমশাইয়ের শুকনো চোখমুখ। পাশে বি এসসি পরীক্ষা দেওয়া বাদল। শূন্য দৃষ্টি, বলির পাঁঠা। মৃত্যু-ছোঁয়া চোখমুখ। ভালো দেখায় না।

একদিন কারখানার মেন গেটের দেওয়ালে আট দশটি ছবি। একেক জনের মুণ্ডুর। একেক রকম রফা। দু-চারটে মুণ্ডু দিতে পারলেই পুলিশি পুরস্কার। যা পাওয়া যাবে তাতে ছোটোখাটো একটা বাড়ি হয়ে যায়। অবাক হয়ে দেখলুম আট-দশটি বাঙালি ছেলেব মৃত্যু পবোয়ানা দেওয়ালে।

বাবা বললেন, দেখো মাখন, বাঙালিরা আর কত রক্ত দেব বলতে পার? এই তো স্বাধীনতায় হাজার হাজার ছেলে শেষ হয়েছে। আবার! ভালো বুঝি না। কেবল মনে হয়, এই ভাষার রক্তে, ভূগোলে কোনও দোষ আছে। না হলে বারবার এত ক্ষয়-ক্ষতি কেন?

পিসেমশাই চোখ গোল গোল করে বাদলের দিকে তাকান।

—হ বুঝি না। আমারও বেবাক গণ্ডগোল হইয়া যায়। বাঙালির এত জিদ, মরার লালচ ক্যান! নেশা! মরণের নেশা। আমরা ছেলেবেলায় দেখছি। টানে। বোঝলেন দাদা! কমু কি, টানে। খবরের কাগজ খোলেন, দ্যাখবেন চাইরটা পাঁচটা কইরা লাশ। ডরাই। বাদল জুয়ান, কী থিকা কী হয়। ডর লাগে দাদা। আপনের কাছে আইনা থুইলাম। এখন আপনে দ্যাখেন। কয়টা দিন থাকুক। অর মায় ঘুমাইতে পারবো। আপনার বুইনে ত জাইগা কাটায়। একটামাত্র পোলা, সব কর্মদোষ।

টাটাও নিরাপদ নয়। এখানে অনেক বাঙালি, ওদের ধাবণা বাঙালি মাত্রই নকশাল। বাবা হতাশ গলায় বোঝাতে চাইলেন।

ওটা কলকাতা, ওখানে দুটো লাশের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে ট্রামলাইন। রক্তরেখার পাশে ভিক্টোরিয়া। বোমের ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার আগেই একজোড়া তরুণ-তরুণী ঘনিষ্ঠ কবিতা নিয়ে বা নাটক, হতে পারে মডার্ন আর্ট বা ছায়াছবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এটা টাটা! কলকাতার ভূত বাসা বাঁধলেও ভগবান এখানে ঢোকেনি।

বাদলের এখানে থাকা, মাঝে মাঝে সন্তর্পণে বেরিয়ে সিগারেট কিনতে গিয়ে পান দোকানে উদাস দাঁড়িয়ে থাকা, চোখে পড়ে, ফলে বাদলের পক্ষেও একটা ভয়ানক গল্প জমতে থাকে। বাঙালি-বাদলের জন্য গোয়েন্দা, সমাজ, সমাজ রক্ষকরা সচেতন হয়ে উঠল।

আমি কারখানা করি। শিস দিয়ে হিন্দি গান। মাঝে মাঝে প্রিয় নায়ক শাম্মী কাপুর, নায়িকা ওয়াহিদা

রহমানের সিনেমা, হাতে আসে উল্টোরথ, জলসা, সিনেমা জগৎ, শচীন ভৌমিকের বম্বে, তবু একেকদিন রাতে ঘুম ভাঙে, হয়তো কোনও অপরাধী-আত্মা সন্তর্পণে খাটা পায়খানার ঝুলন্ত পুঁটুলি খুলে পিস্তল, বইপত্র বার করে। ও সব কখনও ছুঁয়ে দেখ না, কোনও বিপদের মুহূর্তে ওই পিস্তল গর্জে উঠবে না। ওতে গুলি আছে কি নেই! কিংবা আদপে ওটা কাঠ বা প্লাস্টিকের, অচল, গুলি নেই, কতরকম ভাবনা। তবু রাতের অন্ধকারে পেট্রলিং জিপের ধীর চাকা ঘুরে যাওয়া, বুক হিম।

এবং পরদিন দেওয়ালে বিশাল হিন্দি অক্ষরে, কখনও বাংলায় 'রাইফেলের নলই শক্তির উৎস', 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম।' দেওয়ালে কারা কখন বিখ্যাত হাতে লিখে গেল, চোখে পড়লে ভয় লাগে। কারখানায় অন্যরা ঘৃণিত কণ্ঠে বলে, 'বাঙালি লোক জিনা হারাম কর দিয়া', সুদীপ কখনও লিটারেচার নিয়ে আসে। খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সুবর্ণরেখায় গেলে ও গান গায়। কত গান! যে সব গানে রয়েছে জোতদারের লাশ, কৃষকের কাস্তে, বন্দুকের নল, রক্তে রোয়া ধান। শুনতে শুনতে শিহরন জাগে।

সুদীপ বলে, এত ভয় পাস মরতে! দেখ আরও মরতে হবে। না মরলে দাঁড়াবে না। যারা না খেয়ে মরে যাচ্ছে তাদের ভাষা নেই। তোর ভাষা আছে, তুই না-খাওয়াদের সঙ্গে মরবি, এক সঙ্গে।

সুদীপকে পুলিশ চোখে চোখে রাখে, কারণ সে কারখানার চাকরি ছেড়েছে, লেদ মেশিনের ঘর্ঘর তাকে আটকে রাখতে পারেনি। বন্দুকের শব্দ অনেক মধুর, আমরা সুবর্ণরেখার ধারে কুলি বস্তির ছোটো অপরিসর চায়ের দোকানে বসি।

মাঝে মাঝেই পশুডিহি, কদমা, সিদগোড়া রেড করার খবর। পুলিশের মত্ত গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় পরিতোষ, কল্যাণ, সেলিম, লোহা মিস্ত্রি রাজেন।

একদিন চরণজিৎ ডেকে বলল, আপনার নাম পুলিশের খাতায়, একটু সাবধানে থাকুন। যে কোনও ছুতোয় তুলে নিয়ে হাজারিবাগে। তারপর গুলি। কেন এরকম করছেন। বাঙালির ছেলে মাছভাতে থাকুন।

আমি তিন পুরুষের মাতাল। পৃথিবীর ভালো-মন্দ আমাতে বিন্দুমাত্র বর্তায়? বোধ সামান্য। কেন সামাজিক উন্নয়ন প্রয়োজন, সে বুদ্ধি বা পড়াশোনা নেই। ভিখিরি, চাষি, নমশূদ্র, কাহার বা মেথর নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই, মন্ত্রীদের রাজভোগ বা ব্যাভিচার কখনও ভাবায়নি। সুদীপ বলে, তোরা সমাজের শত্রু। তোদের শত্রুতায় পৃথিবী বার বার পিছিয়ে পড়েছে, তোদের ক্যারেক্টার নেই। তোরা জালি।

সুদীপ সুবর্ণরেখা পার হয়ে দলমা পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। ওকে আমার ভালো লাগে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। ওর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ইস্তাহার বিলি, খুব ভালো। কিন্তু একদিন সুদীপও গুলি খেয়ে স্লাগ ডাম্পিংয়ে পড়ে রইল। ওর মাংসে শকুন বসতে দেখলুম।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে ভাবতে দূরের গুমটি থেকে সিগারেট নিয়ে এলাম। যোগেন ততক্ষণে গানে, আড্ডায় মশগুল।

—কী রে এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

—তোর সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম।

—তুই যেমন বোকা, এখানে কাউকে বললেই এনে দিত। ভেরি আনস্মার্ট। ওই টর্চটা কী খুঁজছিল? চোর-ডাকাত?

—নকশাল।

—এখানে আবার নকশাল আছে! যোগেনের অবজ্ঞার হাসি—কত নকশাল দেখবি? চল তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব। দূর, ব্যাটা কে একটা টর্চ জ্বালাল কী দেশলাই ধরাল অমনি নকশাল। দিস ইজ টু মাচ। যদি সত্যি সত্যি দেখতে চাস আমার সঙ্গে চল। অজয়ের ছোটো ভাই অলোক, প্রেসিডেন্সির মহীতোষ, যাদবপুরের শ্যামল, পরপর সব দাঁড় করিয়ে দেব। কথা বলতে বলতে বোম বাঁধবে। পাইপগানে অব্যর্থ টিপ। ঝরঝর জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, মায়াকভস্কি, নেরুদা বলে যাবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটা গল্প

লাইন বাই লাইন। চোখ বন্ধ করে, পৃষ্ঠা খুলেই বলে দেবে রেডবুকের ছত্রিশ পৃষ্ঠা অথবা ছিয়াশি। আরে ব্যাটা কলকারখানায় কুলি-কামার হয়, এখানে রাজনৈতিক সচেতন ছেলেপুলে? নেশা কেটে যাচ্ছে, নিজে হাতে একটু ঢাল, তোর একবার দ্রুত কলকাতায় যাওয়া দরকার।

চুপ করে থাকি, কারণ যোগেনের জবাব আমার কাছে নেই, যে পড়াশুনো থাকলে কথা বলা যায়, সুযোগ পাইনি, তবে আমাদের পাড়ার অনেক ছেলে এখন জেলে। পুলিশের লাঠি খেয়েছে কেবল বাঙালি বলেই। এ দিয়ে অবশ্য প্রমাণ করা যায় না তারা কতটা জীবনানন্দের কবিতা বা ডাস ক্যাপিটালের চে গুয়েভারা বা কাস্ত্রোর। পাড়ার বিখ্যাত লেখক, শৌনক গুপ্ত-র 'চে গুয়েভারা' পড়ে মনে মনে আমিও একজন 'ভিতু-চে'। কখনও মুখে অল্প দাড়ি রেখে মাথায় টুপি পরে দেখেছি, ছবির কাছাকাছি। যোগেন বলল —জায়গাটার একটা টান আছে। আবার টাটায় এলে এখানে আনিস, ভালো, তবে লোকজন বেশ বোকা, রবীন্দ্রসঙ্গীত বোঝে না। আরে কলকাতায় চল, দেখবি খালাসিটোলায় কত সাধারণ মানুষ এমনকি পাঞ্জাবি ড্রাইভারও গলা মেলাবে। কানুদার বেশ কিছু কবিতা যোগেন্দরের মুখস্থ। ভাবতে পারিস, কতটা সংস্কৃতি সচেতন হলে এটা হয়।

যোগেন কত কথা বলে, কত মজার মজার, কবিতা, গান, ছবি, ছায়াছবি! বিজ্ঞান, ভূগোলও জানে। তাব জানার পরিধির মধ্যে বায়োলজি, বটানি, গায়নোকলজি, অ্যাস্ট্রোলজি সবই; বলল, 'অজ্ঞতাই আরাম, যত কম জানবি তত সুখের জীবন, আমার হয়েছে বিপদ। তোরাই ভালো আছিস। নেচেকুঁদে কাটিয়ে যাচ্ছিস এটাই ভালো। চালিয়ে যা গুরু। তবে মদটা তুই ভালো খাস।

একটু ঢোক গিলে, 'তুই তো কাউকেই চিনিস না, তোকে আমি কী বলব। নমিতা সাধুখাঁকে জেলে নিয়ে গিয়ে কী করেছে শুনলে তোর সব ভেতরে ঢুকে যাবে।'

সত্যি কত কম জেনে বেঁচে। এমনকি কালাঝোর, কানাইসর, রুয়ামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বারুদ-টিলা গোপনে তৈরি হয়েছে তার হদিসও জানি না। একটা টর্চের আলোয় ঘাবড়ে যাই। দুটো-চারটে জিপ গম্ভীর ঘুরে গেলে রাতের ঘুম ফট। প্রেশার হাই। অথচ যোগেন বলেছিল, জাল ঢাকা কালো, রাইফেল, ব্রেনগান, স্টেনগান-চর্চিত বড়ো ভ্যানের কথা।

সেই সমকামী ছেলেটি ঢুকেছে, হিরা সামান্য মদ খেয়ে নাচবে। এর-তার কোলে বসবে। হয়তো নতুন বাবুর সঙ্গে! ওর অঙ্গভঙ্গি, কথা বলা সহ্য হয় না। বিরক্ত, ছেলেটি বাঙালি, আরও কষ্ট পাই।

বললাম—চল, ওইদিকে সুবর্ণরেখার ধারে। যাবি?

—যেখানে বলবি।

ঠিক তখনই হিরা, এঁকেবেঁকে এসে যোগেনকে চুমু খেল।

এখানে অন্ধকারে মোম ও হ্যারিকেনের আলো। কাঠকয়লায় লিট্টি সেঁকছে রামলগন। খাপরার বিশাল ছাউনি। বাতাসও ঠিক ঢোকে না। মদ্যপ মাত্রই তাড়াতাড়ি ঘেমে ওঠে। ভেতরে ভেতরে জমে থাকা কয়লা, কার্বন ছাই হয়ে বেরয়। মানুষের জন্য মদ কত জরুরি বোঝা যেতে পারে।

আর থাকল পৃথিবীর জন্য ফুঁসে-ওঠা কিছু যুবক, যাদের কোনও ছিটেও এখানে ঢোকে না, কেননা, চিমনি, ধোঁয়া, ছাই, নাট-বোল্ট, বোনাস, ডি এ, আরও আদুরে শব্দ। রিটায়ার করলে কারখানার গেটে রঙিন হাতি সঙ্গে দুটি নাচনেওয়ালা ছেলে, হিরা, জগা। দুজনেই বাঙালি। ওরা বুকে কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ঘাঘরা-চোলি নাচে। রাস্তা কাঁপিয়ে হেসে ওঠে মানুষ। কাপড়ের স্তন ভরে যায় সেফটিপিনে আঁটা পাঁচ, দশ, কুড়ি রুপিয়ায়।

ক্লাব সুবর্ণরেখা

ভাটি থেকে সুবর্ণরেখা বড়োজোর এক পাক ন্যাশনাল লাইব্রেরি। চিমনি, ইটখোলা, পরপর হোগলা, খাপরার বাড়ি, ঘন শালবন। আগে আরও ঘন ছিল। এখান থেকে শহর মাইলটাক। এটাই শহরের শেষ। আকাশ বড়ো হয়ে নীল। তারা উঠলে সব কটা আঁকড়ি অবধি দেখা যায়। কোম্পানির চিমনি গাছের আড়ালে।

ঝিঁঝি ডাকে। একপাল শেয়াল হুক্কা দিয়ে মিলিয়ে গেল। কিছুদিন আগে এখানেই একজনকে ভাল্লুকে আঁচড়েছে। চিতি সাপের কামড়ে ফি বছর দু-একজন করে অক্কা, তারপর নদী।

পাহাড়ি সুবর্ণরেখা। বাবারা বলতেন, আমরা সুবর্ণরেখার ইলিশ খেয়েছি। আমরা আড়ালে একটু হাসতাম, বলতেন, তখন নদী গভীর ছিল। সবচেয়ে ক্ষতি করেছে কোম্পানি, লোহা ধোয়া নোংরা জল নিয়মিত যেতে যেতে এখন নদীতে আলকাতরা। ইলিশ তো দূরের কথা, বিখ্যাত চিংড়িও শেষ। মাঝে মাঝে দু-একটা রুই-কাতলা। তাদেরও পেটে কোম্পানির আলকাতরা।

—এ জায়গাটা বেশ লাগছে। চাঁদের আলোটা দারুণ।

দূরে কোথাও মাদলের শব্দ। শাল গাছ, অন্ধকার, চাঁদের আলোয় মাদল, স্বপ্নের।

তোর ভালো লাগছে, যাক! স্বস্তি পেলাম। কারণ যোগেনের রুচি খুবই উচ্চমানের। চট করে কোনও কিছু ভালো বলে ফেলার পাত্র নয়। সব কিছুই অন্য চোখে দেখতে অভ্যস্ত। কখন সামান্য একটা ভাঙাবাড়ি বা বাঁকা গাছ দেখে দাঁড়িয়ে পড়বে, বলা মুশকিল।

—দেখ্, আমার তো ভালো লাগছেই, এখানে একবার কানুদাকে আনতে হবে। কানুদা এলে জায়গাটা কাব্য হয়ে যাবে। তুই তো চাইবাসা গেছিস?

—না।

—চা-ই-বা-সা—যাসনি! কী রে! এত কাছে! কানুদা চাইবাসায় দিনের পর দিন কাটিয়ে গেছেন, আর শুধু কবিতা। চাইবাসা কবিতার জন্মভূমি. আর সেই চাইবাসা অবজ্ঞা করে বেঁচে আছিস! ভাবা যায়!

আমি গূঢ় অপরাধীর মতোই পরাজিত-আত্মা। কেন যে চাইবাসা যাওয়া হয়নি, না দেখা চাইবাসার জন্য ভেতরের বেদনা চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। সত্যিই তো কেন চাইবাসায় যইনি। স্বপ্নের চাইবাসা। ছিঃ!

—তুই গেছিস, না? আমি জানতে চাইলুম।

—দুবার, কানুদার সঙ্গে। একবার একা। আগে জানলে তোকে চাইবাসায় নিয়ে যেতাম। নাঃ, তুই আগে কলকাতায় চল। আগে তোকে ওখানে ব্যাপটাইজড্ করি, পরে জয়দেব, চাইবাসা, কঙ্কালিতলা, খোয়াই সব হবে। তোর মধ্যে জিনিস আছে। তোর হবে। এই নিয়ে কথা আছে। হঠাৎ আকাশ দেখে,—ওই দেখ মেষরাশি, ওইটা ভেড়ার ন্যাজ। দেখেছিস, পাশেই বৃশ্চিক। বৃশ্চিকের দাঁড়া ভেড়ার ন্যাজ কামড়ে ধরেছে। এটাই পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ। এরকম আজ থেকে ছ-সাতশ বছর আগে যেবার বাবর ইব্রাহিমকে হারাল, মাত্র কয়েকটা ফৌজ নিয়ে, সেবারও কাঁকড়া. ভেড়ার ন্যাজে কামড়, দেখেছিস অরাজকতা। দেখ ন্যাজে কেমন কামড়।

আমি আকাশে ভেড়া ও কাঁকড়া হাতড়াই। দেখতে পাই না। আমার তো সবই ফুলফুল কুটি কুটি তারা। যোগ কত জানে, কত জ্ঞান! ছোটো জায়গায় কুয়োর ব্যাং রয়ে গেলাম।

—তোরা এখানে আসার আগে দু দিন ডায়মন্ডহারবারে কাটাই।

—একা?

—না, সঙ্গে মনীষা। মেয়েটা ভালো কলেজ থেকে এক্সকারশন যাচ্ছি বলে কাট মারল। ভাবিস না লাম্পট্য বা কেবল যৌনতার জন্য যাওয়া। দেখ তুই। খানিকটা গাছপালার, খানিকটা নদী-নালা-সমুদ্রের, খানিকটা বাসের ধোঁয়ার, কিছু আকাশের তারা, কিছু চাইবাসা বা ঝিঙে-মুলোর, ওই হল তুই মেয়েমানুষের। যে কেবল আদিবাসী মাদল বা সাবিরের রেজালা করে গেল, সে তো ইডিয়েট। তোর অনেক কিছু আছে যা মনীষার নেই, ওকে দিতে হবে। সেই মনীষাকে দিতে হল।

—দিলি! ওর বাবা-মা খোঁজ করল না? ঝামেলা হল না!

—কেন হবে? দু-পাঁচদিন আগে থেকেই পরিবেশ রচনা। মাকে বলতে থাকল, চাই না তবু এক্সকারশনে যেতে হবেই। বাজে সব ব্যাপার। আমার একগাদা মেয়ের সঙ্গে ট্যাং-ট্যাং করে পথেঘাটে ঘুরতে ভালো লাগে না। সেই বিষ্ণুপুর না কাশীপুর, ভাঙা মন্দির দেখতে চল। মা বললেন, যা, ও সব দেখতে হয়। টাকাও

দিলেন। মনীষা আমার সঙ্গে ডায়মন্ডহারবারের ভাঙা মন্দিরে উঠল। ওকে খানিক বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলো, টেরাকোটা দিলুম। কিছু দিতে তো হবেই। কেউ কি শূন্য হাতে ফেরে, না ফেরানো যায়?

—মনীষা গেল! আমি অবাক হয়ে জ্যোৎস্না লাগা যোগের দিকে তাকিয়ে থাকি।

—কথাটা মনীষা বলে নয়। মনীষা না গেলে বিদিশা যেত। বিদিশা না গেলে প্রত্যুষা। একজন তো যেতই। কারণ আমি তো বলিপ্রদত্ত। আরে পাগলা, মনীষা কোনও ব্যাপার?

—তুমি খুব মেয়ে পটাতে পারিস, না? একটা না-পাওয়া ব্যর্থতা, না-জানা অশিক্ষা চাড় দেয়।

—এত ছোটো করে দেখলি? এটাই জায়গার কুফল। চল্, কলকাতায় চল্। তোকে মাল্টিপারপাস জীবন দেখাই। পড়ে থাকিস না, আমি মনীষাকে নিয়ে কোথাও যাইনি, মনীষাও আমাকে নেয়নি। আমরা দুজনে আলদা আলাদা নক্ষত্রমণ্ডলী। একটা মেষ, অন্যটা বৃশ্চিক। ন্যাজে কামড়, এই তো খেলা। ব্যাস সব শেষ। পৃথিবীটা কত বড়ো জানিস? সেখানে একটা মনীষা বা দুটো যোগেন, ফুঃ! মদ দে, মদ আছে? কলকাতায় চল, মনীষাকে তুই নিয়ে নিস, ও তোর মতো ফ্রেশ জিনিস পেয়ে খুশি হবে। তোর মধ্যে একটা সারল্য আছে। এটা মেয়েরা ভালোবাসে। এই তোর ঝকঝকে খাড়ার মতো যৌবন। নে মদ দে, মদ। নেশা তো যাচ্ছে।

সত্যি, দেখছি কলকাতায় যেতেই হবে। জ্যোৎস্নায় প্রতিজ্ঞা জমে ভালো, মনে মনে আকাশ, মেষ ও বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলী, অবশ্যই সুবর্ণরেখা সাক্ষী, আর পড়ে থাকব না, সেই যে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, "থাকব না আর বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে।' শনিবারের কফি হাউস, কে আটকায়, অপারেশন কফি হাউস।

ইটখোলার ঝুপড়িতে এসে গেছি, যথারীতি মাদল, খোঁনা গলায় ছেঁড়া ছেঁড়া গানের কলি। আমার ধারণা ইন্‌স্ট্যান্ট কথা বানাচ্ছে। যা মনে আছে, একবার কবে মাতলা হাতে মাতাল তাবড়োচ্ছে আর গেয়ে যাচ্ছে। একটু গলা টেনে টেনে চালিয়ে গেলেই হল। যেমন ইটভাটার ইটগুলি/হলে নাচে পিঠাগুলি/ঘর বাঁধে যামিনী মিস্তিরি/সিবমিটি দিল লাটুবাবু/বালি দিল মাঠুবাবু/ঘরে ঘরে ঘুরিছে আদুরি।' এরকম অ্যাট র‍্যান্ডাম, সঙ্গীত ম্যানুফ্যাকচারিং। একজন থামলে অন্য একটি গলা শুরু করল, "যাও না যাও না কালা/নারী ফেইলে যাও না দ্বারকা/ঘরে কোমল বাইরে কোমল/নারীর শরীব দমে কোমল/নিঠুব বিধি গড়িল অলকা।

গান শুনতে শুনতে যোগ মাদল টেনে নিল। মদের বোতল ঢালতে লাগল। পাশে বসে থাকা লোকটিকে দু বোতল আনতেও পাঠাল। মহুয়ার গন্ধ ওর ভালো লেগেছে। গান তো কথাই নেই। গলা মেলাচ্ছে—ঘরে কোমল, বাইরে কোমল, নারী শরীর দমে কোমল, বাঃ!

মাদল ফের বুড়োকে হ্যান্ডওভার করে যোগেন বলল,—একেকটা শব্দ একেকটা মুহূর্তকে রঞ্জিত করে। এখন আমায় 'কোমল' শব্দে পেয়েছে। বারবার তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে, সামনে দাঁড়ানো সেই বছর উনিশ-কুড়ির মেয়েটির মুখ মনে পড়ছে। যাকে আর কখনও দেখতে পাব না, ফরসা টলটলে মেয়েটি মাথা কামিয়ে পুজো দিতে চলেছে। মাথা কামালে যে যুবতীর রূপ ফেটে পড়ে, কোমলতর হয়ে যায়, আগে কখনও ভাবিনি। ওর নরম তুলতুলে মাথাটা একরাশ শিউলি, কোলে করতে ইচ্ছে করছিল। ওহ্ কী সেই ঐশ্বর্য!

ভোলোপচুয়াস দক্ষিণী মেয়েটি আমাকে ফোকলা করে দিয়েছিল। ওর ঈষৎ ভারী নিতম্ব হয়তো ভরতনাট্যমেরই ফলস্বরূপ এবং শরীরের কোমল বাঁক। আজ কতদিন পরে, কেন আমি ওকে পেলুম না?

যোগেন ভ্যাচ করে কেঁদে ফেলল। ও আমার বাঁ হাত মুঠো করে অনেকটা কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতে মদ খেল,—কেন ন্যাড়া মেয়েটিকে পেলুম না? ওই কোমল-ন্যাড়া আমার জীবনে শেষ কথা। আজ কতদিন পরে ওই ব্যর্থতা আমাকে খান খান করছে।

—তুই মেয়েটিকে অ্যাপ্রোচ করেছিলি?

—খেপেছিস? ওকে চিনি না। সবে মাথা কামিয়ে, ফুল হাতে, পেছনে কাঞ্জিভরম গোঁজা। গলা, কান, নাক, হাত, কোমর অলঙ্কারে সজ্জিত। আর বর্ণনা দেব?

ফের কান্না।

মদের সুখ-কান্না প্রগাঢ়। বড়োই মায়াময় এই কান্না। কাঁদতে কাঁদতে যোগেন গাইতে লাগল, ঘরে কোমল/বাইরে কোমল/নারী শরীর দমে কোমল/নিঠুর বিধি গড়িল অলকা।

সুইসাইড ইন কফিহাউস

ভাগ্যিস মহুয়ার কনসেনট্রেশন কম, অনেকটা হল, নতুবা সেই বিকেল থেকে শুরু করেছে, এতক্ষণে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারত। একটা বোতল সঙ্গে, যথেষ্ট টলতে টলতে নদীর দিকে চলল। ততক্ষণে যোগের উৎসাহ দেখে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে গানে লেগে পড়েছে। বাঁশিও বাজছে।

আমি বললুম, আমাদের শনিবারের রাতটা কি খারাপ? শুধু কফিহাউসটা পাচ্ছিস না। তা বাদে ইয়ে, আনন্দ-ফুর্তির তো অবাধ ব্যবস্থা।

—ঠিকই। কথার ফাঁকে হাঁটতে হাঁটতে, যোগ কাঁদছে। —সুবর্ণরেখা আর কদ্দূর? নদীর ধারে না বসলে হবে না। কান্না—যোগেন।

—এই তো দু কদম। আবার কান্নাকাটি! ছিচকাঁদুনে!

—তুই কি বুঝবি গাঁইয়া। তুই তো প্রিয়ব্রতকে চিনিস না। অজ্ঞতা কত সুখের। দারুণ কবিতা লিখত। কফি হাউসে সারাদিন, বেচারা আলো নেভালে তবে বাড়ি। বাড়ি ঢোকার আগে গাঁজা পার্কে আরও দু ঘণ্টা, মারাত্মক কবিতা লিখত। এক শনিবার কফি হাউসে গিয়ে দেখি পরনের ধুতি দিয়ে পাখার সঙ্গে বাঁধা, লাশ ঝুলছে। প্রিয়ব্রত আত্মহত্যা করল, ভাবতে পারিস! ও ব্যাটা আমার বন্ধু ছিল।

সে কি হাউমাউ কান্না।

—চুপ কর যোগ, দেখ হয়তো ওর কোনও দুঃখ বা অসুখ-বিসুখ—

—তুই বুঝবি না। প্রিয় আমার কতটা ছিল। সেই প্রিয়র শরীর পরনের ধুতি দিয়ে বাঁধা। এখনও বুঝিনি ও কী করে মরল। কেউ কি মেরে টাঙিয়ে দিয়েছে! আমরা যাওয়া অব্দি লাশ ঝুলেছে। চারধারে ছেলেমেয়ে গিজগিজ। অণিমা এসেছে প্রতিমের সঙ্গে, যাকে ও ভালোবাসতে চেয়েছিল, ঠাসা শনিবার। শুধু প্রিয়, প্রিয় নেই।

'প্রিয়' 'প্রিয়' করে যোগ অন্ধ হওয়ার জোগাড়।

আমরা খোয়াই টিলা পেরিয়ে নদীতে। অনেক নীচে দুধে-বেগুনি জল। রহস্যময় কালো দাগ, কোটি কোটি কালো গোখরোই জলে ঢেউ ভাঙে।

—চল ফিরি, অনেক রাত হল।

—ক'টা? কান্না থামা থমথমে গলা। সঙ্গে আনা মহুয়ার বোতলে মন।

—দশটা। দেশলাই ধরালাম।

দূরে কোম্পানির হুটার। এ শব্দটা বহুদিন ধরেই অসহ্য। বুক হিম করা, একটানা, কোটি কোটি কুকুরের রতিহীন যন্ত্রণার ভোঁ। তাই স্থানীয় লোকেরা 'ভোঁ' বলে।

—দশটায় বাড়ি ফিরবি? তুই কি ঠেলাওয়ালা? বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বি। ভোর পাঁচটায় উঠে লোটা, ময়দান, শালা!

—না, মানে, এখানে ট্রান্সপোর্ট ধর আর একটু পরে কিছুই পাবি না।

—হাঁটব। থেকে যাব। সারারাত সুবর্ণরেখায় থাকলে পুলিশে ধরবে?

—তা না, নিউমোনিয়ায় ধরবে। বজ্জাতি করিস না, চল।

—পাগল হয়েছিস। এই জল ছেড়ে! কী রূপ দেখ। এখানে কানুদাকে আনছি। ঝুড়ি ঝুড়ি গরম পদ্য। বাঁচতে শেখ, চাকর-বাকরের মতো বুজগুড়ি কী ফল। দেখ, সারারাত ধরে। কী রূপ! ওপারে যাওয়া যায় না? ওপারে পাহাড়ের গা অব্দি?

—খুবই কষ্টকর। এখন আর ভালো লাগছে না। এক ধরনের ভয়, অদৃশ্য শাসন, সমাজ আসছে। খারাপ

লাগা শুরু। ভাবছি, যোগেন শেষ অবধি আরও কিছুটা খেয়েই ফিরবে। মরতে কেন যে ওকে এনেছিলুম। ওরা যা শরীর ওকে কাঁধে ফেলে ছুটতে পারি। কোনও ব্যাপার নয়।

ঠিক তখনই একটা বড়ো দল, অনেক কামিন, গোটা কয়েক কুলি, বিপুল উচ্ছ্বাসে হাসতে হাসতে জলের দিকে। ছাদ ঢালাই-এর দলবল। ঢালাই একদিনেই করতে হয়। তাই যত রাত হোক ওরা কাজ শেষ করেই ফেরে। সেই মত কাজের শেষে শরীরের সিমেন্ট ধুতে নদীতে। নদীতে নামার আগে মহুয়া খেয়েছে। কিছু তো করবে!

—ওরা স্নান করতে যাচ্ছে, না? আমিও যাই।

—না না, তুই যাস না। ওরা জলটা চেনে। স্রোত, গভীরতা জানে। চোরাবালি, চোরা টিলা, ঘূর্ণি সব চেনে। তুই তো কখনও সুবর্ণরেখা দেখিসনি।

—গঙ্গা দেখেছি। এটা কি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর?

—তা না, এত রাতে, এটা একটু বাড়াবাড়ি।

—বাড়াবাড়ি মানে। স্নান করা বাড়াবাড়ি?

দেখলাম ভুল শব্দ প্রয়োগ হয়ে গেছে। যোগ খেপেছে। বললাম, না, গামছা-টামছা থাকলে যেতিস। ভেজা শরীর।

—কেন, জাঙিয়া পরে নামা যায় না? সেন্সার হবে? কাঁচি চালাবে? তুই জামাকাপড় ধরে পাঁচ মিনিট বসে থাক। আমি মেয়েগুলোর সঙ্গে চান কবে আসি।

—না, যাস না, প্লিজ। যাস না, তোর অচেনা জল। এত রাত। ওরা তোকে ভয পেয়ে, বিরক্ত হয়ে মারতেও পারে। যাস না যোগ।

যোগ ততক্ষণে জামাকাপড় খুলে ফেলেছে। আমি ওকে কাঁধে তুলে ছুটছি। পারলাম না। ফসকে ছুটতে ছুটতে জলে। যেখানে মেয়েরা ছাদ শেষ কবে স্নান করতে নেমেছে। অনেক যুবতী রাতের জলে, ঘরে কোমল/বাইরে কোমল/নারীর শরীর দমে কোমল/নিঠুর বিধি গড়িল অলকা। গানটা নদী অবধি যোগের সঙ্গে। আর দূরের ইটখোলায় আনতাবড়ি মাদল।

মেয়েদের অসম্ভব ফুর্তির আওয়াজ, নদীর উচ্ছ্বাস, যত জোরেই 'যোগ'-'যোগ' চিৎকার হোক না, কী যায়! তা ছাড়া ডুবো টিলা, গভীবতা, চোরাবালি, আমার কান্না শোনাব জন্য কেউ! □

মুক্তি

তৃষিত বর্মন

খোলা জানালা দিয়ে ভোরের আকাশ দেখছিল দ্বৈপায়ন। বেশ কিছুদিন থেকেই রাতে ভালো ঘুম হয় না তার। শোওয়ার অর্থ এখন শুধু বিছানায় লটকে পড়ে থাকা চোখ ওলটানো মরা পাঙাশের মতো। কারও সাহায্য ছাড়া আজ আর ভালো করে হাঁটাচলার ক্ষমতাও নেই দ্বৈপায়নের। রোজকার প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপগুলো বেডে শুয়েই সারতে হয়।

মাস সাতেক হল, জেল হাসপাতাল থেকে এই সদর হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে তাকে। দরজার বাইরে সশস্ত্র পাহারা। দ্বৈপায়নের ফেলে আসা চাঞ্চল্যকর জীবনের স্বীকৃতি। লিভারের বারোটা কবেই বেজে গেছে। ইচ্ছে হলেও প্রচণ্ড অট্টহাসি হাসতে পারে না সে। এরা বোধ হয় আজও বিশ্বাস করে, সুযোগ পেলে দ্বৈপায়ন বুঝি এখনও একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

রাতের ডিউটি শেষ। নির্জন করিডরে সিস্টারদের পায়ের শব্দ। বাইরেও দিন বদলের পালা। এ সবকিছুই রেখাপাত করে না তার অসাড় চেতনায়। নিজের ওপর নিজেরই ঘেন্না হয় আজকাল। হাসপাতালের চার দেওয়ালের মধ্যে সশস্ত্র পাহারায় একটা ব্যর্থ জীবনের বোঝা টেনে চলেছে দ্বৈপায়ন কীসের প্রত্যাশায়। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার অর্ধেন্দু সামন্ত দ্বৈপায়নের কথা বলতে গিয়ে বার বার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। বলতেন, 'শুধু কলেজিয়েট স্কুলের নয়। দ্বৈপায়ন একদিন জেলার গর্ব হয়ে উঠবে।'

স্কুল কলেজের দেওয়ালে দেওয়ালে তখন সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান। ছয়ের দশকের সেই রক্তক্ষয়ী দিনগুলো এতদিন পরেও সেলুলয়েডের ছবির মতো দ্বৈপায়নের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'—এই স্লোগান সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া থেকে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি হয়ে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার তরতাজা ছেলেগুলোর হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গেছে অব্যর্থ বুলেটের মতো। জোতদার আর মুনাফাবাজদের মারণযজ্ঞে পশ্চিম বাংলার বাতাসে তখন পোড়া বারুদের গন্ধ। দেশের খোল নল্ চেটাকে রাতারাতি আমূল বদলে দেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভীষণ সম্ভাবনাময় কিছু তরুণ তাদের জীবনটাকে বাজি রেখেছিল মৃত্যুর কাছে। সরকারিভাবে পার্টিকে 'নিষিদ্ধ' বলে ঘোষণা করা হল। মূল লক্ষ্য সর্ম্পকে কোনও কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যথার্থ ধারণার অভাব সাধারণ মানুষের কাছে 'দল'কে ক্রমে ক্রমে অপ্রিয় করে তুলল। মহাপুরুষদের মূর্তির শিরশ্ছেদ করে আদতে কোন বিপ্লব মঙ্গল ডেকে আনবে—কিংবা মহানগরীর রাস্তায় কর্তব্যরত সাধারণ পুলিশ কর্মীদের খুন করে কোন মহান বিপ্লবের বান ডাকবে দেশে, এ প্রশ্নে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠল। সরকারি শাসনযন্ত্র এ অবস্থার সুযোগ নিল পুরোমাত্রায়।

উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট হয়ে গেছে। দ্বৈপায়নের রেজাল্টে সবাই খুশি। ফাইনালে দশজনের মধ্যে ওর নাম থাকবে—এ রকম একটা ধারণা হেডমাস্টার অর্ধেন্দু সামন্ত একদিন বাড়ি বয়ে এসে জানিয়ে গেলেন মধু দত্তকে। বললেন, 'আমরা তো আছিই। নিজেও ছেলেটার ওপর একটু নজর দিন দত্ত মশাই। ছেলে আপনার ইস্পাতের টুকরো। শুধু একটু শানের প্রয়োজন।'

* * *

নার্স বেডপ্যান দিতে এসেছিল। দ্বৈপায়ন হাত নেড়ে বারণ করল। বলল, 'প্লিজ সিস্টার, আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি নিজেই যেতে পারব।'

সাত মাসে সকলের মুখই বেশ চেনা হয়ে গেছে ওর। লজ্জা, সংকোচ এই অনুভূতিগুলোর অনেক ঊর্ধ্বে সে এখন। প্রথম প্রথম খুব অস্বস্তি হত। মায়ের কথা মনে পড়ত। ওর খোলা শরীরে মা ছাড়া আর কেউ হাত দেয়নি কোনওদিন। পরে আশ্চর্য হয়ে নিজেই উপলব্ধি করেছে—একটা অচেনা মহিলার হাতের ছোঁয়া তার চব্বিশ বছরের অশক্ত, পঙ্গু শরীরে কোনও আলাদা অনুভূতি জাগায় না।

পাঁচ বাই সাত সেলের অন্ধকূপে নতুন নতুন যন্ত্রণার খেলায় 'ওরা' সব—স-অ-ব কিছু কেড়ে নিয়েছে দ্বৈপায়নের। সিস্টারের এগিয়ে দেওয়া চায়ের গ্লাসটা কাঁপা কাঁপা আঙুলে প্রথমে ডান হাতে তারপর বাঁ হাত মিলিয়ে সাপটে ধরল সে। যে পাঁচটা আঙুলে কলম ধরে একদিন কলেজিয়েট স্কুলের খাতায় প্রতিশ্রুতি রেখেছিল, সে হাতে আর কোনওদিনও কোনও বিশ্বাসের মূল আঁকড়ে ধরতে পারবে না দ্বৈপায়ন। বেঁচে থেকে এ এক দুঃসহ যন্ত্রণা।

কিন্তু সিস্টার মিনতির কী হল? মর্নিং শিফ্‌ট ডিউটি হওয়ার পর থেকে প্রায় মাস তিনেক হল সে দ্বৈপায়নের দেখাশোনা করছে। পেশেন্ট সরকারি বন্দি জেনেও কর্তব্য পালনের ফাঁকে ফাঁকে একটা পুরোনো ক্ষত থেকে ভেতরে নিঃশব্দে রক্তক্ষরণ হয়—নিশ্চিত টের পায় মিনতি।

পরিচর্যার সময় নিয়ম নীতির ফাঁক গলে তার স্নেহমাখা হাত দুটো বেশিক্ষণ দ্বৈপায়নের গায়ে মাথায় খেলা করে। অবিন্যস্ত চুলে চিরুনি চালাতে গিয়ে সাত বছর আগের একটা কিশোর মুখ মিনতিকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে।

আগে থাকতেই খবর ছিল ওদের কাছে। কলকাতা-বহরমপুরগামী বাস থেকে ভবসন্ধেবেলা বেথুয়াডহরি স্টপেজে নামতেই পুলিশ ওকে ঘিরে ফেলে। কৃষ্ণনগর থেকে উঠে যে ফকির এতক্ষণ ওর পাশের সিটে বসে এল সে যে পুলিশের একজন ঝানু গোয়েন্দা, সেটা মৃদুল নেমে টের পেল। একদৌড়ে রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছিল ও। কিন্তু ছটা গুলি বই তো নয়!

পুলিশ লাশ ছাড়েনি। শুধু একবার দেখতে দিয়েছিল বাবা আর দিদিকে আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে। মিনতি অবাক হয়ে দেখেছিল। পুলিশের যে গুলিটা মৃদুলের আঠারো বছরের তরতাজা ফুসফুসটাকে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেটা যেন ওর গত বছর তৈরি করে দেওয়া সাদা সোয়েটারের বুকে লাল গোলাপ হয়ে ফুটে আছে।

কাপে ওষুধ ঢেলে এগিয়ে ধরল মিনতি। বলল, 'টেম্পারেচারটা আজ আর নেই। দশটা নাগাদ ডক্টর গুপ্ত রাউন্ডে আসবেন। ইউরিনের কম্‌প্লেনটার কথা ওঁকে বলবেন কিন্তু।'

হ্যাঁ না কিছুই বলল না দ্বৈপায়ন। নিজের সম্পর্কে আলাদা করে কিছু ভাবতে ভালো লাগে না। মিনতি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গল্পের খুদে শ্রোতারা সব কোথায় গেল? আজ এখনও আসেনি দেখছি?'

মিনতির কথা শুনে দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে চোখদুটো বারেকের জন্য জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, 'হাসপাতালের দমবন্ধ পরিবেশ। দরজার বাইরে পাহারা। ওদের সঙ্গে কথা বলে মনটা তবু হালকা হয়।' বিভিন্ন কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছ-সাতটা ছেলে পুলিশ-পাহারা উপেক্ষা করে রোজই তাদের প্রিয় আঙ্কেলের কাছে আসে গল্প শুনতে। বিছানার চারপাশে দ্বৈপায়নকে ওরা ঘিরে বসে। আঙ্কেলের শীর্ণ কাঁপা কাঁপা হাতের ওপর নিঃসংকোচে হাত রাখে কৌশিক, সজল, শঙ্কর, বাপন-রা। দ্বৈপায়ন যেন নতুন করে বেঁচে ওঠে এই প্রজন্মের মধ্যে। স্বপ্ন দেখতে লোভ হয় তার।

*　　　*　　　*

মধু দত্ত ঠিকাদার মানুষ। পাঁচ সাত বছরের সিভিল কন্ট্রাক্টরি কারবারে বারোটা বালিতে একটা সিমেন্ট মিশিয়ে সবে একটু সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছেন। বার্জটাউনে পাওয়ার হাউসের মুখোমুখি চার কাঠা জমি ঘিরে নতুন দোতলা উঠেছে। এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ঘোষের হাঁ জলহস্তার মতো। বহুত ধানাই পানাই করে গতকালই ওঁর রবীন্দ্র নগরের বাড়িতে বসে ডিলটা' কমপ্লিট হল। এখন মায়ের ইচ্ছেয় চন্দ্রকোনা টাউনের তিন লাখ টাকার কাজটা মধু দত্তর হাতের মুঠোয়। হেডমাস্টার অর্ধেন্দু সামন্তর কথাগুলো তাই তাঁর কান ছুঁয়ে শুধু বেরিয়ে গেল।

মাস দুয়েক পরে ফাইনাল পরীক্ষা। অথচ বেশ কিছুদিন থেকেই নিজের মধ্যে একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছিল দ্বৈপায়ন। রোজকার পড়াশোনা, প্রাইভেট টিউটরের কাছে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে ওঠা-বসার এই নিস্তরঙ্গ ঢেউয়ের নীচে একটা প্রচণ্ড চোরাস্রোতের টান অনুভব করেছিল সে।

রাত আটটায় ইন্দার জমজমাট গোলবাজারে নিজের গদিতে পাঁচ নম্বরি খেরো খাতার ওপর ঝুঁকে কী যেন লিখছিল জানকীদাস। নেপালার এক কোপে পাগড়ি সমেত মুণ্ডটা নেমে এল খাতার পাতায়। পুলিশের চেষ্টা সত্ত্বেও আততায়ীরা ধরা না পড়ায় সে কেন ভেতরে ভেতরে স্বস্তিবোধ করছে—হাজার চেষ্টায় এরও কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না দ্বৈপায়ন। বইয়ের পাতার বাইরে এই ধরনের হাজারও প্রশ্ন ওর মনের অন্ধকারে জোনাকির মতো দাপাদাপি করে বেড়ায়।

বিকেলে সাইকেল নিয়ে আবাসের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিল তথাগত আর দ্বৈপায়ন। সারাদিন প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে আবাসের বিশাল সিড ফার্মটা দম নিচ্ছিল দিগন্তের কোলে হুমড়ি খেয়ে। রক্তলাল সূর্যটা এয়োতির টিপের মতো জ্বলজ্বল করছিল উইন্ড মিলের পেছনে।

সব প্রশ্নের জবাব তথাগতর কাছে আছে কি না না জেনেই দ্বৈপায়ন কৌতূহল প্রকাশ করছিল। জিজ্ঞেস করছিল, 'শ্রেণী শত্রু কাদের বলে রে? প্রতিক্রিয়াশীল আসলে কারা? পুলিশ মেরে, মূর্তি ভেঙে শোষণবাদ কীভাবে দূর হবে? পার্টির নেতা কে?' তথাগত কি তাঁকে কোনওদিন দেখেছে? চিন্তাভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল মনের মধ্যে। তথাগতকে নয়—দ্বৈপায়ন বোধ করি নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল। সাইকেল চালাতে চালাতে মিটিমিটি হাসছিল তথাগত। আচমকা জিজ্ঞেস করল—কর্ণগড় যাবি?

বিশাল মন্দিরের ভাঙা চাতাল পার হয়ে ওরা যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা মন্দিরের পেছন দিক। চারদিকে কুলকাঁটা, বনতুলসী আর আশশেওড়ার ঝোপ। এ দিকে বড়ো একটা কেউ আসে না। মন্দিরের এ অংশটা সমতল থেকে অনেকটা উঁচুতে। দূরে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আদিবাসীদের কুঁড়ের চালে ধোঁয়ার মেঘ। ঝোপের কোল ঘেঁষে ভাঙাচোরা একটা ইঁদারা। পাশ দিয়ে নড়বড়ো একটা লোহার সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। কাছে না এলে বোঝার কোনও উপায় নেই। নামতে নামতে তথাগত বলল—একটু সাবধানে আসিস।'

গর্ভগৃহের মেঝেয় মাদুর পাতা। বিকেল গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চারটে মোমবাতি ভাঙা থামের মাথায় চারকোণে বসানো। জনা দশেক ছেলের ভৌতিক ছায়া দেওয়ালে কাঁপছে। সকলেই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত। ওরা বসতে না বসতেই ভাঙা সিঁড়িতে কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকটি ঢুকতেই তথাগত দ্বৈপায়নকে দেখিয়ে বলল, 'কালীদা, এর কথাই আপনাকে বলেছিলুম।'

ফেরার পথে সাইকেলের প্যাডেলে ভর করে নয়, দ্বৈপায়ন যেন পাখির মতো উড়ে চলল। ঘণ্টাখানেকের কথাবার্তায় কালীদা ওর মনের কুয়াশাটা যেন এক ঝট্‌কায় ছিঁড়ে ফেললেন। বাবা মধু দত্ত নয়। কালীদাই খোঁজ পেয়েছিলেন ইস্পাতের। শান পড়তেই সেটা ঝকঝকে হয়ে উঠল।

খুব একটা দরকার না পড়লে, বাড়ির বাইরে বের হন না গায়ত্রী। বাইরের জগৎ যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে—চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেও সেটা নিশ্চিত টের পাচ্ছিলেন তিনি। এখন ছেলের যে সব বন্ধু আসে, তাদের সবাইকে গায়ত্রী চেনেন না। ওরা সোজা উঠে যায় দোতলায় দ্বৈপায়নের ঘরে। দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা বলে চাপা গলায়।

আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, খুব তাড়াতাড়িই সেটা টের পাওয়া গেল একদিন রাতে মধু দত্ত বাড়ি ফেরার পর। ঢুকেই গায়ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাপটু কোথায়? ওকে ডাকো শিগগির।' জামা, ব্যাগ গোছাতে গোছাতে গায়ত্রী বললেন, 'ও তো ফেরেনি এখনও।'

—এখনও ফেরেনি মানে? রাত নটা বাজে। পড়ুয়া ছেলে এত রাত অব্দি কী করে বাইরে? সারাদিন বাড়ি থাক, ছেলে কী করছে না করছে খোঁজ রাখতে পার না?

স্বামীকে বিলক্ষণ ভয় করে চলেন গায়ত্রী। রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই ভয়ে ভয়ে বললেন, 'যাবে আর কোথায়? মাস্টারের কাছে পড়তে-টড়তে গেছে নিশ্চয়ই। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি চা

চাপাচ্ছি।' স্ত্রীর উদাসীনতায় গায়ে জ্বালা ধরে গেল মধু দত্তের। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'পড়তে গেছে না আমার পিণ্ডি চটকাতে গেছে। হাতে এবার হাতকড়া পড়বে, এই বলে দিলুম।' চলে যাচ্ছিলেন গায়ত্রী। মধু দত্তর শেষ কথাটা শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন, কী করেছে বাপটু?' ধপ করে সোফার ওপর বসে পড়লেন মধু দত্ত। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসে গলায় বললেন, 'পড়াশোনা লাটে তুলে তোমার ছেলে বিপ্লবী হয়েছে। গান্ধী, সুভাষ বোসের স্বাধীনতা ওদের পছন্দ নয়। তাই দেশের ল্যাজামুড়ো ওরা বদলে দেবে।'

হাঁ হয়ে স্বামীর কথা শুনছিলেন গায়ত্রী। বললেন, 'এত কথা তুমি কোত্থেকে জানলে? লুঙ্গিতে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে মধু দত্ত বললেন—"ডি আই বি অফিসের অরুণবাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন, 'এ সব কথা টপ সিক্রেট। বাইরের কারও জানার কথা নয়। আপনি আমার বিশেষ পরিচিত বলেই বলছি। সরকারি ফাইলে আপনার ছেলের নাম উঠেছে। ইদানীং ও কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে—সব কিন্তু স্পেশাল ব্রাঞ্চের নখদর্পণে। এখনও সতর্ক হোন। নইলে এরপর কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না।' হতবাক গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে মধু দত্ত বললেন—'এবার কী হবে বুঝতে পারছ? একটা সরকারি কাজও আমি পাব না। ছেলের জন্যে আমাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেবে গভর্নমেন্ট।'

দ্বৈপায়ন ফিরল রাত সাড়ে দশটায়। ভেতরে ভেতরে ও তৈরিই ছিল। বাবাকে বেশি কিছু বলার সুযোগই দিল না। মধু দত্তর চণ্ডালের মতো মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে খুব ঠান্ডা এবং স্পষ্ট গলায় সে বলল, "পাঁচ বছর আগেও তুমি কেরানিটোলার একটা বাড়িতে একশো টাকার ভাড়াটে ছিলে। আজ বার্জটাউনের মতো জায়গায় চার কাঠা জমির ওপর তোমার দোতলা বাড়ি। এটা যে সোজা পথে হয়নি, তা তুমি নিজেও জানো। বুকে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের ব্যাজ লাগিয়ে, দেশের হাজার হাজার নিরন্ন মানুষকে বঞ্চিত করে যারা 'স্বাধীনতা' নামের সোনার পাথরবাটিটা দু-হাতে চাটছে—তুমিও তো তাদেরই একজন।"

রাগে কাঁপছিলেন মধু দত্ত। তার চেনা, শান্তশিষ্ট বাপটুকে ভীষণ অচেনা লাগছিল। হিতাহিত না ভেবেই বললেন, 'আমার বাড়িতে থাকতে গেলে ও সব চলবে না।' বাবার রাগ দেখে হাসল দ্বৈপায়ন। বলল, 'তুমি শুধু আমার বাবা বলে...।' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মধু দত্ত, 'কী হল? থামলি কেন? বল।'

—না, থাক।

এ ঘটনার বছর চারেক পরে উত্তরবঙ্গের এক চা বাগানে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে ধরা পড়ার পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রথম এবং শেষবারের মতো ছেলের সঙ্গে দেখা হল মধু দত্তর। সে দিন একটা কথাই শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, দ্বৈপায়ন 'মা কেমন আছে '

গত বছর গায়ত্রী মারা গেছেন শুনে একপলক শুধু বাবার দিকে তাকিয়েছিল দ্বৈপায়ন। তারপর ভিজিটিং রুম ছেড়ে সোজা হাঁটতে শুরু করেছিল সেলের দিকে। নিজের ভেতরে কুঁকড়ে গিয়ে মধু দত্ত অবাক হয়ে দেখেছিলেন, চার বছর আগের সেই চোখের আগুন বাপটুর এতটুকুও নেভেনি।

* * *

চৈত্র শেষ হতে চলল। বাইরে জানালার ফ্রেমে আঁটা নাম না জানা গাছটায় কচি কচি পাতার আশ্বাস। বিছানায় শুয়ে দ্বৈপায়ন সে দিকেই তাকিয়েছিল। দরজার বাইরে পায়ের শব্দ। ঘুরে তাকাতেই দেখল, সিস্টার মিনতি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকছে। বুকের ওপর খোলা বইটা সরিয়ে দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার! এত খুশি যে হঠাৎ!'

কাছে এগিয়ে এল মিনতি। বলল, 'খুশি হব না! এই মাত্র অফিস থেকে শুনে এলুম কাল 'ওরা' আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে। বরাবরের জন্যে। কাল থেকে আপনি স্বাধীন, চুপচাপ সিস্টারের কথাগুলো শুনছিল দ্বৈপায়ন। ওর কোনও ভাবান্তর না দেখে মিনতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হল আপনার, আনন্দ হচ্ছে না? ভালো লাগছে না এতদিন পর ছুটি পেয়ে?'

দ্বৈপায়ন ভাবছিল অন্য কথা। কাল সকাল হলে এই হাসপাতাল চত্বরের বাইরে যে পৃথিবীটা তার মুক্তির

জন্য অপেক্ষা করে আছে, সেখানে তার জায়গা কোথায়? চব্বিশ বছরের এই পঙ্গু, অশক্ত শরীরটা ব্যস্ত জগতের কার কোন কাজে লাগবে? মেদিনীপুরে বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। খোঁজাখুঁজি করলে দলের পুরোনো দু-চারজনের দেখা হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু না। ব্যর্থ দ্বৈপায়নের হাতের কাছে আঁকড়ে ধরার কিছুই নেই। একমাত্র সিস্টার মিনতির উপহার দেওয়া বেতের লাঠিটা ছাড়া। হাসপাতাল ছেড়ে কাল চলে যাবে দ্বৈপায়ন। গোছগাছের কিছু নেই। সিস্টার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে বাইরে ছড়ানো। দ্বৈপায়ন জানতে পারল না, জীবনের একটা মধুর সম্পর্কের ছবি সেখানে চোখের জলে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

হই হই করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল কৌশিক, সজল, বাপন, ঝিমি আর গণেশ। দ্বৈপায়নের প্রতিদিনের সঙ্গী, ওর গল্পের খুদে শ্রোতার দল। লাফ দিয়ে উঠে বসল সব ওর বিছানার চারপাশে। কৌশিক বলল, 'আঙ্কেল, এখন তো তোমার দরজায় পাহারা নেই। তুমি আজ আমাদের ঘরে চলো। ঝিমি আবদার ধরল, 'হ্যাঁ আঙ্কেল, রোজ তো আমরা তোমার এখানে এসে গল্প শুনি। আজ তুমি আমাদের ঘরে গিয়ে গল্প বলবে চলো।' দ্বৈপায়ন কী বলবে ভেবে পেল না। শেষ বিকেলের মরা আলোয় হাসপাতালের প্রায়ান্ধকার ঘরে সে যেন আগামিকালের ঝলমলে সকালকে স্পষ্ট দেখতে পেল। তার অশক্ত, শুকিয়ে আসা শরীরের রোগজর্জর বুকের ভেতর এত গভীর একটা আবেগের নদী যে লুকিয়েছিল এতকাল, সে কথা দ্বৈপায়ন নিজেই জানত না। □

হাবা

একলব্য ঘোষ

এইভাবে সকাল হয়। চৈত্রের সকাল গতদিনের বৃষ্টিতে কিছুটা হিমেল এবং সরসও। উঠোনের জামটা প্রচুর পাতা ঝরিয়েছে কচি পাতা ফোটানোর উচ্ছ্বাসে। মসমসে আওয়াজ ওঠে পা চলার পথে। সূর্য ওঠার আগে পুবদিক স্তব্ধ লালচে এবং বাতাস ঝিরঝিরে। একটা কাক বিশ্রীভাবে ডাকছে, হেতুবিহীন কিংবা কোনও মঙ্গল অমঙ্গল চিহ্নে।

চালের বাতা থেকে জালগাছটা পাড়ল এবং হাঁটুর উপর ছড়াল পর্যবেক্ষণের জন্য। তার ফলে একটা চিড়চিড়ে আওয়াজ উঠল লোহার কাঠিগুলোর চালাচালিতে। বেশ ক জায়গায় ছেঁড়া, সারানো দরকার। কিন্তু হয়ে উঠছে না। 'শালা সুতোর যা দাম! এ দিকি খালবিল খাঁ খাঁ, মাছ তো দূরির কতা গেঁড়ি গুগ্‌লি মেলাও ভার!' মনে মনে বিড়বিড়াল। 'মরুগ্ গে।' বলে ছড়াৎ করে ফেলল কাঁধের উপর। দেওয়ালে টানানো খারাটা কোমরে বাঁধল এবং কানে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটায় আগুন দিল। আপাতত নতুন বিড়ি ধরাতে সাহস নেই, তিনটেয় সারাদিন চালাতে হবে, এই ভেবে সংযমী হতে হল। উঠোনে পা দিয়ে একবার তেরচাভাবে ঘরের চালের উপর তাকাল। বৃষ্টিতে আর বাতাসে পচা খড়গুলো এলোমেলো হয়ে আছে বাউন্ডুলে মাথার মতো। গত সনেই খড় চাপানো উচিত ছিল। একটু থামল. কী যেন ভাববে, কিন্তু ভাবা হল না। আস্তে করে পা চালাতেই মরা জামপাতায় আওয়াজও উঠল। জামগাছটা পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় আসতেই সকালের ফ্যাকাশে আলোয় তাকে পুরোপুরি দেখা গেল। গায়ে রং—না রং বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু না—খড়ি ওঠা ধূসরতা মাত্র, চৈত্রের ফাটা এঁটেল মাটির মতো। মাথায় মাঝারি, চুল ছোটো ছোটো এবং পাতলা, মুখের উপর খাপছাড়া ছাড়া বেশ ক দিনের অযত্নের দাড়ি-গোঁফ, চিবুকের কাছে যার ঘনত্ব বেশি। নাকের পাটা ফাঁপা, হলদে দাঁত অল্প বেরুনো। কণ্ঠার হাড় হাঁ করা, বুকে নির্ভেজাল পেশির টান, কবজি এবং হাতের মুঠোয় কাঠিন্য। নাভি সমেত পেট চেতানো, কোমরে সুতোয় একটা জালের কাঠি বাঁধা। ছোটো কাপড় মালকোঁচা মেরে পরা, যাতে পশ্চাদদেশ আবরণহীন। দেহের তুলনায় পায়ের গড়ন খানিক হালকা। পায়ের পাতা একটু ছড়ানো এবং নখগুলো হতচ্ছাড়া ও হলদে।

এবার সে চলার কদম বাড়াল এবং কয়েকটা আনাচ কানাচ পেরিয়ে চষা জমির উপর এসে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ সে চমকাল এবং পেছন ফিরে তাকাল। তার মনে হল কে যেন ডাকছে।

তার নাম হাবা। মনে হল কে যেন তাকে হাবা বলে ডাকল। কিন্তু না, সে নিশ্চিন্ত দূরের কোনও গোরুর ডাক সম্ভবত।

বস্তুত তার নাম কার্তিক। কিন্তু সে হাবা কার্তিক—কারণ তার বুদ্ধি। কৈশোরে এই ডাকে অর্থাৎ 'হাবা কার্তিক'-এ সে খেপত এবং ইট-পাটকেলও ছুড়ত খেপার মাথায়। শেষটায় কার্তিকও বাদ পড়ে গেল, শুধু—হাবা। আর সময়ের বয়সে এমনও হল যে তার সব সয়ে গেল। সে হাবা হয়ে গেল, তার মায়ের ডাকে অবধি। আজ সে হাবা—সবার ডাকে, একমাত্র বউ ছাড়া, কারণ সরল, স্বামীর নাম নেহাত ডাকতে নেই, তাই।

সে কিন্তু তার এই নাম বিবর্তন নিয়ে কোনও দিন ভাবতে বসেনি। আগে তার মাথায় রক্ত চড়ত এখন চড়ে না, ব্যাস ওইটুকু। এর বেশি তলাবার সামর্থ্য তার নেই। আর সেই জন্যেই সে প্রকৃত হাবা। আসলে সে যদি কোনও দিন চিন্তার সামর্থ্য পায় কিংবা তার জন্যে যদি কেউ ভাবনা করে তবে এটাই পরিষ্কার—তার কোনও জালে প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই, সাংসারিক প্রক্ষেপে যা শুধু 'বুদ্ধি' বলে বিবেচ্য।

তার কৈশোরের প্রমাণ—মা বললে, 'হাবা এই শাক ক'টা নে যা বাজারে, দু'পয়সা আঁটির কম দিবিনে, বুঝলি! দশ আঁটি আচে—কুড়ি পয়সা। বেচে আট পয়সার তেল, আর চার পয়সার কেরাচিন আনবি, বাকি পয়সা ফেরত।' সারা দিন বাদে হাবা বাড়ি ফিরল। কিন্তু হাবার কাছে না পয়সা না শাক না তেল। হাবার ভাষায় ব্যাপার এইরকম, 'এক ফড়ে নাকি এই আসতিচি বলে শাক কটা নে উধাও।'

কিন্তু হাবা কাজের। যদি হাবাকে বল, 'যা দিনি আমার এই গোরু কটারে মাটতে চরিয়ে আন দিনি।' হাবা সারাদিন গোরু চরিয়ে মাঠ থেকে ফিরবে, সব কটা গোরু গুনে গুনে ঘরে তুলে দেবে, কোনও গরমিল নেই। হাবাকে যদি বল, 'হাবা হাটে যাচ্ছিস, আমার এই বোঝাটা খানিক বয়ে দিবি।' খানিক নয়, হাবা পুরোটাই বয়ে দেবে।

এ সব অতীত। এর জন্যে হাজামজা বাপ মরা এক ছেলে হয়েও হাবা দিনরাত্তির মার কাছে গালমন্দ শুনেছে, মারধর খেয়েছে। 'ছেলে আমার হল কী! এট্টা কাজের বেলা নেই শুদু পরের বেগার খাটা!'

বর্তমানে মা নেই—বউ। আজ তাই এই টোপ ভোরে উঠে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে। বউকে ডাকার সাহস করেনি। কারণ বউ যদি জানতে পারে সাতসকালে উঠে হাবা জাল হাতে করে মাছ ধরতে যাচ্ছে তা হলে চেঁচিয়ে কুরুক্ষেত্র করবে। কিন্তু এই কথাটা, অর্থাৎ, —সে বউকে ভয় করে, এই কথাটা মাথায় আসতেই তার পৌরুষ ঘা খেল। 'কী, সে না মরদ! ওরকম মাগির—' অথচ সে জানে তার বউ তাকে শাসন করে, বুদ্ধি জোগায় এবং হ্যাঁ, ভালোও বাসে। 'মাগিটা এমন করে!' হাবার মনটা মোচড় খেল।

কিন্তু আজ তাকে ফাঁকায় ফাঁকায় থাকতেই হবে, কারণ আজ—'কিন্তু কিসির ভয়! ঠিকই তো, ঠিক করেচে, হ্যাঁ তার বুকের পাটা আচে।'

হাবা একটু থমকে দাঁড়াল, পায়ের কাছে দুটো কাঁচা আম পড়ে! তুলে নিয়ে এক কামড় বসাল। পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও সকালবেলায় বাসী মুখে টকের ধাক্কায় তার শরীর কুঁকড়ে গেল। কিন্তু ও নাছোড়। 'শালো তুমি যেতই টক হও না কেন, হাবারে হার মানাতি পারবে না।' এবং জিবের ডগায় টক টক আওয়াজ করতে করতে উঁচু বাঁধের উপর উঠতে লাগল।

বাঁধের উপর অবিন্যস্ত বাবলা আর আকন্দ গাছের ঝোপ, মাঝে-মধ্যে দু-একটা মাথাউঁচু তাল-খেজুর। ঝোপের মধ্যে এক ঝাঁক গাঙ শালিক কিচিরমিচির করছিল, ও একটা ঢিল তুলে মারতেই এক ঝলক আওয়াজ তুলে শূন্যে মিলিয়ে গেল। হাবার মনটা কীরকম খুশি খুশি হয়ে উঠল, সে অনুচ্চে বলে উঠলে, 'শালো!'

তখন দূরে পুবালি গাঁয়ের মাথায় সূর্যের লাল আরও গাঢ় হয়েছে। বাঁধের মাথায় উঠে জালগাছটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ভোরের জনহীনশূন্যতায় তাকাল সে। এবং কতগুলো বার বার শোনা কথা তার মনের মধ্যে নিজের মতো করে মনে হল। 'তা হল আমরাই রাজা। তাই বলি, এত ধান চাল, এত সামগ্গিরি যায় কোতায়! এবার শালা হারামির পো বোজ।' তাব খুব খানিক হি-হি করে হাসতে ইচ্ছে হল। এবং সে জোর করে সে-ইচ্ছে দমন করল না। খুব খানিক হাসল। 'বলি, আমি এখন যা ইচ্ছে করব, হাসব, হাততালি দেব, ফুর্তি করব, কেউ তো নেই যে দ্যাখবে, পাগল ভাববে।'

এবার সে নিচু হয়ে জালগাছটা খুলল এবং দড়ির ফাঁসটা কেড়ে আঙুলে গলাল। নদীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে উঠল, 'চোত মাসে নদী মরতি মরতি, এক্কেবারে তলায় নেবে গেচে। তবে আদ কোশ খানেক নাবালে যাতি পারলি জল মেলবে। উ-দিকিই যাব। ....মাচ না হল তো বয়েই গেল, শুদু খানিক সময় কাটানো নে কতা। তবে অবিশ্যি চুনো চিংড়ি দুটো হলি.........মাগীটা মাচ পালি আর—বলি আর দোষ দোব কারে!'

একটা চিল 'ট্যাঁ' করে আওয়াজ দিয়ে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

'শালো তুমি এয়েচো! তবে তো টাইম ভালো, শালার মাচ্ হলিও হতি পারে। কতায় বলে চিল ডাকলি মাচ হয়।'

এবার ও জালটাকে খেলিয়ে ধরল হাতে এবং ঝপাং করে ফেলল মাঝ বরাবর। দড়ি আলগা করে খানিক সময় দিল ভালো করে তলাবার। তারপর টানতে লাগল আস্তে আস্তে পাকা হাতে। ঘোলা জল স্রোতের টানে দু পাশে বয়ে চলল। 'নাঃ, শালোর কিচুই পড়িনি!' জাল গুটিয়ে এনে দুবার আছড়াল কাদামাটি ধোয়ার

জন্যে, তারপর ডাঙায় তুলে মেলিয়ে ধরল। একটা ছোটো চেলা কেবল চিকচিক করছে ফাঁস গলে। সেটা খুলে নিয়ে তালগাছের মাথায় বসা চিলটার দিকে ছুড়ে দিল বলল, 'নে শালো, বউনিটা তুই-ই খা।' ছোঁ মেরে মাছটা নিয়ে শূন্যে চক্কর খেতে লাগল চিলটা। পরের খেপ ফেলার জন্যে কনুইতে বাঁধাতেই একটা গানের সুর ভেসে এল ওর কানে। ও চমকাল, ভয় পেল। 'কেউ রেডিও নে আসতেচে!' কিন্তু ও চালাক হল, স্বাভাবিক হল এবং ঝপাং করে পরের খেপ ফেলল। দড়ি আলগা করে পেছন ফিরে তাকাল। প্রথমে দুটো গোরু, তারপর কালো মাথা, তারপর মানুষ। আমিরুদ্দিনের ছেলে নুরুল। তার সমবয়সি। হাল লাঙল নিয়ে মাঠে চলেছে। হাতে রেডিও। সোনালি রঙের বাহারের উপর সকালের রোদ্দুর চিকচিকিয়ে উঠছে।

—কেডা? হাবা না! বলি এত সক্কালে জাল নে নদীতি! হল কিচু?

—সবে তো দু খেপ, একনো খারা আঁশ করতি পারিনি।

—নদীতি কি আর কিচু আচে!

—তা তো বুজতি পারতিচি। তবু—বউ বললে, ঘরে চাড্ডি চাল আচে, যদি দুটো চুনো চানা—'

জোয়ালটা বাঁধের উপর রেখে রেডিও হাতে নুরুল নেমে এল জলের ধারে। উঁকি মারল কোমরের খারায়।

—বললাম না, একনও আঁশ করতি পারিনি।

আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠানে তখন মীরার ভজনের সুর।

—রেডিওটা কবে কিনলে? হাবা জলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

—কেন, দেকনি? অনেক দিন হল তো! গেল বারের পাটের টাকায়।

—আমারও বড্ড রেডিওর সক। তবে গরিবির—

—যা বলেচ! তবে পাটের টাকায় কিনিচি. আবার পাট বুনতি বেচতি হবে। যারে বলে চাষার মরণ!

—যা বলেচ। বলে হ্যা হ্যা হয়ে হেসে ওঠে হাবা।

—তারপর কালকের খবর শুনেচ তো?

কোন খবরের কথা বলছে নুরুল, সহজেই বুঝতে পারে হাবা। একটু ভাবে এবং চালাক হয়। 'হ্যাঁ কেডা না আর শুনেচে।'

—পুলুশ এইলো. বাতাসীর পাঁচজনারে ধরেচে, সন্দ করচে ওরাই নাকি! সেই জমিনে গন্ডগোল।

—তোমার কী মনে হয়? হাবা নুরুলকে যাচাই করে।

চারপাশ তাকায় এবার নুরুল, তারপর গলা নামায়, 'আমার কিন্তু মন নেচ্চে অন্য। এ সেই—' বলে চোখের মণি ঘোরায়। 'কেন জানো? এট্টা টাকায় হাত দেয়নি, গেঁজেয় পেরায় পাঁচ-সাতশ টাকা ছেল।'

—আমারও মন নেয় তাই।' কথাটা বলতে গিয়ে হাবার ভেতরটা উগরে আসে। কিন্তু সে এখন চালাক, মুখে কুলুপ আঁটে। হাবা আবার খেলায় নুরুলকে, কারণ তাই নির্দেশ। 'ভালই করেচে, তাই না! শালো বড্ড বাড় বেড়িল!'

—তা যা বলেচ। পাঁচ-সাতখানা গাঁর মদ্দি খুব কম লোক ছেল যার গায় শালো হাত না দেচে। তবে কি জানো—একেবারে মারাটা—ধম্ম বলে এট্টা জিনিস একনো—'

—তা হয়তো ঠিক, তবে জানো কি—ও রকম লোকের—এই গত হাটেই সাতগাঁর ফকিরুদ্দিনিরে কী অপমানটাই না করলে, বলে টাকা না থাকে তো বউ দেবা ঘরে। তোমরা মোচনমান, তোমরা জানো ঘরের বিবি তুলি কতা বল্লি পেরানডায় কি হয়।' মুখ খোলে হাবা।

—তবে হ্যাঁ ওগার মুরোদ বলতি হবে, এক কোপে ধড় মুন্ডু আলাদা। শালো, রাতি দেকতি গিইলাম, খানায় পড়ে আচে, কেডা বলবে এই সেই লোক।

—এইবার দেক না অন্য সব বাছাধনেরা ন্যাজ গুটিয়ে পোড়ার মদ্দি যে যাবে।

আচ্ছা, হাবা এট্টা কতা—ছোঁড়াগুলো গুজুর গুজুর করে যা বলে, তা কি সত্যি। আমার তো মন নেয় গরিবির কিচু হবার না। দেকলাম তো কত—গত সনের আগের সনে—দেকেচ তো কত কিচু হল, কত ধন উঠল, কিন্তু কোতার কী? সব ফুস। শালা ভদ্দরলোকেরে বিশ্বেস নেই।'

হাবার বুকের মধ্যেও গুমরে ওঠে। হাতের জালের দড়ি শিথিল হয়ে যায়। 'বলেচ মিয়া ঠিকই ছোঁড়াগুলোও ওই কতা বলে। বলে, নিজির আখের নিজিরা গোচাও পিত্যেশ করো নাকো কার।' আর তাই তো........কিন্তু এর পরের কথাগুলো হাবা আর চেঁচিয়ে বলতে পারে না। ঠিকই করেছে হাবা, মরণই এর শাস্তি। এক দুর্ধর্ষ আবেগ মাথা কোটে হাবার চওড়া বুকের মধ্যে। সেও প্রথমে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু পরে—। সে নিজের সম্বন্ধে এটুকু আন্দাজ করতে পারে সে বোকা, লোকে তাকে ঠকায়। তাই সে সদাই ভয়ে ভয়ে থাকে। এই বুঝি তাকে কেউ ঠকালে! কিন্তু হাবা ছেলেগুলোর চাউনিতে কী যেন দেখে, আর বুঝে ফেলে অনেক কিছু। না, ভয় বোধ হয় মিছে। কারণ হাবা এক বিছানায় শুয়েছে তাদের সঙ্গে বুকে বুক ঠেকিয়ে, মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে নিশ্বাসের শব্দ শুনেছে, অতর্কিতে মনে হয়েছে অন্য আর এক 'হাবা'র নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। এবং কেন যেন তার এক প্রত্যয় মাথাচাড়া দিয়েছে, এক হাবা অন্য হাবাকে ঠকাতে পারে না।

হাবা নিজেকে আবার ফিরিয়ে আনে এবং দড়ি টেনে জাল তোলে। তারপর নুরুলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তা, আর পাঁচজনে কে কি বলতেচে?'

—নানা মুনির নানা মত। কেউ ভালো, কেউ মন্দ। দুটো মাগি তো লাশ দেকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—হারামজাদিদের সোহাগের ভাতার ছেল বোধ হয়।

হি হি করে দাঁত বার করে হেসে ওঠে দুজনে।

—তবে পুলুশ এট্টা হেস্তনেস্ত করবে দেখে নিও।' বলে নুরুল আবার পাড় ভেঙে উপরের দিকে উঠতে থাকে। ওর হাতের রেডিওতে তখন করুণ সানাইর সুর।

পুলিশ কথাটা শুনতেই একটা শিরশিরে ভয় মাথা চাড়া দেয় মনের মধ্যে। 'কেউ কেউ আবার বলতেচে, কুকুর নে আসবে কলকাতার তে। সেবার গঞ্জের গণেশ সাউ খুন হলি, নে এল। তবে সে ভাইতে ভাইতে ব্যবসা নে রেষারেষি—আর যদি নে আসেই, কিসির ভয়! শালা হাবা মরতি ভয় পায় নাকি!' আবার সেই শোনা কথাগুলো মনের মধ্যে আসে, 'আমরা মরব লোকের ভালোর জন্যি, গরিবির ভালোর জন্যি—এমনিতি মানুষ তো একদিন মরবেই!'—'কিন্তু ও শালোর মরণের কী ভয়! পা জড়িয়ে ধরি বলে, তুই আমার বাপ, ছেড়েদে এবারটা।' আবার হাসে হাবা, 'শালো তোর মার পাশে ক রাত শুইছেরে যে তোর বাপ হব? শালো তোদের বাবুরগা ঘরের মেয়েমানষেরা চাষার গার গন্ধ শুঁকলি নেকার করে মরবে। শালা হারানির পো। বোজ এবার মজাটা।'

কিন্তু হঠাৎ ওর নিজের বউয়ের কথা মনে পড়ে যায়। 'তবে যদি কিছু হয়! মাগিটা তারে জ্বালায় বটে—কিন্তু—সে না থাকলি ওদের দেখবে কেডা!' এক আত্মকেন্দ্রিক দায়িত্ববোধ ওকে কাহিল করার চেষ্টা করে। নিজেকে ফেরাবার জন্যে আকাশের দিকে তাকাল হাবা। সোনালি সূর্য এখন পুরোপুরি গাছের মাথায়। আকাশ পরিষ্কার এবং নীল। বাতাস লেগে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙছে নদীর জলে।

জাল ফেলতে ফেলতে হাবা এগিয়ে চলল নাবালের দিকে। যেখানের বেশি জল এবং মাছের আশা। হাবা ভাবল—কালকের ব্যাপার নে হয়তো—হয়তো কেন, নিচ্চয় এখন সারা গাঁ তোলপাড় হচ্চে—হরিমুদির দোকানে, শিবতলায় বা মোচনমান পাড়ার দরগার গোড়ায়। নুরুল বলে গেল নানা মুনির নানা মত। তার হয়তো শোনা উচিত ছিল, কেডা কি বলাবলি করতেচে। কিন্তু তা না করে সে পালিয়ে এয়েচে। —ভয়ে—হাবা ভিতু। কেডা বলেরে আমি ভিতু! ভিতু হলি—পেরথমটায় শালা এট্টু গা ছম ছম করিল। কিন্তু নুরুল তুমি দেকে এয়েচ—শালা গাচকাটা দা—দু দিন ধরে বালি দিইচি—এক কোপে—হুঁ হুঁ এর নাম হাবা—যা বলবে তা করবে। কতা দিইচি করব, ব্যাস করিচি। তবে হ্যাঁ, আজ সারা দিন ফাঁকায় ফাঁকায় আচি, কিন্তু সময় তো পেলিয়ে যাচ্চে না, কাল লোকের কতা শোনব, রিপোট করব।

হাবা এবার জালটা জোর করে ফেলল এবং গুটিয়ে আনল, দেখল বেশ কটা টাউমাছ চকচক করছে। হাবার মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল, 'সুমুন্দির পো এতক্ষনি.পড়া হল! মাগিটা আজ নিচ্চয় খুশি হবে।'

হাবা আবার অন্যমনস্ক হয় এবং ভাবতে থাকে। কী হবে তাদের! নুরুল যেভাবে বলে গেল—গরিব মানষের কি ভালো হবার। নুরুলের তবু দুচার বিগে হলিও আচে কিন্তু, কিন্তু তার নিজির? হাত-পা নে

জন্ম হাত পা নে মরতি হবে। শুধু ওই ভাঙা ঘরখানা আর কাটা পাঁচেক ভিটে। থাকগে ও শালা ভাবনা ভেবে লাভ নেই।

বেলা বাড়ল এবং পেটের মধ্যে খিদে চাগাড় মারল। রাতে বলতে গেলে কিছুই খাওয়া হয়নি, সকালে দুটো কাঁচা আম। জালগাছটা কাঁধে ফেলে বাঁধের উপব উঠল। দেখল নুরুল দূরে লাঙল দিচ্ছে। পায় পায় সেদিকে এগিয়ে গেল। একটা খেজুর গাছে তার রেডিওটা ঝোলানো, হিন্দি সিনেমার গান হচ্ছে, মাঝে মাঝে টুংটাং আওয়াজের ফাঁকে নানান জিনিসের বিজ্ঞাপন। ওকে দেখে নুরুল গোরু থামাল। —'পেলে কিছু?'

—কটা টাউ আর চিংড়ি।

—ওদিকি যাও, হলি হতি পারে কিছু।

—বড্ড খিদে লাগে গো মিয়া ভাই।' পাশেই নুরুলের কাঁকুড় খেত, সেদিকে লক্ষ্য হাবার। 'এট্টা কাঁকুড় দেবা?'

—দেখ পাও কিনা, এট্টার বেশি নিও না।

—না, এট্টা হলিই চলবে।

একটা মাঝারি গোছের কাঁকুড় তুলে চিবতে চিবতে নেবে যায় জলের ধারে। বাড়ির কথা মনে আসে ওর। ছেলে দুটোরে নে বউটা কী করতেচে কে জানে। তবে বউর উপর ভরসা ওর, বেবস্থা এট্টা যা হয় করবে।

সারাদিনের তাত মাথায় করে নদীর কানায় কানায় ঘুরে বেড়ায় হাবা। কারণ আজ সে একা থাকতে চায়। কারণ আজ তার ভয়, আজ তার উত্তেজনা, আজ তার নিজেকে যাচাই করার দিন। সে হাবা, সে বোকা, সে সহজ সরল, তার ভাবনা এলোমেলো তাই। সেই হেতু কোনও গোছানো ভাবনা তার আসে না, কিছুতে বেশিক্ষণ তলাতে পারে না, শুধুই ভেসে ওঠে, হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু শোনা কথাগুলোর রেশ ভাসে কানে। মাঝে মাঝে নিজের দুঃখ-দারিদ্র্য, ছেঁচড়ামি, অতীত, বউ, ছেলেপিলে, ভালোবাসা, ঝগড়া তালগোল পাকায়। তার বয়েস এখন কত এ তথ্য সে জানে না। তবে বাপ মরার পর জন্মেছিল সে। তাই নিয়ে অনেক ঠাট্টা হজম করেছে। বাপের ছেলে কি না সে? এ প্রশ্ন তার কোনও দিন এলেও সে আমল দেয়নি, কারণ সে মরদ তার মতো মরদ। পাঁচখানা গাঁয়ে কজন আছে? বালিতে শানানো দা ঝলসায় তার হাতে কিন্তু লোকগুলো এত মেড়ামারা কেন, এ প্রশ্ন তাকে ব্যথিত করে সদাই। সে হাবা তাই উত্তর পায় না। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলে লোকে হাসে, 'হাবার মরণ দেখ!'

'বলি হাবার মরণ তাই না! তোরা মরবি নে? মরতি সবাইরে হবে।' সহসা তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল, এবার তাকে ফিরতে হবে। শেষ খেপ মেরে জালটাকে ভালো করে ধুলো, এবং গেরো বেঁধে কাঁধের উপর ফেলল। তারপর খারা সমেত মাছগুলো একবার জলে ডুবিয়ে তুলে আনল। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করল। 'তা আদসেরসটাক বটেই, তবে সবই চুনো, বড়োর মদ্দি কেবল ওই পোঁচার মতো বেলেডা।'

বাঁধের উপর উঠে হনহন করে পা চালাল। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। এবং সকালের ভেজে ভেজা ভাব চৈত্রের স্বাভাবিক রুক্ষতায় উধাও। হাত-পাগুলো জলে জলে সাদা সেঁকসেঁকে।

বাড়ির যত কাছাকাছি হতে লাগল তত ওর ভয় বাড়তে লাগল। 'আজ নিঘ্‌ঘাত একটা কেলেঙ্কারি করবে মাগি।' তবে তার ভরসা ওই মাছ কটা। 'মাচ দেখলি নিচ্চয়—'

কাছাকাছি হয়ে জামগাছের আড়াল থেকে দেখল তার বউ উঠোনের উনুনে ভাত চাপিয়ে জ্বাল দিচ্ছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে জালটা রাখল মাটিতে, খারাটা কোমর থেকে খলল। দেখল তার বউয়ের মুখ গম্ভীর, অন্যদিকে চেয়ে তার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করছে। ধোঁয়ায় এবং তাপে চোখ ছলছলে। ছোটো ছেলেটা কোলে, ঘুমন্ত কি জাগা বোঝা গেল না, একটা মাই তার মুখে গোঁজা। বউয়ের দিকে ভালো করে তাকাল—কোমর থেকে উপর দিকে কোন কাপড় নেই, আঁচলটা কোলের উপর জড়ো করা। ঘামাচি এবং ঘামে পিঠটা দগদগ করছে। মাথায় রুক্ষ চুলের জট। আপন মনে একটা উপুড় করা বস্তার মুখ থেকে পাতা ঠেসে দিচ্ছে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে। বড়োছেলেটা সারা গায় ধুলোকাদা মেখে ল্যাংটো হয়ে আনমনে চেয়ে আছে ফুটন্ত হাঁড়িটার দিকে— কেমন করে গা দিয়ে ভাতের গেঁজলা গড়াচ্ছে। সহসা ছেলেটা তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, 'মা, ওই দেখো বাবা। কোতায় গিইলে? সারাদিন আমারা খুঁজে খুঁজে মরবতিচি।'

—কোতায় আবার যাবে! আমার চিতের জোগাড় করতি গিইলো। এত নোকেরে ভগবান নেয় আমারে নেয় না, জ্বলে মলাম।

বোকার মতো হাসে হাবা। 'এই তো এইচি—মাচ মারতি গিইলাম।'

—এ দিকি গুষ্টির খ্যাটের জোগাড় হবে কোত্থিকি?

'ওই তো চাল আনিচো দেকতিচি।'

-সে তো আনতিই হবে। আমার যে বড়ো খোলের জ্বালা। কাল থেকে বলতিছি। চাল নেই—' একটু থামে, যেন কথা ফুরিয়ে যায় হঠাৎ, 'খোকার সাবু এনেচ?'

—সাবু—সাবু—কেন? মাই খাচ্চে তো!

—বোজো বাবুর কথা, আমার মাইতি যেন কত দুধ! টানা টানি তো জ্বালা ধরাই দেছে।'

—আচ্চা এবেলা এনে দেবখোন।

—মা এই দেক কত মাচ। ছেলেটা খারা টানতে টানতে নিয়ে আসে। নিজের আগ্রহকে টেনে রাখতে পারে না ওর বউ, একবার উঁকি মারে খারার ভেতরে। 'অনেকডা মাচ তো!' গলা নরম শোনায়। সন্ধি। খুশি হাবা উঠে যায় পড়ন্ত রোদে জালটা মেলে দিতে।

—খানিকটা বেচি দিলি হত না!' বউয়ের প্রস্তাব। —না , অনেক দিন মাচ খাওয়া হয় না, এট্টু ভালো করে রাঁধ।'

—রাঁধব কি! আবার ঝেঁজে ওঠে বউ, 'এক ফোঁটা তেল আচে ঘরে!'

—তেল—তেল, দাঁড়াও দেখি, হরিমুদির কাচে যদি ছটাক খানেক ধারে পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ, হরিমুদিরি আমার চিনতি বাকি আচে! ধার নে বসে আচে তোমার জন্যি! থাকগে, হবেখন, পিদিম জ্বালার জন্যি একটু তোলা আচে, তাই দে—

আশ্বস্ত হয় হাবা, অবশিষ্ট বিড়িটায় দেয় একটা জ্বলন্ত পাতা তুলে। তারপর বউয়ের পাশটায় বসে পরম নিশ্চিন্তে।

খবর শুনেচ! বউয়ের কথায় চমকায় হাবা। 'এদিকি সারা গাঁ তোলপাড়। কত নোকে কত কতা বলতেচে। কেউ বলতেচে বাতাসীর ওরা করেচে, কেউ বলতেচে ডাকাত, আবার কারুর কতা হল পাটির নোক। শিবু মোড়লের বাড়ি ধান আনতে গিইলাম, ওরগো বাড়ির সব বলাবলি করতিল, এ পাটির নোকের কাজ। তা না হলি টাকা পয়সা সব পড় থাকে। তুমি কিছু জান নাকি?'

হাবার বুকের কাছটায় ধক করে ওঠে। পেটের চাপা কথা গুড় গুড় করে। —'আমি কোত্থে জানব? সারাদিন তো নদীর পাড়ে রইচি।'

—আমার কি মন নেয় ঝান, ওই ছোঁড়াগুলোর কাজ। রাতের আঁধারে আঁধারে কেন আসে আমি বুজি কিচু বুজিনে। আমি আড়ালে আড়ালে সব শুনিচি।

—এই চুপ, একদম খুন করে ফ্যালব, ও কতা যদি মুকে আনবি।

—দেকো একন কী হয়। তখন কত বলিচি, ওরগো পেটের মদ্দি কী আচে তুমি জানবা কী করি? একন বোজ, ভগমান না করুন, হাতে দড়ি না পড়লি হয়। অত ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর কিসির।'

—আমারে বারণ করতিস, আবার নিজি না খেয়ে তো খাওয়াতিস। হাবার গলা চড়ে যায়।

—খাওয়াব না তো কী করব, ভদ্দরনোকের ছেলে বাড়িঘর মা বাপ ছেড়ে এয়েচে—আহা এমনিতি দেখলি মায়া হয়। আর তা ছাড়া নোকের বাড়ি নোক এলি তেড়িয়ে দেবে। গরিব বলি কি আমরা মানুষ না।

'তবে আমারে খুসতিচিস কেন?' হাবার গলা আরও চড়ে!

—দেখো চেঁচিও না, কেডা কয়েনতে শোনবানে আর—দাঁতে দাঁত ঘষে বউ। তারপর গলা খুব নিচু করে জিজ্ঞাসা করে, 'একন কী হবে?'

—কী আবার হবে, ভালই হবে দেখিস। জোরালো গলায় বলে হাবা, 'ওরা তো আমার গা ভালোর জন্যিই করতেচে।'

—কিন্তু তোমার কিছু হবে না তো।
হলিই বা।
ও মা কী হবে গো, মিনসের কতা শোন।
—দেখ মাগি ও রকম করিসনি। ভাত রাঁধ, চাট্টি খাই, শরীরটা বড়ো আনচান করতেচে।
—তবে এট্টা কতা শোনবা? বউ মুখটা ওর কানের কাছে নিয়ে আসে।
—শিবু মোড়লের বাড়ির সব মুক শুকিয়ে এত্তটুকু হয়ে গেচে।
—তা তো হবেই। বুক ফুলে ওঠে হাবার, 'আর অনেক কিচু হবে দেখিস।' হাবার গলায় আগামী রহস্য।
—কী হবে গো?
হবে যকন দেখতি পাবি। মেয়ে মানষের অত জানা ভালো না।'
ওঃ কী আমার মরদ আলেন রে। বলে নিভন্ত উনুনে একরাশ শুকনো পাতা গুঁজে দেয়। বড়োছেলেটা উদোম আগ্রহে বাপ-মার কথা শোনে।

সূর্য অস্ত যায়। টেমির আলোয় বউ ছেলে আর হাবা তিনজনে খেতে বসে। গরম মোটা চালের ভাত আর চুনো মাছ চচ্চড়ি। সারা দিনের খিদের গুহায় পরম শান্তি নামে। কারও মুখে কোনও কথা নেই, শুধু গ্রাস তোলার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরের তৃপ্তির আর আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি বিনিময় হয়। হাবার বুক ভবে ওঠে। ছেলেটা একবার মুখ ভর্তি ভাতের ফাঁক দিয়ে কথা বলে, 'এত মাচ কনতি আনলি বাপ?'

হাবা ছেলের জবাবে বলে, 'উই নাবালের দিকি, যেখানে নদীর অনেক জল।'
—কাল আবার যাবা? আমিও তোমার সনি যাব।
হাবা কোনও উত্তর দেয় না। ভাবে শুধু মাচ হলি তো হবে না, ভাতের জোগাড় চাই। কাল আবার জন খাটার ধান্ধায় বেরতি হবে। তবে যা আকাল কাজ মেলা ভার।

রাত বাড়ে, চৈত্রের দখিন হাওয়ায় জামগাছে পাতা ঝরে। টেমি নিভে যায়। ছেলে দুটোকে ঘরে শুইয়ে ওরা দুজনে হাতনেয় শোয়। ঝিঁঝি ডাকে পাশের ঝোপে।
—আমার বড়ো ভয় করে। নীরবতা ভঙ্গ করে বউ।
—কিসির?
—কি যেন এট্টা ওলটপালট হবে মন নেয়।
—সে তো ভালোই, গরিবির অবস্থা পালটাবে।
—সত্যি করে বলতেন?
শোনা কথা আওড়ায় হাবা, 'ঠিক বলতিচি, আমরা বাজা হব, সারা দেশের রাজা।'
—দুস, তাই ককনো হয়! ওর বউ আরও ঘন হয়ে আসে ওর কাছে। কিন্তু হাবা বুকের নিশ্বাসে উপলব্ধি করে বউও বিশ্বাস করছে একটু একটু সে কথা।
—বউ! হাত দিয়ে বেড় দেয় হাবা। সে তার বিশ্বাসে বাঁচতে চায়। হাবার পেটের মধ্যে উত্তেজনা, আবেগ, গর্ব পাড় ভাঙে। সে বলবে, চেঁচিয়ে বলবে—আমি—আমি—আমি। আমি হাবা। 'বউ!'
কী? কিচু বলবা, কী হয়েচে তোমার?
—বউ আমি।
—তুমি কী?
—আমি করিচি।
চমকে ওঠে বউ, গলা দিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ ওঠে।
—বউ, মানষের ভালো হবে—গরিব মানুষের। হাবার গলায় সাফল্য।
তুমি একা?
না, আরও জনাতিনেক ছেল।
আতঙ্কে, বিস্ময়ে বা বোধ হয় কিছুটা গর্বে ও আনন্দে ওর বউয়ে গলা বুজে আসে। বহুক্ষণ স্তব্ধতায় কাটে। শুধু পরস্পরের বুকে বুক দিয়ে অনুভব করে তারা। □

গল্পের পরিমল

গৌর বৈরাগী

খট খট করে দরজার কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠল দিবাকর।

গ্যাট, ডাংকেল আর মুক্ত অর্থনীতির প্রতিবাদে আজ বাংলা বনধ। আগে থেকে ঘোষিত থাকায় বেশ সুবিধে হয়েছে। লীলারা ছেলেমেয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির সঙ্গে ফ্যামিলি পিকনিক করছে। অল রাউন্ডার ক্লাব ওয়ানডে কমপিটিশনের আয়োজন করেছে। সেখানে মাইকে পুরনো দিনের কিশোরকণ্ঠ। দিবাকরের হইচই ভালো লাগে না। সে একটা বই এনেছে অফিস লাইব্রেরি থেকে। গল্পটা বেশ জমাটি।

সত্তর দশকের ঘটনা। ঘটনার ভেতর একজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী। দুটি খুনের মামলায় সে অভিযুক্ত। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কখনও একাকী পুরুলিয়ার নির্জন বনে। তিনদিন জল ছাড়া সে কিছু খায়নি। তবু তার চোখে স্বপ্ন স্বপ্ন। চারদিনের দিন সেই স্বপ্ন দিয়েই ভাত মেখে খেতে বসেছে এক সাঁওতাল পরিবারে। তখনই এল খবরটা। একটা চিঠি। 'তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার বাড়ি এসো। আমাদের মোম শয্যাশায়ী।' চিঠির ভেতর একজন মা আর তার আশঙ্কা বাবাকেও ছুঁয়ে গেল। সে কাঁধে ব্যাগ ফেলে দ্রুত পথে নামে। রেলবাজারের পাশ দিয়ে সে বাড়ি যাবে। কিন্তু তার যাওয়ার আগেই খবরটা পৌঁছে যায় পুলিশের কাছে। ফাঁদ পাতে পুলিশ।

এই অবধি পড়ার পরেই দরজায় কড়া নাড়ার ভয়ঙ্কর শব্দে চটকা ভাঙে দিবাকরের। বিপ্লবী ছেলেটির নাম পরিমল। পরিমলকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে সে। চাপা একমুখ দাড়িগোঁফ। বসা গাল। উশকোখুশকো চুল। নুয়ে পড়া ঘাড়। কিন্তু তীব্র আর মর্মভেদী চোখ দুটি। সে ভুলে যায় খুব। সে খেতে ভুলে যায়। ঘুমোতে ভুলে যায়। মাঝে মাঝে নিজেকেও ভুলে যায় সে। এমন ভুলোমন ছেলেকে কেউ কি সহজে ভুলতে পারে! তাই পুলিশের পাতা ফাঁদে সে যখন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে তখন বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করে ওঠে দিবাকরের। একটু শব্দ করেই দরজা খোলে সে। জরুরি কথা থাকলে সেটা সেরে নিয়ে এখনই বইটা শুরু করতে হবে আবার। রাস্তায় দোকানপাটই যা বন্ধ। এ দিকে সাইকেল যাচ্ছে। ভুরভুর করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনটে স্কুটার চলে গেল। একটির পেছনে চোখে কালো চশমা পরা প্রেমিকা। দরজার সামনে ছেলেটা দাঁড়িয়ে। সকাল নটার নরম রোদ্দুর এসে পড়েছে ছেলেটার কাঁধে।

কাকে চাই ভাই!

—আপনাকেই দরকার দিবাকরদা।

—আমাকে! বলে দিবাকর ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে। কোথায় দেখেছি। কোথায় দেখেছি! তারপরেই হঠাৎ ভীষণ রকম চমকে ওঠে সে। শালবনের ছায়া নেমেছিল মাটির উঠোনে। শালবনের গন্ধ। জ্যোৎস্নার গন্ধ। মোরগ-ফুল গাছের পাশে বসেছিল একটা শানকি নিয়ে।

কালো, ছিপছিপে ঢ্যাঙা, ঘিয়ে রঙের পেন্টুল, পুরনো ডিজাইনের হাওয়াই শার্ট। সরু সরু সিটে পরা আঙুলে ঝুরঝুরে শুকনো ভাত তুলে মুখে তুলছিল। এই ছেলেটাই না! কী আশ্চর্য। দিবাকরের গলা থমথম করে।

তুমি গল্পের পরিমল না!

—হ্যাঁ আমিই সে। ছেলেটা সতর্ক চোখে চারপাশে তাকায়। ঘন দাড়ির ভেতর হাত বুলিয়ে নেয়। তারপর চাপা গলায় বলে, 'পুলিশ ঘিরে ফেলেছে আমাকে। আমাদের মোমের সঙ্গে আর বোধ হয় দেখা হল না।'

তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর দিবাকরকে ছোঁয় না। সে ভারী অবাক। আশ্চর্য, এ ঘটনাও তো পঁচিশ বছর আগের। হুবহু সেই ঘটনা। হুবহু সেই চরিত্র।

—দিবাকরদা। ছেলেটা চাপা গলায় আবার কথা বলে। আমার শেলটার দরকার। আপনি যদি.......

মুহূর্তে বর্তমানে ফিরে আসে দিবাকর। রো রো রো ইয়োর বোট। জেন্টলি ডাউন দ্য স্ট্রিম। শুভশ্রী গানটা গায়। এবার ফাইভ হবে। ক্লাসে র‍্যাঙ্ক করে। এস বি আই ম্যাগনামের দশ হাজার ইউনিট ডিম পাড়ছে। ছেলেটার দিকে তাকায় দিবাকর। দুটো খুন। একটা কি দুটো ডাকাতি। এইটুকু ভাবতে গিয়েই একটু সময় গড়িয়ে যায়। তার মধ্যেই ছেলেটা ফিরে দাঁড়ায়। বুকের ভেতর ধক করে ওঠে দিবাকরের। কেমন যেন মায়াই হয় তার। দ্রুত পথে নামে সে, আমি—আমি কিন্তু তোমাকে ফিরিয়ে দিইনি পরিমল।

—আপনি দ্বিধাহীন গ্রহণও করেননি। সে নরম করে হাসে।

—কিন্তু এটা কি সম্ভব! দিবাকর চিৎকার করে। পঁচিশ বছর আগের গল্পের আবার নতুন করে ফিরে আসা।

—হ্যাঁ সম্ভব। শান্ত গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ করে ছেলেটা। গল্পে একটা রাস্তা থাকে। গল্পে একটা বাড়ি থাকে। একটা চরিত্রও থাকে সেখানে। গল্পের রাস্তার ধারে গাছ বসিয়ে নেয় পাঠক। গল্পের বাড়ির জানলায় আকাশি রঙের পর্দা ঝুলিয়ে দেয় সেই পাঠকই।

ঠিক তেমন করেই গল্পের পরিমলকে সে দরজা খুলে ডেকে আনে কখনও পঁচিশ কখনও চল্লিশ আবাব কখনও বা নাতিদূর কোনও ভবিষ্যতের কোনও সময়ে......... □

মায়ের জন্য

ভগীরথ মিশ্র

চিৎরঙের ডাঙায় সেই খেজুরগাছটা

চিৎরঙের ধুধু কাঁকুরে ডাঙায় একবুক নিঃসঙ্গতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে খেজুর গাছটা। কতকাল। আকাশের দিকে নিষ্পলক। তার সরু-পানা কালো শরীর ডানদিকে অল্প হেলানো। খরখরে পোড়া পোড়া গা। তাতে অসংখ্য ফুটো-ফোকর, কাটা-ছেঁড়া। ডগায় বিবর্ণ আলুথালু পাতার ঝোড়। উদোম বাত্আসে ফরফরিয়ে ওড়ে। তারই একটা ডালে বসে একটা তেলকুচকুচে গরবিনী ফিঙে লেজ দোলায় প্রায় সারাক্ষণ।

গাছটার সারা গায়ে অসংখ্য চোখ কাটা। হাত দশেক উঁচু থেকে শুরু হয়েছে ওর মরা চোখের গহ্বর। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেছে সারবন্দি অনেক চোখ।

এ শীতেও চোখ কেটে রস নিঙড়ানো হয়েছে। টাটকা চোখের গহ্বর থেকে অল্প অল্প রস চোয়াচ্ছে এখনও। গুঁজি গোঁজা রয়েছে চোখের মাঝখানটিতে। গুঁজির ডগায় জমে রয়েছে কয়েক বিন্দু রস। একটা কাক উড়ে উড়ে ক্রমাগত ঠোক্কর মারছে চোখের মধ্যে।

গাছটা ইজারা নিয়েছে কেউ। রসের ইজারা। ফলে গাছটাকে ছিবড়ে বানানোর আগে ছাড়বে না কিছুতেই। একদিন গুঁজি মেরে পরপর তিন দিন রস নেয়। তারপর একদিন জিরোতে দেয় গাছটাকে। তারপর আবার পরপর তিনদিন। এইভাবে পুরো শীতকাল। জিরেন রসের স্বাদ বেশি। দো-কাটি, তে-কাটি রস অত গাঢ় নয়।

ষষ্ঠী বাউরির মা ও মেজোকর্তা

এরা তবু গাছটাকে তিনদিন বাদে বাদে একদিন জিরোতে দেয়। ষষ্ঠী বাউরির মাকে গাঙ্গুলিরা তাও দেয়নি। ছিবড়ে হওয়ার আগের দিন অবধি একটি রাতও ঘুমোতে পায়নি ষষ্ঠী বাউরির মা।

ষষ্ঠী বাউরি ছেলেবেলার কথা কিছুই ভোলেনি। গাঙ্গুলিগড়ের মেজোকর্তা বড়ো ভালোবাসতেন ষষ্ঠীর মাকে! সেই ভালোবাসার টানে ওর রস খেতেন রোজ। মেজোকর্তা ছিলেন যথার্থ রসিক মানুষ। একা একা রস খাওয়ায় তিনি জোস পেতেন না। তাই জয়রামপুরের পুরন্দর কাইতি, বিষ্টুপুরের মহাদেব উকিল,— এরা ফি-হপ্তায় গাঙ্গুলিগড়ে আসতেন ষষ্ঠীর মায়ের রস খেতে। তখন ষষ্ঠীর মায়ের অঙ্গে সবে রস জমতে শুরু করেছে।

তারপর একদিন ষষ্ঠীর মার দেহজুড়ে কম্প দিয়ে যৌবন এল। গুমরে গুমরে বসবাস করল। না বলে কয়ে চলে গেল একদিন। এবং পঞ্চরসিকে মিলে এই রস চাখাচাখির মধ্যে একদিন ষষ্ঠী বাউরি জগতের মুখ দেখল।

গাঙ্গুলিগড়ের থেকে অল্প দূরে বাবুদের আরও একটা কোঠাঘর ছিল। আমোদ-ফুর্তি যা হওয়ার ওখানেই হত। কোঠাঘরের থেকে অল্প দূরেই একটা ঝুপড়ি ঘরে ষষ্ঠীরা থাকত। ফি-রাতে ষষ্ঠীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর মা চলে যেত বাইরের থেকে তালা লাগিয়ে। তারপর সারারাত, সারাটা রাত ষষ্ঠীর নিঃসঙ্গ কেটে যেত। ও দিকে, রাতভর মেজোবাবুদের চক্ষুর সম্মুখে ষষ্ঠীর মা পেতে দিত একটি একটি প্রত্যঙ্গ। ওরা চোখ কাটত। গুঁজি গুঁজত। রস খেত। ষষ্ঠী তখন অঝোরে ঝুপড়ির মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলত সারা রাত। ভারী খিদে পেত তার। অনেক অনেক খিদে। পেটের, কোলের, সোহাগের, সান্নিধ্যের খিদে।

এইভাবে, গুঁজি পুঁতে রস খেতে খেতে একদিন মেজোকর্তা ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ির মতো চলে গেল ওপারে। ষষ্ঠীর মার শরীরে তখন রস বলতে কিছুই নেই। কাঁটাসার শরীর। নিঃস্ব, রিক্ত। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পাখির খাঁচা একটি। কিংবা চিৎরঙের ডাঙার ওই সিড়িঙ্গে খেজুর গাছ। আর ষষ্ঠী বাউরি, সেই বাচ্চা বয়েস থেকে রস বিহনে সরু ঠ্যাংওয়ালা বকের মতো অবয়ব নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল তার যৌবনের দিকে। এখন তার শরীরে অনেক ব্যাধির নিরঙ্কুশ বসবাস। পেটে, শিরায়, ফুসফুসে, মগজে অনেক রোগের আড়ত। এখন সে অতি কষ্টে টেনে টেনে দম নেয়। নিজের বুকের খাঁচায় হাত বুলিয়ে ভেতরের রুগ্‌ণ পাখিটাকে সোহাগ করতে থাকে সর্বক্ষণ।

আমার মা ও মতিনবাবু

অনেক আগে, আমার সেই ছেলেবেলায়, মতিনবাবু মায়ের কাছ থেকে অনেকগুলো সাদা কাগজে টিপছাপ করিয়ে নিয়েছিল। মা ছিলেন ভারী সরল এবং অসহায়। আমি তখন ছিলাম খুবই ছোটো। আমাকে বুকে চেপে অবিরাম কেঁদে যেতেন মা। কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিতেন না। তখন থেকেই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত মতিনবাবু। ওকে দেখে মা ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন। মতিনবাবু সারাক্ষণ কারণে অকারণে হেসে উঠত হ্যা-হ্যা করে। হাসির সঙ্গে তার সোনা-বাঁধানো দাঁত ঝিকমিকিয়ে উঠত। মতিনবাবুর ওই সোনালি দাঁতের হাসি এখনও মিলোয়নি।

সেই বাচ্চা বয়েসে আমি অনুভব করতাম মতিনবাবুর দৃষ্টির সামনে আমার মা শুকিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে তিল তিল। আমার কান্না পেত।

আমার বয়েস তখন পনেরো কি ষোলো। একদিন মতিনবাবুর সামনে দাঁড়ালাম সাহসে ভর করে। কচি ভুরু পাকিয়ে বললাম, 'তুমি আমাদের বাড়িতে রোজ রোজ আস কেন?'

আমার উদ্ধত ভঙ্গিতে যেন মজা পেল মতিনবাবু। গালখানা আলতো টিপে দিয়ে বলল, 'এটা যে হামার বাড়ি খোকাবাবু। এই ঘর-বাড়ি, গাছ-গাছাল, পুকুর জমিন—সব হামার।'

—না। এসব আমাদের। আমি ফুঁসে উঠি।

আমার দিকে কুতকুতে চোখে তাকায় মতিনবাবু। নিপাট হাসে। বলে, 'কাগজ আছে খোকাবাবু। হামার পাস পাক্কা কাগজ আছে।'

একদিন আমার বাড়ির উঠোনে একগাদা ইট-কাঠ-যন্ত্রপাতি এনে জড়ো করল মতিনবাবু। একখানা হাস্কিং মিল বসাল। চারপাশ থেকে জলের দরে ধান কেনে। আর ওই হাস্কিং মিলে চাল ভেনে রেখে দেয় আমাদেরই গোলার মধ্যে বস্তাবন্দি করে। গভীর রাতে ট্রাক আসে। চালের বস্তা বোঝাই করে নিয়ে ফের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ছেলেবেলায় ট্রাকের হিংস্র গর্জনে কত রাত ঘুমোতে পারিনি আমি। যেন এক হিংস্র দানবের গর্জন।

আমি মাকে বারংবার শুধোই, 'মা, ওই লোকটা আমার বাড়ির উঠোনে ধানভানার কল বসাল কেন?'

—আমাদের ভিটেখানা যে ওর কাছে বাঁধা রয়েছে বাবা।' মা কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেন, 'বোধ করি কোনও দিনও তা ছাড়ানো যাবে না।'

তারপর মতিনবাবু আমাদের ভিটেখানার পুরোপুরি দখল নিয়ে নেয়। জমিতে ডাল-সরষের চাষ করে। ফলের চারা এনে পুকুরের পাড়ে লাগায়। পুকুরে মাছ ছাড়ে। সাবেক কালের বাড়িখানায় আমি আর মা থাকি বটে। তবে ওই পর্যন্তই। মাথা গোঁজার বেশি আর আমাদের কোনও অধিকার নেই পৈতৃক ভিটেয়।

চিৎরঙের ডাঙার সেই সর্বস্বান্ত খেজুরগাছটা এবং আমার মা

আমার সঙ্গে ষষ্ঠী বাউরির খুব ভাব। দুজনে সন্ধের দিকটায় রোজই বসি খেজুরগাছটার তলায়। বসে বসে নিজেদের কথা বলে মনের খেদ মেটাই। মাঝে মাঝে স্থিরপলকে গাছটাকে দেখতে থাকি দুজনেই। কষ্টটা বাড়তে থাকে। মায়ের মুখখানা মনে পড়ে। একদা যুবতী টসটসে গাছটা থেকে তিল তিল রস নিংড়ে নিয়েছে মানুষ। শুকনো শরীরে এখন অসংখ্য মরা চোখের গহ্বর। ওই গহ্বরগুলোকে বয়ে বয়ে এই নিঃসঙ্গ প্রান্তরে হয়তো একদিন নিঃশব্দে মরে যাবে গাছটা। অথচ একদিন ওর কত জৌলুস ছিল। কাঁদি কাঁদি টকটকে

লাল ফল বইত বর্ষায়। পাড়ার সমস্ত বাচ্চা-কাচ্চা এসে ভিড় জমাত ওর তলায়। ষষ্ঠী বাউরির দিকে তাকিয়ে বলি, 'আর ইজারা দিলে গাছটা মরেই যাবে। কত দিনের পুরনো গাছ—।' ষষ্ঠী বাউরি বারবার দিগন্তের গায়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছিল চোখ। বিড়বিড়িয়ে বলল, 'প্রত্যেক বচ্ছর ভাবি, আর ইজারা লয়। বিখ্খো হইলো মা'র মতোন। মাতৃ হত্যা হব্যেক্। কিন্তু কি বইল্‌বো আইজ্ঞা, শালা রহমান ঠিক কাত্তিকের পয়লা হপ্তায় এইসে হাজির। কাত্তিকের পয়লা হপ্তা মানে বুঝেন তো? মায়ে-ব্যাটায় লিরম্বু উপাস চইল্‌ছে তখন। মা ফিট্ হইলে আমি ছাড়াই। আমি ফিট্ হইলে মা ছাড়ায়। এমন মুহুত্তে রহমান দিবেক দু কুড়ি টাকার লালসা। ভাবত্যে পারেন? দু কুড়ি ট্যাকা! এক কুড়ি আগাম দিতে চায়।' মাটির দিকে চোখ নামায় ষষ্ঠী বাউরি। বলে, 'টাকা গুলান লিতে হয় আইজ্ঞা।'

—কিন্তু এই খেজুরগাছটাকে দ্যাখ্। সারা মরসুম চুযে চুযে কী দশা করেছে ওর।

মাটি থেকে ঘাড় তোলে ষষ্ঠী বাউরি। খেজুরগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। হুস করে নিশ্বাস ফেলে। বলে, 'গাছ তো গাছ, এখন যদি কোউ মোর পেটে-ধরা মা-টাকে ইজারা লিতে চায়, যদি সিই সুবাদে হাতে গুঁইজে দেয় এক কুড়ি ট্যাকা, তো লিতে হবোক ট্যাকাটা। খিদার বাড়া আগুন, আইজ্ঞা, নাই এই বিশ্ব-সন্‌সারে। লিমেষে খাণ্ডব দহন কইর্‌তে পারে উ।'

শুনতে শুনতে আমি ক্রমশ ভেতর বাগে তলিয়ে যেতে থাকি। সহসা মায়ের মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মা যে এখন কি করছে, দেশের বাড়িতে!

গতিশীল দেশ ও আমি

বাসায় এসে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লাম আমি। অন্ধকার ঘরে মিটমিট জ্বলতে লাগল জোনাকির মতো টুকরো টুকরো সবুজ আলো। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন......।

গতকাল রাতেও আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। ওরা রোজ আসে। মতিনবাবু সে জন্য ওদের মাসোহারা দেয়। আমার অপরাধ হল, আমি আমার ভিটে থেকে মতিনবাবুকে উঠে যেতে বলেছিলাম। ওর হাস্কিং মিলের দেওয়াল শাবলের ঘা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। মতিনবাবুর ডাকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল পুলিশ বাহিনী বিষ্টুপুর থেকে। বাঁকুড়া থেকে পুলিশের মেজোসাহেব। পরের দিন গভীর রাতে আমার বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিশ। আমাকে অনেক কৌশল প্রদর্শনের পর ধরল। তিন দিন তিন রাত্তির পুলিশ হাজতে থাকবার পর আমাকে তোলা হল বাঁকুড়া কোর্টে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে আমিও চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেলাম। গোটা দশ-বারো ডাকাতি-ধর্ষণ আর রাহাজানির আমি নাকি অন্যতম হোতা। একটা খুনের কেসেও জুড়ে দেওয়া হল আমায়। সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ আমি নাকি বিষ্টুপুর থেকে তালডাংরা জুড়ে গড়ে তুলেছি এক বিশাল উগ্রপন্থী ঘাঁটি। স্বপ্নের মতো শোনাচ্ছিল সমস্ত কথা। আমার জেল-হাজতে ঠাঁই হল।

হাজতে বসে বসে শুধুই ভেবেছি, শুধু মতিনবাবুর হাস্কিং মিলের দেওয়ালে একখানা শাবলের ঘা মারতেই অতখানি তোলপাড় উঠল চারপাশে! পুলিশের রাতের ঘুম চলে গেল। উকিলবাবুদের ছোটাছুটি বেড়ে গেল। শুধু একটি মাত্র ঘায়ে! কেন? কেন?

অনেকদিন বাদে ঘরে ফিরলাম আমি। মতিনবাবু তখন আরও জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের পৈতৃক ভিটেয়। আমাদের পুকুরে পাকা শান বাঁধানো ঘাট বানিয়েছে। আমাদের সাবেক বাড়িখানাকে সে তার গুদাম বানিয়েছে। ভিটের এক কোণে মাকে বানিয়ে দিয়েছে এক কুঁড়ে ঘর। ওই কুঁড়ে ঘরে আমারও ঠাঁই হল। কিন্তু সর্বক্ষণ মতিনবাবুর লোক আর পুলিশের চর আমাকে নজর রাখতে লাগল। নিজের ভিটেয় চোরের মতো বসবাস করতে লাগলাম আমি।

দেশ নাকি এগিয়ে চলেছে। এক-ফসলা জমি সব তিন-ফসলা হল। জোড়গুলোতে বাঁধ হল। ঝলমলিয়ে বিদ্যুৎ জ্বলল প্রাসাদে। কলকারখানা বসল। পিচ রাস্তা হল। সারাক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে বাস, লরি, ট্যাক্সি ছুটে চলে রাজপথ দিয়ে। বিষ্ণুপুরে বিশাল স্টেডিয়াম মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রসিকগঞ্জের ডাঙায়। তার উলটোদিকেই জেলের ফটক। সারাক্ষণ বন্ধ। সেখানে একগাদা সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে একজন বেঁটেখাটো লোক সর্বদাই সতর্ক। এই বুঝি কয়েদির হাত-পায়ের ডান্ডা-বেড়ি ঢিলে হয়ে গেল কিঞ্চিৎ।

সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি হচ্ছে এখানে ওখানে। বাড়ির সামনে ছবির মতো বাহারি ফুলের বাগান। সকাল-বিকেল ঝাঁ-ঝাঁ করে ছুটে আসে লাক্সারি বাস। বাহারি ট্যাক্সি। ঝকঝকে মেয়ে-পুরুষ আর প্রজাপতির মতো বাচ্চারা নামে ঝাঁকে ঝাঁকে। ওরা কলরব করতে করতে শহরের পুরাকীর্তি দেখে। টুরিস্ট লজে বাসা বাঁধে রাতে। সেখানে রাত পোহালেই বাহাত্তর টাকা ভাড়া। তাও খালি থাকে না একটিও ঘর। সারাক্ষণ সেখানে গিজ গিজ করে নিটোল মানুষের দল। এত এত সুখ-সম্ভোগের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে থাকি ষষ্ঠী বাউরিদের কথা।

গতিশীল দেশ ও ষষ্ঠী বাউরির হরেক কিসিমের খিদে

শিরীষ গাছের সব পাতা হলুদ হয়ে গেছে। চ্যাপটা লম্বা ফলগুলো শুকনো হয়ে গাছভরে ঝুলছে। অল্প হাওয়ায় দোলে। ভেতরের শুকনো বীজ ঝনঝনিয়ে বাজে। আর কিছুদিন বাদে খরা হবে সারা এলাকা জুড়ে। এ যেন তারই সঙ্কেত। কাঁকুরে মাটি তেতে-পুড়ে ঝলসে দেবে চারপাশ। মাটির বুক থেকে শোঁ-শোঁ আওয়াজ উঠবে অবিরাম। তখন এক ঢোক জলের তরে উদোম মানুষের দল মাঠ-ঘাট. বন-বাদাড় চষে ফেলবে পাগলের মতো। তখন একদানা চালের জন্য টিপছাপ দিতে দিতে বুড়ো আঙুলে দগেদগে ঘা হবে। চিৎরঙের ডাঙায় গনগনে লোহার মতো মাকড়া পাথর ফাটাতে ফাটাতে শীর্ণকায় মানুষের দল ভরদুপুরে ছাতি ফেটে মরবে। কন্ট্রাক্টরের নীল রঙের ট্রাক ধুলো উড়িয়ে ফিরে যাবে শহরে। সেখানে মাকড়া পাথর দিয়ে কত কিছু নির্মাণ চলছে।

এমনতর অনেক করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করি প্রতিদিন। আর সমস্ত করুণ দৃশ্যের মধ্যেই ছায়া ছায়া ভাসতে থাকে আমার কুঁড়েঘরবাসিনী মায়ের শীর্ণ মুখখানি।

বাঁ হাতে বাঁক্‌ড়া ওল আর ডান হাতে বুনো খরগোশ ঝুলিয়ে ঘরে ফিরছিল উদোম মানুষের দল। ডুবন্ত সূর্যের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছিল তারা। আমি বসেছিলাম খেজুরগাছটার তলায়।

গাছটার একেবারে চুড়োয় সদ্য কাটা চোখ থেকে তখন টিপটিপিয়ে রস ঝরছিল ফোঁটা ফোঁটা। আমার মনে হচ্ছিল, গাছটা যেন অঝোরে কাঁদছে। নিঃশব্দে। দিনরাত। একা একা। ওর চোখের জল টিপটিপ পড়ছিল আমার মাথায়। গাছের কান্নাটা সংক্রামিত হচ্ছিল আমার বুকেও। আমি শিউরে শিউরে উঠছিলাম। রসের ফোটাগুলো আশ্চর্যরকম উষ্ণ। ঠিক আমার মায়ের চোখের জলের মতো।

উদোম মানুষগুলোর পায়ের শব্দে মুখ ফেরালাম। ঝাপটে আসছে ওরা। চিৎরঙের ডাঙায় ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় ওদের ছায়াগুলো যেন যোজন প্রমাণ হয়ে সামনে সামনে হাঁটছে। ঢ্যাঙাপানা সরু সরু মানুষের ছায়া। ছায়ার মিছিল।

ষষ্ঠী বাউরিও ছিল ওদের সঙ্গে। আমাকে দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যেরা এগিয়ে গেল। এখন দাঁড়ানোর সময় নয়। সারা দিনের উপোসি শরীর নিয়ে দাঁড়ানো চলে না। শরীরের লম্বা ছায়াগুলো এখন দু পা ধরে সামনে টানতে থাকে সমুখ পানে। তবুও ষষ্ঠী বাউরি দাঁড়াল। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ওর ছায়াখানা সামনে থেকে পেছনে গিয়ে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—ঘাড় তুলে কী অমন ভালোছেন গাছটাকে? ষষ্ঠী বাউরি শুধোয়।

আমি গাছটার প্রতি তন্ময় ছিলাম। ওই অবস্থায় ষষ্ঠীর মুখের দিকে তাকাই। এক সময় বিড় বিড় করে বলে ফেলি, 'মাকে। আমার মাকে।'

ষষ্ঠী বাউরি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বোকার মতো। কী বুঝল কে জানে। এখন তার উপোসি শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে একটা অসাড় ঝিঁ-ঝিঁ ধরা ভাব। কোনও কিছু তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে না মগজে।

—গাছটাকে ওরা কবে রেহাই দেবে রে, ষষ্ঠী? আমি শুধোই।

—ইজারা লিয়েছে আইজ্ঞা, অত জলদি কি থামে?

ষষ্ঠীর গলায় অপরাধীর সুর।

আমি কথা ঘোরাই। বলি, 'বনে বনে কন্দকচু খুঁজছিস রে বড়ো? মাজুরিয়ার খালে মাটির কাজ হচ্ছে না?'

—মাটির কাজ বন্ধ।

—কেন?

—কে—জানে। ছিষ্টিধর লায়েক নাকি কুর্টের ইন্‌জাক্‌শন এনেছে। বাঁধ হইলে উয়ার দশবিঘা জমিন নাকি ডুইব্যে যাবেক্ জলের তলায়।

ষষ্ঠী মুহূর্তকাল থামে। তারপর বলে, 'কুর্টের রায়কে অন্‌গেরাহ্যি করবেক কে?'

—অথচ বাঁধটা বাঁধা হলে পাঁচশো বিঘা জমি লক্‌লকিয়ে উঠত। তোরাও কাজ পেতিস সংবৎসর। কত গরিব চাষির স্বল্প জমি দো-ফসলা হত। খালের দু পাশে তো প্রায় সমস্তই পাট্টা জমিন।

ষষ্ঠী বাউরি আরও ঘনিষ্ঠ হল। এ দিক ও দিক চাইল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'উই পাট্টা জমি বলেই তো কুর্টের ইন্‌জাক্‌শন লিয়ে এইলো উয়ারা। দশ বিঘা জমিন জলে ডুইব্যা যাওয়ার গল্পটা মিছা। আসলে অত গুলান পাট্টাদারের ঘরে ফসল উঠলে নাকি সস্তা দরে লেবার পাওয়া যাবেক নাই।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ষষ্ঠী বাউরির দিকে। বোকা বোকা মুখে কেমন করে সার কথাটা উচ্চারণ করে ফেলে ওরা!

ষষ্ঠী বাউরি ভারী অদ্ভুত হাসি হাসল। শেষ বেলার ম্লান আলোর সাথে মিশে বড়ো করুণ হয়ে উঠল সেটা। বলল, 'খেতে-ভুঁয়ে কাজ নাই। মাটি কাটবার কাজটাও বন্ধ হয়ে গেল। এ বচ্ছর চুরি চামারিটা বাড়বেক্ আইজ্ঞা।' ষষ্ঠী বাউরির কথাটা আমার মগজের মধ্যে সিঁদ কেটে কেটে ঢুকতে থাকে। মাটিকাটা, পাথর ফাটানো যে কোনও একটা কাজ চললে এলাকায় চুরি-চামারি কমে যায়। অর্থাৎ কাঠফাটা রোদে পাথর ফাটানোর কাজ পেলেও এরা চুরি-চামারি ছেড়ে দিতে রাজি। সেটাও যখন পায় না তখনই বেরয় আঁধারে দু চোখ জ্বেলে।

ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলাম আমি।

ষষ্ঠী বাউরির হাতের খরগোশটা দুলছিল। আমি জানি, খরগোশটা এদের কপালে জুটবে না। গাঙ্গুলিরা নামমাত্র দামে কিনে নেবে ওটা। ওই দিয়ে চাল আটা কিনবে এরা। বাঁকুড়া ওল দিয়ে খাবে।

চোখের সামনে খরগোসটা ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছে। যেন বলছে, সময় বয়ে যায়। এখনি খিদের সময়।

অন্য হাতে ওলটা অসংখ্য গভীর চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। ধমকাচ্ছিল আমায়। যেন বলছিল, 'দেখছ না, সময় বয়ে যায়?'

—পালাব শালা, এদেশ থিক্যে।

ষষ্ঠী বাউরি মাঝে মাঝেই বলে কথাটা। বলি, 'কোথায় পালাবি রে? কোন্ দেশে?'

—যিদিগে দু-চোখ যায়। যিখ্যেনে অমন অষ্ট পহর খিদা নাই।'

ষষ্ঠী বাউরির এই 'অষ্ট প্রহরের খিদে'টার খোঁজ রাখি আমি। সে এক বেয়াড়া সর্বনাশা খিদে। সর্বক্ষণের। জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ঘুমে জাগরণে। সারাজীবন প্রতিটি রাতে বাবুদের সামনে যুবতী প্রত্যঙ্গগুলো একে একে এগিয়ে দিতে দিতে ষষ্ঠীর মা হারিয়ে ফেলেছে, ষষ্ঠীর বাপটা কে! অথচ, সেই জ্ঞান হওয়া অবধি ষষ্ঠীর সব খিদেকে ছাড়িয়ে এই খিদেটাই চাগাড় দিয়ে ওঠে শতগুণ হয়ে। বাপ বিহনে কাঁধে চড়ে তুরকির মেলা দেখা হয়নি ছেলেবেলায়। বাপ বিহনে, এই বয়েসেও কাউকে ঘরে আনতে পারল না ও। সবাই বলে, 'উ শালা বেজন্মাকে কে মেয়া দিবেক্ হে? বাপের নাম জিগালে, শালা গাছের মগডালের দিক ভুল ভুল চেইয়ে থাকে।'

হয়তো এই একটা কারণেই নিজের মাকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারে না ষষ্ঠী বাউরি।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলি, 'তাই যা। চলে যা কোথাও। যেখানে কাজকাম আছে। মা-বেটায় অন্তত একবেলা পেট পুরে খেতে পাবি।'

—মা! ষষ্ঠীর চোখে অসন্তোষ, 'উ কানি বুড়িকে কে লিয়ে যাবেক আইজ্ঞা? আমি একলাই যাব। কালই।'

—কালই?

—হ্যাঁ আইজ্ঞা কাল ভোরেই।'

সহসা বলে উঠি, 'আমি যাব।'

—আপনি? ষষ্ঠী বাউরি যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'আপনি কুথাকে যাবেন আইজ্ঞা?'

—যেদিকে দু চোখ যায়। আমি বিড়বিড় করে বলি, 'এখানে পুলিশের নজরে নজরে নিজের ঘরে চোরের মতো থাকা। আর সয় না। মায়ের মুখের পানে তাকাতে পারিনে আমি। এর চেয়ে চলে যাওয়া ভালো। চোখের আড়ালে, স্মৃতির আড়ালে।'

—তাই চলুন আইজ্ঞা। ষষ্ঠী বাউরি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'দুজনে মিলে থাকব কুথাও। খাটব, খাব। আপনি থাকলে বিদেশে সাহস হবে আমার।'

আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিই।

বলি, 'কাল ভোরে।'

গতিশীল দেশ ও আমার মায়ের কাশি

সন্ধেবেলা হ্যারিকেনের আলোয় খবরের কাগজে পড়ছিলাম। ভারত কারও থেকে শক্তিতে কম নয়।

আমনে দ্বিগুণ উৎপাদন।

ডাস্টবিনের খাদ্য নিয়ে প্রতিপক্ষ চতুষ্পদের সঙ্গে লড়াইতে তিন শিশু গুরুতর আহত। সারাদেশে মহা সমারোহে শিশুদিবস পালিত।

সমাজবিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। বিশ্ববিখ্যাত চোরাচালানকাবী মগনলাল বলেছেন, দেশের কর্তৃপক্ষ চাইলে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। চিড়িয়াখানায় শীতের অতিথিদের সমাবোহ। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের শৈত্যপ্রবাহে তেষট্টি জনের মৃত্যু।

ও ঘরে মা শুয়ে শুয়ে একনাগাড়ে কাশছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি অনেকক্ষণ। ইদানীং মা এমনিই কাশতে থাকেন যখন তখন। লতাপাতাব রস খেয়ে দুদিনের জন্য একটুখানি কমে। আবার বেড়ে যায়।

হেম ডাক্তার বলে. 'ক্ষয় রোগ। দীর্ঘকাল ধরে সুচিকিৎসা চাই।'

পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম মাযেব সামনে। কাশির দমকে চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকখানা ওঠা-নামা করছে হাপরের মতো।

আমার দিকে অতিকষ্টে মুখ তুললেন মা। এবং আমি দেখলাম ওঁর ফ্যাকাশে গালে দুখানি শুকিয়ে যাওয়া জলের বেখা, ভীষণ স্পষ্ট।

সহসা মনে পড়ে গেল, আমার বিরুদ্ধে পুলিশ আর মতিনবাবুর অভিযোগ : আমি নাকি বিষ্ণুপুর থেকে তালডাংরা জুড়ে গড়ে তুলেছি এক বিশাল উগ্রপন্থী ঘাঁটি।

বিষ্ণুপুর থেকে তালডাংরা। টাঁড় মাটি, ধুতমা ডাঙা, কালচে জঙ্গল আর রোগা রোগা আদিবাসী গাঁ। চাঁপা আব ঢেপুযা খাল. 'পিলেন ঘাঁটির' লম্বা চাতাল. পিয়ার ডোবাব ইস্টিশন আব কুষ্ঠ রোগীদের ব্যাবাক। পুবো এলাকার মানচিত্রটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ছবির মতো।

অপরাধী গলায় মাকে বলি, 'কাল আমি চলে যাচ্ছি এই এলাকা ছেড়ে।'

আমার দিকে ভাবলেশহীন চোখে চাইলেন মা কয়েক পলক। তারপর প্রবল বেগে কাশতে লাগলেন।

কেন্দ্রীয় গুদামে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য

তখন ভোরের আলো ফোটেনি। দরজায় মৃদু ঘা পড়ল। দরজা খুলে দেখি থানার বড়োবাবু। পেছনে তাঁর বাহিনী।

উদ্ধত বুটে ছন্দবদ্ধ আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলেন বড়োবাবু। নিঃসঙ্কোচে, যেন তাঁর নিজের বাড়িতেই ঢুকছেন। দরজার মুখে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে রইল দুজন সেপাই।

বড়োবাবু প্রথমেই হাত দিলেন আমার কোমরে। পাঁকের মধ্যে যেমন করে শোলমাছ খোঁজে জেলেবা, তেমনি করে টিপে টুপে দেখলেন, কোনও অস্ত্রশস্ত্র লুকোনো রয়েছে কি না। তাঁর দু হাতের দশ আঙুল অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালো আমার তলপেট, লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষের চারপাশে। আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খানিকবাদে আমাকে ছেড়ে দিলেন বড়োবাবু। আলুথালু তোলপাড় করতে লাগলেন আমার বাক্স-তোরঙ, দেওয়ালের তাক। খাটের থেকে তোষক তুলে ছুড়ে দিলেন মেঝেয়। বালিশের খোলে হাত ঢুকিয়ে পরখ করলেন। একে একে জলের কুঁজো, পায়ের জুতো, বইপত্তর, খবরের কাগজ সবকিছু আঁতিপাঁতি পরখ করতে লাগলেন তিনি।

সহসা পাশের ঘর থেকে কাশির আওয়াজ ভেসে এল। ভীষণ চমকে উঠলেন বড়োবাবু। সেপাই দুটো পলকের মধ্যে বন্দুক তাক করে ধরল ওই দরজার দিকে।

—কাশে কে?

—আমার মা।

সন্দেহের চোখে তাকালেন বড়োবাবু।

—আর কেউ নেই তো?

আমি মাথা নাড়ি।

খবরের কাগজগুলো এলোপাতাড়ি নাড়াচাড়া কবছিলেন বড়োবাবু।

বললেন, 'এসেছিলুম এ দিকে একটা কাজে। ভাবলুম, একটিবার টুঁ মেরে যাই। শুনছি নাকি খুব মিটিং শুরু করেছ লেবারদের নিয়ে! সত্যি?'—বলতে বলতে খবর কাগজের একটি জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল বড়োবাবুর। কেন্দ্রীয় গুদামে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য........

খবরটার তলায় লাল কালির দাগ দিয়েছিলাম আমি। খবরটা খুব রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল আমার কাছে। ভুরু কুঁচকে উঠেছে বড়োবাবুর। আমার দিকে কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'এই কাগজটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।' কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন বড়োবাবু। ঠিক সেই সময়ে বাইরে গর্জে উঠল মোটরের ইঞ্জিন। চমকে দরজার দিকে লাফ মারলেন বড়োবাবু, 'কার গাড়ি এটা?'

—মতিনবাবুব। আমি নিস্তরঙ্গ গলায় জবাই দিই, 'ওর চোরাই চালের ট্রাক রওনা দিচ্ছে কলকাতায়।'

—ও—। নিশ্চিন্ত হলেন বড়োবাবু। ছুটন্ত সেপাইরাও দুলকি চালে ফিরে এল হাসতে হাসতে। বড়োবাবু চৌকাঠ পেরতে পেরতে বললেন, 'চললুম। গুড বয়টি হয়ে থাকবে। একটুখানি বেগড়বাই দেখলে, ডানাটি এক্কেবারে ছেঁটে দোব।'

বড়োবাবু দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

আমি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মতো।

একটু বাদেই দরজার মুখে ষষ্ঠী বাউরিকে দেখা গেল। তাব কাঁধে একখানা শীর্ণকায় পুঁটলি। বলল, 'চলুন আইজ্ঞা। ভোর ভোর রওনা দিলে কষ্টটা কম হবেক্ রাস্তায়।'

আমি নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগলাম ষষ্ঠীর কথাগুলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ষষ্ঠী বাউরি! সন্দেহের ছায়া পড়ল চোখে।

—আপনি তিয়ার হন নাই ইখনো?

পাশের ঘর থেকে একনাগাড়ে কাশির আওয়াজ শুনছিলাম আমি। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ষষ্ঠী বাউরির দিকে। ওর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বললাম, 'কোথায় যাবি রে ষষ্ঠী? মাকে ছেড়ে কোন বিভুঁইয়ে যাবি? তার বুকে আমরা যে বেঁচে আছি আজন্মের শেকড়-বাকড় ছড়িয়ে। প্রজন্ম ধবে তার হাড়ে-পাঁজরায়, রক্তে-মজ্জায়, তার মাটিতে, আকাশে, আলোয়, হাওয়ায়—।' ষষ্ঠী বাউরি আমার কথাগুলো পুরোপুরি বুঝল কি না কে জানে!

বলল, 'ইদেশে থাইকলে একদিন নির্ঘাত মইরে যাব আইজ্ঞা।'

—না, মরব না। আমি প্রগাঢ় আস্থায় উচ্চারণ করি, 'ঘরে ফিরে যা তুই। সব্বাইকে খবর দে। আজ রাতে কাওয়াশোলের জঙ্গলে মিটিং হবে।' □

বার্তা

সিদ্ধার্থ ঘোষ

পিছনে পাঁচিলের বুড়ো ইট। ইটের জীর্ণতার ফোকরে ভিজে চটচটে শেওলা এবং একটি দেড় হাত অশ্বথ গাছ। সামনে ছজন উদ্যত রাইফেলধারী। পিছনে কালো গাড়ির একজোড়া জ্বলন্ত চোখ।

মাঝখানে সন্তু, বিল্টু আনন্দ আর তপনদা। এবং সকলেই নিশ্চল।

গাড়ির হেডলাইটে চারজনের চোখের তারা কুঁচকে আছে। সি আর পি সেপাইগুলোর পিঠে আলো পড়ছে। তাদের মুখে অন্ধকার।

বোল্ শালা—মাও সে তুঙ শুয়োরের বাচ্ছা। বোল্!

বলো, বলো —বললেই তোমাদের ছেড়ে দেব! মাও সে তুঙ শুয়োরের বাচ্চা বলে স্বীকার করে নাও, এখুনি ছেড়ে দেব। অসুবিধের কী আছে। অফিসারের ভাষা সেপাইদের মতো নয়। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। শিক্ষিত। আর শিক্ষাই শালীনতার বাহন। 'এক মিনিট সময় দিচ্ছি—চিন্তা করে দ্যাখো —যে-যে বলবে তাকেই ছেড়ে দেবো—এখন বাজে—', অফিসার পাশ ফিরে গাড়ির হেডলাইটের আলো নিল ঘড়ির ওপর, 'ঠিক দুটো সতেরো—তার মানে—'

সন্তু : শালা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে! অতই সোজা। তপন দা থাকতে আমরা কেউই নিজে থেকে...

বিল্টু : ডিসিশান তপনদার ব্যাপার। আমাব ভাবার কিছু নেই। সেপাই হারামিরা এত মাল টেনেছে যে...

আনন্দ : যদি ওইটুকু বললেই ছেড়ে দেয়, ক্ষতি কি বলতে, কিন্তু তপনদা কি...না, তপনদা যদি মাথা নিচু না করে সেটা হঠকারী সিদ্ধান্ত হবে। এরকম পরিস্থিতিতে—

তপনদা : সন্তু বিলটু আনন্দ আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। আমি যা বলব ওরা মেনে নেবে। আনন্দ ভয় পেয়েছে বুঝতে পারছি। স্বাভাবিক।

...দুটো বেজে সতেরো মিনিট দু সেকেন্ডে...:

সন্তু : মা যখন কাল খবর পাবে কী করবে? খবর পাবে কি না সেটাও অবশ্য বলা মুশকিল কিন্তু পেলেও কি...মা, তুমি ভুল করছ না, ভুল বুঝেছ, অবিচার করেছ আমার ওপর। আমি মরে গিয়েও তোমাকে বোঝাতে পারব না? মা এত খোঁড়াচ্ছ কেন? সায়াটিকার ব্যথাটা আবার..দিদির চোখের কোল বসে ঘন কালি, সাজলে অবশ্য...মার্কেটের ধারে কালো গাড়িটার চাকাগুলোর আবার সাদা-ডোরাকাটা...না মা, এটা ভুল, আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন নই। ক্লাস টেন, তারপর হায়ার সেকেন্ডারি, তারপব বি এ এবং তারপর বেকার। হিসেব করেছ কোনওদিন? মেসোমশাই? তুমি কি বিশ্বাস কর়ো, মেসোমশাই চাকরি করে দেবে? শালা! ওদের বাড়িতে পা দিলেই নিজেকে আমার...বাবা মারা যাওয়ার পর দুশো টাকা ঠেকিয়েছিল। আসলে টাকা ধরিয়ে কর্তব্য খালাস। আর আসতে হল না আমাদের ঘরে। মা তুমি পা ছড়িয়ে বসে রান্না কোরো না! আমার বড্ড খারাপ লাগে। মা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে উঠোনে নামার আগেই সাদা-ডোরাওলা চাকাগুলো তোকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যায়, তাই না দিদি? দিদির সঙ্গে কদিন কথা বলিনি! ধরে নিচ্ছি বি-এ পাস করলে চাকরি হত। কিন্তু ক্লাস টেন থেকে বি এ—ক বছর? ইস্কুল না ছাড়লেও সাদা-ডোরাওলা কালো গাড়িতে চড়তে হত দিদিকে। আমাদের কী এমন অভাব ছিল যে তোকে....দিদি তুই শর্টকাট পথটা খুব চটপট চিনে ফেলেছিস...

বিল্টু : হাতে আঠা মেখে সং সেজে বেপাড়ায় মরতে হবে নাকি! কেস কিচাইন। কোনও মানে হয়! শেষ পর্যন্ত পোস্টার মারতে গিয়ে—তাও যদি অ্যাকশানে ধরা পড়তাম! আঠা শুকিয়ে হাতের তালুটা মাইরি চড়চড় করছে। শালা গুলি খেয়ে মরবার পর আমারও ওই রকম দাঁত ছিরকুটে যাবে নাকি? চোখ মার্বেলের মতো? জীবন গাঙ্গুলির মতো? কক্ষনো না—জীবন গাঙ্গুলি ভয় খেয়েছিল—নিশ্চয় চিৎকার করতে যাচ্ছিল। ওই রকম কুচ্ছিতভাবে মরা চলবে না। হ্যাঁ, এই এক কথা। আচ্ছা, মরে যাওয়ার সময়েও মানুষের কি খেয়াল থাকে শেষ পর্যন্ত? আলবত থাকে! থাকতেই হবে। ছি ছি—শালা দুটোকে মেরে মরতে পারলে আপসোস থাকত না। এইসব পোস্টার-ফোস্টার মারার যে কী দরকার! এই হারামিরা তো কই পোস্টার মারে না! আজ আমাদের চারজনকে খুন করার পর কি কাল ওরা ওয়ালিং করবে! ছোঃ! জানি জানি তপনদা. তুমি বলবে ওদের হাতে খবরের কাগজ আছে। বেশ—মেনে নিচ্ছি কাজটা খুব দরকারি। হল? নন্টে আর ঝন্টে আমাদের বিট্রে করেছে। নিশ্চয় বাঞ্চোৎরা কালো ভ্যান দেখেই চোঁচা মেরেছে। একটু যদি আওয়াজ দিত—মারো গুলি! যা হওয়ার হয়েছে। কিন্তু নন্টে আর ঝন্টের কাণ্ডটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। না হলে পরে ওরা আবার অন্যদের বিপদে ফেলবে।

আনন্দ : বমি পাচ্ছে। কী যন্ত্রণা—মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি আমাদের মেরে ফেলবে? নাকি ভয় দেখাচ্ছে? কী করেছি আমি? পোস্টার মেরেছি। কোনওদিন অ্যাকশান করিনি। পেনসিল কাটতে গিয়ে বুবুর আঙুল কেটে রক্ত...রক্ত দেখলে গা গোলায় আমার! চিরকাল। পুরো ব্যাপারটাই বোধ হয় আমাদের ভয় দেখাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় থানায় নিয়ে যাবে। আমি তো আসতেই চাইনি পোস্টার মারতে। না, ওরা জোর করেছে, তা নয়, কিন্তু তপনদার কথাবার্তা যা—না বলতে পারিনি। এখন উপায়? উপায় কী? তপনদা, বুঝতে পারছ? শুধু শুধু আমায় টেনে আনলে! আমি তো বাংলাটা ভালো লিখি। স্বীকার করবে তো? দুটো হ্যান্ডবিল পার্টির, আমারই লেখা তো! কাজে তো এইভাবেও লাগতে পারতাম। রাজনীতি আর সংস্কৃতি এক করে ফেলে এই বিপদে...মাগো...ওঃ...লু শুন-এর চারটে প্রবন্ধ অনুবাদ করে পাঠাইনি? গ্রামের কমরেডদের জন্যে? সেটা কাজ নয়? সহ্য করতে পারছি না! আমি কি পড়ে যাব? আরেকটু পিছিয়ে দাঁড়ালে তো দেওয়ালে ঠেস রাখতে পারতাম। না—না—খুব রিস্কি! একটুও নড়া চলবে না! পালাবার চেষ্টা করছি ভেবে ভুল করে যদি! না না তা কখনও হয়। মিথ্যে ভয় পাচ্ছি। এত নৃশংস হবে? মাও সে তুঙ-এর কটা উদ্ধৃতি, পোস্টার মারার জন্যে—না, এটা পার্টির প্রচার। করতেই হয়। ক্যাডারদের খেপিয়ে তুলতে। খেপিয়ে রাখতে না পারলে কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না—কিন্তু কী করে এত বড় ভুলটা করলাম। সব বুঝেও। তপনদা বলল বলেই আমার বীরত্ব দেখাবার কী দরকার ছিল। এই বীরত্বের কী প্রয়োজন? এর চেয়ে দুটো অনুবাদ তো...

তপনদা : সন্তু বিল্টু আনন্দ! কী ভাবছে? সারেন্ডারের কথা ভাবছে নাকি? আনন্দ ভেঙে পড়েছে নিশ্চয়। স্বাভাবিক। ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড। দোষ দেওয়া যায় না। এতটা তৈরি ছিল না! না আনলেই হত। বুঝতে পারিনি নিজেও। সন্তু! সন্তু কী ভাবছে? আমাদের চারজনের প্রাণের চেয়ে পার্টি অনেক ইম্পর্ট্যান্ট! হ্যাঁ—ঠিক তাই। সন্তু এ সব কিছুই ভাবছে না। আমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত। সবচেয়ে ঠান্ডা মাথা ওর। অ্যাকশন করার সময়ে বা তার আগে বা পরেও কোনও বিকার দেখিনি কখনও। আর বিল্টু? বিল্টু আমায় দোষ দিচ্ছে খালি হাতে এখানে টেনে আনার জন্যে। ওর হাত নিশপিশ করছে। বিল্টু ঘাড় কাত করে আকাশের দিকে তাকিয়ে...এরই মধ্যে উদ্ধত। ওর বয়স চোদ্দো, কেউ ভাবতে পারে? এগারো বছর বয়স থেকে মাস্তান। ভোটে দলবাজি, স্ট্রাইকে ইউনিয়ানবাজি...প্রয়োজনে সবাই ওকে ডেকেছে। আমরাও কি ওর সাহসটাকে ব্যবহার করেছি? তা হলে আমরাও তো—না, সেটা সত্যি নয়। রাজনীতির পাঠ হয়তো বই থেকে নেয়নি কিন্তু...আমরা পয়সার বদলে ওর কাছ থেকে গুন্ডাবাজি দাবি করিনি। গত বছরে ওর যা দুরবস্থা গেছে টাকা পয়সার ব্যাপারে...এমন কোনওদিন হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে ও কি আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে? মনে করছে না তো খালি হাতে মরবার ব্যবস্থা আমি—না না, আমি শুধুই ওদের অবিশ্বাস করছি। দ্বিধাটা আমার নিজের। আমায় শুধু চারজনের কথা ভাবলে চলবে না। পার্টির কথা—বিপ্লবের প্রয়োজনই সবচেয়ে বড়—আমার

সিদ্ধান্ত সেই রকম হবে। তাতে যদি কেউ মনেও করে—না না, আমায় নির্ভীকভাবে এই চরম মুহূর্তটার মোকাবিলা করতে হবে। অনেক অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল। অনেক ভুল শোধরানো দরকার। আজই কি সব মনে পড়ছে? এতদিন কী করেছি? নেতা হয়েই কি খুব সন্তুষ্ট মনে...আসলে কাজের মধ্যেই ভুলগুলো শুধরে নিতে চেয়েছি বোধ হয়। তার মানে নিজের নেতার স্থানটা না টলিয়ে, এই তো? কথাটা কি ঠিক? তা হলে কেন নিজের কাজের আলোচনা সমালোচনা শুরু করিনি...এখন আর আপসোস করে কী লাভ। সেই গ্রামে যাওয়া হল না। শহরে কি কাজ নেই? মেকানিক্যাল চিন্তা আসছে। শহর মানে শ্রমিক। শ্রমিক সংগঠন গড়তে পারতাম যদি ঠিক মতো—পারিনি। স্বীকার করতেই হবে শ্রমিক ফ্রন্টে আমাদের পার্টি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি। সব শ্রমিকই কি গ্রামে চলে যাবে নেতৃত্ব দিতে? শ্রমিকরা শ্রমিক হিসেবে কী ভূমিকা নেবে? ভুল করেছি বাবার মুখের দিকে চেয়ে গ্রামে যেতে অস্বীকার করে। আজ মরে যাই যদি, কাল কে দেখবে বাবাকে? সেই তো একই ব্যাপার। ক'দিন আগে আর পরে। ইজিচেয়ারের ক্যানভাসটা ছিঁড়ে গেছে। বাবা বসবে কোথায়? সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা? বাবা অথচ একবারও কিছু বলেনি। গ্রামে চলে গেলে বাবা আপসেট হয়ে যেত! জ্যান্ত অবস্থায় অসুস্থ মানুষকে ছেড়ে চলে যাওয়া আর মরে সরে যাওয়া। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত! শান্তা বাবার খোঁজ নেবে। ইজিচেয়ারের ক্যানভাস পালটে দেবে। আমায় ছাড়া বাবা আর কাউকে আপনজন মনে করে না। ভুল চিন্তা। কিন্তু সব ভুল শোধরানো যায় না। ভুল শোধরানোরও একটা বয়স আছে। শেষ বিচারে পৃথিবীটা যুবকদের—যৌবনেরই রাজত্ব—মাঝে মাঝে খোঁজ নিও শান্তা—

....দুটো সতেরো মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড...

সন্তু : মা, কথা বলছ না কেন? কী করেছি আমি? আমায় দোষ দেবে দাও, দিদিকে প্রশ্রয় দিও না। দিদি, নিজের অন্যায়কে ঢাকার জন্য একটা যুক্তি হিসাবে আমাকে সামনে দাঁড় করাসনি। আমি যা করেছি মায়ের জন্য করেছি—দিদির জন্য করেছি--হ্যাঁ, ঠিকই করেছি। এইটাই পথ। সমস্যাটা শুধু আমাদের নয়। কতদূর কী করতে পেরেছি তা অবশ্য জানি না। হর্ন দিচ্ছে কে? সাদা চাকাওয়ালা...অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল...হ্যাঁ...দিদি, ওই সাদা চাকাওয়ালা গাড়িবাবুকে শেষ করে দিতে পারিনি...স্রেফ দুর্বলতা। দুর্বলতার জন্য। ইচ্ছে করলেই পারতাম। একটা জোঁক কমে যেত। দিদির কপালে সিঁদুরের দাগ দেখেছি...তিন দিন বাদে ফেরার পর...কেন পারলাম না তবু? কেন? একা একা এ কাজ করা ঠিক হত না। আমার হাতে পার্টি অস্ত্র দিয়েছে....ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে...না, এ শুধু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়। সে তো আমি জানি। তবু বার বার মনে হয়েছে, এই বিদ্বেষ মেটাবার জন্যই পার্টিতে যোগ দিইনি তো! জানি, তপনদা বলবে, তোর আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। সমস্যাটা তুলে ধরা। লোকাল কমিটি। ইনভেস্টিগেশন হত। ইনভেস্টিগেশনে মৃত্যুদণ্ড পেতই হারামিটা। এমন সাদা চাকাওয়ালা গাড়ি কি একটা? আমার দিদি কি একা...মাপ করো তপনদা, ইনভেস্টিগেশন মানে দিদিও তো বলতে পারিনি...মধ্যবিত্তের লিমিটেশন। খুব সত্যি। যতই হোক দিদি...দিদি, দেখছিস তো, তোর জন্যে...মা, শোনো, দিদিকে আমি ভালোবাসি। সত্যি ভালোবাসি। দিদি, তুই আমাকে তোর ভাগের রসগোল্লা খাইয়েছিলি...ক্লাস ফোরে...তোমরা কেউ বুঝলে না! আমি মরার পরেও কি বুঝবে না? অমল স্বপনদের বাড়ি থেকে অমন দূর্ দূর্ করে? ওরা আমার কমরেড। ওরাই তো দেখবে তোমাদের। ওদের একটু ভালোবাসতে পারো না?

বিল্টু : দ্যাখো দ্যাখো, সি-আর-পি হারামিগুলোকে—কাঁপছে। ইশ্! কী চান্স! পাঁচিলের পিছন থেকে গোটা দুয়েক কেউ যদি টপকে দিত। ওহ্—সব শালা সিয়ারাম করে হাওয়া হয়ে যেত! জনা দুয়েক অন্তত আমরা ভাগতে পারতাম। কিন্তু কেউ তো খবরই রাখে না। বেপাড়া। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিনিশ হয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয়। এই জন্যেই শালা জিনিসপত্তর দরকার—শুধু ছোরা-পেটোর কম্মো নয়। থাকত হাতে এল এম জি—শালা পুরো ব্যাটেলিয়নকে শুইয়ে দিতাম। না না তপনদা, তোমার কথার এটা প্রতিবাদ নয়। বলছি, মাঝে মাঝে দরকার পড়লে ব্যবহার করার কথা। যেমন আজকে—এখন! তুমিই বলো, শুধু

শুধু ধরা পড়ে মরে গিয়ে লাভ আছে? সেপাইগুলোর অবস্থা কাহিল। রাইফেল তাক করে রেখেছে, কিন্তু কাঁপছে ভেতরে ভেতরে। অফিসারটা কিন্তু স্টেডি—ঝানু মাল। টসকাবার জিনিস নয়। ও শালা জীবন গাঙ্গুলির মতো মুখ হাঁ করে মরবে না। সেটা জানি। এই জন্যেই বলি, ছুঁচো মেরে শুধুই হাত গন্ধ হয়। যারা ভয়েই আধমরা তাদের আর খতম করে লাভ কী? চমকে দিলেই তো হল। তা ছাড়া মনটাও তো কনকন করে। খতম করতে হয় তো এমনি মাল। যেগুলো মানুষ নয়। হ্যাঁ—এই সাফ কথা। সে তো হল। এখন উপায়? এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আচ্ছা, যদি সোজা ছুট মারি? ডাইনে বা বাঁয়ে চেপে? সেপাইয়ের বাচ্চারা সবকটা অমনি আমার দিকে ফিরে—হ্যাঁ, কিন্তু তার মধ্যেই লাক থাকলে ওই গলিটার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পারি। তার চেয়েও বড় কথা, তপনদা বিল্টু আর সন্তু যদি ঠিক তখুনি ছুট মারে উলটো দিকে—চারজনের মধ্যে দুজন অন্তত কাটবার একটা চান্স নিতে পারে। আরও ভালো হয়, আমি যখন ডানদিকে ভাগব, যদি বিল্টু তখন সোজা সেপাইদের দিকে ছুটে যায়। কোনওরকমে গাড়িটার পিছন দিকে যদি চলে যেতে পারে, কিছুতেই ধরতে পারবে না। এই গলি দিয়ে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতেই—হ্যাঁ, তবে তার জন্যে সাহস চাই। দৌড়নোর ক্ষমতা। আনন্দ ভিতু—তপনদা অত ছুটতে পারবে না—পারলে সঞ্জুই! আনন্দ আর তপনদা অবশ্য চান্স নিতে পারে বাঁ দিক দিয়ে ভাগবার—কিন্তু—কিন্তু আমি ছোটার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যদি দৌড় না লাগায়, তা হলে কিছুই হবে না। ওরা হয়তো তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি মুখ থুবড়ে পড়ব। তার চেয়েও শালা সাংঘাতিক—সেপাইগুলো যদি ভাবে আমি ভয়ে পালাচ্ছিলাম! আব অফিসারটা যদি তখন হাসে—শালা শুয়োরের বাচ্চা, জানিস না বিল্টু কখনও...

আনন্দ : আসলে ইগো! হ্যাঁ। আমার মুখের ওপর বলবে, বিল্টু সন্তু আমার চেয়ে অ্যাডভান্সড! বাজে কথা। এটা সত্যি নয়। সন্তুর দৌড় নিউ ডেমোক্রেসি আব কনট্রাডিকশন। বিল্টু তো আরও—রেডবুক' ওই দিয়ে রাজনীতি হয় না। সাহস? তা হলে বোকারাই সবচেয়ে সাহসী। যারা না বুঝেই মরে যায় তাদেব মবতে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই—প্রশ্নই ওঠে না। যারা জীবনকে ভালোবাসে তারাই মরতে ভয় পায়। মরার সময় শহিদ বেদি উঠবে বলে কজন ভাবে? কটা ইট লাগে শহিদ বেদিতে? একশো? এখন ইটের হাজার দুশো টাকা। একটা ইট কুড়ি নয়া। খালি মরা আর মরা। খালি মরার কথা ভাবছি কেন? আমি তো আর মরছি না। মরব কেন? না না। তা কখনও ঘটবে না। হতেই পাবে না। কেন যে বাড়িতে বলে আসিনি ছোড়দিকে জানিয়ে এলেও এতক্ষণে বাবা নিশ্চয়—অবশ্য যদি জানত আমার পরিচয়, এই রকম রসিকতা করার সাহস পেত না। না না, ভয়ের কিছুই নেই, শুধু তপনদা যদি গোঁয়ার গোবিন্দের মতো—তপনদা যদি রাজি হয়ে যায় ভালোই, না হলে আমি—এবার ছাড়া পেলে আব এই হঠকারী কাজে...আমি সৎ কিনা প্রমাণ দেওয়ার দায়িত্ব—বিশ্বাস করতে পারো তো আমার সাহায্য নিও, নইলে নিও না—মিটে গেল। আমাকেও মনটা শক্ত করতে হবে। বিপ্লবীদের একজন হওয়ার লোভ—লোভই তো—তা ছাড়া কি—শুধু সমর্থক বলবে আমাকে এটা সহ্য করতে পারিনি বলেই ভুলটা করেছি। কিন্তু সমর্থক হয়েও যদি বিপ্লবের জন্য কিছু করা যায়—কী দরকার বিপ্লবী নাম কেনার? নামে কী আসে যায়? তপনদা চুপ করে কেন? এখনও সেই হঠকাবী জেদ! না না—প্লিজ তপনদা, প্লিজ। এমন ভুল কোরো না। এতগুলো জীবন নিয়ে তুমি... এটা বিপ্লব নয়। আর ক সেকেন্ড? হয়তো ইয়ার্কি করছে। কিন্তু বিশ্বাস কী? হঠাৎ যদি...অফিসারের আদেশ না মেনেই গুলি চালিয়ে...ভুল করেও তো ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ে যেতে পারে। ওগুলো কি লোডেড? বলো বলো তপনদা—তোমাকে বলতেই হবে। চার চার জনের জীবন...

তপন : সত্যিই শান্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানানো হয়তো শান্তাকে ছোট করা। তবু—আর যে কিছু দেওয়ার নেই আমার। শান্তা, তুমি তো আমায় প্রতারক ভাবনি, সেটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। একটা অবলম্বন। নিজেও ভাবিনি কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে। কেউ বিশ্বাস করতে পারে ভাবিনি। আসলে আমি শান্তাকে আন্ডার এস্টিমেট করেছি। শান্তার কমিটমেন্টকে। তাই শান্তা বিশ্বাস করেছে দেখে অবাক হয়েছি। বিয়ে করা যে সম্ভব নয়, মানে কোনও স্থায়ী সম্পর্ক—সে তো আগেই জানতাম। তারপরেও সম্পর্কটা কেন অতদূরে টেনে নেওয়া? শান্তা, তুমি কি জানো এটা অন্যায়? এটা দুর্বলতা। মুখে যা-ই বলে থাকি,

এটা সত্যিই দুর্বলতা। শুধু প্রেম নয়—তুমি আমায় অদ্ভুত একটা শান্তি দিয়েছ। একটা নির্ভর করার জায়গা। কেমন নিশ্চিন্ত হতাম তোমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পেলেই। মায়ের আদর কোনওদিন পাইনি আমি। অল্প বয়সে যাদের মা মরে যায়, তাদের সবারই কি একরকম কিছু আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়? সব জেনেশুনেও তোমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারিনি। তুমি তো বলেইছিলে, তোমার লিমিটেশনের কথা। তবু, ভেবেছি—মানে নিজেকে দিয়ে ভাবিয়েছি—একদিন ঠিক তুমি পার্টিতে যোগ দেবে। ভেবেছি, কারণ না ভাবলে সম্পর্কটা যে হারাতে হত। হারাতে খুব ভয় ছিল। শান্তা, তুমি সাহায্য না করলে আমি এভাবে মনপ্রাণ উজাড় করে পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম না। তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, কাজ করতে দিয়েছ, আবার তারপরেও যখন ফিরে এসেছি.. না, আমি ভাবতে চাই না...অনেক পেয়েছি তোমার কাছে। বোধ হয় দেবে বলেই দিয়েছ, পাওয়ার জন্য দাওনি? তুমি আমার এ সব কথা বিশ্বাস করনি কোনওদিন। হয়তো করবেও না। তুমি আমায় যত বড় ভাবো, আমি তা নই। কক্ষনো না। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। মানুষ যন্ত্র নয়। নিখুঁত নয়। প্রেম ভালোবাসা মায়া মমতা সবই আছে তার। আর তাই যখন কর্তব্যের তাগিদে এগুলোকে পুরো অস্বীকার করতে হয়, বাধ্য হতে হয়—তার ঘৃণা জাগে। আজ যে আমরা চারজন এখানে দাঁড়িয়ে তার কারণও তো তাই। মরব বলে তো আজ মরতে বসিনি। বাঁচতে চাই বলেই—না, না, আমি মরার কথা নিয়ে ভাবতে পারি না। আবোলতাবোল চিন্তা করেছি। সময় তো শেষ হয়ে এল। শুধু নিজের কথা ভেবেই—আমি এখন একা নই—চারজন—চারজনের দায়িত্ব আমার ওপর। এখন কী করা উচিত? আমার সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে পার্টির সিদ্ধান্ত। যদি শুয়োরদের কথামত মেনেও নিই—মানে ট্যাক্টিকালি যদি—হ্যাঁ, মাথা নিচু করায়—যদি করিও—বাঞ্চোৎরা কি ছেড়ে দেবে আমাদের? বিশ্বাস করা শক্ত। তা ছাড়া মাথা নিচু করা মানেই শরীরের মৃত্যুর আগে বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটাব আমি। কিন্তু সন্তু বিল্টু—ওরা যদি সবাই এক্সপেক্ট করে—মানে একটা চান্স নেওয়া আর কি—শেষ চেষ্টা হিসেবে—কিন্তু ওরা কি ওরকম কিছু এক্সপেক্ট করতে পারে! কী চায় ওরা আমার কাছে! কেন আমি এ প্রশ্ন করছি? তবে কি আমি যা চাইছি সেটা ওদের ইচ্ছে বলে চালাতে চেষ্টা করছি? আমি কি ভয় পেয়েছি? আমি কী চাই এখন আমার কাছে? কী চাই আমি? মৃত্যুকে এত বড়ো করে দেখছি কেন? কেন মেনে নিতে পারছি না? এর চেয়ে আরও বড়ো স্যাক্রিফাইস করবার জন্যে তো—তবে কি সেগুলো শুধু কথার কথা ছিল—এইটুকু দ্বিধাই বা আসছে কেন? প্রথম মুহূর্তেই গর্জে ওঠা উচিত ছিল—মাও সে তুং জিন্দাবাদ! কেন পারিনি? কেন? পরিস্থিতিই কি এর জন্যে দায়ি? এই অন্ধকারে, সবার চোখের আড়ালে, অজান্তে, আমাদের মৃত্যু কোন কাজে লাগবে? কাদের জন্য আমাদের এই মৃত্যু? কেউ যদি না-ই জানল, অপঘাতে মরার মতো এই মৃত্যুর কী দাম? মৃত্যুকে যদি কাজেই না লাগাতে পারা যায়—

.....দুটো বেজে সতেরো মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ড...

—আর পাঁচ সেকেন্ড! ফাইভ সেকেন্ডস মোর! অফিসার মনে করিয়ে দিল। এখনও সুযোগ আছে: হয়তো ভাবছ, আমি কথা রাখব না। বিশ্বাস করা যেতে পারে। আই মিন—বিশ্বাস করা ছাড়া অবশ্য দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ। করার কিছু নেই।'

বিল্টু এক ধাবড়া থুতু ছিটিয়ে দিল।

আনন্দের ওয়াক উঠল। মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে শরীর।

সন্তু সামান্য ঘাড় কাত করে তাকাল তপনদার দিকে। তপনদা কী দেখছে ঘাড় উঁচু করে? সন্তু তপনদার দৃষ্টি অনুসরণ করতে চাইল।

তপন : দূরের অন্ধকার আকাশে ডোরা ডোরা সাদা রেখা। এক এক ঝাঁক সাদা আলোর সমান্তরাল নকশা। কি ওগুলো? বাড়ির জানলা খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে ঘরের ভেতরকার আলো। একটু আগেও তো অন্ধকার ছিল। ওই—ওই আরেকটা—পাশের বাড়িটাতে—তার মানে লোক দেখছে—জানতে পেরেছে—

ওই আলোর ফালির পিছনে পিছনে মানুষ রয়েছে চোখ ঠেকিয়ে। তার মানে অন্ধকারে বসেও অনেকে লক্ষ করছে নিশ্চয়। ওরা লক্ষ করছে। নজর রাখছে। ওরা সাক্ষী। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় চারজন অভিযুক্ত জ্বলজ্বল করছে। দর্শকদের চোখের আড়ালে কিছু ঘটবে না। সাবাশ। এই তো চাই। আর এই মৃত্যু হারিয়ে যাবে না।

'রেডি'—অফিসারের কণ্ঠে দ্বিধা নেই। সন্তু আর তপনের চোখে চোখে কথা হল। দর্শকরা সক্রিয় ভূমিকা নেবে না এখন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না—

মৃত্যুকে ওরা প্রতিবাদ করে তুলল—'মাও সে তুঙ।'—তপনদা হাঁকল।

'জিন্দাবাদ!'—সঞ্জু ও বিণ্টু। আনন্দ সেই মুহূর্তে হাঁ করেছিল কিন্তু—বিণ্টুও জিন্দাবাদে গলা মিলিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল সামনে—

রাইফেলের শব্দে বাতাস চিরে গেল। সঞ্জু তপনদাকে ভেদ ক'রে বুলেট পৌঁছল দেওয়ালে।

রাইফেল আবার চেঁচিয়ে উঠল। মাটি থেকে ধুলো উড়ল। ওরা নিশ্চয় হয়ে যাওয়ার পরেও বুড়ো পাঁচিলের গায়ে শিশু অশ্বত্থের পাতায় কাঁপন চলছিল।

আনন্দ আর কিছু বলার সুযোগ পেল না।

বিণ্টু একটা সেপাইকে জাপটে ধরেছে। ধস্তাধস্তি। বিণ্টুর কপালে অফিসার রিভলভারের নল ঠেকাতেই আলিঙ্গনাবদ্ধ সেপাই আর্তনাদ করে উঠল প্রাণভরে—'মরা গিয়া'—

'মাও সে তুঙ'—অফিসারের অটোমেটিক বিণ্টুর শেষ কথাগুলো মুছে দেওয়ার পরেও যেন বিশ্বাস করে থামতে পারছিল না।

কিন্তু ওদের বার্তা তো ওরা পৌঁছেই দিয়েছে। ওই টুকরো টুকরো আলোর ফালির কাছে।

ওই আলো ছড়িয়ে পড়বে। আর তার সঙ্গেই ছড়াবে বার্তা। □

প্রসব

স্বর্ণ মিত্র

হৃদয়পুরের কাঁচা রাস্তায় পা দেওয়ামাত্র আন্না পথের ওপর পেট ধরে বসে পড়ে। ঠিক সীমান্তরক্ষীর ক্যাম্পটির সামনে।

. খানিকক্ষণ সে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করে। আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছিল, তারা কেউ তাকাল, কেউ তাকাল না। যারা তাকাল, তাদের মায়া হল। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে স্থায়ী হল না। যার যার নিজের নিরাপত্তাটুকু এখন আগে। তারপর বাকি মানুষদের জন্য দয়া-মায়া, সহানুভূতি ও করুণা।

সামনে তারকাঁটা দিয়ে সাময়িককালের জন্য ভোর ছ'টা পর্যন্ত হৃদয়পুরের সীমান্ত ঘেরা। সীমানার এ দিকে আজ ভোররাত থেকে জোর তল্লাশি চলছে। দশ হাত দূরে দূরে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী। হাতে বন্দুক নিয়ে তারা দৃঢ় সংকল্পে ব্রত। অথচ চোখে-মুখে একটা চাপা আতঙ্ক আর ভয়। কারণ এখন গোটা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে টানাটানি। অবশ্য এমন রহস্যময় পরিস্থিতির সঙ্গে এলাকার মানুষেরা বেশ খানিকটা পরিচিত। কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছবেরও বেশ কিছু আগে সাঁওতাল হুলের প্রধান নায়ক সিদুমাঝি-কানুমাঝি এই অঞ্চলেই নাকি ঘাঁটি গেড়েছিলেন। এক পক্ষকালের মধ্যে কেবল ওঁপারবান্ধা ও লাঙ্গুলিয়া থানার তিরিশটিরও অধিক গ্রাম তাঁদের দখলে এসেছিল। লোরোজোর থেকে দেওঘরের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটাই তাঁরা মাসখানেকের মধ্যে দখল করে নিয়েছিলেন। আরও শোনা যায়—সেপ্টেম্বর মাসে ওপারবান্ধা গ্রাম থেকে খানিক দূরে প্রায় সাত হাজার সাঁওতাল মাটি কেটে গড় নির্মাণ করে সেই দুর্গাপুজোর উৎসব করেছিলেন।

প্রায় পৌনে দুশো বছর পথ হাঁটার পর গাঁয়ের কূলে আবার এই পুরোনো পরিস্থিতি—রাজায়-প্রজায় যুদ্ধ। গঞ্জের মুখে খদ্দেরের অভাবে ভরদুপুরে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে ভুজঙ্গ কব্‌রেজ আশঙ্কার স্বরে বলেন, 'চারদিকের অবস্থা দেখে বোঝা যায়—কলিযুগ সতাই এবার শেষ হতে চলেছে।'

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই গাঁয়ের মানুষেরং দীর্ঘ পথ হাঁটা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের চলাফেরা ক্রমশ খাপছাড়া আর রহস্যময় হয়ে ওঠে। চেনা মুখের সন্ধান না পেলে হনহন করে হেঁটে চলে যায়। অনাত্মীয়ের মতো। নির্জনতার বিস্তৃতি আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মুখময় যন্ত্রণা আর অস্বস্তি নিয়ে আন্না আবার পেট ধরে উঠবার চেষ্টা করে। খানিক উঠে আবার সে বসে পড়ে। যেন দশ মাসের পেটটা এখনই এক অসহনীয় জন্ম-যন্ত্রণা সৃষ্টি করবে। এই পেটটাই এখন তার বড়ো সম্বল। বড়ো আতঙ্ক আর উত্তেজনা।

ছিব্‌ড়ানো শরীর। হাতে কয়েকটা কাচের চুড়ি। উদ্‌লা গা। পোড়-খাওয়া চাটুর মতন রং। গায়ে জড়ানো তেলচিটে ডোরাকাটা একফালি কাপড়। থ্যাবড়ানো নাকে চ্যাপটা পেতলের নাকছাবি। কোনও উজ্জ্বলতা নেই। বাঁহাতে শিবের উলকি। চুলগুলো সামান্য ভেজা। গোছ দেখলে বোঝা যায়, এককালে ঘনত্ব ছিল। চোখ দুটো বড়ো হলেও সুন্দর নয়। গর্তে ঢুকে গিয়ে পোয়াতি চাউনিটা যন্ত্রণাক্ষুব্ধ।

শরীর আন্দাজে বেমানান পেটটা নিয়ে আন্না আবার দাঁতে দাঁত ঘষে দু'ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল। যে সব লোকের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ আছে, তাঁরা দেখলে হেসে কুটিপাটি হত।

বাজার থেকে কেনা হ্যালেঞ্চা শাকের আঁটি হাতে সে একটু একটু করে সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করল।

—খবরদার!

আন্না থামে। পোয়াতি শরীরের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। সারি সারি খাকি পোশাকের মানুষ। হাতে বন্দুক। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে। পাথরের মতো। নির্দেশ পাওয়ামাত্র সচল হয়ে উঠবে। চোখেমুখে একটা দৃঢ়তার ভাব প্রকাশের কঠোর প্রচেষ্টা। অথচ দৃষ্টিগুলো কেমন চঞ্চল। ভয় আর চঞ্চলতা।

তবু আন্না পা টেনে টেনে এগোয়। থামবে না সে। পরিণতির কথাও জানে। বাপ-ঠাকুদ্দার মুখে, খুড়ি-পিসির কাছেও পুলিশের হামলায় পোয়াতি-বউয়ের ইজ্জত হানির নানা ঘটনা শুনেছে এবং সেই কারণে মরণের আগেই মরতে শুনেছে পেটের ছানাকে। তবু সে থামে না। থামার উপায় নেই। তার চেয়ে মরণ ভালো।

আবার হুঙ্কার আসে—'এক দফা বোলে গা, দো দফা বোলে গা, তিন্ দফা মে.........!'

—মুই কী দোষটা করিছি? তীব্র প্রতিবাদের স্বরে কান্‌কেনে গলায় আন্না কথাটা বলে পেটটা ধরে বসে পড়ে। ক্লান্ত চোখে।

এখন আর আশেপাশে কেউ নেই। কোনও লোক নেই। সব ফাঁকা। হৃদয়পুরের জীবনে আর কিছুক্ষণ বাদেই সন্ধ্যা নামবে। সান্ধ্য আইনের শ্বাস বন্ধ করা নির্জনতা নিয়ে।

সীমান্তরক্ষীরা আন্নার প্রতিবাদের কোনও জবাব দেয় না। মুখের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। সেই পূর্বের চেহারা। একইভাবে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার আন্না ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করে 'সিপাহিজি, মুই কোন্‌ঠে ডাকাতি করিছি? কোন্‌ঠে বদ্‌মাসি করিছি? মোকে ঘরে নাই যাতি দিবি কেনে?' কথা বলতে বলতে আন্না আর এক পা এগোতেই আবার হুঙ্কার আসে, 'এক দফা বোলে গা দো দফা মে.....!'

সতর্কবাণী হৃদয়পুরের বিকেল গড়িয়ে যাওয়া নির্জন পরিবেশে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে.......এক দফা বোলে গা দো..........!

শব্দ শুনে কম্যান্ডার সাহেব বেরিয়ে আসেন। ক্যাম্প থেকে। মাথায় শক্ত খাকি টুপি। পরনেও খাকি জামাকাপড়। অকুতোভয় আর দেশরক্ষার গৌরবের জন্য বুকে একটি সাতরঙা ফিতে। রামধনুর মতো। গায়ের রং তামাটে। চোখ দুটো ছোটো কিন্তু কাচের মতন চিকচিক করছে।

তিনি আন্নার দিকে এগিয়ে আসেন। পেছন পেছন অনুগত রক্ষিবৃন্দ। বাঁ ভুরু সামান্য কপালের দিকে ঠেলে তিনি এক পলক রক্ষিদলের দিকে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে তারা সামরিক কায়দায় সেলাম জানায়। তারপর তিনি আন্নার দিকে তাকান। ঘেন্না আর বিরক্তিভরা মুখে।

দশ হাত দূরে আন্না। দুই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে। হাবা-গোবা চোখ দুটোর তলায় মুহূর্তের মধ্যে যেন কালশিটে পড়ে গেছে। চাপা যন্ত্রণায় মুখটা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

—এই মাগি! শালী, তখন থেকে চিল্লাচিল্লি শুরু করেছিস কেন? চোয়াল শক্ত করে খেঁকিয়ে উঠলেন কম্যান্ডার সাহেব।

আন্না এবার যেন কিছুটা চাঙ্গা হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ল্যাংড়ানোর মতন করে কম্যান্ডার সাহেবের পায়ের খানিক দূরে হুড়মুড় করে পড়ে যায়।

কম্যান্ডার সাহেবও কিছুটা হকচকিয়ে যান। তাড়াতাড়ি কিছুটা তফাতে সরে দাঁড়ান। অন্যান্যরা প্রস্তুত হয়ে থাকে—নির্দেশের অপেক্ষায়।

গর্তে ঢোকা চোখ দুটোকে কম্যান্ডার সাহেবের দিকে তুলে ধরে আন্না কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে থাকে, 'বাবু, মোকে ছাড়ি দে! মোর অ্যাকটা ছানাও নাই বাঁচল। ইটাও যদি মরে, তাইলে মোর কী থাকল। ও বাবু—মুই কোনও পাটিতে নাই। কোনও বজ্জাতের সঙ্গি মোর সাঙাৎ নাই। মোকে সাচ্ করবি?' কথাটা শেষ করেই আন্না উরুর ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে তার আধপোড়া বাঁশের মতো শীর্ণ ঠ্যাংদুটোকে বার করে। তারপর রাগে বিরক্তিতে আর খানিকটা তুলতে গেলে কম্যান্ডার সাহেব খেঁকিয়ে ওঠেন, 'থাম্ শালী।' ঘেন্নায়

ওয়াক তুলে একরাশ থুতু ফেলে তিনি ভুরু কুঁচকে রক্ষিবাহিনীর দিকে তাকান। আন্না পাথরের মূর্তির মতো থেমে থাকে।

—বুকের ওপর কী?

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে আন্না জবাব দেয়, 'মোর বুক ছাড়া অন্য কিছু নাই।'

বুকের ওপর থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে কম্যান্ডার সাহেব পেটের ওপর চোখ ফেলতেই আন্না আশঙ্কায় পেটটাকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'দোহাই বাবু। ইটার মধ্যে মোর ছানা গো বাবু। মায়ের কিরা।'

—হা—রামজাদি। পেটে ভাত জোটে না. পেটটা ঠিক বানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বাবুদের জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। মারতে হয় এক লাথ্। বুটসুদ্ধ লাথিটা তুলেও মারলেন না কম্যান্ডার সাহেব। হয়তো ইজ্জত আর ঐতিহ্যের টানে। অহেতুক ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

ঠিক সন্ধ্যার মুখে আন্না ছাড়া পেল। অনুমতি পেল এ সীমানা থেকে ও সীমানায় নিজের ভিটেয় পা ফেলার। শুধু তার নাম, পদবি, গাঁয়ের নাম, সোয়ামির নাম, সরপঞ্চের নাম, পাঁচটা গ্রামবাসীর পরিচয়—জানা-অজানা অনেক প্রশ্নের পরীক্ষা দিতে দিতে সন্ধ্যা শুরু হয়ে গেল।

হৃদয়পুরের সন্ধ্যায় এখন ঘোরাফেরা বারণ।

দিন-দুপুরেও পথে নেমে দাঁড়ায় না কেউ। গঞ্জের থেকে গোরুর গাড়িতে আসার পথেও প্রকাশ্যে গলা হাঁকিয়ে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যেন শঙ্কিত ও স্তব্ধ হয়ে গেছে। গাঁয়ের ঝিমধরা পরিবেশে জঙ্গলের পথ ধরে মানুষের হঠাৎ হঠাৎ অর্থপূর্ণ চলাফেরা নির্জনতার গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সাঁঝের ভিটেয় গেঁয়ো মানুষের চোখ ডিবের আলোর মতোই মিটমিট করে জ্বলে।

আন্না তাড়াতাড়ি হাঁটবার চেষ্টা করে। শীতের কুয়াশায় কণ্ঠস্থ কাঁচা পথটাও কিছুটা ঘোলাটে ঠেকে। হিম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এতক্ষণের উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় তার সমস্ত শরীরে বিনিবিনি ঘাম ফুটে উঠেছে। অথচ এটা মাঘের শীত। আকাশে ছোটো চাঁদটি দিনে দিনে বড়ো হচ্ছে, অমাবস্যার জমকালো অন্ধকার রোজ পিছিয়ে যেতে থাকে।

আন্না ঢাউস ভুঁড়িটা নিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে খানিক এগিয়ে নিবিড় শালবনের ডান পথে তরতর করে নেমে যায়। তার পিছু পিছু ঢালু জমি গড়িয়ে কাঁচা রাস্তার ওপার থেকে টর্চের আলো জঙ্গলের মুখে থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আন্না ভাটিগাছের ঝোপের মধ্যে ঘন অন্ধকারে মিশে যায়।

জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতার বাসী জঞ্জাল মাড়িয়ে সে দ্রুত এগোতে থাকে।

অন্ধকার জঙ্গলের খাপছাড়া মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আন্নার পুরাতন চিন্তায় চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়—চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিবিড় শালবনের ছোট্ট ঐতিহাসিক স্মৃতিপট—পুলিশের গুলিতে মরণের আগে সিদু মাঝি এই বনেই নাকি ছিলেন! তখন জঙ্গল ছিল ভয়ানক ঘন। পথঘাট নির্ণয় করা যেত না। পুরোনো ইতিহাস ভাবতে ভাবতে আন্নার মনে হল, শরীরটা যেন অনেক হালকা হয়ে এসেছে। পেটের বোঝাটাও যেন আর ভার ভার ঠেকে না।

অন্ধকার জঙ্গলের দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ হেঁটে আন্না নির্দিষ্ট সময়ের কিছু দেরিতে ভিটের পথে পা দিল। তাকে দেখামাত্র ছনের বাড়ির ভাঙা বেড়ার ওপাশ থেকে একের পর এক জোয়ান ছায়া বেরিয়ে এল। হনহন করে। ঘরের ভেতর ডিবেয় আলো জ্বলছে।

ঘরের ভেতর ঢুকে ধপাস করে বসে পড়ে আন্না একটা বড়ো রকমের হাঁফ ছাড়ল। তিনটে ছানা-বিয়োনো শুকনো জীবনে এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা! হাত পাগুলোকে শিথিল করে দিয়ে সে বুকের কাপড় টেনে পোড়া দেহের লজ্জা ঢাকে। তারপর বর্ণনা করতে থাকে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ভিটেয় ফেরার কাহিনী। চোখের পলকে একটা চাপা উত্তেজনা বিদ্যুতের ঝলকের মতো বয়ে যায় সারা ঘর জুড়ে।

তারপর সাঙাতদের সামনে ডিবের আলোয়, ছনের চালায়—ছমছমে হৃদয়পুরের সান্ধ্য আইনের বুকে—পোয়াতি আন্না প্রসব করল—চারটে রিভলভার, অনেকগুলো দলিলপত্র এবং—আপত্তিকর লাল বই! □

র‍্যাবিজ্

অলক সান্যাল

দৃশ্যটা প্রথম দেখেছিল রামবিলাস উপাধ্যায়।

অন্য কেউ দেখলে কী হত জানি না, হয়তো কিছুই না, কিন্তু রামবিলাস—!

রামবিলাস এখানকার দাপুটে জমিদারদের, ভাষান্তরে জোতদারদের ডাকসাইটে কুলপুরোহিত, তাছাড়া তাদের দেড়শো বছরের পুরোনো জাগ্রত রঘুনাথজির মন্দিরের সেবাইতও বটে, বংশ পরম্পরায়, সেই ধারাবাহিকতার গুণে তার দৃষ্টিতে এমন এক প্রখর অলৌকিক তীক্ষ্ণতা তৈরি হয়ে গেছে যে, তা দিয়ে সে বোবা পাথরের বুক চিরে ঘুমন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব টের পায়। তাই তার কোনও বিষয়কে বিশেষভাবে দেখার মধ্যে যে একটি গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী। এই কারণেই রামবিলাসকে দেখে আমি প্রথমটা একটু চমকে যাই, মনে হয় আমি বোধ হয় তার এতদিনকার সেই অলৌকিক ক্ষমতার এক্তিয়ারে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছি। সেই ধরনেরই ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

তবে কেবল এটাই একমাত্র কারণ নয়, আরও কারণ আছে. এবং তা আমি বলেই।

ঘটনার সঙ্গে ঘটনা জড়িয়ে থাকে। আজকের ঘটনাও কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তবে তার কারণ খুঁজতে গেলে আমাকে অনেক জট ছাড়িয়ে মূলে যেতে হবে। যাকে বলে সময়ের উজান বাওয়া—তা-ই! নইলে আজকের এই ঘটনা বা দুর্ঘটনার খেই পাওয়া যাবে না।

কেন জানি না, এই মুহূর্তে আমার সেই ছেলেবেলায় কাঠবেড়ালি ধরতে যাওয়ার ঘটনাটা মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমার একবার কাঠবেড়ালি ধরার শখ হয়েছিল। না, শখ নয়, প্রয়োজন। যদিও ব্যাপারটা কতকটা খেলাচ্ছলেই নিয়েছিলাম, চুরি চুরি খেলার মতন, অত সিরিয়াসলি ভাবার মন ছিল না তখন, ছোটো ছিলাম। তবে সে দিনের সেই অভিজ্ঞতার পর আমার শিশুমনে কী একটা কালসিটে দাগ পড়ে গিয়েছিল সে দাগটা এখনও মুছে যায়নি।

ছোট্ট মতন কাঠবেড়ালিরা রঘুনাথজির মন্দিরের পাঁচিলের ধারে কাঁঠালগাছের ডালে বসে ছিল। নিচু ডাল। বুড়ো মানুষের মতো উবু হয়ে বসে হাত দুটো মুখের কাছে তুলে সে খুব মন দিয়ে কী যেন খেতে ব্যস্ত ছিল। ভারী মজা লাগছিল দেখতে। আমি একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে, খুব নিঃশব্দে এক মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলটার উপর উঠে গুটি গুটি পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি একা আসিনি। সঙ্গে বন্ধু ছিল। বন্ধুটি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। আড়াল থেকে পাহারা দিচ্ছিল। কাউকে দেখলেই সে আমাকে এসে জানিয়ে দিত আর আমরা ছুটে পালাতাম।

কাজটায় ঝুঁকি ছিল। কারণ রামবিলাসের দাপটে মন্দির চত্বরের ত্রিসীমানায় অসময়ে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না, সাহসও না। তা ছাড়া বাইরের লোহার গেটে সকাল বিকেল ছাড়া অন্য সব সময় একটা তালা ঝুলত। তালাটা বেশিরভাগ সময় ভেতর দিক থেকেই ঝুলত, তাতে বোঝা যেত রামবিলাস ভেতরেই আছে। নিজের বাড়িঘর, বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরাট সংসার থাকা সত্ত্বেও রঘুনাথজি মন্দিরের নিরালাতেই তার প্রাণ পড়ে থাকত দিবানিশি। এ জন্য ভক্তদের কাছে একটা আলাদা 'ইমেজ' গড়ে উঠেছিল তার যা সাধারণত সাধুসন্তদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

সাধুরা সাধারণত হয় পাগলাটে, নয় বদমেজাজি ধরনের হয়। রামবিলাস এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। ভয়েও

তাকে অনেকে ভক্তি করে। অকারণে যখন তখন মন্দিরে গিয়ে তাকে চটাতে চায় না। কিন্তু আমাদের সেটা ভক্তির বয়স ছিল না। বড়ো দের মতো ভয়েরও না। আর আমার প্রয়োজনটা ছিল এত জরুরি যে রামবিলাসের তালার পরোয়া করিনি। লোহার গেট দিয়ে উঠে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম নিঃশব্দে। আমরা দুজনেই।

অবশ্য ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়। সেটা সেই থমথমে নিঝুম দুপুরের নির্জনতার। কারণ, 'ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা'—এই ভয়ঙ্কর রহস্যময় শব্দবন্ধটি ঘুরে ফিরেই আমার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যেই কাঠবেড়ালিটাকে দেখলাম—

কিন্তু তার আগে জায়গাটাব একটু বর্ণনা দেওয়া যাক।

লোহার গেট দিয়ে ঢুকে দু ধারে নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা গলি মতো রাস্তা। পাঁচিলের দু ধারে মন্দিরের বাগান। নানান গাছপালার ভিড়ে একটা ছায়াচ্ছন্নতা ঘিরে থাকে সব সময় বাগানময়। সেই ঝিম ধরা দুপুরে ঝোপের আবছা অন্ধকারে ঝিঁঝি ডাকছিল। গলির রাস্তাটুকু পার হলেই সামনে বিরাট উঠোন। সমস্ত চত্বরটা ইট সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। ধারে ধারে ফুলেব টব, সারি সারি। উঠোনের উত্তরে রঘুনাথজির মন্দির আর দক্ষিণে রান্নাবাড়ি। পশ্চিমে নানান গাছপালার জটলার নীচে একটা পাড়বাঁধানো বড়ো সড়ো ইঁদারা। পাশেই চাপাকল। সদর গেট ছাড়াও মন্দিরেব পেছন ধাবে একটা খিড়কি দরজাও আছে, বাইরে থেকে দেখা যায় না।

জায়গাটা এমনিতেই নিরালা নিঝুম, আর সেই খরার খাঁখাঁ দুপুরে তো কথাই নেই। সেটা ছিল যেন কী মাস, বৈশাখ নাকি জ্যৈষ্ঠ? জ্যৈষ্ঠই হবে বোধ হয়, গাছে কাঁঠাল পেকেছিল। মাঝে মাঝে পাকা কাঁঠালের গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে। আর কাঠবেড়ালিটা বোধ হয সেই কাঁঠালেব লোভে—

আমি হাত বাড়ালাম।

হঠাৎ ফোঁস কবে একটা শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে হাত সরিয়ে নিলাম আমি। টাল খেযে পড়তে গিয়ে ধপ করে পাঁচিলের উপর বসে পড়ে কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলাম বটে, কিন্তু বিদ্যুদ্‌বেগে একটা ধারণা ততক্ষণে আমার মনকে অবশ কবে ফেলেছে— আমাকে বোধ হয সাপে কামড়েছে। সবাই বলে, রঘুনাথজির মন্দিবে অনেক সাপ আছে। বিষাক্ত সাপ। নির্জনে ঘুরে বেড়িয়ে তারা দেবতার মন্দির পাহারা দেয়। তাই গাছের কাঁঠাল গাছেই থাকে, ফুলগাছে ফুল—রামবিলাস ছাড়া সাহস করে কেউ সেখানে হাত দিতে পাবে না। বামবিলাস মন্দিবেব সেবাইত, তার একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে, সাপরা তার বশীভূত।

এই আশ্চর্য গল্পটা আমি জানতাম। তবু পাপের পথে পা বাড়াতে আমার একটুও বুক কাঁপেনি সে দিন। প্রয়োজন এসে অনেক সময় মানুষের পাপপুণ্য ধুযেমুছে দেয—এই গূঢ়তত্ত্ব সেই ছেলেবেলার মগজে না ঢুকলেও কার্যত আমি তারই শিকার হয়েছিলাম। কিন্তু দু-এক মুহূর্ত বাদেই আমার চমক ভাঙল, আচ্ছন্নতা কেটে গেল, দেখলাম সাপ নয়—রামবিলাস, আর তার হাতে একটা কালো রঙের লিকলিকে চাবুক, কাঁটালো তার গা। এই চাবুকেরই 'শপাং' শব্দ আমার মুহূর্তের ভুলে 'ফোঁস' হয়ে গেছে। তবে তার কাঁটায় হয়তো বিষ ছিল। ফুলে উঠেছিল আমার ডান হাতের কবজির কাছে একটা রগ, তারপর দেখতে দেখতে প্রায় সমস্ত জায়গাটাই। আস্তে আস্তে সেখানকার সাদা রং নীলাভ হয়ে আসছিল আর নীলের উপর ফুটে উঠছিল লাল টুকটুকে সাবুদানার মতো কয়েক বিন্দু রক্ত। রক্ত দেখে আমি ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি করে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি চেপে ধরতে যাব তার আগেই একটা শির ওঠা শক্তসমর্থ কালো হাত আমার বাঁ হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঁচিল থেকে পড়ে গেলাম নীচে, মাটিতে। রামবিলাস আমার হাত না ছেড়ে মাটি থেকে টেনে তুলতে তুলতে চমকে উঠে বলল, 'আরে! এ যে দেখছি সেই খানকিটার বাচ্চা। মাগি যাকে পেটে নিয়ে পুলিশের ভয়ে পালিয়েছিল দেশ ছেড়ে শ্বশুরের সঙ্গে—তার এত সাহস! তুই হিন্দু? কী করছিলি তুই এখানে—বল্‌?' বলে সে আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মারল। চড় খেয়ে আবার পড়ে গেলাম আমি। বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই ভাঙা গলায় বন্ধুর নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে উঠলাম, বুলু—উ! বুলু—উ!

কেউ উত্তর দিল না। বন্ধুটি সম্ভবত আমার করুণ পরিণতি দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে—ভাবতেই অসহায়ের মতো ডুকরে কেঁদে উঠলাম আমি। কিন্তু রামবিলাসের হৃদয় তাতে গলল না। বরং দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ছড়ি বাগিয়ে বলে উঠল, 'ওঠ্ শালা। তোর ছিঁচকাঁদন বার করছি. ছোঁয়াছুঁয়ি যখন হয়েই গেল তখন—চোপ্ বাঞ্চোৎ, ফের চেঁচাচ্ছে। তোর মুখে আমি—

একটা বিশেষ উপাঙ্গ ভরে দেবে বলে শাসাতেই আমি ভয়ে আর ঘেন্নায় মুখে হাত চাপা দিলাম। আর তখনই, একটা খিল খিল হাসি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মন্দিরের নির্জনতা ভেঙে দিয়েই আবার থেমে গেল। কান্না ভুলে চমকে তাকিয়ে দেখি কয়েক পা দূরে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে, না, মেয়ে বললে ঠিক মানায় না, মেয়েমানুষ।

অবশ্য এটা আমার এই বয়সের ধারণা দিয়ে সেই বয়সের স্মৃতিচারণ। তার পরনে কাপড় ছিল না। হাসির ঝলক উঠেই আবার থেমে যাওয়ার কারণ আমার মতো সেও মুখে হাত চাপা দিয়েছিল। তবে ভয়ে বা ঘেন্নায় নয়. হয়তো অসাবধানে এত জোরে হেসে ওঠার অপরাধে। তার চোখে সেই কৌতুক মাখানো' সতর্কতা ছিল।

তা ছাড়া রামবিলাসও সেই মুহূর্তে কটমট চোখে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। একটু বাদেই মুখ থেকে হাত সরিয়ে সে তার ভরাট আদুর গায়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়েই তাড়াতাড়ি মাটিতে লুটনো ডুরে কাটা ছেঁড়াফোঁড়া শাড়িখানা তুলে নিতে নিতে বলেছিল, 'তা কী করব গো ঠাকুরমাশা, আপনার মুখের ভাষা শুনে বাড্ডাই হাঁসি লাইগলো যে। ভালা রগড় বটে, হি-হি, রাগের মাথায় কুন্‌ঠিং ভরতে কুন্‌ঠিং—হি-হি-হি। ছাড়েন ছাড়েন, আসেন তো, আমাব বেলা চলিং যেছে—'

—হ্যাঁ, তোর তো রোজই বেলা যায়। রামবিলাস বেগে গিয়ে বলে, 'এ বাড়ি কাজ ও বাড়ি কাজ করে মন্দিরের বেলাতেই যত ফাঁকিবাজি। মাসে মাসে চল্লিশ টাকা গুনছি কি মাংনা? ফের উপরি নিতেও তো ছাড়িস না। বাসন তো দুখান তিনখান—'

—এন্ দ্যাখেন, কুন্ কথায় কি! মাথার পেছনে দুহাত তুলে এক মাথা রুক্ষ এলো চুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে মেয়েমানুষটা বলল. 'আমি ফাঁকি দিলাম কুন্‌ঠিং বোলেন তো—কুন্‌দিন দিয়িং ছি? বাদগির মেয়্যা হয়ে বাভুনকে ফাঁকি দিলে আমার অধম্মো হবে না? পাঁপ লাইগবে না? আমি তো শুয়িং ছিলাম গো। আপনিই তো ছুঁড়াকে দেখিং তড়াক্ করে—'

—তো কী করব, পারা যায়? সামনে লোক আর—

—লোক না ছাই, একখানা তো ছুট্টু ছেল্যা! আর ঝোপের দিকে অর লজর ছিল নাকি? আপনি লাফিং উঠে জানান না দিলে জানতেই পেতক না—আপনার বাড্ডাই ভয় গো ঠাকুরমাশা। অত ভয় তো দখিনের দালানে চলেন—উটা তো ঠাকুরের থান লয়! এসেন—

—দাঁড়া। বলে রামবিলাস আমার চোখে চোখে তাকাল। বুঝলাম না সে কাকে দাঁড়াতে বলছে, আমাকে না ওই মেয়েমানুষটাকে। আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে সে। অথচ আমি এক পাও নড়তে পারছি না। সাপের দৃষ্টিতে সম্মোহনের ক্ষমতা থাকে কি না জানি না। কিন্তু আমার মনে হল আমার সামনে যেন একটা কালনাগ দাঁড়িয়ে আছে ফণা তুলে। সাপের মতোই তার এক চোখ দৃষ্টিহীন, কানা—ডেলা পাকানো অনুজ্জ্বল মার্বেলের মতো। কিছু যেন ভাবছিল সে। হঠাৎ মেয়েমানুষটা আবার পেছন থেকে বলে উঠল, 'অত ভাবনা চিন্তার কী আছে গো, বুইঝতে পারছেন না—ছুঁড়াটা কাঁঠাল চুরি করতে এসেছিল! বাপরে, সাহস খুবি—মুন্দিরে চুরি! দেখে তো লাইগছে ভদ্দলোকের ছেল্যা, পাঁপ লাগাইবে সি ভয়ডর নাই? তা, দিয়িং দান—ক্যানে ওই ঠুকরানো কাঁঠালখানটা—কাগে ঠুকরালছে বুঝিন—কী হবে—দিয়িং দ্যান—আপোদ বিদায় করেন!'

—করব তো, কিন্তু—। রামবিলাস হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কাঁঠাল আমি দিচ্ছি। কিন্তু যা দেখলি কাউকে বলবি না খবরদার—বললে এই ঝোপের মধ্যে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব. আমার নাম রামবিলাস. হ্যাঁ!' বলে সে দু হাত বাড়িয়ে যেই কাঁঠালটা পাড়তে গেছে আর অমনি আমি চোখের নিমেষে পাঁচিল টপকে পেছনের খিড়কি দরজার খিল খুলেই দে চম্পট। সে এক ইতিহাস।

জীবনে সেই প্রথম পাপের স্পর্শ পেয়েছিলাম আমি। আট-ন বছর বয়সের ধ্যানধারণা অনুযায়ী আমার ভেতরে একটা পাপবোধ জেগেছিল। মনে হয়েছিল, ওই এক চক্ষু কৃষ্ণকায় পুরোহিত কাঁঠাল ঘুষ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চায়। কারণ তার আজকের গোপন কৃতকর্মের সাক্ষী হয়ে গেছি আমি।

কিন্তু আমি তো তা চাইনি। চেয়েছিলাম একটা কাঠবেড়ালি ধরতে। শখে নয়, নিতান্ত প্রয়োজনে। আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল।

আবার সেই সময়ের উজান বাওয়া! আরও একবার পিছন ফিরে তাকানো—

দাদুকে মনে পড়ছে। কী যেন হয়েছিল দাদুর! ঘুম না হওয়ার রোগ। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করত! দু হাতে মাথা চেপে ধরে অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠত মাঝে মাঝে—আহ্! উহ্! যাতে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

সারাদিন খেটেখুটে রাত্রিবেলায় একটা মানুষ, বুড়ো মানুষ, পাশের ঘরে যন্ত্রণায় ছটফট করবে আর আমরা ঘুমোব—তা কি হয়। মা বলত, 'আহা রে, কী কষ্ট!' আমরা দাদুর কাছে গিয়ে বসতাম! মা দাদুর কপাল টিপে দিত, কখনও হাত বুলিয়ে, কখনও বা হালকা আঙুলের ছোঁয়ায় সুড়সুড়ি দিলে—যখন যেটা দরকার। এক এক সময় দাদুর তন্দ্রাচ্ছন্নভাব আসত। আবার ভেঙে যেত। তখন তাঁর মুখ চোখ, সমস্ত দেহটাই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেত এমনভাবে, আমার ভয় করত, আজ রাতটাই বুঝি দাদুর শেষ রাত। মাকেও উতলা হয়ে উঠে বলতে শুনতাম, 'আপনার কী কষ্ট হচ্ছে বাবা, ডাক্তার ডাকব?'

দাদু হাত নেড়ে বলতেন, 'আরে না না, কমবার হলে এমনি কমে যাবে। ডাক্তার এসে সেই তো পেন কিলার দেবে। আর কত খাব। ব্যস্ত হোয়ো না। যাও, ঘুমোতে যাও। ওই দ্যাখো ছেলেটা ঢুলছে। তোমারও তো একটা শরীর আছে। সারাদিন খাটাখাটুনি, রান্নাবান্না, সেলাইয়ের কাজ। আমার বুড়ো শরীরে এখন সাত রকমের রোগ—এ সারার নয়।'

দাদু জোর করে মাকে উঠিয়ে দিতে চাইলেও মা উঠত না। দাদুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলত, 'আপনি ঘুমোন তো। আপনাকে ও সব ভাবতে হবে না। সারাদিন আপনিও কি বসে থাকেন, ঘুরে ঘুরে অত ছেলে পড়ানোর কাজ—ব্রেনেরও তো একটা ক্ষমতা আছে, কত সইবে।'

এক একদিন দিনের বেলাতেও ওই রকম হত। টিউশানিতে বেরিয়েও ফিরে আসতে হত দাদুকে।

—বউমা, আজ আর গেলাম না। ভালো লাগছে না। মাথাটা কেমন যেন—ট্যাবলেটটা দাও তো, খেয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি।

মা তখন হয়তো এক ডেরি ব্লাউজ পিস নিয়ে ব্লাউজ ছাঁটছে। মুখ না তুলেই বলত, 'আমার এখন ওঠার উপায় নেই, বাবা। ওই তো উপর তাকে বোধ হয় আছে, খুঁজে পেতে নিয়ে নিন না। জানেন যখন আপনার এরকম হয় তখন ওষুধপত্তর পকেটে করে নিয়ে বেরলেই তো পারেন। রোজ রোজ এভাবে কামাই করলে—'

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি যা করছ করো—ডিসটার্ব করব না। আমি তো ইচ্ছে করে—

দাদু আর মার এই ধরনের কথার উতোরচাপান শুরু হলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। ভাবতাম, একটুতেই কেন ওরা রেগে যায়। সামান্য একটা ট্যাবলেট তাকের উপর থেকে পেড়ে নেওয়া বা দেওয়াতে কার কী ক্ষতি হয়। মার উপরেই রাগ হত বেশি। দাদু বুড়ো মানুষ, অসুস্থ। মা তো তা নয়। কাঁচি রেখে এক মিনিট উঠে গেলে কি—

অথচ, এই মাকেই দেখতাম রোজ রাতেরবেলায় দাদুর জন্যে উতলা হতে। দাদুকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে মার কী প্রচেষ্টা। রাত জেগে জেগে চোখের কোলে কালি করে ফেলা। আর দাদুকে যন্ত্রণার মধ্যেও বলতে শুনতাম, 'আমার জন্যে শরীর স্বাস্থ্য এভাবে নষ্ট কোরো না বউমা, যাও ঘুমোতে যাও। ছেলেটাকে তো দেখতে হবে, মানুষ করতে হবে, ওটাই তোমার বড়ো কাজ। ওর একটা ভবিষ্যৎ আছে—

না, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি পাপের পথে পা বাড়াইনি। আমি ভাবতাম দাদুর কথা। মার কথা। দাদুর রাতে যন্ত্রণায় ঘুম হয় না। মা তাঁকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে রাত জাগে। এ বড়ো যন্ত্রণাদায়ক

পরিস্থিতি। দেখে খুব কষ্ট হত আমার। মনে হত সকলের সব যন্ত্রণা যদি ম্যাজিকের মতো দূর করে দিতে পারতাম আমি। কিন্তু হায়, এত ছোটো কেন আমি, রোগা লিকলিকে? ভগবান যদি আমার ভেতরে একটা অলৌকিক ক্ষমতা এনে দিত তা হলে, হে ভগবান—!

প্রার্থনা করতাম আমি। কিন্তু রাগ হত। ভগবান যে মন্দিরে থাকে, তার দরজায় তালা বন্ধ। আর সেই সুযোগে রোজ রাত্রে শয়তান এসে দাদুর চোখের ঘুম কেড়ে নেয় আর মার চোখের কোলে আরও এক পরত করে কালির পোঁচরা পড়ে। দিনেরবেলায় উঠতে বসতে তাই মার শরীর টিসটিস করে, হাই ওঠে, রান্না চাপিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢুলে আসে চোখ। আর খেয়েদেয়ে দুপুরবেলায় সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসলেই একগাদা ছিট কাপড়ের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এই রকম রোজ। কালু খলিফা এসে বিরক্ত হয়। সে দোকানের অর্ডার সাপ্লায়ার। অনেকের মতো মাকেও সে কাজ দিয়ে যায়। কিন্তু কতদিন এভাবে ঘুরবে সে? আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—রাগ করে ফিরে যায়। একদিন এসে শাসিয়ে গেল, 'জোয়ান মানুষের দিনেরবেলায় এত ঘুম কেন জি। রেতের কালে কী করেন। খোকার বাপও তো নাই যে—নাহ্, এমন করলে তো আপনাকে দিয়ে আর কাজ কাম করানো যাবে না!

মা অনুনয় করে বলেছিল, 'চাচা আর একটা দিন অন্তত সময় দিন। দয়া করুন—'

—ধেত্তেরি, ই তো মহা ফৈজৎ—, বলে কালু খলিফা চলে যেতে যেতে আপন মনে গজ গজ করেছিল, 'এই মাস্টারবাবুর মুখ চেয়ে কিছু বলতে পারি না, বুড়া মানুষ, হাতে পায়ে ধরে, না তো—'

না তো কী? এক দুঃখজনক পরিণতির আশঙ্কা করে আমি মাকে বলেছিলাম, আমাকে তুমি ছিট কাটা শিখিয়ে দেবে মা, আমি পারব না? তোমাকে সাহায্য করব।'

তারপর একদিন, সেই আশ্চর্য সূত্রটা আবিষ্কার করে আমি যেন আর্কিমিডিসের উল্লাসে ফেটে পড়েছিলাম, ইউরেকা! ইউরেকা!

অবশ্য মনে মনে। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল খুব গভীর ও গোপন। সেই বয়সের মানসিকতায় অত্যন্ত রোমাঞ্চকরভাবে শ্বাসরোধকারী। তা ছাড়া আর্কিমিডিসের গল্প তখনও আমার জানা ছিল না বলে 'ইউরেকা' শব্দটিও উচ্চারণ করিনি। কিন্তু এখন এভাবে ভেবে নিলে ক্ষতি কী? আর্কিমিডিসের চেয়ে আমার আনন্দ কি কিছু কম ছিল? ছেলেবেলার সব স্মৃতিই তো আমার এই বড়ো বয়সের ভাবনাকে জারকে জারিত করা। কীসে কী হয় তখন বুঝতাম না বলেই যে ঘটনাগুলো সব অর্থহীন মিথ্যে হয়ে যাবে তা তো নয়।

একদিন এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম তার ছোটোকাকার একটা পোষা কাঠবেড়ালি ছিল। কাকা যখন কাজ থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে থাকত তখন কাঠবিড়ালিটা এসে তার গায়ে মাথায় এমনভাবে লেজ বুলিয়ে দিত যে সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম এসে যেত। কাঠবিড়ালিটা মরে গেলে কাকা নাকি অনেককাল ঘুমোতে পারেনি।

এটুকুই আমার সূত্র ছিল। তাই মাকে এসে রহস্য করে বলেছিলাম, 'মা, আমি এবার তোমার চোখের কালি মুছিয়ে দেব। কোনও দাগ থাকবে না।'

মা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ওমা, সে কী রে, কোথায় শিখলি এমন ওষুধ? ডাক্তারি বইয়ে নাকি? তুই এত বড়ো হয়ে গেছিস?

আমি রহস্য উন্মোচন না করে হেসে বলেছিলাম, 'যেখানেই শিখি, বলব কেন? দেখো না, দাদুকে এবার কেমন করে ঘুম পাড়াই! দাদু ঘুমোলেই তো তোমাকে আর রাত জাগতে হবে না। আর রাত না জাগলে চোখে কালিও পড়বে না, দিনেও ঘুম পাবে না। তখন কালু খলিফা এসে তোমাকে অনেক করে কাজ দিয়ে যাবে।'

মা এবার খিলখিল করে হেসে উঠে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'ওরে আমার ছোট্ট, পুঁচকে কোথাকার—পাকা পাকা কথা শিখেছে দ্যাখো! যা, খেলতে যা—দুষ্টু!'

না, খেলায় আমার তেমন মন ছিল না সে কদিন। আমি যেন এক অন্য খেলার স্বাদ পেতে চাইছিলাম। একটা অ্যাডভেঞ্চারের। যতদিন না সেটা সম্ভব হয়, আমার শান্তি ছিল না। কেউ জানত না বনের ধারে খেলতে খেলতে গাছে গাছে কাঠবেড়ালি দেখলেই আমি কেমন চমকে চমকে উঠি। সকলের অলক্ষে আমার

দৃষ্টি পিছলে বেড়ায় ডালে ডালে একটা স্বপ্নের পেছনে। স্বপ্নটা সুখের। দু বেলা দুমুঠো পেট ভরা ভাতের। আর একটা অন্তত পেছন-না-ছেঁড়া প্যান্টের। দাদুর ঘুম না এলে তা হবে কী করে?

সুতরাং একদিন, ভরদুপুরে, যখন খালপাড়ে কাঁকুরে রাস্তার সর্বাঙ্গ তেতে পুড়ে আগুন, বৃক্ষহীন দূরের মাঠ, জলহীন ঘাট পাড়—ত্রিসীমানায় কোথাও কোনও জনমনিষ্যি ছিল না, এমনকি সর্বংসহ দুরন্ত রাখাল বালকেরাও না; বনবাদাড় তোলপাড় করে ধুলো উড়িয়ে কেবল আগুন বাতাসের ঝালাস ছুটছিল ড্রাগনের নিশ্বাসের মতো—আমি তখন চুপি চুপি রঘুনাথ বাড়িতে: মন্দির সেটা, দেবতার স্থান—মনের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটছিল বইকী, যদি পাপ হয়! তবু।

বন্ধুর কাকা এখানে থেকেই নাকি কাঠবেড়ালি ধরেছিল। সুতরাং আমিও কেন পাব না। আমি তখন জানতাম, সুখে পাপ থাকে, কাঠবেড়ালি আমার হাতে কাঁটার আঘাত হয়ে আসবে! ‘পাপ’ শব্দটুকুই তখন শুনেছি মাত্র। তার স্বরূপ দেখিনি। সেই প্রথম আমাকে দেখিয়ে দিল কামতাড়িত স্খলিতবসন দুটি নরনারী। শঙ্খ লাগার প্রাক্ মুহূর্তে একটি শিশুর সামনে ধরা পড়ে গিয়ে ফণা তুলে ছিটকে দাঁড়িয়েছিল রাগে। এই হচ্ছে পাপ, অবোধ শিশুকে দেখেও ভয় পায়।

তারপর থেকে নির্জন পথমধ্যে রামবিলাস আমাকে দেখলেই ছড়ি তুলে চাপা গর্জনে শাসাত, ‘মনে থাকে যেন, কাঁঠাল নিসনি! তোর এত বড়ো সাহস কোথা থেকে হল তা জানি—সব তোর মার শিক্ষা। আমাকে তো চিনিস না! মুখ খুললে আমি তোর ছাল ছিঁড়ে নেব। আব তোর মাকেও ছেড়ে দেব না, হাজত খাটাব। ভেবেছে কী, ছেলেকেও বাপের মতো গুন্ডা বানাবে? সে দিন চলে গেছে!

আমি ভেবে পেতাম না ‘সে দিন’ মানে কোন দিন? কেনই বা আমার বাবা গুন্ডা ছিল আর কেনই বা আমার মাকে হাজত খাটতে হবে, কী দোষে? এই সব প্রশ্ন দিনের পর দিন ঘুণ পোকার মতো আমার মন আর মগজ কুরে কুরে খেত। কাউকে কিছু বলতে পারতাম না সাহস করে। আমার ছেলেবেলার সমস্ত আনন্দটুকু বামবিলাস যেন রাহু হয়ে গ্রাস করে নিয়েছিল।

তাই একদিন, কাঁদতে কাঁদতে মাকে এসে আমি সব কথা বলে দিয়েছিলাম। রামবিলাসের কথা। মা হেসে বলেছিল, ‘তাই বুঝি! এত ব্যাপার? দূর বোকা, এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? তুই তো কোনও অন্যায় করিসনি। বরং যারা অন্যায় আর পাপ করে, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে তারাই উলটে ভয় দেখায়। তোকে ভয় পেলে চলবে না। তুই কার ছেলে জানিস!’

এর পর থেকে মা আমাকে বাবা আর তার সঙ্গীসাথিদের গল্প শোনাত। শুনতে শুনতে আমার বুকের ভেতরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগত, মনে হত, আমি যেন আর ভয় পাচ্ছি না। বাস্তবিক, তারপর থেকে রামবিলাসকে দেখে আমার আর বুক কাঁপত না। কখনও সখনও দেখা হয়ে গেলে সোজা চোখে চাইতাম। আর রামবিলাস যেন আমাকে জব্দ করতে না পারার রাগে তার বিষদৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিত। কিন্তু বুঝতে পারতাম তার ভেতরেব সংশয়টাকে সে চেপে রাখতে পারছে না—আমি যে তার সব জানি, সব পাপ!

সেই রাগই হয়তো সে আজও পুষে রেখেছে মনে। তার এক চোখে সেই অগ্নিস্রাবী দৃষ্টি, হয়তো একেই বলে ব্রহ্মতেজ, পারলে আমাকে ভস্ম করে ফেলে। কয়েক সেকেন্ড সেইভাবেই সে আমার চোখে চোখে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে করজোড়ে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে তার দু চোখ দিয়ে, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে এল। বিড় বিড় করে বলে উঠল, ‘জয় বজরঙবলী!’ তারপর চোখ খুলেই হঠাৎ যেন বুকে বল পেয়ে আবার আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, ‘তুই পাপী। মহাপাপী। ভগবানের গায়ে হাত তুললি। তাঁকে হত্যা করলি। এর বিচার হবে। তোর ক্ষমা নেই। কী করে এবার তুই পার পাস দেখা যাবে!’

রামবিলাস আমার থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, ভাবতেই, আমার হাসি পেয়ে গেল। পাপ দেখাচ্ছে রামবিলাস! আমি যদি বলি পাপ নয়, আমি পুণ্য করেছি! এক দঙ্গল হনুমান দিনের পর দিন এখানকার সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে যাবে, বাগানের ফল খেয়ে, গাছগাছালির ডালপালা ভেঙে তছনছ করে, জমির বেগুন, মাচার লাউ কুমড়ো শশা ঝিঙে—যাবৎ তরকারি ফলমূল নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে

এখানকার গরিবগুরবো খেটে খাওয়া মানুষদের জীবনজীবিকা বিপন্ন করে তুলবে, আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের সমস্ত পশুপক্ষীই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মানুষের কিছু না কিছু উপকার করে, অন্তত এমন অপকার করে না। এই এক আশ্চর্য জীব যারা কেবল ক্ষতি করতেই জানে। মাঝে মাঝে আমার রাগ হয়ে যায়। হনুমান দেখলেই তাড়া করি, গুলতি ছুড়ি। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয় বলে মনে হয় না। চলে যায়। আবার আসে। এবং অবাধে অত্যাচার চালায়।

কয়েক দিন আগে এই রকম এক ঘটনায় আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সেই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করি, এর একটা বিহিত করতে হবে। করবই। এভাবে বাঁচা যায় না। ঘটনা হচ্ছে এই, আমি টিউশানিতে বেরিয়েছিলাম, বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি মা বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। দুপুরে একদল হনুমান এসে মাকে ক্ষতবিক্ষত করে গেছে। শাড়িজামা ছিঁড়েখুঁড়ে, চুল ধরে টেনে আঁচড়ে-কামড়ে শেষে ধাক্কা দিয়ে ফেলে উঠোনের রোদে মেলে দেওয়া রেশনের চাল গম, এক কুলো বড়ি, আরও কি কি সব নিঃশেষে খেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিয়ে গেছে। এক মুঠো চিনি আর এক কুপি কেরোসিন ছাড়া রেশনে আজকাল আর কিছু পাওয়া যায় না। এর মধ্যে হঠাৎ যদি কোনওদিন চাল গম মিলে যায় তবে তা ভাগ্য বলতে হবে। চালে গমে পোকা ছিল বলে মা সে সব রোদে মেলে দিয়ে সেলাই-এর কাজ করতে করতে পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় ওরা ঝড়ের বেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক আধটা নয়, এক পাল। এত বড়ো ক্ষতি কার সহ্য হয়? মা মরিয়া হয়ে বাধা দিতে গিয়েছিল। সেই হল কাল।

আমাকে দেখে মা যন্ত্রণার বদলে চাল-গমের শোকে কাঁদতে লাগল। রাগ করে বললাম, দোষ তো তোমারই। একা ওভাবে ওগুদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া তোমার হঠকারিতা হয়েছে। মারা পড়নি এই খুব। চলো, এখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

ডাক্তারও সেই একই কথা বলল, খুব বেঁচে গেছেন। ভাগ্যি ওটা বাড়ির উঠোন ছিল। ছাদ হলে তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত নীচে। আপনাকে ইনজেকশন নিতে হবে—এত ইনজিওরি, দাঁতের নখের—

ইনজেকশানের দাম শুনে চমকে গেলাম। মাও পাশ ফিরে তাকাল আমার দিকে। আমার চোখে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি ছিল—'নাও, এখন সামলাও! তিন পয়সা বাঁচাতে গিয়ে তিনশো টাকার ধাক্কা।' অন্যদিকে মার চোখে যেন দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে চাপা প্রতিবাদ—'তা কী করব আমি, সর্বস্ব হনুমান-বাঁদরের ভোগে ঢেলে দিয়ে ভয়ে চোখ বুজে থাকব? আমি তা পারব না।'

আমরা দুজনে দুজনকে চিনি, তাই দুজনেই চোখ সরিয়ে নিলাম।

মা হঠাৎ বলে উঠল, 'না না ডাক্তারবাবু, ইনজেকশন-ফিনজেকশন আমাকে দিতে হবে না, একটা টেটভ্যাক দিয়ে দিন তাতেই হবে।'

—বলেন কী! ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, 'আপনাদের মতো ফ্যামিলির লোক যদি—'কথাটা শেষ না করে একটু হাসি দিয়েই বুঝিয়ে দেয় ডাক্তার। বাস্তবিক, এ এক পরিহাস বলতে হবে, মাকে বা মার গর্ভজাত আমাকে দেখে আমাদের হাঁড়ির হালটা কেউ ধরতে পারে না।

—আমি ঠিকই বলছি, ডাক্তারবাবু। মা একটু জোরের সঙ্গে বলে ওঠে, আমাকে আপনি টেটভ্যাকই দিন না শুধু—কী হবে?

—কী হবে? কী না হতে পারে বলুন? ডাক্তার একটা শিশি হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলে, 'এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হওয়ার ভয় থাকে তা আপনিও জানেন আমিও জানি, র‍্যাবিজ। যে কোনও প্রাণীর আঁচড়ে কামড়ে হয়ে যেতে পারে, এমনকি পাখির ঠোঁটেও। তা কুকুর হলে না হয় বলতাম কুকুরটাকে দশদিন লক্ষ রাখুন। সবক্ষেত্রে যে র‍্যাবিজ থাকবেই তার কোনও মানে নেই। তবে এ জিনিস খুব সাঙ্ঘাতিক, বিষটা ঘুমিয়ে থাকে, কেউ কিছু বুঝতে পারে না। তারপর থাকতে থাকতে দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎ যদি মাথাচাড়া দেয় তখন কিন্তু মারাত্মক! তাই রিস্ক নেওয়া উচিত না। আর এসব ইনজেকশনে যখন কোনও ব্যাড রি-অ্যাকশন হওয়ার ভয় নেই। তা ছাড়া, গাছের হনুমানকে আপনি কী করে লক্ষ রাখবেন বলুন? বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। একটা তো নয়, বলছেন ওরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করেছিল—

ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে আমার সমস্ত মন অবশ হয়ে আসছিল।

টাকার কথা ভাবছিলাম। এত টাকা এখন আমি কোথায় পাব? টিউশনি করে মাসে তো পৌনে আটশো টাকা রোজগার করি. তাও কাগজে-কলমে, কোনও মাসেই পুরো টাকাটা উঠে আসে না। বাকি থেকেই যায়, থেকেই যায়—এই করতে করতে প্রায় সাতশো সাড়ে সাতশো টাকা বাকি পড়ে গেছে দুবছরে। মা কিছু কিছু সেলাই-র কাজকর্ম করে বলে সংসারটি কোনও রকমে ঠেকাঠুকো দিয়ে চলে যায়। তাও দু জনের জায়গায় তিনজন হলেই মুখ থুবড়ে পড়ত। দাদু আর নেই। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। তিনি নিজেও বেঁচেছেন, আমাদেরও বাঁচিয়েছেন। শেষ দিকে টিউশানি ছেড়ে দিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। মাথার যন্ত্রণায় এক এক সময় পাগলের মতো ছটফট করতে কবতে শিশুর মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠতেন। মোল্লার দৌড় যেন মসজিদ পর্যন্ত। আমাদের দৌড় ছিল তেমনি পাড়ার বুড়ো হাতুড়ে ডাক্তারের টিনের চালা অব্দি। এখন বেজায় সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছি আমরা। নইলে মাকে হনুমানে কামড়েছে বলে মায়ের সুবো এম বি বি এস (ক্যাল)-এর চেম্বারে ছুটে আসব কেন। নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে হল আমার। আমাদেব বেঁচে থাকাটাই যেন একটা হঠকারিতা—পদে পদে আপশোশ আর আক্ষেপের মধ্যে দিয়ে দিন কাটে। কেন এলাম এখানে? এখানে না এলে তো বিপদের ছায়া মাড়াতে হত না। মৃত্যুর চেয়ে মৃত্যুভয় মারাত্মক, সংশয়ের টানাপোড়েনে জেরবার করে দেয়। এর চেয়ে পাড়াব হাতুড়ে ডাক্তারই ভালো ছিল, দাদুর শিরঃপীড়ায় সকালে-বিকেলে কেবল ট্যাবলেট দিত আর কপালে ঘষবার আশ্চর্য মলম। আমার এখনকার ধারণা মতো দাদুর ব্রেনটিউমারের ম্যালিগন্যানসি নিয়ে মাথা ঘামাত না।

অবশ্য ঘামালেই বা কী হত! কী বা করতে পারতাম আমরা! আমি তো তখন ছোটো, আমার মা? এখন মা নিজেই আক্রান্ত। আমি কি জ্ঞানপাপী হয়ে নির্বিকার বসে থাকব? হঠাৎ আমাব সাতশো টাকার কথা মনে পড়ল। অনেক দিন বাকি পড়ে আছে অনেকের কাছেই। এবার আদায় করতে হবে। চাইতে গেলে সবাই 'আসছে মাস' দেখায়। কবে যে সেই 'আসছে মাস'! এবার একটু জোর দিয়ে চাইতে হবে—বিপদে পড়েছি। যদিও জানি যাদের দামি মাস্টার রাখার সঙ্গতি নেই তারাই আমাকে রাখে। আর হায়ার সেকেন্ডারি পাশ সস্তাব মাস্টার বলে আমারও একটা হীনম্মান্যতা আছে! আমাকে ডাকলেই পাওয়া যায়, দরকার মতো ছেঁটে ফেলাও যায়; তাই ক্ষীণকণ্ঠে ছাপোষা অভিভাবকের কাছে ধাব বাকির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বার বার আমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে। অথচ বুকের মধ্যে সর্বদা একটা অসন্তোষের কাঁটা খচখচ করে, এত টাকা বাকি, বাগ হয়। আমি কি 'এইসব মূঢ় ম্লান মুক দিতে হবে ভাষা'—এই রকম কোনও আদর্শ নিয়ে ছেলে পড়াতে এসেছি? তোমাদের অভাব আছে, আর আমার নেই? আমি তো আমার ন্যায্য পাওনাই চাইছি। এটা আমার দাবি। মাকে নিয়ে একটা সংশয়াক্রান্ত সময়েব যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। সামনে মাত্র দশটা দিন। এই দশ দিন একটা প্রতীকী সময় মাত্র। তারপর থেকে শুরু হয়ে যাবে এক অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—কি হয়, কি হয়। আমার চোখের সামনে ভাসছে মার সেই ভয়ঙ্কর অথচ করুণ ভবিতব্যের ছবি—উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত, র‍্যাবিজ জর্জরিত ঘোলাটে দুই চোখ. লালা ঝবছে—দাঁতে নখে বিষ নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে নিজেকেই নিজে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে মা।

—উহ্!

একটা তীক্ষ্ণ অথচ ক্ষীণ আর্তনাদ সহসা আমার আত্মমগ্নতা ছিন্ন করে দেয়, চমকে উঠি। সামনে তাকিয়ে দেখি মা. আমার পাশের চেয়ার থেকে উঠে তখন ডাক্তারের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসেছে। মার ক্ষতস্থানে অ্যাসিড লাগাচ্ছে ডাক্তার। লাগাতে লাগাতে বলছে, জ্বালা তো সামান্য করবেই, ম্যাডাম। এত যন্ত্রণা ভোগ করছেন, এটুকু আর কী। তবু আপনার ভাগ্য ভালো যে চোখেমুখে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়নি। বডির আপার পোরশানেই তো দেখছি যত ইনিজিওরি। বলুন, আর কোথাও নেই তো, লজ্জা করবেন না। জামা-টামা সব ছিঁড়ে দিয়েছিল বলছেন—'

ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে মা মাথা নিচু করে বলল, 'না'।

—ডান হাতের কবজিতে লাগল কী করে? বেশ তো ফুলে উঠেছে দেখছি, দেখি!

—ছুটে পালাতে গিয়ে সিঁড়ির কাছে পড়ে গিয়েছিলাম। হাতের ভরে পড়ি—উহ্! মা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে যন্ত্রণা চাপতে চাইল।

ডাক্তার পরীক্ষা করতে করতে বলল, হুম্, লাগবেই তো। আপাতত কয়েকটা পে'নকিলার দিয়ে দিচ্ছি। ঠান্ডা জল, গরম জলও করবেন। তবে সিওর হওয়ার জন্যে একটা এক্স-রে করতে হবে কিন্তু। ছোটো ছোটো হাড় আছে ওখানে, লিগ্যামেন্ট আছে, কোথায় কী হয়—তবে হ্যাঁ, সবচেয়ে আর্জেন্ট হল ইনজেকশনটা নিয়ে ফেলা—আপত্তি করবেন না। আমরা তো কেউ হনুমানটাকে দেখতে পাচ্ছি না—পার্টিকুলার কোন্‌টা, যদি সত্যি করেই সেটা খেপে গিয়ে থাকে বা আগে থেকেই হয়তো—

—না না খ্যাপা-ট্যাপা না, বদমাইশ। ও শালা খুব খচ্চর জাত। ডাক্তারের আধবুড়ো কমপাউন্ডার সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে মার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'খুবই খচ্চর, মেয়েছেলে দেখে ভয় পায় না। তেড়ে আসে। সন্ন্যাসী দল ছিল কি?' কমপাউন্ডার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

বললাম, 'সন্ন্যাসী দল। সে আবার কী? জানি না তো।'

—জানেন না? ছেলেবেলা থেকে এত হনুমান দেখছেন—

কমপাউন্ডার একটু হেসে মার হাত থেকে সিরিঞ্জ টেনে নিয়ে তুলো ঘষতে ঘষতে বলল, ওদের মধ্যে দুটো দল আছে। যে দলে দেখবেন অনেক বাচ্চা-কাচ্চা থাকে, সেটা হল মাদি হনুমানের দল। অবশ্য তার মধ্যে একটা গোদা হনুমানও থাকে। সেটা হল পুরুষ, সর্দার। মাদিগুলোর মালিক। মাদিগুলোর মাদি বাচ্চা হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পুরুষ বাচ্চা হলেই মুশকিল। তখন ওই গোদাটা তাকে হয় মেরে ফেলে, নয় তো মেরে-ধরে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন এই বাচ্চাটা গিয়ে ভিড়ে যায় আর এক দলে যেখানে সবাই পুরুষ, একটাও মেয়ে হনুমান নেই। এজন্যেই ওদের দলটাকে সন্ন্যাসী দল বলে। ব্যাটারা খুব দুর্ধর্ষ। যে দিন আসবে একেবারে লন্ডভন্ড করে দিয়ে যাবে। কিছু মানে না। খেঁকি কুত্তাগুলোকে তো পাত্তা দেয়ই না, আর মেয়েছেলে দেখলে তো—'

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি! ডাক্তার হঠাৎ কমপাউন্ডারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইন্টারেসটিং, তাই না? সন্ন্যাসী দল—তাতে একটাও মেয়ে নেই! বেচারারা—'

রসিকতাটা আমার বুকে ছ্যাঁত করে লাগল। মনে হল, হনুমান বিশারদ কমপাউন্ডারের মালিক ডাক্তারটি নিজেই একটা অশ্লীল, সেক্স-স্টার্ভড্। আমি মার দিকে আড়চোখে তাকালাম। এই আটত্রিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে এসে আজও কি মা লোভী পুরুষের চোখ টেনে নেয়? না, কোনওরকম ইডিপাস কমপ্লেক্স থেকে নয়, ছেলেবেলার নানান ছোটোবড়ো তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই উনিশ কুড়ি বছরের যৌবনে পৌঁছেও সেই একই অভিজ্ঞতার তিক্ততায় রাগে আর অপমানে ভাবতে লাগলাম। মার সংগ্রাম কেবল ভাত-কাপড়ের নয়, সসম্মানে বেঁচে থাকারও। ছেলেবেলায় অতশত বুঝতাম না, এখন বুঝি বলেই অসহ্য লাগে।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে এই অসহ্যতা আবার নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। বার বার মনে হচ্ছিল হনুমান সংক্রান্ত ঘটনাটা না ঘটলে বোধ হয় এ সব কিছুই হত না, যেমন চলছিল তেমনি চলত, হঠাৎ যেন একটা জটিল বাঁকের মুখে এসে আছড়ে পড়ল সমস্ত পরিস্থিতিটা। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে, পাড় ভাঙা ঢেউয়ের মতো আমি নিজেই ফুঁসতে লাগলাম ভেতরে ভেতরে—আমার আবাল্য পরিচিত সমস্ত চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। উত্তরোত্তর কয়েকটি দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মনকে যেভাবে তিতিবিরক্ত, বিরক্তির সঙ্গে রাগ, রাগের সঙ্গে বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণার সঙ্গে ঘৃণা মিশে গিয়ে অস্থির করে তুলেছিল। তার মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় আমি চমকে চমকে উঠেছিলাম, মনে হচ্ছিল আমিই বুঝি এখন র‍্যাবিজগ্রস্ত; দীর্ঘ দীর্ঘকাল রক্তের ভেতরে লুকিয়ে ছিল যে কালান্তক বিষ তা আজ মাথাচাড়া দিয়ে জানান দিতে শুরু করেছে; কী করলে শান্তি পাব বুঝতে পারছি না।

কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরেও মার সারা শরীর জুড়ে ক্ষতজনিত ব্যথা ও যন্ত্রণার কোনও উপশম

নেই। ডান কবজির স্ফীতিও আগের মতোই। হাতটা অকেজো হয়ে পড়েছে। সেলাই-এর কাজকর্ম বন্ধ। বাঁ হাতে হাতা খুন্তি ধরে রান্নার কাজ চালানো যায়, কিন্তু কাঁচি ধরে দোকানের অর্ডারি মালের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় না। কিছুদিন এইভাবে চললে আমাদের 'দিন আনি দিন খাই' টাইপের সংসারের নাভিশ্বাস উঠতে আর দেরি হবে না। তাই মাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারিয়ে তোলাই এখন আমার লক্ষ্য। কিন্তু তার জন্যে এমন হেনস্থা হবে ভাবিনি।

প্রথম দু দিন বাড়ি থেকে বেরতেই পারিনি, মার এত জ্বর! জ্বরটা এখন কমে আসায় সকালে-বিকেলে সময় করে টিউশানিতে বেরচ্ছি। তবে ছাত্র পড়ানোর থেকে বকেয়া আদায়ের দিকেই লক্ষ্য আমার। মাথায় ঘুরছে ওষুধপত্তর, ইনজেকশান আর এক্স-রে'র চিন্তা। ডাক্তারের ফিস তো আছেই, আরও টুকিটাকি। অনেক টাকার দরকার। আমি তো ভিক্ষের জন্য হাত পাতছি না, পাওনা টাকাই চাইছি। কিন্তু অভিভাবকদের মুখ দেখে মনে হয়েছে আমি কাউকে বিরক্ত করছি, কাউকে বিষণ্ণ, কাউকে বা অযথা বিপদগ্রস্ত। অনেকে সন্দেহ পোষণ করেছে, এত টাকা বাকি হয় কি করে, আমার হিসেবে নিশ্চয় ভুল আছে। আশ্চর্য, এতদিন কারও কাছে এভাবে চাইনি বলেই যেন ওদের কাছে আমার একটা খাতির সম্মান ছিল, আজ প্রয়োজনে হাত পাততে গিয়ে দেখি ব্যাপারটাই ভুয়ো; আমার আর্থ-সামাজিক জীবনের ভিতটা এমন থসথসে, ঘুণধরা জানতাম না!

এই সব কারণেই আমার মানসিক অস্থিরতা এবং তার জন্য দায়ি যে হনুমানের দল, রাগটা গিয়ে পড়েছিল তাদের উপর। বস্তুত, পৃথিবীর যাবৎ হনুমান জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রবল বাসনায় কদিন থেকেই আমার মন ছটফট করছিল। হাত নিশপিশ করছিল—অবিকল সেই নাগবৈরী গড়ুরের মতোই।

তাই আমার একটা অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং তা হাতের কাছে পেয়েও গিয়েছিলাম। পাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে। আমি এতদিন নাবালক ছিলাম বলে মার হেফাজতে ছিল ওটা। আজ আমি সাবালক। সুতরাং আর কোনও বাধা থাকার কথা নয়। তবু তার অজ্ঞাতেই কাজটা করতে হয়েছে কারণ মা ওটাকে আজও আমার নাগালের বাইরে গোপনেই রেখে দিতে চায়। হাস্যকর! মা কি আজও আমাকে সেই ছোটোই ভাবে, নাকি অযোগ্য? তা হলে আর কবে সময় হবে?

তোরঙ্গের তল থেকে খুঁজে পেতে অস্ত্রটাকে বার করতে গিয়ে মনে হল, বেচারা যেন এতদিন অনাথ শিশুর মতো অবহেলায় অভিমানে একগুচ্ছ বুলেট বুকের কাছে নিয়ে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিল. আমার ছোঁয়ায় জেগে উঠল।

হাতে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহসা আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। মার মুখ থেকে শোনা। বাবাকে আমি দেখিনি। বাবা খুন হয়ে গেলে মা রাতারাতি এই রিভলভার আর একমুঠো বুলেট সম্বল করে আমার তিনমাসের ভ্রূণটাকে পেটে নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল পুরানো জায়গা ছেড়ে। পুলিশ আর জোতদারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী স্থানটাকে চিহ্নিত করে ফেলেছিল। খবরটা গোপন ছিল না। দলের কে কোথায় ছিটকে গিয়েছিল মা জানতে পারেনি। কিন্তু যাওয়ার আগে তারা আঠারো বছরের গর্ভবতী মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়েছিল তাদেরই সহমর্মী এক বয়োবৃদ্ধ মানুষের স্নেহছায়ায়। তিনিই আমার দাদু, আমার পিতামহ। প্রৌঢ়ত্বে এসে যাঁর পুরানো রাজনৈতিক বিশ্বাসে মোহভঙ্গ ঘটে যায়। বাবা আর তার সাথিদের উপর তাই তাঁর কোনও রাগ বা অভিমান ছিল না, বরং অভিনন্দন ছিল। বিপত্নীক মানুষটি পুত্রশোক চেপে রেখে অপরিচিত পুত্রবধূকে গ্রহণ করেছিলেন দুহাত বাড়িয়ে, তারপর একজন নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবীর মতোই অসুস্থ দুর্বল শরীরেও তাকে নিয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে। সে দিন থেকেই মা 'ফতিমা' থেকে 'প্রতিমা' হয়ে যায়। ধর্ম নয়, রাজনৈতিক কারণে। এ এক আশ্চর্য গল্প। মা আমাকে বলেছিল।

এ গল্প একদিনে শেষ হওয়ার নয়। দিনে দিনে শুনতে হয়। দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। আমিও বেড়ে উঠেছিলাম।......

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত-বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) সীমান্তের এক রিলিফ ক্যাম্প থেকে পালানোর সময় বাবার সঙ্গে মার প্রথম দেখা হয়। অদ্ভুত জীবন বটে মার। এক জীবনে কত অভিজ্ঞতা! দেশের মাটিতে আপনজনদের হারিয়ে এসে একা সহায়সম্বলহীন অবস্থায় একটা ষোলো বছরের কিশোরী

মেয়ের জীবন কোথায় ভেসে যেত সে দিন কে জানে। রিলিফ ক্যাম্পে নারী-শিকারিদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। মানুষের বিপদে-আপদে অভাবে-দুর্দশায় সাহায্যের নামে সুযোগসন্ধানী রাবণ ঋষিদের কোথাও অভাব ঘটে না। শেষ পর্যন্ত মার পালানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু পালিয়েই কি বাঁচা যেত, যদি না সেই সময় গোপনে অস্ত্রের খোঁজে বাবাদের দলটা সীমান্তের ধারে ধারে ছড়িয়ে পড়ত? অজস্র মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে চমৎকার ক্যামোফ্লাজ। বাবাদের চোখে এক নতুন স্বপ্ন তখন। আর তখনই একদিন, রবীন্দ্রনাথ হলে হয়তো বলতেন 'কি ছিল বিধাতার মনে'—বাবার সঙ্গে মার দেখা হয়ে গেল। তারপর তো এক অবিশ্বাস্য জীবন। আশ্চর্য, এক গল্পের মতোই বটে, হয়তো গল্পের চেয়েও আশ্চর্য। শুনতে শুনতে আমি মার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে যেতাম।'

সেই সময়, বাবার গল্প বলতে বলতে মা আমাকে একদিন এই অস্ত্রটা দেখিয়েছিল, সঙ্গে একমুঠো বুলেট। কেমন করে এতে গুলি করতে হয়, ট্রিগার টিপতে হয়—তাও দেখিয়েছিল। আমার চোখে তখন এটা ঠিক যেন একটা খেলনার মতো। আমি নেব বলে কী ঝোঁক ধরেছিলাম! মা প্রথমে বকেছিল, তারপর আদর করে বুঝিয়ে বলেছিল, 'লক্ষ্মীটি এখন নয়, বড়ো হও, বড়ো হলেই এটা তোমার। তোমারই তো! কিন্তু তার আগে যে নিশানা ঠিক করতে হবে! এটা তো শখের খেলনা নয়!'

সে কথা মনে আছে। তাই আমি আজ শখ করে নয়, প্রয়োজনেই এটাকে বের করে এনেছিলাম। নিখুঁত হাতে লোড করেছিলাম। এবং সন্ন্যাসী দলটা এসে যেখানে দাপাদাপি শুরু করেছিল সেই দিকে ছুটে গিয়ে পরপর ছটা গুলিই চালিয়ে দিয়েছিলাম। দলের কে কোথায় কোনদিকে হুপ হুপ শব্দে ছিটকে পালাল কে জানে। কিন্তু তার মধ্যেই একটা—

হ্যাঁ, রঘুনাথজির মন্দিরে অবিকল এই রকম একটা হাত জোড় করা পাথরের মূর্তি দেখেছি বটে। রামবিলাস রোজ ওটাকে ফুল বেলপাতা আর নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করে। ভক্তেরা এসে পায়ের কাছে পয়সা ছোটায়। আমি সেই 'সাক্ষাৎ ভগবান'কে খুন করেছি—রামবিলাস তো আমার উপর খাপ্পা হবেই। সত্যযুগ হলে হয়তো দৃষ্টি নিক্ষেপেই ভস্ম করে ফেলত। কিন্তু এটা কলিযুগ, তার চোখে সে আগুন নেই আমি জানি, শুধু আস্ফালন। তাই তার চোখরাঙানিকে পরোয়া না করে আমি, মরা হনুমানটাকে টেনে জঙ্গলের ধারে ভাগাড়ে ফেলে আসব বলে ঠিক করলাম। এখানে পড়ে থাকলে পচবে, দুর্গন্ধ ছড়াবে।

কিন্তু হাত বাড়াতেই রামবিলাস চিৎকার করে উঠল, অ্যাই খবরদার! ওঁকে ছুঁবি না!' আমি কুঁজো হয়েই মুখ তুলে জানতে চাইলাম, 'কেন?'

—কেন? উনি যে ভগবান! তুই ম্লেচ্ছ। তোর শরীরে যবনীর রক্ত আছে। বাপ হিন্দু হলে হবে কী, তোর মা যে মুসলমান, নাম ভাঁড়িয়ে হিন্দু সেজেছে, জানিস না?

কথাটা বিষের তিরের মতো বুকে এসে বিঁধল। তবু শান্ত হয়েই তার উত্তর দিলাম, 'জানি। তাতে কী হয়েছে?'

—কী হয়েছে মানে? কোন অধিকারে তুই হিন্দুর দেবতার গায়ে হাত দিতে যাস! তোর সাহস তো খুব?

—আরে দূর! যে দেবতা কেবল সর্বনাশ করে বেড়ায় সে আবার দেবতা কীসের, দানব। তাকে আমি মানি না, আমাদের শত্রু।

—শত্রু! রামবিলাস খিঁচিয়ে উঠে বলল, হায় রাম! পবনপুত্র হনুমান তোর শত্রু? তা তো বলবি রে হারামজাদা। খানকির বাচ্চা। তোর বাপ যে নকশাল ছিল! জাতধম্ম মানত না। জোতদার খুন করে জঙ্গলে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াত। জমি নিয়ে চাষাদের খ্যাপাত—যেন শালাদের বাপের জমি! আর কোথা থেকে একটা মুসলমান ছুঁড়িকে জুটিয়ে এনে বেলেল্লাপনা করত—তার ফল তো তুই, তোর আর ধম্মজ্ঞান কী থাকবে? যে পাপে তোর বাপ মরেছে, তোর দাদু ইশকুলের চাকরি খুইয়ে বুড়ো বয়সে শুকিয়ে মরেছে, সেই পাপ তোকেও লাগবে—এই আমি বলে দিলাম!

—আরে যাও যাও! আমি শূন্যে হাতের ঝটকা মেরে বললাম, তোমার বলাতেই যেন সবকিছু হয়ে যাবে—

শালা ভণ্ড, চরিত্রহীন, জোতদারের দালাল। আমার বাবা বেলেল্লাপনা করত আর তুমি বুঝি খুব ধোয়া তুলসীপাতা? টিকিতে ফুল ঝুলিয়ে ভগবানের পুজো করে বেড়াও আর লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরের বাসন মাজা ঝিয়ের অভাবের সুযোগ নিয়ে তার পেটে শুয়োরের বাচ্চা পয়দা কর—আমি জানি না? ভেবেছ এখনও বুঝি সেই ছোটোই আছি, ভয় পেয়ে চুপ করে থাকব, থাকব না—!'

—চুপ কর হারামজাদা, বেজন্মা কোথাকার। তোকে আজ পুলিশে দেব। বল, কোথায় পেলি তুই ওই রিভলভার? কোথায় পেলি—আ-আহ্। আমাকে খুন করে ফেলল গো—! একটা আর্তনাদ করে বসে পড়ল রামবিলাস। কারণ আমি আর সহ্য করতে পারিনি। প্রচণ্ড রাগে আর ঘেন্নায় দাঁতে দাঁত পিষে গুলিশূন্য রিভলভারটা ছুড়ে মেরেছি তার কপাল লক্ষ করে। রামবিলাস আমার টার্গেট ছিল না। পাকেচক্রে হয়ে গেল। হয়তো তা-ই হয়। হতই। হনুমান একটা প্রতীক মাত্র।

রামবিলাস আর্তনাদ করতে করতে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছে ততক্ষণে। দরদর করে রক্ত পড়ছে। দূর থেকে তার চিৎকার শুনে হইহই করে ছুটে আসছে একদল লোক—খুন! খুন! ঠাকুরমশাইকে খুন করেছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে! সর্বনাশ, এত বড়ো বুকের পাটা ককার—কে সে?

রামবিলাস ওই অবস্থায় একহাত তুলে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে, ওই নকশালের বাচ্চাটা! ওকে ধরো, ছেড়ো না--শেষ করে দাও!

আমি হতভম্ব। ঘটনাটা এইভাবে মোড় নেবে ভাবিনি। লোকগুলো ছুটে আসছে। আমি কি তা হলে পালাব? কিন্তু আমার অস্ত্র—?

ঘুরে দাঁড়াতেই রামবিলাস ভয় পেয়ে আবার চিৎকার করে উঠল, 'ওই দ্যাখো, আবার আসছে ও—সর্বনাশ। ওখানে ওর অস্ত্রটা আছে—সব ধ্বংস করে দেবে। কেড়ে নাও, কেড়ে নাও—জয় বজরঙবলী! জয় শ্রীরাম। বক্ষে কর—

রামবিলাসের সুরে সুরে মিলিয়ে লোকগুলো হুঙ্কার দিয়ে উঠল, জয় বজ্রঙবলী! জয় শ্রীরাম! মারো শালাকে—'

ওরা এগিয়ে আসছে। না, আর স্থির থাকা যায় না। আমার বাবা-মার পবিত্র আয়ুধ আমারই ভুলে ছিটকে যাবে একদল ভণ্ড দুরাচারী ধর্মের ধ্বজাধারীদের হাতে এ আমি সইতে পারব না। আমার এ পাপ ক্ষমার অযোগ্য।

সুতরাং বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে রিভলভারটা হাত তুলে নিলাম আমি। চিৎকার করে বলে উঠলাম, খবরদার—আর এক পাও এগোবে না। আমি তোমাদের ভগবানকে খুন করেছি। বেশ করেছি। এবার তাকে ভাগাড়ে ফেলতে যাব। না হলে আমার মুক্তি নেই। আমাকে মেরে ফেললেও আমি শুনব না।'

হ্যাঁ, আমি আর শুনব না কারণ, যে মুক্তির স্বপ্নের ভেতর দিয়ে আমি এসেছি এই পৃথিবীতে, হেঁটে যাব; সেই পথটা আবার দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। রক্তের ভেতরে শুনতে পাচ্ছি সেই বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ! □

সূর্যসেনা

তিমিরবরণ সিংহ

একটা জ্বলন্ত আগুনের ডেলা গাঁক করে ছুটে বেরিয়ে এল। কোটি কোটি বছরে যে বিচিত্র মানুষের সৃষ্টি সেই মানুষের বুক কবুতরের মতো ভালোবাসায় কাঁপছিল। সেই ভালোবাসার কবোষ্ণ ঢালু বুক লোভী কসাইগুলো ফেঁড়ে ফেলল।

আর ঝড় উঠল, রক্তের মতো হয়ে গেল সারাটা আকাশ। মরদগুলোর চোখের কোণে কোণে প্রতিহিংসা ছুরির মতো কেটে কেটে বসে গেল।

চৈত্রের হল্‌কা বাতাসে সাঁওতাল গাঁওটা তখন নেড়িকুত্তার মতো হাঁপাচ্ছে। শুকনো রুটির মতো পেটে মরদগুলো তাড়ি গেলে আর খরা বাতাস ওদের বুকে বাড়ি মারে। আর সেই ভুখা সূর্যের জ্বলুনি বুকে নিয়ে একটা ছেলে এল সেই গ্রামে। বলল,—লড়তে হবে। বলল,—অস্তর হাতে নিতে হবে, এককাট্টা হতে হবে, লড়তে হবে জান কবুল করে—এটা ইজ্জতের লড়াই। দেখ, তোদের বাপদাদাদের রক্ত লেগে আছে এ মাটির সঙ্গে, এই মাটিতে তোদের রক্তের ফসল ওঠে!

বর্ষা নামল মৃত্যুর মতো অন্ধকারকে বুকে নিয়ে। বর্ষা নামল আগুনের টুকরোর মতো আকাশটা ফাটিয়ে।

সারাদিন বৃষ্টি চলল। বর্শার ফলার মতো বৃষ্টির টুকরোগুলো মরদগুলোর বুকে বিঁধতে লাগল। বুক খামচে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল লখিন।

শকুনটা উড়ছিল ঘোলাটে চোখদুটোর লোভী দৃষ্টি নিয়ে—ওটা স্থির হয়ে দাঁড়াল গ্রামটার মাথার উপর—নখ থেকে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে নামল মাটি পর্যন্ত, খামচে ধরল গ্রামটাকে—নখগুলো বিঁধিয়ে দিল ঢালু বুকে।

চম্পার বুকফাটা চিৎকারে গাঁওটার বুক কাঁপিয়ে উঠল, হেঁই গো মরদরা—

ছেলেটি বলল, আমাদের খুন ঢালতে হবে—তাজা খুন। বলল, আমাদের নেতা চেয়ারম্যান মাও সে তুং। ছেলেটি রক্তের মতো লাল বইটা খুলে মাও সে তুঙের ফটোটা দেখাল,—ইনি চিন দেশের আশি কোটি মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, এঁর নেতৃত্বে লড়াই করে আশি কোটি মানুষের গলার ফাঁস খুলে গেছে। ইনি বলেছেন, কোনও কোনও মৃত্যু বেলেহাঁসের পালকের চাইতেও হালকা, আর কোনও কোনও মৃত্যু হিমালয় পাহাড়ের চাইতেও ভারী।

ছেলেটির গলার স্বর আবেগে কাঁপছিল, আমরা যদি স্বার্থপরের মতো মরি, তা হলে ওই মরণ দেখে ওই যে বেলেহাঁসটা উড়ে যাচ্ছে ওর পালকটাও হাসতে থাকবে। আর যদি সমস্ত গরিব ভাইদের জন্য আমরা মরতে পারি, তা হলে হিমালয় পাহাড়টাও মাথা নোয়াবে।

কী আছে, আমরা মরেই আছি—আমরা যদি ওই কেউটে সাপগুলোকে জিন্দা রেখে দিই তা হলে উয়ারা আমাদের চ্যাংড়াদের বুকেও বিষ ঢালবে। ওই কেউটে সাপগুলোর ফণা কাটতে হবে।

কি রে, পারবি না?

—হাঁ, পারবু না কেন?

বর্ষা কেটে গেছে। অন্ধকার আকাশ পাতলা হয়ে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। জ্যোৎস্নার বুকে বিরাট বিরাট মহুয়া গাছগুলো বারোমাসের এক দুঃখের ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। লাল কাঁকরের টিবিগুলো রাত্রিবেলা বন্য বিড়ালের মতো ঘুমিয়ে রয়েছে। এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নার মধ্যের গাঁওটা ঘুমোতে পারে না। লখিনের বুকের একটা সাদা হাড়ের করাত কেটে বসে রয়েছে।

আলোছায়ায় তারাগুলো নিঃশব্দ স্বপ্নের ফিনকি ছিটোচ্ছে। ওই স্বপ্নের ফিনকি চম্পার চোখে দেখত লখিন। তাই ওই নীল তারাগুলো চম্পার কথা মনে পড়িয়ে দেয়—লখিন ভর রাত ঠায় বসে থাকে—মাঝে মাঝে বুকের ভিতরে চিড় খেয়ে যায়—হেঁই রে লখিন, অনেক রাত হল, শুতে যা।

ওই থিরথিরে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে লখিনের মনে হয়, চম্পা কাঁদছে।

'আজ অনুশোচনার দিন নয়, আগুনের মতো জ্বলে ওঠার দিন, কোনও হত্যাই যেন বিনা বদলায় না যায়।' তাই কালকে আগ্নেয়গিরির লাভায় আকাশটা টকটকে লাল হয়ে যাবে, আর সেই আগ্নেয় লাভা ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মরদগুলোর বুক থেকে।

আগামিকাল কি ওদের পরব? □

ওরা ফেরেনি

দীপঙ্কর দাস

কাল রতন ফিরেছে।

বুকের নীচে অস্পষ্ট একটা ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল আমার। ঘুম ভাঙার পরও জাগতিক পরিমণ্ডলে ফিরে আসতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। বুকের নীচে সেই ব্যথাটা কখনও গভীর হয়ে কখনও বা হালকা হয়ে আমাকে খুব ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিয়ে আসছিল ঘরের স্পর্শ গন্ধময় জগতে। একটু আগে আমি কি কোনও স্বপ্ন দেখছিলাম? ....তন্দ্রার ভেতর থেকে জাগরণে ফিরে আসতে আসতে আজকাল আমি যেমন স্বপ্ন দেখি! নিটোল কোনও গল্প নয়—ছাড়া ছাড়া কিছু ছবি কিংবা মুহূর্ত—উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় ভরা,—এরকম কোনও স্বপ্ন: আমি চেষ্টা করেও এরকম কোনও স্বপ্নের কথা মনে আনতে পারছিলাম না। তবু টের পাচ্ছিলাম কাল সারা রাত আমার বুকের পাড়ের অনেক মাটি সরে গেছে। নিঃশব্দে, নিরালায়। এখনও মাটি সরে যাওয়ার শব্দ হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে বাসি অন্ধকার। এখনও স্পষ্ট সকাল হয়নি। কাছে-দূরে কোথাও ঠিক-ঠাক দিন শুরুর শব্দ জাগেনি। কেতকীরও ঘুম ভাঙেনি। আমি ঘরের মধ্যে প্রায় সিসার বাষ্পের মতো ভেসে বেড়ানো আবছা আলোয় চোখ মেলে তাকালাম। একবার পাশের ঘরের দেওয়ালটার দিকে চোখ ফেরালাম। দেওয়ালের ওপারের ঘরে রতন আছে। ও ঘর থেকে ভেসে আসা কোনও শব্দের প্রত্যাশায় কান খাড়া করে অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। কোনও সাড়া-শব্দ কিছুই শুনতে পেলাম না। রতন বোধ হয় এখনও গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে। কতদিন পরে সে এমন নিশ্চিত আশ্রয়, এমন উষ্ণ শয্যা ফিরে পেয়েছে। তাই হয়তো ঘুম তার ঘন হয়ে উঠেছে। কাল সারা রাত বড় গুমোট গেছে। শেষ রাতের দিকে অল্প অল্প হাওয়া ছেড়েছিল। এখনও হাওয়ার রেশটুকু রয়ে গেছে। এই রকম ঝিরঝিরে বাতাসে কিছু যেন থাকে। আমার শরীরের স্নায়ুগুলো একটু একটু করে হাত-পা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। অসাড় ভাবটা কাটছিল।

কাল রাতে রতন ফিরে এসেছে।

ঘরের মধ্যে থেকে আলো-আঁধারি সরে যাচ্ছে ক্রমশ। দেওয়ালের ঘুলঘুলিতে চড়াই পাখি বাসা বেঁধেছে হয়তো। দুটো চড়াই ওই ঘুলঘুলিতে বসে খুনসুটি জুড়ে দিয়েছে। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। সামনের মাঠে মরা ঘাসের ওপর গত রাতের শিশির এখনও চিকচিক করছে। মাঠের পূর্ব দিকে সার বেঁধে দাঁড়ানো শিরীষ আর তেঁতুল গাছগুলির আড়াল থেকে সূর্য উঠে আসছে। কপালের দু পাশের শিরা দুটো দপদপ করছিল। কাল রাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি। এমনিতেই কাল বিছানায় যেতে যেতে অনেকটা রাত করে ফেলেছিলাম। তার উপর কিছু উত্তেজনাও ছিল। তাই তন্দ্রায় আচ্ছন্নের মতো বাকি রাতটুকু কেটে গিয়েছিল। এখন এই মুহূর্তে সকালের অন্তরঙ্গ আয়োজনের ভেতর আমি যেন কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম। আমার ভালো লাগছিল।

কেতকী উঠল বোধ হয়। বারান্দার ও দিক থেকে ওর কাশির শব্দ শুনতে পেলাম। এ বাড়িতে ঘর বলতে দুটো। ভেতরের বারান্দায় তিন দিক ঘিরে দেওয়াল তুলে আর একটা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওই ঘরটা কখনও ব্যবহার করা হয়নি। সংসারের নানান রকম টুকিটাকিতে ভর্তি হয়েছিল ঘরটা। রতন আসবে বলে ঘরটাকে কাল পরিষ্কার করিয়েছিলাম; আমার ইচ্ছে ছিল ওই ঘরটায় আমি শোব। রতন শোবে আমার ঘরে। তা হলে কেতকীকে আর ঘর ছাড়তে হবে না। কেতকী রাজি হয়নি।

সে তার ছোড়দার জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি। রতনকে ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজে ওই বারান্দার একটেরে ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে। আমি আর কথা বাড়াইনি।

বুকের নীচে মাটি সরে যাওয়ার চিনচিনে ব্যথাটা এখনও বেজে চলেছে। ঘর ছেড়ে কলতলায় এসে দাঁত মাজতে মাজতে দেখলাম কেতকী গত রাতের এঁটো বাসনপত্তর নিয়ে মাজতে বসেছে। তার মানে কাজের ঠিকে ঝিটা আজ আসবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে, টগরের মা আজ আসবে না নাকি?'

কেতকী কড়াইয়ে তেলচিটে আঠা ছাড়াতে ছাড়াতে সাড়া দিল, 'টগরের জ্বর চলছে ক দিন। বলেছে আজ নাকি টগরকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে।'

তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছিল কেতকী. উনুন প্রায় ধরে এল। ধোঁয়া মরে গেছে। আমি উনুনটা রান্নাঘরে তুলে নিয়ে এলাম। কেতকী জল পাম্প করতে করতে বলল, 'দাদা, এই বাটিটায় চায়ের জলটুকু চড়িয়ে দাও। জল গরম হতে হতে আমার এ দিকটা সারা হয়ে যাবে।'

কলতলা থেকে ঘরে ফিরে আসতে আসতে কেন জানি আমার চোখ রতনের বন্ধ দরজাটার ওপর গিয়ে পড়ল আর একবার। বুকের মধ্যে দলাপাকানো শ্বাসটুকু বুক ছেড়ে বেরিয়ে এল। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। গত কয়েকটা দিন আমাদের অনেক উদ্বেগ আর উত্তেজনায় কেটেছে। রতনের ফিরে আসার সংবাদটার জন্য আমরা কেউ তেমন প্রস্তুত ছিলাম না। আসল কথা আমরা অনেকদিন আগেই ওর বেঁচে থাকার সম্ভবনাটুকুকেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলাম। তাই রতনের ফিরে আসার সংবাদ আমাদের অস্তিত্বের গোড়া ধবে প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটাকে আমি সহজে হজম করে নিতে পারিনি। সে দিন অফিস বেরবার মুখে ডাক পিওন যখন জানলা গলিয়ে একটা পোস্টকার্ড ছুড়ে দিয়েছিল, আমি তখন ভাবতেও পারিনি ওই পোস্টকার্ডটা এরকম কোনও অভাবিত সংবাদ বহন করে এনেছে। মা মারা যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে আমরা অনেকদিন স্বজনহীন। চিঠিপত্র আসে না। তাই চাপা কৌতূহল নিয়ে পোস্ট-কার্ডটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। রতন মাত্র দুটো লাইনে তার ফিরে আসার সংবাদটুকু লিখেছিল। সেই দুটো লাইনই আমাকে বিহ্বল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। জীবনের মধ্য-তিরিশে এসে আমি আজকাল বুঝতে পারি কোনও চূড়ান্ত দুঃখ কিংবা চবম আনন্দের মুহূর্তগুলিতেও মানুষের অচঞ্চল হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ানো উচিত। আমি স্থির হতে চেয়েছিলাম। পারিনি। মুখ দিয়ে কখন যেন আমার অজান্তেই বেরিয়ে এসেছিল, 'কেতু, শিগগির আয়!'

আমার গলায় হয়তো স্বাভাবিক উত্তেজনার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। কেতকী এক ছুটে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হল দাদা, এমন করে ডাকলে কেন?'

আমি কোনও সাড়া দিতে পারিনি। কেবল হাত বাড়িয়ে পোস্ট-কার্ডটাকে এগিয়ে ধরেছিলাম কেতকীর দিকে। কেতকী চিঠিটা পড়তে পড়তে অস্ফুট যন্ত্রণায় কিংবা তীব্র আনন্দে বলে উঠেছিল, 'ওহ্! ছোড়দা বেঁচে আছে! ....মাগো, ছোড়দা নাকি ফিরে আসছে।'

ভাদ্র মাসের সকাল। রোদ যেন লঙ্কা বাটার মতো ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। বাজারের মুখটায় নেপালকাকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি একটু দাঁড়ালাম। তিনি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল নাকি রতন ফিরে এসেছে!

আমি নেপালকাকার মুখ দেখলাম। নেপালকাকার সঙ্গে আমাদের বাবার খুব হৃদ্যতা ছিল একদিন। বাবা মারা যাওয়ার পরও সেই হৃদ্যতার সূত্র ধরে তিনি আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। মা চলে যাওয়ার পর সেই হৃদ্যতার টান ধরেছে। তবু এই পাড়ার মধ্যে যে কজন প্রবীণ মানুষ আমাদের দিকে একটু চোখ তুলে তাকান তাঁদের মধ্যে নেপালকাকা একজন। ....কাল রতন ফিরে আসার পর থেকে আমার মনটা একটু স্পর্শকাতর হয়েছিল। সকাল থেকে নানান চিন্তাভাবনা সেই কাতরতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছিল। তাই নেপালকাকার প্রশ্নে আমি যেন একটু আশ্রয় খুঁজে পেলাম। খুব ধীর গলায় বললাম, 'হ্যাঁ কাকা, রতন কাল ফিরেছে।'

—আছে কেমন ছেলেটা? নেপালকাকা কেশে বুক থেকে কফ তুলে আনলেন। নিচু হয়ে বললেন, 'এতদিন কোথায় কোথায় ছিল, বলেছে-টলেছে কিছু?'

—নাহ্, তেমন আর বলল কই? ....বাজারের মুখটা অনেক সরু। তাই লোকজনের ধাক্কা লাগছিল। কেউ কেউ চাপা বিরক্তি প্রকাশ করে যাচ্ছিল। নেপালকাকা আমার ডান হাতের কনুই ধরে টেনে নিয়ে একটু পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। এ দিকটায় কয়েকটা দশকর্মা ভাণ্ডারের দোকান। ভিড় কম। আমি পূর্বকথার জের টেনে বললাম, 'তবে চিঠি লিখেছিল ভাগলপুর জেল থেকে। তাই মনে হচ্ছে—'

—থাক, এত তাড়া কীসের! একবার যখন ফিরে এসেছে......। একজন সাইকেল যাত্রী নেপালকাকার শরীর ছুঁয়ে চলে গেল। তিনি শরীরের ভারসাম্য সামলাতে আরও একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন। ওখান থেকেই খুব নামানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ও নিজের হাতে মার্ডার-টার্ডার করেছিল নাকি? ....ওই মানে ওরা যাকে বলত শ্রেণীশত্রু খতম,........বলেছে কিছু?'

মুহূর্তের জন্য আমার চোখের সামনে থেকে চরাচর দুলে উঠল। বাজারের ভিড়, মাছের দোকানগুলির হই-হট্টগোল, পায়ের নীচে কাদা আবর্জনার স্তূপ,—সব কিছু নাগরদোলার মতো ঘুরতে শুরু করল। দম আটকানো বাতাস আমার শ্বাসকষ্ট ধরিয়ে দিচ্ছিল। আমি দেখছিলাম সেই আবর্তিত মুখের মিছিলে নেপালকাকার মুখটা কেমন যেন পাথুরে হয়ে যাচ্ছিল। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। চোখ দুটো কোটরে সিঁধিয়ে গেছে। এতদূর নীচে নেমে যেতে পারে মানুষের কৌতূহল! এভাবে কথা জাগাতে পারে প্রিয়জনেরাও? ....নেপালকাকা আরও বলে চললেন, 'কারণটা যতই ব্রড হোক না বাবা, আফটার অল মার্ডার তো। তোমার আমার ঘরের ছেলের হাতে রক্তের দাগ—।' আমি আর শুনতে পাচ্ছিলাম না কিছুই। আসলে কোনও শব্দই তখন আর কানে ঢুকছিল না। কী অসম্ভব আর অপার্থিব নীরবতা জেগে উঠেছিল আমার বুকের নীচে। সেখানে লুকিয়ে আছে দূর্বাঘাসে ছাওয়া এক উপত্যকা। সকালের কলুষহীন রোদ গড়িয়ে পড়ছে উপত্যকার ঘাসে। আর উপত্যকার সেই স্নায়ু অসাড় করা নির্জনতা ভেঙে দিয়ে কে যেন তারস্বরে ডেকে চলেছে, 'র-ত-ন-রে-এ! রতন রে........এ-এ-এ!

বাজার সেরে ফিরে এসে দেখলাম রতন তখনও জাগেনি। কেমন যেন নিঃস্ব লাগছিল নিজেকে। খুব বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল। কেউ যেন অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে আমার ভেতর থেকে খুব গোপন, খুব একান্ত কিছু একটা কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন সেই শূন্য জায়গায় খা-খা করছে ভাদ্রের রোদ। কেতকী একবার ঘরে ঢুকে কিছু একটা নিয়ে ফিরে চলে গেল রান্না ঘরে। কেতকীর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তবু যতটুকু দেখা গেল তাতে টের পেলাম ওর মুখটা ঈষৎ রক্তাভ, থমথমে। কেতকী যেন বহু কষ্ট করে বুকের ভেতর বয়ে যাওয়া কোনও ঝড়কে গোপন করে রেখেছে।

পরিকল্পনা তো আর কম ছিল না আমাদের। মা মারা যাওয়ার পর আমাদের এই বাড়িতে কোনওদিন কোনও আনন্দ উৎসব হয়নি। সন্ধ্যার বিমর্ষতা কোনওদিন সজীব হাসিতে ভরে ওঠেনি। সৃষ্টিছাড়া কোটর হাঁ করা এক ক্ষুধা সব সময় হাঁ করে আছে। নিঃশব্দে, নিরুচ্চারে ওই হাঁ মুখের ক্ষুধা মেটাতে আমরা কবে যে একেবারে ফুরিয়ে গেছি, সেই খবরটুকুও রাখি না। সেখানে আমাদের আদরের সহোদরের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের সংবাদে আমরা যেন কিছু একটা পাওয়ার, কিছু একটা দেওয়ার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলাম। রতন ফিরেছে—একটা মাত্র রাত পার হয়েছে—তার মধ্যেই আমরা যেন আবিষ্কার করে ফেলেছি আমাদের পাথরচাপা বুকের নীচে আর বোধ হয় উৎসবের বাতি জ্বলল না।

স্নানঘরে ঢুকে মাথায় জল ঢাললাম অনেকক্ষণ। জলের শব্দে আবার বুকের নীচে সেই মাটি সরার শব্দটা ফিরে ফিরে আসছিল। তখন কী বলছিলেন নেপালকাকা? ....'আফটার অল মার্ডার তো! আমাদের ঘরের ছেলের হাতে রক্তের দাগ!' ....নাহ্, আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। রক্তের দাগ! ....আমি নিজের অজান্তে কখন যেন ডান হাতের করতলটা চোখের সামনে মেলে ধরলাম। সাবান ঘষে পরিষ্কার করলাম করতল। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলাম। কোনও দাগ, কোনও চিহ্ন লুকিয়ে আছে কি এই হাতে? এখন চোখে ধরা পড়ছে না। হয়তো একদিন ধরা পড়বে। ভাবতে ভাবতে বাথরুমের আর্দ্র শীতলতায় জল-গায়ে দাঁড়িয়ে থেকেও আমি ঘেমে উঠছিলাম। আমি কেন তখন নেপালকাকার সামনে দাঁড়িয়ে বাজারের সমস্ত

ভিড়কে হতচকিত করে চিৎকার করে উঠতে পারিনি, 'নেপালকাকা, আগে নিজেদের হাতগুলো দেখুন। ....দেখুন ওখানেও রক্তের দাগ আছে কি নেই।'

স্নান-খাওয়া সেরে অফিসে বেরুতে যাচ্ছি, কেতকী এসে দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল। আমি মুখ ফেরালাম ওর দিকে। একবার চোখাচুখি হল। চোখ সরিয়ে নিলাম। কেতকীর চোখ লাল-বর্ণ। বোধ হয় কাল সারারাত না ঘুমিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছে খালি। আমি শ্বাস চাপতে চাপতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে কেতু, বলবি নাকি কিছু?'

কেতকী ঘাড় নাড়ল। নাহ্, কিছুই সে বলবে না।

ভাদ্রের রোদ গায়ে সয় না। তবু সইতে হয়। আমি কেন জানি বেরিয়ে আসার সময় দেখা কেতকীর মুখটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। ঠিক ওই রকম মুখ নিয়ে আমাদের মা একদিন চলে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় ঠিক এমনি করে জিজ্ঞেস করেছিলাম; 'কিছু বলবে মা?'

মা আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়েছিলেন। নাহ্, কিছুই তিনি বলবেন না।

চোয়ালের নীচে ব্যথা জমছিল। কতদিন হয়ে গিয়েছিল আমরা রতনকে হারিয়েছিলাম? আজকে আর দিনক্ষণ ঠিক ঠিক মনে করতে পারি না। কেবল মনে আছে মা তখন বেঁচেছিলেন। আর সময়টাও তখন বড়ো অস্থির ছিল। মারদাঙ্গা, খুনখারাপি.—চারদিকে লেগেই থাকত। রতন চিরদিন মেধাবী ছাত্র ছিল। আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল রতন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে তার উজ্জ্বল ফলের দৌলতে এই কঠিন বাজারেও ভালো আয়ের একটা চাকরি অনায়াসেই জোগাড় করে নিতে পারবে। সেই সুবাদে এই সংসারের অচল চাকাটা একটু ঘুরবে। এই প্রত্যাশার পেছনে হয়তো একটু স্বার্থ-গন্ধ ছিল। তবু আমরা এ রকমই স্বপ্ন দেখতাম। আমাদের বাবা অকালে মারা গিয়েছিলেন। তাই আমাকে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে ছোটো মেসোর সুপারিশে কোনও রকম একটা সামান্য আয়ের চাকরিতে ঢুকে পড়তে হয়েছিল। তা ছাড়া আমি কোনওকালেই লেখাপড়ায় তেমন একটা সুবিধা করতে পারিনি। তাই আমাদের অনেক আগাম প্রত্যাশা রতনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। এ নিয়ে মার সাথে কখনও সখনও আলাপ করে দেখেছিলাম তিনিও এই বিশ্বাসে আস্থা রেখেছিলেন। সেই রতন আমাদের সব হিসাব গরমিল করে দিয়েছিল। এর জন্য হয়তো কেউ দায়ি ছিল না। তবু আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চেয়েছিলাম। একদিন রতনকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোর মনে কী আছে রতন?' রতন সাড়া করেনি। আমি ওর চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করেছিলাম। আমার বুক কাঁপছিল। আমি পারিনি। একসময় ধরা গলায় বলেছিলাম, 'মার কথাটা মনে রাখিস রতন। মা তোর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেন।' রতন আমার কথার সরাসরি কোনও উত্তর করেনি। একটু ঘুরিয়ে বলেছিল 'আমাকে দুর্বল করিস না দাদা।' ততদিনে আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম সময় তার অনিবার্য কালো হাত আমাদের ঘরের ভেতরও বিছিয়ে দিয়েছে। ওই হাত অনেক কিছু নেবে। বুকের রক্ত না ঝরিয়ে থামবে না।

অফিসে দিনটা আমার ভালো কাটল না। আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের অনেকের জানা ছিল রতনের ফিরে আসার কথা। চেয়ারে বসতে না বসতেই ওরা আমাকে ছেঁকে ধরল। 'রতনের সঙ্গে আমার কী কী কথা হল? রতন কি ওদের রাজনীতির লাইনকে ভুল বলে স্বীকার করেছে?' —এ ধরনের কথা থেকে শুরু করে 'রতনকে কি ডাণ্ডাবেড়ির অত্যাচার সইতে হয়েছিল?' কিংবা 'হায়দ্রাবাদি-গোলির প্রয়োগ কি রতনের ওপরও হয়েছিল?' এই রকম নানান প্রশ্নে ওরা আমাকে উত্ত্যক্ত করে তুলল। আমি যত বলি রতনের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি, ওরা ততই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। কেউ কেউ বলে বসল, 'আমি নাকি চিরদিন আঁতলেমি করে গেলাম। এর জন্য সময় সময় আমাকে নাকি সহ্য করা যায় না।' আমি শুনে গেলাম। কোনও উত্তর দিলাম না। ওরা আমার কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে রতনদের রাজনীতির অতিবাম বিচ্যুতি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনায় ফিরে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ভাদ্রের একটা দিন জ্বলে জ্বলে ফুরিয়ে গেল। আমার টেবিলের পাশেই জানলা। পুরোনো বাড়ি—তাই জানলার আকৃতি বেশ বড়ো। চেয়ারে বসে বসে আমি বাইরের শহর দেখছিলাম। বেলা মরে আসার আলো ফুটেছে শহরের বুকে। বাস্ততার ওম উঠছে ওর গা থেকে। কাল রাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি। সকাল

থেকে বুকে মাটি সরে যাওয়ার কষ্ট হচ্ছে। অফিস-ঘর জুড়ে সহকর্মীদের হাসি-ঠাট্টার শব্দ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল আমার চারদিকে। আমি যেন সব কিছু থেকে আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে পড়ছিলাম। সেই দূর্বাঘাসে ঢাকা উপত্যকা, আমাব চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আবার। উপত্যকার ঘাসে ঘাসে জড়িয়ে আছে দিনশেষের আলো। ঠিক এমন সময় পরেশ এসে বলল, 'বাণী, তোর ফোন। এস ও-র ঘরে।'

শ্রান্ত হাতে ফোন তুললাম, 'হ্যালো।'

—কে, বাণীদা? আমি ওজু বলছি। ওপার থেকে জলতরঙ্গের মতো রিন রিন করে ওজুর কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল।

—ওজু! দিল্লি থেকে কবে ফিরলে?

—এই তো কাল। ওজুর কণ্ঠস্বর একটু উত্তপ্ত শোনাল—'নিউজটা কি ঠিক, বাণীদা?'

—কোন নিউজ ওজু?

—রতনদা নাকি ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ ওজু।

—রিয়েলি? ওপারে ওজুর বিস্ময়ের মুদ্রা যেন দূরভাষের মধ্য দিয়ে আমার কানে ছড়িয়ে পড়ল। ওজু আবার বলল, 'কী দারুণ, তাই না বাণীদা?

—কোনটা দারুণ ওজু।

—ওই রতনদার ফিরে আসাটা? কি থ্রিলিং! জানো অনির্বাণও ওই রকম। প্রেটি একসাইটিং।

—কে অনির্বাণ ওজু?

—ওম্ মা, অনির্বাণকে জানো না? —দারুণ গলফ খেলে। লাস্ট ইয়ারে দিল্লির টুর্নামেন্টে হাইয়েস্ট স্কোর করে মার্চেন্ট কাপ উইন করেছে। এত ভালো না। তোমাকে কী বলব? সো সুইট অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিশড—জানো অনির্বাণও বলে এ দেশে পেজেন্ট রেভলিউশন ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। ও তাই আমাকে নিয়ে স্টেটস এ সেট্‌ল করতে চায়।

ওজু ফোন করছিল। আমার মাসতুত ভগিনী দিল্লি প্রবাসিনী অর্থনীতির ছাত্রী, ফোনে আবও কত কথা বলে চলল। ওজুকে আমি চিনি। ওকে আমি যখনই দেখেছি, সে প্রথম সকাল, মধ্য দুপুর কি শ্রান্ত বিকেল, —যাই হোক না কেন,—আমার মনে হয়েছে ওজু বোধ হয় এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এল। —এমন ঢুলু ঢুলু চোখ ওজুর। আজন্ম সম্পদ আর বিলাসের মধ্যে যে শরীর গড়ে ওঠে,—আমার ভগিনী হওয়া সত্ত্বেও এ কথা আমি না ভেবে পারিনি যে ওজুব ওই শরীব যেন ঘনবদ্ধ অন্তরঙ্গতায় কোনও সজীব প্রাণবান পুরুষকে আহ্বান করছে। সেই ওজু ফোন করছিল। আমি এক সময় ফোন বেখে ফিবে এলাম। কপালেব দু-পাশের শিরা দুটো অসম্ভব গতি নিয়ে দপ দপ কবছিল। ওজু বলছিল রতনকে একবার ওজুদেব বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে। সে রতনের ফিরে আসার সংবাদ পাওয়ার পব থেকেই নাকি উত্তেজনায় ফুটছে! —ওহ্! হাউ একসাইটিং!

সবটাই একসাইটিং বুঝি, ওজু সবটাই বুঝি একসাইটিং? চোখের নীচে জল কাটছিল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। কেন জানি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল,—দূরে প্রবাসের কোনও প্রত্যন্ত শহবের জেলখানার লৌহ-গরাদ আঁকড়ে ধরে কে যেন এক যুবক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে হেমন্তের সন্ধ্যায় আকাশ থেকে আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত! গত রাতে হয়তো তার ওপর 'হায়দ্রাবাদি-গোলি'র অত্যাচার প্রয়োগ করা হয়েছিল। কাল্পনিক স্বীকারোক্তি আদায়ের অজুহাতে জোর করে তার গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করানো হয়েছিল বরফশীতল লোহার রড। আজ সারাটা দিন সে মৃতবৎ অচেতন হয়ে পড়েছিল গরাদের কর্কশ-করুণাহীন পাথুরে মেঝেয়। এই বেলায় তার জ্ঞান ফিরেছে। তাই যন্ত্রণায় বার বার শরীর বেঁকে যাচ্ছিল তার। আব ঠিক সেই সময় দিল্লির তৃণাচ্ছাদিত শান্ত কোনও গলফ-গ্রাউন্ডে গলফ-এর উইনিং স্ট্রোক করে পয়েন্ট শিকারি এক যুবক পাশের উষ্ণ যুবতীর কাঁধে হাত রেখে বলছে—'এ দেশে পেজেন্ট রেভলিউশন ছাড়া কিছু হবে না। আমরা শিগগির স্টেটস-এ সেট্‌ল করব।'

অফিস ছুটি হতে চলেছে। সহকর্মীরা বাড়ি ফিরছে এক এক করে। সচরাচর অফিস ছুটির পরেই আমি বাড়ি ফিরি না। সহকর্মীদের কারও কারও সঙ্গে একটু তাস-টাস খেলি। অফিসের ভিড় পাতলা হলে বাস ধরি। আজ কেন জানি আমাকে খেলার জন্য কেউ ডাকতে এল না। আমারও ইচ্ছা করছিল না নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে খেলতে বসি। শূন্য অফিসঘরটায় একা একা বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা নিয়ে লোফালুফি করলাম। চোখের পাতায়, কপালে কাচের শীতল স্পর্শ নিলাম। তারপর এক গ্লাস জল খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পাড়ার তেমাথার মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সাধন ঘোষ আমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর হাসির পর্দা টেনে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে বাণীবাবু।'

—আমার সঙ্গে? আমার গলায় বিস্ময় চাপা থাকল না। সাধন ঘোষের সঙ্গে আমার তেমন কোনও হৃদ্যতা নেই। কেবল মুখচেনা, এই মাত্র। কোনও একটা রাজনৈতিক দলের তিনি বিশেষ কেউকেটা। তার হাতে বেশ বড়োসড়ো একটা ছেলে ছোকরার দল আছে। দেখেছি নানান ছুতোয় তিনি মিছিল টিছিল বের করেন। হরতাল-টরতাল হলে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সেই সাধন ঘোষের কথায় আমি স্বভাবতই চমকে উঠলাম।

—হ্যাঁ বাণীবাবু, আপনার সঙ্গেই। সাধন ঘোষ ডান হাতের তর্জনীটা তুলে এনে আমার বুকে ছোঁয়ালেন। তারপর শান্ত গলা বললেন, 'কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো সে কথা হওয়ার নয়, চলুন কোথাও গিয়ে বসি একটু।

আমার অস্থির লাগছিল। অথচ সাধ্য নেই যে বলি, 'না সাধনবাবু, আমার এখন তাড়া আছে। বসতে পারব না।' কারণ সাধন ঘোষকে অসন্তুষ্ট করাটা মোটেই বিচক্ষণতার কাজ হবে না। সেই সাহসও আমার নেই। অথচ মাত্র সাত মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে আমার বাড়ি। সেই বাড়িতে এখন বুঝি কিছু ঘটছে। আর সেখানে আমাকে সাধন ঘোষের কথা শুনে সময় অপচয় করতে হবে।

—রতন নাকি ফিরে এসেছে? সাধন ঘোষ চেয়ার টেনে বসতে বসতে প্রশ্নটা আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

আমি টের পেলাম আমার মধ্যে খুব নীরবে ধস নেমে গেল। নিশ্বাস চাপতে চাপতে বললাম, 'এর মধ্যেই জেনে গেছেন?

—আমাদের সব কিছু জানতে হয় বাণীবাবু,—এবং তাড়াতাড়ি। ঠোঁটের মুদ্রা করলেন সাধন ঘোষ। মুদ্রা ভাঙলেন, বললেন, 'সে যাই হোক, আসল কথাটা বলি।' সাধন ঘোষ চোখ তুললেন। আমার চোখে চোখ ফেললেন। তারপর বললেন, 'রতন কী ঠিক করল?'

—তার মানে? ঢোক গিললাম আমি।

—মানে আর কী? বলছিলাম ওর মতো একটা অ্যাকটিভ ক্যাডার একদম বসে যাবে সে তো ঠিক কথা নয়। কিছু একটা করবে নিশ্চয়। সেটাই জানতে চাই।

—এ সব রতনকেই জিজ্ঞেস করবেন।

—চটছেন কেন বাণীবাবু? সাধন ঘোষের মুখ পাথুরে আকার নিল। সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'একদিন ওদের হাতে আমাদের কত ছেলে খতম হ... হল সে কথা ও নিশ্চয় ভুলে যায়নি। তাই বলছিলাম রতনকে বলুন ও যেন আমাদের লাইনে চলে আসে। আমরা সব কিছু ক্ষমা করে নেব।

বুকের মধ্যে রক্ত লাফাচ্ছিল। আমি একবার সাধন ঘোষের মুখের দিকে তাকালাম। পাথুরে মুখ,—চিবুকটা কাস্তের ফলকের মতো বেঁকে আছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এখান থেকে মাত্র সাত মিনিটের হাঁটা পথে আমার বাড়ি। আমি ভাবতে পারছিলাম না। চোখ দুটো আবার জ্বালা জ্বালা করে উঠল। ক্রোধে নাকি অভিমানে আবার চোয়ালের নীচে ব্যথাটা টন টন করতে লাগল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয়নি, রতন ফিরেছে। এর মধ্যেই ওকে নিলামে চড়িয়ে দর হাঁকছেন সাধন ঘোষ। আমি একসময় দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ির সামনে এসে আমার পা কাঁপল। বাড়ি ফেরার রাস্তাটা আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। চোখ বেঁধে

ছেড়ে দিলেও আমার ভুল হওয়ার কথা নয়। তবু আমার মনে হল আমি যেন ঠিকানা ভুল করেছি। সমস্ত বাড়িটা একরাশ অন্ধকার নিয়ে নিঃশব্দ হয়ে আছে। কোনও সাড়া শব্দ আসছে না।

সারা শরীর ভয়ে হিম। মনে হল দরজার কড়াটুকু নাড়ার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। তবু হাত বাড়িয়ে কোনও রকমে কড়া নাড়লাম। ডাকতে চাইলাম রতন কিংবা কেতকীর নাম ধরে। পারলাম না। আবার স্খলিত হাতে কড়া নাড়লাম।

দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়াল কেতকী। আমি ঘরে ঢুকে বললাম, 'কীরে, আলো জ্বালাসনি কেন?' আমি হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালালাম।

গায়ের জামাটা খুলে আলনায় রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলাম, 'রতন বুঝি বেরিয়েছে?'

পেছন থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ এল। কেতকী কোনও সাড়া দিল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'রতন দুপুরে স্নান-খাওয়া করেছিল তো?'

কেতকী এবারও কোনও সাড়া দিল না।

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালাম। কেতকীর চোখ দুটো আরও একটু লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটো চেপে ধরে ও যেন কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছিল।

—কীরে কেতু, অমন করছিস কেন? কিছু হয়েছে নাকি? আমার বুকটা ছাঁত করে উঠল।

কেতকী আর যেন পারল না। অনেক সয়েছে সে। কাল থেকে অনেক কিছুর ভার সে বয়ে এসেছে। আমার আশঙ্কা-মিশ্রিত প্রশ্নে এতক্ষণে ভেঙে পড়ল কেতকী। 'আমি আর পারছি না দাদা, আমি আর পারব না।' কেতকী হাতের মুঠো খুলে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল আমার দিকে। তারপর দু হাতে মুখ ঢাকল।

কাগজের টুকরোটা খুললাম। ওঃ—রতন চলে গেছে। আর সেই কথাটা লিখে রেখে গেছে। বেশ, বেশ; সারাদিনের শেষে আমি অবাক হয়ে দেখলাম সামান্য কিছু শোকতাপ আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আমি ফ্যানটার গতি বাড়াতে বাড়াতে বললাম,—কখন?

—তুমি অফিসে চলে যাওয়ার পর আমি একটু বাথরুমে গেলাম। ফিরে এসে দেখি ছোড়দার ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি টেবিলের ওপর ওই কাগজটা। কেতকী কথা শেষ করল না। দু-হাত দিয়ে আবার মুখ ঢাকল।

আর কথা বাড়ালাম না। আমাদের দুজনেরই বোধ হয় একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। পিঠের শিরদাঁড়াটা ব্যথায় টনটন করছিল। হাতে-মুখে জল দিয়ে এলাম। কেতকী চা দিয়ে গেল।

ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। হাত পাখাটা নিয়ে জানলায় এসে বসলাম। আজ সারাটা দিন অসহ্য গুমোট গেছে। এখন অল্প স্বল্প বাতাস ছেড়েছে। আমি একবার ঘাড় উঁচিয়ে দেখলাম মেঘে কেটে কখন যেন অসম্পূর্ণ এক চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। চাপা জ্যোৎস্না গড়াচ্ছে গাছ-গাছালির মাথায়। খালটার ওপারে বিশাল মাঠ। এই মাঠে এখন বোধ হয় প্রশান্তি ছেয়ে আছে খুব। ওই রকম প্রশান্তির মধ্যে ফিরে যাওয়া আর হল না এই জীবনে। সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরেই রয়ে গেল। না আমি, না কেতকী—কেউ পারলাম না একটা মুহূর্তকেও নিজের অধিকারে রাখতে। কত অনায়াসে দিনগুলি আমাকে নিয়ে খেলে গেল। আমি খেললাম। খেলতে খেলতে হাঁপ ধরে গেছে। তবু একটু পিঠ টান টান করে দাঁড়াতে পারলাম না।

কখন যেন কেতকী আমার পাশে এসে বসেছিল। আমি একবার ওর দিকে ঘাড় ফেরালাম। আবার সরিয়ে নিলাম। কেতকী নামানো গলায় ডাকল, 'দাদা।'

—বল্।

—ছোড়দা কি সত্যি সত্যি ফিরে এসেছিল?

শোন মেয়ের কথা। আমিও কি পাছে এই প্রশ্নটা আমার মধ্যে চাগিয়ে উঠে আমায় বিপন্ন করে তোলে এই আশঙ্কায় প্রশ্নটাকে সারাদিন ধরে এড়িয়ে চলছি না? কী উত্তর দেব? তবু যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছি এমনি ঢঙে বললাম, 'ওদের এখনও ফেরার সময় হয়নি রে কেতু। সময় হলেই ফিরবে।' □

খোঁচড়

নবারুণ ভট্টাচার্য

শার্টের কলারটা শেষ হওয়ার কাছে ঘাড় আর পিঠের মাঝামাঝি ইঞ্চি দুয়েক জায়গায় ওর একটা চুলকুনির অসুখ আছে। চামড়াটা ওখানে নরম, লোম নেই, তেলতেলে আর ছিটি ছিটি দাগ। অসুখটা ইচ্ছের সঙ্গে বাড়ে-কমে। কাউকে খুন করার আগে জায়গাটা ভিজে দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে আর চিড়বিড় করে করে চুলকোয়—বস কাটে—তখন ওর চোখ দুটো ঠান্ডা বরফকুচি হয়ে আসে আর ও বুঝতে পারে যে কারওর লাশ আনবার সময় এখন খুব কাছে। সমকামনায় সময়ের তোবড়ানো মুখটা ওর মুখে ঘষে। ইচ্ছেটা গায় রোঁয়া রোঁয়া একটা জ্যান্ত মাংসের ডেলা। ডান পকেটে সিগারেটের কালো গুঁড়ো, নোনা ঘাম আর যৌনগন্ধের মধ্যে বিভলভারের কালো কোটরটা চোখ খুলে তাকায়, শরীরটা সাড় আর অসাড় হয় একই সঙ্গে, হাতের আঙুলগুলো অবশ অথচ যান্ত্রিক হয়ে বেঁকে আসে, কালচে থ্যাবড়া নখগুলো হিম হয়ে ওঠে। চুলকুনির পোকাগুলো শিরার মধ্যে কুরতে থাকে, দাঁতের ভিতর দিয়ে হাড়ের মধ্যে চলে যায়। তখন ও মুখে থুথু জমায়, দাঁত চোষে আর জন্তুর মতো দেওয়ালে বা ভ্যানের জালে পিঠ ঘষে, ছেঁচড়ে গিয়ে চুলকুনিটা জ্বালা করে আর টক উদগ্র এবং বিশেষ ঘামের গন্ধ পায়। ওর ঠোঁট দুটো মোটা আর ছাল ওঠা। হাসি পায় ওর, কারণ ও বুঝতে পারে এখন আর কিছুতেই কেউ ঘটনাটা আটকাতে পারবে না, মাংসের ডেলাটা যেন বলে দেয় একটু পরেই ও একটা লাশ নিয়ে ফিরবে—লাশ এখনও বেঁচে আছে—এখনও জানে না সুতরাং সতর্কতা অবান্তর প্রশ্ন। হাতের লোমগুলো শিরশির করে দাঁড়িয়ে ওঠে।

লাশটা পায়ের কাছে পড়ে থাকে—উপুড় বা চিত—ও পা দিয়ে লাশটাকে খোঁচা মারে। আর ভ্যান চলার ঝাঁকুনিতে বুঝতে পারে যে মড়াটা থিতোচ্ছে। কখনও কখনও গরম থাকে, [illegible], পোড়া চামড়া আর রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়। ওর চুলকুনিটা কমে আসে তখন, মুখের থুথুটা গিলে ফেলে শুধু ঘামের টক উগ্র গন্ধটা যায় না। গন্ধটা তাড়াবার জন্যে ও সিগারেট ধরায়, সিগারেট খুজতে ডানহাতটা প্রতিবারই রিভলভার রাখার ডান পকেটে চলে যায়, রিভলভারটা ভারী লাগে আর ওর মুখের ওপর, এবড়োখেবড়ো দাঁতের উপর চলন্ত রাস্তার আলোর ছায়ার চকমকি কিলবিল করে। ভ্যান চলার ঝাঁকুনিতে লাশটা লাফায়, নড়াচড়া করে, মাথা নাড়ায়, সব কথায় না বলছে বা অন্ধকারে পাশ ফিরে শুতে চাইছে বলে মনে হয়। জামার ওপর বুলেটের পোড়া গর্তের চারপাশে রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে থাকে, চোখ দুটো অল্প খোলা বা বোজা, কখনও দমকা বাতাস এসে বেওয়ারিশ চুলগুলো নিয়ে খেলা করে। রাস্তার আলো অন্য পুলিশদের বন্দুকের নলে চকচক করে। সবাই চুপ করে থাকে বা নিচু গলায় দেহাতি হিন্দিতে কথা বলে, হাসে। ও তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করে সিগারেট খায়। লাশটার ওপর বা অন্ধকারে ছাই ফেলে, জুতো দিয়ে ছোঁয়। জিভ কাঁপিয়ে গান গায়। ঝাঁকুনিতে আর লজঝড়ে টিনের শব্দে তাল মিলিয়ে লাশটা বোকার মতো নড়াচড়া করে, লাফায়। গাড়িটা থানায় ঢোকাবার আগে জ্বলা পেট্রোলের কালো ধোঁয়ায় ওর মৌজটা ভেঙে যায়। ততক্ষণে সরতে সরতে লাশটার একটা ঠান্ডা হাত যদি পায়ের ওপর এসে পড়ে তবে লাথি মেরে সরিয়ে দেয়। লাশের মার নামে খিস্তি করে।

(মৃতদেহ যখন এ জাতীয় প্রস্তাবের জবাবে রা কাড়ে না তখন মৃতের নির্বাক অস্তিত্ব ও লাশসমেত সামগ্রিকতার উপর ঘাতকের কর্তৃত্ববোধ জন্মে এবং বহু অনুশীলন বা হত্যার পর ঘাতকের এই মানসিকতা

যে কোনও জীবনের ন্যায় নিজস্বতা অতিক্রান্ত বিকাশ ও বিবর্তনে ক্রিয়াশীল সুতরাং যে কোনও জীবিত ব্যক্তিই এখন এই জটিল চিন্তানুযায়ী ক্লীব বা মড়া হইবার উপযোগী। সরকার অনুমোদিত ঘাতকের এই বিচিত্র গুণপনার সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক চৌম্বকক্ষেত্রের কোনও ভৌতিক বাণিজ্য আছে কি না তাহা রহস্যাবৃত এবং এই অনুসন্ধান সম্ভবত বিপজ্জনক।)

লম্বা একটু কুঁজো পিঠটাকে দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে ও শুনছিল পুরনো কেস ফাইল রাখার ধুলোপড়া কাঠের তাকটার ওপারে ভারী একটা বাড়ি মারার শব্দ হচ্ছে--ধুপ! ধুপ!—ওখানে একটা কেঁদো বুড়ো টিকটিকি আছে—আরশোলা ধরে আর কাঠের গায় আছড়ে আছড়ে মারে। দেওয়ালে মশা মারার দাগ। বিরাট সরকারি ক্যালেন্ডার। দাসের টেবিলে একটা ট্রানজিস্টার—খুব আস্তে নানারকম শব্দের মধ্যে হিন্দি খবর হচ্ছে কিন্তু দাস ঘুমোচ্ছে—আবার গান শুরু হলে ঠিক জেগে উঠবে। দেওয়ালগুলো কালচে বলে জোরালো বাল্‌বের আলোও মরা। বাল্‌ব ঝোলাবার তারে মাছি বসে। লক-আপে একটা ছেনতাই ফ্যাঁশা গলায় গান গাইছে—কতকগুলো কথা বলার টুকরো, বুটের মচমচ আওয়াজ— গানটা থেমে যায়, তালা খোলার শব্দ। ওর টেবিলে একটা খালি কোকাকোলার বোতল—একটা মাছি বার বার ভেতরে ঢুকছে আর ওর আঙুলগুলো একটু একটু নড়ছে—রেডিওটা বাজছে। ওর মনে হল একটু একটু করে ঘুম ধরছে চোখে কিন্তু বিকেলবেলা সিঙাড়া খেয়েছিল—পেটের মধ্যে গজগজ করছে তবে সুবিধের বিষয়টা এই যে চা পড়লে অম্বলের অস্বস্তিটা দমে আসবে। চা এসে পড়ল বলে। টিকটিকিটা এখনও আরশোলাটাকে আছড়াচ্ছে (কুমিরের বাচ্চা)—তবে এখন অনেক থেমে থেমে—রেডিওর আওয়াজ আর ছেনতাই-এর গান মিশে যাচ্ছে—একটু ঝুঁকে পড়ে ও—টিকটিকিটার পিঠ হলদেটে আর আরশোলাটাকে কামড়ে ধরে আছে বলে কাটার পাখনাগুলো ছেতরে আছে (সবুজ চোখ দুটো ঠান্ডা......আরশোলার পায় কাঁটা কাঁটা, শুঁয়ো দুটো একটু একটু নড়ে, ছেনতাইটা ঝিম ঝিম করে ইনিয়েবিনিয়ে হিন্দি খবর বলছে (সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার দুজন ঘরের কোণে খড়ের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে—ছেনতাইটা পা ডলে দিতে বলে—কনস্টেবল হাসে), কালো একটা রং জলে (রক্ত) যেমন করে ছড়ায় তার চেয়ে অনেক আস্তে একটা (হেডলাইট দুটো কালো ঠুলি পরানো.....) জলের মধ্যে ছড়াচ্ছে—জলটা চৌবাচ্চার মধ্যে.......অনেকগুলো বোমা ভিজিয়ে রাখা আছে জলে (ডি অ্যাক্টিভেট করার জন্যে)— বোমাগুলো জলের তলায় হালকা হয়ে যায় (আর্কিমিদিস)......টিকটিকির সাদা পেটটা খাবার গেলার পর ফুলে ঢোল হয়ে আসে ব্লব.....ব্লব ....সাইলেন্সারে গুম হয়ে যায় আওয়াজ.....ওয়েবলি স্কট......ওয়েবলি......চামর যন্তর.......দাসটা শালা এক নম্বরের ত্যাঁদোড়.....পসথ্যুমাস পুলিশ মেডেলও পাবে না.....পিকরিক অ্যাসিড লাশচেরাইয়ের ছড়ানো টেবিল, নাইট্রোগ্লিসারিন......অ্যাম্পুল....কেমিস্ট্রির দুঁদে দুঁদে ছেলে সব হারামির বাচ্চা -- চৌবাচ্চাটার মধ্যে হাত ডুবিয়ে ও বোমাগুলো ছোঁয়.....ভিজে দড়ি জড়ানো গোল গোল.....ঠান্ডা অথচ ছোঁওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাঁশ করে একটু সাদা ধোঁয়া.....ঝিলিক....আরশোলা মুখে টিকটিকিটা লাফিয়ে গায়ের ওপর পড়ে ঝুরঝুর করে দেওয়ালের বালি নিয়ে.....ভ্যানের মেঝেতে ঝাঁটা দিয়ে ঘষে ঘষে রক্ত ধোওয়ার শব্দ.....ওসি,..... ওসি-র ঘরের পর্দাটা উড়ছে; পাখা ঘুরছে.....টি....গুম.....বিস্ফোরণে সমস্ত বাড়িটা কাঁপে....হাতে মাল ফেটেছিল সাধনের.... লাশের চোখগুলো ঝুলে পড়েছিল......ঝলসানো মুখের কয়লার মধ্যে দাঁত......জানলার কাচগুলো খিলখিল করে ভেঙে পড়ে (ব্লু চ্যানেল—ওয়্যারলেসে অবিশ্রান্ত মেসেজ).....গন্ধকের হলদে ধোঁয়ায় বোমাগুলো বলের মতো লাফাতে লাফাতে দৌড়ে বেড়ায়.......

—চা খায়েন, চা খায়েন—ঝিমুনি টিমুনি সব চইলা যাইবো—দাস একহাতে চায়ের গেলাস নিয়ে কথাগুলো বলছে। বাইফোকাল চশমার ওপারে পরিহাসরত চোখ। দাসের সঙ্গে ওর গোঁফগুলোও হাসছে। ও একটু গলা ঝাড়ে, নিজের গেলাসটা নেয়, অভ্যাসবশত ফুঁ দেয় তারপর সুড়ুৎ করে চুমুক লাগায়। একটা পিঁপড়ে ভাসছিল, আঙুল ডুবিয়ে তুলে এনে টেবিলের নীচে লাগায়। একটু ঘুমিয়ে দাসের চোখ ফুলেছে, দাস বকে চলে—'আইজ দুপুরে বোঝলেন, এক প্রফেসার—কী এক কলেজে পড়ায় আসছিল। কয় কিনা ওসি-র কাছে দেখা করব—ক্যান ওসি-র কাছে ক্যান? খালি মাথা নাড়ে আর কয় যে হে নাকি আমি বুঝুম

না। শ্যাষে গেল ওসি-র কাছে। বাকিটা অবশ্য এভিডেন্স—এস আই মল্লিক তহন ওসি-র ঘরে ছিল, মল্লিব কইলো কী য্যান কথাটা—ওই যে সব ক্রিমিনালগোর কথাবার্তার বই লিখতাসে—শোনেন একবার কথা—আরে ওই চোরডাকাইতের কথা যেমন। বোঝলাননি....যেমন আই-বি রে কয় খোঁচর, পিস্তলরে কয় চেম্বার..... এইসব লোয়ার ক্লাস কথা আর কি.....ভাবেন একবার কী অবস্থা! রবি ঠাকুর শরচ্চন্দ ছাইড়া এইবার পকেটমার আর চোর ধাউড়ের কথা লইয়া টানাটানি। আবে বাবা, তা পুলিশের কাছে আসা ক্যান বাপ? আসল লোকদের জিগাইলে না ঠিক ঠিক কথা জানতে পারতা। হেঃ হেঃ বুঝ করেন একবার—কলেজে পড়ায় আর চোরধাউড়ের বুলি শিখায়....ভাবইতেই পারি না.....হেঃ হেঃ' —দাস বকে চলে আর হাসে। দাস খুব গপ্পোবাজ—লোকটা ভালো—ধান্দাবাজি করে না কিন্তু তবু ওর মনে একটু খিঁচ আছে—শুধু মনে হয় যে দাস ওকে ভয় পায়—যখন হাসে তখনও চোখে ভয়টা কামড়ে থাকে। ও গভীর তৃপ্তি সহকারে চা খায় আর দাসের কথা শোনে। একটু একটু হাসে। কতকগুলো উত্তেজিত গলার আওয়াজ—গেলাসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিনি গোলে। বুটের শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। গল্পটা নিঃসন্দেহে মজার কিন্তু কিছু বলার আগেই দৌড়ে আসে এস আই মল্লিক। তাল সামলাতে চৌকাঠে হোঁচট খায়! বয়স কম—উত্তেজনায় অস্থির—ওকে গলা নামিয়ে বলে, 'কালীতলা যুবক সমিতির জলসায় গৌতম বিশ্বাস গান শুনছে। এইমাত্র কোটন বলে গেল—অথেনটিক রিপোর্ট।'

মল্লিক হাঁপাচ্ছে—কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠছে—নার্ভাস টাইপ। কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শরীরের কুঁজো ভাবটা চলে গেছে। চা-টা এক চুমুকে তলানি উপুড় করে খায়, ঠক করে গেলাসটা রাখে তারপর বেল্টটা আঁট করতে করতে বেরয়। দাস জিজ্ঞেস করে—'কী কইলেন মল্লিকবাবু?' ওরা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দাস ওদের বেরিয়ে যাওয়াটা দেখে তারপর রেডিওতে কান পাতে। ওর রেখে যাওয়া গেলাসের গা বেয়ে চিনি নীচে নামছে। নামছে। জোর করে দেয় রেডিওটা। বাইরে ভ্যান স্টার্ট দেওয়ার শব্দ—চিৎকার—বারান্দা দিয়ে কনেস্টবলের বুট পরা দৌড়ের শব্দ...ইয়ে আকাশবাণীকে পঞ্চরঙ্গী কারি ক্রম.........

. .গৌতম বিশ্বাস—অ্যাকশান না করলেও ঘোড়েল অর্গানাইজার ...শুয়োরের বাচ্চা বহুদিন বেপাত্তা.... অথেনটিক রিপোর্ট.......অথেনটিক....ভিড়ের মধ্যে ছেলেটাকে কায়দা করতে হবে......একবার দৌড়লেই শালা ক্যাচাল—বারান্দা বরাবর হাঁটতে হাঁটতে মল্লিককে জিজ্ঞেস করে --'খুব ভিড়?' --'ভিড় আছে, বোম্বের আর্টিস্ট আসছে।'

বোম্বের আর্টিস্ট আসছে তাই খুব ভিড়....মল্লিক ছেলেটা কাঁচা.....রক্ত দেখলে উলটে দেবে....গৌতম বিশ্বাস সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান শুনছে...বহুদিন ফেরার...এ তো সেই মেডিক্যাল কলেজের সেল সেক্রেটারি...ঘাগু মাল.....এইবার শালার ফাইল বন্ধ হবে....কাচটা ছোপধরা, জালঢাকা। হেডলাইট ঝলসে উঠতে লম্বা আলোয় থানার গেটটা দেখা যায়।

ও ভ্যান ড্রাইভার গুরুঙের পাশে বসে। চারটে প্লেন ড্রেস লাফিয়ে ওঠে। ভারী দেহের ওজনে কিঁচ কিঁচ স্প্রিঙের শব্দ করে গাড়িটা দোলে। চলন্ত অবস্থায় তারা পেছনের দরজা টেনে বন্ধ করে। জালের মধ্যে গোল গোল ফোকর। ভ্যানটা থানার গেট পার হয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাস্তার মোড় ঘোরে। আলোয় দেখা যায় একটা কুকুর রাস্তা থেকে সরে গেল। ওর পিঠটা চুলকোতে শুরু করেছে। চোখগুলো কুতকুতে, ছোটো আর ঠান্ডা হয়ে গেছে। মুখ লালা কাটছে। লালায় তামাকের কুচি। ও আঙুলগুলো নাড়ায়—একটু অসাড় আর ঠান্ডা। পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা বের করে, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাইলেন্সার লাগায়। নলের উপর আঙুলের ছাপ পড়ে। জটলার মধ্যে ছুটলে গুলি চালানো যাবে না অবশ্য ছুটতে যদি পায়। রাস্তার আলো ওর একটু ফাঁক মুখের মধ্যে দাঁতের ওপর কাঁপে। ছোপ! সাইকেলের ওপর সাদা সার্ট পরা পেছনে চলে আসে। গৌতম বিশ্বাস মুখটা মনে পড়ে...জ্যান্ত মুখটা না এলেও ফটোগ্রাফটা মনে পড়ে...নিজের মুখে থুথু জমছে...গৌতম বিশ্বাস...স্পষ্ট দেখতে পায় ফটোগ্রাফটা...ভ্যানটা মোড় ঘোরে আবার....দারুণ জোরে

চলছে...প্রায়ান্ধকার রাস্তায় কতকগুলো ফুলকি...চুলে অনেক তেল দেয় বলে মোটা ভারী চুল বাতাসে ওড়ে না...গাড়িটা ব্রেক কষার জন্যে ক্যাঁচ করে শব্দ হয়...হেডলাইটে মেয়েদের ইস্কুলের পাঁচিলটা দেখা যায়.... পোস্টার....বম্বের আর্টিস্ট আসছে তাই খুব ভিড়.......গাড়িটা আস্তে হয়....হেডলাইট দুটো নিভিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে..গান শুনছে এখন, গুরুঙকে ও কালীমন্দিরের উলটোদিকে থামাতে বলে। গাড়িটা গুঁড়ি মেরে চলে। যুবক সমিতির মাঠটা আর কয়েকটা বাড়ি পরে। লাইব্রেরির ইট বের করা ঘরটা শেষ হলে.....গুরুঙ বড়ো ভালো চালায়......সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আর্মি ট্রাক চালিয়েছিল আরাকানে...পাকা হাত....অন্ধকার ভ্যানটা প্রায় শব্দ না করে থামে.....

.....দরজাটা খুলে নামে....চোখ দুটো এ দিক-ও দিক লেপটে দেখে নেয়...কয়েকটা ফালতু লোক দেখছে....পিঠে চুলকুনিটা চিড়বিড় করে জ্বালা করে....হাঁটতে হাঁটতে একবার মুখ খিঁচিয়ে চুলকোয়—দুজন প্লেনড্রেস ওর হাত কুড়ি পেছনে চলতে থাকে। ওরা দুজন ধুতি, বুট আর টেরিলিনের ঝোলা শার্ট পরা...কোমরের কাছে গুঁজে রাখা পিস্তল। পা না ঠুকে হাঁটতে চেষ্টা করলেও ওদের জুতোর শব্দ হয়।...ওর শরীরটা সোজা...লিকলিকে... সাপের ছোবল মারার মতো হাঁটার ধরন ....বাঁ হাতটা অসাড় হয়ে ঝুলছে। ডান হাতটা পকেটে ঢোকানো। আলো আর ভিড়.... অনেক লোক হয়েছে..... মাইকের শব্দ। ক্লাচ্..... টর্চের বোতামের মতো সেফটি ল্যাচটা সামনে এগিয়ে যায়।

মার্কারি আর টিউবে রাত দিন হয়ে গেছে। গিজগিজ করছে লোক। বেঁটে একটা টাকমাথা লোক এতক্ষণ কমিক করছিল—ছেলে পাশের বাড়ির মেয়েকে হিড়িক দেওয়ার জন্যে বাপের আক্ষেপ। লোকেরা হেসে হেসে থেমে গেছে কারণ ছেলে শেষের দিকে বাপের পেটে পেটো চমকাব বলে লাফাচ্ছিল। সলজ্জ মেয়েদের দিকে চোখ মেরে যাচ্ছে ছেলেরা এবং প্রতিটি ছেলেই অন্য ছেলেদের দিকে হিংস্র চোখে নজর রাখছে এবং সরফরাজি করছে। মাইকে কিঁ....ই...ই করে একটা যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছিল.....শব্দটা থামিয়ে ঘোষণা শোনা যায়—'এবার আপনাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শ্রীঅজিত কাপুর ও সম্প্রদায়। বঙ্গোয় সহযোগিতা করছেন মাস্টার লিমবো, পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানে গণেশ মোদক, গিটারে পিনাকী বোস।' চুঁই চুঁই সিটির আওয়াজ শোনা যায়। লোকেরা উঁচু হয়ে স্টেজের উপর দেখতে চেষ্টা করে। বাজিয়েরা বাজনা সাজায়, মাইকওয়ালা এসে মাইক্রোফোন ঠিক করে। ঘোষক এবার বেশ নাটকীয় করে গলা চড়িয়ে চেঁচায় 'অজিত কাপুর অ্যান্ড হিজ পার্টি।' অনেকটা জায়গা নিয়ে উৎসবের আয়োজন—বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওপরে শামিয়ানা। ঘেরার দু দিকেই লোক জমাট হয়ে আছে। অজিত কাপুর একহাতে মাইক্রোফোনের গলা ধরে...লোকের গুঞ্জন কমে আসছে...হঠাৎ বাঁশের বেড়ার ওপর উঠে একটা ছেলে চিৎকার করে ওঠে—'হরে কৃষ্ণ হরে রাম!' —ছেলেটার সারা মুখে ব্রণ—কতকগুলো সিটির শব্দ শোনা যায়—সেই সঙ্গে 'গুরু! গুরু!' চিৎকার। ছেলেটার চিল্লানো আবদার বোধ হয় গায়কের কানে পৌঁছয় না। সে ঘাড় অবধি নেমে আসা চুল ঝাকিয়ে বলে—'হামারা পহেলা গানা হায় ফিল্‌ম আঁখমিচৌলিসে।' ....আবার কতকগুলো সিটির শব্দ আর উল্লাসধ্বনি (এই সময় ও ভিড়ের মধ্যে ঢুকছিল আর একটা নিরীহ চেহারার লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে সে ফিসফিস করে দাঁতের তলায় বলেছিল—'স্টেজের সামনে, ডানদিকে..') —পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানটা বেজে ওঠে, গিটারে ভ্যাম্প শুরু হয়, বঙ্গোটা টিগ্ ডিগ্ করে বাজতে থাকে—লাল গুরু শার্ট পরা গায়ক একটু পেছনে হেলে মাথাটা সামনে ছুড়ে দেয় সহসা এবং উৎকণ্ঠায় কাতর ছেলেরা মুগ্ধ চোখে দেখে তিনটে ভ্যাম্পের মাথা, একটা হাত কানের ওপর চাপা দেয় গায়ক—চোখ বুজলে কার হিম্মত আছে বলবে যে কিশোরকুমার না......

....আজা রে আজা—ছুপ ছুপকে পেয়ার হাম করেঙ্গে
বাত য়ে কিসি কো মালুম হো না পায়ে
আজা রে আজা.......

(পিঠটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, আলোগুলো গলছে, সিটির শব্দ আর ভিড় ঠেলে ও এগোয়, ওর চোখ প্রত্যেকটা

মুখে তাকায়, লোক সরিয়ে ও এগিয়ে যায়, উঁচু হয়ে দেখে, সামনের দিকে চেয়ারে মেয়েরা বসে আছে, তার ডানদিকটা যদিও এখান থেকে একটু দূরে তবু ওখানে...'স্টেজের সামনে, ডানদিকে'...) ...যে ছেলেটা চিৎকার করে ফিলমের নাম বলেছিল সে তার ক্যাওড়াদের নিয়ে ভিড়ের মধ্যে একটু গোল জায়গা খালি করে নিয়ে নাচছে। রুমাল দিয়ে ঘোমটা বানিয়ে সরাচ্ছে আর ঢেকে দিচ্ছে। খ্যামটার তালে তাল মিলিয়ে হাততালি দিচ্ছে অন্যরা....কোমর নাচাবার ভঙ্গিতে যৌনমিলনের প্রস্তাব অত্যন্ত স্পষ্ট......

.....কিতনা আচ্ছা হায় এ মৌকা
দুনিয়া ভি হো জায়ে ধোকা
জঙ্গল মে মঙ্গল মনায়েঙ্গে হাম
মোহব্বত কী কিসমৎ জগায়েঙ্গে হাম........

.......মেয়েরা অবাকবিভোর হয়ে শুনছে, কারণ কিছু কিছু গান হরমোনকে সম্মোহিত করে, যৌবন থাকুক বা না থাকুক দেহলিতে অহিফেন-মাদকতা আনে। পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়নের রিডে ছোকরার আঙুলগুলো দুর্দান্ত খেলা করছিল তখন, বঙ্গোবাদকের চুল তার কপালের ওপর এসে পড়েছিল, সে ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দেয়। দারুণ জমে গেছে গান, সমস্ত ভিড়টা বুঁদ হয়ে শুনছে (গৌতম বিশ্বাস নীল শার্ট আর পায়জামা পরা.. .ফরসা গানটা শুনছিল না অন্যমনস্ক হয়ে ছিল জানবার কোনও উপায়ই নেই....ও একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ায়— একটা লোকের পরেই....অজান্তে ডান হাতটা পকেট থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে রিভলভারটা নিয়ে.. .নলের মুখটা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখায় কেউ দেখতে....ছেলেটা ফরসা...রুক্ষ চুল...মুখের মধ্যে একটা মজা পাওয়ার ভাব আছে..... চোখ দুটো বড়ো সুন্দর ...এস ও এস....মাত্র একটা লোকের পরেই—ক্যাওড়াদের নাচের হাততালির শব্দ...

.......চুলকুনিটা দপ দপ করে লাফায়, চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে.. ....মুখের মধ্যে থুথুর ঘূর্ণি.....চোখ দুটো ঠান্ডা....মরা শকুনের চোখ...ট্রিগারের উপর কালচে নখগুলো আঙুল জড়িয়ে আছে......সাপ....জিভ ধারালো ভাঙা দাঁতে লেগে চিরে যাওয়ার মতো তীব্র একটা মুহূর্তে.....

..আজা রে আজা—ছুপছুপকে...

...ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়....সমস্ত আলোর বাল্বগুলো সহসা ঝলসে যায় ছোবলে. .গলা আলোয় নেগেটিভ ছবির লোকটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে ও সামনে এসে দাঁড়ায়.......মোটা লোকটাকে সরিয়ে ও সামনে এসে দাঁড়ায়.......মোটা ঠোঁটটা সরিয়ে লালা পড়ছে—বাল্বগুলো গলে টল টল করে তরল আলো পড়ছে.......রিভলভারটা প্রায় পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানে. ..ব্লব্... ...ছেলেটার বিস্ফারিত চোখ......সাইলেন্সারে গুম হয়ে যাওয়া আওয়াজ.......ওয়াব্. ছেলেটার পেট থেকে রক্ত ছিটকোয়......। মুখটা হাঁ করা বাতাস উগরোয়, হাঁটু ভেঙে সামনে এগিয়ে আসে.... .চোখ দুটো সহসা আঘাতে বিস্ময়ে বোবা....... ওর মুখ থেকে লালা পড়ছে .....ছেলেটা যেন ওকে ছুঁতে আসে...... না পেরে উলটে হাঁটু গেড়ে শরীরটা পড়ে..... ও এক পা সরে আসে তারপর খুলির নীচে গলায় রিভলভারের মুখটা ঠেকিয়ে গুলি করে.. . ব্লব্। শরীরটা ছিটকে যায় ......লালা টানার অশ্লীল শব্দ..........হাত দুটো একটু কাঁপে চারপাশে চিৎকার... . ফিকে একটু কর্ডাইট আর রক্তের গন্ধ.......আলো দুলছে...... লোক দৌড়য়.......চিৎকার.......সমস্ত আলোগুলো একটা জ্বলন্ত গোলক তৈরি করেছিল.......টগবগ করতে করতে আলোগুলো আলাদা হয়ে ফিরে যায়......শব্দ.......কানের ওপর টিকটিকিটার শিকার আছড়ানোর শব্দ......রক্ত মেঝে ওলটপালট করে.......লোকের পায়ে জড়িয়ে যায়......মুখটা মাটিতে ঘষে—হাতটা টানটান হয়.........থেমে যায়......পায়ের কাছে রক্তাক্ত একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে—

........একটা বুড়োর জুতোয় রক্ত ছিটকে লেগেছে, বুড়োটা পেচ্ছাব করে ফেলেছে। একটা মেয়ে দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কতকগুলো মেয়ে আর বাচ্চা কাঁদছে। লোকজন দৌড়বার ভিড়ে প্লেনড্রেস দুজন এগোতে পারছে না। কয়েকটা লোক (পুলিশের লোক) চেঁচাচ্ছে—'দৌড়বেন, না, দাঁড়ান...... দৌড়বেন

না।' সাইলেন্সারের শব্দ (চুরি করে হত্যার অস্ত্র) বেশি দূরে যায় না তবু খুনের খবর চলে গেছে—সবার কাছে। যুবক সমিতির কিছু ছেলে সন্ত্রস্ত মুখে হন্তদন্ত হয়ে লোক আটকাচ্ছে। গায়ক ও তার দলবল স্টেজে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন নড়বার সাহসটুকুও নেই.......'দৌড়বেন না, দৌড়বেন না—যে যেখানে আছেন দাঁড়িয়ে যান—কিছু হয়নি।' পুলিশেব একজন লোক অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জটলার দিকে যায়। (সেই লোকটা যে ওকে গৌতম কোথায় আছে বলে দিয়েছিল).......ওরা বলাবলি করছিল এরকম একটা ব্যাপারেব পর জলসা থামিয়ে দেওয়াই উচিত কারণ গৌতম পাশের পাড়ার ছেলে আর মাংসরক্তের দৃশ্য দেখে সকলেরই যখন গা গুলোচ্ছে। পুলিশের লোকটা কিছুটা অর্ডারের মতো করে চিল্লায়—'শুরু করতে বলুন—জলসা ফলসা থামানো চলবে না, গান হোক, গান চলুক—আমরা লাশ বার করে নিয়ে যাচ্ছি—শুরু করতে বলুন।' স্টেজের দিকে পিস্তল নাচিয়ে লোকটা অর্কেস্ট্রার কন্ডাকটবের মতো করে চেঁচায়—অ্যানাউন্স করতে বলুন—

মাইকে ঘোষণা শুরু হয়, 'আমাদের সঙ্গীতানুষ্ঠান আবার শুরু হচ্ছে—আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন—ভয় পাবেন না—ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই'—গলাটা একটু কেঁপে যায়। যে বলছে তার কথা আটকে যাচ্ছে।

..........মৃত্যুর ভারী বাতাস প্রত্যেকটা লোককে ছুঁয়ে গেছে। কয়েকজন হাত তুলে আছে। (ভয় পাবেন না, ভয় পাওযার কোনও কারণ নেই) ও সামনে যায়, হাতে খোলা রিভলভার। লোকে দু ধারে সরে যায় আর আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকে। দুজন প্লেনড্রেস ছেলেটাকে নিয়ে চলে ওপরে। একজন একটা হাত, আর একজন একটা পা ধরে ছেলেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—রক্তাক্ত গলার পর অসহায় মাথাটা ঝুলছে—চোখটা খোলা—ওদের চলার ধরনে মাথাটা যেন এই বহুদৃষ্ট যাত্রার প্রতি গভীর সম্মতিতে দুলছে। রক্ত ছড়িয়ে গেছে সারা জামায়। মুখটা খোলা, কিছুটা বিস্ময় এখনও মুখ থেকে যায়নি। মাটির উপর আছড়ে পড়েছিল বলে কপালটা ছড়া, মুখে মাটি ঘষে গেছে—রক্ত গলা থেকে গড়িয়ে গিয়ে কানের পাশ দিয়ে চুলে গিয়ে জমছে, মাটিতে পড়ছে (ভয় পাবেন না, ভয় পাওযার কোনও কারণ নেই)—ডান পা মাটিতে ছেঁচড়ে চলে. হাতের আঙুলগুলো টেনে টেনে মাটিতে দাগ কাটতে চেষ্টা করে যেন। লাশের পেছনে পিস্তল নিয়ে সেই লোকটা। মাইকের যান্ত্রিক শব্দটা আবার শুরু হয়—সেটাকে ছাপিয়ে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানের দু একটা সুর শোনা যায়, যে জায়গাটায় ছেলেটা পড়েছিল সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে—ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়িয়ে আছে—ছিটকে ছিটকে গেছে—এক পাটি চটি উলটে পড়ে থাকে—কে একজন বলে চুন এনে ছড়িয়ে দিতে—শুষে নেবে—(ভয় পাবেন না, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।)

(কখনও দাঁড় করিয়ে খুলির পেছনে নল লাগিয়ে বুলেটে মাথা চৌচির করে ঘিলু ছিটকে দেওয়া হয়েছে, কখনও অ্যাসিড ও নুন মাখিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, চলন্ত গাড়ির থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে যাতে রাত্রের শেয়ালরা অভুক্ত না থাকে—এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে কলকাতার কোনও কুকুর মানুষের মাংসের স্বাদ পায়নি এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না—জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে—পচে ফুলে রবারের মতো হয়ে যাওয়ার পর শনাক্তকরণ অসম্ভব এবং বিভিন্ন উচ্চতা থেকে আছড়ানো হয়েছে, লাঠি পিটিয়ে কিমা করে ফেলা হয়েছে.........এবং আরও দেশি বিদেশি যন্ত্র........রসায়ন........বিকৃতি........যা যা করা সম্ভব হয়নি তার মধ্যে নাৎসি ফ্রিজিং মিক্সচার ও গ্যাসচেম্বার বা মার্কিন পদ্ধতিতে উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দেওয়ার কথা বলা যায়।

ভয় পাবেন না, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

ঢাউস ভ্যানটা এগিয়ে এসেছিল। দরজার দুটো পাল্লা হাঁ হয়ে আছে। ও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লাশ ওঠাতে বলে.......হাতটা ধরে উঁচু করে ঝুলিয়ে একজন ভ্যানের মধ্যে ঢুকে যায়......মাথাটা একবার ঠুকে যায় পা-দানিতে—পাগুলো বাইরে বেরিয়েছিল......ভেতর থেকে টানার ফলে অন্ধকারে ঢুকে যায় মৃতদেহ। এক পায়ে চটি ছিল না। খুন! লাশচুরি! সারাটা রাস্তা ফোঁটা ফোঁটা রক্তাক্ত! রক্ত মৃতদেহ........রক্ত, কিন্তু এখন

আর পুলিশের কুকুর এসে নাক কুঁচকে শুঁকে শুঁকে খুনিকে হদিস করবে না। আজ্ঞা রে আজ্ঞা, ছুপছুপকে......কলজে নিঙড়ে নিচ্ছে গুরু! একটা দায়সারা ময়নাতদন্ত ....ওয়াক্........কাঁটাপুকুর মর্গের প্রাত্যহিক মোচ্ছব........রাত্তিরে শ্মশানের সামনে লাশ পাচারের ভ্যান. ....ঘুমচোখে অভ্যস্ত ডোম.........ইলেকট্রিক চুল্লির তীব্র লাল কয়েলের ফার্নেসে নিক্ষিপ্ত নগ্ন দেবদূত. . .. দপ করে জ্বলে ওঠা চুল ও কাপড়, সমস্ত লোক সাক্ষী, স্বচক্ষে দেখা সমস্ত ঘটনা......কিন্তু এবার আর কেউ সাক্ষী দেবে না কেন? কবন্ধ কখনও কথা বলে কে কোথায় শুনেছে?........থানায় মুখ দেখিয়ে গৌতম চলে যাবে মর্গে . সেখানে সারারাত একলা.......মুখটা একটু খোলা. .. . .বিস্ময়ে চোখ চেয়ে? ....ঠান্ডা.........শক্ত ....আড়ষ্ট রাত্রে বাড়িতে খবর যাবে .... গৌতমের বুড়ো বাবা কড়া নাড়ার শব্দে সচকিত হয়ে বালিশের পাশে হাতড়ে চশমা খুঁজবেন . কে. ..খুলুন, হরেন বিশ্বাস কার নাম. . .বৃদ্ধের ভীত মুখের ওপর টর্চের আলো পড়বে. ....রাত্রিকে তছনছ করে দেবে ভয.........বুটের শব্দ. . .....বলা হবে জরুরি প্রয়োজনে আসতে.. .....চরম আশঙ্কাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করবে সবাই. .... .কত কী হতে পারে . . ..মৃত্যু ছাড়া আর সমস্ত কিছু এখন অস্বাভাবিক......লাশ দেওয়া হবে কি হবে না....... আর এক উল্লাস........গৌতম এতকিছুর এতটুকুও জানতে পারবে না. .....সারাটা রাত একটা স্বল্পালোকিত হিমঘরে একা শুয়ে থাকা শক্ত ঠান্ডা আড়ষ্ট. ....স্মৃতিফলক হাড়িকাঠ গলাগোথা. .. ..জায়গাটায় রক্ত জমাট হয়ে আছে... ....মৃগয়ার শিকার ঝুলিয়ে নিয়ে আসার সারাটা পথে রক্তের শুকনো দাগ, সমস্ত বাতাস রক্তে ভেজা ......কোনও 'বিচার বিভাগীয় তদন্ত' এই হত্যার জন্য হাস্যকৌতুকের আসর জাঁকিয়ে বসবে না..... .গৌতম যে কোনও একটা রেপকেস বা ওয়াগনতোড়ের চেয়ে বেশি ইজ্জত আশা করতে পারে না। রক্ত শুকিয়ে মাটি হয়ে যাবে.......রক্তের গন্ধ নিশ্বাস হয়ে মানুষের বুকে মিশে থাকবে.........রক্ত খুন রক্ত মৃতদেহ রক্ত..... কিন্তু এবার আর লালবাজারের ডালকুত্তা এসে শুঁকে শুঁকে খুনের হদিস বের করবে না...... কেন?

হেডলাইট দুটো গেস্টাপোর চোখের মতো ধকধক করে জ্বলছিল। গাড়িটা জোরে চলছিল তবে এবার রাস্তা অনেক কম। ও মাঝে মাঝে পা দিয়ে লাশটা ছুঁয়ে দেখছিল আর সিগারেট খাচ্ছিল চোখ বুজে। চুলকুনিটা কমে যাওয়ার পর কমজোর লাগছে। মাথাটা খালি খালি, ভ্যান চলার ঝাঁকুনিতে লাশটা লাফায়. নড়চড় করে। (সত্তরের দশকের প্রথম দিকে গৌতমের মার প্যারালিটিক হয়ে যাওয়ার কারণ কি হিজড়ের ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকতে গৌতমের অস্বীকার করা? প্রোটিনের অভাব? দুর্ঘটনা? গৌতম. 'বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার্থে দু রাউন্ড গুলি চালাতে হয়,'—এই খবর কালকে লাখ লাখ লোক পড়তে চলেছে—এ বিষয়ে তুমি কী করতে পার? বিশাল রোটারি মেশিন থামিয়ে দেবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা? তোমার এই ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকানোর মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট কোনও নির্দেশ নেই।) একটা পা শুধু ভাঁজ হয়ে আছে। ও লাশটার ওপর ভাই ফেলে আর গুন গুন করে একটা সুর ভাঁজে। সিগারেটের ধোঁয়াটা মগজে ধাক্কা দেয়। আলোগুলো কিলবিল করছে মুখের ওপর—একটা প্রাইভেট সামনে রাস্তা দিচ্ছিল না- -'আবে মাদার' ড্রাইভার কাঁচা খিস্তি করে—ও হাসে। পকেটে সিগারেটের শুকনো গুঁড়ো. বদ্ধ ঘাম আর যৌনতার গন্ধের মধ্যে বিভ্রান্তভাবের ভারী বোধ। চুলকুনিটা প্রায় নেই। ঘামের টক গন্ধটা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে না রক্তের গন্ধটা বাড়ছে? রাস্তার আলো ওর তেলা কপাল আর চোয়াড়ে গালের ওপর কাঁপছে--ফাসিস্ত আদলের মধ্যে প্রাকৃত এক অশিক্ষিত মুখ। ও ঝিমুনির মধ্যে পা দিয়ে লাশটাকে ছোঁয়—এখনও মানুষের মতো, ঘণ্টা দুয়েক পরে কাঠমড়া হতে শুরু করবে। —'সিঁটো শালা সিঁটো।' (বিসর্জনের রাতে ভাসানের ঢাক বাজে না, মানুষ বিগ্রহকে ভুলে থাকতে চায়, তাসা পিটিয়ে ছেলেরা নাচে না, মুখ থেকে ফুঁ দিয়ে পেট্রোল জ্বালায় না—এ কেমন আনন্দ? গৌতম, মর্গের ইঁদুরগুলো ও রকম স্বাস্থ্যবান আর মাংসল কী করে হয়? গৌতম! তোমাকে চেরাই করে ওরা কীসের তালাশ করবে? তুমি কোন পূজার অঞ্জলি? তোমার ভয় করে না?) পেট্রোলপোড়া কালো ধোঁয়া নাকে আসে। জোর একটা ঝাঁকুনি দেয় ভ্যানটা। সিগারেটটা ঠোঁটে ঠেকানো যায় না। লাশটা হুড়ুদ্দুম লাফায়। থানার গেট দিয়ে গাড়িটা ঢুকছে। গরগর্ শব্দ করে ইঞ্জিনটা দমে আসে—হেডলাইটের আলো দুটো নিভে যায়।

কালো আর একটা ভ্যান, গায়ে সাদা ক্রুশচিহ্ন। দুটো খাকি জামা পরা নড়বড়ে আধবুড়ো লোক আছে। ওরা গৌতমকে বয়ে নিয়ে যাবে ওই ভ্যানটায়—যাতে চড়ে ও চলে যাবে মর্গে। গাড়িটার নাম অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান হলেও ওতে আহতদের চেয়ে নিহতেরই বেশি চড়তে পায়। আয়োডোফার্মের গন্ধ........ফাঁড়াই.......সেলাই.... ইঁদুর দৌড়বার শব্দ........গৌতম, তোমার ভয় করবে না?

বেল্টটা টিলে করতে করতে ও ঢুকছিল। ও সি-র ঘরে গিয়ে রিপোর্টটা দেয়.......

—কোনও রেজিসট্যান্স দিয়েছিল নাকি?

—না স্যার, টাইম পায়নি।

বেরতে বেরতে প্রশ্ন আসে—'ক রাউন্ড?' —'দু রাউন্ড স্যার।' (এক রাউন্ডেই ফেলা যেত কিন্তু হাতটায় খুন ভর করলে আঙুলগুলো থামতে চায় না।) ঘরে ঢুকতে শোনে দাসের টেবিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। যদিও কেউ ঘরে নেই। দাস একটু বাদে এসে ঢুকল। জেনানা লক-আপ থেকে হাসির শব্দ আসে। ও কান খাড়া করে শোনে। দাস বকতে থাকে—'দ্যাহেন একবার কাণ্ডকারখানা—কতকগুলো ছেমড়িরে ধইরা আনছে। আপনেও ডিউটিতে গ্যালেন—ওই গুলারে লইয়া আসল। আনবি তো আন—আমারই কাছে: বাব্বাঃ—কী মুখ এক একটার। এক্কেরে সেরদর........কথা কয় আর হাসে.........কথা কয় আর হাসে........আউ ছিঃ ছিঃ।' এস আই মল্লিক ঘরে এসেছিল। দাস বলে......'ও মশাই—দুপুরে ওই যে প্রফেসার না কী ছাতা আসছিল—কী একটা কথা বার বাব বলছিল বলেন তো?' মল্লিক বুঝতে পারে না—বলে, 'কী কথা?'— 'আরে, ওই যে সব চোর বাটপাড়ের কথা—খোঁচোড়, গজ—আরও কত কী।' মল্লিক একটু হেসে বলে —'স্ল্যাং স্ল্যাং—উনি একটা আন্ডারওয়ার্ল্ড স্ল্যাঙের ডিক্সনারি লিখছেন।' দাস খুব খুশি—'অয়, অয়—স্লেং এইবার ধরছি—স্লেং কালেক্ট করে। —স্লেং...... ।' দাস বড়ো মজায় হাসে আর মাথা দোলায়। মেয়েগুলোও লক-আপে খিল খিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে এ ওর গায় ঢলে পড়ছে। ও হাসির শব্দটা মন দিয়ে শোনে। বেশ লাগে শুনতে। পাউডার আর দোক্তার গন্ধ, চওড়া চওড়া, কালো কালো; মোটা মোটা ঠোঁট— মাথায় চওড়া নাইলনের রিবন। —'শালা! লুড়কুৎগুলোকে মেরে মেরে হাত পচে গেল।' উঠে পেচ্ছাবখানার দিকে গেল।

(অপরকে বিনষ্ট করিবার অধিকারবোধ আয়ত্তে আসাব সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিবার ইচ্ছার অভেদস্বরূপ নিজের দেহে, রক্তকণিকায়, চৈতন্য ও স্নায়ুতে মৃত্যু ভীতির রূপ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং এই প্রজন্মের নৈরাজ্য দেহকে অতিমাত্রায় জাগ্রত ও হীনবল এবং মনকে সাবধান ও পক্ষপাতগ্রস্ত করিয়া তুলে। এই বিপরীতমুখী ক্ষয়প্রবাহের মধ্যে নেতি চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায় এবং নিজের সংরক্ষণের ইচ্ছাকে ক্লান্ত ও মন্থর করিয়া তোলে ফলে প্রতিটি হত্যাই নিজের মধ্যে মৃত্যুর অনুঘটক হইয়া কাজ করে ফলে মহামারীর লক্ষ লক্ষ মাছির পাখনার উল্লাস রক্তে ধ্বনিত হয়।)

দরজার কাছের সিটে ও ঘাড় গুঁজে বসেছিল আর ডানদিক বাঁদিক দুলছিল। রিলিফ ভ্যানে রাত করে ফেরবার সময় ঝাঁকুনিতে ওর ঘুম পাচ্ছিল—শুধু মধ্যে মধ্যে পা-টার সামনে এগিয়ে কী একটা খোঁজার অভ্যাস হয়ে গেছে তাই ঝিমুনিটা বার বার চলে যায়। রাত্তিরে সাবান মেখে স্নান করে—চুলকুনিটায় মলম লাগায়—শরীরের ঘাম আর নোংরা ফেনা কলতলার ঝাঁঝরির কাছে গিয়ে পাক খেয়ে তলিয়ে যায়। মাথায় গন্ধতেল মাখে। খুব ঘুম পায় কিন্তু ঘুম কখনও স্বপ্ন ছাড়া আসে না। স্বপ্নের চোখ আছে, তারা প্রশ্ন করে, হাসে, টিন বাজায়, স্বপ্নগুলোর হাত-পা ছেঁড়া, টুকরো টুকরো, রক্তাক্ত। যদিও কম কথা বলে কিন্তু বাড়ির লোক বলে ও নাকি ঘুমের মধ্যে কথা বলে ওঠে, কখনও গোঙায়, জড়িয়ে জড়িয়ে অর্ডার দেয়। কোনও কোনও দিন ঘুমের মধ্যে পিঠটা এত আঁচড়ে আঁচড়ে চুলকোয় যে সকালে দেখে কেটে গেছে। আগে ভাবত ভূতে খিমচোয়। চুলকুনিটা তারপর সারাটা দিন জ্বালা করে আর ডান হাতটা ছটফট করে। পাশের লোকটাও ঢুলছে। কেউ একজন বিড়ি খাচ্ছে—আগুনটা দপ করে ওঠে। ঝিমুনিতে মাথাটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে........কানের

মধ্যে শুধু গাড়ি চলার শব্দ.......বাঁ পা-টা সামনে এগিয়ে যায়। আলো যা জ্বলছে রাস্তায়........অনেক বাড়ির আলো নিভে গেছে। পানের দোকনের সামনে দু-একটা লোক। ট্রামের শ্রমিকরা রাত্তিরে ট্রামলাইন খুঁড়ে কাজ করছে। লাল লাল লণ্ঠন টিবি করা কালো মাটির ওপর সার দিয়ে রাখা। ও ঝিমোয় তাই দেখতে পায় না। অন্ধকার সিনেমা হল—নায়িকার বিশাল ছবি—ঠোঁটের কাছটা খোবলানো। রাস্তাঘাট ফাঁকা—শেষ কয়েকটা ট্যাক্সি জোরে বাতাস উড়িয়ে চলে যায় এ দিক-ও দিক। ডিউটি শেষ করে প্রাইভেট বাস আলো নিভিয়ে গ্যারেজে ফিরছে। বাঁ হাতে টিফিন বাক্সটা ধরে ও ঝিমোয় কিন্তু প্রখর এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলে দেয় এখন কোন রাস্তা চলছে। প্রত্যেকটা মোড় চেনা—তাকালেই চেনা জায়গা দেখা যায়। ওর নিজের অঞ্চলটা শান্ত। ভ্যান থেকে বাড়ির গলিটার মুখে নামিয়ে দেয় রোজ আবার সকালে ওখান থেকে তুলে নেয়। ওর পাড়ায় কোনও ঝুট-ঝামেলা নেই, দেওয়ালে কিছু লেখা আছে বটে কিন্তু ওগুলো বেপাড়ার ছেলেদের কাজ। ও ভালো করেই জানে যে ওর পাড়ার কোনও ছেলে এ সব করে না। এই কথাগুলো ও রোজ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বাড়ি ফেরবার সময় খতিয়ে ভাবে। প্রত্যেকটা কথা বোঝে, ওজন করে তবু ভয় যায় না। পুরোপুরি আশ্বস্ত হওযার কোনও কারণ নেই কারণ সুধীর বোস ওই এক থানাতেই এস-আই ছিল। তারও পাড়ায় কোনও গন্ডগোল ছিল না, কিন্তু একদম বাড়ির চৌকাঠের সামনে কুপিয়ে দিয়ে গেল.........ডান হাতটা প্যান্টের উপর দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে রিভলভারটা খোঁজে। অবশ্য সুধীরের কতকগুলো অসুবিধেও ছিল—মোটার দিকে গড়ন থাকার জন্যে হাত-পা বেশ তাড়াতাড়ি খেলত না। ফাঁক পেলেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টেরি কাটত। লোকটা নাকি ঝুলেপড়া নাড়িভুঁড়ি ধরে ছুটেছিল হাত বিশেক। বউ আর দুটো বাচ্চা। সুধীরকে যে দিন ভ্যানের পর ভ্যানের মিছিল করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় সে দিন ও ছিল। ভালো করে দেখছিল মুখটায় কিছু হয়নি, পেটটা ফেঁড়ে দিয়েছিল—তক্ষুনি তক্ষুনি মরেওনি, নল নাকে ঢুকিয়ে বেঁচেছিল দিন দুযেক। গাড়িটা থামবার আগে ও টিফিন বাক্সটা বাঁ পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। রিভলভারটা ডান পকেট থেকে বার করে—বেশ ভারী—ম্যাগাজিনটা দেখে—সেফটিটা সরিয়ে আবার ট্রিগারে আঙুল রেখে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখে। গাড়িটা থামে।

ইঞ্জিনটা চলছে বলে একটানা গোঁ গোঁ শব্দ হয়। দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে নামে। দরজাটা ঠেলে দেয়। গাড়িটা চলে যায়। ছোটো লাল আলোটা শব্দের সঙ্গে দূরে চলে যায়। সামনে পেছনে দেখে। কেউ নেই, ফাঁকা। চাঁদের অসুস্থ পাণ্ডুর আলো। কোনও বাড়িতে আলো জ্বলছে না। দূরে ভ্যানের শব্দটা মিলিয়ে যেতে নিস্তব্ধতা জড়ো হয়ে আসে। ঠান্ডা বাতাস আছে। ও গলির মোড়টা ঘোরে, বেশ সরু রাস্তা—ভ্যান ঢুকতে পারে না। বাঁ দিকের ইটের পাঁচিলটা ওর হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে পেছনদিকে সরে যায়। পাঁচিলের ওপর সারি দিয়ে লাগানো কাচের ধারালো টুকরো চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে। শুধু ওর চলার শব্দ। চাঁদের থেকে কিছুটা দূরে একটু মেঘ, একটু দূরে ল্যাম্পপোস্ট......চকিতে দাঁড়ায়......নিজের চলার শব্দ নেই.........রিভলভারটা নিয়ে থাবাটা পিছলে বেরিয়ে আসে পকেট থেকে.......খসখস শব্দটা ওকে ছুঁতে আসে......

.......ল্যাম্পপোস্টটা হঠাৎ খিলখিল করে গড়িয়ে পড়ে রাগে! উলটোদিকে ইটের দাঁত বার করা হাড়গিলে পাঁচিলটা হা হা করে হাসে। ফাটলের মধ্যে চোখ........চোখের পাতা ছেঁড়া, হাইড্রান্টের খোলা চোয়ালের মধ্যে কারা যেন কান পেতে শোনে........বদলার একটা ছুরি চিৎকার করে ছিটকে যায়। ঝলসে ওঠে ফলা! পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ আলো পাইপগানের উগরোনো গলা এক টুকরো সিসে হয়ে ছুটে আসে! —ও রিভলভারটা হাতে নিয়ে সাপের মতো চারদিকে তাকায়—দেওয়াল আর মিশকালো শ্যাওলা, নিঃশব্দ রাত: তবু হলুদ চাঁদটা ছাদের আলসে থেকে গড়িয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ে বার বার অসংখ্য স্প্লিন্টারে ফেটে যাচ্ছে, শরীরের মধ্যে মাংসরক্তের মধ্যে, হাড়ের মধ্যে মজ্জা ভয়ে জমে আছে—ভয়! মৃত্যুভয়! তারা খসে পড়ার পর ভয়াবহ অন্ধকার বাতাসে শব্দহীন ঘাতক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে পায়ের শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে সংখ্যাতীত অশ্বারোহী প্রতিশোধ—খালি পায়ে দৌড়বার শব্দ......স্ট্যাবকেস.........হালাল......নীল শার্ট আর পায়জামা পরা

মুখে রুমাল বাঁধা.......গায়ে চাদর জড়িয়ে বোমা ধরে রাখার বিশেষ হাতের নিশানা........'আমরা নেবই নেব' বদলার শব্দ মর্গের ভ্যাপসা আলোয়.......শ্মশানে ও প্রান্তরে..........প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি বাড়ি খেয়ে খেয়ে ফেরে.........রক্তহীন মুখ যুবকের.......ড্যাগার.......রক্তমাখা নীল শার্ট পরা........শরীরে বুলেটের গর্তগুলো জ্বলছে নিভছে জ্বলছে........

—ও হাঁপায় আর ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে—ভয়ে সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে যায়, নিশ্বাস, ব্লাডগ্রুপ, লালা, আইডেনটিটি কার্ড, টিপছাপ, হাসি, রিভলভার, পাসপোর্ট সাইজ ফটো, নিম্ন বুদ্ধাঙ্ক, হজম, উল্লাস, ভোগ্যনারী, চেতনা, দেশ, রাশিচক্র—নাপাম জেলির মতো স্বচ্ছ, গাঢ়, বীভৎস—তার সমগ্র অস্তিত্ব ভীত কৃমির মতো কুঁচকে যায়........

খস খস শব্দ। চারদিকে তাকায়—কেউ নেই। খস খস শব্দ। একটা ভোটের পুরনো পোস্টার আলগা হয়ে ঝুলছে আর বাতাসে দেওয়ালের গা ঘষছে—খস খস শব্দ।

সমস্ত শরীরটা টান টান হয়ে ওঠে আবার, শ্লথ ও তৃপ্ত মুখ। ও রিভলভারটা বাঁ হাতে নেয়, ডান হাতের তেলো ঘামে ভিজে গেছে, হাতটা প্যান্টে ঘষে, উত্তেজনায় মুখ থেকে লালা পড়েছিল। মুখটা হাত দিয়ে মোছে আর মোছবার সময় সেই বিশেষ ঘামের টক গন্ধটা পায়। খুন আর ভয়ের জৈব গন্ধ! ওর চলবার শব্দটা জোর হয়। আড়চোখে দেখে চাঁদটা আলসেতে ঠিক ঠেকে আছে। ঠোঁট দুটো সরিয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে হলুদ--ও হাসে। একটা বেড়াল দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে আঁশটে ছাইগাদা আর ময়লার মধ্যে চলে গেল। ও হাসে। চোখ দুটো শুধু সজাগ আর জ্বলন্ত। ওর ছায়াটা রাস্তায় আর দেওয়ালে ভাগাভাগি হয়ে পড়েছে—বুকের মধ্যে দিয়ে নর্দমা। তেরছা কালো টিনে কর্পোরেশনের নোটিস—'এখানে প্রস্রাব করিয়ো'—না-টা ইট দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে দিয়েছে। বমি ওলটানো দুর্গন্ধ! কতকগুলো পোকা রাস্তার আলোর পাশে পড়ছে--ওর পা ফেলার শব্দ তারা শুনতে পায় না। বাড়িগুলো অন্ধকারে বিশাল বিশাল জন্তুর মতো ওত পেতে আছে! অস্বস্তিতে দাঁতগুলো হাসি থামিয়ে আবার ঠোঁটের আড়ালে চলে যায়। মুখের মধ্যে লালা জমে। চাঁদের আলো থিকথিক করছে, বিরক্তিতে হাতের আঙুলগুলো বেঁকে যায়। টক ইচ্ছেটা আঙুল বেয়ে কালচে থ্যাবড়া নখে গিয়ে জমে। শার্টের কলারে শেষ হওয়ার পরে ঘাড় আর পিঠের মাঝামাঝি জায়গাটা চুলকোয়? □

ওথেলো

মনোজ দাস

আজকাল আমি কিছুতেই যেন আর বিশ্বাস করতে পারি না। অথচ আমার একদিন ছোটোবেলা ছিল। বেশ কয়েকটা বছর জুড়ে ছিল যার বৃত্ত। তখন অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে পারতাম। অসন্দিগ্ধভাবে। বস্তিটা তখনও এত প্রসারিত হয়নি। একটা ছোটোখাটো বট আর শিরীষ গাছ ছিল পশ্চিমের পুকুরপাড়টায়। এখন গাছ পুকুর কিছুই নেই। সব সমান হয়ে বস্তির সঙ্গে মিশে গেছে।

তখন আমি আমার বাবা-মা, আমার ভাইবোনেরা, পাশের কুঠুরির রামবিলাসরা যেমন সত্যি ছিল তেমনি সত্যি ছিল নিশির ডাক, বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি, সোনার কাঠির রাজকন্যা, তেপান্তরের মাঠ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি। অথচ, আমি কোনওদিন নির্জন কোনও বড়ো মাঠ দেখিনি। কোনও সবুজ গ্রাম দেখিনি। গভীর রাতে কোনও বেলগাছও দেখিনি।

যাদের দেখিনি কখনও তাদের বিশ্বাস করতে সেই বয়েসে এতটুকু দ্বিধা হত না। আর আজ আমার নিজের রক্তের প্রতিও অবিশ্বাস। আসলে সেই মনটাই আমার হারিয়ে গেছে।

কথাটা যে কোনও বিশেষ কারণে আমার এক্ষুনি মনে পড়ল, তা নয়। আজকাল আমার প্রায়ই এরকমটা হয়। এর জন্যে কোনও নির্জনতা লাগে না। কফি হাউসের হই-হুল্লোড়ের মধ্যে কিংবা বাসের প্রচণ্ড ভিড়ে ঘামতে ঘামতে নিজেকে অনায়াসে আমি একটা দ্বীপ মনে করে নিতে পারি। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতেও আমি মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাই। আসলে আমি তখন একটা দ্বীপ বনে গেছি। এবং কোনও নাবিকই সেখানে সহজে পৌঁছতে পারে না।

ইলা আমার গায়ে ওঁতো দিচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে নীরব থাকতে দেখে ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। ভাবনার ঘোরটা কেটে গেল। আমি সাড়া দিলাম না। দিতে ভালো লাগল না। জানলা দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চেয়ার ছেড়ে ইলা উঠল। আমি ওর দিকে তাকালাম। উঠছিস? ও জবাব দিল না। মুখ ঘুরিয়ে পা বাড়াল। জানি, এর পরে ওর মান ভাঙাতে পার্কের একটা অন্ধকার কিংবা ওই ধরনের কিছু নির্জনতার দরকার হবে। এই রেস্তোরাঁয় বসে কেলেঙ্কারি করতে আর ভালো লাগল না। উঠে পড়লাম।

মার্চের সন্ধ্যা। কলেজ স্ট্রিটের এই অঞ্চলটা বেশ তকতকে। হাঁটতে ভালো লাগছিল। কেউ কোনও কথা বলছি না। নিরালা পথ। থমথমে ভাব চারদিকে। কেননা ঘণ্টাখানেক আগে এ অঞ্চলে একটা পুলিশ ভ্যানের ওপর বোমা পড়েছিল। এবং ফলে কয়েক রাউন্ড গুলি। দু-পাঁচটা মারা গেছে শুনেছিলাম।

শুনে শুনে কান পচে গেছে। এখন আর তেমন উৎসাহ বোধ করি না। কেবল ফায়ারিঙের সময়টুকু একটু সাবধান হই। তারপর যে কে সেই। মৃত্যু ব্যাপারটা তেমন বীভৎস কিছু একটা বলে মনে হয় না।

আমার দাদু সজ্ঞানে মরেছিলেন। মৃত্যুর দিনটায় তাঁর যে মূর্তি দেখেছিলাম তা কোনওদিন ভুলব না। বাজারের যত ফল আর মিষ্টি এক টুকরো করে দাঁতে কেটেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হলে আবার ঘাটের মড়া। অতএব সমস্ত ইচ্ছা মিটিয়ে নিতে হবে। একদিকে শুনছিলেন গীতাপাঠ আর অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন ডাক্তারের দিকে।

দাদুর বাঁচবার ইচ্ছা ছিল। অথচ মৃত্যু তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। এই ভেবে আমি সে দিন খুব কেঁদেছিলাম। আজ যদি হঠাৎ গুলি খেয়ে আমি মরে যাই তবে দাদুর মতো কাতর হব না। কেননা, জীবন ও মৃত্যুর ফারাকটা আমার কাছে তেমন বড়ো নয়।

অবিশ্যি তখন আমি খুবই ছোটো। ইস্কুলে পড়ি। আর এখন ইউনিভার্সিটির শেষ বছরের পড়ুয়া। ইলাও তাই। বসে না থেকে একটু ঘোরা আর কি। কেননা, ভালোভাবেই জানি যে, পাশ করলেও বেকার থাকতে হবে। না করলেও তাই।

ডালহাউসি এসে গেছে। এতক্ষণে খেয়াল হল যে, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটছি। ইলা পাশে পাশে চলেছে। ভীষণ রেগে গেছে মনে হল। কেননা রাগ করে থাকার মেয়ে সে নয়। ক্লাসের বাইরে অধিকাংশ সময়টা ওকে বকবক করতে দেখি। আমার সঙ্গে, সমীরের সঙ্গে, মানবের সঙ্গে এবং এমনি অনেকের সঙ্গে। সুতরাং ওর এই চুপ করে থাকাটা বিশ্রী লাগছিল।

ইলার দিকে ফিরলাম। এখুনি কি বাড়ি যাবি?

হ্যাঁ। শরীরটা খারাপ খারাপ লাগছে। ইলা উত্তর দিল।

কেন? ইচ্ছা না থাকলেও ফস্ করে কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। অন্য সময় হলে বলতে পারতাম না। তখন আমার কাছে ইলা রায় আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর নীরবতা ভাঙার ইচ্ছাটা আমার কাছে এত প্রবল হয়েছিল যে, একটা অন্তরঙ্গ প্রশ্ন অসতর্ক মুহূর্তে করে ফেলেছি।

ইলা আমার মুখের দিকে তাকাল। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

এই, বল্ না তোর কী হয়েছে?

ও ম্লান হাসে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার বোধ হয় টিবি হয়েছে মিহির। আজ কয়েকদিন হল রক্ত পড়ছে মুখ দিয়ে।

চমকে উঠে ওর একটা হাত চেপে ধরলাম। কোনও কথা বলতে পারলাম না। আমার মনে হল, একটা জাহাজ সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে প্রচণ্ডভাবে সাইরেন বাজাচ্ছে। সেই জাহাজের মধ্যে একটা কেবিনে আমি আর ইলা বসে। ও খক্‌খক্ করে কাশছে আর রক্ত ফেলছে। আমি সব রক্ত মুছে নিচ্ছি।

তারপর একসময় তার কাশি থামল। বললাম, আর রক্ত আছে রে তোর থুতুতে?

ও বলল, না। তারপর আমার বুকে মাথা রাখল।

একটা ট্রাম ঝক্‌ঝক্ শব্দে পাশ কাটাল। তার পিছনে কয়েকটা ট্যাক্সি আসছে। একটা ডবলডেকার আমাদের বিপরীত দিকে চলে গেল।

চারপাশের সমস্ত কিছুকে আমি ভুলে গেলাম। ইলার চোখে চোখ রেখে বললাম, ইলা, তোকে আমি ভালোবাসি।

ইলা আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ নিচু করে বলল, ও সব আমি হারিয়ে ফেলেছি মিহির।

আমিও এতদিন বিশ্বাস করতাম না যে, ভালোবাসা বলে কিছু রয়েছে। শান্ত গলায় বললাম, আজ তোকে দেখে আমার মনে হচ্ছে ভালোবাসা মিথ্যে নয়। আমরা আবার বাঁচব ইলা।

কতদিন স্বপ্ন দেখেছি, একটা সবুজ দ্বীপে আমরা বাসা বেঁধেছি। আমি আর সে। আদম আর ইভ। বিশ শতকের এই পৃথিবীটা যেখানে এখনও পৌঁছয়নি। যেখানে আদিগন্ত কাশবনের মাঝে এখনও লুকোচুরি খেলা যায়। কিন্তু পেলামটা কী? পুরুষের দেখা অনেক পেয়েছি। আমার শরীরের সীমানাতেই তাদের যাতায়াত। সেই স্বপ্নে দেখা পুরুষের মতো কেউ আমাকে ভালোবাসতে পারল না মিহির। কেউ না। ধরা ধরা গলায় বলল ইলা।

আমিও স্বপ্নে দেখেছি তাকে। যার চোখ দুটো পাখির নীড়ের মতো। যে নীড়ের বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে পারব। তুই পারবি ইলা, আমাকে সেই বন্দরের সন্ধান দিতে। তোকে আমি সারিয়ে তুলব। আমি আবার বললাম।

পিছনের দিকে তাকাল ইলা। আবার ট্রাম আসছে। চলি। কাল আসছিস তো।

ট্রাম এসে গেল। ও উঠে পড়ল ঠেলেঠুলে। আমার রাস্তা অন্যদিকে। তাই উঠলাম না।

সারাটা পথ এক আশ্চর্য আনন্দে ডুবে বাড়ি এলাম। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সাধতে সাধতে। কথাগুলো মনে পড়ছিল না ঠিক। কারণ অনেকদিন রবীন্দ্রনাথকে ভুলে ছিলাম। কিন্তু সুরটা মনে ছিল।

পাড়ায় ঢোকার মুখে দেখলাম, চারপাশ থমথমে। চায়ের দোকানটা খোলা নেই। বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে। ডানদিকের একটা গলি থেকে শিস শুনতে পেলাম। পরপর দুটো। বুঝতে অসুবিধা হল না। রমেশরা ডাকছে।

বললাম, কী রে, সব কিছু ঠাণ্ডা কেন?

জ্যোতিদা গ্রেফতার হয়েছে। রমেশ বলল।

কখন?

বিকেলে। আস্তানা থেকে। নির্মল উত্তর দিল।

জ্যোতিদার খবর পুলিশ পেল কীভাবে? মাত্র আজ সকালে তো এসেছে। আমি প্রশ্ন করলাম।

শ্যামল বেইমানি করেছে। দাঁতে দাঁত চাপল রমেশ।

শ্যামল! আমি যে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

হ্যাঁ। চাকরি আর চাকতির টোপ দিয়েছিল ওকে পুলিশ। তারপর যা হওয়ার........সব ফাঁস করে দিয়েছে। নির্মল বলল।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল রমেশ। সারাদিন থানায় থাকবার পর সন্ধ্যাবেলায় লুকিয়ে বাড়ি আসছিল। সেখান থেকে তুলে এনেছি। চল্। ওর বিচার হবে।

ওরা হাঁটতে শুরু করল। আমিও ওদের সঙ্গ নিলাম। নিস্তব্ধ কালো রাত। অদূরে কোথাও একপাল কুত্তা হুল্লা করছে। গলি দিয়ে আমরা কজন হেঁটে চলেছি। আমি আর রমেশ পাশাপাশি। পিছনে বাবলু, নির্মল আর সোনা। কেউ কোনও কথা বলছি না। নিস্তব্ধতটা বিশ্রী লাগছিল।

বললাম, কোথায় রেখেছিস শ্যামলকে?

সত্য মাস্টারের বাড়িতে। রমেশ সংক্ষিপ্ত উত্তব দিল।

চমকে উঠলাম। সে কী? সব জানাজানি হয়ে যাবে না? সত্যদার ভাইটা আই বি-তে কাজ কবে না?

রমেশ ছোট্ট করে হাসল। সত্য মাস্টারের বাড়ি এসে গেছে !

অন্ধকাব ঘর। রমেশ টর্চ জ্বালল। স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর নির্মল আর অসীম বসে ছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়াল। কোণের দিকে মড়ার মতো পড়ে রয়েছে শ্যামল। উপুড় হয়ে। মুখ-হাত-পা বাঁধা।

বললাম, খতম হয়ে গেছে?

অসীম একটা বিড়ি ধরাল। না। এবার হবে। তবে তার আগে ওর মুখটা খুলে দেওয়া দরকার।

নির্মল আর অসীম ওকে চিত করে শোয়াল। তাবপর ওর মুখের ভিতর থেকে কাপড়গুলো বাব করল। শ্যামলের ঠিক মুখের ওপর টর্চেব ফোকাস। ফ্যাকাশে। রক্তহীন।

থানায় গিয়েছিলি কেন? রমেশের গলাটা প্রচণ্ড কর্কশ.

শ্যামল উত্তর দিল না। মড়ার মতো চোখ দুটো আমার চোখে রাখল শুধু। আমি মুখটা নিচু করলাম।

রমেশ আবার গর্জে উঠল। থানায় গিয়েছিলি কেন? জ্যোতিদার খবর পুলিশ পেল কীভাবে? আমাদেব অপারেশনের গোপন প্ল্যান জানল কীভাবে? বারুদের আস্তানার হদিস পেল কীভাবে?

সবাই একসাথে গর্জে উঠল : জবাব দে!

অসীম বলল, বিশ্বাসঘাতক বেইমান কোথাকার।

বিশ্বাসঘাতক আমি, না তোরা? তোরা তোদের নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিসনি? তোরা সংগ্রামী জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিসনি?

শাট আপ। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কী জানিস তো?

জানি। মৃত্যুদণ্ড।

হ্যাঁ। প্রস্তুত হ।

প্রস্তুত হয়েছি অনেক দিন আগে থেকে। যে দিন বাবাকে টিবিতে ধরল, বিয়ের যুগ্যি বোনটা সংসার চালাতে গিয়ে বাইরে রাত কাটাতে শুরু করল, ছোটো ভাই দুটো ইস্কুলে না পড়তে পেরে

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল। সেইদিন থেকে—যে দিন তোদের আদর্শের নামাবলির পিছনের আসল রূপটা দেখতে পেয়েছিলাম।

তবে এ পথে এসেছিলি কেন?

তোদের ভুল বুঝেছিলাম তাই। মনে করেছিলাম, তোদের বুলির মধ্যে সত্যি কিছু আছে। তারপর দেখলাম সব ভাঁওতা। প্রতিক্রিয়ার দালালরা দখল করে নিল তোদের। সমস্ত গণ-আন্দোলনের পিছনে ছুরি মারা শুরু করলি তোরা। তোদের আর আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে শ্যামল হাঁপাতে লাগল।

তাই পুলিশের কাছে গিয়েছিলি? দাঁতে দাঁত চেপে বলল নির্মল।

ম্লান হাসল শ্যামল। আশ্চর্য, ও এখনও হাসছে? তারপর বলল, কত টাকা পেয়েছি জানিস?

রমেশ আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বিশ্বাসঘাতকের যা প্রাপ্য, সেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব করছি আমি। তোমরা কে কে রাজি? হাত তোলো সব।

সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। সকলেই হাত তুলেছে। যন্ত্রচালিতের মতো আমিও তুললাম। বোধ হয় একটু দেরি হয়েছিল। রমেশ আমার চোখে চোখ রাখল। তারপর একটা ভোজালি তুলে দিল আমার হাতে।

আমি ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম, আমি!

কেন, আপত্তি আছে নাকি?

রমেশের স্বরে যেন সন্দেহ। অমনি কল্পনায় দেখলাম, আমিও শ্যামলের মতো শুয়ে আছি। বিচার হল। তারপর ধড় আর মুণ্ডু আলাদা। এবার শিউরে উঠলাম।

তাড়াতাড়ি বললাম, না না, আপত্তি কিসের? বোমা মেরে মেরে এখন আমি পাকা কসাই।

ভোজালিটা হাতে নিলাম। শ্যামলের দিকে তাকালাম। চোখ দুটো বোজা। এই মুহূর্তে ও কি কিছু ভাবছে? নাকি নির্বিকার হয়ে রয়েছে? আগেকার যুগে সাধু-সন্ন্যাসীরা কি মৃত্যুর আগে এতটা স্থির থাকতে পারত? জানি না।

চোখ দুটো একবার বন্ধ করলাম। এক মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলি ছবি ভেসে উঠল মনে। শ্যামলদের ছোট্ট খোলার ঘরটা। দুজনের এক সঙ্গে ইস্কুলের পথে চলা। গলিপথে মার্বেল আর লাট্টু খেলা। ওর রুগ্‌ণা মা আর বোনটার কথা! ওর ছোটো ভাই মন্টুর বড়ো বড়ো টানা চোখ দুটো।

সংবিৎ ফিরে পেলাম। বললাম, রমেশ, এবারটা ওকে ক্ষমা করা যায় না?

মিহির!

রমেশ, সোনা, নির্মল একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। আর ঠিক তখনই গলার ওপর কোপটা বসিয়ে দিলাম। রক্ত ফিনকি দিয়ে বার হল। কিন্তু আমি দেখলাম না। টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম।

ভাবলাম বাড়ির দিকে যাই। কিন্তু থেকে থেকে শ্যামলের কথা মনে পড়ছে। ভীষণ বিশ্রী লাগল। মনে হল, আমি যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। একটু উত্তাপ চাই। চারপাশে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। একটু আলো চাই। শ্যামলের গলা কাটতে গিয়ে আমি কি নিজেকে কাটলাম? ঠিক যেন বুঝতে পারছি না। দম আটকে আসছে আমার। আজ কি বাতাস নেই?

কিন্তু যাই কোথায়। রমেশের ওখানে? অসম্ভব। এবার যা পারে ওরা করুক। বাড়ি যাব? না না। বাড়ি সহ্য হবে না। প্রচণ্ড জোরে না হাসলে মনটা হালকা হবে না। উত্তাপ না পেলে আমি বরফ বনে যাব।

হাঁটতে হাঁটতে সোনাগাছিতে এলাম। হাতে একটা ঘড়ি ছিল। বিনিময়ে সারা রাত্রির বন্দোবস্ত হল।

তারপর খেলা করতে করতে যখন একসময় ক্লান্ত হলাম—তখন মনে পড়ল ইলাকে। মনে পড়ল আজ সন্ধেবেলাতেই ডালহাউসির নির্জন রাস্তায় ইলার চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, ইলা, তোমাকে ভালোবাসি।

নিজের ওপর বিশ্বাসটা আবার হারিয়ে ফেললাম। ইলার সঙ্গে আজকের সন্ধেটা কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হল, সে সব যেন কোন্ বিস্মৃতির যুগের কথা........এইসব ভাবতে ভাবতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমের মধ্যে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। মস্ত বড়ো হলঘরে থিয়েটার হচ্ছে। শেক্সপিয়রের ওথেলো। ছুঁচ ঢুকতে না পারা অন্ধকারে ডুবে রয়েছে ঘরটা। ডেসডিমোনা একক শয্যায় শায়িতা। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। কাঁপা-কাঁপা একটা মোমবাতি নিয়ে ওথেলো এল। সতর্ক পায়ে। ডেসডিমোনার ঘুম ভেঙে গেল। বলল, আজ সারাটা রাত স্বপ্নের দ্বীপে থাকব দুজনে।

হা হা করে হেসে উঠল ওথেলো। কালো আবলুস কাঠের মতো চেহারাটা তার আরও বীভৎস হল। তারপর হাতের চক্‌চকে ছুরিটা সে বসিয়ে দিলে ডেসডিমোনার পালকের মতো বুকটায়।

আকাশের তারাটা নিভে গেল। জোনাকিরা মরে গেল। একটা হাউই বাজি হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি দিয়ে ওপরে উঠে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল।

উদ্যানের দিকে ছুটে গেল ওথেলো। কিছু ফুলের খোঁজ করল। পেল না। কেননা, ডেসডিমোনাব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ওথেলো।

মঞ্চে আবছা অন্ধকার। ওথেলোর মুখের ওপর আলোর ফোকাস। দর্শকদের দিকে ফিবে প্রশ্ন করল সে, আচ্ছা, আমি কে বলুন তো?

সমবেত দর্শক . তুমি ওথেলো। শেক্সপিয়রের সৃষ্টি তুমি।

ওথেলো : আপনারা?

প্রথম দর্শক : আমরা দর্শক।

ওথেলো : মিথ্যে কথা।

দ্বিতীয দর্শক : কে আমরা?

ওথেলো : আমি, আপনি, আপনারা—সবাই ওথেলো। আমরা সবাই খুনি, আমরা সবাই ডেসডিমোনাকে খুন করেছি। খুন করছি।

সমবেত দর্শক : আমরা সবাই ওথেলো? হা হা, আমরা সবাই ওথেলো!

প্রথম দর্শক : আমি চাঁদ, ফুল আর কল্পনাকে ভুলে গেছি।

ওথেলো : আপনি আপনার হৃদয়কে হত্যা করেছেন।

দ্বিতীয় দর্শক : আমি একজন বিজ্ঞানী। মুঠোর মধ্যে ধরতে গিয়ে দেখি কোন ফাঁকে আকাশটা মুছে গেছে।

ওথেলো : দেহকে পোস্টমর্টেম করলে ভালোবাসা পাওয়া যায় না।

তৃতীয় দর্শক : আমি আজকাল বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি। আমি আপনার অচেনা একটা মহাদেশ।

ওথেলো : কারণ জারজ সন্দেহে আপনি আপনার আত্মজের রক্তে হাত ধুয়েছেন।

দৃশ্যটা পালটে গেল। সাবা হলঘরটাই মঞ্চ। আগেকার দর্শকরা এখন অভিনেতা। চারদিকে একটা ফ্যাকাশে আলো। সকলেব মুখ ব্লটিং পেপারের মতো সাদা, পাণ্ডুর। রক্তহীন। একটা অসহ্য গুমোট। চোখেমুখে মৃত্যুর বিভীষিকা। হঠাৎই প্রথম দর্শক চিৎকার করে উঠল।

আমি ডেসডিমোনাকে হত্যা করেছি। আমি আমার প্রেম-ভালোবাসা সব কিছুকে হত্যা করেছি। আমাকে শাস্তি দাও।

দ্বিতীয় দর্শক : আমি পিশাচের দাস হয়ে পড়েছি। চারদিকে কী অন্ধকার। আমায় একটু আলো দেখাও।

তৃতীয় দর্শক : আমি নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি চাই।

সমবেত দর্শক : আমরা স্বদেশে ফিরতে চাই।

পরিবর্তিত দৃশ্যে মানুষগুলোকে নেগেটিভ ফোটোর মতো দেখাচ্ছে। সকলের হাতে চক্‌চকে ছুরি। ডেসডিমোনার দেহটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, অমনি সকলে চিৎকার করে উঠল : ডেস....ডি...... মো.........না।

প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে ভেসে ভেসে ক্লান্ত হল। তারপর যে যার নিজের বুকে ছুরি বসাল। এবং মঞ্চের আলো নিকষ অন্ধকারে গেল হারিয়ে। □

কপিলের মুলুকযাত্রা

শংকর বসু

ভারতিয়ার কপিল। বউ-খেকো কপিল। তিনকুলে তার আপনজন বলতে আছে আটার দলার মতো এক নানি। তাও মুলুক থেকে সমাচার এসেছে গেল হপ্তায়, সে বুড়ি নাকি গুয়ে-মুতে ল্যাবড়ে-থ্যাবড়ে আছে। বুড়ি বিদেয় হলে কপিলের অতীতটুকু টিকটিকির ল্যাজের মতো নিঃসাড়ে খসে যাবে। তখন আপনি আর কোপনি সম্বল। তখন কপিল শুধু ভারতিয়া কোম্পানির বিশ সালের গোঁয়ার ওয়ার্কার। যার সম্বল বলতে বুক পকেটের ফটোক, ঝাকড়ামাথা হাড্ডিসার বট গাছটাব তামার বর্ণ কচিপাতা ছোঁওয়া টানা আটচালা বস্তিটি। বস্তির একখানা খোপ। খাটিয়া। আর খটমল।

আসল বিত্তান্ত ফটোকের। নিউ অ্যালেনবেরির লাগাতার পেটগুখা হরতালের রুক্ষু মেজাজের ভেতর, উবু হয়ে বসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে কপিল ফটোখানা বের করে মোলায়েম চোখ বুলোয়। নারা লাগিয়ে গলা ভেঙে কেলে মন্টু ফ্যাস ফ্যাস করে বলে—কপিল, ও কিসের ফটো?

—ফটোক হ্যায় ফটোক।

—আরে বাপ্ কার ফটো দেখি না!

—রাম লছমন কা।

বুক পকেটে থাকে ফটোটা। পাতলা প্লাস্টিকের খামের গায়ে ঘাম-বসা নুনদাগ ফটোটায় লেগেছে ভারতিয়ার বয়লারম্যান কপিল যখন লোহার ঢাউস পেটটার ভেতর বেলচায় করে কয়লা ফ্যাকে আর গতর বেয়ে ফিনকি দিয়ে ঘাম ছোটে, ফটোটা তখনও বুকের কাছে থাকে। কপিলের মাস মাইনের মেহনতের পয়সা আর টুকিটাকি দশটা জরুরি কাগজের সাথে ফটোটা ওর কাছে কাছে দশ বচ্ছর যাবৎ আছে। দশ বচ্ছর। চাট্টিখানি কথা নয়, এখন তো চুলের গোড়ায় চাঁদের রুপোলি ধাতু গলে গলে লেগেছে। আর তখন ছিল মিশকালো চুল। পুলিশের হুলিয়া নিয়ে মানুষটা কপিলের ডেরায় উঠেছিল। আনজান আদমি দেখে বহুর শরম লেগেছিল! আর কপিলের চাউনিতে সে শরম বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেছিল। আর তারপর ভাজি রোটি দাল সবই বানিয়েছে। মানুষটাও কমতি নয়-দুচার রোজেই বহুর দাদা বনে গেল সাচমুচ। ডেরার ভেতর একটা পাতিল কিনে রেখেছিল কপিল। সেই পাতিলেই লোকটা হাগা মোতা সারত, ডিউটি যাওয়ার আগে কপিল পাতিলটা নিয়ে চান করতে ছুটত। অথচ ও মানুষটার নামধাম জানত না। সনৎদা সাথে করে এনে বলেছিল: 'কপিল ভেইয়া, এ সাথিকে কদিন রাখতে হবে। হাওড়ার ওই জুটমিল ওয়ার্কারদের স্ট্রাইকের পর যে গুলিগালা চলল না...। পুলিশ খুঁজছে।' কপিল আর পুঁছতাছ করেনি। জরুরতও হয়নি। মানুষটা ওয়ার্কারের ভালাইর জন্যে লড়ছে, ব্যাস। সনৎদাকে কপিল কী বলেছিল এখন আর মনে নেই। মনে আছে লড়াকু মানুষটা তারপর মাহিনাভর খাঁটিয়াটা দখল করে ছিল। আর যাওয়ার আগের দিন কপিলকে একটা ফটোক দিয়েছিল। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে কপিলের পিঠে আলতো চাপড়া মেরে বলেছিল : ইয়ে লেনিন, আর ইয়ে হ্যায় স্তালিন।

তারপর কোথায় যে মানুষটা হারিয়ে গেল। কপিল ভারতিয়ার ধুলো-তেল কালিমাখা রাস্তার ধারের চায়ের ঝাঁপ-তোলা দোকানের বেঞ্চে বসে কাকদ্বীপের শাঁখের শব্দ শুনেছিল। লড়াই সংবাদ কাকের মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফিটার মিস্ত্রি পঞ্চাকে ডেকে এনে কপিল দু ভাঁড় চায়ের কথা বলে মুচকি মুচকি হাসত। পঞ্চার দরকচা মুখের দিকে চেয়ে হাসত। পঞ্চা ওর রকম-সকম দেখে বিগড়ে যেত ঃ আরে শালা হাসছিল

কেন? অ্যালেনবেরির সুদর্শনে মুখখানাও বেঁকে তুবড়ে একসা হোত : কা রে? বোল কা বোলেগা? আর কপিল মুখ টিপে টিপে হাসত। শেষকালে ওরা রেগে হুট করে উঠে দাঁড়ালে জামার খুঁট ধরে জবরদস্তি টেনে বসাত : দেখো, কা হ্যায়?

—কা?

—ফটোক।

—তো ক্যা?

—ইয়ে দেখ, ইয়ে হ্যায় লেলিন, আর ইয়ে হ্যায় এস্‌তালিন।

দু তিন দফা এমনি হতেই ব্যাপারটা ধর্মঘটের মতো চাউর হয়ে গেল আব সেই থেকে কপিলের নামটা চাউর হয়ে গেল। ভারতিয়ার কপিল। মুচকি হাসি আর কপিল। বিহারের খরায় পোড়া চোখ দুটোয় তবু লোহার বাবরির মতো ফুল ফোটে : লেলিন কেয়া কিয়া? এস্‌তালিন কৌন থা? সনৎদা সেবার কোর্টের ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আনমনে বলত : লেনিন ছিলেন ভারত...ভারতে...থুড়ি...রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতা...বীর...শিক্ষক।

—এস্‌তালিন?

—স্তালিন ছিলেন লেনিনের...সহকর্মী কমিউনিস্ট...লেনিনের ডান হাত।

—ডাহিনা রাজু?

—হ্যাঁ।

—তব তো উলোগ রামলছমন থা।

রোদে জ্বলা বিহারের চোখ ফটোর মানুষ দুটোর মুখ খুঁটিয়ে দেখে। আঁতিপাতি করে কী যেন খোঁজে। আচমকা বলে ওঠে : এস্‌তালিনকা অ্যায়সা দেখনেমে হামরা মুলুক মে ভী এক খেত মজদুব হ্যায। লেবার কোর্টের কাগজপত্তরেব ভেতবে থেকে মাছির মতো চোখ দুটো উঠিয়ে আনে সনৎ : কা পাগল কা মাফিক...।

—নেহী সচমুচ।

সনতের মুখে বাঁকাচোবা হাসির একটা রেখা কিলবিল করে উঠতেই কপিল চুপ মেরে যায়। বুক পকেট থেকে ফটোটা বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে : আচ্ছা ও সাথি আওর নেহী আয়েগা? সনতের ঠোঁটে, চিবুকে, চোখের খাঁজে 'জানি না'র উদাসীন রেখা কুটিকুটি করে দেগে বসে। আর কপিল বিড়বিড় করে : ও ভী বহুত আচ্ছা আদমী থা।

ভারতিয়ার গেট ডাহিনা ফেলে বাঁয়া তরফ চা-দুকান। অলিম্পিয়া ফ্যাক্টাবির চা-দুকান। ধোঁয়ার জাল। কানের পর্দা ফাটা সিটি। আর পূর্ণিয়া জিলার হাবিবেব রুগ্‌ণ বউয়েব নাকফুল দেখতে দেখতে কত দফা মিছিলে হেঁটেছে কপিল। পেটছিবড়ে করে শুকনো হাড়ে এককাট্টা লাগাতার স্ট্রাইকের সময় হাবিবের বউয়ের নাকফুল বেচতে দেখেছে। আটাগোলা খেয়ে সুদর্শনের ট্যাপাটোপা বউটা ম'ল! আর বউটার বুকের দুধ টেনো আড়াই বছরের লাপসালুপসো ছেলেটা। তারপর খাদ্য আন্দোলন। আর হাবিবের উরুতে চোট। কপিল অনেক দেখল। অনেক শুনল। আনকোরার দলকে কপিল এখন রাশিয়ার বাকু অঞ্চলের লড়াইর গল্প শোনায়। আর বলে : জানতা এস্‌তালিন কোন থা? লেলিন?...নেহী, তো শুন...।

হঠাৎ একদিন বন্দেল গেটের লেবেল ক্রসিং ছাড়িয়ে সাঁড়াশির মতো আড়াআড়ি রাস্তা ধরে ডিউটি-ফেরতা কপিলের মাথার ওপর ধোঁয়া আর নিশ্বাসের অফুরন আকাশটা ফালা ফালা হয়ে গেল কুচো মেঘে। পঞ্চা আর সুদর্শন ভারতিয়ার সামনে কাঁচা নর্দমার ওপর বাঁশের মাচান বাঁধা বেঞ্চে চুপ মেরে বসেছিল। সনৎদা ওদের বেওকুফ মুখের দিকে চেয়ে বলল : পার্টি ভাগ হয়ে গ্যাছে। তারপর দেখতে দেখতে যে যার হেডটেল করে একেক দিকে চলে গেল। পঞ্চা আর কপিল কোথাও নাম লেখাল না। দড়ি টানাটানি চলছে ওদের নিয়ে। অলিম্পিয়া কোম্পানির ঘ্যাস কয়লার ঢিবির কাছে সনৎ কপিলের ডাহিনা বাজু চেপে ধরল : কী রে কপিল, কী করবি?

—মুলুক যাব।—ঃ কেন? নানীর কাছে?—ঃ নমেহি।—ঃতব্?— ঃ ফটোক ফাঁড়নে নেহী সাকেগা।—! ফটো ছিঁড়তে কে বলেছে?—ঃ তুমলোগ এসতোলিনকো মানতা হ্যয়?—ঃ ন্‌ন্‌না। খোদ রাশিয়াই মানছে না।—ঃ হাম ভি রাশিয়া কো মানতা নেহী।

কপিলকে বাগে আনা গেল না। কাঠগোঁয়ার কপিল। ভারতিয়ার কপিল। বউ-খেকো কপিল। সনৎ কপিলকে বাগানের আশাও ছেড়ে দিল : বিহারের হুনুমানজি, রামলঝমন সিনায় থাকে ওর।

বিহারের হনুমানজি মুলুক যাওয়ার তোড়জোড় করছে। অথচ মুলুকে ওর জ্ঞাতিকুটুম বলতে ছিল জবুথুবু এক নানি। সেও চোখ বুজিয়েছে। সুদর্শন আর পঞ্চার সাথে ভেট করল কপিল। মুখে সেই টেপা হাসি।

—নানীর তবিয়ত খারাব?

—নেহী। ও তো মর গিয়া।

—তবে যাচ্ছিস কোন চুলোয়?

—মুলুক।

—মুলুকে আছেটা কে?

—হ্যায় কই।

কপিল মুচকি মুচকি হাসে। সুদর্শনের শুঁয়োপোকার মতো ভুরু কুঁকড়ে প্রকাণ্ড নাকটা ছুঁয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলে। আর কপিল মজাক করছে। হাসছে। পঞ্চা তেড়িয়া হয়ে উঠল ঃ কে বলবি তো? কপিল ফের হাসতে থাকে। হঠাৎ বুক পকেট থেকে ছবিখানা বের করে পটলায়কের মতো সুর করে বলে : ইয়ে হ্যায় লেলিন, আর ইয়ে হ্যায় এস্‌তালিন...হাম এস্‌তালিন কো ঢুঁড়নে যা রহা...। বাঁশের মাচানে মচমচ শব্দ তুলে কপিল ওদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল : হামারা মুলুক মে এস্‌তালিনকা আ্যয়সা এক আদমি হ্যা...য়...। বিলকুল এস্‌তালিন ক্যা আ্যয়সা...বড়া বড়া মোচ...।

কপিল মুলুক গ্যাছ দশ-বারো সাল হল। গাঁওয়ালে দেশোয়ালে কারও হাত দিয়ে একটা খত পাঠায়নি। দশ বারো সাল মানুষটার পাত্তা নেই। ভারতিয়ার গেটের সিধে নর্দমার ওপর বাঁশের মাচানে বসে সুদর্শন আর পঞ্চা মাঝে মধ্যেই বলাবলি করে : কবে ফিরবে বল তো?

অলিম্পিয়া কোম্পানির সিটি আর মজুরের হাসির হররার মধ্যে ওদের দুজনের ভেতর কেউ কপিলের ভালোই কামনা করে। আরেকজন বলে : দেখিস ও ঠিক ফিরবে। □

গাণ্ডীব

সুযশ ভট্টাচার্য

বউ নিয়ে বাস থেকে নামতেই রজনী কপাট একেবারে বাঘের মুখোমুখি পড়ে গেল। নুটু মল্লিক! এমন সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে যে লুকোবার জো নেই। বউকে নিয়ে সদর থেকে ফিরছে রজনী। বাহাত্তরের ধানকাটা কেসটার তদ্বির করে বটকৃষ্ণ উকিলকে বৌ-এর বাউটি বাঁধা দেওয়া তেরো টাকা ধরে দিয়ে বিকেল বিকেল বাস ধরে ঘরে পৌঁছবার ইচ্ছে ছিল। সেটাই হল কাল। এখন একেবারে বাঘের মুখে। নুটু মল্লিক যে সাঁঝ পেবোলেই দু পাত্তর বাংলা মদ গেলে, সেটা সবাই জানে। রজনী কপাটেব দুশ্চিন্তা অবশ্য মাতাল নুটুকে নিয়ে নয়। নুটু মল্লিক এ তল্লাটের সরকার, পুলিশ, নেতা ও পঞ্চায়েত—সে একাই একশো।

রজনীর হাতে চটেব ব্যাগে সদর বাজারে কেনা আলু সবজি আর কোর্টের কাগজের ছোটো বাণ্ডিল। সে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় বউকে তাড়া দেয়, 'চল্ চল্ পা চালা, সাঁঝ নামে।' বিড় বিড় করে খিস্তি করে, 'শালা যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।' ঘোমটার আড়ালে বউ মুখঝামটা দেয়, 'মাতালটা ড্যাবাড্যাবা চোখে মোকে দ্যাখে, দ্যাখো!' রজনী ফিস ফিস করে বলে, 'তাড়াতাড়ি আয়, বাস রাস্তা পেরিয়ে মাঠে নেমে যাব।'

নুটু মল্লিক কেঁদো বাঘের গলায় হাঁক পাড়ে, 'অ্যাই শালা রজনী, দাঁড়িয়ে যা।'

বসিরহাটের বনরঙা দিগন্তে সন্ধ্যা নামে সরকারি কার্ফুর মতো তল্লাট জুড়ে। বাসটা যাত্রীদের নামিযে দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেছে। চায়ের দোকানের সামনে বাসরাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যায় কোর্ট ফেরতা রজনী কপাট, তার বুকে একটু ঝলক মারে শঙ্কা, তার বউ জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

নুটু মল্লিক খসখসে পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে বগল চুলকে হাঁকে, 'অ্যাই উল্লুক, গিয়েছিলি কোথায়?'

—এঁজ্ঞে, সদরে। তাবিক ছিল।

—অ, তা সদরে কি রোজই তারিখ থাকে আজকাল? পরশু গিয়েছিলি কোথায়?

—ভগবানপুর, আঁজ্ঞে।' সন্ত্রস্ত রজনী জবাব দেয়।

সত্তর একাত্তব সালে যখন সে বারাসত জেলে আটক ছিল, তখন পুলিশের বড়োকর্তা চোখ লাল করে এরকম করেই জেরা করত, হট্টগোলের নেতারা কোথায়, পার্টির লোকেরা কে কে আসত তাব ঘরে। নুটু মল্লিকরাও আজকাল পুলিশ হয়ে গেছে। নুটু মল্লিক যারে ছোঁবে, তার নির্ঘাত অঠোরো ঘা। আবার হাঁক পাড়ে নুটু—'ক্যানো, আজকাল ভগবানপুরে কি তোদের হারামজাদা পার্টির আপিস খুলেছে? পুরোনো সম্বন্ধটা আবার পাতাচ্ছিস নাকি?'

নুটুর সাগরেদ হারু বোষ্টম ফুট কাটে, 'ছেড়ে দাও নুটুদা, এ শালা নকশাল পার্টির ভাগ্যে আবার মিত্যু নাচছে বটে।'

রজনী আপত্তির সুরে বলে, 'এ কীরম কতা আপনার? গিস্লাম ভগবানপুরে, আপন ভাইয়ে বউ দেখতে। বিয়ে করা পর্যন্ত ভাইটা বলে পাটায়, দাদা দেকে যাও মোর ঘরসন্সার। তা সে দিন বউকে নিয়ে সকাল সকাল চলে গিস্লাম। এতে পাটি এল কোথায়? এ কী রকম ধারা প্রশ্ন আপনার?'

জ্বলে ওঠে নুটু মল্লিক। উনসত্তর সত্তরে এই ছোটো লোকগুলো যা খুশি তাই করেছে ভদ্দর লোকেদের নিয়ে। জমি কেড়েছে, ধান কেটে নিয়েছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, আর পাঁঠা কাটার মতো কেটেছে নুটুর মতো লোকেদের। উঃ সে সব দিনের কথা চিন্তা করলেই নুটুর কল্জে ঠান্ডা হয়ে আসে। কিন্তু এখন আবার

নটুদের দিন। নটু যদি বলে পশ্চিমে সূর্য ওঠে তাহলে এ তল্লাটে যত হাড়হাভাতে ছোটলোক একবাক্যে বলবে, হ্যাঁ পশ্চিমেই সূর্য ওঠে। ছোটোলোকগুলোকে জুতোর ডগায়, লাঠির তলায় না রাখলে আবার কখন পাখা উঠবে শালাদের। রজনী কপাটের এতটা যুক্তিবাদী কথাবার্তা, মুখের ওপর চোপা করায় নটু বিড়বিড় করে জ্বলে ওঠে, 'দ্যাখ রজনী, ঢ্যামনামি করিসনি। ও সব ঢঙ আমার সামনে দ্যাখাসনি। পাটি ফাটি করলে এবার হাটের ওপর মেরে ঝুলিয়ে দেব তোদের মাগভাতারকে।'

রজনীর পাশে দাঁড়ানো বউ কী একটা বলতে যায় রাগতভাবে, রজনী তাকে আটকে দেয়। 'তা এঁজ্ঞে, আপনারা যখন গাঁয়ের কত্তা, তখন আপনারা তা পারেন বটে। ভগবান যদ্দিন রাখেন আমাদের।'

রজনীর কথায় বিনয়ের পরিমাণ এবং ভগবানের উল্লেখে নটু মল্লিক কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়। রজনীর বউয়ের কাপড় জড়ানো শরীরটায় চোখ সাঁটিয়ে নটু বলে, 'ভগবান ক্যানো রে, আমরা আছি তো তোদের জন্যই। বাড়িতে যাস্ না ক্যানো আজকাল? নাকি ধারকর্জর আর কোনওই দরকার নেই?'

রজনী পাশ কাটায়।— 'আর কত্তা, মোটে সময় পায় না আপনার বাড়ি যাওয়ার, পেটের ধান্দায় ভোবনাটা ঘোরে। পোড়া পেট বড়ো জ্বালায়।'

নটু মল্লিক মদের হেঁচকি তুলে দরদমাখা সুরে বলে. 'তা তুই সময় না পাস্ তোর বউকে পাঠিয়ে দিলেই পারিস, ধানটা মুড়িটা নিয়ে গেলেই পারে—' নটুর গলায় প্রজারঞ্জনের অমৃত ঝরে, মদের নেশাটা জমে ওঠে। হারু বোষ্টম আরেকটা বোতল খুলে দেয়। রজনীও বউকে নিয়ে পা চালায়। বলে, 'আর কত্তা, তা তো বটেই, আপনারা যখন আছেন দেশে গাঁয়ে।'

নটু দরাজ গলায় বলে ওঠে, হ্যাঁ পাঠিয়ে দিস বউটাকে। বুইলি হারু, প্রজা না থাকলে কীসের রাজা, বল?' তাব মাতলামি চড়ে ওঠে। রজনী দ্রুত হাঁটে, বউ পেছনে পড়ে যায়। রজনী অধৈর্য কণ্ঠে তাড়া লাগায়, দুজনে দোকানগুলোর দরমার বেড়ার পাশ দিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। দূরে গঞ্জের অশ্লীল অন্ধকারে নটু মল্লিকের মাতলামির হই চই তখন শোনা যায়।

সিঁদুরিয়ার আউল-বাউল মাঠে নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রজনী। গাঁয়ে এলে বিশেষ ভয় থাকে না। পাঁচ গাঁয়ের পরে ভোলাপুরে পুলিশ ক্যাম্প, রাত-বিরেতে পুলিশগুলো বড়ো একটা আসে না, নটু মল্লিকের চ্যালাচামুণ্ডা দু-একটা যে নেই গাঁয়ে, তাও নয়, তবু রজনী গাঁয়ে ঢুকলে ভরসা পায়, গাঁয়ের মাঝে কৃষক সমিতির পুরোনো অফিসটাতে ঢুকলে বুকে বল পায়, ঠিক যেমন পেত পাঁচ সন আগেকার গন্ডগোলের দিনগুলোতে।

অন্ধকার দাওয়ায় উঠে বউ শুধায়, 'কাজটা কিন্তু ভালো হল নি।' রজনী কথা বলে না। বউ নুড়ো জ্বালার জন্য পাটের কাঠি ভাঙে পটাপট। তারপর বলে, 'ওই পাটির কথা বলছিলুম, সব্বোনেশে পাটি। আবার করলে নটু মল্লিক ছেড়ে কথা কইবে?'

উঠানের চুল্লিতে হাঁড়ি বসেছে, রজনী উনুনের আলোয় বউয়ের দিকে তাকায়। প্যাঁচা ডাকে দূরে, আজ আকাশে চাঁদ নেই। রজনী খিঁচিয়ে ওঠে, 'মেলা বকিস না। কোন কাজটা ভালো হবে তা'হলে? নটুর দালালি করাটা, পাটি করার আগে নেশাভাঙ করে তোক ঠ্যাঙাতুম, সেই কাজটা? শুকনো পাতা উনুনে ঠেলে লোহার নলে ফুঁ মারে রজনীর বউ। আঁচল দিয়ে ধোঁয়ার চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'সেটা তুমি বোঝ। বড়ো পণ্ডিত হয়েছ। জেল খেটেছ। আর এ দিকে আমি মরি।' রজনী নরম সুরে বলে, 'তবে পাটির লোক এলে তুই যে বড়ো তাকে জল দিস, পান্তো বেড়ে দিস? সেও তো সব্বোনেশে!' বউ জবাব দেয় না। উনুনে পাতা ঠেসে।

রজনী বোঝায় বউকে, 'দ্যাখ্ না পাটির কাগজে কীসব লিখেছে! গাঁয়ে সাত দফা কাজ। গতর যার জমি তার, সরকারি খাজনা কমাতে হবে—জোতদারের অস্তর কেড়ে নাও—'

বউ মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'হুঁ ঢাল নেই তরোয়াল নেই ব্যাটাছেলে শিকারে যায়। দেখলে তো একবার লড়াই করে, কত মরল, কত জেলে পচল, মামলা করে সব্বসান্ত হল, এরপরেও শিক্ষে হয় না; রাখো তোমার কাগজ।'

আগের দিনগুলো হলে, রজনী তার বউয়ের এই চোপা করা মুখ মেরে থেঁতো করে দিত। আজ কিন্তু হেসে ফেলে বলে, 'একবার মার খেয়েই যদি হেরে ন্যাজ গুটিয়ে পালালুম তবে আমি কীরকম ব্যাটাছেলে! পুলিশের লাঠি খেয়ে এসে মাগের আঁচলে মুখ লুকোয় কোন মরদের বাচ্চা। নে নে, ভাতটা দ্যাখ্, একে উনুনের গরম তার ওপর তোর মেজাজ, হয়ে গ্যাছে এতক্ষণ!'

বউ হাড়ির ঢাকনা খুলে হাতা দিয়ে নেড়ে দেয়। উনুনের আঁচ নিভে আসে, সেই আঁচ থেকে লম্ফ ধরায়। রজনী কোর্টের কাগজপত্রের ভেতর থেকে পার্টির কাগজ বের করে বিড়বিড় করে পড়ে লম্ফর আলোয়। সাঁঝরাতের জমাট অন্ধকার গ্রামটাকে চেপে ধরে। রজনী কাগজ পড়ে। খানিকবাদে বাইরে খক্ খক্ কাশির আওয়াজ শোনা যায়। তাড়াতাড়ি কাগজগুলো মাদুরের তলায় চালান করে রজনী। বাইরের দিকে তাকায়, 'অ, যামিনী খুড়ো। এসে বোসো।'

যামিনী এ তল্লাটের পুরোনো বাসিন্দা, পুরনো লেঠেল। তেভাগার ধান লুটে, জমিদারের মাথা ফাটানোর কাজে লাঠি ব্যবহার করে জেল খেটেছিল বহুদিন। চোখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখের পাতাগুলো সাদা। যামিনী দাওয়ার ওপর বসে পা ঝুলিয়ে, 'তা সদরের খবব বল্ খানিক শুনি।'

—কোন খবরটা চাও?

—তা খবর যেটা হয়। তোর মামলার খবরটাই বল্।

—হুঃ! মামলার আবার খবর। উকিলের পেট ভরানো। তার চে পাটির কথা শোন।'

—কোন পাটি।

—নস্কাল পার্টি।

—আবার ওই নস্কাল পাটি? তা কদ্দুর গড়াবে এবার লড়াই? নুটুকে কাটা পর্যন্ত? তুই জেলে যাওযা পর্যন্ত? যামিনী খোঁচা দিয়ে বলে।

খানিক কাগজপত্তর ঘেঁটে বজনী চুপ মেরে বসে থাকে। তারপব একটা ছেঁড়া কাগজ পাকিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলে, 'এবারেব লড়াইটা জবর একটা কিছু হবে বলেই তো মনে হল। পাটি তো গাঁয়ে সাত দফা কাজ দিয়েছে চাষিদের।'

—তোবা দিলি সাতদফা, নুটু মল্লিকরা দিল বিশ দফা, সি পি এম দিল ছত্রিশ দফা। দফাবফা না হয় চাষাভুষোগুলোর। পুলিশ ক্যাম্পও রইল, হারামির ছেলে নুটু মল্লিকও রইল, ক্যামন করে যে পাটি চলবে? দেখিস্ মাথা ঠান্ডা কবে দেখিস। তোদেব জোয়ান বয়সও রক্ত গরম।

আম-জাম-নারকেল গাছেব ওপবে এতক্ষণে ছোটো একটা চাঁদের ফালি আলো ছড়াচ্ছে। নিশুতি হয়ে আসে গাঁ। বুড়ো যামিনী গল্প করে চলে গেছে। কেরোসিন আলোয় বানান কবে বিড়বিড় করে ইস্তেহাব কাগজ পড়ে রজনী কপাট। সবটা মাথায় ঢোকে না. যেটুকু ঢোকে সেটাই তার মধ্যে মহা হট্টগোলের সূচনা করে। গতর যার জমি তার, এ যদি হয়? লাঠালাঠি, মারামারি, পুলিশ, নুটু মল্লিকের তড়পানি আর গোঁয়ার চাষিদের মারমূর্তি—সব স্পষ্ট দেখতে পায় রজনী। তারপর? ইস্তাহারটা গোলমেলে, নাকি সে পড়তে পারল না? পার্টিটাই গোলমেলে। হলে কি হবে, এ পার্টিটা যেন রক্তে ঘামে ভেজা, মনেব কথাটি বলে। সহজ কথা। ভেড়ুয়া ভোট পাটির মতো ধান্দাবাজ নয়, এ ব্যাপারে রজনী নিশ্চিন্ত।

বউ বলে, 'ভাত দিয়েচি।' রজনী থুম মেবে বসে থাকে।

বউ আবার বলে, 'ভাত বেড়েচি'। রজনী ধাঁ করে প্রশ্ন করে।' 'হ্যাঁরে, সেই যে জেলে যাওয়ার আগে মোর বড়ো চাকুটা তোর কাছে ছিল, সেটা কোথায় রে?'

বউ বিরক্ত হয়, 'ক্যানো, কাকে কাটবে? খড়ের চালে লুকোনো আছে সেটা।' রজনী নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য শুধায় আবার, 'আছে তো ঠিক?'

বউ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'বিশ্বাস না হয় তো, নিজের চোকে দেকে এস। মরণের পাখা উঠেচে!'

নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বসে ভাতের দলা মুখে ফেলে এক্কগাল হেসে রজনী বলে, 'বুঝলি না ব্যাপারটা? পাটি যে অস্তর নামায় না কখনও! মোদের কি চাকু হারালে চলে?' □

কম্বিং

অমল রায়

মেঘলাদিনে ঝড়বাদলে মাতামাতি করার বয়েস তুই পেরিয়েছিস, তবু এখনও দিগন্তে ঝড় উঠলে বুকের ভিতর পদ্মাপারে বালকবেলার উচ্ছল দৃশ্যগুলো নড়াচড়া করে ওঠে। তাই আজকে কাজলকালো সকালবেলায় অফিসে প্রাত্যহিক প্রয়োজন আর ক্লান্ত অপরিহার্য অভ্যেসের দাসত্ব না করতে চেয়ে তোর বউয়ের দাগপড়া ম্লান মুখের দিকে তাকালি, যেন দুপুরের অফিসের টেবিলে ঘাড়গুঁজে কাজ করা নয়ত হাঁ করে ঝিমুনোর সুড়ঙ্গ পথ ছেড়ে রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ গোনার যৌথশয়নের অলস উদাসীনতার আমন্ত্রণলিপি তার মুখে খুঁজে পাবি। কিন্তু যা হওয়ার তা হয়—এই পরম আধ্যাত্মিক সত্য তুই এতদিনে বুঝে গেছিস। প্রতিদিন হাই তুলেও বউয়ের চামড়া ওঠা ঠোঁটের তিক্ত স্বাদ তোকে নিতে হয়। তাই আগের মতোই চারবার কামানো ব্লেডে ধার দিতে হল। ঘ্যানঘ্যানে ছোটো মেয়েটাকে ধমকে বাজারের জন্য পনেরো বছরের রোগা গম্ভীর ছেলেটাকে দেড় টাকা দিয়ে সস্তায় কেনাকাটা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ছড়ালি, গামছা কাঁধে বারোয়ারি কলতলায় ঝগড়া করলি, পাশের ঘরের ভাড়াটের ঘাড়ের ওপর মুখ বাড়িয়ে পুলিশের গুলিতে পনেরো জন নিহত, তিন মাথাওয়ালা গোরু, ধাপায় মেয়রের দ্বারোদঘাটন, পূর্ববঙ্গে তিপ্পান্নজন খান সেনা নিহত, তিনজন রমণীকে নয়জনের ধর্ষণ, ইত্যাদি অত্যাবশ্যাক মুদ্রিত সংবাদ সংগ্রহ করলি, 'কিগো হলো না...কিগো...' রান্নাঘরের দরজায় কিছুক্ষণ ব্যস্ততা দেখাতে হল, তারপর নাকে না মুখে, মুখে না নাকে ভাত ডাল-ঘ্যাঁট গুঁজে উদাসীন পান চিবানো আর কালো ন্যাকড়ার টিফিনবাক্স হাতে বাসের অপেক্ষায়...

বৃষ্টি পড়ছে। তুই অফিসে আনমনা বসে। বাসে কারা যেন বলছিল বেহালা না বেলেঘাটায় চারটে ছেলেকে উর্দিপরা জীবেরা সকালবেলায় গুলি করে মেরেছে। বাসের জানালা দিয়ে তুই দেখছিলি এক নিত্যযৌবনা মহিলার ছবির সঙ্গে 'হিংস্রতা বর্জন করুন'-এর ছাপা পোস্টার আর চলন্ত ট্রামের গায়ে 'নিরোধ ব্যবহার করুন'-এর পাশাপাশি রবি ঠাকুরের বাণী। আর এখন তোর রোগা, কালো, বিষণ্ন-গম্ভীর ছেলেটাকে মনে পড়েছে, যে কোনওদিন ভালো জামাকাপড় আর নতুন বইপত্তর পায়নি, যে মাঝে মাঝেই বাড়িতে থাকে না। কারা যেন ওকে রাত্তিরে আলকাতরার টিন হাতে ঘুরতে দেখেছে, ওর পড়বার টেবিলে উজ্জ্বল লাল কভারে আগুনে বই দেখে চমকে উঠেছিলি। ওর আয়নায় তোর অনেকদূরে মোমবাতির কাঁপা আলোয় গুপ্তবৈঠক আর বনেজঙ্গলে পলাতক জীবনকে দেখতে পাস। তাই ওকে সমীহ করিস। এখন কি তোর ওর জন্যে ভয় হচ্ছে?

টিফিনের সময় ওরা ম্যানেজারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল, ছাঁটাইয়ের খড়্গ নামছে তোদের

অফিসেও। অটোমেশন। তুই চুপচাপ ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়েছিলি ওদের সঙ্গে। মাথার ভেতরে অনন্ত শূন্যতা। হয়তো এবার পেটেও বাসা বাঁধবে।

বাস অন্য রাস্তায় ফিরছে। কলেজ স্ট্রিটে নাকি কাদের সঙ্গে কাদের গোলমাল হয়েছে, পুলিশ গুলি চালিয়েছে। ছ জন ফিনিশ। 'তাজ্জব ব্যাপার! একদিকে পুলিশ মারছে ছেলেগুলোকে, অন্যদিকে নিজেদের মাথা নিজেরাই ভাঙছিস! এইজন্যে তো...কে যেন বলল, কে যেন বলল, সারিবদ্ধ মুখের মিছিলে তাকে চেনা গেল না।

মোড়টায় কারা যেন পোস্টার মেরে গেছে—'পদ্মার বুকে আজ মেকং-এর ঢেউ।' তোর কেমন যেন লাগল। পুরোনো প্রেমিকাকে তিরিশ বছর পরে দেখলে যেমন লাগে।

রাস্তাটা অন্ধকার। রেডিওতে উপনির্বাচনের ফল বলছে, তুই শুনতে পাচ্ছিস? ও দিক থেকে একটা মোটর আসছে, তার আলো হলদে বাড়িটার দেওয়ালে আটকে গিয়ে কোনও মহিলার নেতৃত্বে এই দেশে যেন সমাজতন্ত্র এসে গেছে এই খবরটা দিতে না দিতেই কে যেন ফিসফিস করে পাশ দিয়ে বলে গেল—'পুলিশ ঘিরেছে পাড়াটা। সার্চ করছে।' সঙ্গে সঙ্গেই দুটো কালো গম্ভীর চোখ মনে পড়ল। বুকের রক্তগুলো কি জমাট বেঁধে গেল? গাড়ি থেকে কারা যেন এসে বুকের ওপর নল ঠেকিয়ে বলল—'হ্যান্ডস্ আপ।'

কী করবি তোরা? হাত তুলবি না বন্দুক কেড়ে নিবি? □

অভিজ্ঞান

অসীম ত্রিবেদী

বান্টির নাম বান্টি।

বান্টি নামের জুতো হয়, সেলুন হয়েছে, বান্টি-ছাপ গেঞ্জি পাওয়া যায়, বান্টি নামের বিড়ির বান্ডিল এখনও হয় কি না কে জানে, তবে বান্টি নামের—বলাই বাহুল্য—মানুষও হয়। যেমন কিনা আমাদের বান্টি। যেমন কিনা ওর দিদি লালি কিংবা মা জলি—জলি নামের সেলুন, জলি মার্কা বিড়ি, আবার জননীও। যেমন কিনা চার্লি চ্যাপলিনের কলা ও শৈলী জুতোর কালিতে নেমে এসেছে, ম্যাডোনার মুখ ঢেকেছে সুটিং-শার্টিং—ওইরকমই। এখন আমাদের বান্টির নাম নান্টি-রান্টি-মান্টিও হতে পারত—মাঝে নয় হসন্তের ছুঁই-চলে যাই ধ্বনিতে ঠুনুঠুনু মজা থাকে কিংবা, কিংবা আবার বান্টির দুই বন্ধু রকি আর গোগোর মতো ক-য়ে আর গ-য়ে ধাক্কা ধাক্কা ভাবও হতেই পারত। তা আইস পাঠক। কোনও বান্টি প্রজাতীয় মনুষ্যের অর্থবিচার করি।

মালিকানা ফ্ল্যাটের রাস্তার দিকের ঝুলবারান্দা, তিনতলার ঝুলবারান্দা থেকে নীচে তাকাল বান্টি—ও তো নীচে তাকাতে খুব ভালোবাসে। সিনেমায় দেখা গ্রীবাভঙ্গির বিনোদনে বান্টি কেমন একটা দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় : চারপাশে এলোমেলো কিছু দোতলা-তেতলা বাড়ি, তাদের ঘের করে আছে বেশিরভাগই একতলা আর সকলকে সাঁড়াশির মতো ঠেসে রয়েছে টালি কি খাপরার ঝুপড়ি—যতদূর, যতদূর চোখ যায়। আসলে কারখানা থেকে দূরে, রেললাইনের এ পারে শহরের এ দিকটায় নতুন গ্যাঞ্জাম উঠেছে। রাস্তার ও পিঠে ঝলমলে বিউটি পার্লারের পাশেই টিনের চালের ধূসর মুদিখানা, তো এ পিঠে অহঙ্কারী ফ্রিজ, ভিসিপি, টিভির দোকানের ঘাড়ের উপরই পান-সিগারেট, তরি-তরকারি মায় একের ভেতর আট কি দশ দশ কারবারের গুমটি। একটায় আরেকটায় এত অমিল, রাস্তায় এ পিঠ ও পিঠে এত বেশি সব উলটোপালটা যে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে সে ভাগ কখনও মেলে না : তা আইস পাঠক এ রূপ শহরের রূপবিচার করি।

ঝুলবারান্দা থেকে ভেতর আসে বান্টি। বান্টির পায়ে পায়ে আমরাও। ঘরে বান্টির বাবা লিখছেন। বাবা এই তো সে দিন দৈনিক পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হলেন। টেবিলে কাগজ, বান্টির বাবার বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে টোকায় টোকায় নাচছে সিগারেট, নাচছে ধোঁয়া, ওর বাবার ডান পাঞ্জায় কলম—পরিচিত দৃশ্য। সিগারেটে তিনি টান দিলেন, মাথা দুলল। আবার টান দিলেন, মাথা দু দিকে দোলে—হ্যাঁ-ও হতে পারে না-ও হতে পারে দেখে বান্টি ককিয়ে ওঠে :

বাব্বি তুমি মাদ্রাসি স্টাইলে মাথা দোলাচ্ছ, লেখা হয়নি?

হয়েছে ডিয়ারি, একটু হেব্বি হয়ে গেছে।

হেব্বি! কেন গো?

হেব্বি মানে বুঝলি ল্যাঙ্গুয়েজটা, আ মিন, শক্ত শক্ত হয়ে গেছে।

তা হলে একটু পাতলা করে দাও।

তাই তো ভাবছি—একটু জল মিশিয়ে দি বল? নইলে পাবলিক খাবে না। বান্টির বাবা টেবিলে কাগজের উপর ঝুঁকে এলেন। পাবলিকের খাবার এবং হজম করবার যোগ্যমাপের জল মেশাতে লাগলেন শক্ত করে ফেলা গদ্যে। কাল পাঠক খাবে।

বান্টি নিজের ঘরে এসে—গত বছর ওর দিদি লিলির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে এ ঘরটা গোটাগুটি বান্টির হয়ে গেছে—ভিসিপি-তে সাম্প্রতিকতম রক্-এর ক্যাসেট চাপায়। আহ্ দারুণ। গান, নাচ, সঙ্গে নমস্কারি

শরীর। বান্টির ক্লাস টেন হল। আজ রোববার। নো স্কুলবাস, নো রেডি-স্টেডি টেনশন। সোফায় গা এলিয়ে গান-নাচ-শরীর এবং নিজের ভেতর কুলকুল বয়ে যাওয়া আনন্দের প্রতি মনোযোগী সময়ে আচমকা ও ঘর, পাশের ঘর—মায়ের ঘর থেকে ঝনঝন কাপ কি প্লেট ভাঙার একেবারে বেতালা শব্দ হল। বান্টি দ্রুত উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজালো প্রথমে, তারপর ভিসিপি-র ভলিউম খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে ফিরে ফের বসে। কেননা, এরপর মায়ের ঘর থেকে এমন প্যানপেনে সব শব্দ শুরু হবে—ওফ্ ডিসগাস্টিং!

ও ঘরে পাশের ঘরে তা হলে বান্টির মা, জননী আছেন! কেন যে আছেন কে জানে! তিন বছর হল পক্ষাঘাতে পঙ্গু। বাড়িতে থাকলে মাঝেমধ্যেই মায়ের অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ এ ফ্ল্যাটের বাতাস ভারী করে। দিদি লালি বিয়ের পর পর একবার বাবাকে বলেওছিল মাকে কোথাও কোনও ক্লিনিক্যাল হোমে-টোমে রাখা যায় কি না। বাবা বলেছিলেন—বলিস কী! তোর মা আমার লক্ষ্মী। সেই কবে থেকে কাগজে ঘসটাচ্ছি—বিয়ের পরপরই না পার্মানেন্ট স্টাফ হলাম। তারপর থেকে টুক টুক করে এতদূর তো এগোলাম ঠিক। তোর মা আমার লক্ষ্মী রে।

তার মানে লক্ষ্মী—তা সে পাথরের কি মাটির লক্ষ্মী হোক বা হাড়-মাংসের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর বসত ঘরে। মাও ঘরে থেকে গেল। মায়ের জন্যে সারাক্ষণের মেয়ে চম্পা—চাঁপা আছে। তা ছাড়া রান্নাবান্নার রামুদা—রামচন্দ্র। লালি কিন্তু বাবার এই সব বিরক্তিকর কুসংস্কারে ততোধিক বিরক্ত হয়ে বাপের বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছে। বান্টির বাবা অবশ্য ইদানীং বলেছেন যে, এই ফ্ল্যাটকে দেশলাই খোল নয়, একেবারে আনকোরা সাজানো বাংলো করে দেবে কোম্পানি! সেখানে না হয় মায়ের জন্যে একটা আউট হাউস গোছের কিছু করা হবে যাতে মায়ের একটানা করুণ ভনভনানিতে লোকটা জনটা কি বাড়ির কারও কোনও অসুবিধে না হয়। তখন বান্টি বন্ধুদের নিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দেবে। স্টিরিওয় রক-র‍্যাপ কিংবা মেটাল চাপিয়ে স্কিপিং, ফ্রিহ্যান্ড, ইযোগা......

বাবা কাগজ কোম্পানীর দেওয়া নতুন মারুতি জিপসি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই মৃত্যুঞ্জয়কাকু ওরফে ম্যাটি আঙ্কল আসেন। বাবার মুখে শোনা মানে, বান্টির বাবা গল্প করেছিলেন যে, মৃত্যুঞ্জয়কাকুকে ছেলেবেলায বাবা এবং আর বন্ধুরা মাতা বলে ডাকতেন। এদান্তে অবিশ্যি মাতার জায়গা নিয়েছে ম্যাটি—কবে থেকে ভগায় জানে। অর্থাৎ কিনা অতীব অর্থবহ মৃত্যুঞ্জয়-এ জল মিশিয়ে কালে কালে দেশি ম্যাতা থেকে বিশ্বজনীন ম্যাটি—হাই ম্যাটি।

ম্যাটি আঙ্কল আসতে ভিসিপি-র শব্দব্রহ্ম এ-টা নীচের দিকে কমিয়ে আনতেই হয় কেননা আঙ্কল এ বাড়ির কাছের মানুষ। এবং সফল মানুষ। সত্তর দশকে বাঁ হাতটি কনুই থেকে খুইয়েছেন। বান্টিদের ছেলেবেলায় ফুলহাতা জামা পরে বাঁ হাতটি পিঠের দিকে সলজ্জে গুঁজে রাখতেন যাতে কারও সহজে চোখে না পড়ে, মনে না ধরে স্বপ্ন দেখার, ভাঙার আবার দেখার সে বর্ণাঢ্য বিষাদের বৃত্তান্ত। এখন কিন্তু বান্টির ম্যাটি আঙ্কল সাধারণতই হাফহাতা না পাঞ্জাবি না টি-শার্ট ধরনের কী যেন একটা পরেন। সত্তরের তাড়াহুড়োয় কোনওমতে কেটে জোড়া এবং সেলাই করা ঢেউখেলানো কনুইটা পেছন থেকে সামনে এসে গেছে; আধহাতি বাঁ-হাত আগিয়েই রাখা থাকে বিজ্ঞাপনের মতো—অ্যা-অ্যাই দ্যাখ, বিপ্লবের জন্যে আমার আত্মত্যাগের বহর দ্যাখ! পুরো আধগোছ হাত পাঞ্জা সমেত উচ্ছুগ্যু করেছি। তোমরা কতটুকু জানো আমাদের?

বান্টির ছেলেবেলায় আঙ্কলকে খুব বড়ো দেখাত, খুব উঁচু। বান্টি অনেকটা নিচু থেকে দেখত ঘাড় তুলে। পরে বান্টি বড়ো হতে হতে এখন আঙ্কল সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে যত উপরে মেঘ ছুঁই ছুঁই ততই বান্টি উচ্চতায় তার আঙ্কলকে ধরে ফেলেছে। প্রায় ধরে ফেলেছে। আঙ্কল আই আই টি-র উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন, হিরের টুকরো ছেলে—হিরের টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলি............

বান্টির ম্যাটি অ্যাঙ্কলের ফ্রিডম প্রমটার্স অ্যান্ড ডেভোলপার্স—ফ্রিডম মানে স্বাধীনতার চেয়েও উজ্জ্বল। আঙ্কলের এক জন্মদিনের পার্টিই চলে তিনরাত্তিরব্যাপী। তেরাত্তির ফিসুর-ফাসুর কীর্তন। আমন্ত্রিতের তালিকায় স্বাধীনতার উজ্জ্বল সমস্ত রত্ন সমাবেশ—কবি প্লাস মন্ত্রী ইন্টু এলাকার দাদা ডিভাইডেড বাই ইনকাম ট্যাক্সের এমনকি কচি-কাঁচা ইন্সপেক্টররাও মাইনাস নিজের অফিসের কেরানি পিওন ইন্টু জনগণ : সরল কর। নিমন্ত্রিত

রত্নগুলি তরল শীতল উষ্ণ কঠিন সবরকমের স্বাধীনতা পানভোজন করবেন, আবার শেষে ছাঁদা বেঁধে নিয়েও যাবেন এক এক প্যাকেট স্বাধীনতা।

ম্যাটি আঙ্কল সম্বন্ধে আমাদের বান্টির কেমন একটা খচখচে অস্বস্তি থেকেই গেছে সেই কবে থেকে! বান্টির তখন ক্লাস সেভেন। সবে ওর মায়ের সেরিব্রাল আক্রমণটি হয়েছে। শীতকাল। বান্টিকে মাস্টারমশাই পড়াচ্ছিলেন। এই পড়তে পড়তেই ক্লাস সেভেনের বান্টির কী যেন কি হয়—মানুষের এই এক আশ্চর্য বোধ শক্তি। মাস্টারমশায়ের কথা, পাশের ঘরে অসুস্থ মায়ের গলার ঘড়ঘড়ে শব্দ, রান্নাঘরে রামুদার হাতা-খুন্তির আওয়াজ ছাপিয়ে বান্টির মনে হয় এ ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তে সবকিছু ঠিকঠাক যেমনকে তেমন নেই—কী যেন একটা নেই। বান্টি মাস্টারমশাইকে 'আসছি' বলে বসিয়ে রেখে বেড়াল পায়ে সিঁড়ির কাছে এসে একটুখানি দাঁড়িয়েই বুঝে ফেলে কী নেই। বাড়িতে দিদি রয়েছে, ম্যাটি আঙ্কল অনেকক্ষণ এসেছেন কিন্তু ওদের কোনও শব্দ নেই। গম্ভীর সিঁড়ি দিয়ে নেমে বান্টি বাবার ঘরের জানলার পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা যে মৃদু ধ্বনি কানে শুনতে পায় তা এত অচেনা, এতটাই অস্বাভাবিক ওর কাছে যে, ওর মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ারে কে যেন সঙ্কেত পাঠায় এবং এক আঙুলে নিঃশব্দে পর্দা সরিয়েই বান্টি এক অসহনীয় দৃশ্য দেখে ফেলে। বাবার বেতের চেয়ারে আঙ্কল, আঙ্কলের কোলে দিদি। আপন দিদির গাওয়া ঘি রঙের গোপন দুটি নরম গণ্ডের একটি আঙ্কলের থাবায় বন্দি। কেননা, আঙ্কলের একটি হাতই তো জ্যান্ত খালি। তারপর আঙ্কলের ঠোঁটে সিগারেট, রবীন্দ্রনাথের গান—সিগারেট নাচে, মাছির মতো, ভুনভুনে রবীন্দ্রনাথ নাচে; দিদির স্কার্ট-ব্লাউজের হুকেও রবীন্দ্রনাথ, উলের জ্যাকেটের বোতামেও রবীন্দ্রনাথ—অতি তরল করে আনা কী একরকমের রবীন্দ্রসঙ্গীত তা বান্টির বোধগম্য ছিল না। তবে সেই স্মৃতি বান্টির ছায়ায় ছায়ায় অনেকদিন সঙ্গে সঙ্গে চলে। আজও তার রেশ রয়ে গেছে বলেই আঙ্কলের গলা পাওয়া মাত্র ভুরু কুঁচকে যায়। পরে, বান্টির এখন তো ক্লাস টেন. ভ্রূ সরল হয়ে আসে সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের উত্তরের মতো।

আঙ্কল হাজির হয়েই হইহই করে কথা বলেন যাতে বান্টির মা শুনতে পান। ওর মা সশব্দে গুঙিয়ে ওঠেন যাতে আঙ্কল শুনতে পান। তারপর আঙ্কল আরও উচ্চ কণ্ঠে বান্টির কাছে ওর মায়ের খবরাখবর জানতে চান, লালির খবরও। হঠাৎ দ্রুত পায়ে বান্টির মায়ের ঘরের দরজায় পৌঁছে উল্লাসের গলায় প্রশ্ন করেন : হাই বেবি! কী খবর?

বান্টির মা আরও করুণ গলায় কী যেন ঘড়ঘড়ে উত্তর দেন বান্টি বুঝতেও পারে না। খালি আঙ্কলকে একটানা বলে যেতে শোনে : আরে নো প্রব্লেম! চিয়ার আপ বেবি। আমরা তো আছি।

বান্টি যেটা একেবারেই জানে না তা হল এই যে, দরজায় একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। এতে ওর মা খুব খুশি এবং সেই একটা মানুষকে মা নিজের বেদনার গভীর তলের দিকে টেনে নিতে চাইছেন। আর সেই মানুষটা কিছুতেই গভীরে যাবেন না, হালকা জলে এলোপাতাড়ি খেলতে লেগেছেন। একসময় খেলার ক্ষান্তি দিয়ে মানুষটি আবার বান্টির ঘরে এসে আঙ্কল হয়ে যান।

—আঙ্কল, তোমার চোখমুখ কীরকম দেখাচ্ছে যেন।

—কীরকম বাডি?

—কীরকম ফুলোফুলো চোখ, শুকনো মুখ—তোমার কি শরীর খারাপ?

আমার যে কি খারাপ!—আঙ্কল দার্শনিক হয়ে যান।

বান্টি এ সময় র‍্যাপের তালে কোমর দোলায়, পিটি করে—টো টুগেদার, টো টুগেদার হপ্ হপ্ হপ্.....

—কেন আঙ্কল, কি হল?

কাল রাশিয়াটার গেল।

টো টুগেদার টো টুগেদার, হপ্ হপ্ হপ্........কোথায় গেল?

—গোল্লায় রে গোল্লায়! সবাই মিলে—লেনিন, স্ট্যালিন আর এই ব্লাডি গ্লাসনস্ত্—পরশ্রীকাতরতায় মিলে রাশিয়াকে ডুবিয়ে ছাড়ল।

লেনিনকে জানে বান্টি। বলশেভিক নেতা, ইতিহাস বইতে আছে, মাথায় টাক—তবে স্ট্যালিনকে ঠিক

জানে না, ছবি দেখেছে রাস্তার দেওয়ালে—গোঁফের ছবিটা মনে পড়ে। কিন্তু বান্টি এখন ওয়ার্মআপ এক্সারসাইজগুলো করছে নাচের মুদ্রায়, ওর মনের পর্দাজুড়ে এখন মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনা—মাইকেল জ্যাকসনের মাথায় বান্টি লেনিনের টাক বসানোর চেষ্টা করে, বসে না—টো টুগেদার, টো টুগেদার—ম্যাডোনার মুখে তো স্টালিনের গোঁফ সেট করতেই পারে না—হপ্ হপ্ হপ্.........ধুস্! র‍্যাপের আওয়াজ একটু বাড়ায় বান্টি—ধুস্! আঙ্কল আঁতলেমি করছে!

—কাল জানিস সারা রাত ঘুম হয়নি।

—কেন?

সব স্বপ্ন শেষ মাই ডিয়ার! স্বপ্ন ছাড়া কী নিয়ে—ক্লান্ত আঙ্কল উদাসীন হাতে বান্টির পড়ার টেবিল থেকে তেলতেলে বিদেশি পত্রিকা হাতে তুলে আনেন। সোফায় ধুপ করে দেহ ছেড়ে দেন। তারপর পত্রিকার প্রচ্ছদেই উলঙ্গ রমণীর উদার শরীরের বাজারের গ্যেটেই থমকে যান। অবশেষে পত্রিকা দেখা শেষ হলে সেটি টেবিলে আছড়ে ফেললেন : ধুস্! ফালতু সব।

এই আছড়ানোয়, এই ধুসে কিংবা ফালতুতে রাগ আছে অথচ রাগ নেই। আঙ্কলের কঠিন কঠিন রাগে এই লম্বা দু দশকে কতবার কত রকমের জল মিশিয়ে জল করা হয়েছে সে রহস্য বান্টির অজানা—তার কোমর দোলে, দোলে সকল অঙ্গ এবং একই জায়গায় সে হাত-পা ছোড়ে : টো টুগেদার টো টুগেদার.........

শেষ বিকেলের বিষণ্ণ রোদ দরজা গলে কাত হয়ে শুয়ে আছে বান্টির মায়ের ঘরের মেঝেয়। তাঁকে একটু আগে চম্পা—চম্পা বোস প্রস্রাব করিয়ে দিয়ে গেছে। বাইরে বিকেলের বয়স বাড়ছে, দিনেরও ছায়ায় ভাগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ঘরে তো এই বিকেলের রৌদ্রটুকু আসে, ঘন ঘন চাঁপা আসে, কখনো-সখনো একটা চামচিকে ঢুকে পড়ে, আর নীচের পথ থেকে ছুটে এসে ধাক্কা মারে পথচলিতি গাড়িঘোড়ার উৎকট ধ্বনিসমূহ। আর কিছু না। আজ অবিশ্যি ঠাকুরপো দরজার কাছে এসেছিল। এ ঘরটা বান্টির মায়ের মোটে পছন্দ না। এ ঘরে মৃত্যুর ফিস-ফাস চলাফেরা আছে। দশ বছরটাক আগে এ ঘরেই শ্বশুরমশাই মারা গিয়েছিলেন। আবার চার বছর আগে, এই তো সে দিন যেন, শাশুড়িও এ ঘরেই শেষবারের মতো বাতাস নিয়েছিলেন। ভারী বাতাস। ক'দিন ধরে কেন কে জানে বড্ড শাশুড়ির মুখটা মনে পড়ছে তাঁর। শাশুড়ি যে রাতে যান—সন্ধে থেকে শ্বাস টানছিলেন—সে রাতে পাশের ঘরে তখন বান্টি আর লালি একমনে গভীর রাতের হিন্দি ছবি দেখছিল টিভিতে। বারণ করেননি বান্টির মা—আহা! বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটো, কী আর বুঝবে শোকতাপের, জীবন তো পড়েই থাকল, দুঃখ শোক কত বার কত রূপে আসবে, এখন শুনুকগে দু-একটা ভাল-মন্দ গান, ভুলে থাকুক—আহা! এ ঘরে সে সময় শাশুড়ির বুকের হাপরে শেষ শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা।

এখন পাশের ঘর নিঃশব্দ, বান্টি কোথায়, ভাবলেন মা, ঘুমুচ্ছে কি? কে জানে? টেপডেক আর ভিসিপিটা বান্টির আবদারেই তো কেনা। ওব বড়ো শখের জিনিস। আচমকা খোলা দরজার ফাঁকে মেঝেতে লম্বা ছায়া দ্রুত সরে যেতে দেখেই—কে? কে রে? জড়ানো গলা বান্টির মায়ের।

ছায়া বলে : আমি, কেন?

—ও বান্টি? শোন্, শোন্ না।

ছায়া দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হয়—বলো।

—একটু এখানে আয় না রে—মা হাত বাড়ান।

—আমার কাজ আছে। ব্যাডমিন্টন ক্লাবে যাব।

—সে যাবিখন। ভেতরে আয়। —খাটের কিনারে বিপদসীমা ছুঁয়ে বান্টিব মা আর তাঁর বাড়ানো দু হাত।

—ধুস্। আমার টাইম নেই। বান্টি ফড়কে সরে গিয়ে ফের ছায়া হয়ে যায় এবং ছায়াও ছিটকে যায় দ্রুত।

বান্টির মা দু হাত বাড়াতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে খাট থেকে মেঝেয় পড়ে যান। মাথার পেছনটাই সরাসরি পড়েছে আছড়ে। গোঙানি শুরু হতেই বান্টি টেপডেকে রক চাপায়—রক অত

জোর ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ শুনে চাঁপা ছুটতে ছুটতে এসে দেখে নাক দিয়ে গ্যাঁজলা মেশানো রক্ত আর গোনে গলায় গোঙানির শব্দ। চাঁপা, ভীত চম্পা পাঁজাকোলা করে বান্টির মাকে বিছানায় তুলে শোওয়ায়। তারপর দৌড়ে পাশের ঘরে যায়—ছোটোবাবু, দিদিমণির অবস্থা খুব খারাপ।

—তার আমি কী করব? ডাক্তারকে ফোন করো গে।

—তুমি করো না ছোটো—

—শাট আপ?

চাঁপা ডাক্তারবাবুকে ফোন করে। রামদার দায়িত্বে দিদিমণিকে সঁপে বান্টির বাবাকে ফোন করে। বান্টির বাবা সব কাজ, হাফ কাপ কফি এবং আধপ্লেট চিকেন পকোড়া ফেলে ছুটে আসেন। তিনি এসে লালিকে ফোন করেন। লালি বিউটি পার্লার থেকে মুখে অসমাপ্ত মাসাজ নিয়ে ছুটে আসে। তারপর ওরা সকলে একত্রিত হলেন অনেকদিন পর। এ ঘরে এলেন—পুরো পরিবার, ছোটো পরিবার—সুখী পরিবার। ডাক্তার বললেন, আর কোনও আশা নেই। বলেই হাতে নল গেঁথে দিলেন, নাকে নল পুরে দিয়ে হাত ধুয়ে মুছলেন। ফিজটা বুঝে নিয়ে পাখি হয়ে গেলেন।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে বান্টির মায়ের মস্তিষ্কে খানিক সাড় ফিরে আসে। তিনি নিঃশব্দে চোখ খোলেন। প্রথমটায় জগৎ সংসার—তাঁর সংসার—ঝাপসা, কুয়াশামাখা; শেষে খুব ধীরে ছোট্ট চারপাশ স্পষ্ট হয়। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে কিসের বাজনা, বেজেই চলেছে। আর তাঁকে ঘিরে, স্পষ্ট দেখতে পান তিনি তিনটে উদ্‌গ্রীব, উৎসুক, আশায় উজ্জ্বল মুখ। তিনজোড়া চোখে ঝিলকে উঠছে সন্ধ্যার বর্ণাঢ্য চিতা। দূরে দরজার কাছে আরও কারা দুজন দাঁড়িয়ে আছে যেন—এত দূর, এত অস্পষ্ট যে বোঝা যায় না তাদের মুখচোখ। না, কাছের এই তিনজন মানুষের মুখেচোখে মাখা ঝলমলে আশার ঘামতেল মোছা যায় না। এদের আশায় ছাই দিয়ে বাঁচার ইচ্ছে জাগে না আর বান্টির মায়ের, তাঁরা মাথাটি এদের আশ্বস্ত করে শেষবারের মতো ঢলে পড়ে একপাশে, ওফ্ মা!

রামচন্দ্র ও চম্পা বোঝে যে, এ বাড়িতে আর ক্লিনিকাল হোম কিংবা আউটহাউস আলোচিত হবে না। তাদের চোখের সামনে এই ছোটো পরিবারের একজন মৃত ও তিনজন জীবিত মানুষ নিঃসাড়ে শুয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরের পৃথিবীতে তখন অন্ধকার উপুড় করা রাত্রি এগিয়ে আসছে শব্দহীন। পাশের ঘর থেকে কখনও বন্ধ না হওয়া রকের বাজনা ও গানের কথা সুর এ ঘরে প্রবেশ করেছিল। এখনকার শব্দহীনতার তীব্রতর সে সব কথা ও সুর মৃত এবং জীবিতদের অস্থিতে প্রবেশ করে, মজ্জায় প্রবেশ করে।

এবং কী আশ্চর্য! চম্পা ও রামচন্দ্র নামের দুটি মানুষের চোখের সামনে ছোটো ও সুখী পরিবারের একজন মৃত ও তিনজন জীবিত মাটির প্রতিমা গলতে শুরু করে। গলে গলে জল হয়ে যেতে থাকে........

আর চম্পা এবং রামচন্দ্রের মুখের বাইরে ও ভেতরে দু ধরনের জল জড়ো হয়, মুখের বাইরের দিকে চোখ বেয়ে, গাল বেয়ে জলের ধারা; আর মুখগহ্বরে জমা হতে থাকে ঘন পেছল জল—থুতু।

সে থুতু বাইরে ফেলা হয় না। ফেললে বুম্ শব্দে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। উড়ে যাবে এই শহর। □

স্বর্গের পাখিরা

জগন্নাথ প্রামাণিক

আজকাল আর উত্তেজনাটা তেমনভাবে শরীরের ভেতর, স্নায়ুর কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে না, অথচ, উত্তেজনাটা ঠিক দুটো বাজলে, শিশুর ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতোই, শরীরে ও মনে নাচতে থাকে, এই বুঝি দীপঙ্কর এল। দীপঙ্করের আসাটা যদিও নিশ্চিত নয়। দীপঙ্কর প্রতিদিন আসে না। আসে, মাঝে মাঝে, তবে ঠিক দুটোয়, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দুটো বাজলে। আর এইজন্যেই জয়ার আড়ষ্টতায়—ভয়ে ভয়ে দুপুরবেলাটা কোনধার দিয়ে চলে যায়!

দীপঙ্কর যখন আসে, তখন সুমিতাভ অফিসে, ছেলেমেয়ে স্কুলে। ছেলেমেয়ে মানে টুকাই এবং তিন্নি। টুকাই আট আর তিন্নি পাঁচ। থ্রি এবং ওয়ান।

সুমিতাভই প্রথম এনেছিল দীপঙ্করকে। সুমিতাভর থাউজেন্ড সিসি মারুতি থেকে নেমে সোজা হেঁটে এসেছিল দীপঙ্কর সুমিতাভর সঙ্গে তাদের ফ্ল্যাটে। এতটুকু আড়ষ্টতা, লজ্জাবোধ বা সঙ্কোচ লক্ষ করেনি জয়া দীপঙ্করের চোখেমুখে। এমনকি প্রথম দিন ওদের বাড়িতে এসে দীপঙ্কর জয়াকে নাম ধরে তুমি সম্বোধন করে ডাকতেও। জয়া বিস্মিত হয়েছিল। বিস্মিত হয়নি সুমিতাভ। আসলে সুমিতাভ মানুষটাই মানুষের কাছে বড়ো অচেনা-অজানা, জয়া হাসে। হাসির গভীরে লুকিয়ে থাকে দুঃখ, যন্ত্রণা ও ক্রোধের প্রতিচ্ছবি। জীবনে কোনওদিন নীচের দিকে তাকাল না সুমিতাভ. চোখ দুটো ভগবান যে কীভাবে দিয়েছিল ওকে, কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ওর বোধ, বুদ্ধি, বিবেক, ভেবে কুলকিনারা পায় না জয়া। কতবার জয়া বলেছে, দেখো, আমার সন্দেহ হয় সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যা বাজারে গিয়ে জিনিস কম কিনে পয়সা চুরি করে। তুমি দু-একদিন গিয়ে দেখ না। এভাবে দিন দিন চুরি আমার ভালো লাগে না। সুমিতাভ, ধুর। ক টাকার বাজারে ক পয়সা আর বাঁচাবে। কাজের মেয়েকে এভাবে সন্দেহ করা উচিত নয়। আজকাল প্রত্যেকটি জিনিসের দাম হুহু করে বাড়ছে। তা ছাড়া ওবও তো হাতখরচ বলে কিছু আছে।

– কেন, হাতখরচের জন্যে আমরা কি ওকে টাকা দিই না?

–ক টাকা দাও?

—একটাকা, দু টাকা, যখন যা চায়।

– ওতে আবার হয় নাকি।

--তবে কি প্রতিদিন দশ টাকা বিশ টাকা দিতে হবে?

—না, তা নয়—

—তবে—

—ও সব ছোটোখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামিও না তো, ওতে নিচুতাই প্রকাশ পায়।

—তুমি তো চিরকাল উদাসীনভাবেই সব কিছু দেখলে। এই যে দীপঙ্কর হুটহাট আমাদের বাড়িতে আসে..........

—আসে তো কী হয়েছে, দীপঙ্কর তোমার বাপের বাড়ির, আই মিন, দেশের লোক। তোমার সঙ্গে পড়েছে......

—পড়েছে তো কী হয়েছে?

—হবে আবার কী। বন্ধুর মতো...........

—তোমার সন্দেহ হয় না?

—কেন সন্দেহ হবে। অতটা ছোটো করে আমাকে দেখো না।

—তুমি তো চিরটা কাল সবাইকে বড়ো করেই ভেবে গেলে। জয়া ঠোঁটের কোণে হাসি বিছিয়ে দেয়।

সুমিতাভ হাসে, সে হাসিতে স্নিগ্ধতা মাখানো এক ধরনের আত্মতৃপ্তি, যে আত্মতৃপ্তিতে একজন স্বামী একজন স্ত্রীকে, এবং একজন স্ত্রী একজন স্বামীকে গভীরভাবে নিঃসঙ্কোচে, নিঃসন্দেহে ভালোবেসে যেতে পারে, নির্ভর করতে পারে একে অন্যের ওপর। কিন্তু তা কি সত্যি। জয়া তো জানে এই উদারতার গভীরে সুমিতাভর মধ্যে লুকিয়ে আছে কোনও এক গোপন অভিসন্ধির বীজ।

একচিলতে উঠোনে বেলফুলের তিনটি ঝাড় থেকে সদ্যফোটা কয়েকটা ফুলের স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে খেলা করতে থাকে জয়ার। জয়া এলো চুল খোঁপা করে, দু-একটা ফুল ঝাড় থেকে তুলে মাথার খোঁপায় গুঁজে রাখে। এই বেলফুলের ওপর চিরকালের দুর্বলতা জয়ার। তার বাপের বাড়ি চন্দনপুকুরে বেল আর জবার ছড়াছড়ি। ন-পিসিমা বেল ফুল দিয়ে এ বেলা ও বেলা কৃষ্ণের পুজো করেন। বারো বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে আসার পর থেকে একমাত্র কৃষ্ণই জীবনের নির্ভরশীলতা, এ কথা পিসিমা যৌবনের প্রারম্ভেই বুঝে নিয়েছিলেন। তাই জীবনের সবকিছুকে তুচ্ছ করে কৃষ্ণকে সখা, প্রিয়, বঁধূয়া এই সম্বোধনে ভূষিত করে আপন হৃদয়ে স্থান দেন। পিসিমা এখন বয়োবৃদ্ধা। চোখে কম দেখেন। কানে কম শোনেন।

দীপঙ্কর ছন্নছাড়া, যুক্তিবাদী এবং ভীষণ বেহিসেবি। পৃথিবীর কোনও কিছুই তার হিসেবের মধ্যে থাকে না। জীবনে কোনওদিন স্কুল, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড না হওয়া ছেলে কেরিয়ারের দিকে তাকাল না। কলেজে অনার্সের ক্লাস যখন জমে উঠেছে, তার সঙ্গে প্রেমও, হঠাৎ ডুব মারল দীপঙ্কর। টানা তিনমাস। সেই সময়ের দিনগুলো যে কী অসহ্য যন্ত্রণায় কেটেছে তার তা জয়া এখনও ভাবলে শিউরে ওঠে। কলেজের দরজা প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল যদি না সুমিতাভ পাশে এসে দাঁড়াত। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার জন্যে সেই সময়, জয়ার ভালোভাবেই মনে পড়ে, পাড়ায় পাড়ায় লাশ, কাশীপুরে গণহত্যা, সরোজ দত্তকে খুন করে ময়দানে ফেলে দেওয়া, বাড়িতে বাড়িতে পুলিশের চিরুনি তল্লাশি, রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারিদের ভারী বুটের শব্দ। দেশকে শোষণ থেকে মুক্ত করার, বুর্জোয়াদের একচ্ছত্র অধিকারকে গণ-অধিকারে পরিণত করার জন্যে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের মুখে স্লোগান—'চিনের নেতা আমাদের নেতা' 'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'। দীপঙ্করের সঙ্গে এ নিয়ে কতবার কতরকম তকাতর্কি হয়েছিল তার। সে দীপঙ্করকে বলত, হিংসার রাজনীতি ছাড়ো। হিংসার রাজনীতিকে আমি সমর্থন করি না।

—হিংসার রাজনীতি মানে?

—এই যে তোমরা, তোমাদের পার্টি মানুষ খুন করছে, এটা কি অন্যায় নয়? পাপ বা হিংসা নয়?

—না, অন্যায় নয়। হিংসা তো নয়ই। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে ক্ষুদ্রস্বার্থকে চিরকালই উপেক্ষা করতে হয়। এতে কোনও পাপ বা হিংসা থাকে না।

—তার মানে এই নয়, নিরীহ মানুষদের কুকুর ছাগলের মতো মেরে ফেলা।

—আমরা যাদের মারি তারা মোটেই নিরীহ নয় ম্যাডাম। তারা এক একটি দানব, শোষক। দেশীয় সম্পদকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে, অর্থের পাহাড় সাজিয়ে ভোগবিলাসে জীবন ভাসায়। নিরীহ, অশিক্ষিত, গরিবদের শ্রমের মূল্য দেয় না। তাদের মানুষই ভাবে না। শোষণ করে।

জয়া মাথা নিচু করে থাকে। সে জানে সে কোনও দিনও দীপঙ্করের সঙ্গে তর্কে পারবে না। তার স্বপ্নের পৃথিবী দু চোখের রং হারায়। ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। তবু দীপঙ্করকে সে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চায়। কারণ দীপঙ্কর যে তার ভোরের বাতাস, অন্ধকারের ঐশ্বর্য, হৃদয়ের পদ্মরাগমণি। বুক দিয়ে গভীর হতাশা ও দুঃখের নিশ্বাস বেরিয়ে আসে জয়ার। রথী খুন হওয়ার পর, আনন্দ ও অজিতেশ তার পিছনে লেগেছিল ছিনে জোঁকের মতো। ইউনিয়ন ইলেকশনে জেতার পর অজিতেশের সাহস বেড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণভাবে। সরাসরি অ্যাপ্রোচ—চল মাইরি দিঘা ঘুরে আসি। তোকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। শরীরটা

মাইরি বানিয়েছিস পাকা আপেলের মতো। কতরকমের কুৎসিত ইঙ্গিত। সে সময় সুমিতাভই বাঁচিয়ে দিয়েছিল তাকে।

—পিং পিং পিং। ডোরবেল বেজে ওঠে। ইলেকট্রনিক কোয়ার্জে এখন দুপুর দুটো। জয়া জানে কে আসছে। তাই ব্যস্ততা তেমনভাবে নাড়ায় না। আস্তে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খোলে। দীপঙ্কর ঘরে ঢোকে। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং নির্লিপ্তভাবে।

—একটু চা করো। কিছু খাবার থাকলে দিও। নিচু গলায় বলে দীপঙ্কর।

—কেন অফিসে আজ কি টিফিন করনি? বাড়িতে লাঞ্চ?

—বাড়ি? বাড়ির কথায় দীপঙ্কর হেসে ওঠে। সে হাসিটা ভীষণ গভীর এবং তাৎপর্যময়। যার মধ্যে হ্যাঁ বা না খুঁজতে যাওয়া জয়ার মূর্খামি ব্যতীত আর কিছুই নয়। তা ছাড়া, এখন বাড়ি বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলে দীপঙ্কর কথার জালে জড়িয়ে এমন কিছু বলবে, যাতে জয়াকে অপ্রস্তুত হতে হবে। দোষী অপরাধীর মতো মাথা নিচু করতে হবে।

চা করে, প্লেটে চা এবং কিছু স্ন্যাকস দিয়ে দীপঙ্করের সামনে ধরে দেয় জয়া। দীপঙ্কর চা খেতে খেতে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু জয়ার মুখের দিকে। যে চাহনিতে মানুষ ভুলে যায় সবকিছু। সমাজ-সংসার-সংস্কার। থাকে শুধু চাওয়া-পাওয়া। দীপঙ্কর চাইলে হয়তো পেয়েও যেতে পারে জয়ার কাছ থেকে অনেক কিছু। কিন্তু দীপঙ্কর কিছুই চায় না। তাই ধীরে ধীরে তার চোখের চাহনিটা ক্রমশ ম্লান হতে হতে একসময় মিলিয়ে যায় দুপুরের হেলেপড়া রোদের মতো। জয়া ছটফট করে। যন্ত্রণায়, তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। জয়া প্রাণহীন পাথরের মতোই নিজেকে লুকিয়ে রাখে নিজের মধ্যেই।

কতবার জয়া ভেবেছে সে সোজাসুজি দীপঙ্করকে বলে দেবে, সে যেন সুমিতাভর অবর্তমানে এরকম দুপুরবেলা হুটহাট করে না আসে। এতে তার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, সাংসারিক শান্তিও। কিন্তু শত চেষ্টা করেও জয়া দীপঙ্করের মুখের ওপর কিছু বলতে পারে না। বলতে গেলেই কে যেন তার ঠোঁট চেপে ধরে। আসলে জয়ার ভেতরে যে আর এক জয়া আছে সে দীপঙ্করকে খুব আত্মিকভাবেই চায় এবং ঠিক এ সময়ে, আপন করে। জীবনের প্রথম যৌবনে যেভাবে চেয়েছিল।

স্বর্গের পাখিরা উড়ে যাচ্ছে ডানা মেলে, সাদা ঘোড়া কালো ঘোড়া ছুটছে কেশর দুলিয়ে। দৈত্যটা হাসছে হো-হো-হো করে। দিগন্ত প্রসারিত তার দাঁত। চোখ জ্বলছে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো। বিশ্রী কুৎসিত খণ্ড খণ্ড নারকীয় স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যেতেই জয়া ধড়ফড় করে উঠে বসে বিছানায়। আচ্ছন্ন জয়া চোখ মেলে দেখে, সুমিতাভ ঘুমিয়ে আছে পাশে। মৃদু নাক ডাকছে। সুমিতাভর পাশে তিন্নি। টুকাইয়ের সেক্স গ্রো করছে। অতএব সে আর তাদের সঙ্গে শোয় না। টুকাই ঘুমায় পাশের ঘরে। সেই ঘরেই নীচে বিছানা পেতে শোয় সন্ধ্যা। দরজা হাট করে খোলাই থাকে। বিছানায় বসেই ও ঘরের দিকে তাকায় জয়া। না কোনও সাড়াশব্দ নেই। অঘোরে ঘুমচ্ছে সব। শুধু পাঁচে পাখা থাকায়, পাখার শব্দ হচ্ছে বনবন। দেওয়ালের দিকে সামান্য মাথা তুলে আবার তাকায় জয়া। অজন্তা কোয়ার্জে সময়ের সঙ্কেত। রাত দুটো।

সেই দুটো। কেন ঘুম ভাঙল দুটোর সময়? দুটো না হয়ে তিনটে হল না কেন? দুটোকে যে তার ভীষণ ভয়। জীবনের যা কিছু সুখ-স্বাদ, বেঁচে থাকার আনন্দ-উচ্ছ্বাস এই দুটোতেই নিহিত ছিল। যা তাকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে দিয়েছে। মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে নানান প্রশ্নের। যুক্তি ও তর্কের।

জয়া বুঝতে পারছে তার মাথা ধরেছে। মৃদু মৃদু পেন হচ্ছে। এখন একটা পেনকিলার না খেলেই নয়। বাড়তে দিলে অসহ্য হয়ে উঠবে। পেনটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে মস্তিষ্কে, স্নায়ুর কোষে কোষে। তখন আর একটা পেনকিলারে হবে না। পর পর দু-তিনটে পেনকিলার না খেলে মাথার যন্ত্রণাটা বাড়তে থাকবে ক্রমশ।

নিঃশব্দে জয়া নেমে আসে বিছানা থেকে। ডাইনিং টেবিলের ওপর জগ থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে, তার পাশে রাখা একটা নোভালোজিন বের করে, পট করে স্ট্রিপ থেকে খসিয়ে গলায় ফেলে জল দিয়ে গিলে নেয়। তারপর জলের গ্লাসটা মুহূর্তে নিঃশেষ করে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

চারদিকে নৈঃশব্দ্য। তাদের এই 'আশাতরী' হাউজিং কমপ্লেক্সের ব্যালকনি থেকে সীমাহীন আকাশটাকে বড়ো সুন্দর, বড়ো মায়াবী দেখায়। মনে হয় আকাশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্রগুলি যেন এক একটি অশরীরী আত্মা। হাজার হাজার বছর ধরে তারা নির্বাসনে থেকে দীপ্ত চোখে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের সীমাহীন লোভ আর আকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার দিয়ে চলেছে। যতদিন যাচ্ছে, লাগামহীন মানুষের ভোগ আর লালসা যেন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতোই বেড়ে চলেছে। এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মুখেই মুখোশ। বাইরে আর ভেতরে কোনও সাযুজ্য নেই। যেমন সুমিতাভ।

পাশের ফাঁকা মাঠটা থেকে একটা দমকা হাওয়া চোখে-মুখে এসে আছড়ে পড়ে জয়ার। জয়া বুক ভরে সেই হাওয়া নাক মুখ দিয়ে টেনে নিয়ে ফুসফুসে চালান করে দেয়। তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে মুখ দিয়ে মৃদু শব্দ করে—আহ্। ঠিক তখনই একটা ভয়ঙ্কর অগ্নিপিণ্ড চোখের সামনেই এসে নাচ করতে থাকে। জয়া সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। জ্ঞান ফেরে পরের দিন নার্সিংহোমে।

পৃথিবীতে এত আলো, এত জ্যোৎস্না, কিন্তু জয়ার চোখমুখ অন্ধকারের প্রতিমূর্তি। জীবনে নিস্পৃহতায় জয়া এখন মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি।

সে কী চেয়েছিল? কী চেয়েছিল দীপঙ্কর? সুমিতাভই বা কী চায়? আজ আর জয়া কিছু চায় না। তার চাওয়া-পাওয়া অনেকদিন আগেই অস্তমিত হয়ে গেছে। এখন সে শুধু চায় শান্তি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, অশান্তির, অতৃপ্তির একটি অন্ধকার বলয় তৈরি হচ্ছে তার আশেপাশে। এই বলয়ের চারধারে সে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে। যে দিন সে সুমিতাভর সৃষ্টি করা বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, সে দিনই তার প্রকৃত মুক্তি। কিন্তু সে মুক্তি বোধ হয় আর তার জীবনে আসবে না।

সুমিতাভ মানুষ না পিশাচ! পৈশাচিকতা সুমিতাভর রক্তের শিরায় শিরায়। সংসারে, নিজের অফিসে, এমনভাবে ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকে, যা দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না মানুষটি ভেতরে সংগোপনে লুকিয়ে রেখেছে এক নারকীয় দানবকে। আর দীপঙ্কর—দীপঙ্কর আর যাই হোক, তার মধ্যে আদর্শ, সততা, মানবিকতা, মূল্যবোধ কোনও কিছুরই অভাব নেই। বরঞ্চ বেশি বেশি করে বিরাজমান। দীপঙ্করের এই দুর্বলতাগুলিকে কী সুন্দর নিপুণভাবে দিনের পর দিন সুমিতাভ সুকৌশলে ভদ্রতার মোড়কে মুড়ে স্লো পয়জন করে যাচ্ছে। অর্থ, নাম, যশ, প্রতিপত্তির জন্যে কী না করতে পারে সুমিতাভ। সুমিতাভকে এ নিয়ে যখনই প্রশ্ন করেছে জয়া, সুমিতাভ সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। কখনও কখনও তীব্র বিরক্তিভাব মুখে ফুটিয়ে বলেছে, ও সব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না তো। ও সব তুমি কিছু বুঝবে না।

—কী হবে তোমার অত টাকায়?

—টাকা, টাকা কোথায় আবার? বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হলেই কি মানুষের প্রচুর টাকা হয়ে যায়?

—তবে আর কী চাও তুমি?

—আমি তো কিছুই চাই না।

—তবে কেন নিত্যদিন নতুন নতুন পৈশাচিকতায় নিজেকে এভাবে শেষ করছ? শেষ করছ সংসারটাকে?

সুমিতাভ জোরে হো হো করে হাসে। ভয়ঙ্কর বীভৎস—কুৎসিত সে হাসি।

জয়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সুমিতাভর সেই কুৎসিত হাসি আর দৃষ্টিশক্তির বৃত্তের পরিধিতে। দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করে।

'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'—এই চিন্তা ও ভাবধারায় ভাবিত দীপঙ্কর যে মানবিক আদর্শকে মাথায় নিয়ে কলেজ ছেড়েছিল, ফিরে এসেছিল এক বুক হতাশা আর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে, ফিরে এসে দেখেছিল চতুর্দিকে লোভ আর প্রলোভন।

তার বিয়ের ঠিক পর পরই, একদিন হঠাৎ ধর্মতলায় দেখা হয়েছিল দীপঙ্করের সঙ্গে। বাস ধরার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে। কী বিশ্রী চেহারা হয়েছে দীপঙ্করের। রোগা, চাপ চাপ এক মুখ দাড়ি। বহুদিনের তেলহীন ঝোপজঙ্গলের মতো রুক্ষ চুল, দু চোখ কোটরাগত, ফরসা রংও চেপে গেছে অনেকখানি। পরনে চিমটি

কাটলে ময়লা উঠবে এমন একটা ট্রাউজার ও শার্ট। কিন্তু কোটরাগত চোখেও হাজার পাওয়ার বাল্বের জ্যোতি। দীপঙ্কররা যে সত্যিকারের বিপ্লব চেয়েছিল সে দিন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল সে।

সামান্য দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছিল সে। চেঁচিয়ে ডেকেছিল—দীপঙ্করদা।

তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই, একরকম ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। কিছু ভণিতা না করে তার সিঁথির দিকে একপলক দৃষ্টিপাত করে, ঠোঁটে একটা সমাধানহীন হাসি বুলিয়ে বলেছিল, বাঃ, বিয়ে করে ফেলেছ দেখছি। ভালোই করেছ। তারপর কী বলবে বল? কেন আমাকে ডাকলে চটপট—কুইক। একদম হাতে সময় নেই। বাবা পুলিশ লাগিয়েছে। আমাকে খুঁজছে পুলিশ। তার চোখে তখন জল এসে যাওয়ার উপক্রম। সে বলেছিল, তুমি ও পথ থেকে ফিরে এসো দীপুদা। আর এই রাখো কার্ডটা। পারলে একদিন বাড়িতে এসো।

কী মনে হয়েছিল কে জানে। জয়ার দু চোখে চোখ রেখে দীপঙ্কর বলেছিল, তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক হবে। দলে ভাঙন ধরেছে। বহু আদর্শহীন লোক ঢুকে পড়েছে। শুধু ক্ষমতা আর স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এভাবে বিপ্লব হয় না। বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন নেই। সব নিশ্চুপ, নীরব। ওরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করল, অথচ আমাদের.......

তারপর একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, চেষ্টা করব কথা রাখার। বলেই, একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়েছিল।

দীপঙ্করের বাবা শুভঙ্কর চক্রবর্তী, দু-দুবারের এক্স এম এল এ। বিশাল সম্পত্তির মালিক এবং বড়োবাজারে লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী। তার পক্ষে দীপঙ্করকে বের করা এবং পুনরায় মূলস্রোতে (দীপঙ্করের বাবার ভাবনায় ও যুক্তিতে) ফিবিয়ে এনে পুনরায় কলেজে ভর্তি করানো অসম্ভব হয়ে ওঠেনি। শুধু কিছু বেগ পেতে হয়েছিল, এই যা। একমাত্র ছেলে কলেজ ছেড়ে পার্টিতে নাম লেখাতেই তিনি দেশের সব পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ছেলের সব কিছু বদ খেয়াল দূর করে ব্যবসায়ী করবেন। দীপঙ্কর এখন ব্যবসায়ী। এক্সপোর্টার। ডালহৌসিতে অফিস করেছে।

কিন্তু সত্যিই কি দীপঙ্করের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে? পেরেছে কি দীপঙ্কর সব কিছু বিসর্জন দিতে। কই, কোনও দিনও তো, তার জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু জয়ী (জয়াকে জয়ী বলে ডাকত দীপঙ্কর) -কে সে নীচে নামাতে পারেনি। জয়া ভাবে, বরং সে রক্ত-মাংসের মানবী, দিনের পর দিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হেরে গেছে। সুমিতাভ কী ?? জয়া তা জানে। আর জানে বলেই সে বড়ো বেশি প্রতিহিংসাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল সুমিতাভর প্রতি। সে যেন নিছকই এক খেলনা সুমিতাভর। যখন যেভাবে ইচ্ছা সুমিতাভ খেলাতে চায়, খেলতে চায় জয়াকে নিয়ে। পি আ., ও, প্রযোজক, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা—সবারই কাছে জয়া খুব দামি ক্যাপিটাল সুমিতাভর। যেহেতু দীপঙ্কর এখন, বাবার মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবসা দেবে সুমিতাভকে, শুধু তাই নয়, দীপঙ্করের দুর্বল স্থান কোথায়, জানার পরই সুমিতাভ এক নতুন খেলায় মত্ত হয়েছে দীপঙ্করকে নিয়ে। কিন্তু দীপঙ্কর, দীপঙ্কর যে বড়ো বেশি আপন তার, সে তো চায় অন্য কিছু তার জয়ীর কাছে। সে জন্য দিন দিন দীপঙ্কর কেমন পালটে যাচ্ছে। আর দীপঙ্করের পালটে যাওয়াটাই জয়াকে পাগল করে দিচ্ছে দিনের পর দিন। দীপঙ্কর যদি রক্তমাংসের খেলায় জড়িয়ে ফেলতে পারত তাকে, তা হলে হয়তো হাওয়ার স্রোত বইত অন্যদিকে। একদিন, বহুদিন যা দীপঙ্কর চেয়েছিল, স্কুলে, কলেজে, তার কাছ থেকে, কিন্তু দ্বিধায় হোক, লজ্জায় হোক, আর শালীনতাতেই হোক জয়া তা দিতে পারেনি দীপঙ্করকে। তারপর ঘটে গেল অঘটন, আর সেই অঘটনের সুযোগ গ্রহণ করল সুমিতাভ। একসময় দীপঙ্কর এবং সে স্বর্গের পাখি হতে চেয়েছিল। একদিন তারা দুজনে কলেজ পালিয়ে বেড়োতে গিয়েছিল ময়দানে। নীলাকাশ, ম্লানরোদ্দুর, আর স্নিগ্ধ বাতাসে কবিত্ব ঝরে পড়েছিল দীপঙ্করের কণ্ঠে। দীপঙ্কর চোখ বুজে আবৃত্তি করেছিল—'আকাশে দু-হাত মেলে একদিন/ উড়ে যাব/ স্বর্গের পাখিদের দেশে/যেখানে থাকবে না/লোভ হিংসা-দ্বেষ/সমাজের ভয়/ঠোঁটে ঠোঁট রেখে...........'

—এই মুখটা একটু বাড়াও না। দীপঙ্কর মাথা ধরে টানবার চেষ্টা করে।

—না মশায়, আজ না। তোমার জিনিস তোমারই তোলা রইল। দেখছ না, লোকগুলো কেমন করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

—তুমি না—

—কী?

—কী আবার, একটা পাখি।

—হ্যাঁ, আমরা দুজনেই স্বর্গের পাখি। উড়ে যাব স্বর্গে।

দুজনেই তারা হো হো করে হেসে উঠেছিল ময়দানের ঘাসে বসে। তখন বিকেলের শেষ রোদ্দুর হিন্দুস্থান বিল্ডিং, টাটা সেন্টার, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনালের টিভির অ্যান্টেনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল নীলাকাশে। রাতচরা পাখিরা ডানায় ভর করে বেরিয়ে পড়েছিল নিজেদের গোপন আস্তানা থেকে। সেই সব খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি জয়ার মনে পড়লে জয়া পাগল হয়ে যায়। যন্ত্রণায় শরীর ছিঁড়ে যায়। বুকে ব্যথা হয়।

কিন্তু সুমিতাভও তো এরকম ছিল না? সহজ সরল গরিব ঘরের মেধাবী সুমিতাভ তখন ছিল অন্যরকম। অন্তত জয়া তাই ভাবত। আর সেই ভাবনাতেই সে সুমিতাভকে জীবনসঙ্গী করেছিল। তা হলে সুমিতাভব এই নিম্নগামিতার জন্যে কি পরোক্ষে সেই দায়ি? সেও তো একদিন চেয়েছিল বাড়ি-গাড়ি, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য। পরোক্ষে মদতও জুগিয়েছিল। তবে কেন আজ তার এত হীনম্মন্যতা। জয়া ভাবে। জয়া ভাবে, তা হলে তার এবং তাদের জীবনে দীপঙ্করের উপস্থিতিই কি সব কিছু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য দায়ি। নাকি অন্য কিছু? যে লোলুপ পিশাচ পুরুষটি সুমিতাভর ভেতরে লুকিয়েছিল, সন্তর্পণে বাড়ছিল দিনের পর দিন, সুযোগ খুঁজছিল বহিঃপ্রকাশের? জয়া যত ভাবে, মাথার মধ্যে ভাবনার পোকারা তত জাল বিস্তার করে, সেই জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে জয়াকে।

—ম্যাডাম, ওষুধটা খেয়ে নিন।

জয়া ওষুধ হাতে নেয়। দেখে ভ্যালিয়াম। ওষুধ খাবার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব হয়। জয়া বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বেডের ওপর। আচ্ছন্নতায় শরীর শিথিল হয়। চোখ বুজে আসে। চোখ বুজতেই জয়া দেখতে পায় সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্ররা উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের পাখিদের মতো ডানা গজিয়েছে সবাই পাখি হয়ে গেছে। সব পাখি উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। স্বর্গের দেশে। ঘোড়া ছুটছে। সাদা ঘোড়া—কালো গোড়া—লাল ঘোড়া—নীল ঘোড়া। ঘোড়া কি নীল হয়? কে যেন ফিসফিসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলে—হয় হয়। সব হয়। বিষ পান করে শিব কি নীলকণ্ঠ হননি?

মাঝে মাঝে ব্যস্ত সুমিতাভ ছেলেমেয়েকে নিয়ে নার্সিং হোমে জয়াকে দেখতে আসে। পাশে বসে চোখেমুখে হাত বুলিয়ে দেয়। চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল, তোমার জন্যে টুকাই-তিন্নির মন খুব খারাপ। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা থেকে চলে যায়। কিন্তু সে আসে না।

গভীর রাতে ওষুধের অ্যাকশন কেটে গেলে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে গেলে জয়া বিশাল কাচের জানলা খুলে আকাশ দেখে। দূরে হুইশেল দিতে দিতে যান্ত্রিক গর্জন করতে করতে ট্রেন ছুটে যায়। রাতচরা পাখিরা ডানায় অন্ধকার মেখে কোথায় যেন চলে যায় দিন দিন, জয়ার মনে হয় পাখিরা কত সুখী। তার ভীষণ কান্না পায়। সে দু চোখে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে। সকাল-সন্ধে-দুপুর-রাতে সে অপেক্ষা করে থাকে, দশটা-বারোটা-একটা-দুটো-তিনটে-চারটে বাজে, ঘড়ির কাঁটা পুরো বৃত্তটাই পরিক্রমণ করে ফেলে। একদিন, দু দিন নয়, প্রতিদিনই, রোজ রোজ। কিন্তু সে আসে না। জয়া ভাবে তবে কি দীপঙ্কর স্বর্গের পাখি হয়ে গেল? তাদের তো দুজনেরই স্বর্গের পাখি হওয়ার কথা ছিল। □

ডাইন

অমর মিত্র

সূচনা

ভর সন্ধেয় নদীর ধারে ডাইন ঘুরে বেড়ায়। গাঁযে তাই রটেছে। পলাতক হরি নায়েকের বউটা ডাইন হয়ে যাচ্ছে। রূপ খুলেছে তার। এই অ্যাত্তখানি সিঁদুর ধেবড়ে আছে কপালে আর সিঁথিতে। লাল পেড়ে শাড়ি, পা ভর্তি আলতা নিয়ে নায়েকের বউটা সুবর্ণরেখার চবে ঘুরে বেড়ায়। হাতের প্রদীপ অন্ধকাবে তারার মতো দেখায়!

মন্দ লোকে কুকথা বলে। আর সত্যি কথাই যদি বসালো হয় তো সর্ব মানুষ সুখ পায়। কথার রসে জিভে স্বাদ আসে। ভালোমন্দেব বিচার হয় না।

বড়ো রসালো খবর হয়েছে হরি নায়েকের বউটা। একটা বিশ-পঁচিশ বছরের সোমত্ত যুবতী বদলে যাচ্ছে। চরিত্রে বিক্ষেপ এসেছে তাব। এত বড়ো খবর এই অঞ্চলে ইদানীং বড়ো হয় না। তাই মুখে মুখে কানে কানে সব ছয়লাপ। পুলিশেও শুনেছে। কেননা হরি নায়েক সংক্রান্ত যাবতীয় খবরেই পুলিশের কান।

—এই হচ্ছে নেতা, দু দিন পালাতেই বউযেব চবিত্র বদলে যায়, ঘবেব বউ ঠিক করতে পারে না আবাব দেশ ঠিক করতে যায়।

থানার মেজবাবু বত্রিশ দাঁত বাব করে হাউ হাউ হাসতে থাকেন। হ্যাঁ, তাঁর হাসাটা ঠিক এই রকমেব। দূব থেকে শুনলে মনে হবে কেউ যেন কাঁদছে। মেজবাবুব কাছে এই পৃথিবীটা শোকের। এটা বোধ হয় বিশ বছব পুলিশে চাকবি করার ফলাফল।

রাত গহীনে গাঁয়ে এখনও শিযাল উঁকিঝুঁকি মারে। দিনের আলোয চেনা যায় না। হরি নায়েকের বউয়ের খোঁজে আছে শিয়ালগুলো।

—বুঝলে হে দাঁতপাঠ, কাল বাতি নায়েকের বউটো মোব জানলা দিয়া উঁকি মারছিল। শতপথীবাবু পান চিবুতে চিবুতে বলেন।

—কী রকম কী করম?

—সেটি এক বিভ্রান্ত বটে, যোবতী মেয়ামানুষ, লজ্জা, লজ্জা। তা নায়েক নিজেই গোলমেলে মানুষ, বউটো কী করি ভালো হয়।

হ্যাঁ, বড়ো গোলমেলে মানুষ এই হবি নায়েক। ইয়া পুরুষ, কালো মেঘের মতো মানুষ। বুকের ছাতি নয় যেন মেঘ করা আকাশ। চোখ দুটো অঙ্গারের দুই টুকরো যেন। গালে পাতলা ফিনফিনে দাড়ি। লোকে বলে নায়েক যদি শক্ত করে মাটিতে পা রেখে দাঁড়ায় তো সাধ্য কাব যে সেই উরু একটুও সরায়। এই ভাবনাটি অবশ্য এসেছে একটি রঙিন হিন্দি চিত্র হতে। রামায়ণ কাহিনী। রাবণের রাজসভায় অঙ্গদ। উরু স্থাপন করেছে মহাবিক্রমে। সে উরু কাঁপায় কোন রাক্ষসের সাধ্য।

এহেন হরি নায়েক তাবড় তাবড় মানুষের দুঃস্বপ্ন। হরি নায়েকের ভয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে হয় শতপথী মহাপাত্রদের। গোলমালটা কী রকম?

হরি নায়েকের মাথায় যেন কী আছে। সবটাই গোলমেলে। কেননা পৈতৃক চার বিঘে জমি চষে আর অন্য বাবুদের জমি ভাগে চাষ কবে তার দিন বেশ চলে যেত এই পৃথিবীতে। সে কারণে পৃথিবীনামিত

এই গ্রহের মানচিত্রে অপরিস্ফুট গোপীনাথপুর থানার ১৪৫ নম্বর জুরিসডিকশন লিস্টের মৌজা কীর্তনিয়াশোল নিয়ে ভদ্রসজ্জন বাবুমহোদয়েরা এত তিতবিরক্ত হতেন না। শুধু কীর্তনিয়াশোল কেন। এর চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা মায় বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলার বাবুমহোদয়েরাও এই হরি নায়েকের নাম শুনে সারিডন খেতে বাধ্য হন।

কেননা হরি নায়েক এই অঞ্চলে প্রচলিত যাবতীয় প্রথাকে অস্বীকার করে। এই প্রথাগুলি ঐতিহ্যময় এবং বাবুদের জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত। ভদ্রসজ্জন মানুষের জীবনের সঙ্গে অন্যান্য ইতরজনের জীবনও যেহেতু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সে কারণে প্রথাগুলি এই অঞ্চলের সর্বমানুষের জীবন ও জন্ম জড়িয়ে।

প্রথা কম নয়। যেমন বসন্তে গাঁ উজাড় হয়ে যাওয়ার সময়ে ধুমধাম সহকারে শীতলা ঠাকুরানীমাতার অর্চনা। সময়-অসময়ে অষ্টপ্রহর, ষোড়শপ্রহর, কৃষ্ণনাম, টুসু পরব, করম পরব থেকে বারো মাসে তেরো দুগুণে ছাব্বিশ পরব। যদিও এগুলি সুপ্রচলিত, তবুও হরি নায়েকের চোখ এই প্রথাগুলিকে অস্বীকার করতে পারে না। সে বরং.একটি হাস্যকর কাজ করে। যে যে প্রথাগুলিকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করে হরি নায়েক সেগুলি কাগজে কলমে সরকারি খাতায় পুরোপুরি অ্যাবলিশড্। কিন্তু কাগজ কলমের সরকারি নিয়মের বাইরেই পৃথিবী, হরি নায়েকেব কীর্তনীয়াশোল এবং তার আশপাশের মৌজাগুলি।

সুতরাং কাগজ কলমের সঙ্গে বাস্তব অবস্থাকে মিলিয়ে দিতে গেলেই রব ওঠে। বাবুমানুষেরা যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন। এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও খেপে ওঠে। হচ্ছেটা কী?

সত্যিই এটা কী রকম! সরকারি আইন মতে এই সেচ এলাকায় পুরো একটি পরিবার জমি রাখতে পারে বাহান্ন বিঘের মতো। তিনি যদি তাঁর বাড়ির মুনিষ এবং বাগাল ছেলেটাকে কিছু জমি দান করেন বা জামাইয়ের নামে জমি কেনেন তো কারওর কিছু বলার নেই। কেননা 'দান' এই শব্দটি এ দেশীয় সমাজ-সভ্যতার একটি মূল্যবান অঙ্গ। আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। হরি নায়েক এই অধিকাবে হস্তক্ষেপ কবে। তার উর্বর মস্তিষ্ক যাবতীয় গোলমালের সূত্র।

সে বলে এটি দান নয়, বেনাম। অধিক জমি রাখার কৌশল। দলবল নিয়ে সে ধান কাটতে যায়। জমি দখল করতে চায়। অথচ বাড়ির মুনিষ বা জামাইয়ের নামে জমি রাখা একটি ঐতিহ্যময় প্রথা। সরকারি অফিসগুলিও তা জানে। এই পদ্ধতিতে জমি অর্থাৎ পৃথিবী ভোগ করা বাবুদিগের অধিকার।

এই চাকে ঢিল মেরে কয়েকজন পাগলাটে সরকারি অফিসার রীতিমত ভিমরুলের তাড়ায় দূর অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে চাকরি বাঁচিয়েছেন। তাঁবা আদপেই এসব কাজের যোগ্য ছিলেন না। বাবুরাও তাই বলেন। কেননা আবহমানকাল যে সব প্রথা চলে আসছে তাকে ববণ করে নেওয়াব ভিতরেই স্বাভাবিকতার লক্ষণ। মরা নদীর বালি সরিয়ে তাকে আবার প্রবহমান করে তোলার ভিতরে স্বাভাবিকতা নেই, অন্তত তাঁদের জীবনে প্রচলিত অভিধান যা বলে। হরি নায়েক অভিধানের শব্দ বদলে দিতে চায়। এ কারণে সে একটি স্বাভাবিক মানুষ। অসুস্থতা তার মাথায়। এবং এই অসুস্থতার জন্যই তার যাবতীয় কুখ্যাতি।

দাতা এবং গ্রহীতার সম্পর্ক ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন। সুদ দেওয়া এবং নেওয়া এ দেশে একটি সুপ্রচলিত প্রথা। সুদ দিতে হয় কেননা তিনি ধার দেন। তিনি ধার দেন বলেই আমাদের ইহজীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং তাঁর যাবতীয় শর্ত আমাদের পূরণ করে চলতে হয়। এই ঈশ্বর করুণা করেন, করুণা করেন এই আশায় যেন আমরা ঈশ্বর নামক দেহী এবং বিদেহীর ভজনা করি।

হরি নায়েক গরিবগুরবো একেবারে মাটিতে বুক ঘষটে চলা মানুষগুলোকে নিয়ে দল পাকায়। তাদের মাটিতে দু পায়ে দাঁড়াতে শেখায়। শিখিয়ে বলে সুদ দেওয়া বা নেওয়ার জন্য মানুষের জন্ম নয়।

তেমনই জমির ব্যাপারেও হরি নায়েক মানুষগুলোকে সঙ্গে নেয়। বলে, আপাতত আইন কানুনই মানুন বাবুমশায়রা, বাড়িতে লুকোনো জমি আমাদের দিন। আমরা খেয়ে বাঁচি। অন্যের নামে জমি রেখে সেই জমির ধান নিজের খামারে তোলা সরকারি নিয়ম নয়।

এটা বেনিয়মও নয়। তা হলে সমস্ত মানুষের চর্মচক্ষুর সামনে এই প্রথা বহুকাল চলতে পারত না। গোলমেলে অনেক প্রথাই তো ব্যবহার হতে হতে নিয়ম হয়ে যায়। সেই নিয়মে মানুষের বংশগত অধিকার জন্মে যায়। অনন্তকালের সেই অধিকারে হরি নায়েকের হস্তক্ষেপে বাবুগণ সত্যিই বিরক্ত। কিন্তু মুখে সেই বিরক্তি প্রকাশে সাহস করেন না। হরি নায়েকের ভয় আছে।

সে এখনও পলাতক। তার বউটা এই সময় দুশ্চরিত্রা ডাইন হয়ে যাচ্ছে। ভর সন্ধেয় সুবর্ণরেখার বালুচরে প্রদীপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এ সব হয় কেন? তা হলে হরি নায়েকের জীবনের গভীরে ঢুকতে হয়।

২

এই হরি নায়েক যেমন বাবুদের কাছে অস্বস্তি তেমনই গরিবগুরবো হাড়-হাভাতে মানুষের কাছে ঈশ্বরপ্রতিম। বছর-সাত আট আগের কথা। সত্তর একাত্তর সাল হবে বোধ হয়। পুরো গোপীনাথপুর থানা হরি নায়েকের ভয়ে ঠক ঠক করছে। হরি নায়েক তখন হয়েছে শ্রীহরি।

শ্রীহরি ভগবান। ভগবান এই কারণে যে, আমাদের বিশ্বাস ভগবানই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মানুষের জীবন-মৃত্যু তাঁব ইচ্ছা। একদিন হরি নায়েকে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করত। হরি নায়েক মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত করে দিত। একেবারে চিত্রগুপ্তের খাতা নিয়ে বসেছিল সে। পৃথিবীতে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসেব করত। মানুষে ছড়া বেঁধেছিল—

রাখে হরি মারে কে?
মারে হরি রাখে কে?

গোপীনাথপুব থানা হরি নায়েকের ভয়ে কাঁপে। বাবুগণ হরি নায়েকের ভয়ে দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন। তাঁদের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে বিষয়টি মিলে যায়। এইভাবে আস্তে আস্তে জমি দখল হয়ে গেল। বাবুরা আদিপ্রথা ছাড়তে বাধ্য হলেন। যাঁরা একটু অন্যরকম হতে গেলেন, পার পেলেন না। হরি নায়েক মানুষের ছায়া দেখে তাঁর স্বভাব বলতে পারে।

বউ তার রূপসি। তার মাথায় এক মেঘ চুলে, তার কোমল দুই চক্ষুতে, দেহের রেখায় রেখায় বন্য সৌন্দর্য। হরি নায়েক যেন বউযের গা থেকে বুনো ফুলের গন্ধ পায়। সৌন্দর্য তো সকলের প্রিয়। হবি নায়েকের আবার তাতে অহেতুক প্রীতি। সব সুন্দর হবে। মানুষ-সহ পৃথিবী হয়ে উঠবে অপরূপ। সে কারণেই জমি দখল। বাবুগণের অধিকৃত প্রথাব হাত তোলা। বউকে সে মাঝে মধ্যেই বলে, যেমন তুই তেমনি হবে জগৎ।

এমনই বন্য। মাটি আর বনজ বৃক্ষের গন্ধমাথা দুর্দম সুন্দর। বউ তো এ সব শুনেও কথা বলে না। তার মাথায় এ সব ঢোকে না। তার রূপের অহঙ্কার আছে অন্তত গাঁয়ের মানুষ যা বলে। রূপের গুমরে নাকি তার পা পড়ে না মাটিতে। সে বড় নিশ্চুপ। কথা নেই মুখে। হাসির শব্দ শোনে না কেউ। পায়ের শব্দ কই?

নায়েক সকলের মাথাব্যথা। বউয়ের তাতে কী হয়! সে থাকে তার মতো, নায়েক নায়েকের মতো। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাঁরা একটু অসুস্থ তাঁরা সমস্তটা অ্যানালিসিস করে নায়েকের দোষ খুঁজে পান না। কেননা জমিগুলো সত্যিই সিলিং ছাড়া। দখল হতে দোষ কোথায়? আর সুদের অত পার্সেন্টেজও হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মূলত নায়েকের বিপক্ষে। কেননা মহাপাত্র শতপথী বাবুদের জীবন রক্ষার জন্য, বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁদের জন্মবৃদ্ধি এবং চাকরিতে যোগদান। তাঁরা আইনে বিশ্বাসী। কিন্তু এই আইন সর্বত্র একই রকম প্রয়োগে ততটা তৎপর নন।

সুতরাং একাত্তর সালে হরি নায়েক অ্যারেস্ট হয়, তাকে জেলে যেতে হয়। কিন্তু প্রথম দিকে নায়েকের এই গ্রেপ্তার ও কারাগারে গমন কীতনিয়াশোল এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় পুরোনো দিন পুরোনো প্রথা ফিরিয়ে

আনতে সাহায্য করে না। বিশালদেহী হরি নায়েক ধরা পড়ার আগে মহাপাত্রবাবুর বন্দুকের তিনটে বুলেট পায়ে নিয়ে চারদিন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। কাঁধে ট্যাঙ্গির কোপ নিয়ে রাত অন্ধকারে ফিরে শতপথীবাবুর বিচার করে গ্রামবাসীর সমক্ষে। সে সকলের বিস্ময়। এমন মানুষ কে আছে যার কাঁধের ভিতরে নাকি এখনও বুলেট রয়ে গেছে। তার প্রভাব কি কম! সুতরাং নায়েক জেলে গেলেও মানুষের চেতনা যায় না। রাত অন্ধকারে বদমায়েস বাবুর ঘরের সামনে তারা চিৎকার করতেও ভোলে না, রাখে হরি মারে কে। মারে হরি রাখে কে?

বাবুরা প্রথমে নরম হন। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। একদিন তাঁদের আবার পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা পুরনো অভ্যেসে ফেরেন। সহায়তা করে প্রশাসন। কেননা এখন দেশের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি জরুরি। বাবুমহোদয়গণ দেশীয় অর্থনীতির ধারক ও বাহক। তাঁরা উন্নত প্রথায় চাষ না করলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাবে। ভূমির নয়, আসলে কৃষি সংস্কার চাই। গরিব হাড়-হাভাতেরা যে সব জমি দখল করে কর্ষণ করে, তা নিয়ে নাও। গরিব মানুষের না আছে অর্থের সংস্থান না আছে শিক্ষার আলো। তাদের দ্বারা জমি অপমানিত হয়। সুতরাং বাবুরা বেনাম জমির দখলে চলে গেলেন আবার। সুদের হার বৃদ্ধি করলেন। তাঁরা জেনেছিলেন এক মহান সত্যযুগের সূচনা হতে যাচ্ছে এ দেশে। সুতরাং এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দেশের উন্নতি সাধনই জনগণের পবিত্র কর্তব্য। আর হরি নায়েক নিশ্চিত ফিরবে না। তাঁদের ঘুম এল। ঘুমের ভিতরে এল স্বপ্ন। তাঁরা দেখলেন সুবর্ণরেখা নদীতে এক সোনার নৌকো ভেসেছে। সেই নৌকোয় তাঁরা দুলছেন। হরি নায়েক লাশ হয়ে উদোম মেঘের মতো বুক আকাশের দিকে ফিরিয়ে ভেসে যাচ্ছে স্রোতের বিপক্ষে—পশ্চিমে। তার বুকের উপর একটা ইগল। ঠুকরে খাচ্ছে হরি নায়েকের টুসটুসে যকৃত।

৩

এমনিভাবে দিন কাটলে গরিবগুরবোরা নিশ্চিত হটে যেত। দেশের সমস্ত মানুষ সম্পদশালী হয়ে উঠত অবশ্যই। কিন্তু তা হল না। যে ব্যবস্থাটা শতপথী মহাপাত্রবাবুদের কাছে জরুরি ছিল, দেশের মানুষের কাছে তা ছিল না। একদিন হরি নায়েক এল। একেবারে সুবর্ণরেখার বালিতে বালিতে হেঁটে ফিরে এল। ঠিক দুপুরবেলা শতপথীবাবু নদীর চরে চিনেবাদাম খেতের উপর দাঁড়িয়ে ভূত দেখেন। জেলে একটুও বদলায়নি। সেই দেহ সেই চোখ। রব উঠল, রাখে হরি মারে কে?

তার রূপসি বউটা তখন দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। রোজ এমনিভাবেই থাকত। বিদেশে গেছে পুরুষ মানুষ, ঠিক ফিরে আসবে।

এবার প্রশাসন নিশ্চুপ। শতপথীবাবুরাও কথা বলেন না। তাঁরা কৌশল করেছেন কীভাবে এ যাত্রায় রক্ষে পাওয়া যায়। হরি নায়েক এল, দেখল, লোকজন নিয়ে বসল রাতদুপুরে। শৃগালের প্রহর গোনা বন্ধ হল। সাপের লেজ খসে পড়ল। আগের বারে হরি নায়েকের নামে বিশেষ কোনও চার্জ ছিল না। তবু আটক রাখা হয়েছিল এত বছর। কিন্তু এখন! নায়েক মরেনি। তার দাঁত পড়েনি, চুল খসেনি, গায়ের চামড়া তেমনই টানটান। কোথাও কোনও শিথিলতা নেই। চোখ আরও জ্বলজ্বলে। বুড়ো হাড়িরাম তার বুকে মাথা রেখে যাবতীয় দুঃখের কথা বলল। কথা বলল আরও কত মানুষ বাবুগণ ভয় পেলেন।

কিন্তু মানুষের স্বভাব হল অধিকার করা। পিতৃপিতামহ তাঁদের উপর যে পবিত্র দায়ভার অর্পণ করে গেছেন তা সুষ্ঠুচিত্তে পালন করাই মনুষ্য ধর্ম। এই ভূসম্পত্তি, এই সুদের ব্যবসা এ সব রক্ষার দায়িত্ব বংশানুক্রমে তাঁদের উপরই বর্তেছে। এটাই প্রথা। আবার এ সব যেন ব্যাহত হতে চলে হরি নামেয়কের ফিরে আসায়। সব থমথমে। নায়েকের ঔদ্ধত্য বাড়ছে। বাবুরা যমের মতো ভয় করেন এই খাঁটি চাষাটিকে। নায়েক বেঁচে থাকতে এইভাবেই দিন কাটবে। অসহ্য! তাঁদের মনেও কেমন সংস্কার ঢুকে গেছে। নায়েকের মৃত্যু নেই। তিনটে বুলেট গিলে ফেলেও যে বেঁচে থাকে, টাঙ্গির কোপ নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে যে গ্রামে বিচারসভা বসায়, সে আর যা হোক মানুষ নয়। আধিভৌতিক কোনও শক্তি আছে ওর ভিতর।

কথা শোনা গেল নায়েক প্রতি অমাবস্যায় যায় চোরমুণ্ডির মহাশ্মশানে। তন্ত্র সাধনা করে। ওর ভিতরে পিশাচশক্তি ভর করেছে। ওর কপালে তেল সিঁদুরের ফোঁটা। এখন মনে হয় পিশাচ নয়, পুরুষটার উপর তার ডাইন বউটাই বোধ হয় ভর করেছিল, কী জানি, কিছু বোঝা যায় না।

এই সময় নায়েক না হয় অল্পদিনের জন্য গা ঢাকা দিয়েছে কিন্তু তার বউটা ভ্রষ্টা হয় কী করে! তার ঢলঢলে পানপাতার গড়নের মুখ, একমাথা চুল, অপরূপ চোখ যে অন্য কথা বলে। তার সম্পর্কে রটে যাওয়া কথা যে বিশ্বাস করতে ভয় হয়। তবু যা রটে তার কিছুটা বটে। মেয়ে মানুষের মন!

রাত গহীনে সুবর্ণরেখার চরে লাল শাড়ি-সিঁদুর-আলতায় বউ হেঁটে বেড়ায় তা দেখেছে সর্বজনে। দেখেছে সে চরে বসিয়ে দিচ্ছে প্রদীপ। অতবড় নদীব বালিচর। সেখানে একলা যায় কেন যুবতী বউটা? বাবুরা বলেন, সে নানান মানুষের জানলায় রাতবিরেতে উঁকি দেয়। আরও আরও অনেক কথা। তা বলা যায় না।

বউ নাকি চোরমুণ্ডির মহাশ্মশানে যায় মহারাত্রিতে। সেখান থেকে চুল এলিয়ে নদীর বালিতে দাঁড়িয়ে নাঙা হয়ে যায়। প্রেতের সঙ্গে ওর শোয়া-বসা। একেবারে ডাইন হয়ে যাওয়ার সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। দিন দিন তার রূপ ফেটে পড়ছে। প্রেতের স্পর্শ পড়েছে ও দেহে। বাবুরা মহা উত্তেজনায় ভুগছেন। এ সব নিয়ে জোর রসালাপ চলে তাঁদের ঘরে। তাঁরা অ্যাদ্দিনে একটা বিষয় পেয়েছেন যা দিয়ে হরি নায়েককে নিশ্চিত খতম করে দেওয়া যাবে। বুনো পুরুষটা বউটার গলা কেটে নিজেই গিয়ে উঠবে থানায়, এ.রকম নিশ্চিত কিছু হবে।

হরি নায়েক নিখোঁজ হয়েছে সাত-সাতটা দিন। সাত দিনেই এত কাণ্ড। নায়েক জেলে থাকার সময় বউটা কী করেছিল!

কাহিনী রচনা হয় মুখে মুখে। যার উদ্দেশ্য বউটাকে বহুবল্লভা প্রমাণ করা। বুঁড়ো হাড়িরাম বলে, নায়েক ফিরুক এর হেস্তনেস্ত হবে।

নায়েক আপাতত আত্মগোপন করেছে। কারণটা কী? না, এরসঙ্গে গোপীনাথপুর থানা বা কীতনিয়াশোল মৌজা জড়িত নয়। থানা নিরুপদ্রব থাকতে চায়। অযথা নায়েককে অ্যারেস্ট করে কোনও ডেফিনিট চার্জ দিতে না পারলে থানা বিপদেই পড়বে। রাতদুপুরে গাঁয়ে গাঁয়ে রব উঠবে : মারে হরি রাখে কে?

গোপীনাথপুর থানা এলাকা বিহারের সিংভূম জেলার পাশাপাশি। সিংভূমের গ্রামগুলির সঙ্গে কীতনিয়াশোল ও তার পাশের মৌজাগুলোর যোগ আছে। এ দিকের মানুষ ও দিকে যায় খাটতে, ধার আনতে। এ দিকের বড়মানুষ বাবুরা ও দিকে জমি রেখে পশ্চিম বাংলার জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন অক্লেশে ফাঁকি দেন। বিহারে যে আইন পশ্চিম বাংলায় তা নয়। কিন্তু জমি মাটি সব এক।

নায়েক জেলে যাওয়ার পর থেকেই এদিকের মহাপাত্র শতপথীবাবুরাও গরিব মানুষদের ধার দেওয়া বন্ধ করেছেন (এখন বোঝ মজাটা, নায়েক তো জেলে পচছে!)।

তাই গরিব মানুষ ছোটে সিংভূমের গ্রামে। গ্রামের নাম ভালুকমারা। সেখানে দাতারাম সিংয়ের কাছে ধার পাওয়া যায়। তিনি রাজপুত। শোনা যায় তাঁর পিতা রঘুনাথ সিং লোটাকম্বল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এখানে। তারপর বড়মানুষ হয়েছিলেন সুদের কারবারে। বড়ো বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর ওয়ারিশান দাতারাম সিং। নায়েকের অনুপস্থিতিতে চড়া সুদে ধার দিয়ে চাষাভুষোর খটিবাটি জমা করেছেন তাঁর ঘরে। নায়েক ফিরে সব শুনে বলল, সমস্ত ফেরত চাই।

রব উঠল, সমস্ত ফেরত চাই।

মানুষের যা যা গেছে সব ফেরত চাই। এতদিন জীবন রুদ্ধ হয়েছিল, জীবন ফেরত চাই।

দাতারাম সিং দানে অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। সুতরাং নিয়মমত সব ফেবত নেন তিনি। কেননা ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি চাই ভবিষ্যতের জন্য। তাঁর নামকরণের সার্থকতা বজায় রাখতে হবে। সুতরাং তাঁকে হতে হবে অনমনীয়। এত সহজে মাথা নোয়ালে এই জঙ্গলের ভিতর রাজা হয়ে বসতে পারতেন না। তিনি নায়েককে ভয় করেন। তবু মাথা নোয়ান না। নায়েক নাছোড়বান্দা। নায়েকের সঙ্গে কথা হয়। সব ব্যর্থ।

দাতারাম জানেন একবার যদি আত্মসমর্পণ করা হয় তো সব শেষ। আবার লোটাকাম্বল নিয়ে রাজস্থানে ফিরতে হবে। সে দেশ তিনি দেখেননি। এখানেই তাঁর জন্ম।

শেয়ে নায়েক হুঙ্কার দিয়ে ফিরে এল, ঘটি-বাটি-গহনা যা নিয়েছ, ফেরত দাও। তোমার সুদের খাতা দেখাও, হিসেব পরিষ্কার করো।

তা হয় না। এ সব হলে স্বর্গ হতে পিতার অশ্রু নামবে দাতারামের চওড়া বুকে। তাঁর ভাণ্ডার যাবে ফুরিয়ে। দান করবেন কীভাবে! সুদ আসবে কোত্থেকে?

সুতরাং আক্রান্ত হলেন দাতারাম। দুপুর দুপুর পাঁচশো মানুষ মিছিল করে এল। নায়েক দাতারামের দেহে আঘাত হেনে পাপ কবল।

রব উঠল—মারে হরি রাখে কে?

দাতারামের বন্দুক গর্জে উঠল। জঙ্গলের নিঃসীম স্তব্ধতায় ঘা পড়েছে। বেজে উঠল কাড়া-নাকাড়া। এক সময় পুলিশভ্যানের শব্দ শোনা যায় ফরেস্ট রোডে। দাতারাম উলটে পড়েছিল বারান্দার উপর। তিরে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার শরীর। নায়েক পালিয়েছে। দাতারামের লাশ তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। নায়েকের নামে ওয়ারেন্ট। এবার খুনজখম হামলার চার্জ। ধরা পড়লে শাস্তি গুরুতর। তাই তাকে লুকোতে হয়েছে।

গোটা কীতনিয়াশোল দুলছে ভয়ে। শতপথী মহাপাত্ররা নিশ্চুপ। এমন ঘটনায় তাদের শরীর ছমছম করে দিনরাত। নায়েক আবার খেপেছে। দাতারামের মতো শক্ত মানুষ এইভাবে মরল, তাঁদের আর রেহাই নেই। গোলমাল চলেছিল সন্ধে অবধি। ভর সন্ধেয় যে কোথায় পালাল লোকটা! বুঝিবা অন্ধকার হয়ে গেছে। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। গরিব মানুষ ভয়ে আছে, এই বুঝি খবর আসে নায়েক ধরা পড়েছে।

নায়েক তুমি ধরা দিও না। তুমি যদি ধরা দাও তা হলে এই কীতিনিয়াশোলের মাটি, এই সুবর্ণরেখা নদী, এই জঙ্গল সব আবার বদলে যাবে। শতপথীবাবুরা হয়ে উঠবে দাতারাম।

এহেন বড়ো মানুষের বউটা যে কী হয়ে যায়। এমন মানুষের বউ এমন হল। ভগবান পৃথিবীতে একের পিঠে এক বসাতে ভুলে যান। নায়েকের বউ নায়েকের মতো হয় না। দুশ্চরিত্রা হয়ে ওঠে সে।

মনে হয় বউ বুঝি নদীর চরে প্রদীপ জ্বেলেছে। নায়েক ফিরে আসবে নদীপথে সেই সেবারের মতো। এবার হয়তো ফিরবে সন্ধেবেলা। তাই প্রদীপ জ্বালা! কিন্তু অত ঘটা করে রূপ দেখানো কেন? পানের রসে লাল টুকটুকে ঠোঁট নিয়ে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো হেঁটে যাওয়া কেন? চিল-শকুনের নজর পড়েছে সে দিকে লক্ষ্য নেই বউটার!

এ সবের জবাব বউয়ের কাছে আছে। সে রূপের অহঙ্কারের কথার জবাব দেয় না। নায়েক চাইত বউ যেন তার ঘরে ফেরার সময়ে আলতা রাঙা পা মেলে বসে থাকে। কপালে যেন টকটকে সিঁদুরের টিপ থাকে। তাই কি বউয়ের অত সাজের ঘটা! এ তো নায়েকের বিপদ ডেকে আনা। পুলিশের চরে ছেয়ে গেছে চারদিকে। নায়েক যেন এক্ষুনি না ফেরে। বউ তার নষ্ট হয়ে যাক।

নায়েকের অন্তর্ধান বিষয়ে যাবতীয় তথ্য এই। এখানেই কাহিনীর শেষ হয়ে যায়। শুধু কৌতূহল থেকে যায় তার রূপসি বউ সম্পর্কে। তার চরিত্র বদল বিষয়ে। কোনও কথাই জানা যায় না। মানুষে শুধু ভাবে। বাবুমহোদয়েরা খুঁজে বার করেন যাবতীয় কলঙ্ক। আদি রসে তাঁদের ঠোঁট ভিজে যায়। আর অন্য মানুষেরা ভাবে অন্যরকম। সেই ভাবনা হয়তো এইভাবে হয়, তা হলেই নায়েক কাহিনী উপসংহার হয়ে যায়।

উপসংহার

সেই সন্ধেয় দাতারাম সিং ঘরে পড়ে থাকলেন। পুলিশের গাড়ির শব্দে সকলে চমকে ওঠে। পালাতে হবে। নায়েক নির্দেশ দেয় না কেন?

এক শালগাছের গোড়ায় গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে ছিল মানুষটা। চারটে লোক তাকে মধ্যরাতে বয়ে

আনে কীতনিয়াশোলে। তখন সব নিঝুম। তারা ডাকে নায়েকের বউকে। রূপসি বউটা বাইরে দাঁড়িয়ে খুব নিশ্চুপ। চারটে মানুষ হতচকিত। এই দেহ নিয়ে কি করবে! বউ নায়েকের বুকে কান রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তা হলে! ওরা কি লাশ বয়ে আনল নায়েকের? নায়েক নেই?

এই খবর জানলে কীতনিয়াশোলের বাবুরা বাঘ হয়ে উঠবে। ছিঁড়ে খাবে মানুষগুলোকে। চারটে লোক ভয় পায়। কাল থেকে কী হবে? (নায়েক মরল, না আমরা সকলে মরলাম।)

ভয়ে চারটে মানুষ কাঁপছে। নায়েক কী করে মরে। এতবড়ো লাশটায় প্রাণ নেই। এটা কীভাবে হয়। নায়েকের তো মরার কথা নয়।

হেঁইখানে কথা লয়, আর লোকে জানত্যা পারবু, চ নদীর পাড়ে।

চারজনে লাশ নিয়ে চলে নদীর দিকে। তখন চাঁদ ঝুলেছে দূর জঙ্গলের মাথায় পৃথিবীর সীমানায়। জ্যোৎস্না সরে যাচ্ছে! এই রাতে নদীকে দেখাচ্ছে বড়ো দুর্বল, ধুধু করছে বালি, একেবারে নিঃসম্বল বিধবার মতো। (নায়েক মরল না আমরা মরলাম।)

নদীর চরে লাশ নামায় ওরা। এখন কী করবে? চারটে পুরুষ একটা মেয়েমানুষ নায়েকের দেহে নিয়ে বসে থাকে। কাল কি পুলিশের হাতে লাশ তুলে দেবে? তা হলে হয়তো বাঁচবে ক দিনের জন্য। না হলে লাশ এখানে পড়ে থাকুক। থাকুক। রাতগভীরে সব গ্রাম ছেড়ে পালাক। নায়েক মরেছে শুনলে বাবুরা ছেড়ে কথা বলবে না। তার লাশ ফেলে কেঁদে ওঠে।

—শাখা ভাঙ। একজন নায়েকের বউয়ের দিকে তাকায়।

—শাখা ভেঙে ঘর যা। একজন হিসিয়ে ওঠে।

এতক্ষণ যে চুপ করে থম মেরে বসেছিল সে গর্জে ওঠে, না।

—কেনে? চারটে মানুষ আগুন চোখে বউটাকে দেখে।

—শাখা ভাঙলে গাঁসুদ্ধ মানুষ মরবে, নায়ক মরলে সকলের মরণ! কিন্তু করি কী! একজন ফুঁপিয়ে উঠে নদীর বালি হাতড়াতে থাকে।

—লাশ পুঁতে ফেল, রটাই দে নায়ক পলাইছে, মু সিঁদুর পরি। বউ ফিসফিসিয়ে বলে।

—বলিস কী তু, পাপ হবেনি মেয়্যা মানুষেব।

—আগে বাঁচি পরে পাপ, গাঁ বাচলে বড় পুণ্যি। শাখা-সিঁদুর পরা থাকলি নায়েক মানুষের ভিতর বাঁচি থাকে; বাবুগণ ভয় পায়, তদ্দিন আব এক নায়েকের জন্মো হবে।

রাতারাতি সুবর্ণরেখার চরে লাশ পোঁতা হয়। নায়েকের বউ তোরঙ্গ থেকে লালপেড়ে শাড়ি বাব করে সিঁদুরে আলতায় নববধূ হয়ে যায়। নববধূ নায়েকের কবরে প্রদীপ দেয়। বাবুগণ বটায় সোমত্ত বউটার চরিত্তির খারাপ, ডাইন হয়ে যাচ্ছে। □

দগ্ধদিনের কিছু স্মৃতি

সুদর্শন সেনশর্মা

শ্রীচরণেষু বাবু,

গতকাল হঠাৎ আমার বন্ধু চঞ্চলদের বাড়িতে রোববারের কাগজটা ওলটাতে ওলটাতে 'বিপ্লব আজ কোন পথে নামে তোমার, হ্যাঁ তোমারই লেখাটা চোখে পড়ে। ওই নামে আমার বাবু ছাড়া আর কে হবেন! তাই কপাল ঠুকে তোমার নামে কাগজের অফিসেই চিঠিটা পাঠালাম। তোমার ঠিকানা জানি না। তুমি শুনে থাকবে হয়তো মা এখন অন্নপূর্ণা গার্লস স্কুলের স্থায়ী শিক্ষিকার মর্যাদা পাচ্ছেন।

খোকনবাবু আছেন না? খোকনবাবু এখন আমাদের এ তল্লাটের রাজনৈতিক সর্দার। খোকনবাবুর দিদি জেলাপরিষদের সদস্যা। দাদা—। ও সব কথা থাক। বাবু, আমি কিন্তু আর এখানে থাকতে পারছি না। তোমার মুখে একবার (পরিষ্কার মনেও পড়ে না) খুব ছোটোবেলায় বুঝি একবার বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু তোমার এই লেখাটা পড়ে খুব বিমর্ষ হলাম। লেখাটায় নয়। লেখাটা আমার বাবুর লেখার মতোই। তোমার অনেক লেখাই আমার কাছে সযত্নে আছে। লেখাটার বক্তব্যে আমি খুব মর্মাহত হয়েছি—লেখকের হতাশাও চাপা থাকেনি। বাবু, এ চিঠি তুমি পাবে তো? তোমার ঠিকানা আমাকে জানাও। তোমার অসুবিধে হলে আমি তোমার কাছে যাব। বাবু, আমি এখন কত্ত বড়ো বলো তো। খোকনবাবুকে, মায়ের খোকনকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বাবু, ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যায় না? অ্যাট লিস্ট ফর মাই সেক। তুমি আমায় কত.........আজ এই পর্যন্ত।

প্রণত

সুদিন।

বিপ্লবের খোয়াব আমায় পঙ্গু করেছে। বাবা, আমি আর ছুটতে পারি? ক্রাচ লাগে। সঙ্গে এসকর্ট লাগে। পুলিশি অত্যাচার। তিন তিনটে অপারেশনের ধকল পনেরো বছরের হাজতবাসের মধ্যেই সইতে হয়েছে......আরও কত কী। তোরাও যদি হারিয়ে যাস। ভাগ্যিস কলকাতা থেকে পরিমল এসে তোর চিঠিটা দিয়ে গেছে। ও চেক দিতে এসেছিল। শৈলেন্দ্র সমাদ্দারের চোখের কোনায় জল এসে পড়েছিল। অমলার ছায়া চৌকাঠে। তাড়াতাড়ি চোখের জল সামলে, চিঠিটা ভাঁজ করে নিতে হয়!

আপনি আজ অনেক ভোরে উঠেছেন?

—ঘুমটা ভেঙে গেল, জানেন অমলা!

—রাতের ওষুধটা আপনি খাননি!

—না খেয়েছি........আসলে.....

—কাল পরিমলবাবু ফিরে যাওয়ার পর থেকেই আপনাকে খুব অস্থির লাগছিল। আপনার রাতের ঘুমের দরকার........এ সপ্তাহেই আবার হাসপাতাল যেতে হবে খেয়াল আছে?

শৈলেন্দ্র এবার হাসেন। আপনি তো খুব আমায় বলছেন। নিজের দিকে একটু তাকান। খুব পেল লাগছে। আপনি ওষুধ খেয়েছেন?

অমলার চোখ এ ঘরের দেওয়ালের দুটি ছবি ছুঁয়ে যায়। শৈলেন্দ্র সে দিকে ফেরে। অমলার গলায় খেদ, আমার ছেলেটাও যদি আজ........আমার তবে.......

শৈলেন্দ্র গলা খাঁকারি দেন। 'যদি' 'তবে'র কোনও মূল্য নেই অমলা......

—মাঝে মাঝে এমন মনে হয় আমার। ইচ্ছে করে....

—এমনই এক ইচ্ছের দিনে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল....শৈলেন্দ্রর মুখে হাসি।

অমলা ম্লান হাসেন, 'বাতিল দুটো মানুষকে জায়গা দিতে নারাজ, অনড় ট্রেনটাই বাতিল হয়ে গেল সেদিন......'

অমলা সুর পালটালেন, 'দেখেছেন তাল বুঝে আপনাকেও বাতিলের দলে ঢুকিয়ে ফেললাম—আসলে আপনি তো আর সেভাবে নিজেকে জাহির করলেন না! আপনাদের দগ্ধদিনের অন্য সব সঙ্গী যেমন, কমরেডরা যেমন আগুনের দাগ দিব্যি চাপা দিয়ে মূলস্রোতে ফিরে গেছেন গিয়ে কেউকেটা হয়ে গেছেন অথবা.........

শৈলেন্দ্র হাত তুলে অমলাকে থামান......আমি বাতিল নই? ওই পরিমল না হলে হাসপাতালেও জায়গা হত না। ক্রাচ। তিনটে অপারেশন। পনেরো বছরের অকথ্য নির্যাতনে সারা শরীরের বিষভার নিয়ে মূল স্রোতে ফিরে যাই কোন আক্কেলে? সব কিছু হারিয়ে বাকি জীবনটুকুতে আমাদের হওয়া না হওয়া, পারা না পারা, উদ্যোগ পর্বের খোয়াবনামাই না হয়... ...

এ বাড়ির জানলার বাইরেই একটা পুকুর. ওপরে আদিগন্ত মাঠ। গাছ-গাছালির ফাঁকে দূরের কিছু বাড়িঘরের আভাস। ও দিকে তাকিয়ে দুজনেই উদাস হয়ে গেল......

ভিড়ে ঠাসা ডাউন বনগাঁ লোকাল। ঠাকুরনগরের এক ডেরা থেকে গালে 'নাট্যশ্রী'র নকল দাড়ি লাগিয়ে মাথায় সাদা টুপি, লুঙ্গি শৈলেন্দ্রও এক ট্রেনে। শেয়ালদায় নেমে এধার ওধার ঘুরে 'দাদা'র সঙ্গে দেখা করতে হবে বিকেল পাঁচটায় কলাবাগান বস্তিতে। সেখানে থেকে শিলিগুড়ি হতে পারে.... ... হতে পারে... .

গেটের কাছে তিনটে চারজনের দল। তাস পিটছে। অশোকনগরে ভিড় বাড়ল। চাপ বাড়ল। গালে চিড়বিড় করছে। চুলকানো চলবে না। চশমাটা চোখে। কেউ চিনে ফেললে অশোকনগরেই তাকে নামিয়ে নিতে পারে।

ভিড়ের থেকে আওয়াজ উঠল। ধেৎ, আপনার হাতে সাহেব থাকতে বিবিটাকে মারলেন না?

—মশায়, আপনি খেলা বোঝেন! এ ধার থেকে আওয়াজ ওঠে ঠিক ঠিক।

—সাহেব না ধরে কেউ বিবি মারে? নযতো গাজতবাস, যাবজ্জীবন.. ...দাদা সাহেব ধরুন, ধরে যত খুশি বিবি মারুন। কোনও শালা আপনার কিস্যু করতে পারবে না......

—ঈশ্বর গুপ্তটা কে রে?

—আরে গোপালদা, গোপালদা এসে গেছে।

—কে রে?

—আরে বিকেলে ভোরের ফুল / কলপ করা কালো চুল।

হেঃ হেঃ হিঃ হিঃ হাসির ফোয়ারা। দু ঃ শা—লা তাস পড়ে যাচ্ছে।

ভিড় থেকে কে বলল বেশি হেসে না বাপসকল। দিনকাল ভালো নয়। দেখবে পুরোনো অসুখ ফিরে আসছে। বন্যা আসছে। মহামারী আসছে।

যে ছেলেটা একটু আগে নো ট্রাম্প বলেছিল, সে বলল, কাল আমাদের খেলার মাঠের কাছে রবীন্দ্র ভবনের সামনে রবি ঠাকুরের মূর্তির মাথা নামিয়ে দিয়েছে..... .

—রবিঠাকুরের অন্যায়?

বুর্জোয়া কবি। আর রবিঠাকুরের জন্যই নাকি প্রতি বছর উত্তরবঙ্গে বন্যা হয়। আর কিছু লেখার ছিল না? উনি কেন শুধু শুধু বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙো দাও ভা..........ঙো লিখতে গেলেন! প্রতি বছর বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে......

আবার ভিড়ের মধ্যে হাসি। ওহ্ রবিঠাকুরের দোষ। ইঞ্জিনিয়ারদের দোষ নেই...... কন্ট্রাক্টারদের দোষ নেই......

—এই শালা তাস দেখ। অন্য দিকে কান দিচ্ছিস কেন?

—যাই বল, গান্ধীজিকে কিন্তু.........

ভিড় থেকে কে রসিক গলায় বলল—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক......বন্দুকের নলই...........

চাপা গলা এক বৃদ্ধ তাসুড়ে, হারামজাদা রাজনীতির 'র' কইলে কাইল হইতে আমি নাই.........

একটি ছেলে, বছর উনিশের, সদ্য কলেজ পড়া, তেজি গলায় ভিড় থেকে বলল—ঝপ করে দেশের নেতাদের গাল দেবেন না। গান্ধীজিকে আপনি গাল দিলেন কিন্তু.......হো চি মিনেরও তো কেমন দাঁড়ি আছে.....তাঁকে কি আমি ব্যা বলব........?

বলতে হল না ভালো করে।

—তবে রে! কোত্থেকে কী হয়ে যায়। শৈলেন্দ্র কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারটে ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বারাসত কলেজের ছেলেটির ওপর— জিভ ছিঁড়ে নেব শালা........তোর বাবা ব্যা.......গান্ধী ব্যা.......

ভিড় থেকে একটি ছেলে টুক করে খসে যেতে যেতে শৈলেন্দ্রর পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দাদা আমি শঙ্কর। আপনি দত্তপুকুরে নেমে ভ্যান রিকশায় যশোর রোডে গিয়ে যে দিকে খুশি যেতে পারেন। আপনাকে হন্যে হয়ে সব খুঁজছে। যোগীপাড়া থানার কনস্টেবল শঙ্কর। বন্ধু মহিমের ছেলে শঙ্কর? পুলিশের কথায় সে বিশ্বাস করবে? শঙ্কর বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে নেমে যেতে পারি। আর একটা কথা, দুলালকে অশোকনগরের দিকে আসতে বারণ করবেন।' কলেজের ছেলেটির নাক, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। গান্ধীজিকে লেখার অযোগ্য শব্দে গাল দেওয়া যাবে, রবিঠাকুরকে বুর্জোয়া বলা যাবে, নাস্তির খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা যাবে বিদ্যাসাগরের স্কন্ধ, কিন্তু মাও-কে কিছু বলা যাবে না, হো চি মিন-কে কিছু বলা যাবে না..........রুমাল চাপা দেওয়া রক্তাক্ত ছেলেটা দত্তপুকুরে নামল। শঙ্করও। ট্রেনটা দত্তপুকুর ছাড়ার মুখে শৈলেন্দ্র। দত্তপুকুর স্টেশনমাস্টার অফিসের দেওয়ালে..........নকশাল বাড়ির লাল আগুন........বন্দুকের নলই......

শৈলেন্দ্র কল পাম্প করেন। ছেলেটি নাক মুখ চোখে জল দেয়। শঙ্কর দেখে। শৈলেন্দ্র পালটানো গলায় শঙ্করকে বলে, 'অ্যাই একে একটু ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও.......

ছেলেটি বলল, 'না না, আমি আগে কলেজে যাব........'

জানলার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শৈলেন্দ্র ঘরের দেওয়ালে ফিরে আসেন। শঙ্করের ছবি। মহিমের ছবি।

—আপনি অমলা বলছিলেন না ওষুধ খাওয়ার কথা। রাতের ওষুধটা খেলে আমার একটা বিচ্ছিরি স্বপ্নঘোর হয়। কাল কী দেখেছি জানেন?

—অমলার ঘোব ভাঙা গলা কী? তিনিও অতীতের গভীর অতলে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

—বাজারের মুখে বাতাবি লেবুর গাছটায়। দেখি পাখিরা খুব ভিড় জমিয়েছে। টুনটুনি দোয়েল........

—আপনি পাখি চেনেন........?

—চিনব না! ঠাকুরনগরের এক পরিত্যক্ত ইটভাটায় আত্মগোপনকালে, সময় কাটত না। আমি, পরিতোষ তখন পাখি দেখে দেখে অনেক কিছু......

—কোন পরিতোষ? যিনি এম এল এ হয়েছেন?

—হ্যাঁ, ও সব থাক এখন। স্বপ্নের কথা বলি। স্বপ্নভঙ্গের নয়। পাখিদের নাচানাচিতে একটা পাকা বাতাবি বোঁটা থেকে খসে মাটিতে পড়ে ফেটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দেখি, বাতাবি লেবুর কোয়া তো নয়, বাতাবি ফেটে আতাফলের দানা বেরচ্ছে.........তারপর দেখি নগরের সব বাতাবি বৃক্ষেই বাতাবির গড়নে আতা ফলে আছে—যেটাই খুলি........

—আতাবি?

—হ্যাঁ।

বাজারে ঢুকতেই হরি মাছওয়ালা বলল, 'আসুন বাবু কাই মাছ নেবেন। খুব ভালো। নগেনবাবুদের ভেড়ির.....!'

—কাই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু, রুই কাতলের হাইব্রিড। চিড়িয়াখানায় যেমন টাইগন, শেকুর দেখেন......

অমলা হাসেন, 'যাহ্। তারপর।'

হরিই বলল, 'বাবু রাগ করেছেন, সে দিন মাছ দিতে পারিনি বলে। ডাক্তারবাবুও রাগ করেছেন। কী করব বলুন। দেবতাদের খেপিয়ে কি ব্যবসা হয়! সে দিন আপনার দাদা এসেছিলেন না অমলা? আমি আর ডাক্তারবাবু ভাগ করে ইলিশ মাছটা নেব ঠিক হল। একজন এসে গোটা মাছটাই লাগবে বলে, দু কেজি মাছটা নিয়ে চলে গেল।

হরি বলল, এই কাই মাছ তো ওইবাবুর পুকুরের, থুড়ি ভেড়ির। বাবু এখন নেড়ি হয়েছেন........

—নেড়ি মানে বুঝলাম না হরি........!

—নগেনবাবু তো নেতা ছিলেনই, হালে ভেড়ির মালিক হয়েছেন—তাই তিনি নেড়ি—বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওই যে আমোদিনী অ্যাপার্টমেন্টের মালিক গোপালদা, উনি যেমন প্রোতা......।'

—প্রোতা?

—উনি তো প্রোমোটার ছিলেনই। এখন আরও সুবিধে পাওয়ার জন্য, পলিটিক্স করার জন্য উনি নেতাও হয়ে গেলেন.......কী বুঝলেন? কী দাঁড়াল তবে। প্রোতা. ..

স্বপ্নটা এমন সময় ভাঙল। তখন চরাচর জুড়ে শুধু স্বপ্নের আতাবি বৃক্ষ। বাতাবির গড়ন। কিন্তু আতাফলের গঠন। পাখিরা খেলছিল।

স্বপ্ন ভাঙার পরে আমার প্রথমেই মনে হল, খোকন এখন কী? প্রোতা না নেড়ি? নাকি আরও বড়ো কিছু!

—খোকন কে?

—ও আপনাকে বলা হয়নি। আমার ছেলের ভাষায় আধুনিক রাজনৈতিক সর্দার। আমার স্ত্রীর খোকনবাবু কিংবা শুধু খোকন.......কী আস্পর্ধা, আমায় বলে মুচলেকা দিতে.........আর তার সঙ্গেই ওহ্!

অমলা বারান্দার দিকে উঠছেন। তিনিও আনমনা।

—আজ কাগজে একটা অদ্ভুত খবর আছে পড়েছেন? সব পুলিশের যদি এরকম বোধোদয় হত।

—কী।

—আজ এত বছর বাদে কেরালার এক ছোটো পুলিশ কবুল করেছেন যে তাঁর ওপরওয়ালা তাঁকে দিয়ে জোর করে এক নকশাল নেতাকে মারিয়েছিল। মেরে একটা মিথ্যে সংঘর্ষের গল্প ফেঁদেছিল। সেই পুলিশটি তাঁর ওপরওলাকে নাকি বলেছিল এটা অন্যায়। আইন পুলিশ হাতে নিতে পারে না। ওপরওয়ালা বলেছিল তবে তোমাকেই মারব। মেরে তোমার বউকে একটা মেডেল পাঠাব.....পুলিশটি নকশাল নেতার খুনের দৃশ্যটি সহ্য করতে পারছিল না.......প্রতিনিয়ত ট্রিগার টেপার মুহূর্তটি তাকে তাড়িয়ে বেড়াত........অবশেষে......

অমলার মুখ থমথমে। শঙ্কর কিন্তু দুলালকে মারেনি।

—আমরা জানি অমলা। শঙ্করের স্কুলের বন্ধু দুলাল তাড়া খেয়ে আপনাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অনেকরাতে থানা থেকে ফিরে শঙ্কর দুলালকে দেখে খুব ভয় পেয়েছিল। দুলাল শঙ্করকে পুলিশের চাকরি নেওয়ার জন্য গালাগাল করেছিল। অথচ শঙ্কর দুলালকে নিজের জীবন বিপন্ন করে......সেটাই শঙ্করের বিরুদ্ধে গেল...... অথচ দুলাল ট্রেনে উঠেও পালাতে পারেনি.......পুলিশের হাতে নয়.......পুলিশের হাতে নয় দুলালকে কে মেরেছিল আমরা জানি......

—অথচ রটিয়ে দেওয়া হল শঙ্কর দুলালকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে এনে অনেক রাতে.......

ক্রাচটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শৈলেন্দ্র.........শঙ্করকে পুলিশই মেরেছে। পুলিশই........

অমলা কাঁদছেন। তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায় সত্তরের আর এক স্মৃতি। শঙ্কর বেঁচে থাকলে আজ ছেচল্লিশ বছর বয়স হত। একদিনে কার এমন সর্বনাশ করেছ ঈশ্বর!

অমলা পুজো করেন না। তার ঠাকুরের আসন নেই। তাঁর নিয়ম মানার দায় নেই। কোনওক্রমে জীবনটা বয়ে বেড়ান........যাদের কারণে তাঁর এই সর্বনাশ.........তাঁদেরই একজন আবার.......

অমলা শৈলেন্দ্রর দিকে ফেরেন। কই রাগ হচ্ছে না তো একটুও..........মানুষটার উপর রাগ হচ্ছে না একটুও। লোকটাও এখন বাতিল।

একাত্তরের নভেম্বরের রাত। দূর থেকে হইচই। বোমার শব্দ কানে আসছে। সকালবেলা বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুলে ভাঙচুর হয়েছে। চেয়ার টেবল বেঞ্চ জড়ো করে এনে আগুন লাগানো হয়েছে। নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কালীবাড়ির কাছে এম এল এ-র সহকারী খুন হয়েছে. বিকেলবেলা থানা থেকে দুটো লোক এসে বলে গেল, 'সাবধানে থাকবেন। কোথাও বেরোবেন না। সি আর পি নেমেছে......' তখনও তিনি জানেন না......রাত দশটার সময় তিনি জানলেন তাঁর কনস্টেবল-পুত্র থানার অদূরে খুন হয়েছে......সারা রাত কি করে কাটল..... ছেলেটার বাবা দিনরাত পরিশ্রম করেন। বেসরকারি অফিসের সামান্য আয়। অফিসের পরেও এক মারোয়াড়ির গদিতে খাতা লেখার কাজ করে অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন তিনি........

মারোয়াড়ির গদিতেও কদিন আগে হামলা হয়েছে। ফেরার পথে কে তাঁকে শাসিয়েছে, ছেলের মরামুখ তাঁকে শিগগির দেখতে হবে........সে সৌভাগ্য আর তাঁর হয়নি......কী কারণে যে তিনি স্টেশন থেকে, নির্জন অন্ধকার থেকে, বাড়ির দিকে ছোটা শুরু করেছিলেন তা একমাত্র তিনিই বলতে পারতেন.......কোনও অমঙ্গলের ভয়েই কি তিনি......চাররাস্তার মোড়ের কাছে সি আর পি চিল্লিয়ে বলেছিল—হল্ট.....

উত্তরচল্লিশ. প্রায় পঞ্চাশের মানুষটি ছোটা থামাননি। চাররাস্তার মোড়ে কলেজের মাস্টার মশাইয়ের এক ছেলেকে, হাসপাতাল থেকে অপারেশন করিয়ে ফেরা ছেলেকে, সি আর পি উঠিয়ে এনে, বিছানা থেকে উঠিয়ে এনে হাজার অনুনয় সত্ত্বেও, পেটে অপারেশনের ব্যান্ডেজ থাকা সত্ত্বেও মাঝরাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে......তার বয়েস যে কুড়ি পেরিয়েছে........তার রক্তে বিপ্লবের বীজ রোয়া থাকতেই পারে........

—হল্ট.....

মহিমবাবু দৌড় বন্ধ করেন না। তিনি দৌড়ে পরের মোড়টা পেরিয়ে যান। দু পাশ থেকে, বাড়ির আধ বন্ধ হওয়া জানলা থেকে কেউ কেউ বলতে থাকে দাদা দাঁড়িয়ে পড়ুন। পাগলা কুকুর তাড়া করলে দৌড়োতে নেই। সি আর পি তাড়া করলে দৌড়োতে নেই।

—হল্ট—হল্ট......

ফোলিও ব্যাগটা বগলে চেপে, একটু ঝুঁকে দৌড়চ্ছিলেন মহিম।

শিববাড়ির মহা নিমগাছটার সামনে তিনি আছড়ে পড়লেন। এ মৃত্যুর কথাও অমলা জেনেছিলেন পরদিন। পিতা, পুত্রের মৃতদেহ পৌঁছেছিল একসঙ্গে। অমলা পাথর তখন। কাঁদতে পারেননি।

শেয়ালদা স্টেশনের আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। একটু আগে ঘোষণা করে হয়েছে দার্জিলিং মেল বাতিল। একজন জেল থেকে ছাড়া পাওয়া অসুস্থ মানুষ ক্রাচ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করেই দেখেন, এক মহিলা কাঁদছেন। সামনে একটা বোঁচকা। এই পরিমল একটু দাঁড়াও তো.......

—কোথায় যাবেন?

—শিলিগুড়ি—

—ট্রেন তো যাবে না......

হঠাৎ আলোর ঝলকানি। আপনাকে চেনা চেনা লাগছে!

ভদ্রমহিলা মুখ চোখ মুছতে মুছতে বলছেন, আমি তো চিনতে পারছি না।

—না চেনারই কথা। অনেক দিন বাদে। অসুস্থও.....যে চেহারা দেখে চেনা যেত সে-তো গোল্লায় গেছে...

—মহিমের কী খবর? আ আ ......

এইবার চিনতে পারেন অমলা। দুচোখে জ্বলন্ত আগুন....শৈলেন্দ্রবাবু আপনি।

শৈলেন্দ্র বলেন হ্যাঁ, 'আমি বুঝতে পারিনি....'

—ঠিক কী হয়েছিল....

—আপনি যান। এখন আসুন.....আমার তাড়া—

কোথায় যাবেন—ট্রেন তো.....

—অ্যাই পরিমল, ভদ্রমহিলাকে একটু সাহায্য কর তো?

অমলা ভ্রূ কুঁচকে বলে আপনার স্ত্রী সঙ্গে নেই। ছেলে?

পরিমল ঢোক গেলে, হয়তো খবর পায়নি। ক্রাচে ভর দেওয়া ঝুঁকে দাঁড়ানো শৈলেন্দ্র বলেন.... 'আমি বলেছি। হযতো রাগ করেই আসেনি। আসবে না। যুদ্ধে নামলে অনেক রকম ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে ম্যাডাম—'

—আমার যেমন করেছেন........

—ম্যাডাম আপনি এখন উঠুন। ট্রেন যাবে না। দরকার হলে কাল আবার। আপনাকে পেযে গেছি। .আমার অনেক শোনার আছে। শাস্তি অনেক আমি পেযেছি.....আপনারও যদি কিছু দেওয়ার থাকে .. প্লিজ উঠুন. শঙ্করের কথা জানি—মহিমের জানি না।

—তাঁরা দুজনেই একদিনে খুন হয়েছে।

—এখন কাঁদছিলেন কেন? ওঁদের মনে পড়ছিল? না না দাদা আমায় অনেক সাহায্য কবেন। ওও অসুস্থ। তাই.....শিলিগুড়ি যেতে হবে, চলুন কাল আপনাকে দাদার কাছে পৌঁছে দেব.. .

আটানব্বইয়ের নভেম্বর এখন মধ্যবয়সী। শীত পড়েনি। গত দুদিন বেশ গরম গেছে। বৃষ্টি দু-এক ফোঁটা হলেও শীত আসেনি। গবমও কমেনি। হঠাৎ দুপুরবেলা অমলা দেখেন তাঁর বাড়ির গেটের দিকে এক যুবক ছুটে আসছে। —এটা কি শৈলেন্দ্র সমাদ্দারের বাড়ি?

অমলা গেট খুলে দিতে দিতে বলে—আসুন..... ..

—বাবা আছেন?

—হ্যাঁ। অমলা তাকিয়ে থাকেন। যুবকটি ছুটতে ছুটতে ঘবে ঢুকে শৈলেন্দ্রকে জড়িযে ধবে বাবা, বাবা বলে আদব কবতে থাকে। আদব করতেই থাকে।

আর কোনও চান্স নিই নি বাবা . কাগজেব অফিসে গিযে হেঃ হেঃ দেখলে তো বাবা আমি এখানে থেকে চাকরি করব। খোকন মামা, পরিতোষ কাকুকে ধবে বন দপ্তবে একটা চাকবি জুটিয়ে দিযেছে বাবা তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব না। আব থাকব না।

আদরের আতিশয্যে ক্রাচ পড়ে যাচ্ছিল। শৈলেন্দ্র বলে উঠলেন 'অমলা আমাদেব সুদিন এসেছে সুদিন এসেছে।' □

প্রতিক্রিয়া

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

আপনি বেশ কিছুদিন আগে দুবার আমার খোঁজ করেছিলেন। প্রথমবার আমাদের বাড়িতে, দ্বিতীয়বার হাহাকার-এ। আপনাকে কখনও আমার মা দেখেনি। আমি বাড়ি ফিরতেই আপনার চেহারার বর্ণনা দিয়ে মা বলেছিলেন, 'কী ব্যাপার রে? ছেলেটা কে?' আমি জামা খুলে ঘরে টাঙানো দড়ির উপরে রেখে মাকে বলেছিলাম, 'ও কেউ না।'

—কেউ না মানে? আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মা। তার চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল আর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা ভয়ের ছাপ। সে দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলেছিলাম, 'তুমি আজকাল সবেতেই কেমন ঘাবড়ে যাও।' মার কাছে যদিও আপনি ছেলে, আমি বললাম, 'লোকটা একটা কাজের খোঁজ নিয়ে এসেছিল।' স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম মা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। পাছে আরও কিছু বলে বসে তাই আমি বাথরুমের দিকে চলে গিয়েছিলাম।

রান্নাঘরে তিনটে রুটি আর বিভিন্ন ধরনের আনাজ মিলিয়ে তৈরি একটা তরকারি নিয়ে আমার অপেক্ষায় বসেছিল মা। আমি অন্যদিনের মতো রুটি-তরকারি গিলতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাব মা আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, এভাবে তাকিয়ে থাকলেই মাকে দুঃখিনী মনে হয়। অনেক কথা বলতে চায় মা, সাহসে কুলোয় না। ইদানীং আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকে। দু-এক কথা হতে না হতেই হয়তো মাঝপথে খাবার ফেলে উঠে পড়ব এইসব ভেবে মা আর কথা বলে না।

আমার খাওয়া হয়ে যেতেই মা বলেছিল, 'হ্যাঁরে, তোকে বাড়ি বয়ে এসে কাজের খবর দিতে এল, শেষে না পেয়ে আবার রেগে যাবে না তো?'

অনেকটা সময় নিয়ে এক গ্লাস জল শেষ করে বলেছিলাম, 'না-না, আমার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। আমি কালই দেখা করব।' আজকাল মেজাজ একটু ভালো থাকলেই আমি মিথ্যে কথাগুলো অনর্গল বলে যাই। কথার সবটা থাকে ক্ষমতাবান লোকেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। অল্পদিনের মধ্যেই চাকরি হয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা। শুনতে শুনতে মার চোখ আশায় ঝক ঝক করে ওঠে। তার আধময়লা শাড়ির জায়গায় জায়গায় হলুদের দাগ, ঘরে বহু বছরের জমে থাকা ঝুলকালির মধ্যে টিমটিমে কম পাওয়ারের আলো, মার মুখের অনেক কষ্ট সহ্য করার বলিরেখা সব মিলিয়ে যার। চারদিকে চমকে ওঠে আলোর ছটায়, রাজমাতার মতো মার মুখে গোটা পৃথিবীকে ক্ষমা করে দেওয়ার স্মিত হাসি ফুটে ওঠে।

অনেকদিন হয়ে গেল 'হাহাকার'-এ যাই না। যখন যেতাম সে সব দিনের কথা ভাবলে মনে হয় যেন গত জন্মের ঘটনা। হাহাকার নামটা আমরা দিইনি। আমাদের চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের বয়সে বড়ো পাড়ার দাদাদের দেওয়া নাম। পনেরো বাই কুড়ি ঘরে ছোটো ছোটো কতকগুলি বেঞ্চ, একখানা মাত্র আলো আর বেশিরভাগ সময় কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় কেমন একটা ঝিম ধরে থাকা পরিবেশ। দোকানের মালিক নিধুদার ধুতি উঠে থাকত হাঁটুর উপরে। গেঞ্জি ছাড়া কখনও জামা পরতে দেখিনি। পাকিয়ে যাওয়া চেহারায় চোখ দুটো প্রথমে নজরে পড়ত। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

পাড়ার দাদারা একে একে চাকরি পেয়ে বিয়ে করে সন্তান লাভ করে যখন হাহাকারে আসা বন্ধ করে দিল তখন আমরা দখল নিলাম। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মরা মাছের মতো নিধুদার চোখের দিকে তাকিয়ে চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁট ছোঁয়ালেই তেতো হয়ে যেত জিভটা। কম দামি চায়ে একটা বুনজ গন্ধ

টের পেতাম। একটা ভালো চাকরির জন্য, আরও ভালোভাবে বাঁচার জন্য, ফ্রকের আড়াল থেকে বেরিয়ে শাড়ির মধ্যে জড়িয়ে যেত যে সব মেয়েরা, তাদের কাছে পাওয়ার জন্য হাহাকার করে উঠতাম। এতদিন বাদেও হাহাকারের আড্ডা সমানে চলছে। একদল চলে গেলে আর একদল এসে দখল নিচ্ছে।

হাহাকারের পাশ দিয়েই আমার যাতায়াতের পথ। সে দিন হাহাকার থেকে একটি ছেলে ছিটকে এসে আমাকে বলল, 'দীপেনদা, আপনাকে একজন ভদ্রলোক খোঁজ করছিলেন।' ছেলেটি আপনার চেহারার বর্ণনা দিল। বলল, 'ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কবে কবে হাহাকারে আসেন।' কথাটা বলে ছেলেটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গেল।

আজকাল আমি বাইরে খুব একটা কথা বলি না। আমাকে সবাই এড়িয়ে চলে। আমিও কোথাও যাই না, কারও সঙ্গে মিশি না। হাহাকারে এখন যারা বসে, তাদের অনেকে আমাব কোলে উঠে বেড়িয়েছে এক সময়।

ধরণীদা, আপনি আমাকে খুঁজবেন আমি জানতাম। মনে হয় আপনি ইতিমধ্যে জেনেছেন যে অধীশের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমাব বাড়িতে যাওয়া আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। সেখানে আপনি আমাকে পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু হাহাকাবে গেলেন কী ভেবে! সেখানকার আড্ডার সকলেই আজ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে। কেউ বিখ্যাত কেউ বা অতি সাধারণ। ওদের সকলের আগে হাহাকার থেকে আমি বিদায় নিয়েছিলাম।

তখন সবেমাত্র কলেজ ছেড়েছি। পরীক্ষার ফল প্রকাশের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক ছিল না। মনের সবটুকু আগ্রহ উজাড় করে চাকরির আবেদন করছি। অফিস পাড়ায় গিয়ে খুঁজছি কোথাও লোক নেওযার নোটিস ঝোলানো আছে কি না। রোজই হতাশ হয়ে ফিরে আসছি হাহাকারে। তখন এমন অবস্থা, চোখের সামনে দিয়ে উর্বশী-মেনকা চলে গেলেও মনে কোনও রং চমকে উঠছে না। মনটা বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে। তেতো।

সেই বছরই বাবা মারা গেলেন। রোগটা নিজের মধ্যেই পুষে রেখে কাউকে জানতে না দিয়ে সকলকে নিশ্চিন্ত রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য ছিল না। আমি অনেকদিন ধরে লক্ষ করছিলাম বাবা কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। কখনও হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছি তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন একভাবে। আমি দেখে ফেলতেই ঝটিতি চোখ সরিয়ে নিয়েছেন। বাবা হয়তো কিছু বলতে চাইতেন আমাকে। সে কথা বলবার আর সময় পেলেন না। বাবা চলে যাওয়াব পর সেই একই রকম চোখের চাউনি দেখেছি আমার মা-ভাই-বোনেব চোখে। কী ভীষণ দায়িত্ববোধ যে সবসময় আমাকে পীড়ন করত তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তখনই অধীশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়।

একই কলেজে আমরা পড়তাম। যতদিন কলেজে ছিলাম দূর থেকে ওকে দেখেছি। নিত্য নতুন পোশাক পরে মোটর সাইকেলে শব্দ তুলে ও যখন যাতায়াত করত, কমনরুমে টেনিসের বোর্ডে যখন ঝড় তুলত, যখন বন্ধুদের নিযে দু হাতে পয়সা ওড়াত, তখন ওর দাপটের সামনে দাঁড়াতে সঙ্কোচ বোধ করতাম। আমার পকেটে থাকত সামান্য পয়সা। সব সময় আতঙ্কে থাকতাম এই বুঝি খরচ হয়ে যায়।

কিছুদিন যাবৎ বাবার অফিসে যাতায়াত করছিলাম। কিছু টাকা পাওনা ছিল সে জন্য তদবির করতে। সেই সঙ্গে বাবার অফিসেই যদি একটা চাকরি জোটাতে পারি সেই চেষ্টাটাও ছিল। পাওনা টাকাটা হাতে না পেলেও, পাব আশা ছিল। কিন্তু চাকরিটা হবে না। অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে জেনেছিলাম আমার চাকরির ব্যাপারে উপর মহলে লেখালেখি চলছে। প্রথম প্রথম তাঁরা আমাকে কিছুটা প্রশ্রয় দিতেন বোধ হয় বাবা-মরা ছেলের প্রতি করুণা করেই। দু-তিনবার যাওয়ার পরেই তাঁরা বেয়ারাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাকে যেন তাঁদের ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়। বাবার অফিসের দেওয়ালে পোস্টারের ছড়াছড়ি। দুটো ইউনিয়ন। বাবা মারা যাওয়ার খবর শুনে দু দল থেকেই অনেক লোকজন এসেছিলেন বাড়িতে। কয়েকজন আমাকে ডেকে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'চিন্তা কী, আমরা তো আছি।' ধরণীদা, আমি কিছুদিন দুটো ইউনিয়নেরই নেতাদের কাছে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। শেষে একদিন আমি নিজেকে আবিষ্কার করি তাদের

একান্ত অনুগত বেয়ারা হিসেবে। এর চা এনে দিচ্ছি। আরেকজনের সিগারেট। কখনও বা হন্যে হয়ে ঘুরছি কারও দু-লিটার কেরোসিন তেল জোগাড় করে দেওয়ার জন্য।

তখনই একদিন রাস্তায় অধীশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমাকে দেখে অধীশ বলল, 'কী ব্যাপার?' ওর দৃষ্টি ছিল আমার মাথার দিকে। বললাম, 'বাবা'।

কলেজে পড়া অধীশের সঙ্গে এই অধীশের যেন কিছু পার্থক্য ছিল। বলল, 'আয়'। একটা চায়ের দোকানে বসলাম আমরা, বলল, 'কী খাবি?' আমি সহজ হতে পারছিলাম না। বললাম, 'যা হোক।'

টোস্ট আর চা নিয়ে কথা বলতে বলতে অধীশ আগ্রহের সঙ্গে আমার সব কথা শুনল। ওর আগ্রহ আমাকে অনেক সহজ করে দিচ্ছিল। আমার সব কথা উজাড় করে দিচ্ছিলাম ওর কাছে। একসময় লক্ষ করলাম আগামিকাল বাড়িতে কী খাব আমরা তার ঠিক নেই, কবে আমার একটা চাকরি হবে, চাকরি পাওয়ায় জন্য নিজেকে কেমন কুকুরের মতো এ দরজায় ও দরজায় ঘুরতে হচ্ছে এইসব বলতে বলতে আমি কেমন জ্বলে উঠেছি। রাগে ক্ষোভে দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত চোয়াল, বুকের ভিতরে কান্নার স্রোত। অধীশ উঠে আমার পিঠে হাত রাখল। বলল, 'একদিন তোর বাড়িতে যাব।' ঠিকানা নিল।

অধীশকে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখে আমার মা খুশি হয়েছিল। এইজন্য নয় যে বড়োলোকের ছেলে আমার বন্ধু হলে আমার বোনের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। মা ভেবেছিল এইরকম একটা যোগাযোগ থেকে আমি নিশ্চয়ই একটা কাজের খোঁজ পেয়ে যাব। কথা বলতে বলতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। মা বলল, 'এখানেই চারটি ডাল-ভাত খেয়ে যেও বাবা।' কথাটা শুনে, মার সাহস দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। কোনও কথা না বলে অধীশেব দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও বলল, 'বেশ তো মাসিমা।'

খেতে বসে শুধুমাত্র ডাল-ভাত একটা ভাজা দিয়ে খেয়ে অধীশ খুব খুশি হয়ে উঠেছিল। আমি ওর মুখে তখন কৃত্রিমতা খুঁজে পাইনি। বিকেলের দিকে ও বলল, 'চল তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।' ধরণীদা, আপনি হয়তো ভুলে যাননি সে দিনই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আপনাকে কয়েকজন ঘিরে বসে ছিল। আমি আর অধীশ গিয়ে সেখানে বসলাম। যখন ফিরে এলাম তখন আমার অবস্থা একটা ঘোরলাগা মানুষের মতো।

বাড়িতে ফিরে দেখি আমার মা বসে আছে নতুন কোনও খবর শুনবার আশায়। আমার ভাই বইপত্র সামনে নিয়ে বসে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। বোন এক কাপ চা রেখে গেল। হ্যাঁ ধরণীদা, কখনও কখনও চা-ও হত আমাদের। মাকে দেখতাম মাঝে মাঝে কোনও খুশির খবর শুনবার আশায় চা দিত আমাকে। সঙ্গে কখনও মুড়ি, কখনও বিস্কুট। আমি অবাক হয়ে যেতাম মা সামান্য ফ্যামিলি পেনশনের টাকায় এ সব কী অলৌকিক উপায়ে সংগ্রহ করতে পারে। পরে ভেবে দেখেছি সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে একমাত্র সব মায়েরাই পারে। বিশ্বাস করুন ধরণীদা, চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতে নিতে মনে হল মা-ভাই-বোনের প্রত্যাশা পূরণ আমার দ্বারা কখনও সম্ভব হবে না, যদি না সব কিছু নতুন করে বদলে নেওয়া যায়। বিকেলে আপনার কাছ থেকে শুনে আসা কথাগুলি মনে পড়েছিল। ক্রোধে ফুঁসে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম অজস্র নিয়ে যারা নিজেদের কুক্ষিগত করে বসে আছে তাদের গায়ের চামড়া খুলে যাদের কিছু নেই তাদের পায়ে জুতো পরিয়ে দেব। শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়েছিলাম। ট্রিগারে হাত রেখে শক্তির উৎস খুঁজে নিতে চাইছিলাম। ধরণীদা, আমি প্রথম চেয়েছিলাম আমার মা-ভাইবোনকে সুখী দেখতে। পরে মনে হল, এমন অজস্র মা-ভাইবোনকে একটা নতুন জীবনের স্বাদ দেব। নতুন দিগন্তের। তখন আমার সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছিল তারাও আমার মতোই এই বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে ছিল না।

তখন অধীশ আমার পাশে। ওকে পেয়ে আমার ভিতরের উন্মাদনা যেন আরও বেড়ে গেল। আসলে আমরা যাদের গায়ের চামড়া খুলে আমাদের বিজয় উৎসবের বাদ্যযন্ত্র বানাতে চেয়েছিলাম, অধীশ সেই শ্রেণীর একজন। ওকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে মনে হয়েছিল সুদিনের বুঝি আর দেরি নেই। একদিন আমাদের গোপন আস্তানায় ওর মা হঠাৎ এসে হাজির। এসে প্রথমেই আমাদের কয়েকজনের উপরে হম্বিতম্বি শুরু করলেন। অধীশ ওর মাকে ফিরিয়ে দিতে চাইছিল বার বার। শেষে মাসিমা আমাদের প্রত্যেকের প্রায় পায়ে

ধরে বললেন অধীশকে ফিরিয়ে দিতে। আমি কোনও কথা বলতে পারছিলাম না। আমার মায়ের সঙ্গে অধীশের মাকে মেলাবার চেষ্টা করছিলাম। মাসিমা শব্দটা যেন ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে কোনওভাবেই খাটে না। মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা যেন বিজ্ঞাপনের ছবি থেকে উঠে এসেছেন। ছায়াছবির সুন্দরী নায়িকাদের মতো তার রাগ, অনুরোধ, কান্না, হাঁটাচলা, এমনকি ছেলেকে ভিক্ষা চাইবার ভঙ্গি পর্যন্ত। অবশ্য কোনওভাবেই কাজ হল না। অধীশ ফিরিয়ে দিল ওর মাকে। আমার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ একেবারেই ছিল না। আমার মা-ভাইবোন কেমন আছে জানবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতাম এক এক সময়। খুব দেখতে ইচ্ছে হত আমার মাকে। নিজেকে স্থির রাখতাম নতুন এক সকালের অপেক্ষায় যখন নিজেকে লুকিয়ে না রেখে অসংখ্য মানুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ আসবে।

নিজেদের লুকিয়ে রেখে অতর্কিতে আক্রমণ করার কৌশল নিয়েছিলাম আমরা। বোমার আওয়াজে, রিভলভারের ঝলকানিতে আমাদের অস্তিত্ব জাহির করতে গিয়ে আমরা অনেককে খতম করেছি। পরে ভেবে দেখেছি তাদের এবং আমাদের চাহিদার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদায় সকলের কণ্ঠস্বর একই রকম। ধরণীদা, তখন অনেক কথা বলার ছিল আপনাকে। কোথায় যে আপনি ছিলেন? কোনও খবরই পেতাম না। বাইরে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কেউ এলে আপনার কথা জানতে চাইতাম। কী আশ্চর্য তারাও আপনার খবর জানত না।

অধীশের মা যে দিন এলেন তার পরদিন বিপদটা যেভাবে এল আমরা একেবারেই আঁচ করতে পারিনি। ঘুম ভাঙতেই বাইরে বেরিয়ে দেখি গোটা এলাকাটা যেন থমকে আছে। আড়াল থেকে দেখলাম চারটে কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে। আমি ভিতরে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুললাম। সে দিন অসংখ্য রাইফেলধারী আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম শেষ লড়াইটা করব। ভাবনাটা মনেই থেকে গেল। গোটা কয়েক বোমা আর কয়েকটা রিভলভার, অজস্র রাইফেলের কাছে খেলনা মাত্র। পালিয়ে যাওয়ারও উপায় ছিল না। আমাদের মধ্যে দু-একজন অসম্ভব ক্রোধে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। ফলে বোমার শব্দে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল এলাকাটা। তারপরেই উকুন বাছার মতো আমাদের তুলে নেওয়া হল। ধরণীদা, এখন আমার ডান হাত প্রায় নুলো। চোয়ালটা বেঁকে একদিকে কাত হয়ে আছে। আমার শরীরের ভিতরটা কমজোরি।

জেলে আমার পরিচিত আর কাউকে দেখতে পাইনি। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল তাদের মধ্যে অনেকে তখনও টগবগ করে ভিতরে ভিতরে ফুটছে আবার অনেকে যেন পঙ্গু আশ্রমের আত্মভোলা ভক্ত। ঝিমিয়ে পড়েছে জাল দিয়ে আটকানো ঝাঁকার মুরগির মতো।

অধীশকে আর দেখতে পাইনি। অন্য সকলের চাইতে অধীশকে বোধ হয় একটু বেশি পছন্দ করতাম আমি। পি ডি অ্যাক্ট আর মিসার গোলকধাঁধায় বহুদিন কেটে গেল জেলের ভিতরে। হঠাৎ একদিন সেখানে বসেই শুনতে পেলাম বাইরের রাজনৈতিক ওলটপালটের খবর। এই সময় কয়েকজন বন্দিমুক্তির বন্দির জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেন। তাঁরা কখনও সভা করেছেন, কখনও বা মিছিল করে ধেয়ে যাচ্ছেন মহাকরণের দিকে।

একদিন ছাড়া পেলাম। ধরণীদা, বাইরে বেরিয়ে মনে হল কী আশ্চর্য, আমি বেঁচে আছি! এমনও তো হতে পারত জেলের ভিতরেই গুলি খেয়ে মারা গেছি, আর খবরের কাগজে লেখা হয়েছে—জেলের ভিতরে বন্দিরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মারা গেছে অথবা জেলের পাঁচিল ডিঙিয়ে পার হতে গিয়ে প্রহরীর গুলিতে নিহত! সে সব কিছুই হল না। বরং এক বন্দিজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে শুরু হল আর এক বন্দিজীবন। যেখান থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, দেখলাম আবার সেখানে এসেই দাঁড়িয়েছি। আমার মার প্রাণটা তখনও তার দেহটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। আমার ভাই লেখাপড়া ছেড়ে তেজি যৌবনকে বন্ধক রেখেছে এক রেশনের দোকানের মালিকের কাছে। আমার বোন তার যুবতী শরীরটাকে আড়ালে আবডালে রেখে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ছোট ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছে 'ই-তে ইঁদুরছানা ভয়ে মরে।' আর আমি বেঁকে যাওয়া চোয়াল, অক্ষম ডান হাত আর কমজোরি শরীরটাকে নিয়ে যেখানে সেখানে গিয়ে ছাই উড়িয়ে দেখেছি এক কণা খাদ্য মেলে কি না।

ধরণীদা, সারাদিন ঘুরে হন্যে হয়ে আমি এসে দাঁড়াতাম ধর্মতলার কাছে। এখানে এলে আমার হতাশ চোখে পড়ত মস্ত শহরটা যেন দুটো ডানা লাগিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক স্বপ্নরাজ্যে। হোটেল থেকে হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে আসছে খাদ্যের সুবাস। নারীপুরুষ উভয়ই যেন আলো-ঝলমল শহরটার উপরে সুখী পুতুল। পৃথিবীর এত হাসি আছে? এত সুখ।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন চায়ের দোকানে আপনার খোঁজ পেয়ে গেলাম। যে শুয়োরের খোঁয়াড়ে আপনি একসময়ে ঢুকতে চাননি, খবরের কাগজে আপনার বিবৃতি পড়ে মনে হল আপনি সেই খোঁয়াড়টা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে চাইছেন।

জেল থেকে আমরা যারা ছাড়া পেয়েছিলাম, শুনেছি আপনি তাদের দু-একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ওরাই বলেছিল আমার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে চাইছেন। ধরণীদা, আপনার বোধ হয় জানা ছিল ছোটোবেলা থেকে আমার সব কাজই বাঁ হাতে করা অভ্যাস। মজার ব্যাপার এই, আমার ডান হাতটাকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে।

অধীশের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম। কোনও তাড়া ছিল না। বাড়ি ফিরেই বা কী করব। মা-ভাইবোন ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হয়। এই দিনগুলিতে আমার আত্মহত্যা করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠত। নিজেকে হত্যা করার হাত থেকে রেহাই পেতে এলোপাতাড়ি ঘুরতাম শুধু। অধীশ পাশ ফিরে দাঁড়িয়েছিল। আমি পিছন থেকে গিয়ে ওর পিঠে মৃদু ধাক্কা দিতেই ও চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল দ্বিতীয়বার। বলল, 'দীপেন, তুই!' আমি কোনও কথা না বলে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ও নিজের জুতোর ডগা থেকে শুরু করে নিজেকে যতটা দেখা যায় দেখল। বলল, 'ভালো আছিস?' আমি আমার ডান হাতটা তুলে ধরবার চেষ্টা করতেই সেটা একপাশে ঝুলে রইল। সে দিকে তাকিয়ে অধীশের সমস্ত মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। যেন কিছুটা আতঙ্কিত এইভাবে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'একদিন চলে আয়।' কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল, 'আজ চলি।' কথাটা বলতে গিয়ে কেমন জড়িয়ে গেল। অধীশ এমনভাবে দ্রুত এগিয়ে গেল, মনে হল ও আমার কাছ থেকে পালাতে চাইছে। লাল রঙের একটা মারুতি গাড়ির মধ্যে গোলাপি রঙের এক সুন্দরী বসে ছিল। অধীশ গাড়ির ভিতরে গিয়ে স্টিয়ারিং ধরল। বাইরে তাকিয়ে দেখল গাড়ির জানলার কাছে আমি দাঁড়িয়ে। ঝটিতি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে অধীশ বলল, 'আসিস কিন্তু।' চকিতে গোলাপি সুন্দরীর মুখে দেখলাম বিরক্তি।

ধরণীদা, পুলিশ আমাকে ধরলেও আমার রিভলভারটাকে নিতে পারেনি। জেল থেকে বেরিয়ে সেটাকে গোপন জায়গা থেকে বের করে আমার নিজের কাছে রেখেছিলাম। চারটে গুলি অবশিষ্ট ছিল। আত্মহত্যার কথা মনে হলেই আমি সেগুলি নিয়ে কখনও নাড়াচাড়া করতাম। অধীশের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দুটো গুলি ওকে উপহার দেওয়ার কথা মনে হল।

অধীশের ব্যাপারে যতটুকু কানে এসেছিল তা হল, সে দিন আমাদের গোপন আস্তানার খবর পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ওর মা। অধীশের বাবা পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে অধীশকে ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দেন বিদেশে। আমরা যখন জেলে অধীশ তখন ধীরে ধীরে ইস্পাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। ফিরে এসে ওর বাবার ফ্যাক্টরিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নিশ্চিন্ত।

আমি সুযোগ খুঁজছিলাম অধীশের মুখোমুখি দাঁড়াবার। একদিন বাড়ি ফিরে শুনলাম রেশনের দোকানের কাজটা ভাইকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। দোকানের মালিক ওর বদলে অন্য একটি ছেলেকে কাজ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা ছেলেটি স্থানীয় নেতার কাছ থেকে একটা চিঠি এনেছিল। সে দিন খেতে বসে মাকে আর মিথ্যা গালগল্প শোনাতে ইচ্ছে করল না। কোনওরকমে খাওয়া শেষ করলাম। ধরণীদা, হয়তো সে দিন রাতেই আমি নিজেকে হত্যা করতাম। হঠাৎ মনে হল মরতেই যদি হয় একা নয়।

পরদিন অধীশের অফিসে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বারোটা। সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কোমরের কাছে সযত্নে রেখেছিলাম অস্ত্র। চারটে গুলি ভিতরেই ছিল। মনের অবস্থাটা ছিল এলোমেলো।

ঘুম থেকে উঠেছিলাম অনেক আগেই। সারারাত না ঘুমিয়ে ভাই বিছানায় ছটফট করেছে। শেষ রাতে বোধ হয় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমরা। ও তখনও ওঠেনি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। বারান্দায় এসে দেখি বোন হাঁটুর ভাঁজে মুখ গুঁজে বসে। আমার চোখে চোখ পড়তেই উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আমি মার কাছে গিয়ে হঠাৎ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মার চোখে একটা দিশাহারা ভাব ফুটে উঠল। আমি সব পিছনে ফেলে দ্রুত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

রিসেপশনের পুতুল পুতুল মেয়েটির হাতে আমার নাম লিখে একটা স্লিপ এগিয়ে দিলাম। সকাল থেকে কিছু মুখে দিইনি। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। হঠাৎ রিন রিন কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালাম। অধীশের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে মেয়েটি।

কোমরের কাছে একবার হাত দিলাম। বেয়ারা দরজা খুলে দিতেই শুনলাম অধীশ বলল, 'কাউকে ভিতরে আসতে দিও না।' ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঘবের ভিতরে আমি আর অধীশ। কোমরের কাছে শীতল স্পর্শ। অধীশ জানত বাঁ-হাতে নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করতে পাবি আমি। ধরণীদা, অধীশের ঘরে ঢুকে একটা সুন্দর ঠাণ্ডা পরিবেশে আমি আরাম অনুভব করলাম। আমার একটু বসতে ইচ্ছে করছিল। তার আগেই অধীশ বলল, 'আয়, বোস।' আমি বসতেই ও বলল, 'অনেক দেরি করে ফেললি। আমি ভেবেছিলাম আরও আগে আসবি। যা হোক কোনও অসুবিধা হবে না।' দুটো টাইপ করা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'একটাতে সই কবে আমাকে ফেরত দে।' হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে দেখলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। অধীশের ফ্যাক্টরিতে। হাত বাড়িয়ে কলম নিয়ে একটা কাগজ সই করে অধীশকে ফেরত দিলাম। ধরণীদা. বিশ্বাস করুন. কোমরের কাছে রাখা অস্ত্রটার কথা আমার যে একেবারে মনে ছিল না। তা নয়, কিন্তু একটা চাকরি পেয়ে আমার মা-ভাইবোন এদের মুখ চোখেব সামনে ভেসে উঠেছিল। সেই মুখগুলিতে একটু হাসি ফুটে উঠুক এই চাওয়াটাই আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল তখন। এ কথা অস্বীকার করবার কোনও কারণ নেই।

জানি না আপনি আমাকে এখনও কেন খুঁজছেন। আপনি আমার কাছ থেকে কী আশা করেছিলেন অথবা এখনও কী আশা করেন তা বুঝতে পারছি না। তবে আঁচ করতে পারছি হয়তো অতীতের ভুল, আজকের নয়ানীতি, ভবিষ্যতের লড়াই এ সব নিয়ে নানা স্বপ্ন দেখাবেন।

ধরণীদা, সকলের মতো আমিও স্বপ্ন দেখছি। শুনলে খুশি হবেন ধরণীদা, আমার ভাইও একটা চাকরি পেয়েছে। অধীশের ফ্যাক্টরিতেই। আমার বোনের জন্য একটা পাত্রেব সন্ধানে আছি। আপনি গতকালও আমার খোঁজ কবেছিলেন। ধরণীদা, একদিন নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে। আমি এখন যেমন আছি হয়তো একদিন এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকব না। আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, আবও আরাম, ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য আরও ভালো চাকরির প্রয়োজন হতে পারে আমার। এমনও হতে পারে সে দিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটাব নিতে গিয়ে দেখব সেটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য টেবিলের উলটোদিকে বসে আছেন আপনি। □

একটি নাটকের ভূমিকা

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

এই কিছুক্ষণ আগেই, দুঃসহ রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মেখে যেন গা এলিয়ে পড়েছিল রাস্তাটা। রাস্তা বলতে রাস্তার কঙ্কাল। রাজকীয় মহিমা হয়তো একসময়ে ছিল। এখন এই নির্জীব গলিটার মুখে এসে, কর্পোরেশনের পাহাড়-প্রমাণ নোংরা আর্বজনাস্তূপের অত্যাচারে শীর্ণ হতে হতে এর বিশাল দেহটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। পুরোনো দিনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুপ্ত গৌরবের শেষ ছোঁয়াটুকুও এখন মুছে ফেলতে পারেনি পাশাপাশি অতিকায় বাড়িগুলো। কালচে, ধুলো জমে যাওয়া ইতিহাসের পাতার মতো মাঝে মাঝে কোনও বয়স্ক লোক হয়তো ঝাপসা দৃষ্টির পাতা উলটিয়ে মনে কবতে চেষ্টা করে এককালে কত চেকনাই ছিল রাস্তাটার। একদিকেব পেট চিরে আবার নিতান্ত অভদ্রের মতো ট্রামলাইনের খানিকটা অংশ ঢুকে পড়েছে। তাতে রাস্তাটাকে আরও বেঢপ দেখায়।

গলির মুখে, মন্টাদার দোকানের ঝকঝকে সাইনবোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে একটি বছর নয়েকের ছেলে। ড্যাবডেবে চোখে সকালের কলকাতাকে গিলছে।

সকালবেলার চনমনে রোদ্দুর দাপিয়ে এসেছে রাস্তাটাব উপর। গলির মুখের দোকানপাটের ঝাঁপ সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। অনেক রাত্তির পর্যন্ত রাস্তাটার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শোনা যায়। হবেক রকমের ব্যবসাপত্তর পাশাপাশি বাড়িগুলোর চিলেকোঠাব থেকে নীচের অন্ধকার ঘুপচিগুলোর মধ্যেও মেলে দিয়েছে অসংখ্য শেকড়। বহু মানুষজনের আনাগোনা ছেলেটার কৌতূহল বাড়িয়ে দেয। সে খানিকটা হাঘরে দৃষ্টিতে দ্যাখে। আস্তে আস্তে রাস্তাটাব উপর ব্যস্ততার ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে। সামান্য সময়ের ব্যবধানে টুকরো-টাকবা কেনাবেচার আওয়াজ। এ-বাড়ি ও-বাড়ির দরজায় ঝিদের অধৈর্য খটাখট আঘাত। সওয়ারহীন রিকশার টুংটাং ঘণ্টাধ্বনি। ইট-পাথরের নিশ্ছিদ্র কঠিন দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে দুঃসাহসী অশথের চারা মাথা তুলেছে। সবুজের উঁকিঝুঁকির মধ্যে দু-একটা অলস পাখির মৃদু কুচকাওয়াজ এখনও শোনা যাচ্ছে। শিরশিরে হাওয়ায় খানিকটা শীতের আমেজ।

ছেলেটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে হেলতে দুলতে এগিয়ে চলা ট্রামগাড়িটাকে দেখতে থাকে। এক হাতের শক্ত মুঠোয় বুকের মধ্যে লেপটে রযেছে একটা এক পাউন্ড ওজনের পাউরুটি।

একটা দোতলা লাল রঙের বাস ট্রামগাড়িটাকে টেক্কা দিয়ে ভস্‌ভস্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেল। ছেলেটার চোখে জমাট বাঁধা বিস্ময়। চলে কী করে? হুমড়ি খেয়ে যায় না এত বড়ো শরীরটা! মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায় তাদের গাঁয়ের পাশের পাকা রাস্তার ওপর ধুকপুকিয়ে ছুটতে থাকা সেই লক্কড়-ঝক্কড় 'রামেশ্বর' বাসের শরীরটা। এক চিলতে সবুজের অস্পষ্ট রেখা হঠাৎ হাওয়ায় চোখের সামনে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়। কত তফাত! প্রতিটি বাড়িকেই তার এক একটা প্রাসাদ বলে মনে হয়। ভুল করে সব কটা বড়ো বাড়িই তার কাছে ফোর্ট উইলিয়াম। গাঁয়ে থাকতে এই নামটুকুই সে শুনেছিল।

দিদিমা ধমক লাগিয়েছিল—"অত হাঁ করে চেয়ে থাকিস কেন? গাড়ি চাপা পড়বি যে।" দিদিমা তাকে পাউরুটি কিনতে পাঠিয়েছে। "সক্কালবেলা বাসট্রামের তেড়ে আসা দঙ্গল নেই। তা ছাড়া একটু হেঁটেই গলিটার মুখে দোকান। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবি আর কবে? ম্যাড়মেড়ে গাঁইয়া থাকলে মানুষ হবি কী করে?"

আসলে সেই পনেরো দিন আগে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে ছেলেটা। অনাহারে শুকিয়ে দড়ি হয়ে যাচ্ছিল তাই নেহাত বেঁচে থাকার জন্য শহরে পাঠানো। মামার বাড়ি লেখাপড়া শিখতেও পারবে। কিন্তু এই পনেরো দিনেই মামাদের কট্‌কটে চোখের ভালোবাসা মাপতে অসুবিধে হয়নি ছেলেটার। শহরে থেকে মামাদের খেয়ে লেখাপড়া করা আর তার হবে না। ইতিমধ্যেই সে ফাইফরমাশ খাটবার জন্য একটি বাড়তি ছোকরায় পরিণত হয়েছে। তবু দিদিমা তাকে চোখে চোখে রাখে বলেই রক্ষে। কিন্তু দিদা এ দিক ও দিক দেখতে দেয় না একদম। ঠিক এখনই দিদার চোখের শেকল খোলা। রুটি কিনতে এসে সে এখন স্বাধীন। এখানে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কলকাতাকে দেখলে কারোর কিচ্ছুটি বলার নেই।

রাস্তা দিয়ে বাজারের থলে হাতে একটা মোটা মতন লোক আসছে। একটা অভব্য কৌতূহলে ছেলেটা লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে থাকে। থলথলে ভুঁড়িতে আলগা করে একটা ধুতির গিঁট লাগানো। গায়ে একটা হাফ শার্ট। গোলগোল মুখের মধ্যে দুটো ছোটোখাটো খাদান। দুটো চোখ। চোখের নীচে রহস্য। দেখলে গা ছমছম করে। পুরুষ্টু মোটা ঠোঁটের উপর কাঁচি দিয়ে ছেটে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে একজোড়া হিন্দুস্থানি গোঁফ। থপথপ করে হেঁটে লোকটা তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। ছেলেটার দৃষ্টি এখন সরে গেছে রাস্তার দিকে। একটা সুদৃশ্য গাড়ি হনহন করে এগোতে গিয়ে জরদগব ট্রামের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিরক্ত হয়ে ড্রাইভার হাতে কামড়াচ্ছে আর ক্রমাগত প্যাঁ পোঁ করে হর্ন বাজিয়ে চলেছে।

ঠিক এমনি সময়ে, যখন কলকাতা ক্রমশ কোলাহলময়ী হয়ে উঠেছে তখন তার সমস্ত কোলাহলকে ছাপিয়ে একটা তীব্র বীভৎস আওয়াজ আছড়ে পড়ল সদ্য জেগে ওঠা এই রাস্তাটার ওপর। গলির মুখটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। একটা ভীষণ 'বাম' বাম' শব্দতরঙ্গ ঠিকরে বেরিয়ে গিয়ে গলিঘুঁজির ভেতরের হিমশীতল নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল। ফটাফট দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিটি মানুষের হৃৎপিণ্ডের ওপর রাশি রাশি আতঙ্ক ধারাল নখে খামচাতে লাগল। সকালবেলার তাজা ফোলা ফোলা মুখগুলোর ওপর কে যেন লেপে দিল উৎকণ্ঠার কালি। পথচলতি লোকজন এ দিক ও দিক দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাটা পরিত্যক্ত শ্মশান। আশপাশের বাড়িগুলোর জানলার খড়খড়ির ভেতর উৎকণ্ঠিত চোখের সারি। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাটা, ধোঁয়ার আস্তরণটা পাতলা হতেই তার ভেতর দেখা গেল সেই মোটা মতন লোকটা রাস্তায় পড়ে খাবি খাচ্ছে। তাজা রক্তে মাখামাখি তার বিশাল শরীরটা, পেটের এক অংশ থেঁতলে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে।

ছেলেটির চোখ দুটো হুকের মতো আটকে গেছে মৃতদেহটার ওপর। ছোটো ছোটো চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভয়। পা দুটো কেউ যেন মাটিতে টেনে ধরেছে। ছুটে পালাবার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু শক্ত মুঠোয় বাঁধন আলগা হয়নি। কারণ পাউরুটি না নিয়ে বাড়ি ঢুকলে তার অশেষ যন্ত্রণা লেখা আছে। চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে তার। প্রচণ্ড ভয়ে ঠেলে উঠে আসছে বমি। গা ঘিন ঘিন করা একটা অস্বস্তি। হঠাৎ তার পা দুটো কেমন কাঁপতে থাকে। মাথার ভেতরে কারা নির্দয়ভাবে হাতুড়ি পেটায়। কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করে। চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে। মৃতদেহটার চেহারাটা তার কাছে আরও আরও বড়ো হয়ে যেতে থাকে। ছোটো ছোটো চোখ দুটোর খাদানে আগুন জ্বালিয়ে রেখে লোকটা তাকে গিলে ফেলছে.......কার কর্কশ কণ্ঠস্বরে হুঁশ ফিরে আসে ছেলেটার। কেউ কি তাকে কিছু বলছে? হ্যাঁ তাই তো, তাই তো, মন্টাদার গলা, তাকে চেনে।

"এই, পালা। শিগ্‌গির পালিয়ে যা। চোঁ চাঁ দৌড় মার। না হলে পুলিশ এসে ছিঁড়ে ফেলবে।..."

পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে থাকে ছেলেটা, কিন্তু কোন দিকে? এই সে দিনই দিদার বাড়ি থেকে বেরবার পথটা সে মুখস্থ করে ফেলেছিল। গেটটা পেরিয়েই একটা বাঁক.....তারপর কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে ওই হলদে ছোপওয়ালা লম্বাটে বাড়িটার গা ঘেঁষে সরু রাস্তায়, নাক বরাবর গিয়ে একটু বাঁ দিক দিয়ে......কিন্তু সেই বাঁ দিকটা কোথায়?........গাঁয়ে থাকতে সূর্যের ওঠা আর পাটে যাওয়া দেখে দিক নির্ণয় করত। কিন্তু এখানে? চারদিকে বাড়ি, বাড়ি আর বাড়ি। বাড়িতে বাড়িতে ষড়যন্ত্র করে যেন আকাশকে জোর করে ঢুকতে দেয়নি

এ তল্লাটে। একফালি সূর্যকে দেখতে হলে অনেক কষ্টে ঘাড় উঁচু করে তাকাতে হয়। ছেলেটা প্রথমে ভাবল সোজা দৌড়ে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলেই হলদে ছোপওয়ালা ওই বাড়িটাকে চিনে নিতে পারবে। তারপর সোজা দিদিমার বাড়ির গেটের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যাওয়া......

ছেলেটা প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়য়। এদিক-ওদিক আরও কিছু লোক ছুটছে, বাস-ট্রামগুলো যেভাবে গুঁতোগুঁতি করে সমানে এগিয়ে যাওয়ার কসরত দেখাত সেই কসরত যেন হঠাৎ থেমে গেছে। তার চোখ পড়ল একটা বাস হঠাৎ শরীরটাকে মোচড় দিয়ে আগুপিছু সার্কাসের খেল খেলতে খেলতে পেছন ফিরে পাঁই পাঁই করে দৌড়ে পালাল। রিকশাওয়ালার বিকশার চাকা যেন হাওয়ায় গড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে। ট্রামরাস্তার ধার ঘেঁষে যে আলু-পেঁয়াজ বিছিয়ে ছোকরাটা বসত সেও চট গুটিয়ে নিয়ে ধাঁ করে সেঁধিয়ে গেল পেছনের গলিটার ভেতর। ছেলেটার সামনে হলুদ ছোপওয়ালা বাড়িটা এসে পড়েছে। কিন্তু বাড়িটার কাছে পৌঁছেই ভুল ভাঙে তার। সে আবিষ্কার করে এটা সেই বাড়ি নয়। সামনে রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। বাড়িটার গায়ে প্রায় ধাক্কা খেতে খেতে সে পিছু হটল। আবার পেছন ফিরে ছুট্। ধকাস পকাস হৃৎপিণ্ড ক্রমশ ভারী হয়ে উঠেছে। একটু বাদে বুঝিবা ফেটে যাবে। পায়ের শিরায় টান ধরেছে। গোড়ালির তলায় জ্বালা। রবারের চপ্পল কোথায় ছিটকে বেরিয়ে গেছে—ছেলেটা ছুটতে ছুটতে আবার ঠিক একই জায়গায় ঘুরে এল। গলি আর ট্রামলাইনের মুখে। কিন্তু রাস্তায় কারা? চারদিকে ফিসফাস, গুঞ্জন, লোকটা পড়ে আছে। সে আবার উলটোদিকে দৌড়য়। কিন্তু এবার আর তার শরীর চলছে না। শুধু একটা গিলে খাওয়া ভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। রাস্তাগুলো ভয়ঙ্কর নির্জন। মানুষজন একটাও নেই। অথচ এই সকালবেলায় রাস্তার আশপাশে থিক থিক করে লোক। যে যার কাজকর্ম নিয়ে অনর্গল কথা বলে যায়, ঝগড়া করে, এখন সব চুপ মেরে গেছে।

প্রতিটি বাড়ির দরজা বন্ধ। কোথাও কোনও ফোকর নেই যা দিয়ে গলে ভেতরে যাওয়া যায়। এ দিকে রাস্তাটা যেন কামড়াতে আসছে। মরিয়া হয়ে সে ছুটে ছুটে যেতে থাকে প্রতিটি বাড়ির দরজায়। উৎসুক হয়ে দেখতে থাকে মানুষ কোথাও আছে কি না। অন্তত একজন কেউ যে তাকে ঘরের ভেতর ডেকে নেবে। গাঁয়ে থাকলে যার হোক বাড়ির দাওয়ায় সে ঢুকে পড়তে পারত এতক্ষণে। হঠাৎ তার ক্ষুধার্ত চোখ একটা বাড়ির আধভেজা দরজা দেখে আশান্বিত হয়। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই একটা বাঘের মতো কুকুর ঝাঁপ দিয়ে আসে। ছেলেটো পালাবার পথ পায় না। আবার ফিরে যায় রাস্তার কাছে। এবার কে যেন তাকে বেশ জোরেই আদেশ করে : বাঁচবি তো এবার উলটো দিকে পালা। এ দিক দিয়ে পুলিশ আসবে, যা শিগ্‌গির! পালা হাঁদারাম—

ছেলেটা এবার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নেমে যায় রাস্তার মাঝ বরাবর। একেবারে গিয়ে পড়ে মড়াটার পাশে। হঠাৎ হাত থেকে পাউরুটিটা খসে পড়ে যায় তার। চাপ চাপ রক্তের উপর। নিচু হয়ে পাউরুটিটা তুলে নিয়ে সোজা সামনের দিকে ছোটে আবার। পাউরুটিটাকে জোরে চেপে রাখে। হারালে মামিরা খেতে দেবে না। বোধ হয় এতক্ষণে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে মামিদের। কিন্তু একি! সামনের রাস্তায়ও সেই ভয়ঙ্কর নির্জনতা, বাড়িগুলো জনমানবহীন এক একটা অন্ধকার প্রাসাদেব মতো। হঠাৎ তার মনে হয় কেউ তার পেছনে ধাওয়া করছে। নির্ঘাত তাকে ধরে ফেলবে। মায়ের করুণ মুখটা এই মুহূর্তে বড়ো বেশি করে নাড়া দেয় তার স্মৃতিকে। দিদিমা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর কান্নাকটি শুরু করে দিয়েছে! মামারা তো বাজারে, জানতেও পারবে না। বাবাটা সেই গাঁয়ের বাড়িতে। দুধি গাইয়ের বাছুরটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে হাম্বা রবে জানান দিচ্ছে তার খিদে পেয়েছে—ছোটনটা মার কোলে বোধ হয় খলবলিয়ে উঠেছে—আবার ছবিগুলো সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

ও দিকে রাস্তার উপর তখন আর এক দৃশ্য। বিকটদর্শন কালো জন্তুর মতো পুলিশ ভ্যানটার পেট খালি করে নেমে এল সশস্ত্র পুলিশ। দুজন অফিসার লাশটার পাশে দাঁড়িয়ে। মুখে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কে একজন ওয়ারলেসে খবর পাঠাচ্ছে লালবাজার কন্ট্রোলরুমে। পদাধিকার বলে পুলিশের ডি সি ডি ডি সর্বময় কর্তৃত্ব জাহির করছেন। লোকাল থানার বড়োবাবু হাঁসফাঁস করতে করতে হুকুম তামিল করছেন।

গোটা পাড়াটা সিল করে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হল। অবিলম্বে আদেশ পালনের জন্য তৎপর হয়ে উঠল বাহিনী। প্রতিটি গলির মুখে মুখে সশস্ত্র পুলিশের উদ্যত বন্দুক। সাদা পোশাকের গোয়েন্দার কঠিন মুখে জটিল প্রশ্নের গোলকধাঁধা। কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে আক্রমণ হয়েছে এই নিয়ে মাপজোকও চলছে। কপালে কুঞ্চনের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে গোয়েন্দার। দাঁতে দাঁত চেপে পুরো রাস্তাটাকে সন্দিগ্ধ চোখে উলটে পালটে এ পিঠ-ও পিঠ করে জরিপ করতে থাকেন ডি সি নর্থ। সম্ভাব্য প্রতিটি মানুষের চোখের কর্নিয়ায় অদৃশ্য কোনও চক্রান্তের সন্ধান করেন। ট্রামরাস্তার ওপার থেকে এ দিক-ও দিক বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে জলবিন্দুর মতো সি আর পি-র হেলমেট ছড়িয়ে যেতে থাকে। রাস্তার দুপাশে প্রতিটি বাড়ির উপর থেকে ভেতর পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় তল্লাশি চালাবার আদেশ দেওয়া হয়। প্রতিটি মানুষের শরীর তন্নতন্ন করে চিরে ফেলে অনুসন্ধান চালানোর নির্দেশ আসে ওপরওয়ালাদের। ধড়টি পড়েছে পুলিশের একজন শাঁসাল কেউকেটার। প্রায় শখানেক বিপজ্জনক নকশালকে সে হজম করে ফেলেছিল। সুতরাং পাতালে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলেও খুঁজে বার করতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট্। ডিসি-র চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। ঘন ঘন হাঁকডাকে আর বল্গাহীন খিস্তি-খেউড়ে চারদিক দাবড়ে ফেলতে থাকেন তিনি। গোটা মিনিস্ট্রি লেভেলে সাড়া পড়ে গেছে। সুতরাং হত্যাকারীদের চাইই। সে নকশাল হোক, সমাজবিরোধী হোক—যেই হোক না কেন। কী দুঃসাহস ছোঁড়াগুলোর, গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকে চ্যালেঞ্জ জানায়! সকালবেলা ভালো করে কোষ্ঠ সাফ হয়নি ডিসির। মাঝে মাঝে পেটটাও শালার বেইমানি করছে, বিপত্তি বেড়েছে তাঁর।

বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠতে থাকে একটা দমবন্ধ করা অস্বস্তিতে। ক্রমশ রোদের তাপ বেড়ে যায়। কলকাতার ব্যস্ততার বেলা বাড়ে। অথচ আজ এই হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী লেন আর তার আশপাশের গলিগুলোর ব্যস্ত জীবনের কোলাহল যেন এক লহমায় উবে যায়। আজ মানুষগুলোর মুখ কেউ সেলাই করে দিয়েছে। শুধু এ দিক-ও দিক ফিসফাস। মৃদু গুঞ্জন। আজ যেন কারওর অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। বেড়ে দেওয়া ভাতের থালায় বেড়াল উৎসব করছে কোথাও। কেঁদে-কেটে ককিয়ে ওঠা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে জোর করে থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে মায়েরা। গলির মোড়ের জটলার খদ্দেররাও আজ কথার তুবড়ি খুলে বসেনি। একটা চাপা গুমোট। মরা মরা ফ্যাকাশে রোদ্দুরে গায়ে জ্বালা ধরে। গলদঘর্ম পুলিশের অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি। সতর্কতা, চরকির মতো ঘোরা চোখ। বিশ্বাসঘাতক সময় ওত পেতে বসে থাকে। তল্লাশকারী পুলিশের স্বেচ্ছাচার চরমে ওঠে যতই ওরা হতাশ হয়। যান্ত্রিক কলরব কোনও সময়েই থিতিয়ে যায় না।

ফটোগ্রাফার ফটো তোলে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। অতি উৎসাহী রিপোর্টার ডিসির আগুন আগুন মুখের সামনে ভিড়তে পারছে না তাই দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রত্যাশায়। পুলিশের বিবরণ অনুযায়ীই তৈরি হবে রিপোর্ট। গোটা এলাকা জুড়ে জাল বিছানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনাচারেক প্রাইম সাসপেক্টকে ঘাড় ধরে নিয়ে এসে পেছনে বুটের লাথি কষিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল ডিসির সামনে। আর কোনও ব্যাটাছেলেকে পাড়ায় পাওয়া যায়নি। ক্ষুধার্ত ডিসি তখন যে কোনও মূল্যে খবর বার করতে চায়। কেতাদুরস্ত জব্বর ঝাড় যত বেশি পড়বে ততই পাথর গলতে শুরু করবে এবং ইনফরমেশন। ডিসি চারজনকেই একটা টেম্পোরারি বিচারালয়ের সামনে দাঁড় করায়। বিচারক সে নিজে। কারণ আদালত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। শকুন-চোখ উকিলের জেরার সামনে পড়তে হয়। অনেক দুঁদে পুলিশ অফিসারকেও ছাই ছাই মুখ নিয়ে উকিলের ঝাম্টানি সহ্য করতে হয়েছে এ অভিজ্ঞতা আছে ডিসির। তা ছাড়া কোর্টে হাজির করতে গেলে অনেক রকমের গণতন্ত্রের কোড মানতে হয়। এত বছরের চাকরি জীবনে ডিসি এ সবের তোয়াক্কাই করেননি। সুতরাং আজ এ সব ঢঙ তার সহ্য হবে না। চারজনের identification খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেললেন তিনি। এক নং ট্রামরাস্তার পাশে আলুওয়ালা রবি, দুই—মুদির দোকানি মন্টা, তিন—নিমকি জিলিপিওয়ালা, চার—সেই সময় বাজার করতে যাওয়া এক প্রাইভেট কোম্পানির অফিসার।

এগিয়ে আসে একজন খুদে অফিসার। ডিসি লালবাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যস্ত রাখে নিজেকে। এই পেটি একটা ইন্টারোগেশনের সামান্য ব্যাপারে অধস্তনরাই যোগ্য। তাঁর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার

কোনও মানেই হয় না। তা ছাড়া নিতান্ত বেয়াড়া গোছের রগুড়ে স্নায়ুর কোনও হার্ড-কোর ছাড়া ডিসির ইন্টারোগেশনের সামনে দাঁড়াবার সৌভাগ্য কারও হয় না। বাকিরা কয়েক রাউন্ড আগাপাশতলা কচুয়া ধোলাই খাওয়ার মধ্যেই কোনও না কোনও সময় ব্রেক করে যায়। কিন্তু এখন আবার হার্ড-কোরদের সংখ্যা খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে যাওয়ায় ডিসির পরিশ্রম হচ্ছে বিস্তর। এর জন্য তাঁর বিরক্তিরও সীমা নেই। আগে তাঁর খানিকটা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করতে ভাল লাগত কিন্তু এখন এই সেয়ানা যে কে—এই ব্যাপারটা ঠিক করতেই পুলিশের নার্ভের ওপর ভীষণ স্ট্রেন পড়ে যাচ্ছে। তবে আলুওয়ালা রোগা-পটকা ছেলেটাকে বাগে আনতে এই খুদে পোকা পোকা দাঁতওয়ালা নেংটি ইঁদুরটাই যথেষ্ট। একটু একটু করে আপাত গম্ভীর নিরেট সাহসের মাটি কেটে কেটে ও ঢুকে পড়তে পারে অনেক ভেতরে। "এই, অমন খরগোশের মতো তির তির করে দৌড়ে পালাচ্ছিলি কেন?" সরাসরি প্রশ্ন রাখে খুদে। ওস্তাদি কায়দায় পানের পিকটা ফেলে দিয়ে মেলে ধরে ব্যাঁকানো দৃষ্টির হুকটা। খামচে তুলতে পারলেই হল।

"এজ্ঞে ভয়ে", নিতান্ত অসহায়ের মতো উত্তর দেয় ছেলেটা। একটু দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা আলুর ঝাঁকা ও পেঁয়াজের ডালাটার হতকুচ্ছিত দোমড়ানো চেহারার উপর চোখে চলে যায় তার। আঁতকে ওঠে সে। আজ মহাজনের দেনা শোধ করার কথা। অন্তত সুদটা। আলুগুলোর পেট ফেটে রাস্তায় পড়ে আছে। পুলিশের লোকেরা তার আলুগুলোর উপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ স্পৃহায় বুট জুতো পরা পায়ে নেচেকুঁদে সাবাড় করে দিয়েছে।

"ভয়ে? কার ভয়ে?"—ঠাণ্ডা হিলহিলে সাপের ফণা মাথা তোলে।

মিইয়ে যায় রবি। "এজ্ঞে—"

"চল্ শালা।" একটা রদ্দা নেমে আসে।

"এজ্ঞে—"

"শালা এজ্ঞে এজ্ঞে বলে তো খুব ঢঙ দেখিয়েছ এখন বলো তো বাপধন, ছুটছিলে কেন?"

"আপনেদের ভয়ে হুজুর।"

"আমাদের ভয়ে? কেন, পুলিশকে তোর অত ভয় কেন?" হুকের দাঁড়া দুটো হাঁ করে থাকে ধরবার জন্য।

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে আস্তে আস্তে চোখ তোলে রবি।

"হুজুর, গরিব লোক, ছোটোখাটো ব্যবসা করে খাই, ঘরে ছয়টা পেট, কুন কিছু ঝুট ঝামেলা হলি থানায় নে গেলে ঘরে আমার বাল-বাচ্চা সব না খেয়ে মরবে—"

"শালা, ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে বসল। তুই পুলিশকে ভয় পাস কেন, আগে সেটাই বল্। তুই তো চোর-ডাকাত বা খুনি নস্—?" ঠাণ্ডা চোখ স্থির থাকে রবির ওপর।

"এজ্ঞে, না হুজুর।"

'তা যদি না হয় তা হলে খামোকা ভয় পেতে যাবি কেন?"

"এজ্ঞে যদি অভয় দ্যান তা'লে বলি—"

"হুঁ বল।"

"পুলিশ রামকে ধরতি এলি শ্যামকে ধরি নে যায়, তাই ভয়ে ভয়ে থাকি হুজুর"—একটা ভারী বুটের লাথি রবির পাঁজরের উপর এসে পড়ে। রবি ছিটকে পড়ে। আবার ওঠে। তার পায়রার খাঁচার মতো বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করে।

"শালা পুলিশ কি অন্ধ না কিরে—পুলিশের নামে কেচ্ছা! শালা ভালো ম্যাও ধরেছিস তো।" অফিসারের বড়ো লাগে। জ্বালা ওঠে।

"এজ্ঞে না হুজুর।"

"তবে? পুলিশের নামে দুর্নাম রটাচ্ছিস!"

"এজ্ঞে আর বলব না।"

"একটু আগে এখানে কোনও চ্যাংড়া ছেলেদের ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিস?"

"না হজুর।"

"কোনও স্লোগান শুনেছিস?"

"না হজুর।"

"দেখেশুনে না বলছিস।"

"এজ্ঞে না হজুর।"

"বোমা যখন ফাটে তখন তোর চোখ কোথায় ছিল শালা?"

"এজ্ঞে নিক্তির ওপর।"

"ধুস্স্ শালা, একদম ভুসিমাল, কচলে কিছু হবে না।" বিরক্তিতে ফেটে পড়ে অফিসার।

"আমারে ছাড়ি দিবেন হজুর—।" রবির চোখে করুণ প্রত্যাশা। অফিসার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এতক্ষণ পরিশ্রমের পর ছেড়ে দিতে তার ইচ্ছে করে না। একটা পাশবিক আনন্দেই সে ছেলেটাকে আটকে রাখতে চায়।

"না, শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে তোকে, শালা রাস্তার ওপর ব্যবসা করছিস—এটা কি তোর বাপের জায়গা?" রবির কাছে সমস্যা। সত্যিই রাস্তাটা কার বাপের জায়গা এটা তার জানা নেই। সে চুপ করে থাকে।

"এই, তোর লাইসেন্স আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কই দেখি।"

"দেখাতে পারবনি বাবু। আপনের পুলিশের একজন আমারে বলি দিছেন যে তেনার কথাই নাকি লাইসেন্স—।" লাল হয়ে ওঠে অফিসারের মুখ। তিনি আর সময় খরচা করতে চান না। রবি ঝাঁকা সমেত ভ্যানের খোলে চলে যায়। দ্বিতীয় নম্বরে মন্টার পালা। চেহারাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় অফিসার। বেশ নধরকান্তি খোলতাই শরীর।

"খড়খড়ির ভেতর দিয়ে কী দেখছিলে।"

"লোকটার উপর বোমটা পড়ল।" খানিকটা রোয়াবি কায়দায় উচ্চারণে একটা অসংস্কৃত ভাব রেখে উত্তর দেয় মন্টা, ভাবখানা পুলিশকে সে থোড়াই কেয়ার করে।

"কোত্থেকে পড়ল?"

"সেটা আমি কী করে জানব? জানবার কথা আপনাদের।" ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

"জানার জন্য কৌতূহল যখন ছিল তখন ভেতরে ভেতরে সন্দেহটাও ছিল—।"

"কাকে সন্দেহ করব?" কথার সুরে অফিসারের অবাক লাগে।

"পাড়ার কে কে নকশাল আছে, চেনো?"

"লোকাল এম এল এ-কে একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে। আমিই করে দিয়েছি।"

"অ্যাঁ!" চমকে ওঠে অফিসার। "কোন্ এম এল এ?"

"মি: অমুককে চেনেন না? সে কী মশায়? ভীষণ ইনফ্লুয়েনশাল লোক।" মন্টা খেলা দেখতে থাকে। দেখতে থাকে পুলিশ অফিসারের মুখের ভাবে কেমন পরিবর্তন আসে। এম এল এ-র পেছনে ঘুরতে ঘুরতে এ সব অভিজ্ঞতা তার জলভাতেব মতো হয়ে গেছে।

"ওঃ! তা এতক্ষণে সে কথা বলবেন তো?" অফিসার তুমি থেকে আপনিতে উঠে আসেন।

"দেখুন দেখি কী ফালতু ঝামেলা হচ্ছে। আপনারা মশায় সব ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! আই অ্যাম রিয়েলি স্যরি ফর দ্য ইনকন্ভেনিয়েন্স—"

খুদে অফিসার এবার ডিসির কানে কানে কী যেন বলেন। ডিসি হঠাৎ দ্রবীভূত হয়ে মন্টার কাছে আসেন। "আরে আগে একটু জানান দেবেন তো। এ শালার কাউকে বিশ্বাস নেই এখন, বুঝলেন! একটা কুকুর পর্যন্তও আজকাল বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে মশাই! কখন ঘ্যাঁক করে কামড় বসিয়ে দেবে। তা আপনাদের বস্‌কে বলবেন লিস্টটা আমরা পেলে আমাদের পক্ষে কাজের সুবিধে হবে। আমরা মিলিয়ে দেখব।" মন্টাদা মাথা নেড়ে হেলতে দুলতে চলে যায়। ডিসি তার অপস্রিয়মাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উগরে দেন সমস্ত ক্ষোভ! "শালা রামগরুড়ের ছানা। একটা ফার্স্টক্লাস ক্রিমিন্যাল। এখন এম এল এ-র কাছা ধরে ধরে লিডার বনে গেছে।"

তিন নম্বরে, রাগে গরগর করতে করতে মিঃ মিত্র আসেন। প্রাইভেট কোম্পানির সেল্‌স্ এগ্‌জিকিউটিভ, তিন হাজারি মনসবদার। আচমকা পুলিশের লাথি খেয়ে তাঁর নাদুসনুদুস শরীরের বিভিন্ন জায়গার নাটবল্টুগুলো কিছুটা বিকল হয়েছে।

"কী ব্যাপার? এভাবে আমাকে হিউমিলিয়েট করার কোনও রাইট নেই আপনাদের। আমার ভ্যালুয়েব্‌ল টাইমটাকে নষ্ট করে দেওয়ার কোনও মানে হয়?"

চেহারার লালিত্যে, ফেটে পড়া রক্তের আধিক্যে এই বপুর দিকে ডিসির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবার।

"দেখুন, আমাদের ঠিক এই সময়টাই ভীষণ মূল্যবান। কারণ এই সময়টুকুই আমাদের অনেক কিছু ক্লু দিতে পারে। দেরি হলে রক্তের দাগটা মুছে যাবে।"

"তা এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?"

"একটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে গোটা এলাকাটার নাড়ির সম্পর্ক থাকে। আমরা টের পাই।"

"আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। আই নো নাথিং। ওনলি আই হার্ড দা বার্স্ট অ্যান্ড স দি স্মোক—"

"ফর দ্যাট ইউ আর টু আনসার আওয়ার কোয়েরি।"

"ইন নো ওয়ে বাউন্ড টু আনসার। ইউ কান্ট ডিটেন মি। দিস ইজ ডিমোক্র্যাসি।"

"স্যরি, উই আর হেল্পলেস। ডিমোক্র্যাসির অবস্থাটা বজায় রাখবার জন্য নিশ্চয়ই আপনারা কো-অপারেট করবেন। বলুন, বোমাটা কোন দিক থেকে চার্জড হতে আপনি দেখেছেন?"

"আই হ্যাভ নো টাইম অ্যাট অল।"

"বাট উই আর হিয়ার টু টেক ইওর টাইম"—ডিসির সরাসরি উত্তর।

"আমাকে একটু কথা বলতে দিন তো। অথবা পুলিশ কমিশনারকে আমার নামটা বলুন। উইদিন টু মিনিটস আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমার আজ ঠিক এগারোটায় কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের মিটিং। আই মাস্ট জয়েন।"

ডিসি একটু থমকে যান। ওয়্যারলেসে কথা বলেন। তারপর এগিয়ে আসেন মিঃ মিত্রের দিকে, "স্যরি টু হ্যারাস ইউ। ইউ মে গো।"

রাগে গজ গজ করতে করতে মিঃ মিত্র চলে যান। এবার ডিসির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নিমকি জিলিপিওয়ালার উপর। কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তিনি পুলিশ কনস্টেবলদের আদেশ করেন বেধড়ক ঠেঙিয়ে ওটাকে ভ্যানে তুলে দিতে।

ডিসির চোখ দুটো জ্বলতে থাকে কয়লার চাঙড়ের মতো। যত্ত সব ফালতু মালকে ধরে নিয়ে এসেছে কনস্টেবল, অথচ সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে ধোঁয়াটে লাগে। এই সাতসকালে বোমাবাজি করে কি ছেলেগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? নিশ্চয়ই পাড়াটার মধ্যে কোথাও না কোথাও শালাদের সিমপ্যাথাইজার রয়েছে। নইলে এত তাড়াতাড়ি এস্কেপ করে কী করে? ডিসি একবার ভাবলেন গোটা পাড়াটাকে পেড়ে ফেলবেন। কিন্তু ওখানেও আবার ওইসব এম এল এ, এম পি, মিনিস্টার, চামচা, ইন্‌ফর্মার—এতগুলো পরগাছাকে বাদ দিয়ে অপারেশন চালাতে হবে। সম্ভব? কার গায়ে কখন আঁচড় পড়বে আর সে শালা খোদ মহাকরণে কলকাঠি নেড়ে কেরিয়ারের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

তাঁর হয়েছে শাঁখের করাত। পেটটা আবার মোচড় দিয়ে ওঠে ডিসির। রোদের তাপে মাথার চাঁদি ফেটে যাওয়ার জোগাড় হয়।

হঠাৎ জনাচারেক কনস্টেবল ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়। উত্তেজনায় তাদের শরীর কাঁপছে। তারা কোনও কথা বলতে না বলতেই ডিসির মুখ থেকে তিন অক্ষরের পুলিশ কোড বেরিয়ে আসে—"বাঞ্চোত"!

কনস্টেবলরা এই অভাবিত সম্ভাষণে হাঁ হয়ে যায়। অভ্যস্ত ওরা ঠিকই। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা যে খবর নিয়ে এসেছে তাতে এই সম্ভাষণ অভিপ্রেত নয়।

"একটা খবর আছে স্যার।" খবরের কথা শুনেই গরুকে ঘিরে আসা শকুনগুলোর মতো পুলিশেরা ঘিরে ধরে তাদের। কনস্টেবলদের কাছে জানা যায় তারা দ্বিতীয় গলিটায় একটা বাড়ির দোরগোড়া থেকে সিঁড়িতে উঠতে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে।

ফস করে দেশলাই কাঠিটা যেন কেউ জ্বালিয়ে দেয়। ডিসির ভেতরকার অতৃপ্তির ইন্ধনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে যায়। ত্বরিৎগতিতে তিনি অর্ডার করেন বাড়িটাকে ঘিরে ফেলতে। পুলিশ ও সি আর পি বাহিনী খুব সতর্কভাবে বাড়িটার চারদিক থেকে বেড় দিয়ে আসে। চারপাশের বাড়িগুলোর পাঁচিল টপকে মুহূর্তের মধ্যেই তারা ছাদে উঠে পজিশন নিয়ে নেয়। এবার ওই সিঁড়ি বেয়ে শিকারের গন্ধ শুঁকে এগোনো। চোখ-কান খোলা রেখে যে কোনও রকমের এনকাউন্টারের জন্য তৈরি থাকা।

বাছা বাছা কয়েকজন কনস্টেবলকে ডিউটি দেওয়া হয়। কিন্তু এগোনো নিয়ে ওদের মধ্যে লেগে যায় একটা ঠাণ্ডা লড়াই। এভাবে এগোতে যাওয়া মানেই সুইসাইড করা। কোনও কভার নেই। ধীরে ধীরে এনিমির ডেনের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কোনও অফিসারের লিড করার কথা। কিন্তু এগোনোর দায়িত্ব পড়ে এই কজনের ওপর! অফিসাররা শুধু অর্ডার করেই খালাস। এই আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য ওদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধে। কিন্তু বিস্ফোরণের উপায় নেই। রাইফেল বাগিয়ে ধরে দুর্গানাম জপ করতে করতে তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে একটু একটু করে। অত্যন্ত ধীর গতি তাদের। কারণ 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'-এর কোনও প্রতিযোগিতা নেই ওদের মধ্যে। এক এক সময় ওরা দু-তিনজন মিলে দেওয়াল হয়ে এগোয়। ছোট্ট সিঁড়িতে স্থান অকুলান হয়। হঠাৎ একটা ধপ্ করে শব্দ হয়। কনস্টেবল দুজন প্রায় গড়িয়ে পড়ে যাওয়া থেকে সামলে নেয় নিজেদের। বুকের ভেতর তাদের দামামা বাজে। বউ-বাচ্চার মুখগুলো মনে পড়ে তাদের। ওদের মুখগুলোকে ঠিক পোড়া বেগুনের মতো লাগে। কিন্তু বুকের ধুকপুকানি কমতে তারা আবিষ্কার করে একটা বেড়াল লাফ দিয়ে পড়েছে। বাহিনী আবার ওঠে। রক্তের ক্ষীণ রেখা পায়ের আঙুলের ছাপ নিয়ে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। একটু ধন্দ লাগে তাদের। সিঁড়িটা প্রায় শেষ হয়ে এল অথচ এখনও কোনও হদিস নেই কারও। কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ ধাপটা পেরলেই ছাদ। মুক্ত ছাদে কোথায় শালারা ঘাপটি মেরে পড়ে আছে কে জানে। যে প্রথম ছাদে নামবে তার নাড়িভুঁড়ি নির্ঘাত আউট হয়ে যাবে।

এবার ভেজানো দরজাটার কাছে এসে চারজন চারজনের দিকে বিমর্ষভাবে তাকায়। একে অপরের কাছে অনেকদিনের না বলা কথা স-ব যেন বলে দিতে চায়।

কিন্তু এ দিকে সময় নেই তাঁদের, মুহূর্তগুলো বড়ো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আত্মহত্যার মুহূর্তটা বড়ো তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে কাছে। হাতে রিস্টওয়াচগুলো ভীষণ জোরে টিকটিক করে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে একজন প্রস্তুত হয়ে নেয়। কে জানে রাষ্ট্রপতি পদকটা তার ভাগ্যে জুটলেও জুটে যেতে পারে। দরজার একটা পাল্লাকে কভার করে আর একটি পাল্লা দড়াম করে খুলে দেয় সে। আর ঠিক তখনই তাদের চোখের সামনে দৃশ্য হয় চিলেকুঠির ভেতরটা। প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটতেই তারা আবিষ্কার করে একটি আট বছরের ছেলেকে। জড়সড় হয়ে একটা পাউরুটি বুকে নিয়ে সে বসে আছে। হাতে-পায়ে শুকনো রক্তের কালচে দাগ। রুটিতে রক্ত মাখামাখি। ছেলেটার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখের

পাতা নড়ছে না। চোখগুলো ভয়ে ছোটো ছোটো হয়ে গেছে। তবুও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে বন্দুকের দিকে।

হঠাৎ যেন কনস্টেবলগুলোর ভেতরের হায়েনারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। একজনের কয়েক সেকেন্ডের জন্য মনে পড়ে গিয়েছিল নিজের ছেলের মুখ। কিন্তু সেই ছবির শক্তি বড়ো কম। বিশেষ ছাপ ফেলতে পারল না তার মনে। এখন বড়ো দুঃসময়। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস নেই। প্রায় যুদ্ধ জয়ের উন্মাদ আনন্দে মানুষি সত্তা ঢাকা পড়ে যায় তাদের। কর্তব্যপালনে তৎপর হয়ে ওঠে তারা। চারটে ক্ষুধার্ত হায়েনা এবার প্রায় খাবলা মেরে তুলে নেয় ন বছরের ছোট্ট শরীরটাকে। টেনেহিঁচড়ে বুটের লাথি কষিয়ে গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলে নীচে।

ছেলেটি ভয়ে হাত-পা ছুড়তে পারছে না.....অনেক চেষ্টা করে সে একবার চিৎকার করার শেষ চেষ্টা করে কিন্তু গলার ভেতর শুকনো কফ আটকে গিয়ে একটা ঘ্যাড়ঘেড়ে অস্পষ্ট গোঙানির মতো স্বর বেরয়। ঘোরের মধ্যে ছোট্ট স্মৃতির মণিকোঠায় ধরে রাখা মায়ের কাঁদো কাঁদো মুখটা ওলটপালট হয়ে নাচতে থাকে। ছাড়াছাড়া ছবির মতো টুকরো ধানখেত, ধলিগাই, কিছু মানুষ, বাবা—সব কলের বায়োস্কোপের মতো সরে যেতে থাকে। তারপর কে যেন তাকে দুটো সবল হাতে হ্যাঁচকা একটা টান মেরে দাঁড় করিয়ে দেয়। চোখের সামনে তার অন্ধকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাড়া পড়ে চারদিকে। ডিসির মাথায় রক্ত উঠে যায়। রক্তমাখা রুটির ছবি ওঠে পটাপট। তারপর সেই রৌদ্রতপ্ত রাজপথের ওপর ন বছরের এই "দুঁদে নকশাল"-কে পিছমোড়া করে দাঁড় করিয়ে তার আধমরা শরীরের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় দুটো বুলেট। ছেলেটি একবার মাত্র মাকে ডাকার সময় পেয়েছিল। চারপাশের বাড়িগুলোর খড়খড়ির ভেতর থেকে অনেক আতঙ্কিত চোখ নীরবে সেই দৃশ্যের সাক্ষী হয়। কেউ কোথাও কাঁদে না। শুধু ভ্যানের ভেতর আলুওয়ালা রবি ডুকরে কেঁদে ওঠে আর পুলিশের লাথি খায়। দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বাহিনী ফিরে যায় আবার। স্পটে পাহারাওয়ালা পুলিশের সামনে মৃত রাস্তাটাকে আরও মরা দেখায়। অধিক রাত্রে পুলিশের জনৈক বড়োকর্তার সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিম্নলিখিত কথাবার্তা কোনও বুদ্ধিমান সাংবাদিক টেপ করেন। প্রশ্ন : হ্যালো, নাটক কেমন জমল? উত্তর : ওয়ান্ডারফুল। প্রশ্ন : এনি রিঅ্যাকশন? উত্তর : অনেকদিন এরিয়াটা ঠাণ্ডা থাকবে স্যার।.........

পুনশ্চ : পরের দিন প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে পুলিশের সঙ্গে এক ভয়াবহ সঙ্ঘর্ষের খবর বেরয়। কুখ্যাত নকশালপন্থী বলে চিহ্নিত একজন তরুণের পুলিশের সঙ্গে বেপরোয়া গুলি বিনিময় করতে করতে মারা যাওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে গণতন্ত্রপ্রিয় দেশের মানুষ। পুলিশের একজন মুখপাত্রের রিপোর্টে বিপজ্জনক এই নকশালপন্থীটির বয়েসের জায়গায় শুধু নয়ের আগে একটা দুই যুক্ত হয়। হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি পাইপগান। □

স্বস্ত্যয়ন

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

জাজিমের উপর নরম তোশক, তার উপর মৃগচর্ম পাতা, রক্তবর্ণ তাকিয়া দু পাশে, মাঝখানে বসে আছেন গুরুদেব স্বামী অঘোরানন্দ। হরিদ্রাবর্ণের উপবীত, মাংসল দেহ নির্লোম, হাতে অস্থির জপের মালা।

একটু আগে গুরুবন্দনা শেষ হল। শঙ্খবাদ্য ও ঘণ্টাধ্বনি হল। রূপময় ঘর। গুরুদেবের পদকিনারে বসে আছে বাড়ির কর্তা রতিকান্ত পবি। নিজস্ব হাঁটুর গাঁটের পাতলা চর্বির আস্তরণের উপর নিজের আঙুলের টোকা দিয়ে স্তিমিত স্বরে ভাবাবেশে গাইছেন 'ভবাসাগর তারণ কারণ হে, গুরু দেব দয়া কর দীনজনে।' রেকাবিতে রাখা সাজা পান মুখে দিলেন গুরুদেব। রতিকান্ত চৌকির তলায় রাখা পিকদানি তুলে গুরুদেবের মুখের কাছে ধরলেন। গুরুদেব বাঁ হাতটা এগিয়ে সামনে স্থির রাখলেন। রতিকান্ত দেখল গুরুদেবের করতল তার চোখের সামনে, আঙুলগুলো গায়ে গায়ে জোড়া থাকলে বরাভয় মুদ্রা ভাবা যেত, তা নয়, আঙুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখা আছে। গুরুদেব বোধ হয় বলতে চাইছেন 'অপেক্ষা কর'।

—ডাঁড়া এই টো মুখে ডিলুম পানটা, এখনই পিকদানি হাজির করলি,—টোর'সব কাজেই টাড়াহুড়ো, গুরু বলে উঠলেন। 'টারাহুড়োয় জানবি মরণ, ঢর্ম হল ঢৈর্য ঢারণ।' রতিকান্ত দোষ করে লজ্জায় মাথা নিচু করে রয়েছে। এইবার গুরুদেব পিক ফেললেন। রতিকান্তকে বললেন গুরুদেব 'তোর সব তাতেই একটু তাড়াহুড়োরে, রজঃ গুণ প্রবল হলেই ওই ধর্ম প্রকাশ পায়। সত্ত্ব গুণার্জনের জন্য দান, দক্ষিণা, সেবা—শিষ্ট জীবন, মিষ্ট বাক্য এইগুলির অভ্যাস দরকার হয়। ওই যে অশথ বৃক্ষটা হঠাৎ করে অবিবেচকের মতো কেটে ফেলে দিলি, বিশাল ছায়ায়ডাঙা জমিটার চাষের বিঘ্ন হচ্ছিল বলে—কেন কাটলি? ছায়াঘন পরিবেশে তুই ইষ্ট চিন্তা করতে পারতিস।

রতিকান্ত বলল, 'ছবিঘা জমি পেরায় আন্ধার হইছিল গুরুদেব। ওকেনে একুন কচু বুনে দিলম, তার রোজগেরে দান দক্ষিণা ব্রাহ্মণ সেবা করে সত্ত্ব ধর্ম করা যাবে। সেই বিবেচনায় আর তা ছাড়া ন পুকুরের পাড়েও অশথ ব্রেক্ষ আছে একটা, সেটা লয় বাঁধিয়ে, ওকেনে বসে ইষ্ট নাম করা যাবে, যদি বলেন...

—যাক সে কথা, কালকের স্বস্ত্যনের জন্য যা যা দরকার জোগাড় করিস, স্বোপার্জিত জমির তিন হাত গভীরের এক খাব্‌লা মৃত্তিকা চাই। তাড়াহুড়ো করে যে সে জমির মাটি নিয়ে আসিস না য্যানো, স্বোপার্জিত হওয়া চাই। ছটি বিল্বফল, কদম্ব বৃক্ষের ছাল, আর একশো আটটি শ্বেতপদ্ম। তামাক দে। গুরুবাবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্তা ব্রাহ্মণী হেমবালা তামাক তৈরি করতে লাগল।

গুরুদেব বললেন,

নিজের যাহা উপার্জন
দান করিবে সেরূপ ধন।

—পরের দ্রব্য দান করাও যা, না করাও তা। যেমন ধর না, এই গোলাপ ফুলের মালা, এ তো অন্যের বাগানের ফুল। তাড়াহুড়ো করে জোগাড় করেছিস। রতিকান্ত হঠাৎ প্রণিপাত হল। 'আপনি অন্তর্যামী। এই ফুলগুলো চাকরবাকর দিয়ে আপনার সেবার জন্য বিডিওর কোয়াটার থিকে তোলা করিয়েছি আপনি জেনে গেছেন ঠাকুর। অপরাধ মার্জনা করুন।' গুরুদেব হো হো করে হেসে উঠলেন। 'বোকা কোথাকার। বড় তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত করে ফেলিস তুই। এতে অলৌকিক কিছু নেই। আমি দেখলুম তোর বাগানে শুধুই কচু গাছ, লাউ গাছ, বেগুন গাছ। ফুল গাছই নাই, গোলাপ দূরে থাক। দ্বিতীয়ত এটা শহর নয় যে কিনতে পাওয়া যাবে। তাতেই সিদ্ধান্ত করা গেল এই ফুলগুলো হয় ভিক্ষালব্ধ নয়তো চৌর্যলব্ধ।'

গুরুদেব তামাক খেতে লাগলেন।

—বুঝলি, ধৈর্য বড় ভালো গুণ। সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় যেমন বৌমার গর্ভে দশ মাস ধরে সন্তানটা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এক মাস আগে যদি জোর করে প্রসব করানো হত তবে অপরিপুষ্ট হত। মুনি-ঋষিরা সিদ্ধিলাভের জন্য হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করতেন। পুরাকালে নীলক পক্ষী নামে এক আশ্চর্য পক্ষী ছিল। তার পালক ছিল। চক্ষুমণি হীরকখচিত। ওষ্ঠ মুক্তানির্মিত। বসন্তকালে ডিম্ব প্রসব করার পর ত্রিশ বসন্ত অতিক্রম হত। তারপর আরও ত্রিশ বসন্ত ডিমে তা দেওয়ার পর সুসময়ে শাবক নির্গত হত। তাড়াহুড়োয় কিছু হয় না।

রতিকান্তের বালক ভ্রাতুষ্পুত্র অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে, 'নীলক পাখির ডিম এখনও আছে বাবাঠাকুর?

গুরুদেব উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললেন, হ্যাঁগো আচে বইকি, খুঁজলেই পাওয়া যাবে।'

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ ধর্মালোচনার পর ব্রাহ্মণী হেমবালাকে গুরুদেবের সেবার জন্য গুরুদেবের ঘরে রেখে রতিকান্ত শুতে গেল।

রতিকান্তর স্ত্রী ঘুমোচ্ছে। স্ত্রীর সাথে রতিকান্তর মাও আছেন। তার স্ত্রীর দু-একদিনের মধ্যেই সন্তান প্রসব করার সম্ভাবনা। তাদের বিবাহ হয়েছে প্রায় কুড়ি বৎসর। বহু চিকিৎসা ও অর্থ ব্যয়ের পর এই তাদের প্রথম সন্তান। আসন্ন সন্তানের নির্বিঘ্ন প্রসবের কামনায় স্বস্ত্যয়নের জন্য গুরুদেবের শুভাগমন। আগামীকালই স্বস্ত্যয়ন হবে। উপকরণ সবই সংগ্রহ হয়েছে কেবল স্বোপার্জিত মৃত্তিকা ছাড়া। ওটা গুরুদেবে নিজ হাতে তুলবেন।

রতিকান্ত শুয়ে শুয়ে ভাবে গুরুদেবের বাণী, 'তাড়াহুড়োর জানবি মরণ, ধর্ম হল ধৈর্য ধারণ।' তাড়াহুড়ো করেই অনেক লোকসান হয়েছে ওর। মহেশ্বরী রাইস মিলের শেয়ারটা তুলে নিয়ে ও পাটের গুদামে ঢেলেছে। কারণ রাইস মিলে তেমন লাভ হচ্ছিল না। গত বছরেই ধানকলে সরকারি আইন পালটে গেল। ধানকলগুলো ইচ্ছেমত দামে চাল বেচতে পারছে এখন। তাড়াহুড়ো না করে যদি একটু সবুর করত তবে কত পয়সা হত। দান দক্ষিণা, ব্রাহ্মণ ভোজনে আরও পয়সা ঢেলে সত্তুগুণ অর্জন করত সে। এখন আফসোস হয়। তার ছোট ভাইটাকে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই ভাইটা মরল। ভাইয়ের বউ মরল আরও ছ মাস পর। রেখে গেলে ছেলেটাকে। এখন এই ছেলেটা পৈতৃক সম্পত্তিতে বখরা বসাবে। তাড়াহুড়ো করে যদি ভাইকে বিয়ে না করাত তবে এ ঝামেলাটা হত না।

আয়ু যখন কম—ভাই তো মরতই। পৈতৃক সম্পত্তিটা তবে রতিকান্তই ভোগ করত। তাড়াহুড়ো করে বিয়েটা দিয়ে এখন আফসোস।

তাড়াহুড়ো করে কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেসে ঢুকেও কম ভুল হয়েছিল? এখন বাংলা কংগ্রেস নেই। কংগ্রেসে ঢুকেও সেরকম সম্মান পাচ্ছে না রতিকান্ত। নাঃ, এ দোষ শোধরানো দরকার।

ওর সন্তানকে, গুরুকৃপায় পুত্রসন্তানই হবে আশা করা যায়, জ্যোতিষীরও তাই মত, ধৈর্যের গুণ শিক্ষা দেবে। শিশু বয়েসেই।

গুরুদেবের বাণী মনে পড়ে রতিকান্তর। 'নিজের যাহা উপার্জন, দান করিবে সেরূপ ধন। 'খুব খাঁটি কথা। খুব খাঁটি কথা...একটু পরে গুরুদেবের পান খাবার বাটা আর রেকাবি গড়িয়ে গড়িয়ে রতিকান্তর ঘরে চলে আসে। গতকালই পানের বাটা আর রেকাবিখানা গুরুদেবকে দান করেছিল রতিকান্ত।

রেকাবিখানা মশারির বাইরে নাচতে লাগল, বলতে লাগল, 'এ আমি তোমার লয়গো তোমার লয়, আমার মুনিব নিশ্চরণ। গুরু তোমার দান লেয়নি, আমি লইতো তোমার উপার্জন।'

আর অমনি রতিকান্তর মশারির বাইরে নিশিচরণ এসে হাজির, হাতে সেই থালা। আবার বিরাট কঙ্কালে রক্ত কাঁপানো আওয়াজ তুলল 'ঝম'। আর অমনি বায়োস্কোপের মতো পুরনো হিস্টিরি দেখতে চায় রতিকান্ত—

নিশিচরণের ছেলেকে সাপে কাটার পর ছেলে ঘাসের মধ্যে পড়ে আছে, দুলু ওঝা মাথা নাড়িয়ে মন্ত্র পড়ছে

ফিঙার বচনে ফিঙি পাতিলেন বিষ
ভস্ম যারে কালপুট সাপের বিষ
মনসা দেবীর আজ্ঞায় রূংরোং সোহায়—

এমন সময় ছুটে এল সেই ছোঁড়াটা, কি না নাম, সাধন, প্রাইমারি মাস্টার। এসে বললে, 'ওঝায় কী হবে, শহরের হাসপাতালে পাঠাও।'

নিশিচরণ পরের দিন এল রেকাবিটা হাতে নিয়ে।— 'এটা রেখে পাঁচটা টাকা দ্যান বাবু, এটাই সম্বল আর কিছু নাই।'

—কী হবে রে, মদ খাবি বুঝি?

—ব্যাটারে ভরতি করেছে সোহরের হাসপাতালে, মোর পরিবার ছেলেডা দেখার মন করেছে। যাওয়া আসার ভাড়া নাই।

থালাটা রতিকান্তর ঘরে রইল। পাক্কা একসের ওজন। কারুকার্য করা। রতিকান্তর বউ মহা খুশি।

এক বছর পর নিশ্চিরণ এল আবার।

বাবু টাকাটা এনেছি। থালাডা ফিরতি দ্যান।

—নিবিখনে, আছে থাক না, নিলেই তো বেচে দিবি। বলেছিল রতিকান্তর বউ।

—তা থাকে কেনে, অঘ্রানে লেব খনে।

অঘ্রানে আবার এল নিশিচরণ, 'বাবু থালাডা দ্যান, ওটাই সম্বল, ট্যাকাডা লিন।'

—কত টাকা এনেছিল?

—কেনে পাঁচ ট্যাকা।

—সে তো আসল। ডের বছরের সুদ কত জমেছে, জানিস? বারো টাকা লাগবে।

নিশিচরণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সোজা তাকাল রতিকান্তর চোখের দিকে—'থালাডা ছেনিয়ে নিলেন গো বাবু...।'

নিশিচরণ চলে যাচ্ছে মশারির পাশ থেকে। থালাটাও সঙ্গে সঙ্গে। রতিকান্ত দ্যাখে।

এবার এল হেমবালা হেলেদুলে। গুরুসেবার জন্য গুরুর ঘরে ছিল। হেমা এসে বলল, 'গুরুদেব ফিরিয়ে দিলেন। সেবা নিলেন না।'

রতিকান্তর মনে পড়ল গুরুদেবের বাণী—নিজের যাহা উপার্জন....।

ঝম্। আবার পুরনো হিস্টিরি।

—হেমবালার স্বামী হেরম্ব নামাবলী গায়ে কাশছে, আর হাঁপাচ্ছে। রতিকান্তর গোপাল জিউর নিত্যসেবার জন্য আসতে গিয়ে, বারান্দায় বসে পড়েছে কাশতে কাশতে।

—হাঁপানিটা বেড়েছে বুঝি? রতিকান্ত বলছে।

—হ্যাঁ, বেড়েছে খুব। এক যজমান পুরীতে নিয়ে গেছিল, গত বছর শীতে ভালো ছিলাম।

এর পরের দৃশ্যে রতিকান্ত হেরম্ব পণ্ডিতের বাড়িতে। ঘরে বুড়োর যুবতী স্ত্রী। দ্বিতীয় পক্ষ। গোপন আলাপ। প্রিয় সম্ভাষণ। হারমোনিয়ামে ষড়যন্ত্রের বাজনা।

পরের দৃশ্যে পুরী যাচ্ছে হেরম্ব। রতিকান্তই খরচ দিল। মাসে মাসে কিছু টাকা পেনশন দেবে কথা দিল রতিকান্ত।

পরের দৃশ্য॥

হেমা—ছিঃ ঘেন্না ঘেন্না, আমি তো পরস্ত্রী।

রতি—তুমি বৈষ্ণবী আমিও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব পরকীয়া প্রেমে পাপ নাই। ফুটন্ত ফুলে ভ্রমর বসবে না, তা কি হয়?

আরও কিছুদিন পরের আরেক দফা সংলাপ।

রতি—গুরুদেব ওই পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত?

গুরু—পাপ কী? কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় পাপ নাই। শরীরেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।

সকালবেলা উঠে রতিকান্ত বুঝল কাল সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে।

হেমবালাকে জিজ্ঞাসা করল, জানতে পারল, গুরুদেবের কোনও অসুবিধা হয়নি রাত্রে। হেমবালা ঘণ্টা খানেক পা টিপতেই গুরু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; তারপর রতিকান্ত শুনল ওর বউয়ের ব্যথা উঠেছে। তারপর রতিকান্ত গুরুদেবের চরণামৃত নিল। রতিকান্তর বউও চাইছিল চরণামৃত। গুরুদেব বাধা দিলেন।— 'আজ তোমার পুজো। তোমার বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের সার্থকতম দিন আজ। আজই হয়তো তোমার সন্তান হবে। আজ আর আমার চরণামৃতর প্রয়োজন নেই।'

রতিকান্তর বড় আনন্দ হচ্ছে। বিশ বছরের আকাঙ্ক্ষিত পিণ্ডদানাধিকারী আসছে।

গুরুদেব স্বস্ত্যয়নে বসবেন। লোকজন ব্যস্ত। হোমকুণ্ড তৈরি; শুধু স্বোপার্জিত জমির তিন হাত গভীর থেকে সংগৃহীত মৃত্তিকা বাকি রয়েছে।

রতিকান্তর মনটা এখন কেমন কেমন করছে। গতকাল সাধন মাস্টারকে স্বপ্ন দেখেছে রতিকান্ত।

গণ্ডগোলের সময় সাধন মাস্টার বলত রতিকান্তকে, —আপনার এক খণ্ড জমিও আপনার নয়, সবই জোচ্চুরি করা। ওই জমিতে আপনার অধিকার নেই।

রতিকান্ত ভাবে—বলনা মৌজার বিশ বিঘা জমি হল বিয়েতে যৌতুক পাওয়া। ওটা ওর স্বোপার্জিত হল না। বাগদা মৌজার জমি পৈতৃক সূত্রে পাওয়া, অভিরামপুরের জমিও পৈতৃক। হাজরা পুকুরের পশ্চিমপাড় পাঁচ বাগদিকে ঠকিয়ে নেওয়া। বুড়োশিব মন্দিরের জমিও কৌশলে ভোগ করছে রতিকান্ত। রায়চরের জমিও, বিষয়বুদ্ধির বলে সাঁওতালদের সরিয়ে দিয়ে জোগাড় করেছে রতিকান্ত। বাকি থাকে বলনা মৌজার জাম গাছতলার ডাঙা জমিটা।

গত বছর অঘ্রানে ধান কিনে ভাদ্রে বেচে দিয়ে যে লাভ হয়েছিল তাতেই কিনেছিল জমিটা! উঁচু জায়গা, নিরিবিলি। ভেবেছিল ওখানে একটা মন্দির পেতিষ্ঠা করে সত্ত্ব ধর্ম করবে।

মনে হল ওই জমিই স্বোপার্জিত। তাছাড়া পবিত্র। মাটি কাটার জন্য লোক লস্কর, চাকর বাকর আর গুরুদেবকে নিয়ে রতিকান্ত চলল বলনা মৌজার জামগাছ ডাঙায়। পেছন পেছন চলল বাপ মা মরা রতিকান্তর ভ্রাতুষ্পুত্র।

রতিকান্তর মনে আনন্দ। পবিত্র মাটি পাওয়া গেছে। ধনশালী বলশালী সন্তানের জন্য স্বস্ত্যয়নের সব উপকরণই হাতের কাছে। হয়তো আজই বাপ হবে। ঢ্যামনা বদনাম ঘুচতে চলেছে তার।

জামগাছতলা খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে। দূরে রোদ্দুর পোহাচ্ছে গুরুদেব। রতিকান্ত তদারক করছে। চারপাশে পাকা ধান।

যে ছোটলোকগুলো খোঁড়াখুঁড়ি করছিল তারা শাবলের ডগায় শক্ত স্পর্শ পায়, তারপর একটু মাটি সরায় ওরা। 'মোহরের বাস্‌কো!' চিৎকার করে ওঠে চাকরবাকর লোকলস্কর। রতিকান্তর ভ্রাতুষ্পুত্র ছুটে এসে ঝুঁকে দাঁড়ায়। তারপর চিৎকার করে ওঠে—গুপ্তধন। গুপ্তধন।

সাধারণ প্যাকিং কাটের বাক্‌সো। রতিকান্ত ভাবে, এরকম কাঠের বাক্‌সেসেত তো গুপ্তধন থাকে না। রতিকান্ত বাক্‌লোটার ডালি খুলতে হুকুম করল।

এবার দেখা গেল বাক্‌সোর মধ্যে দড়ি প্যাঁচানো গোল বলের মতো কী সব। রতিকান্তর চাকরবাকর ওগুলো চিনল। চিনেই দূরে সরে গেল। রতিকান্ত ঝুঁকে পড়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে হাত ধরে টেনে দূরে সরিয়ে নিল। তারপর চাকরবাকরকে হুকুম করল, 'ওখানে বালতি করে জল ঢেলে দে।'

রতিকান্তর শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র জিজ্ঞাসা করল, 'ওগুলো কী জেঠু, ওগুলো কি সেই নীলক পাখির ডিম?'

রতিকান্ত রেগে বললে, 'তোর মুণ্ডু, সাধন মাস্টার এইসব ডিম পেড়ে রেখে গ্যাছে।'

গুরুদেব শুধুলেন, 'ওখেনে হট্টগোল কেনে? কী উঠল রে মাটির তলা থেকে?'

রতিকান্ত বললে, 'বোমা।'

গুরুদেব বললেন, 'সমুদ্র মন্থনে কখনও ওঠে হলাহল, কখনও অমৃত।

রতিকান্ত বললে, 'এ বড় বিপজ্জনক, এবারে আর খুঁড়তে হবে না। এগুলো থাক এখেনে, পরে থানার খপর দোবখনে। রতিকান্ত ওই ডাঙা জমিতেই অন্য একটা স্থান নির্দেশ করে খুঁড়তে বললেন।

একটু পরেই আবার চিৎকার করে উঠল মাটি খোঁড়া চাকরবাকর—লরকঙ্কাল বাবু। রতিকান্ত দেখে মাটির ভিতর থেকে উজিয়ে আছে হাড়, মাথার খুলির একটু অংশ। কাউকে গোর দিয়েছিল বোধ হয়। কোদালের ফলায় ক্রমশ আরও কিছু মাটি উঠে আসে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে কঙ্কালের শরীর, দুটো হাত ভাঁজ করা। বুকে, গায়ে গুটিয়ে রয়েছে একটা সবুজ রং এর জামা, অথচ শরীরের সমস্ত মাংস রক্ত মাটির সূক্ষ্ম আনাচেকানাচে মিশে আছে। রতিকান্ত দু আঙুলে চোখের কোনার ছোট্ট লাল রঙের মাংস চেপে ধরে, চোখের কোনা থেকে উঠে আসে পিঁচুটি। কঙ্কালের শরীর। বুনো কচুর মতো এখন মৃত হাড়ের রং, হাত দুটো বুকের কাছে স্থির, সবুজ জামাটা গুটিয়ে রয়েছে—হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল কেন শাবল আর কোদালের শব্দ?

—ভদ্দরলোক ছিল যে গো, কেউ খুন করেনছে—কাজের লোকেরা বলে ওঠে।

চাকরবাকরদের কোদাল শাবল আর নড়ে না, ভরা গর্তটার দু পাশে নিথর দাঁড়িয়ে। ওরা কি চিনতে পেরেছে এই সবুজ জামা? ওরা কি গোল হয়ে কোনও মৃত অজগর দেখছে?

রতিকান্তর ঘাড় গর্দান বেয়ে ঘাম নামছে। গরমের পিচ রাস্তার মতো তেতে উঠছে চামড়া, রোদ্দুরটা বড় তপ্ত মনে হচ্ছে—চোখ বুজল রতিকান্ত—চোখ বুজলেই দেখতে পায় ঝড়ের নারকোল গাছের মতো মাথা নাড়ছে সাধন মাস্টার। রতিকান্তর কানের মধ্যে গোঁ গোঁ করছে পেট্রোম্যাক্সের শব্দ। চোখের সামনে সাধন মাস্টারের বুক চাপড়ানোর শব্দ। রতিকান্ত ভাবতে চায় না সাধন মাস্টারের সেই চোখ, সেই দাঁতে দাঁত, গলার পাশের উঁচু হওয়া নীল শিরা। হরকান্তর মেজ ছেলেটা এক হাজার টাকা নিয়েছিল, ও বলেছিল সাধন মাস্টারের লাশ ফেলে দিয়েছে কুনো নদীর বানের জলে। ধোঁকা দিল?

রতিকান্ত চোখ মেলে—কুনো নদীর বান ওইখানে কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে। কালবৈশাখির মেঘের ডাক ওইখানে কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে।

ডিভিসি ক্যানেলের লকগেট ছেড়ে দিয়েছে যেন কেউ,—রতিকান্ত জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে, দলা পাকিয়ে, গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে, ঢিলের মতো, বাচ্চাদের মার্বেলের মতো গড়াচ্ছে, ছ্যাঁচড়াচ্ছে, ধানকাল, আখ মাড়াইয়ের মেশিন, জোত জমা গাইবলদ দালান পড়চা পঞ্চায়েত সব নিয়ে—তাল গোল পাকিয়ে, দলা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ...রতিকান্ত চিৎকার করে—গর্ত বোজা, এখুনি, এখুনি। নিচু হয়ে তুলে নেয় এক খাবলা মাটি, সবুজ জামার ওপর ছুড়ে দেয়, সবুজ জামা নড়ে ওঠে আর ওমনি নড়ে ওঠে জয়া-রত্না আই আর এইট-এর মাঠ। দু হাতে খাবলা খাবলা মাটি তোলে, ছুড়ে দেয় সবুজ জামায়, সবুজ জামাটা আড়াল করা দরকার। অসহ্য।

কিন্তু চতুর্দিকের সমস্ত মাঠ জুড়ে ছড়ানো সবুজে, রতিকান্ত দেখে সাধন মাস্টার শুয়ে আছে। পরনে সবুজ জামা। □

চক্রব্যূহ

কিন্নর রায়

> 'বনদুর্গার দুই ছেলে—কালকুমার আর কেষ্টকুমার। তাদের বাবা শিব। স্বর্গের পাঠশালায় কালকুমার কেষ্টকুমার পড়তে যায়। ওই ক্লাসেই পড়ে কার্তিক আর গণেশ। একই বেঞ্চিতে বসে চারজন। রোজ রোজ খাগের কলম, লেখার তালপাতা ইচ্ছে করেই নীচে ফেলে কার্তিক আর গণেশ। কালকুমার কেষ্টকুমারকে বলে, তুলে দে। দুই ভাই বড়ো দুঃখ পায়, রাগ হয়, তবু তোলে কলম। মা যে বলে দিয়েছে ওরা দুজনেই আমাদের থেকে বড়ো দাদা। বড়োমা দুর্গার ছেলে।'

এই পর্যন্ত এসে গায়ত্রীর থেমে যাওয়া। চৈত্রের শেষ দিনে তাঁর উপোসি গলায় তিয়াস। ঢোঁক চেপে শুকনো গলায় বুলিয়ে দেন থুতুর বারিধারা। বাইরে দশটা বেলার রোদে ক্রুশবিদ্ধ পৃথিবী। আকাশ ধোঁয়াটে, মেঘহীন। অথচ সেখান থেকে ক্রমাগত নেমে আসে ক্রুদ্ধ রোদের হলকা। একটি একলা চিল সেই ধূসর নীলিমায় চক্কর কাটে। তার গলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা হঠাৎ আর্তনাদে ধোঁয়াটে, মেঘহীন আকাশে ঠোক্কর খেয়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে ঢ্যাঙা পুকুরের সবুজ জলে বিঁধে যায়। চিলের ছায়া সেই পান্না রং জলে ভাঙে, যেন কোনও গুলিবেঁধা, ডানাভাঙা পাখি জলে থুবড়ে পড়ল। একটি প্রাচীন মাছ হঠাৎ ঘাই মারে জলে।

ঢ্যাঙা পুকুরের ধার ঘেঁষে এই একতলা পুরোনো বাড়ির সামনের উঠোনে ফলসার ঝাপড়ালো সবুজ ছায়া। বাড়ির পেছনে অনেকখানি ফাঁকা জমি। সেখানে আটকিরের জঙ্গল। গোটা তিনেক বেলগাছ। দুটি নারকেল গাছ। শিমুল, কলকে ফুলের গাছ। ভাঙা অব্যবহৃত পায়খানা এখন ইটের পাঁজা। তার গা-লাগোয়া একটা বকুল গাছ। সমস্ত ফলসা গাছ জুড়ে এখন কাঁচা-সবুজ ফল। লাল রঙের কাঠপিঁপড়েরা কালচে সবুজ গুঁড়ি বেয়ে বেয়ে লাইনবন্দী উঠে যেতে চায় উপরে। একটি দোয়েল শিস দিতে দিতে বড়ো নিপুণতায় সেদিকে নজর রাখে।

গায়ত্রী তাঁর উপোসি স্বর লালার সরবতে ভিজিয়ে আবার বলেন—

> 'এমনি করেই দিন কাটে। তারপর হঠাৎ একদিন কালকুমার কেষ্টকুমার বলল, না, রোজ রোজ কিছুতেই আমরা তোমাদের কলম আর লেখার তালপাতা তুলে দেব না। কিছুতেই না। তোমরা ইচ্ছে করে নীচে ফ্যালো.....'

এ সব বলতে গায়ত্রীর সামনে দিয়ে দৌড়ে যায় ফরিদপুর জেলার আকসাভোজেশ্বর। তাঁর ছেলেবেলাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। চারপাশে উঠোন। মধ্যিখানে উঁচু মাটির ধাপের উপর টিনের বাড়ি। দেওয়াল চাল সবই টিনের। বাবা স্কুলের হেডমাস্টার, আবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ছোটোকাকা আর জ্যাঠামশাই স্বদেশি করেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন দেশের বাড়ি কালকুমার আর কেষ্টকুমারের ব্রত। কোনও মূর্তি না, ছবিও না। নারায়ণ পুজো করে দিয়ে গেলেন বাবা। তারপর ব্রতকথা। আগের দিন নীলষষ্ঠী গেছে। সারাদিন না খেয়ে থাকার পর সন্ধেবেলা শিবের মন্দিরে প্রদীপ দিয়ে এসে জল খান সন্তানবতী মায়েরা। পরদিন আবার উপোস। ব্রতকথা শোনার পর ছোলার ছাতু আর যবের ছাতু গুড় দিয়ে মেখে খাওয়া।

এখন, এই ঠাকুরঘরে গায়ত্রীকে ঘিরে তাঁর তিন ছেলের দুই বউ। আর ছোটো ছেলের মেয়ে ঝালর। বড়ো বউ প্রীতি মারা গেছে, দেখতে দেখতে সাত বছর হয়ে গেল, তপন জেল থেকে বেরবার পর মাত্র কয়েকটা মাস। মেজো বউমা নমিতা, ছোটো বউমা শুক্লা। তাদের দুজনেরই হাতজোড়। দু হাতের ফাঁকে

সবুজ দুব্বো, আর দুধে-আলতা ফুল। শুক্লার একটি মেয়ে ঝালর, জোড়হাত, চুপচাপ। নমিতার কোল এখন অব্দি ফাঁকাই। যবের ছাতুর টিলার উপর কালো মাছিদের ল্যান্ডিং। আবার চক্কর কাটা।

ফরিদপুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গায়ত্রী আবার ফিরে আসেন হাওড়া জেলার বালির এ বাড়িতে। দেশভাগের অনেক আগে থেকেই কলকাতা এবং পরে এখানে থাকার সূত্রে তাঁর জিভে পশ্চিবঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সড়গড়। অথচ আচার-আচরণে, ব্রত-পার্বণে তিনি এখনও সম্পূর্ণ ওপার বাংলা।

গায়ত্রী বলে যান—

> 'কালকুমার-কেষ্টকুমারের কথা শুনে তো খুব রাগ কার্তিক-গণেশের। চোখ পাকিয়ে বলে, কী বললি, এত বড়ো সাহস তোদের, আমাদের কলম তুলবি না! বাপ-ঠাকুরদার নাম জানিস না! নরলোকে পূজা পাস না, ট্যামগোপালের নাতি! নে, শিগগির কলম তোল!'

এই দুই দেবশিশুর বহুবার শোনা দুঃখে সাত বছরের ঝালরের টানা দু চোখে মেঘ। ঠোঁটে খঞ্জন-ডানার তিরতির। নমিতা ভারী শরীর নিয়ে একটু নড়ে থেবড়ে বসে। ঝালর একবার মেজোমার দিকে চায়। তার হাত-বন্দী দুব্বো এবং ফুল ঘামের শিশিরে ভেজে।

ঠাকুরঘরে একটু গুমসোনি আবহাওয়ায় চৈত্রের রোদ ঢাক বাজাতে বাজাতে ঢুকে পড়ে। দূরে গোস্বামীপাড়ার পিচ রাস্তার উপর পরির দোকানের সামনে দিয়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে যায় গাজন-সন্ন্যাসী। তাদের পেছনে নতুন সরা হাতে সঙ-সাজা শিব-দুর্গা। গলায় গোঙানি—বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব! ঢাকের শব্দে সজনে ডাঁটা ফাটে। ফেটে যায় শিমুল ফুল। অজস্র তুলোর সাদা রোঁয়া প্রজাপতি হয়ে ভাসতে ভাসতে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে যায়।

শিমুলের গায়ের কাঁটা-ছোঁয়া রোদ ঠাকুরঘরের কোণে বড়ো সযতনে বোনা মাকড়সার মসলিন বিদ্ধ করে গায়ত্রীর অলঙ্কারহীন কানের পাশে হাওয়ায় নড়েচড়ে ওঠা পাকা চুল ছুঁয়ে খা-খা সাদা সিঁথি টপকে কোথায় কোন দিগন্তে যেন হারিয়ে যায়।

ঝালর স্থির। গায়ত্রী বলেন—

> "সে দিনই বাড়ি ফিরে দুই ছেলের হাপুস কান্না। সঙ্গে বায়না—'শিগগির বলো, আমাদের বাবা কে?' তাদের কান্না দেখে, সব শুনে, বনদুর্গা বললেন, 'কাল তোরা পাঠশালায় গিয়ে বলবি, তোদের বাবার নাম শিব।' দুই ছেলের আনন্দ আর দেখে কে! পরদিন পাঠশালায় গিয়ে ওরা বলল, 'জানো কার্তিকদা, গণেশদা, আমাদের বাবা শিব।' শুনে কার্তিক আর গণেশ এই মারে তো ওই মারে। কী! এতবড়ো আস্পদ্দা! শিব তোদের বাবা? তোরা কি নরলোকে পূজা পাস?'
>
> "ব্যাস, বাড়ি ফিরে আবার দুই ছেলের কান্না। 'মাগো, আমরা কেন পূজা পাই না মর্ত্যলোকে?' বনদুর্গা তখন বললেন, 'বেশ, তোমরা দুভাই ব্রাহ্মণের বেশে মর্তে যাও। গিয়েই তোমরা বাজারের সমস্ত মাছ-মাংস মন্ত্রবলে লুকিয়ে ফেলবে। তারপর গিয়ে উঠবে কোনও ধার্মিক ব্রাহ্মণের বাড়ি।' বাকি কী কী করতে হবে কানে কানে বলে দিলেন বনদুর্গা। তারপর দু ভাই......"

গায়ত্রীর শেষ কথাটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল মাইকের তীব্র আওয়াজ। দিওয়ার দিওয়ার দিওয়ার......। অমিতাভ অমিতাভ অমিতাভ। বচ্চন বচ্চন বচ্চন.......।

গোস্বামীপাড়া রোডের উপর দিয়ে খুব ধীর লয়ে বয়ে যাওয়া সাইকেল রিকশা সিটে দুজন সদ্য কিশোরবেলা পেরনো মানুষ। তারা তাদের গলার স্বরক্ষেপণে টেনে আনার চেষ্টা করে প্রতিধ্বনির মায়া। যেমন কোনও কোনও ভয় পাওয়ানো রেডিও বিজ্ঞাপন-নাটকে থাকে ইকো-এফেক্ট। এ তারই ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াস।

মাইক এ মুখ থেকে ও মুখ ফেরে এবং ও মুখ থেকে এ মুখে। বাতাসে ধ্বনিত হয় গলার বিচিত্র স্বরে—শশী শশী শশী। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কণ্ঠ বলে ওঠে, কাপুর কাপুর কাপুর.......। এই ইকো-প্রয়াস আকাশে মিশে

যাওয়ার পর সবাই শুনতে পায় নবতরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে পয়লা বৈশাখ কামারপাড়ায় সারারাতব্যাপী ভিডিও শো। টিকিটের দাম এক টাকা ও দু টাকা। সঙ্গে আরও দুটো রঙিন হিন্দি ছবি। রিকশা ততক্ষণে জোড়া অশ্বত্থতলা স্কুলের আশুতোষ ভবনের কাছে পৌঁছে গেছে।

গায়ত্রীর কথায় কথায় কালকুমার-কেষ্টকুমার ততক্ষণে হাজির মর্তে। ব্রাহ্মণের পোশাক। হাতে কমণ্ডলু। বাজারে এসেই তারা লুকিয়ে ফেলে সমস্ত মাছ মাংস। তারপর রোদ ঝলসানো দুপুরে কড়া নাড়ে গেরস্থের দরজায়।

"অতিথি বৎসল সজ্জন গৃহস্থ ভরদুপুরে দুজন ব্রাহ্মণের দেখা পেয়ে আহ্লাদে যোলোখানা। গৃহস্থ ও তার গৃহিণী দুই ব্রাহ্মণকে দয়া করে ভোজন করতে অনুরোধ করে। রহস্যময় হাসি হেসে দুজনই রাজি। শুধু শর্ত থাকে, মাছ-মাংস ছাড়া তারা খাবে না।

"তারপর এ হাট সে হাট, এ বাজার সে বাজার ঘুরে ফিরে আসে গৃহস্থের লোকজন। না, কোথাও একটুকরো মাছ-মাংস নেই। অতিথি নারায়ণ, তার উপর ব্রাহ্মণ, সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে। গৃহস্থ পড়ল মহাসঙ্কটে। এ দিকে অতিথি দুই ব্রাহ্মণ তো স্নান করে, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না গৃহস্থর স্ত্রী। নিজের একটিমাত্র আড়াই বছরের ছেলেকে বঁটিতে কেটে.........'

উঠোনে, ফলসার ছায়ার নীচে তপনের সাইকেল রাখার শব্দ। আজ বিকেল পাঁচটায় একটা গেট মিটিং আছে বালি জুট মিলে। সে ব্যাপারেই যোগাযোগ সেরে ফিরল তপন। উঠোন। তারপর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সিমেন্ট চটে যাওয়া এবড়ো-খেবড়ো দাওয়ায়, উঠোন থেকে অনেকটাই উঁচু। রান্নাঘর এবং ঠাকুরঘর ছাড়া একতলায় সারবন্দি পাঁচখানা বেশ বড়ো ঘর। তার একটিতে বড়ো মাপের গোদরেজের নবতাল। রেলের বদলির চাকরিতে গায়ত্রীর বড়ো ছেলে, তপনের বাবা নিশিকান্ত এখন বিহারের জামালপুরে। প্রীতির মৃত্যুর পর বছরে দুবার বাড়ি আসে নিশিকান্ত। একবার পুজোর অষ্টমীতে, বিজয়া কাটিয়ে ফেরে। আর অন্য সময় বছরে যে কোনও একবার। মাসে মাসে মানি অর্ডারে দুশো টাকা আসে গায়ত্রীর নামে। তপন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাবার সঙ্গে কোনও আন্তরিক মত বিনিময় বন্ধ। বালিতে নিজের সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা তপনের এই বিপ্লবীয়ানায় যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ এবং আহত বলে মনে করে নিশিকান্ত। একমাত্র আত্মজকেও এ ব্যাপারে ক্ষমা করা হয়ে ওঠে না।

তপন তাই গভীরে কিছু বেপরোয়া এবং জেদি। যদিও তার মুখ এবং শরীরে ধৈর্য এবং স্থির বিশ্বাসের এক আশ্চর্য মায়াবী আবরণ। নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে এই মায়া ইউরিয়া সার এবং শ্যালোর জল। এ বাড়ির সংসারে প্রায় নির্বান্ধব তপনের জন্যে দুটি ছায়া—গায়ত্রী আর ঝালর।

তপন দেখে রান্নাঘরে হা-হা উনোন। তাতে অল্প অল্প ফোটা ভাত। এই প্রায় দুপুর ছোঁয়া চৈত্রদিনে তার বুকের ভেতর চা-পিপাসা। ঠাকুরঘরে গলা ধীর লয়ে বাজে—

"বঁটিতে টুকরো টুকরো হল আড়াই বছরের ছেলে। তারপর তাকে কেটে ধুয়ে, ভালোমতো ঝাল মশলা দিয়ে রেঁধে বাটি সাজিয়ে দুই ব্রাহ্মণের সামনে গিন্নি আসন পেতে জল ভরে ভাতের থালা সাজায়। দুই ব্রাহ্মণ খেতে বসে অবাক। পঞ্চব্যঞ্জনের সঙ্গে বাটি ভরা মাংস! এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, এ মাংস আপনারা পেলেন কোথায়? মাথা নিচু করে পরিবেশন করছেন গিন্নি। দূরে হাতজোড় করে দাঁড়ানো গৃহস্থ। হঠাৎ প্রশ্ন শুনে ফুঁপিয়ে ওঠে দাসী। যে পাখা নেড়ে বাতাস করছিল এতক্ষণ। কাঁদতে কাঁদতে সেই দাসী বলল, 'ও মা, না রাক্কুসি! নিজের ছেলেকে কেটে খাইয়েছে তোমাদের।' অবাক দুই ব্রাহ্মণ। তারা তখন পরিচয় দিল নিজেদের। বলল, 'ছেলের শরীরের কোনও অংশ কি এখনও আছে?' চোখের জল মুছতে মুছতে দাসী বলল, 'আছে। ছেলের নখ আর চুল আমি পুঁতে রেখেছি কলাপাতা মুড়ে কলাতলায়।' ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণেরা তখন বলল 'ওগুলো নিয়ে এসো।' "

তারপর সব ব্রতকথাই যেভাবে শেষ হয় এ কাহিনীর অন্তিমপর্বও সেই একই সুরে। দেবপুরুষদের কমণ্ডলুর মৃতসঞ্জীবনী জলে প্রাণ পেল আড়াই বছর। পাঁচ বছর হয়ে লাফিয়ে পড়ল মায়ের কোলে অলৌকিক মহিমায়। সে দিন থেকেই কালকুমার-কেষ্টকুমারের পুজো সমস্ত পৃথিবীতে। মায়েরা এই পুজো করেন ছেলেদের কল্যাণে। ঘরের ছাতু, ছোলার ছাতু আর চিঁড়ে-মুড়কি-বাতাসা। দুপুরে আড়াই ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খান মায়েরা সেই আড়াই বছরের শিশুর কথা মনে রেখে। দুরকম ডাল আর ডাল বেটে বড়া ভাজা। একটা ডালে কচি আম।

হাতের ফুল-দুব্বো ছুড়ে দিয়ে প্রণাম করে একে একে সবাই বেরিয়ে এল। হাতে সামান্য সামান্য প্রসাদ। এরপর ছাতু মাখা হবে। সঙ্গে চিঁড়ে-মুড়কি-কলা। তপন তখন ঠাকুরমার ঘরে খাটের উপর শুয়ে ৬৯-সাল পিকিং রিভিউয়ে ছেপে বেরনো কতকগুলো প্রবন্ধের সঙ্কলন পড়ছিল। হালফিল ছেপে বের করেছে কলেজ স্ট্রিটের এক পাবলিশার। নকশালবাড়ির ঘটনার পর পরই এ সব লেখা। এবং আরও পরের কিছু প্রবন্ধ।

এই খাটেই শোয় তপন। খাটে মশারি টাঙানোর পর নীচে তেমন হাওয়া যায় না। তাই এরকম ব্যবস্থা। গায়ত্রী ঢুকে হাত রাখলেন তপনের মাথায়। ঠাণ্ডা ভিজে হাত। সাদা চন্দনমাখা আশীর্বাদী-ফুল। একটু চমকে মুখ তুলল তপন, ও তুমি! একটু চা খাওয়াবে!

—এত বেলায় চা কিসের? চান করে আয়, ভাত দেব।

—দেরি আছে এখনও, সবে তো ভাত হচ্ছে তোমার। আধ কাপ, লেবু দিয়ে।

—লেবু নেই। শুধু লিকার খাবি?

—বেশ তো। তুমি-আমি দুজনে—

—না, আমি পারি না শুধু লিকার খেতে।

তারপর গায়ত্রীর চলে যাওয়া। পিকিং রিভিউয়ের পুরোনো প্রবন্ধ সঙ্কলনে ফিরে যেতে যেতে মাথা থেকে আশীর্বাদী ফুল ঝেড়ে ফেলার জন্যে তপন হাত ঝাড়া দেয়। একবার দুবার। তারপর ফলাফল না দেখেই নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফেরে। চারু মজুমদারকে তখন চিন পার্টি দারুণভাবে সমর্থন করছে। সেইসব আশ্চর্য লাইনের ভেতর ডুবে যেতে যেতে তপন টেরও পায় না তার ঘন চুলের খাঁজে একটি ফুলের পালক নির্জন আকাশে একটি তারার মতোই ফুটে থাকে।

এক হাতে মিহি ছাই আর অন্য হাতে ছাতু নিয়ে ছাদে ওড়াতে আসে ঝালর। গায়ত্রীই তাকে পাঠান। পৌষে বাড়িতে নতুন খাওয়ার দিনে কাককে 'কা-কা-কা/আমাদের বাড়ি নতুন হয়েছে/নতুন খেয়ে যা' বলায় যে দায়িত্ববোধ এবং আনন্দ, এই ছাই-ছাতু ওড়ানোতেও তা তেমনিভাবে ফুটে ওঠে। ডান হাতের তেলোয় রাখা ছাতু ফুঁ দিয়ে হাওয়ায় মিশিয়ে দিতে দিতে ঝালর বলে, মিত্রর মুখে ছাতু দিলাম। তারপর বাঁ হাত নিচু করে দু পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছন দিকে ছাই উড়িয়ে দিতে দিতে বলে, শত্রু মুখে ছাই। একটু থেমে আবারও বলে, দাদার শত্রুর মুখে ছাই।

দুই

এ-স্টক কারখানা, অন্যান্য কয়েকটি বন্ধ জুট মিলের শ্রমিকদের সমর্থনে বালি মিলে গেটমিটিং। ঠিক পাঁচটায়। খোলাখুলি গণসংগঠন গড়ায় বিশ্বাসী নয়, এমন দু-একটি গ্রুপের ছেলেরাও এসেছিল। মঞ্চে বক্তৃতা করতে উঠে তপন বার বার জোর দিচ্ছিল ঐক্যের উপর। সমস্ত বিপ্লবী গ্রুপের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা দরকার।

বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেই বলা হল। এঁরা প্রায় সকলেই একসময়ে একটি পার্টির সাইনবোর্ডের নীচে ছিলেন। মৃন্ময় আর সুভাষকে এই মিটিঙে একেবারেই আশা করেনি তপন। এখনও মৃন্ময়-সুভাষদের সাংগঠনিক সমস্ত ব্যাপারই একান্ত গোপনীয়। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। ডায়াস থেকে নেমে একটু

অন্ধকার মতন কোণে মৃন্ময় আর সুভাষকে দেখতে পেল তপন। ও কিছু বলার আগেই ওরা হাত নেড়ে দাঁড়াতে বলল।

তখনও স্লোগান উঠছে। বাঁশের লাঠির মাথা থেকে নেমে আসছে লাল পতাকারা। ওরা তিনজন দুটো সাইকেল হাঁটিয়ে এগিয়ে গেল। তপন বলেই এসেছে অন্যান্যদের, ও-ও এগিয়ে গেল। ততক্ষণে চৈত্রের চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্না।

চৈতনপাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সুভাষ আয় মৃন্ময়ের সঙ্গে কিছু কথোপকথন তপনের। আন্দোলনের চরিত্র এবং পদ্ধতি নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক ও মতভেদ। সরাসবি খতম, অ্যাকশনে বিশ্বাসী সুভাষ ও মৃন্ময় ক্রমাগত তপনদের বলে যায় সংশোধনবাদী। আপসকামী। কোথায় যেন আমের বোল ধরেছে। তার ফিকে ম-ম সুঘ্রাণে ডুবে যেতে যেতে তপনের বুকের গভীরে বেদনার বেহাগ। ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন এখনও অনেক অনেক টুকরো থেকে, একে অন্যকে আপসকামী বলে দায় মেটালো। পালটে তপন ওদের কী বলতে পারে? সঙ্কীর্ণতাবাদী, হঠকারী? সালে অমিতাভদারা ওদের যা বলেছিল। হাতে সাইকেল নিয়ে হেঁটে জ্যোৎস্না পেরতে পেরতে তপনের মনে পড়ল মাস তিনেক আগে ওরা যখন বালি মিলে আবার নতুন করে ট্রেড ইউনিয়ন বেস গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তখন একদিন বিকেলের টান ধরা আলোয় দেখা অনন্ত ঘোষের সঙ্গে। তিরিশ বছর জুট মিল ট্রেড ইউনিয়ন করছেন অনন্ত ঘোষ। সাইকেল হাঁটিয়ে এমনি পাশাপাশি। বাতাসে তখনও শীত লেগে আছে। তপনের গায়ে একটা শেয়াল রঙের র‍্যাপার। অনন্তদা বলছিলেন, 'গণসংগঠন গড়া অনেক শক্ত তপন। অনেক টাকা-পয়সা, সস্তা হাততালি, গরম কথা। নেতা হওয়ার মোহ।' কথার ফাঁকে বিড়ি ধরালেন অনন্ত ঘোষ। তারপর বললেন, 'অথচ দ্যাখো, তোমরা আবার সেই লাইনেই ফিরে আসছ। ভোট, গণসংগঠন, কৃষকসভা, ট্রেড ইউনিয়ন।' অনন্তদার গায়ে সস্তা ভুটিয়া কার্ডিগান, নীচে সাদামাঠা খদ্দরের হাফশার্ট, আর হাট থেকে কেনা একটা ঠেটি পায়জামা। তপন জানে অনন্ত ঘোষের সঙ্গে তাঁর পার্টির লাইন তেমন বনে না। এ কবছরে তিনি গাড়ি বাড়ি করতে পারেননি, কোনও পারমিটও না। অথচ সংগঠন গড়ার কাজে এমন নিষ্ঠাবান মানুষ, হাওড়া জেলায় আর দ্বিতীয় নেই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঠেটি পায়জামা পরা মানুষটি হাঁটছিলেন। তপন বলেছিল, আপনার সঙ্গে একদিন বসতে চাই অনন্তদা।

—বেশ তো। একদিন এসো না পার্টি অফিসে। আমি তো সারাক্ষণই ওখানে।

ওরা ততক্ষণে পার্টি অফিসের সামনে।

তপন জানে বহুদিন রাজনীতি করা এ মানুষটির এটা এক কৌশল। তারপর বসা আর হয়নি। সেই আলো ঝলমলে পার্টি অফিস, রাস্তায় দাঁড়ালে বুক থেকে গলা অব্দি দেখতে পাওয়া মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন, আর অনেক মানুষ দেখতে দেখতে তপনের পেছিয়ে আসা। ওরা অমিতাভদা, অনন্তদাদের বলেছিল সংশোধনবাদী, আপসকামী। আর ওরা পেয়েছিল সি-আই-এ-র দালাল, হঠকারী আখ্যা। তারও আগে সালের কলকাতা কংগ্রেসের পর অনন্তদা অমিতাভদারা পূর্ণদা-বীরেনদাদের বলেছিলেন সংশোধনবাদী। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেই তখন এক নতুন সঙ্কট। অথচ আজ লোকাল ঝগড়া বাদ দিলে কর্মসূচির ভিত্তিতে পূর্ণদা-বীরেনদাদের সঙ্গে অমিতাভদা-অনন্তদারা কত কাছাকাছি! এমনকি আন্তর্জাতিক প্রশ্নেও। বলতে গেলে সে দিনের বীরেনদা-পূর্ণদাদের কথাই আজ ঘাড় নুইয়ে মেনে নিচ্ছে অমিতাভদা-অনন্তদারা। এই হঠকারিতা আর সংশোধনবাদের নাগরদোলায় কতদিন পাক খাবে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন।

চৈতনপাড়া হয়ে হপ্তা বাজারের কাছাকাছি সাইকেল হাঁটিয়ে ওরা তিনজন। একটু দূরেই বালি স্টেশন। লাইনের ওপারে ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা। সাইকেলের সামনের রডে সুভাষকে বসিয়ে প্যাডেলে চাপ দিল মৃন্ময়। এক কাপ চা খাওয়ার কথা বলতে গিয়েও বুকের কাছে আটকে গেল তপনের। আম্রমুকুলের মধুগন্ধে ভরা সেই সন্ধ্যায় কোথায় যেন একটা কোকিল পাগল করা সুরে ডেকে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে সাইকেল রাখতে রাখতে তপন দেখল লোডশেডিং। পাঁচটা ঘরের সামনে টানা লম্বা বারান্দায় হ্যারিকেন।

ছোটোকাকিমার ঘর থেকে ভেসে আসছে ঝালরের পড়ার শব্দ। ছোটোকাকার রেলের চাকরি, এখন একটা-আটটা চলছে। স্টেশনারি দোকান বন্ধ করে বালি বাজার থেকে ফিরতে ফিরতে মেজোকাকার সেই এগারোটা বেজে যাবে প্রায়। ততক্ষণ অন্ধকার ঘরে ঘুমবে মেজোকাকিমা।

উঠোনে তোলা জলে পা ধুয়ে বারান্দায় টাঙানো গামছায় পা মুছে ঘরে এসে দেখল গায়ত্রী হ্যারিকেনের আলোয় তপনের শার্টে বোতাম লাগাচ্ছেন। তপনের লম্বা ছায়া দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছাদে। পায়ের শব্দে মেঝেয় বসা গায়ত্রী মুখ তুললেন। মোটা কাচের চশমায় ম্লান অন্ধকার। তাঁর তসর তসর চামড়ায় হ্যারিকেন-আলোর আলগা পালিশ। নাকের পাশে কানের পেছনে ছায়ার নিখুঁত কারুচিত্র।

—চা খাবি?

—তুমি খেলে খাব।

—আমার তো আজ উপোস। মুগ ডাল ভিজানো আছে। নারকেল কোরা দিয়ে খাব। তুই খেলে করি।

—করো, তবে দুধ ছাড়া।

—আর কিছু খাবি?

—না। বলতে বলতে খালি গায়ে লুঙি পরা তপন বিছানায় নিজেকে মেলে দেয়। তার সবে তিরিশ পেরনো অভিজ্ঞতা বুঝতে পারে না কীভাবে এগোনো দরকার। এত গ্রুপ, এত অনৈক্য, সবাই যেন এক একজন সেন্ট্রাল কমিটি। আশ্চর্য! ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরিই হয়নি, এমন কথা বলেও অনেকে নেমেছেন রাস্তায়। সেখানেও অভ্যন্তরীণ বিরোধ, অনৈক্য। অথচ ইস্যুভিত্তিক একটা কমন প্ল্যাটফর্ম তো গড়া যেতে পারে। বন্দীমুক্তি, কিংবা অন্ধ্র, বিহারে নির্বিচারে গণহত্যা, এটাও তো হতে পারে আন্দোলন গড়ার কেন্দ্রবিন্দু।

চা খেতে খেতে তপন আবার গায়ত্রীকে দেখে। তাঁর সাদা থানে, পাকা চুলে, তসর তসর রঙের ত্বকে লুকোচুরি খেলে আলো এবং অন্ধকার। গায়ত্রী শার্টে বোতাম লাগান, তপনের ছেঁড়া প্যান্টে তাপ্পি দেন। তাঁর বিশাল ছায়া দেওয়ালে ভারতের মানচিত্র হয়ে পড়ে থাকে।

তিন

পয়লা বৈশাখের বেশ কয়েকটা লাল গণেশ আঁকা নেমন্তন্নের চিঠি এসেছে বাড়িতে। সন্ধেবেলা দুই কাকিমা, ঝালর গেছে নেমন্তন্ন রক্ষা করে ধার-বাকি মেটাতে। মেজোকাকার দোকান হয়ে ওদের ফিরতে রাত হবে। বাড়িতে গায়ত্রী একা। তখন তপন আর সুবীর বেণী ঘোষের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানায় বসে ছিল। বিপত্নীক বেণী ঘোষ নিঃসন্তান। বালি বাজারে তাঁর অনেক পুরোনো ডাক্তারখানায় আলমারির কাছে ঝুল। দেওয়ালে হ্যানিম্যান, সুভাষচন্দ্র আর রামমনোহর লোহিয়ার ছবি। সে সব কাচেও অনেক ধুলো। দিনরাত নাক্সভমিকা, আর্নিকা, পালসিটিলা, সাইলেশিয়া, চেলিডোনিয়াম নিয়ে ডুবে আছেন। মাথায় বড়ো টাক। গালে লম্বা পাকা দাড়ি। মাঝারি চেহারা। তপন বার বার তাঁকে বোঝাচ্ছিল একটা নাগরিক কমিটি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা। একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার, নৈতিক অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আর নানা দৈনন্দিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বেণী ঘোষ রাজি হন না। অথচ তপন এবং সুবীর জানে তাঁর মতো একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ নাগরিক কমিটি বা দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ কমিটির মাথায় থাকলে সামনে এগিয়ে যাওয়া কিছুটা সহজ হবে। কথাবার্তা, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর বেণী ঘোষ দু দিন পরে আবার তাদের আসতে বলেন। রাস্তায় বেরিয়ে এসে ওরা দেখতে পেল প্রবল হরিধ্বনি দিতে দিতে একদল শ্মশানযাত্রী একটা মড়া নিয়ে পাঠকঘাটের রাস্তায় ঢুকে গেল।

বৈশাখের এক ফুরফুরে বিকেলে নাগরিক কমিটির প্রথম মিছিল হাঁটল বালির রাস্তায় রাস্তায়। বেণী ঘোষ একেবারে সামনে, আর দেখা গেল মিত্যুম্ চৌধুরীকে। পঞ্চাশের দশকে যিনি ছিলেন এই অঞ্চলে

আনডিভাইডেড পার্টির শিরদাঁড়া। ১৯৬৪ সালের পর আর কোনও নৌকোতেই ভেড়েননি। এখন একটা ছোট্ট শেডের নীচে জনা-দুই-তিন ওয়ার্কারের সঙ্গে হাতে হাতে লেদ চালিয়ে টুকিটাকি জিনিস বানান। লাভের বখরা সমান সমান। বাকি তিনজন শ্রমিক তাঁর কারখানার শেয়ার হোল্ডার। তেমন ভিড় না হলেও সবার নজরেই আসে এ মিছিল।

পনেরো দিন পর সাট্টার ঠেক তোলার দাবিতে আর বাজার থেকে নিয়মিত মস্তানদের তোলা তোলার বিরুদ্ধে থানা ঘেরাও হয়। ওসি আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। কথা পাওয়া যায় চেনা সমাজবিরোধীদের পুলিশ ধরবে।

থানা ঘেরাও সেরে সুবীর এবং তপনের বেণী ঘোষের ডিসপেনসারি থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। বেণী ঘোষের ডিসপেনসারিই এখন নাগরিক কমিটির অস্থায়ী ঠিকানা।

গোটা এলাকা জুড়ে লোডশেডিং। সাইকেলের সামনের রডে সুবীর, তপন চালাচ্ছে। জোড়া অশ্বত্থতলা স্কুল পেরিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে সুবীরকে নামিয়ে দেওয়া। তারপর তপনের ফিরে আসা বড়ো ধীরে। একলা।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। চারপাশে অন্ধকারের দেওযাল। প্রবোধভবন মাঠের সামনে কীভাবে যেন আটকা পড়ে তপনের সাইকেল। একটু লাফিয়ে উঠেই নামে মাটিতে। রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো দুজন শক্ত পাকানো মোটা কাছি ফেলে তপনের সাইকেল ধরে। তপন টাল খেয়ে ঘুরে তাকায়। চারপাশে অন্ধকারের ঢেউ। তার ডান কাঁধ লক্ষ করে সলিড লোহার রড নেমে আসে। অসহ্য ব্যথা, যন্ত্রণায় তপন বুঝতে পারে এখনই ছোটা দরকার। চটি, সাইকেল বিসর্জন হয় আঁধারে। হেডলাইটবিহীন কাত হওয়া সাইকেল গুঁজরে পড়ে পিচ রাস্তায়। তার চাকা দেড়পাক ঘুরে থামে। হালকা করে মাথা ছুঁয়ে আবার রড নামে।

তপন দৌড়য়। তার পেছনে চার জোড়া ঘাতক-পা। তপনের গলার ভেতর থেকে ভয়মাখা হাহাকার উঠে আসে। সেই শব্দ, আর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ছুটে যায় কয়েকটি পাইপগানের গুলি। যার একটি তপনের বাহু বিদ্ধ করে। আক্রান্ত রক্তাক্ত তপন জোড়াপুকুরের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির উঠোনের কাছে চলে আসে। আবার এক রাউন্ড ফায়ারিং। তার আওয়াজে ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটায় ঘুলঘুলির পায়রা, নারকেল গাছের মাথায় বাসা বাঁধা কাক। উঠোন পেরিয়ে, সিমেন্ট চটা রকে উঠে তপন হাঁপায়। গরম রক্তে বাঁ হাতে হ্যান্ডলুম পাঞ্জাবির হাতায় ফুটে উঠছে নানা ডিজাইন। টলা পায়ে লম্বা দালানের মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় ক্লান্ত, অবসন্ন তপনের পড়ে যাওয়া! হাতের ধাক্কায় ওলটানো হ্যারিকেন। সেই আলো-গড়াগড়ি বারান্দায় গায়ত্রী, ঝালর, নমিতা এবং শুক্লার একে একে বেরিয়ে আসা। তারপর সমবেত কণ্ঠের চিৎকারে বাতাস ভারী।

পরদিন নাগরিক কমিটির ডাকে গোটা এলাকা জুড়ে বন্ধ। উত্তরপাড়া হাসপাতালের নোংরা, অবিন্যস্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে তপন খবর পায় সফল বন্‌ধের। কলকাতার একটি চালু ইংরেজি দৈনিকের স্থানীয় সংবাদদাতা তার ইন্টারভিউ নেয়। পটাপট ছবি ওঠে।

হাসপাতালের ঘন্টা বেজে যাওয়া পর্যন্ত ভেতরে থাকে ঝালর আর গায়ত্রী। যাওয়ার আগে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রসাদী ফুল রেখে যান গায়ত্রী বালিশের নীচে। সুবীর খবর দিয়ে যায় সমাজবিরোধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে আরও অনেক বড়ো মিছিল বেরিয়েছিল।

দিন কুড়ি পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তপন বাড়িতে। গুলি তার ভেতরে ঢোকেনি, তা ছাড়া থ্রি-টু পাইপগান থেকে ছোড়া। তবুও ডাক্তার বলেছেন সাবধানে থাকতে। ঘা এখনও শুকোয়নি পুরোপুরি।

সেভাবে কেউই ধরা পড়ল না। দু-চারজনকে যা পুলিশে তুলেছে, তারা নেহাতই চুনোচানা। বাজারে তোলা তোলার কিং খেঁটকি এবং তার রাইভ্যাল হাতকাটা-স্বপন দুজনেই জেলের বাইরে। নাগরিক কমিটির বিরুদ্ধে আপাতত ওরা দুজনে এক ছাতার তলায়। সাট্টা এবং চোলাই ভরপুর চলে। সমৃদ্ধ হয় খেঁটকি এবং হাতকাটা-স্বপন। তোলাও অবিরাম ওঠে। সাতদিন ধরে শেতলা পুজো হয় বালি বাজারে। সেখানে প্রতি রাত্রেই যাত্রা। 'হারেমের কান্না', 'লেনিন', 'সিঁদুর নিও না মুছে'-র আশ্চর্য সহাবস্থান। মাইকে অনুপ জালোটা,

কিশোরকুমার ও পান্নালাল ভট্টাচার্য সমান মর্যাদা পান। এ সব আশ্চর্য পঞ্চরঙ্গি খেল্‌ দেখে তপনের খেদ বাড়ে।

এর মধ্যেই হাতকাটা-স্বপন খুন হয় নেকির চোলাই ঠেকে। তার কানে নল ঠেকিয়ে গুলি করে ঘাতক। খেঁটকি ফেরার হয়। দেওয়ালে দেওয়ালে খবরের কাগজের উপর লাল রঙে লেখা হাতকাটা-স্বপন খতমের খবর পৌঁছে দেয় সুভাষ মৃন্ময়দের গোপন সংগঠন। তারা এরকম আরও সমাজবিরোধী ফেলে দেওয়ার হুমকি দেয়। মানুষ সাময়িক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

তিন দিনের ভেতর স্বপনবাহিনী তছনছ করে বেণী ঘোষের ডিসপেনসারি। অনেক বিপদ পেরিয়ে আসা বেণী ঘোষ মিনিট তিনেক আগে খবর পেয়ে এ যাত্রাও কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে যান। তাঁর হ্যানিম্যান, সুভাষচন্দ্র, রামমনোহর লোহিয়াকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় স্বপনবাহিনী। আলমারির একটি কাচও আস্ত থাকে না। অথচ পুলিশ নিশ্চুপ থাকে।

তপন বা তার সংগঠন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কোন পর্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার, পালটা মারের প্রয়োজন আছে কি না, এ নিয়ে সে ধাঁধায় পড়ে। যদিও নাগরিক কমিটি গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে, থানা ঘেরাও হয়, অনেক নতুন মুখ আসে মিছিলে। সমাজবিরোধীরা সাময়িক কোণঠাসা।

তপনের ছাপা ছবি ও ইন্টারভিউ এলাকায় তার মধ্যবিত্ত মর্যাদা বাড়ায়। সেই রিপোর্টারটি খবরের খোঁজে আবার আসে। তপনের বিষাদ বাড়ে।

চার

বহুদিন পর পুলিশের জিপ এসে দাঁড়ায় তপনের বাড়ির সামনে। বেলা প্রায় দুপুর। বাতাসে ঘুঘুর মন কেমন করা অলৌকিক ডাক। হলুদ কলকে ফুলে ফুলে ছাওয়া গাছের ছায়ায় গায়ত্রী গুড়াখু দিয়ে দাঁত ঘসছিলেন। পুকুরে নাইবার আগে এ তাঁর নিত্য অভ্যাস। পুলিশ তাঁর কাছে নতুন নয়। সেই দেশের বাড়িতে অনেকবারই। তারপর এ বাড়িতেও তো কম বার হল না।

যে পুলিশ অফিসারটি জিপ থেকে নামল তার হাতে একটা মোটা ডায়েরি। তপনের বয়েসিই হবে হয়তো বা। লম্বা দোহারা গড়ন। টেরিকটের খাকি ইউনিফর্মে ঘামের জলছবি। চশমা ছাড়া ভালো নজরে পড়ে না সব কিছু। তবু দাড়িগোঁফ কামানো এ মুখ দেখে গায়ত্রীর মনে হল এ মুখে সিনেমার পুলিশ হলেই বেশি মানায়। তর্জনী দিয়ে দাঁত মালিশ থামিয়ে ষাট ৫.রনো গায়ত্রী বাঁ হাতে সারা গা ভালো করে ঢাকেন।

—এখানে কি তপন চক্রবর্তী থাকেন?

মাটিতে গুড়াখুর পিক পেলে গায়ত্রীর স্পষ্ট উত্তর—হ্যাঁ। তার বেঁটে ছায়া মাটিতে সামান্য ভাঁজ খায়। আর তখনই গায়ত্রী শুনতে পান অফিসারের পেছন পেছন নেমে আসা পুলিশ কনস্টেবলটি ফিস ফিস করে বলছে, 'এটাই স্যার। আমি চিনি।'

কোনও দিকে না তাকিয়ে অফিসারটি বলল, 'উনি বাড়িতে আছেন?'

—না।

—কোথায় গেছেন?

—বলতে পারব না।

—শুনুন, উনি বাড়ি এলে ওকে একবার বলবেন থানায় দেখা করতে, বড়োবাবু ডেকেছেন।

সেই মুহূর্তে গায়ত্রীর শিরদাঁড়া টানটান। এ বাড়ির তিন মালিক। সমস্ত জমি, গাছ তাঁর নামে, এই অধিকারবোধের চেতনার শেকড় তাঁকে মাটির গভীরে ইতিহাস পেরিয়ে আসা কোনও প্রাচীন বনস্পতির মতোই প্রোথিত করে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ান। তাঁর রগের ডানদিকে মরা নদীর মতো একটি শিরা হঠাৎ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে ফুলে-ফেঁপে উঠে প্লাবিত হতে চায়। চোয়ালে দৃঢ়তার ঢেউ ওঠে, তারপর বড়ো ধীরে হারিয়ে যায় গলার কাছে। গায়ত্রী আর কোনও কথা বলেন না। আপনমনে গুড়াখু মেজে যান। একটি মৌটুসি পাখি মধুর সন্ধানে কলকে ফুলের ভেতর প্রায় ঢুকে পড়ে।

জিপ ছাড়ার শব্দ ওঠে। ডিজেলের গন্ধে বাতাস গম্ভীর। দুই পুকুরের মাঝখান দিয়ে গিয়ে বড়ো রাস্তায় সে ডানদিকে ঘোরে। একটা পাড়া আগলানো কুকুর লম্বা ঘেউ ডেকে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত জিপের পেছনে দৌড়য়। তারপর ফিরে আসে। গায়ত্রী দেখেন তাঁর আশপাশের বাড়ির জানলায় বেশ কয়েকজোড়া কৌতূহলী চোখ।

আর প্রায় চল্লিশ মিনিট পর তপন ফিরে আসে। অস্নাত, অভুক্ত গায়ত্রী তাকে ঘরে ডাকেন। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে সযতনে বলেন, কদিন তুই বাইরে কোথাও থাক। আমি কিছু ভালো বুঝছি না।

তপন আবার সঙ্কটে পড়ে। সে বুঝতে পারে না থানায় যাবে কি না। অনেক বছর আগের গোপন জীবন এবং অভিজ্ঞতা তাকে থানায় যেতে না করে। তপন তবু নিজেকে বোঝায়—সে তো এখন গণসংগঠনের লোক, তার নাগরিক কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন, ক্রেতা-প্রতিরোধ সংগঠন.....।

গায়ত্রীর চোখের কোলে জল জমে। গলা বুজে আসে। তবু বলেন, 'তুই কিছুদিনের জন্যে হলেও এখান থেকে চলে যা।' তপন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। টানাপোড়েনের ভেতর দিয়েই কোনও রকমে দুটো ভাত খায়। তারপর কাঁধ-ঝোলায় একটা পাঞ্জাবি, পাজামা, ডায়েরি, টুকিটাকি কাগজপত্র নিয়ে হাঁটে। গায়ত্রী মনে মনে বলেন, 'যাওন নাই, আসো গিয়া। দুর্গা দুর্গা দুর্গা। সিদ্ধবকুল, মা বিপত্তারিণী......।' বাড়ির উঠোন পেরিয়ে তপনের বেঁটে ছায়া বড়ো রাস্তায় দীর্ঘতর হয়ে যায়।

সে দিন রাতে একলা খাটে শুয়ে গায়ত্রীর ঘুম আসে না। বাইরে আকুল জ্যোৎস্না। সেই ভাঙা, পরিত্যক্ত পায়খানার ইটের পাঁজার পাশে নিঃসঙ্গ গাছ থেকে একটি দুটি তিনটি বকুল ঝরে পড়ে। মনে হয় বুঝি জ্যোৎস্নাবিন্দু নামছে আকাশ থেকে, টুপ টাপ টুপ....! পাগল করা বকুলঘ্রাণ ঢুকে পড়ে গায়ত্রীর নাকের ভেতর। তপনের মাথার গন্ধলাগা বালিশ গালের নীচে রেখে গায়ত্রী কাঁদেন। গাল আরও জোরে চেপে ধরেন বালিশের উপর। তারপর হাত বুলোন আস্তে আস্তে। নারকেল পাতার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বৈশাখী হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। অন্ধ জ্যোৎস্নায় কাক ডাকে।

শেষ রাতে বড়োরাস্তায় এসে দাঁড়ায় কালো পুলিশ ভ্যান। রবার সোলের জুতো পরা পুলিশ দাবার ঘুঁটি হয়ে ছড়িয়ে যায় গোটা চত্বরে। সমস্ত বাড়ি ঘেরাও করার পর উঠোন পেরিয়ে সিমেন্ট-চটা উঁচু রকের ওপর উঠে আসে সকালের সেই সাব-ইনস্পেক্টর। তার বাঁ হাতে পাঁচ সেলের টর্চ, ডান হাতের মুঠোয় গুলিভর্তি রিভলভার। ট্রিগারে সতর্ক আঙুল। খোলা রিভলভার এক হাতে নিয়ে দরজা ধাক্কা দেয় বয়স্ক হাবিলদার। তার ছোটো করে ছাঁটা তেলমাখা চকচকে সাদা চুলে চাঁদের আলোর পালিশ। ধাক্কা প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে, আরও জোরে। ফলসার ছায়া মেখে শুয়ে থাকা নেড়ি কুকুর কি ভেবে আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে ভয়মাখা ডাক ছেড়েই ছুটে উঠোন পেরিয়ে যায়।

শেষ রাতের আকাশ-আলো সিমেন্ট-চটা রকে পড়ে কান্নায় কুটি কুটি। কাক ডাকে। ডাকে।

ফিকে তন্দ্রাভাঙা গায়ত্রী বুকে বকুলের গন্ধ ভরে নিতে নিতে গালের নীচে আরও শক্ত করে চেপে ধরেন তপনের মাথার বালিশ। দরজা ধাক্কানোর তীব্র শব্দে খান খান নিশুতি।

গায়ত্রী কান বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। তবু শব্দ হানা দেয়।

এই গা-পোড়ানো গরমে গায়ত্রীর শিরদাঁড়ার ভেতর শীত ঢুকে পড়ে। ভয়ের বরফ। □

উত্তরাধিকার

জয়ন্ত জোয়ারদার

একপাল শকুন ডানা ঝাপটাচ্ছে, উড়ছে বসছে আর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বাবলাকুটুস বনকুলের ঝোপের ওপর। শকুনগুলোর চোখ স্থির। পলক পড়ে না। আর ওদের চোখের মণির কালো হলদে ফ্যাকাশে চিত্তির দেখে গা শিউরে ওঠে।

মানওয়াটগঞ্জে সবে ভোর হয়েছে। গঞ্জের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে এক গভীর কাঁচা নালা। তারই পাড়ে পায়খানা করতে বসে শকুনগুলোকে দেখছিল মজারুল। দিগন্তে সূর্যদেবকে তখনও দেখা যাচ্ছে না। গঞ্জের প্রায় গাছতলাতেই ভূতপ্রেত বা দেবদেবীর থানে ভক্তদের ফুলবেলপাতা নিবেদন শুরু হয়ে গেছে। ডাকাবুকো বাইশ বছরের জোয়ান মজারুল, বয়স্ক লোকদের শকুনের পাখার হাওয়া লাগানোর নিষেধ মানে না। কাক-শকুনের চেল্লাচেল্লিতে আকৃষ্ট হয়েই দেখতে যায় কার গোরু মরেছে। --হায় আল্লা। এ তো গুলাকির বেটি! হায় হায়।

গুলাকির বেটি--বয়স দশ বছর, কৈশোরে পা দিয়েছে নিহত। গত চার মাসের মধ্যে এটি পঞ্চম ঘটনা। সবকটিই নাবালিকা মেয়ে এবং প্রত্যেকেরই যৌনাঙ্গে ধারালো অস্ত্রের ক্ষতের দাগ।

খবর ছড়িয়ে পড়ে গঞ্জের এ মাথা থেকে ও মাথা। শিশুদের বুকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কেঁপে ওঠে মায়েরা। এখানে-ওখানে জটলা, উত্তেজিত আলোচনা। একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি খুন। নিশ্চয়ই কেউ 'ভানমতী' করেছে। মা-বাপেরা কুমারী মেয়েদের নিয়ে সন্ত্রস্ত। কার পাপে কোন দেবতা অথবা অপদেবতা রুষ্ট হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কিছুতেই একমত হওয়া যাচ্ছে না।

স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ আর এস কুলকার্নি আবার দিশেহারা--খুনি কে? কোই সেক্স ম্যানিয়াক? কোই মেন্টালি ডিরেঞ্জড পার্সন? মেম্বার অব এ সিক্রেট কাল্ট? এ ক্রিমিনাল গ্যাং?

মানওয়াট—তুলো জোয়ার আর কাপড়ের কেনাবেচার হাট। নিকটতম রেলস্টেশন মানওয়াট রোড--প্রায় ছমাইল দূর। সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের মনমড কাচেগুড়া লাইনের অখ্যাত স্টেশন। দশ মাইল দূর দিয়ে কুলকুল করে গোদাবরী বয়ে চলেছে পুব-দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের দিকে। কাছাকাছি সবচেয়ে বড়ো শহর অওরঙ্গাবাদ—প্রায় চল্লিশ-মাইল দূর। সরাসরি কোনও বাস সার্ভিস নেই। পার্বণী থেকে বাস বদলে তবে যাওয়া যায়।

মানওয়াটের দিন—সেই মরাঠাদের হাতে যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এসেছিল—তখন থেকেই বানিয়া আর জমিদারদের মুঠোয়। স্বল্প কয়েকজন জমিদার-মহাজন এলাকার প্রায় সমস্ত জমি এবং কারবারের মালিক। ব্যাপক অধিবাসীরা হিন্দু-মুসলমান তাঁতি ও চাষি। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ এবং শ পাঁচেক ঘর 'পার্ধি'—যাদের সম্বন্ধে লোকাল পুলিশ রিপোর্ট—দিস কমিউনিটি হ্যাজ এ ব্যাকগ্রাউন্ড অব পেটি ক্রাইমস।

স্বাধীনতার পর থেকে মানওয়াটে তিনটি পরিবর্তন হয়েছে। আজাদির পরের বছর আশপাশের গুলবর্গা, অওরঙ্গাবাদ, বিদ ইত্যাদি এলাকার কৃষকদের সঙ্গে পুলিশ-মিলিটারি-রাজাকরদের খুব হাঙ্গামা যখন হয়েছিল তখন পুলিশ-থানা বসেছিল এবং আর উঠে যায়নি। তার দু-এক বছর পরে হাটের পাশে একটা টিউবওয়েল বসেছিল—কালক্রমে খারাপ হয়েছিল—মেরামত আর হয়নি এবং এখন শুধু তার ভাঙা চাতালটুকু পড়ে আছে। আর তৃতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, পার্বণী অব্দি বাসের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে দুই হয়েছে। অওরঙ্গাবাদ

গিয়েছে এমন ভাগ্যবানেরা বিজলি বাতি দেখেছে। আর একবার নাকি মানওয়াটেও একদিনের জন্য বিজলি আলো জ্বলেছিল। সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় জমিদার প্রভাকর বারহাটের দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ের সময়।

মানওয়াটে বেলা বাড়ে। জটলার ভিড় পাতলা হতে থাকে। কিসিনে 'গাভাডোরা' কিয়া হোগা—নিশ্চয়ই কেউ তুকতাক করেছে—প্রায় ফয়সালা হয়ে আসে। উত্তেজনা থিতিয়ে পড়ে। শুধু এক অশরীরী ভয় গঞ্জের কয়েক হাজার মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে।

পার্ধি-ঘরের দুরন্ত সুন্দরী মেয়ে রুক্মিণী! সুঠাম দেহ। নিতান্ত সাধারণ অবস্থা থেকে রূপ আর বুদ্ধির জোরে পয়সা করেছে বটে। ওর জাতের আর সবার মতো ওকে খেটে তো খেতে হয়ই না, এমনকি ওর বাপ বোন, বোনের বর আর সৎভাইসহ একগুচ্ছের পোষ্যকে ও বসিয়ে খাওয়ায়। তার বিনিময়ে পোষ্যরা ওকে ওর মদের ব্যবসায় সাহায্য করে অবশ্য। জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রভাকর বারহাটে ওর বাঁধা বাবু। বাবু ওকে বাড়ি করে দিয়েছেন, জমিজমা গয়নাগাটিও দিয়েছেন প্রচুর।

কিন্তু রুক্মিণীর মনে সুখ নেই। মাস কয়েক আগে প্রভাকর বারহাটেই ওকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীও তাঁকে সন্তান দিতে পারছে না। পারছে না তাঁর সুবিশাল সম্পত্তির এক উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে। জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রভাকর তাই রুক্মিণীকে বলেছিলেন, তাঁকে সন্তানের পিতা করে দিতে। আর এর বিনিময়ে তিনি অঙ্গীকার করেছেন রুক্মিণী ও সেই সন্তানকেই তাঁর বিপুল সম্পত্তি দিয়ে যাবেন।

সত্যি তো! এত সম্পদ কার জন্য? শুধু নিজের ভোগের জন্য তো আর সম্পদ নয়। যদি উত্তরাধিকারীই না থাকল তবে আর.......আর এ দিকে রুক্মিণীর বয়েস বিয়াল্লিশ—রজস্রাব অনিয়মিত। আগে ভাবত নিজের সম্পত্তি বোন সমিন্দরবাইয়ের ছেলেকেই সব দিয়ে যাবে। কবায়ও সম্পদের গরবে রুক্মিণী ছিল ডগমগ। কিন্তু প্রভাকর মহাজনের গোদাবরীর ধারের ওই এক হাজার বিঘে জমি, প্রাসাদোপম পাকা বাড়ি আর সোনা—ধামা ধামা সোনার গয়না, সিন্দুকভরা গিনি আর......আর বাড়িতে মাটির নীচে কোথায় কত পুঁতে রেখেছে কে জানে! ভাবতেই শিহরিত হয় রুক্মিণী। বৈদ্য, হাকিম আর মাজার-দরগায় মাথা খুঁড়তে শুরু করে। সন্তান কামনায় যে যা বলে তাই করে। সম্প্রতি প্রসব করেছে এমন নারীর গর্ভপুষ্প চুরি করে এনে কাঠের আগুনে তা জ্বালিয়ে সেই আগুনে ভাত বেঁধে খায়। অশোক গাছের ছালের রস খায়। সমিন্দরবাইয়ের রজস্রাবকালে ব্যবহৃত ন্যাকড়া নিজে পরে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

আবার একটা খুন। সেই একইরকম সবই—কুমারী, বয়স বারো, যোনিদ্বারে ক্ষতচিহ্ন। শুধু একটা জিনিসই এবার নতুন, বাঁ হাতের কড়ে আঙুল আর মুণ্ডুটিও কাটা এবং তা নিখোঁজ।

সংবাদপত্রগুলো সেনসেশনাল কভারেজ করে উইথ ইলাস্ট্রেশন। অ্যাসেমব্লিতে অমরাবতীর এম এল এ লোকাল পুলিশের যোগ্যতা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলেন। উচ্চপদস্থ অফিসার পাঠানোর ব্যাপারে হোম-মিনিস্টার ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি দেন।

আর মানওয়াটের লোকেরা হাট ভাঙলে—সারাদিন তুলো, জোয়ার আর কাপড়ের হিসেব সেরে বিড়ি-কলকেটা ধরিয়ে রোজকার অভ্যেসমত গান-বাজনা আর দুনিয়াদারির সব আজব-তাজ্জব খবর শুনতে বানিয়া-মহাজনদের দোকানে ট্রানজিস্টর শুনতে বসে। সে দিন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তারা শুনল সেই রেডিও থেকে তাদেরই গঞ্জের নাম বলছে, বলছে তাদেরই ঘরের মেয়েদের খুন হয়ে যাওয়ার কথা। খবর শেষ হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ কারও মুখ থেকে কোনও কথা সরে না। শেষে চাপেকের মহাজন বললে—'কিরে, গত ভোটের সময় বলেছিলাম না ওই বারহাটেকেই ভোট দিস। শুনলি তো নিজেরাই, নিজের কানেই, অ্যাঁ? মানওয়াটের ব্যাপার মুম্বই (বোম্বে) অব্দি পৌঁছে গেছে। কেমন দেখ কাজের লোক বটে বারহাটে—ওরও তো নাম বলল। আশপাশে তো পঞ্চাশটা গ্রামগঞ্জ আছে, রেডিওতে কোনওদিন কারও নাম উচ্চারণ করেছে? অ্যাঁ।

শ্রোতাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটলে আবার সেই ছটি খুনের গপ্পোই ঘুরে ফিরে আসে।

—পাপ! পাপে ভরে উঠেছে। ওই তো, ওই যে গুলাকির বেটিটা যে মরল—পাশের ঘরের সফিকুলের সঙ্গে ওর মার কিসের এত ফষ্টিনষ্টি চলছিল? আর ভগবান কি মরে গেছে যে চোখ খুলে দেখে না কিছু অ্যাঁ? জাত নাই বেজাত নাই—ইয়ে।

মহাজনের বিচার শুনে ঘাড় নেড়ে সায় দেয় অনেকেই। কিন্তু ভেতর থেকে যেন সায় পায় না। দেবতা এমন করবে কেন? পাপের সাজা দিতে হয় তো যে করেছে তাকে দাও। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোকে কেন? এ দেবতার কাজ নয়। নিশ্চয়ই কোনও অপদেবতা রুষ্ট হয়েছেন।

ঘরে ফেরার পথে মজারুল বুড়ো সইফুদ্দিনকে শুধায়—'চাচা, সব মেয়েগুলোই গরিব ঘরের কেনে? অপদেবতারা কি মহাজনদের ঘরের মেয়াদির দিকে নজর দেয় না?'

—আল্লা জানে বেটা।

—কী জানি চাচা। ই কমাস ধরে কেনে ইসব হচ্ছে। আগে তো কুনুদিন খুনখারাবির কথা শুনি নাই।

—হইছিল বাপ, আর একটা খুন হইছিল। তোরা তখন পৈদা হোস নাই।

—হুঁ?

—হাঁ। তবে মেয়াছেলা নয়, বেটাছালা। ভিনদেশি একজন। চাচা একবার পেছনে সামনে দেখে নিল।

—তো?

ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি দু হাত দূরের জিনিসই ঠাওর করতে পাবে না। চাচা লাঠিটা দু বার ঠুকে নেয়। মানহাটের সরু আঁকাবাঁকা গলিপথ। গলির শেষ মাথায় পায়ের শব্দ ভেসে আসে।

—কী হল চাচা?

—উঁ, না, কিছু না। পরে শুনিস বেটা। আর মহাজনদের সামনে কুনুদিন এই কথা বলিস না।

এই খুনের ঘটনা কটি ছাড়া বেশ শান্তিতেই দিন কেটে যায় মানওয়াটে। হাটুরে লোকের দৌলতে জুয়া-মদের আড্ডা ও বেশ্যালয় চলছে। ভূতপ্রেত ঠাকুর দেবতা হাকিম বৈদ্য ওঝা জরিবুটি তাবিজ আর গুপ্তধনের গল্পে গতানুগতিক মানওয়াটের দিন গুজরান।

এ দিকে কুলকার্নির চাকরি বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠেছে। প্রতিটি মার্ডারের পরেই কোনও না কোনও ক্রিমিন্যালকে আরেস্ট করা হয়েছে। এই এলাকার পরিচিত ক্রিমিন্যাল আর কেউ বাইরে নেই। কিন্তু এতগুলো গ্রেফতার, কত টর্চার এবং তজ্জনিত স্বীকারোক্তি থেকে কোনও কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। সবচেয়ে মুশকিল, খুনগুলোর মোটিভ কী হতে পারে তাই কুলকার্নি ভেবে পাচ্ছেন না। এলোপাতাড়ি যা মনে হচ্ছিল করে যাচ্ছিলেন—যদি কোথাও কোনও সূত্র পাওয়া যায়। হঠাৎ মাথায় আসে—দিজ মার্ডারস মে বি সাম হাউ রিলেটেড টু উইচক্রাফট। মধ্যপ্রদেশের এক সহকর্মী বন্ধুর কাছে এ জাতীয় একটা কেস যেন শুনেছিলেন কবে। এরিয়ার সমস্ত উইচ-ডক্টরদের কোশ্চেন করতে শুরু করেন। করতে করতে অমরাবতীর এক বিখ্যাত ওঝা গণপত ভগোছি সালভের কনফেশন আদায় করতে পারেন এই অব্দি—দ্যাট হি হ্যাজ অ্যাডভাইসড রুক্মিণী অ্যান্ড বারহাটে টু প্লিজ গড বেতাল মহারাজ উইথ ভার্জিন........

সালভের কনফেশনে জোর পান কুলকার্নি। কিন্তু এক্স-চেয়ারম্যান এবং এলাকার সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী লোকের গায়ে হাত দিতে সাতবার আগুপিছু ভাবতেই হয়।

কিন্তু তার আগেই মানহাটের শান্ত মৌচাকে আবার ঢিল পড়ল। আবার একটা খুন—সেই একইরকম। কুমারী, বয়েস এগারো, যোনিদ্বারে ক্ষতচিহ্ন।

আবার উত্তেজনা, ভয়ের করালছায়া। কে করছে, কেন করছে নানা জনের নানা মত। শেষে এ কথা ও কথার পরে এক ব্যাপারে দেখা গেল সবাই একমত যে বারহাটে চাপেকর জাতীয় মহাজনেরা সবাই দুই, তিন বা চার পুরুষ আগে জিনের আদেশে 'গাড়োয়ার' বা অন্য কোনও না কোনও মন্দির বা সংলগ্ন পুকুরের তলা থেকে প্রচুর ধনসম্পদভরা সিন্দুক পেয়েছিল। মহাজনেরা সেই সিন্দুক তাদের শোওয়ার ঘরে খাটের নীচে পুঁতে রেখেছে। আর তারই মধ্যে জিনেরা আটকে আছে। নিশ্চয়ই কোনও সোনাদানা গয়নাগাঁটি বার করতে গিয়ে ভুল করে কেউ সেই সিন্দুকের ডালা হাট করে খুলেছে আর জিনটা গেছে বেরিয়ে। আর সেই জিনই এ সব খুনখারাপি করছে।

মজারুলের মতো কয়েকটা এঁড়ে ছোঁড়ার এ সব কথা বিশ্বাস হয় না। খানিক তক্কো করে—জিন তো লোহা ধরবে না। তা হলে প্রতিটি মেয়ের শরীরেই হাতিয়ারের ক্ষত কেন?

অন্য কারওর সমর্থন না পেয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ে মজারুল। বন্ধুবান্ধবদের বোঝাতে চেষ্টা করে পুলিশের কুত্তার কথা। অওরঙ্গাবাদে ও যখন মাঝে কিছুদিন রিকশা চালাত তখন দেখেছে একবার। সেই কুত্তা আসবে ওদের এখানে আর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঠিক খুনিকে বার করে দেবে। সবাই বিস্মিত হয়ে ওর কথা শোনে কিন্তু পুরোটা যেন বিশ্বাস করে না।

—ও সব জিন প্রেত কিছু না রে। সম্পত্তি জিনে দিয়েছে? এই যে চাঁদরামের বিধবার জমিটা চাপেকর মহাজন নিয়ে নিল, কুন জিনটা এসে মহাজনের জমি বাড়িয়ে দিল?

—উর কপাল মন্দ। মরদাটাও মরল আর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভিটেজমিটাও গেল।

—থাম। তোরা শালা মহাজনের বজ্জাতিটা দেখলি না? চাঁদরাম জীবনভর মহাজনের মুনিষ খাটল আর বউ-বাচ্চার থাকাব ওই ভিটেটুকুও ঋণের দায়ে নিয়ে নিল?

—সুখার বছব ধান ধাব লিয়েছিল যে।

—তারপর পাঁচ বছরেও বেগার খেটে তা শোধ হল না, শালা না-মবদের দল। এ গাঁয়ে আর কারও ভিটে বাঁচবে না—সব তোদের ওই জিনেই লিবে।

অসহ্য লাগে মজারুলেব। গ্রামেব এই শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেতে শহরে গিয়েছে। রিকশা চালিয়েছে তিন-বছর। সেই একইরকম বেগার খাটা। মালিকের রিকশা ভাড়ায় নাও তিন টাকায়। দিনভর মেহনত করে কামাও পাঁচ টাকা বড়োজোর ছ টাকা। সেই জোয়ার বজরার রুটি আর ভাজি। বস্তির বন্ধ ঘরে দমবন্ধ হয়ে আসত। তাই আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু কোথাও ভালো লাগে না ওর। দিনভব হাড়ভাঙা মেহনত, আধপেটা খাওয়া। বেচাবা চাদরামেব বিধবাটা—হয়তো ছেলের হাত ধরে কসবী-গ্যাঙেই যাবে। মাথা গবম হয়ে যায় মজারুলের —মাঝে মাঝে মনে হয় জোয়ারের ডাঁটের মতো মহাজনগুলোব মাথাও শালা হাঁসুয়া দিয়ে নামিয়ে দেয়।

ঔরঙ্গাবাদে ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশকে ট্রাঙ্ককল করাব আগে সালভের স্টেটমেন্টটা একবার মনে মনে গুছিয়ে নেন ইন্সপেক্টর কুলকার্নি। তিনি ভিস্যুয়ালাইজ করতে চেষ্টা করেন।

> একটা বন্ধ ঘরে রুক্মিণী, বারহাটে এবং ওঝা সালভে। মাঝখানে একটা যজ্ঞকুণ্ড জ্বলছে। রুক্মিণীর বাড়ির অন্য লোকেরা হয়তো বন্ধ দরজার বাইরে ভিড় করে আছে।
>
> পানোন্মত্ত সালভে ঢোল বাজিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে রুদ্রনৃত্যে মত্ত। সালভের কাঁচাপাকা জট-পাকানো বড়ো বড়ো চুল। রক্তচক্ষু, কপালে লাল টীকা।
>
> লেটাপেটা মিনষে, লোটাকানি ভঁযষা।
> ভাদ্র মাসে টোটে পানি,
> শেষ আছে এর বিশেষ জানি।
>
> সালভের মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। পেশিগুলো শক্ত হয়ে যায় আর প্রভাকর বারহাটেব হাতে একটা লাঠি দিয়ে তার সারা শরীরে আঘাত করতে বলে। অথচ আঘাতে সে কোনও ব্যথা অনুভব করে না। ঠিক এই সময় সে তার আয়ত্তাধীন শক্তিকে অনুরোধ করে রুক্মিণীকে সন্তান-উৎপাদনে সক্ষম করে তুলতে। তারপর রুক্মিণীকে গোলমরিচ আদাপড়া খাওয়ায়। যজ্ঞকুণ্ডে ঘি-ধূপ অর্পণ করে। তবু দৈত্যাধিপতি প্রসন্ন হন না। তখন সালভে আরও রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। রুক্মিণীকে পরিধেয় খুলে ফেলতে বলে। উত্তেজনায় রুক্মিণী থরথর করে কাঁপতে থাকে। প্রভাকর এগিয়ে এসে একটানে কাপড় খুলে দেয় আর সালভে এলোপাতাড়ি রুক্মিণীকে মারতে থাকে। পর্বতবাসী বেতাল মহারাজ তখন সালভের ওপর পূর্ণভাবে ভর করেন। বেতাল সালভেকে দিয়ে বলান—রক্ত চাই, রক্ত। কুমারীর যোনির রক্তে বেতালের স্নানেচ্ছা আর সেই রক্তে যদি রুক্মিণী তার যৌনাঙ্গ ধৌত করে, তবেই সে সন্তানবতী হবে।

সালভে তারস্বরে অপার্থিব অমানুষী ডাক ছাড়ে। প্রভাকর গর্জে ওঠে—তবে তাই হবে। তাই হবে মহারাজ

সন্তান আর সম্পদলাভের উত্তেজনায় রুক্মিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ওহ্ হরিবল্! কুলকার্নি বসকে ঠিক কীভাবে বলবেন ভেবে পান না।

—হ্যালো, হ্যালো স্যার। কুলকার্নি বোল রহা হুঁ।

সুপার বিরক্ত হন। সবে সন্ধে হয়েছে। প্রাসাদ-সদৃশ কোয়ার্টারের লন অ্যাটাচড বারান্দায় বসে মিসেস সবে ফ্রিজকোল্ড কাস্টার্ড চামচে তুলে মুখের কাছে ধরেছিলেন... আর রিং হল। বিরক্ত স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

—স্যার। সেই মানে... .এই সিরিজ অব মার্ডারের ব্যাপারটায় একজন উইচ-ডক্টরের কনফেশন অনুযায়ী প্রভাকর বারহাটে ও তার রক্ষিতাকে.. ..

—বারহাটে ....মানে এক্স চেয়ারম্যান?

—হ্যাঁ।

—কী ধরনের কনফেশন?

কনফেশন ডিটেল করতে প্রায় ঘেমে যান কুলকার্নি।

—হোয়োট ননসেন্স। তুমি কি এ সবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ নাকি?

—না স্যার, তা কেন। আমি শুধু ওদের অ্যারেস্ট করতে চাইছি আর তাই আপনার ওপিনিয়ন....

—বিপদ ডেকে আনছ কুলকার্নি। এক্স-চেয়ারম্যান ও তার কেপ্টের গায়ে হাত দিয়ে তুমি ওখানে টিকতে পারবে? আর ভুলে যেও না আমাদের এই অমরাবতীর এম এল এ প্রভাকর বারহাটের ভাইপো। খোদ স্টেট হোম মিনিস্টারের পেয়ারের লোক।

—কিন্তু প্রেস যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে স্যার। কুলকার্নি আমতা আমতা করে।

—দাখো কী করতে পারো। লাইন ছেড়ে দেন সুপার।

—কার কেপ্টের গায়ে আবার হাত দিচ্ছিলে? মিসেস রসিকতা করেন। সুপার রসিকতাটুকু তারিয়ে উপভোগ করে হাসেন আর বলেন— মানওয়াটের ওই ইডিয়েট কুলকার্নিটা।

সইফুদ্দিন চাচার ঘর যায় মজাকল। ভর দুপুরবেলা যে যার খেতে বা তার ঘরে ব্যস্ত। মজাকলের অস্থির লাগছিল। একটার পর একটা মেয়ে খুন হয়ে যাচ্ছে। পুলিশের কুত্তা আসছে না। থানায় বললে বলে মুম্বইতে কুত্তার অনেক কাজ। সময় হলে তবে আসবে। আসল পুলিশ আর পুলিশের কুত্তা সব শালা শহরের বাবুদের জন্য।

—কে রে? সইফুদ্দিন চাচা বসে বসে ঝিমচ্ছিল। গায়ে একপাল মাছি ভন্‌ভন্ করছে। পায়ের ঘাগুলো থেকে বিজবিজে কষ বেরচ্ছে।

মজাকলকে আসতে দেখে উঠে বসে চাচা।—কী রে, এ সময় চলে এলি? কাজে যাসনি।

—চাচা, সেই ভিনদেশির কথাটা?

—কুন কথাটা?

—সেই যে।

—ও।

চাচা দরজার বাইরেটা দ্যাখে। গলার স্বর নামিয়ে নেয়—যেন গুপ্তধনের হদিস দিচ্ছে এমনভাবে বলে—ভোঙ্গির তালুকে তখন জোর 'ধামাল'। চাষিভাইরা সব জমির দখল নিয়েছে। আর তার দেখাদেখি আশপাশের মুলুকের চাষিরাও শুরু করেছে। পাট্টাপূর্জা সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। নিজামের পুলিশ আর রাজাকর গুন্ডাদল এল ওদের দমন করতে। সে কী লড়াই। ওরা বন্দুকের গুলি ছোড়ে তো এরা জবাব দেয়, দূরপাল্লার তির আর বাদিশাল (বড়ো গুলতি) দিয়ে পাথরের বড়ো বড়ো টুকরো ছুড়ে। অনেক পুলিশ জখম হতে বেটারা ভয়ে হাতিয়ার ছেড়ে পালাল। আর চাষিদের হাতে এসে গেল অনেক বন্দুক।

—ভিনদেশি ছিল সে লড়াইয়ে?

—হাঁ বেটা। আর উদিককার পার্টিই তো পাঠালে ভিনদেশিকে এ দিক পানে লড়াই বানাতে। ও দিককার লড়াই যত জোরদার হয় এ দিককার মহাজনদের তত ভয় বাড়ে। নানাজনকে মহাজনেরা ভিনদেশির ব্যাপারে এটা ওটা শুধায়। ভিনদেশিকে ছুপিয়ে রাখলাম কদিন। চাচা থামে, খক খক করে কাশে দু বার। কফ ফেলে।—পানি হবে কিরে? হাওয়া জরা ঠাণ্ডা লাগছে।

—তারপর? মজারুলের চোখেমুখে আগ্রহ উপচে পড়ছে। জং-লড়াই—চাষিদের সেনা—সব আজব-কথা, নতুন নতুন কথা। চাষা একদিন ধরে—এই ছাব্বিশ বছর ধরে যখের মতো আগলে বসেছিল সব কাজের কথাগুলো।—ফিন?

—ও দিকে হিন্দুস্থানের সেনা ঢুকে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে লাগল। আর এ দিকে মহাজনদের সাহস গেল বেড়ে। দু-পাঁচজনকে ডেকে ভাতে মারার ধমক দিলে। অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। যা ডরপোক সব ইদককার মানুষ।

—ভিনদেশি কুন পার্টির ছিল চাচা?

চাচা সন্ধিগ্ধ চোখে গলির দিকে চায়। ধারেকাছে কেউ নেই। দূরে কোথাও এক নিঃসঙ্গ ঘুঘু ডাকছিল। সেটাও রহস্যজনকভাবে চুপ করে যায়। আর তখনই যেন গুপ্তধনের সিন্দুক খোলার অপরূপ চাবিকাঠি এক নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে চাচা ফিস্‌ফিস্ করে গোপন মন্ত্রটি উচ্চারণ করে—লালঝাণ্ডা পার্টি।

মজারুল কোনওদিন লালঝাণ্ডা দেখেনি, অওরঙ্গবাদে থাকতে শুনেছে মুম্বইতে আর অন্ধ্রতে নাকি এ পার্টি আছে। ওর বুকের ভেতরে কেমন যেন গুড়গুড় করে ওঠে একটা আবেগ—কামগারের পার্টি ভুখা মানুষের পার্টি। ভোটের কদিনের পার্টি না—সঙ্ঘর্ষের পার্টি, জংফৈলানোর পার্টি!

তারপর চাচা?

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রুক্মিণী ও বারহাটেকে থানা-হাজতে নিয়ে আসেন কুলকার্নি। কিন্তু সে রাতেও গাঁয়ের পথে পথে কালো-জোব্বা গায়ে—দাড়িওয়ালা হাতে লাঠি কাঁধে ঝোলা—কার নাকি ডাক শোনা গেছে—'ধারিয়াবাবা আলারে আলা' (ছেলেধরা এসে গেছে)। আর পরদিন সকালেই দেখা যায় এক চাষিবউ ও তার বাচ্চা মেয়েকে মাঠের মাঝে কেউ হত্যা করে রেখে গেছে। বউটির শরীর অক্ষত কিন্তু সাত বছরের মেয়েটির শরীরে সেই একই ক্ষতচিহ্ন।

কুলকার্নি আবার সুপারের কথাগুলো ভাবতে বসেন। আর সত্যি তো, এরপরেও রুক্মিণী এবং বারহাটেকে থানা-হাজতে আটকে রাখার মতো কী প্রমাণ হাতে আছে। সালভে অ্যাডভাইস দিলেই বারহাটে বা রুক্মিণী মার্ডার করবে এমন কোনও কথা নেই। আর সবচেয়ে বড়ো কথা আপনি বাঁচলে বাপের নাম। স্ত্রী তো দিনরাতই পেছনে লেগে আছে—কাউকে ধরে-করে এখান থেকে পুণেয় বদলি নাও। পুণের উপকণ্ঠে এক টুকরো জমিও কিনে রেখেছেন। মাথা গোঁজার জায়গা একটু করতে পারলেই হয়। নিজেদের বুড়ো বয়েসটাও নিশ্চিন্তি আর ছেলেদের জন্যেও কিছু করে দিয়ে যাওয়া হয়।

কুলগুরুর কাছ থেকে বিপদনাশিনী মাদুলি হাতে বেঁধে মুম্বই থেকে ডেপুটি কমিশনার ভাকাটকর মানওয়াটে এসে পৌঁছান। বড়োকর্তাকে খুশি করতে কুলকার্নির বউ নিত্যিদিন চর্ব্যচোষ্য রাঁধেন। ভাকাটকর পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গাম্ভীর্য সহকারে কুলকার্নিকে বোঝান যে আইনের হাত অনেক লম্বা এবং পুওরার ক্লাসের ভেতরেই টেনডেন্সি অব ক্রাইম বেশি। পুলিশ হচ্ছে প্রশাসন-যন্ত্রের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ বিভাগ এবং তাঁর চোঁয়া-ঢেকুর ওঠায় বাকি কথাটা আটকে যায়। কুলকার্নি অ্যান্টাসিড আনতে দৌড়ন।

বসের কথাগুলো কুলকার্নির হজম হয়। ভাকাটকর পাশের জেলার আদিবাসীদের মধ্যে নরমুণ্ড সহযোগে পুজো করার প্রাচীন রিচুয়ালের সন্ধান পেলে বসের নির্দেশে প্রায় গোটা দশেক গ্রামের সব পুরুষকে ধরে এনে বেধড়ক পিটিয়ে কনফেশন আদায়ে সচেষ্ট হন।

শুধু মজারুলদের মতো কিছু গরিবীগুরবো জোয়ান ছেলে দলবেঁধে চুপিসাড়ে রাত পাহারা দিতে শুরু করে। তাদের হাতে টাঙ্গি আর বাদিশাল।

—হুজুর পুলিশকে যা বলেছি, নেশার ঝোঁকে বলেছি। আর ওই পুলিশের বড়োবাবুটা ভয় দেখালে। ওঝা সালভে প্রভাকর মহাজনকে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে।

—যা হয়েছে, হয়েছে। আমি শহরে উকিলবাবুর কাছে নিয়ে যাব। ওখানে পুলিশ আর উকিলের সামনে বলবে যা বলেছ তা এই পুলিশের বড়োবাবু ভয় দেখিয়ে জোর করে বলিয়েছে।

—জো হুকুম হুজুর!

—কিন্তু রুক্মিণীর কিছু হচ্ছে না কেন? সবই তো ঠিকমত করা হল?

—না হুজুর, আমি কাল রাতেই বালাঘাই পর্বতবাসী বেতাল মহারাজের আদেশ পেয়েছি যে রুক্মিণী নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

ক্ষিপ্তা রুক্মিণী রাগে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওঝার ওপর। বারহাটে আটকান।

—কী নিয়ম?

—হুজুর, মহারাজ বেতাল আদেশ দিয়েছেন রুক্মিণী হাড় নয়তো সাপের গর্ত ডিঙিয়েছে আর তাই সন্তান এসেও নষ্ট হয়ে গেছে।

—কিন্তু আমার তো হয়ে হচ্ছে না।

রুক্মিণীর চোখে উত্তরাধিকারীর স্বপ্নে বিশাল সম্পদ তিরতির করে কাঁপে।

—হে নারী। ওঝা সালভে তার মহীরুহ ব্যক্তিত্বে আসীন আবার।— দশ মাস ধরে প্রতিমাসের এই ঋতুরক্ত জমেই তো সন্তান তৈরি হবে। নিয়মমত সব হলেই তুমি সন্তানবতী হবে।

বিদায়ী ভালই জোটে।

মজারুলদের রাত-পাহারার দলটির খবর ও চাপের ফলেই নবম খুনটি ঘটার পরেই ভোররাতে ইন্সপেক্টর কুলকার্নি রক্তমাখা কুঠার খুঁজে বার করে সমিন্দরবাইয়ের ঘর থেকে। সমিন্দরবাই নিজের, আর স্বামী টুকাইয়ার, রুক্মিণীর, প্রভাকর বারহাটের, সৎভাই সোপানের অপরাধ কবুল করে।

এবং কুলকার্নির ট্রান্সফার অর্ডার আসে প্রায় পেছন পেছন।

এর পরের ঘটনা যা জানা গেছে চোদ্দো মাসে নটি খুনের অভিযোগে সমিন্দরবাই টুকাইয়া ও সোপানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। রুক্মিণীর ফাঁসির হুকুম। কিন্তু তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটায় জেলে আপাতত পাগলদের ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। রুক্মিণী দিনরাত শুধু বিড়বিড় করে একটাই কথা বলে—সম্পত্তি কে ভোগ করবে? মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরেও চিৎকার করে ওঠে সে—এত সম্পত্তি তা হলে কে ভোগ করবে?

এ দিকে দলবদল করে প্রভাকর বারহাটের ভাইপো আবার এম এল এ নির্বাচিত হয়েছেন। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা বলছে খুড়ো নাকি ভাইপোকে জেতাতে অঢেল টাকা ঢেলেছে। প্রভাকর বারহাটে মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন এবং নতুন একটি রক্ষিতা এনেছেন।

তবু মানওয়াট খানিক বদলে গেছে। মজারুলদের এখন অনেক সঙ্গীসাথী। এখন প্রায়ই তারা সইফুদ্দিন চাচার ঘরে গিয়ে বসে। জিন-ভূত-দানোর রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলে ওরা মহাজনদের শোষণ-অবিচারের কথা আলোচনা করে। আর চাচার কাছে শোনে সেই ভিনদেশি রাজপুত্রের গল্প—কীভাবে সে ঘুমন্তপুরীর সবাইকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

মজারুলরা শোনে তার হাতের বাদিশাল নাড়াচাড়া করে। □

সময় অসময়

প্রদীপ মিত্র

এক

মাঝরাত্তিরে বাড়ির সামনে জিপ এসে থামার আওয়াজেই তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল নিরুপমার। কলিং বেল বাজামাত্র দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকল মৃগাঙ্ক। পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে টেবিলে রেখে বলল, ওঃ যা গরম, চান করতে হবে।

ঘড়ি দেখল নিরুপমা। বারোটা চল্লিশ। বলল, খাবে তো?

—নাঃ, খেয়ে এসেছি। শার্টের বোতাম খুলে ঘরের কোণে ছুড়ে দিয়ে চেয়ারে বসল মৃগাঙ্ক—স্রেফ এক কাপ কফি।

মৃগাঙ্কর মুখে মদের গন্ধ, গেঞ্জিতে ঘামের। দু দিন এক রাত পর বাড়ি ফিরল। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। ভাগ্যিস ফোনটা আছে! খবরটা অন্তত পাওয়া যায়।

মৃগাঙ্ক বাথরুমে ঢুকলে নিরুপমা পাশের ঘরে ছেলেমেয়ের পাশ থেকে শরৎ রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডটা তুলে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। ফ্রিজ থেকে দুধ বার করে জল মিশিয়ে গ্যাস জ্বালল।

—আজ বাড়ি আসবে টেলিফোনে বলোনি তো! নিরুপমা বলল।

- কেন, আগে থেকে না জানিয়ে বাড়ি এলে তোমার অসুবিধা হয় নাকি? সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথা ছুড়ে দিল মৃগাঙ্ক।

—না না, এ কী কথা বলছ তুমি? নিরুপমা বলল, 'বাড়ির মানুষ বাড়ি আসবে তাতে আবার অসুবিধা কী? মানে তুমি তো আজ বিকেলেও ফোন করেছিলে, তখন তো কিছু বলোনি, তাই বলছি। বাড়ি আসার ঠিক ছিল না, তাই না?

— ঠিক থাকবে কী করে? ওই দূর্বা ঘোষের গ্রুপটা যেরকম অতিষ্ঠ করে তুলেছে..... । দাঁতে দাঁত চাপল মৃগাঙ্ক, 'কাল তো ধরা পড়েছে পাঁচজন, তার তিনটেই মাগি—সব ওই দূর্বা ঘোষের গ্রুপের। সারা রাত ইন্টারোগেশন চালিয়েও একটি কথাও বার করা গেল না!'

এ কথায় কী বলা উচিত মাথায় আসে না নিরুপমার। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে। কফিতে চুমুক দিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে মৃগাঙ্ক। লোমে ভর্তি খালি গা, চর্বি আগের থেকেও বেড়েছে। শুধু একটা আন্ডারওয়্যার পরে আছে আলগা করে। নিরুপমা দেওয়ালের দিকে তাকাল। দেওয়ালে বাঁধানো ছবি - রাজ্যপালের হাত থেকে পুলিশ পদক নিচ্ছে মৃগাঙ্ক। এর পরেই ডি সি ডি ডি র‍্যাংকে প্রমোশন হয়েছিল।

—কাল ধরা পড়েছে বুঝি পাঁচজন? সব উগ্রপন্থী মানে টেররিস্ট যাদের বলে?

--হ্যাঁ, আজকের পেপারেই তো দিয়েছে। —মৃগাঙ্কর গলায় বিরক্তি—ডেলি পেপারটাও পড় না?

—-পড়তে ভালোলাগে না যে! নিরুপমা টেবিলে মৃগাঙ্কর রিভলভারটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, কাগজ খুললেই কেবল, খুন জখম-বোমা-পিস্তল-পাইপগান—সংবাদপত্র তো নয় দুঃসংবাদপত্র!

—কিন্তু নিউজপেপারই তো সময়ের দর্পণ মানে মিরর। মৃগাঙ্ক রিভলভারটা তুলে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে বলে, 'পেপারটা রোজ পড়ো, তা হলেই বুঝবে কেন আমাদের বাড়ি ফেরার ঠিক থাকে না। দেশটাকে যেন মগের মুলুক করে তুলেছে। আজ এখানে বোমা ছুড়ছে, ওখানে পাইপগান চালাচ্ছে, কাল থানা ঘেরাও,

মিছিল-মিটিং-স্ট্রাইক, স্কুল-কলেজ পোড়ানো, ট্রাফিক কনস্টেবল্ খুন! পেপার না পড়লে দেশের অবস্থাটা জানবে কী করে? ওই সব ন্যাকা ন্যাকা গপ্পো উপন্যাস না পড়ে পেপারটা পড়ো।

কুণ্ঠিতভাবে চোখ নামিয়ে নিরুপমা রেডিওর ওপর শরৎ রচনাবলীটা দেখল আড়চোখে। তারপর বলল, 'ওই বোমা ছোড়া-টোড়া খুন-টুন যারা করে তারা সবাই ওই দূর্বা ঘোষ নাকি বললে তার দলের?

—দলটা দূর্বা ঘোষের কে বলল? স্ত্রীর অজ্ঞতায় বিরক্ত হয়ে মৃগাঙ্ক—'ওদের খতম পার্টির এই অঞ্চলের লিডার। রীতিমত প্যানিক তৈরি করে রেখেছে—যাকে বলে লাল সন্ত্রাস। দূর্বা ঘোষের নামটা পর্যন্ত শোনোনি? মেয়েছেলে আর কাকে বলে?

মাথা নামিয়ে খানিকক্ষণ নখ খুঁটল নিরুপমা। তারপর মৃগাঙ্কর জন্য বিছানা করতে চলে গেল।

দুই

খবরের কাগজ রোজই আসে। কিন্তু কোনওদিনই তার জন্য বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে না নিরুপমা। পাতাগুলো উলটে ভাসা ভাসা চোখ বোলায়, সিনেমার পাতাটা দেখে। উত্তমকুমারের নতুন ছবি কোন কোন হাউসে রিলিজ করল দেখে আর ঘন শ্বাস ফেলে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম কত দিন সিনেমায় গেছে মৃগাঙ্কর সঙ্গে। মৃগাঙ্ক অবশ্য ধর্মেন্দ্রর ফ্যান ছিল, বাংলা ছবিকে বলত প্যানপ্যানানি। উত্তমকুমার বড়ো আর্টিস্ট না ধর্মেন্দ্র বা রাজেশ খান্না—এই নিয়ে তর্ক বিতর্কও হয়েছে কত রাত পর্যন্ত কোয়ার্টারের ছাদে! জ্যোতিতে 'হকিকৎ' দেখে আমিনিয়াতে খেয়ে একদিন অনেক রাতে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরছে, তখনও প্রথম প্রমোশনটাই পায়নি মৃগাঙ্ক, নিরুপমাকে নিরু বলতে বলতে মাঝে মাঝে নাড়ু বলে খ্যাপাত। ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে বলেছিল, "চিনের মুখোশটা কিন্তু খুলে দিয়েছে 'হকিকৎ'-এ, কী বলো নিরু?" আনমনে নিরুপমা বলেছিল, 'তা তো বটেই, বাইরেটা কী দারুণ লাগছে দেখেছ?' ট্যাক্সি তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে মার্বেল পাথরের সৌধ। মৃগাঙ্ক বলেছিল, 'টেররিস্টরা এ সব দখল করে মাথায় নাকি লাল পতাকা ওড়াবে। ভিক্টোরিয়া, রাইটার্স, আকাশবাণী স-ব, হেঃ।'

সে রাতে বাড়ি ফিরে মদ খেয়েছিল মৃগাঙ্ক, বাড়িতে সেই প্রথম! নেশার ঘোরে বলেছিল, "শালারা বলে কিনা চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, পুলিশ মিলিট্যারি গভর্নমেন্ট সব নাকি কাগুজে বাঘ, পার্লামেন্ট হল গিয়ে শুয়োরের খোয়াড়! শুয়োরেব বাচ্চাগুলো খুন করে, বামমোহন বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে' শালারা 'হকিকৎ' বন্ধ করতে গিয়েছিল! ... এক বুলেটে ওদের......

কাজ দেখিয়েই পুলিশ পদক পেয়েছিল মৃগাঙ্ক, প্রমোশনও পেয়েছিল পরপর। ক্রমশ দায়িত্ব বেড়েছে, কাজের চাপও বেড়েছে। বিয়ের পর বছরে তিন-চারবার ...পের বাড়ি যেত নিরুপমা, আত্মীয়দের বাড়ি যেত। মৃগাঙ্গর দায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তো নিরুপমার বাবা মারা গেলেন, মা-ও চলে গেল, দাদা ট্রান্সফার হয়ে বাঙ্গালোরে ছিল, সেখানেই অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল। বোনটার বিয়ে হয়েছে অনেক দূরে—সেই জলপাইগুড়ি। ওর স্বামী রাজনীতি করে, বোমা বাঁধতে গিয়ে হাতটাই উড়ে গেছে। চাকরিটা এখনও আছে কি না সন্দেহ, যোগাযোগ নেই বহু দিন! নিরুপমার এক দূরসম্পর্কের বোন সুজাতা, বোন না বলে গ্রামের বন্ধু বলাই ভালো, গ্রা... স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত দুজন, সেই সুজাতার সঙ্গে যোগাযোগটা অবশ্য ছিল। খুব মিল ছিল দুজনের, খুব মনের মিল। এই কলকাতাতেই তো বিয়ে হয়েছিল সুজাতার, কিন্তু ওর বিয়েতেও যেতে পারেনি নিরুপমা, শুনেছে ওর স্বামী স্কুল মাস্টারি করে। কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ নেই কত দিন! কোথায় যে আছে ওরা!

এ দিকে নিরুপমার ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে। ফ্ল্যাটে সময় কাটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে। মেয়েটা স্কুলবাসেই যাওয়া-আসা করে, ছেলেটাকে স্কুল দিয়ে আসতে হয়, নিয়ে আসতেও হয়। এটুকুই নিরুপমার বাইরে বেরনো, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ। আশপাশের লোকজন প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার অনেক চেষ্টা করেছে নিরুপমা। কিন্তু দু-চার কথা বললেও প্রাণ খুলে মিশতে চায় না কেউ। যেন একটু এড়িয়েই চলে। মৃগাঙ্ক গোয়েন্দা অফিসার বলেই কি?

ঘন শ্বাস ফেলে তাই শরৎ-রচনাবলীতে মন দেয়। কখনও রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে শোনে হেমন্তর গান, উত্তমকুমারের লিপে দারুণ মানায়। মাঝে মাঝে রেডিও খুলে নাটক শোনে, মহিলা মহল বা ছায়াছবির গান শোনে, কিংবা ছেলেমেয়েকে নিয়ে শিশুমহল বা গল্পদাদুর আসর। রেডিওর খবর ভালো লাগে না, খবরের কাগজ পড়তেও তাই। মৃগাঙ্ক যতই বলুক সমাজের দর্পণ, কাগজের পাতা জুড়ে খবর কেবল যে উগ্রপন্থী নাশকতা আর পুলিশি তৎপরতার রিপোর্ট, যেন সেই 'হকিকৎ' সিনেমাটা হচ্ছে রোজ রোজ। খুন জখম অ্যারেস্ট বোমা পাইপগান আর নেতাদের ভাষণের খবর। কত আর পড়া যায়? সিদ্ধার্থ রায় চারু মজুমদার জ্যোতি বসু কানু সান্যাল ইন্দিরা গান্ধী—সব বড়ো শক্ত শক্ত মনে হয়, সব একঘেয়ে।

তিন

শনিবার ছেলের স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি। স্কুল থেকে ফেরার পথে বুবুন বায়না ধরল খেলনা কিনে দিতে হবে। ভবানীপুরে খেলনার দোকানগুলো খুলতে খানিক দেরি আছে। লাইব্রেরি থেকে বইটা বদলাল। শরৎ চাটুজ্জের লেখা ন্যাকা ন্যাকা গপ্পো—বলেছে মৃগাঙ্ক। ওটা বদলে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'টা নিল, ছেলেমেয়েকে বলা যাবে গল্পগুলো।

ঘোরাঘুরি করতে করতে দেখল মিটিং হচ্ছে হাজরা পার্কে। এরকম আজকাল লেগেই আছে। মঞ্চ-ফঞ্চ কিছু নেই, একটু উঁচু জায়গায় লাল শালু টাঙিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বক্তৃতা করছে আধ-ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক। লোকটার চোয়াল ভাঙা, উসকোখুসকো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পথচলতি মানুষজন নিরুপমার মতোই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। লিফলেট বিলি করছে বিশ বাইশ বছরের কটা ছেলে। নিরুপমার হাতেও একটা দিল। 'বিপ্লবী তহবিল' লেখা বাক্স নেড়ে চাঁদা চাইছিল একজন, নিরুপমা দেখেও দেখল না।

ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল নিরুপমা, সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসল যে তাকে দেখে অবাক। ওর গ্রামের সেই হারিয়ে যাওয়া বন্ধু, ওর লুকোচুরি কুমিরডাঙা খেলার সাথি, ওর বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথার সঙ্গী, ওর গোলাপ ফুল পাতানো সই সুজি, মানে সুজাতা। পরনে আটপৌরে ডুরে শাড়ি। মাথার চুল কোনও রকমে জড়িয়ে খোঁপা বাঁধা, কোলে একটা বাচ্চা—নিশ্চয়ই ওর ছেলে। সুজাতা হাসছে, হাসলে এখনও ওর গজদন্ত দেখা যায়, চোখের তারা চকচক করে। তবে চোখের নীচে কালি পড়েছে, রোগা রোগা শুকনো চেহারায় লাবণ্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

—নিরু না? সুজাতাই এগিয়ে এসে কথা বলল। গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'ইস কত দিন পর দেখা!'

তারপর মিটিং শেষ হলে কত কথা! পার্কের রেলিং ধরে গ্রামের গল্প, সুজাতার বিয়ে, ঘর-সংসার, দেড় বছরের ছেলে আর স্বামীর স্কুলের সংবাদ। মাইনে পায় না ঠিকমত, বাড়িতে সায়া-ব্লাউজ বানিয়ে দোকানে দোকানে অর্ডার সাপ্লাই করতে হয় সুজাতাকে। নিরুপমার স্বামী যে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড়ো অফিসার হয়েছে, ছেলেমেয়েরা নামী স্কুলে পড়ে—সব খবরই রাখে সুজাতা। দুম করে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তুই হঠাৎ এখানে! মিটিং শুনছিলি নাকি?'

—আসলে ছেলেটা খেলনা কিনবে বলে বাযনা ধরেছে, কিন্তু দোকান তো খোলেনি, তাই ভাবলাম কী করি। বেশ বলে কিন্তু এরা। এ সব কথা সত্যি নাকি রে সুজি?

—কী সব কথা?

—ওই যে বক্তৃতায় বলছিল, থানা লক-আপে পুলিশে নাকি কাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে, মেয়েদের ওপর নাকি.....

—হ্যাঁ, সত্যি তো বটেই। অসীমা পোদ্দারকে তো এখনও ছাড়েনি। লিফলেটটা পড়িস। বারাসতের ঘটনাটা ডিটেলে লিখেছে তো! আচ্ছা, তোদের বাসাটা কোথায় রে?

—এই তো ঢাকুরিয়া—পি ব্লক, চার নম্বর ফ্ল্যাট—দোতলায়। এক দিন আয় না ভাই বরকে নিয়ে। কী নাম রে বরের?

—গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ মল্লিক।

—গৌরাঙ্গদাকে নিয়ে এক দিন চলে আয় তাড়াতাড়ি। বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে।

এ কথায় কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুজাতা। তারপর ঘন শ্বাস ফেলে বলল, 'নাঃ, পারব না রে। খুব ঝামেলার মধ্যে আছি। বুঝতেই তো পারছিস, স্কুলে পড়ায়, এই সামান্য চাকরিতে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থাকা, সব জিনিস কিনে খেতে হয়! একটু সেলাই-ফোঁড়াই করি, সংসারে কিছুটা ঠেকন দেওয়ার চেষ্টা আর কী! আচ্ছা, চলি রে! আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনও দিন রাস্তাঘাটে।'

গজদন্ত দেখিয়ে হেসে সুজাতা চলে যাচ্ছে, কোলে ছেলে, কাঁধে একটা ঝোলা। নিরুপমা ডাকল—'সুজি, এই সুজি।' তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তোরা কোথায় থাকিস বললি না তো।'

একটু যেন থতমত খেল সুজাতা। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'ওই তো কালীঘাটে। কিন্তু বাড়িতে তো তোকে আসতে বলতে পারব না এখন। কতটুকুই বা থাকতে পাই বাড়িতে? তোর দাদা স্কুল বেরিয়ে গেলে আমাকেও তো বেরতে হয়। দোকানে দোকানে অর্ডার সাপ্লাই করি বললাম না? বাড়ি ফেরার কোনও ঠিক থাকে না। আচ্ছা, তোর বাড়িতে বোধ হয় ফোন আছে। নম্বরটা বলবি? নম্বরটা থাকলে ফোনে এক-আধ দিন কথা বলা যাবে কিংবা দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যাবে। কত নম্বর রে?

ফোন নম্বর লিখে নিয়ে সুজাতা চলে গেল তাড়াতাড়ি। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখল নিরুপমা। সুজাতা কি এড়িয়ে গেল? কালীঘাটে থাকে বলল, কিন্তু পুরো ঠিকানাটাও বলল না। নিরুপমার স্বামী পুলিশে কাজ করে বলে?

বিকেল শেষ হয়ে আসছিল। নিরুপমা আনমনে তাকিয়ে ছিল দূরে, বুবুন হাত ধরে টানল। তারপর দোকানে নিয়ে গিয়ে খেলনা নিল—একটা রিভলভার, কোমরে বাঁধার খাপ সমেত। ঠিক ওর বাপির কোমরে যেমন দেখেছে তেমনই।

চার

ফ্ল্যাটে ফিরে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে পড়তে বসিয়ে কাজের মেয়েটাকে ছুটি দিয়ে লিফলেটটা খুলে বসল নিরুপমা। সাতটি মৃতদেহের ছবি—সাতজন গুলিবিদ্ধ তরুণ। প্রত্যেকের নাম ঠিকানা বয়স সব লেখা আছে। আরে! এ খবরটা তো কাগজেও বেরিয়েছিল কিছু দিন আগে। বারাসতের ঘটনা। হ্যাঁ, প্রথম পৃষ্ঠাতেই বোধ হয় দিয়েছিল পুলিশ-উগ্রপন্থী খণ্ডযুদ্ধে হত সাত তরুণ, আহত একত্রিশ পুলিশ-কর্মী। লিফলেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিরুপমা। একমাত্র যে ছেলেটি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তার কথা লিখেছে। বিনা বিচারে আটক ছিলাম আমরা—প্রত্যেকেই কম-বেশি এক মাস। রোজই দিন নেই রাত নেই, জিজ্ঞাসাবাদের নামে অকথ্য পৈশাচিক নির্যাতন করা হত আমাদের ওপর। একদিন আমাদের বলা হল তোমাদের ভালো খবর আছে। ওপর থেকে অর্ডার এসেছে তোমাদের ছেড়ে দেওয়ার। আমরা তো অবাক। জেলার বলল, আসলে তোমাদের তো ছাত্র হিসাবে সুনাম আছে, তা ছাড়া তোমাদের বয়সও কম। মিনিস্ট্রি থেকেই তাই তোমাদের রিলিজ করে দেওয়ার ডিসিশন হয়েছে। তারপর আমাদের নিজের নিজের জামাপ্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিতে বলা হল। আমরা একটা জিপে উঠলাম। রাত তখন বেশি নয়—আটটা। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর জিপ থামল একটা নির্জন জায়গায়—গঙ্গার ধারে। পুলিশ অফিসারটি বলল, যাও তোমরা, এবার নেমে বাড়ি চলে যাও। খুবই সন্দেহ হচ্ছিল আমাদের। আশঙ্কাও হচ্ছিল। কিন্তু কিছু তো করার নেই। আমরা হাঁটছিলাম আর মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে দেখছিলাম। পুলিশের ওপর আদৌ বিশ্বাস নেই, তাই সামান্য এগিয়েই আমরা পরস্পরের থেকে সরে ছড়িয়ে যেতে লাগলাম। অন্ধকার উঁচু-নিচু জায়গায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে বড়ো বড়ো পা ফেলে আমরা আলাদা আলাদাভাবে হাঁটছিলাম। হঠাৎ জিপের হেডলাইট জ্বলে উঠল। স্টার্ট নিল জিপটা। এগিয়ে আসতে লাগল খানাখন্দ দিয়ে। কাছাকাছি এসে জিপটার হেডলাইট ঘুরতে লাগল এ দিক থেকে ও দিক আর সেই সঙ্গেই শুরু হল বুলেট বৃষ্টি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে স্টেনগান থেকে। আমরা যে যে দিকে পারছি দৌড়চ্ছি। কিন্তু কতক্ষণ? মাথায় পিঠে গুলি খেয়ে একের পর এক লুটিয়ে পড়তে লাগল কমরেডরা। আমার

বাঁ পায়ে লাগল প্রথম গুলিটা। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম একটা ঝোপের আড়ালে গর্তের মধ্যে। এই পড়ে যাওয়াতেই আমি বেঁচে গেলাম।

লিফলেট থেকে মুখ তুলে ঘন শ্বাস ফেলল নিরুপমা। তবে যে কাগজে দিয়েছিল খণ্ডযুদ্ধ! মৃগাঙ্কদের ভাষায় এনকাউন্টার! লিফলেটে ছাপা হয়েছে তো একমাত্র জীবিত ছেলেটারই জবানবন্দি—নিজের চাক্ষুষ করা অভিজ্ঞতা ঃ পা ছেঁচড়ে টেনে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ঢালু জায়গায় কখনও এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে আমি গাছপালার আড়াল ঘেঁষে পালাতে লাগলাম। কিন্তু হেডলাইট ফোকাস করছিল আমার ওপর আর গুলি ছুটে আসছিল আলো ধরে ধরে। অনেকটা দূরে চলে গিয়েও আমি গুলি খেলাম। এবার ডান পায়ের উরুতে। তারপর ডান হাতে। শেষ গুলিটা আমার জামার বাঁ কাঁধটা ফুটো করে সামনে একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে বেঁধে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা খাদের জলের মধ্যে পড়ে যাই। তাতেই ওরা ভেবেছিল আমি মরে জলে ভেসে গেছি।

মুখ তুলল নিরুপমা। আর পড়া যায় না! সাতটা তরতাজা প্রাণ এইভাবে শেষ হয়ে গেল! লিফলেটের সস্তা কাগজে ছাপা ওদের মায়া মায়া মুখে অপরাধের কোনও ছাপ নেই। মুখে শুধু যন্ত্রণার ছাপ, ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়িয়ে নামছে কালো রক্ত। কারও চোখ বন্ধ, কারও খোলা। কী অপরাধে ওদের এই শাস্তি? লিফলেটের উলটো দিকে একেবারে নীচে, বক্স করে লেখা ঃ 'বারাসতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জবাব চাই।' তার নীচে ঃ 'শহিদ কমরেড লাল সেলাম।' একেবারে তলায় ঃ 'শাসক শ্রেণীর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিপ্লবীগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।'

লিফলেট পড়া শেষ হতেই নিরুপমার কানে আসে পাশের ঘরে বুবুন বলছে, 'এই বোন, লড়াই লড়াই খেলবি?'

উত্তরে মেয়েটা কী বলল শোনা গেল না। বুবুন বলছে, 'আমি পুলিশ তুই উগ্রপন্থী, অ্যাঁ? এই পিস্তল দিয়ে তোকে গুলি করব, তুই মরে যাবি, অ্যাঁ?' মেয়েটা বলছে, 'দাঁড়া আগে মায়ের আলতাটা নিয়ে আসি। গুলি মারলে রক্ত বেরয় জানিস না?'

পাঁচ

খানিক পরে মৃগাঙ্কর ফোন এল এবং আরও ঘণ্টাখানেক পর মৃগাঙ্ক ফিরল। ফিরে স্নান টান করে শুধু আন্ডারওয়্যারটা পরে ফুল-স্পিড ফ্যানের তলায় কফির কাপ নিয়ে বসলে নিরুপমা বলল, 'আজ আমার গোলাপ ফুল সই-এর সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পর।'

—কার সঙ্গে দেখা হল? মৃগাঙ্ক ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।

— গোলাপ ফুল সই গো, হাসে নিরুপমা, 'তোমার মনে নেই? সুজাতা, সুজাতা। সেই যে গো আমার বাপের বাড়ির গ্রামে—যে মেয়েটার গজদন্ত আছে, তুমি বলেছিলে হস্তিনী নাকি? আমাদের দুজনকে একরকম জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওর বাড়ি—সুজাতা—সুজি, মনে পড়ছে না?'

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে পড়ছে—টেবিলে কফির কাপটা রেখে সিগারেটে লম্বা টান দেয় মৃগাঙ্ক—'মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কত দিন?'

—বছর পাঁচেক হল, আর এই পাঁচ বছরই একদম দেখাই হয়নি আমাদের। আজ বুবুনকে স্কুল থেকে নিয়ে ফেরার সময় দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। ইস্, কী আনন্দ যে হল কী বলব তোমায়! ছেলেবেলা থেকেই ওর সঙ্গে খুব মনের মিল আমার, জানো তো? এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি, এক সঙ্গে খেলেছি, একটা দিনও ঝগড়া মনোমালিন্য হয়নি আমাদের।

চুপচাপ সিগারেট টানছিল মৃগাঙ্ক। হঠাৎ বলল, 'সুজাতার' সারনেম মানে টাইটেলটা কী ছিল যেন?'

—রায়, সুজাতা রায়।

—এখন কিন্তু মল্লিক। সুজাতা মল্লিক। কোথায় থাকে এখন বলল?

—কালীঘাট।

—অ। সিগারেটে পরপর কটা টান দিয়ে কফির কাপে ফেলে দিল মৃগাঙ্ক, তারপর উঠে বারান্দার দিকে যেতে যেতে বলল, 'সুজাতার সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করাই ভালো।'

এ কথায় আহত বোধ করে নিরুপমা। মৃগাঙ্ক এমনিতেই মেলামেশা তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু স্পষ্ট কারও নাম করে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে কখনও বারণ করেনি তো আগে। নিরুপমা অবাক চোখে তাকিয়েছিল মৃগাঙ্কর মুখের দিকে। মৃগাঙ্ক বলছে, ওর 'হাজব্যান্ড তো স্কুলমাস্টার, টেররিস্টদের কাগজে আর্টিকল লেখে ছদ্মনামে। সে সব বলেছে কিছু? আরে বাবা, গভর্নমেণ্ট পুরো একটা ডিপার্টমেন্ট পুষছে শুধু এইসব খবরের জন্যে। না বলল তো কী হল? জানতে বাকি রইল কিছু? ওদের একটা ছোটোখাটো মিটিং ছিল না আজ হাজরা পার্কে?'

আরও আশ্চর্য হয় নিরুপমা। ভয়ে ভয়ে বলে, 'ওদের মিটিং কি না জানি না, তবে মিটিং একটা হচ্ছিল দেখেছি। পাজামা পাঞ্জাবি পরা রোগামতন একটা লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বক্তৃতা দিচ্ছিল।'

—ওটাই গৌরাঙ্গ মল্লিক—ওর হাজব্যান্ড।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। ওই মিটিঙেই ছিল তো সুজাতা?

এ কথায় থতমত খায় নিরুপমা। কথাগুলো মনে মনে একটু সাজিয়ে নিয়ে বলে, 'ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম তো, ও পিছন থেকে এসে ডাকল, কোথায় ছিল দেখিনি।'

—অ। আবার একটা সিগারেট ধরায় মৃগাঙ্ক—'সব ওই দূর্বা ঘোষের গ্রুপ' ওই গৌরাঙ্গ মল্লিকের লেখাপত্রও তো তাই বলে।'

—তোমাকে এবার খেতে দিই? প্রসঙ্গ বদলাতে চায় নিরুপমা—'রাত হয়েছে অনেক।'

খাওয়ার পর গ্রিল বারান্দায় বসে সিগারেট টানছে মৃগাঙ্ক, নিরুপমা বলল, 'হ্যাঁ গো, দিনকতক আগে—প্রায় মাসখানেক হতে চলল—কাগজে একটা খবর দিয়েছিল দেখেছি বারাসতের, সাত জন মারা গিয়েছিল, একত্রিশ জন ইনজিওর্ড হয়েছিল এনকাউন্টারে, তুমিই তো বলেছিলে পুলিশকে ওরা কিভাবে ক্যামুফ্ল্যাজ করে........'

—হ্যাঁ, তো কী হয়েছে? মৃগাঙ্কর ভ্রূ-তে ভাঁজ পড়ে।

—না মানে সেরকম কিছু নয়—আমতা আমতা করে নিরুপমা—'আজ বুবুনকে নিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম তো, হঠাৎ একটা ছেলে, ওই মিটিং-এরই হবে নিশ্চয়ই, একটা লিফলেট দিল। পথচলতি সবাইকেই দিচ্ছিল, আমাকেও দিল। দেখবে?'

তাড়াতাড়ি 'বেতাল পঞ্চবিংশতির' ভেতর থেকে লিফলেটটা বার করে এগিয়ে দিল নিরুপমা। পড়তে পড়তে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে মৃগাঙ্ক, দাঁতে দাঁত চেপে বলছে, 'শুয়োরের বাচ্চাদের যত লোক-খ্যাপানো গপ্পো। শালা ......বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা পার্টি, ট্র্যাফিক কনস্টেবল খুন করা পার্টি, খতমের পলিটিক্স.......শালা চিনের দালাল—গপ্পো ছেপে বিলি করছে।. .....'

—কেন? গপ্পো বলছ কেন? নাম-ঠিকানা এ সব ছেপে দিয়েছে যে প্রত্যেকের!

—আরে, আনঅথরাইজড় পাবলিকেশন এ সব তাও বোঝো না? দিনরাত বেতালের গপ্পো পড়লে আর কী হবে? মৃগাঙ্ক ধমকের সুরে বলল, 'পাবলিশারের নাম-ঠিকানা আছে কোথাও? কিংবা প্রিন্টারের? যত্তসব রাবিশ, ড্রেনে গড়াগড়ি যায়......'

বলতে বলতেই লাইটারের আগুনে লিফলেটটা জ্বালিয়ে দেয় মৃগাঙ্ক।

ছয়

পরদিন দুপুরে ফোনটা বাজল। কী করছিস নিরু? —সুজাতার গলা শুনে চমকে উঠল নিরুপমা। 'তোর স্বামীকে বলেছিলি নাকি আমার কথা?' —জিজ্ঞেস করছে সুজি।

—হ্যাঁ, মানে ঠিক সেভাবে নয়—আমতা আমতা করে নিরুপমা।

—মৃগাঙ্কবাবু পলিটিক্সের কথা তুলল না?

কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে নিরুপমা বলল, 'কেন বল তো?'

—মৃগাঙ্কবাবু গোয়েন্দা তো, তাই জিজ্ঞেস করছি। —হাসল সুজাতা, 'পলিটিক্সের কথা নিশ্চয়ই তুলেছিল? বল।'

—হ্যাঁ, মানে........আচ্ছা তোর হাজব্যান্ড কি টেররিস্টদের কাগজে আর্টিক্‌ল লেখে?

—টেরিরিস্টদের কাগজে কি না বলতে পারব না, তবে কিছু ভালো ভালো লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অর্থনীতি রাজনীতির ওপর প্রবন্ধ লেখে এ কথা ঠিক। মৃগাঙ্কবাবুরা কত খবর রাখে দেখছিস তো? —হাসছে সুজাতা— 'কোন দিন হয়তো অ্যারেস্ট-ট্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেশনের নামে নখের মধ্যে সুচ ঢোকাবে, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেবে কিংবা বারাসতের ওই ছেলেগুলোর মতো......'

—যাঃ, কী আজেবাজে বলছিস? নিরুপমা বলে, 'আচ্ছা সুজি, ওই যে লিফলেটটায় সাতজন ছেলের খুনের কথা লেখা আছে ও সব কি পুরোপুরি সত্যি? মানে লিফলেটের কোথাও পাবলিশার বা প্রিন্টারের কোনও নাম-টাম নেই তো।'

আবার হাসছে সুজাতা। বলছে, 'তুই আমায় সুজি বলে ডাকলি আজ কত বছর পর! শোন্ নিরু, আমরা যে দলের রাজনীতিটা করি সেই দলটাকেই এখন সরকার বা প্রশাসন দেশের শত্রু বলে প্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। তাই তো ধরে ধরে বিনা বিচারে আটক করছে। অমানুষিক নির্যাতন করছে কিংবা খুন করে দিচ্ছে। তাই পাবলিশার-প্রিন্টারের নাম ছাপা তো সম্ভব নয়। ছাপলে তাদের ওপরেও অত্যাচার হবে, প্রেসই হয়তো বন্ধ করে দেবে। ফ্যাসিস্ট গভর্নমেণ্ট আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে লড়তে গেলে এটুকু কারসাজি করতেই হয়, উপায় কী? কোথায় ছাপা হল সেটা বড়ো কথা নয়, বুঝলি নিরু, সাধারণ মানুষের বোধ-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার ছাপ তাতে আছে কি না, সেগুলো সত্যি ঘটনা কি না— সেটাই আসল কথা। ছেলেবেলার সেই কুমিরডাঙা খেলাটা মনে আছে তোর? মৃগাঙ্কবাবুরা হচ্ছে কুমির আর আমরা যারা ডাঙায় আছি তারা—পলিটিক্সের জলে নামলেই মৃগাঙ্কবাবুরা কামড়ে দেয়—এই অবস্থা, বুঝলি তো?

—ধ্যেত, ও সব বাদ দে তো, নিরুপমা বলে, তোর সঙ্গে খুব গল্প করতে ইচ্ছে করছে। আমি খুব একা রে সুজি, ভীষণ একা! ভাল্লাগে না কিছু, কিচ্ছু, ভালো লাগে না রে!

—গল্প করার আর অসুবিধে কী? —টেলিফোনের ও দিক থেকে সুজাতার গলার স্বর ভেসে আসে— 'আমারও তো ইচ্ছে করে ঠিক ছেলেবেলার মতো পা ছড়িয়ে বসে গল্প করতে তোর সঙ্গে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু তোকে অ্যালাউ করবে তো?'

—ওর কথা বাদ দে।

—ঠিক আছে, তোকে একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি, কবে কোথায় দেখা করবি বলে দিস, তবে বাড়িতে নয়, বাইরে। নম্বরটা ধরে বলবি অনন্ত চক্রবর্তী; অ্যাঁ। লিখে রাখ নম্বরটা।

তাড়াতাড়ি বেতাল পঞ্চবিংশতির মলাটেই নম্বর লেখে নিরুপমা। লিখতে লিখতেই বলে, 'সব পেয়েও কিছুই পেলাম না রে গোলাপ ফুল, ছেলেবেলাটাই ভালো ছিল। বড়ো একা একা লাগে এখন, বড়ো ভয় করে!'

সাত

দিন কয়েক পর কাগজে একদিন কোন্নগরের ঘটনা বেরয়। কাগজের হেডলাইনে নতুন মন্ত্রিসভার সঙ্কট। একেবারে ডান পাশে শেষ কলামে লেখা ঃ কোন্নগরের কাছে মাটি খুঁড়তে গিয়ে মাটির তলা থেকে বার হয়েছে নয়টি যুবকের ক্ষতবিক্ষত পচা-গলা লাশ। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এই নয় জনই পুলিশ হেফাজতে ছিল এবং তারপর নিখোঁজ হয়ে যায়। নয়টি বীভৎস মৃতদেহের ছবি ছাপা হয়েছে পঞ্চম পৃষ্ঠায়। কাগজের ওপর ঝুঁকে-পড়ে নিরুপমা। শাড়ির আঁচলে কখন মুখে চেপে ধরেছে খেয়াল থাকে না।

সমস্ত দুপুর যখন একা, রেডিওর 'মহিলা মহল' শুনতে ভালো লাগে না, বেতাল পঞ্চবিংশতি খুলতে ইচ্ছে করে না, এমব্রয়ডারিতেও মন বসে না, হাতে সুচ সুতো নিয়েই চেয়ে থাকে কাগজের ছবির দিকে। ছবির পচা-গলা বিকৃত মুখগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। মনে মনে কথা বলতে শুরু করে মৃত মুখগুলির সঙ্গে।

বলো-না সত্যিই কি থানায় বোমা ছুড়েছিলে তুমি? সত্যিই কি মানুষ খুন করেছিলে? এ সমাজকে বদলাতে গেলে কি খতমের রাজনীতি না করলেই নয়? তোমরা বলো শ্রেণী-সংগ্রামের কথা, নকশালবাড়ির কথা, কৃষি-বিপ্লবের কথা। কিন্তু সাধারণ মানুষ, দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ কি বোঝে এ সব? বুঝলে এভাবে কীটপতঙ্গের মতো মরতে হয় কেন তোমাদের? কেন শুয়োর মারার মতো পুলিশ তোমাদেব খুন করে লাশ পুঁতে দেয়?

জলপাইগুড়ির ভগ্নিপতির কথা মনে পড়ে নিরুপমার। অনু মানে অনুপমার বর। ফরসা রোগা রোগা ছেলেটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ খুব কম, কাটেও না। কেমন নেপালি নেপালি দেখতে। সব সময় হাসে, তাই নিরুপমা ওকে ডাকত দেখন-হাসি বলে। মুরগি কাটতেও পারে না। শ্বশুরবাড়ি এসে ছাগল-ছানা কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়োত। সুজাতাদের বাড়িতেও গিয়েছিল ছাগল-ছানা কোলে। সেই গোবেচারি ছেলেটা কিনা রাজনীতি করে' বোমা বাঁধে! রাজনীতি করলেই কি বোমা মারতে হয়? মানুষ খুন করতে হয়? খুন না করে কি দেশের ভালো সমাজের ভালো করা যায় না? বোমা বাঁধতে গিয়ে হাতটাই খুইয়েছে ছেলেটা। এখনও বেঁচে আছে তো? আহা অনু, অনু রে।

কাগজ থেকে নিরুপমার চোখ সবে যায় দেওয়ালে। দেওয়ালে মৃগাঙ্কর পুলিশ পদক নেওয়ার ছবি। পুলিশের তো অনেক ক্ষমতা—রাষ্ট্রক্ষমতা না কী যেন বলে গৌরাঙ্গদারা। এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন এত ভয় কুড়ি বাইশ চব্বিশ বছরের ছেলেগুলোকে? এত ভয় যে বিনা বিচারে আটক রেখেও ভয় যায় না! শুয়োর মারা করে মেরে ফেলতে হয় গোপনে! কিংবা জেরার নামে অমানুষিক নির্যাতন করতে হয়!

দিনের পর দিন বন্দিদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতনের খবর। কিছু কিছু বেরয় খবরের কাগজে, বেশিরভাগই রাস্তায় পাওয়া প্যাম্ফলেটে, বুকলেটে, স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ে। জেলে কিংবা থানা লক-আপে সারা রাত হাজার হাজার ওয়াট বৈদ্যুতিক আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করার ফলে অন্ধ হয়ে গেছে কেউ, কিংবা দিনের পর দিন অত্যাচারে উন্মাদ। ফ্যানের রড থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখে পেটানো হয়েছে গাঁটে গাঁটে, মেয়েদের যৌনাঙ্গে দেওয়া হয়েছে সিগারেটের ছ্যাঁকা। জেরার নামে চৌবাচ্চায় চোবানো হয়েছে সারা রাত, নখের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে সুচ। পড়তে পড়তে বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে নিরুপমার; আনমনে নিজের নখের মধ্যে সুচ ঢুকিয়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে কেমন রক্ত পড়ে: বাথরুমে গিয়ে অকারণে চৌবাচ্চার জলে মাথা ডুবিয়ে থাকে প্রাণপণ, তারপর ছটফট করতে করতে মাথা তুলে ফেলে। হাঁপায়। শুয়ে ঘুম আসে না। পাখার হাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই মনে হয় ঝুলছে যেন কেউ, যেন অসীমা পোদ্দার! অচেনা মেয়েটার মুখ ঝুলছে নীচের দিকে, সে উলঙ্গ! মেয়েটার মুখে রক্ত, গোপনাঙ্গে রক্ত! উঃ মা গো! অনু, অনু রে! বড়ো একা হয়ে গেছি রে বোন! চারপাশে যুদ্ধের মধ্যে বড়ো ভয় করে আমার। হ্যাঁ যুদ্ধ, যুদ্ধই তো! —যে যুদ্ধের এক পক্ষে রয়েছে বারাসত, কোন্নগর, বসিরহাট, দমদম, বরানগরের খুন হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েগুলো, ওদের মিটিং-এর মানুষজন আর সুজাতারা, আর অন্য পক্ষে রয়েছে মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ আর মৃগাঙ্ক! নিরুপমা কোন দিকে যাবে?

আট

মাসখানেক পর একদিন সন্ধের পর মৃগাঙ্ক বাড়ি ফিরেই বলল, 'বিকেলে কাউকে ফোন করছিলে?'

থতমত খায় নিরুপমা। মৃগাঙ্কের মুখে অ্যালকোহলের চড়া গন্ধ। আমতা আমতা করে বলে, 'কেন বলো তো!'

—যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাবটা তো আগে দেবে—মৃগাঙ্ক বিরক্ত—তা নয়, পালটা প্রশ্ন।

—না, মানে.......কই? নিরুপমা কোন রকমে বলে, 'ফোন তো করিনি কাউকে।'

—সেই কথাটা বলতে এতক্ষণ? আসলে লাইনটা এনগেজড্ পাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম তুমি বুঝি ফোন করছ কাউকে। ঠিক আছে, কড়া করে চা করো।

বাথরুমে ঢুকল মৃগাঙ্ক। বেরিয়ে যথারীতি শুধু আন্ডারওয়্যার পরে গ্রিল-বারান্দায় বসল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'উঃ যা ঝঞ্ঝাট যাচ্ছে কাল থেকে!'

—কেন, কী হয়েছে? —মৃগাঙ্কর রোমশ বুকের দিকে তাকিয়ে নিরুপমা জিজ্ঞেস করল।

—একটা খাণ্ডার মেয়ে ধরা পড়েছে পরশু, নাম বলছে দূর্বা ঘোষ।

—তাই নাকি? আরও কাছে এগিয়ে আসে নিরুপমা।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি আসল নাম তা নয়। আমাদের কাছে যা ইনফরমেশন, দূর্বা ঘোষ আসলে দূর্বাচরণ ঘোষ—বেটাছেলে। শুয়োরের বাচ্চা প্রচার হয়ে গেল মাগি বলে! বোঝো কী পলিটিক্স! এরকম কত মাগি ধরা পড়ে দূর্বা ঘোষ নাম বলে তার ঠিক আছে? তবে নামের কথা বাদ দাও, মেয়েছেলে তো নয়, একটা যেন থ্রি নট থ্রি বুলেট! এমন তাকায় যেন চোখ দিয়ে আগুন বার করেই ভস্ম করে দেবে!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ইনটারোগেশনে মাগি একটা কথাও ফাঁস করল না। আসল দূর্বা ঘোষের খবর তো দিলেই না, এমনকি গ্রুপের অন্য কারও নাম-ঠিকানা পর্যন্ত বললে না। স্ট্যামিনা বটে!

—তুমিই জেরা করছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ, কিন্তু কাজ হল না দেখে ওকে যার কাছে পাঠানো হয়েছে তার নামেই মেয়েদের পেচ্ছাপ আটকে যায়। পোয়াতি মেয়েদের আবার দু চক্ষে দেখতে পারে না। মাগিটাকে উলঙ্গ করে সিলিং ফ্যানের রড থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল—ওপর দিকে ঠ্যাং আর নীচের দিকে মুণ্ডু। কাল সারা রাত।

—তারপর? তারপর?

—তারপর আর কী? ব্লিডিং থামতেই চায় না। আমাকে আবার ডাক্তার নিয়ে ছুটতে হল লর্ড সিনহা রোডে—আই বি লক-আপে। ওখান থেকে অবশ্য সরিয়ে দেওয়া হবে প্রেসিডেন্সি জেলে। এই যাঃ, কথাটা খুব গোপন—টপ সিক্রেট, যেন পাঁচ কান হয় না, খুব সাবধান!

চায়ের খালি কাপ-ডিশটা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে নিরুপমা, কাপটা ডিশের ওপর ঠকঠক করে কাঁপছে। তুমি এবার খেয়ে নেবে তো? —প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করে নিরুপমা—রাতের খাবার দিয়ে দিই?

—নাঃ, গলা ভেজাতে হবে আর একটু। ফ্রিজ থেকে মাংস বার করে একটু ঝাল ঝাল করে ভেজে দাও তো।

নিরুপমা ভেতরে যেতেই বুবুন এসে বলল, 'তারপর কী হল বাপি?'

—কিছু না। পড় গে তো! কেবল বড়োদের কথায় কান পাতবে। মারব এক লাথি।

ধমক খেয়ে দরজা থেকেই গুটিগুটি ভেতরে ঢুকে পাশের ঘরে চলে যায় ভাই-বোনে।

—এই বোন, কাল এই রক্ত রক্ত খেলাটা খেলব কেমন? বুবুন ফিসফিস করে।

—লাগবে না তো? বোন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

—দূর বোকা! লাগবে কেন? মিছিমিছি তো।

রান্নাঘরে গ্যাস জ্বেলে নিরুপমা চেয়ে থাকে জানলার বাইরে অন্ধকারে। কালো আকাশজোড়া একটি মেয়ের মুখ। সে কি দূর্বা ঘোষ, অসীমা পোদ্দার, সুজাতা নাকি নিরুপমা নিজে?

অনেক রাত্তির পর্যন্ত বারান্দায় আন্ডারওয়্যার পরে বসে বসে ভাজা মাংস দিয়ে মদ খায় মৃগাঙ্ক। ছেলেমেয়েকে খাইয়ে নিজে একখানা রুটি চিবিয়ে শুয়ে পড়ে নিরুপমা। ঘুম আসে না। কেবল মৃতদেহ ভাসে চোখের সামনে। বরাসত-কোন্নগরের ছেলেরা ভাসে, ভাসে নকশালপন্থীদের বোমার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন মাস্টারমশাই,

ট্র্যাফিক কনস্টেবল্। নিরুপমার চোখের সামনে দৌড়ে পালায় পায়ে উরুতে গুলি খাওয়া তরুণ। বন্ধ চোখের ওপর দুলতে থাকে পুলিশের পাশবিক অত্যাচারের শিকার বসিরহাটের মেয়ে।

মৃগাঙ্ক বলে অ্যাডভেঞ্চার। অ্যাডভেঞ্চারে মেতেছে আজকের ইয়ং জেনারেশন। পিকিং রেডিও আর সি আই এ-র এজেন্ট চারু মজুমদারই নাকি এদের মাথা চেবাচ্ছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে নিজের জীবনের বিনিময়ে নিছক অ্যাডভেঞ্চার কি সম্ভব?

উগ্র গন্ধ আসে অ্যালকোহলের। ঘুম আসে না। নীলাভ আলোয় নিরুপমার চোখের সামনে লর্ড সিনহা রোডের আই বি লক-আপে সমানে দোল খেয়ে যায় ফ্যানের রড থেকে ঝোলানো পোয়াতি মেয়েটা!

নয়

পরদিন সকালে বুবুনকে স্কুলে দিয়ে আসার পর কাজের মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে নিরুপমা ফোনটা তোলে। কাল বিকেলে সুজাতা ফোন করেছিল—বোধ হয় সেই অনন্ত চক্রবর্তী ভদ্রলোকের অফিস থেকে। দু বন্ধুতে অনেকক্ষণ গল্প হয়েছিল ফোনে, যে কারণে মৃগাঙ্ক নিরুপমাকে ফোন করতে গিয়ে লাইনটা পায়নি। কথায় কথায় সুজাতা বলছিল ওর মন খারাপ। ওর এক বান্ধবী, সে-ও দোকানে দোকানে শায়া-ব্লাউজ বানিয়ে সাপ্লাই করে বেড়োয়, পরশু ধরা পড়েছে চেতলা থেকে। এখন তো ধরা পড়লেই বিনা বিচারে আটক। কিন্তু মেয়েটা প্রেগন্যান্ট। ওকে কোথায় যে রেখেছে পুলিশ তার কিছুই জানতে পারেনি ওরা, তাই ভয় ওকে বা ওর পেটের সন্তানকে অত্যাচার করে মেরে না ফেলে।

এই মেয়েটাই কি এখন আই বি লক আপে এবং সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা প্রেসিডেন্সি জেলে? কাল রাত্তিরে নেশার ঘোরে কথাটা বলে ফেলেছে মৃগাঙ্ক। খবরটা পাঁচ-কান করতে বারণ করে দিয়েছে। কিন্তু সুজাতাকে জানালে মৃগাঙ্কের তো কোনও ক্ষতি হবে না। অন্য দিকে মেয়েটা অন্তত নির্যাতন থেকে বেঁচে যাবে। আহা ওর পেটের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে বাচ্চা!

—হ্যালো, অনন্ত চক্রবর্তীকে একটু দেবেন?

সুজাতাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য মেসেজটা বলে দিয়েই আতঙ্কিত হয়ে উঠল নিরুপমা। এরকম গোপন কথা—মৃগাঙ্কর অফিস সিক্রেট—বলে দেওয়াটা কি ঠিক হল? মৃগাঙ্ক যদি জানতে পেরে যায়? না না, কীভাবে জানবে? এই যে বুবুনকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে কয়েক দিন দেখা হয়েছে সুজাতার সঙ্গে, ফোনেও গল্প হয়েছে মাঝে মাঝে—কিছুই জানতে পারেনি তো মৃগাঙ্ক। নিরুপমা রাস্তা থেকে লিফলেট বুকলেট পেয়েছে আরও কত বার, দেওয়ালের পোস্টার পড়েও জেনেছে অনেক কিছু, কই মৃগাঙ্ক তো বুঝতেও পারেনি কিছুই।

মৃগাঙ্কর সঙ্গে সম্পর্কটাই কেমন হয়ে গেল!—দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরুপমা— আসলে জীবনটাই যে ভয়ঙ্কর বদলে গেছে চারপাশে। কেমন যেন ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে সময়! এই অসময়ে কি টেবিল ক্লথের এমব্রয়ডারি কিংবা উত্তম-সুচিত্রায় বুঁদ হয়ে থাকা যায়?

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ জিপ এসে থামল বাড়ির সামনে। জেগেই ছিল নিরুপমা। চুপচাপ বসেছিল বারান্দায় অন্ধকারে। কলিং বেল বাজার আগেই ঘর খুলে দিল। ধক করে নাকে এসে লাগল উগ্র অ্যালকোহলের গন্ধ। ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে নিরুপমার মুখের ওপর ঋজু দৃষ্টি ছুড়ে দিয়েছে মৃগাঙ্ক। চেয়ে আছে এক দৃষ্টে—যেন শিকারের দিকে বাজপাখি। খুব গম্ভীর। নিরুপমার কপালে ভাঁজ পড়ে। ভয়ে ভয়ে বলে, 'কী ব্যাপার? পাখার তলায় বোসো।'

—তুমি ফোন করেছিলে ওদের? পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় মৃগাঙ্ক। খুব নিচু গম্ভীর গলায় কেটে কেটে উচ্চারণ করে কটি শব্দ—'অফিস সিক্রেটটা দূর্বা ঘোষের গ্রুপকে না জানানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলে না, না?'

—কী হয়েছে? আতঙ্কে ঢোঁক গেলে নিরুপমা, ওর শরীরের ভেতর দিয়ে যেন একটা হিমস্রোত বয়ে যাচ্ছে, কোনও রকমে বলে, 'কই আমি তো কাউকে......'

—শাট্ আপ। গর্জন করে ওঠে মৃগাঙ্ক, একদম মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করবে না। তুমি না খবরটা

দিলে ওরা জানল কী করে? তোমার জন্য, শুধু তুমি ভেতর থেকে স্যাবোটাজ করার জন্য আজ সন্ধে থেকে আই বি লক-আপের বাইরে হাজার খানেক লোক জমেছিল। মেয়েছেলেটাকে প্রেসিডেন্সি জেলে শিফ্‌ট্‌ করার সময় রাস্তা থেকেই কেড়ে নিয়ে গেল।

—কিন্তু আমি তো কাউকে কিছু......

—শাট্‌ আপ ইউ স্কাউন্ড্রেল! বলতে বলতেই নিরুপমার মুখের ওপর সজোরে ঘুসি চালায় মৃগাঙ্ক। ডাইনিং টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিরুপমা। বুট দিয়ে সজোরে লাথি কষিয়ে মেঝেয় ফেলে দেয় মৃগাঙ্ক তারপর আলমারি খুলে বার করে আনে হান্টার। বিয়ের পর কুকুর পোষা হয়েছিল, সে সময়কার চাবুকটা।

—শালা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! তোকে আজ মেরেই ফেলব শালী।.......

কিছুক্ষণ চাপা আর্তনাদ করার পর নিরুপমা স্তব্ধ হয়ে যায়। ছেলেমেয়ে ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করে।

দশ

পরদিন সকালে সর্বাঙ্গে ব্যথা। গা গরম। শাওয়ার খুলে ভালো করে স্নান করে নিরুপমা। মৃগাঙ্ককে বেড-টি দিয়ে ছেলেমেয়েকে ঘুম থেকে তোলে, খেতে দেয়।

অফিস বেরবার সময় পর্যন্ত একটাও কথা বলে না মৃগাঙ্ক। স্কুল বাস এসে মেয়েকে নিয়ে যায়। বুবুনকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে নিরুপমা। তারপর যথারীতি একা, ভীষণ ভীষণ একা। ইচ্ছে হয় অনুর সঙ্গে গল্প করে, সুজাতার সঙ্গে গল্প করে। সেইসব পুরোনো দিনের গল্প, সেই লুকোচুরি, রুমালচোর, কুমিরডাঙা খেলার গল্প। ঝড়বৃষ্টিতে আম কুড়োনোর গল্প। ইস্ সেই সুজাতা—সুজি, সে কিনা আমের আচার চুরি করে মায়ের বকা খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে এসেছিল নিরুর কাছে, সেই সুজাতা যে পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র পাওয়ার আগেই ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করত সে কিনা আজ....

সত্যিই বদলে গেছে সময়। কেমন যেন সাগরের ঢেউয়ের মতো উত্তাল টালমাটাল সব। বড়ো অশান্ত। নইলে সংসার, ছেলেমেয়ে, স্বামী, রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, বই— সব থাকতে শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজ কিংবা লিফলেট খুলে নিরুপমা কেন ছবির মৃত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কাটাবে সমস্ত দুপুর?

বিয়ের পর কত স্বপ্ন ছিল মৃগাঙ্ককে নিয়ে। মৃগাঙ্ক যে অ্যালসেশিয়ানটা পুষেছিল তাকে নিয়ে কত দিন ভোরে বেড়োতে বেরিয়েছে দুজনে, রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে তখন এখনকার মতো জোতদার খতম, কৃষি বিপ্লব আর গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কথা লেখা থাকত না, 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' ক্যাপশন দেওয়া ইন্দিরা গান্ধির ছবির পাশে লেখা থাকত না 'চারু মজুমদার জিন্দাবাদ'। কুকুরটা মরে যাওয়াতে খুব কেঁদেছিল নিরুপমা, হান্টারটা কেনা হয়েছিল কুকুরটার সঙ্গেই ওকে পোষ মানানোর জন্য ভয় দেখাতে, কিন্তু এক ঘা ও কোনও দিন চালানো হয়নি কুকুরটার ওপর।

আপন মনেই হাসছিল নিরুপমা। কাল রাত্তিরে এই সামান্য হান্টারের কটা ঘায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল! তা হলে যে সব মেয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মৃগাঙ্কদের হাতে নির্যাতন সহ্য করছে, তারা? রাতভর সিলিং থেকে নীচের দিকে মাথা রেখে ঝুলতে ঝুলতে যে মেয়েটার অ্যাবরশন হয়ে যায় তার কত কষ্ট! কত যন্ত্রণা!

ফোনটা বেজে ওঠে এই সময়। ধড়ফড় করে উঠে তাড়াতাড়ি ফোন তোলে।

—হ্যালো, আমি সুজাতার বান্ধবী বলছি। সুজাতা মানে সুজাতা মল্লিক, বুঝতে পারছেন তো? সুজাতা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। না না, সেরকম কিছু নয়, আসলে ওর বোধ হয় কিছু টাকা-পয়সা দরকার। ওর হাজব্যান্ড ঠিকমত মাইনে পাচ্ছে না স্কুল থেকে, তাই হয়তো আপনাকে কিছু বলবে। আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায়, মানে আপনাদের বাড়ি থেকে আসতে মেন রোড থেকে বাস থেকে নেমে, বাঁ দিকে একটু হেঁটে মোড়ের মাথায় ঠিক 'জয় মা তারা' দোকানটার সামনে......

সারাটা দুপুর উত্তেজনায় ছটফট করে নিরুপমা। ইস, কী আনন্দ, সুজির কথাই ভাবছিল আর সুজি নিজেই কিনা দেখা করতে বলেছে। বিকেলে বুবুনকে স্কুল থেকে এনে বাড়িতে রেখে কাজের মেয়েটাকে থাকতে বলেই বেরিয়ে পড়ে। মৃগাঙ্ক জানতে পারলে কী হবে এই চিন্তাটা যে মাথায় আসে না তা নয়। কিন্তু সুজাতা—সুজি যখন ডেকেছে তখন কোনও কথা নেই। সুজি মানে গোলাপ ফুল সই, ছেলেবেলার কুমিরডাঙা খেলার সাথি, পুকুরপাড়ে নির্জন দুপুরে পা ছড়িয়ে আচার খাওয়ার বন্ধু। ওর স্বামী ঠিকমত মাইনে পায় না, আহা!

টাকা যা ছিল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এবং বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার আগেই আচমকা গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গেই বোমা পড়ে। খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের অ্যামবাসাডর এক রাশ ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা যায় লাশের পাশে বেশ কিছু লিফলেট ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। নকশালপন্থীদের শ্রেণী-শত্রু খতমের আহ্বান ছাপা তাতে।

ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে, বেশি রাতে পুলিশ এসে লাশ তুলে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বহু লোক এসে লাশ দেখে যায়। এমনকি মন্দির চত্বর থেকে, ফলের বাজার থেকে, বড়ো রাস্তা থেকেও অনেক মানুষ এসে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে। এবং দূর্বা ঘোষের গ্রুপের কর্মীদের কয়েকজন গোপনে লাশ দেখতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে পুলিশের হাতে ধবা পড়ে। সুজাতা তাদেব একজন।

পবদিনের কাগজে ভেতরেব পাতায় ছোট্ট করে বেরয় খবরটা: নিরুপমা দত্ত নাম্নী জনৈকা মহিলাকে বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন মৃত অবস্থায় কালীঘাট মন্দিরেব কাছে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিববণ মতে মহিলা সম্ভবত দেবীদর্শনের উদ্দেশে একাই মন্দিরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি বোমা ছোড়া হয় মহিলাব ওপব এবং সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। এটি নকশালপন্থীদের কাজ বলে পুলিশেব সন্দেহ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মৃতাব স্বামী কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের উচ্চপদস্থ অফিসার। মৃতদেহের চারপাশে ছড়ানো লিফলেট থেকে পুলিশেরা অনুমান যে, আততায়ী উগ্রপন্থীরা দূর্বা ঘোষ গোষ্ঠীর সশস্ত্র কর্মী। গৌরাঙ্গ মল্লিক নামে এক স্কুল-শিক্ষককে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। □

চক্রব্যূহ

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

কৌশিক এখন কাগুজে বাঘ। এই শহরের বেশ কয়েকটা সংবাদপত্রের সঙ্গে কৌশিকের এক ধরনের নির্লিপ্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সব কাগজে প্রায়শই ওর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অথচ ঠিক এই রকম কোনও নির্দিষ্ট যুক্তি ও অবয়ব তার সামনে নেই যে প্রক্রিয়ায় ভেবে নেওয়া সম্ভব, ঠিক কোন অবস্থা ও প্রতিবেশের পরিকল্পিত যোগাযোগে এখন সে সংবাদ জগতের পোকায় পরিণত হয়েছে। প্রথমদিকে মনে হত ওর নিজের কিছু বক্তব্য আছে এবং সেই বক্তব্যকে প্রকাশের জন্য একটা মাধ্যম বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু পরবর্তী স্তরে এই উদ্দেশ্যটা বদলে যেতে থাকে। সংবাদপত্রকে ব্যবহার করার বদলে সংবাদপত্রই এখন কৌশিককে খবর আদায়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। বর্তমানে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা তার মনস্তত্ত্বে ঘুণপোকা যে সে সংবাদপত্র নামক দৃশ্যমান পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ লীন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, যে কোনও সংবাদের উজ্জ্বল অক্ষরের মাঝে কৌশিক নিজেকে দেখতে পায়। আর এই দৃশ্য বস্তুত তার শরীরে কম্পনরেখা ও মনের বিন্দুতে এক রঙিন আলপনা এঁকে দেয়।

সেই ছোটোবেলা থেকেই, কৌশিক সংবাদপত্রের জগৎকে বেশ ভয় করে। এই ভয়ের কারণ হল, প্রায় তখন থেকেই খবরের কাগজ ওর মধ্যে এক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করত। কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই সংবাদের অন্তর্গত বস্তুরাজি বিশাল এক আতঙ্কের দুনিয়াকে পর্দায় হাজির করত। যেন যুদ্ধ এবং মহামারী ছাড়া পৃথিবীতে কোনও খবর নেই। সংবাদপত্রের ঘটনাজড়িত বিষয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও কৌশিক যেন নিজের অজান্তে জড়িয়ে ফেলত নিজেকে। হাজার হাজার মানুষের বিষণ্ণতার কাহিনী থেকে কৌশিক মাঝে মাঝেই তীব্র মৃতদেহের গন্ধ টের পেত। সংবাদপত্র যেন আতঙ্কের এক বিশাল প্রান্তর, সেখানে কৌশিক কোনও দামাল শিশুর মতো হামাগুড়ি দিতে থাকে এবং দু হাতে জাপটে এই গ্রহের যাবতীয় ঘটনাকে আত্মসাৎ করে নিজের মধ্যে।

প্রথম দিন সম্পাদকের মুখোমুখি বসে অবধি, ওর সেই অনিশ্চয়তাটা অনুভব করেছিল কৌশিক। শৈশবের সেই অমলিন সাদা কাগজের উপর সাজানো অজস্র অক্ষরের নির্জনতা, সেই নির্জনতায় কৌশিকের শরীর ভাসিয়ে অক্ষর মৈথুন; যেন নতুনভাবে টের পেয়েছিল ও। সম্পাদক কিন্তু খুবই ঝকঝকে। আত্মস্থ গলায় ওর পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলেন। সেই শুরু, বলা যায়। এই ঘটনা বছর তিনেক আগের। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে নিউজপ্রিন্টের সমুদ্র ওকে আকর্ষণ করতে শুরু করে। মুদ্রিত হরফে হাজার হাজার শব্দের আনাগোনায় মাতাল হয় কৌশিক।

সাংবাদিকতার প্রথমদিকে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি অনুভব করত কৌশিক। লক্ষ লক্ষ মুদ্রণে নিজের নাম দেখে, অথবা সংবাদপত্র তার ভাবনাকে বেশ প্রশ্রয় দিচ্ছে, এই ধারণায় বেশ মুগ্ধতা আছে। সম্পাদকের শীতল চোখের চাউনি, লেখার গুণাগুণ সম্পর্কে তার বিজ্ঞ মন্তব্যের হাসি ঢেউ হয়ে প্রবেশ করত শরীরে। পরের দিকে অবশ্য ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। এইভাবে বছর খানেক বাদেই কৌশিক সম্পৃক্ত হয়ে গেল মিডিয়া-জগতে। এই প্রক্রিয়ায় খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। আসলে কৌশিকও যেন মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছিল, এই কাজের জন্য। আগের সেই ভয়কে এখন কবজা করা সম্ভব হয়েছে। কালো মুদ্রিত অক্ষর এখন আর সমুদ্রভীতির কারণ নয়। কৌশিক, প্রায় খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে প্রোথিত করেছিল সংবাদপত্রের জগতে। সংবাদ আদায়ের কৌশল অনেকটা রপ্ত হয়ে গেলে, ইদানীং সম্পাদকের

গভীর মুখেও হাসির চিড় দেখা যায়, কৌশিক লক্ষ করেছে। শুধু সেই অনিশ্চয়তা বা উৎকণ্ঠার ঝড়কে এখনও বশ করা যায়নি। সাংবাদিকতার অলি-গলি নখদর্পণে এলেও, মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে উৎকণ্ঠার সেই ঝড়কে এখনও কৌশিক মাঝে মাঝে রক্তস্রোতে অনুভব করে। এর যথার্থ কারণটা অবশ্য ওর কাছে অজানা।

এই উৎকণ্ঠা নিয়েই ও বেরিয়ে পড়েছিল নতুন ঘটনার তথ্যসংগ্রহে। সম্পাদক বেশ হাসিমুখে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কাগজের স্থির লক্ষ্য। বিষয়টা দশ-বারো বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনও রাজনৈতিক গণহত্যা। এই বিষয়ে তদন্ত করে সমস্ত ঘটনাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রথমে শুনে বেশ চমকে উঠেছিল কৌশিক। বেশ একটা উত্তেজনাও হচ্ছিল। ঠিক এই ধরনের কোনও কাজের কথা সম্পাদক বলতে পারেন, এটা ধারণায় ছিল না। এই ধরনের কাজেও কোনও দৈনিক কাগজ উৎসাহী হতে পারে, ভাবতেই পারেনি কৌশিক। এতদিন পর্যন্ত ও যে লেখাগুলো লিখেছে, সেগুলো খুবই সাধারণ বিষয় নিয়ে। সরকারের দুর্নীতি অথবা পুলিশের ব্যর্থতা অথবা ভারতের লোক-নাটক, এইরকম। সম্পাদক যে রাজনীতি বিষয়ক কোনও ঘটনায় উৎসাহী হবেন, বিশেষ করে গণহত্যা, যা আমাদের দেশের রাজনীতির প্রকৃত চেহারাটাকে তুলে ধরতে পারে, ছিঁড়ে দিতে পারে তার সাজানো মুখোশকে—এই ভাবনা কৌশিকের কল্পনায়ও কখনও জায়গা পায়নি।

প্রাথমিক উত্তেজনাটা ঝরে যাওয়ার পর কৌশিকের মনে দু ধরনের ভাবনা কাজ করতে শুরু করে। সম্পাদক কেন এই বিষয়টাকে লেখার জন্য বেছে নিলেন? তার পেছনে কি বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে? এক ধরনের প্রতিবাদ কৌশিকের ভাবনায় মাথাচাড়া দেয়। পাশাপাশি অবশ্য একটা ভালোলাগাও কাজ করছিল। এই তদন্তের মাধ্যমে দেশের আসল রাজনীতির শক্তিগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরা যাবে। তা ছাড়াও রাজনীতি বাদ দিয়ে এই গণহত্যার একটা অমানবিক দিকও আছে। কৌশিক ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয় এই দ্বিতীয় লক্ষ্যের প্রতি। তখনই কৌশিক, নিজেকে প্রায় যুক্ত করে ফেলে বিষয়টার সঙ্গে। কাজটা করা সম্ভব হলে, এই অমানবিক দিকটাকেও ফুটিয়ে তোলা যাবে, এটাই ওকে বেশ উত্তেজিত করছিল। আর তখনই সম্পাদক ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন লেখাটার বিষয় ও উদ্দেশ্য।

গণহত্যাটা সঙ্ঘটিত হয় প্রায় বছর বারো আগে। সত্তর দশকের সেই উত্তাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায়। দীর্ঘ সতেরো ঘণ্টার অভিযানে শখানেক চরমপন্থী বিপ্লবী যুবককে এবং আরও কিছু সাধারণ ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিল। শোনা যায়, সমস্ত ব্যাপারটাই অর্গানাইজ করেছিল তৎকালীন শাসক পার্টির লোকেরা। পুলিশও তাদের মদত দিয়েছিল। ঘটনাটা শহরে বেশ আলোড়ন তোলে। কিন্তু মন্ত্রী-আমলা, বেশ কয়েকটা প্রতিবাদের মিছিল, বিভিন্ন পার্টির পক্ষে প্রতিবাদ, তদন্ত কমি : ইত্যাদি হই-চই এবং আড়ম্বরে, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ধামাচাপা পড়ে যায়। পরে অবশ্য কিছু মহল থেকে নতুনভাবে তদন্তের জন্য আবেদন চালানো হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনকি চরমপন্থীদের নিজস্ব টির পক্ষ থেকেও নতুনভাবে খোঁজখবর করা হয়নি।

যাই হোক, সম্পাদক বেশ প্রাঞ্জলভাবেই বলে যাচ্ছিলেন বিষয়টা। অর্থাৎ কীভাবে কাজটা করতে হবে, তার অনুপুঙ্খ। তখনও কৌশিকের মনের মধ্যে সেই ভালোলাগা উত্তেজনাটা কাজ করছিল। নিজেকে বেশ দায়িত্বসচেতন মনে হচ্ছিল। সাংবাদিকের সামনে সামাজিক প্রাণী হিসাবে দায়িত্ব পালনের কোনও সুযোগই থাকে না! শুধু নির্দেশমাফিক কাজের স্রোতে কৌশিক যেন কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল।

এতটা সময় পর্যন্ত কৌশিক বেশ সবলভাবে ভেবে এসেছে। একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতিক্রিয়া—এই ছিল ওর ভাবনার সূত্র। এখন ওর সামনে বসে সম্পাদক বলে যাচ্ছেন। কিন্তু যতই ও বেশিভাবে সম্পাদকের বক্তব্যের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, ততই বোঝা যাচ্ছিল যে ব্যাপারটা আদৌ ততটা সরল নয়। কৌশিক এতক্ষণ যেভাবে ভেবে এসেছে, সম্পাদক কিন্তু ঠিক সেইভাবে ভাবছেন না। তাঁর ভাবনায় কাগজের উদ্দেশ্য এবং তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণহত্যা—এই দুটো জিনিস মিলেমিশে আছে। এখানে দুজনের মূল লক্ষ্যের একটা তফাত আছে, যেটা কৌশিক আগে একেবারেই ভাবেনি। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিল, ওকে সম্পাদকের লক্ষ্য মতোই কাজটা করতে হবে।

এমনিতেই এক ধরনের উত্তেজনা, ভালোলাগার পাশাপাশি একটা সূক্ষ্ম প্রতিবাদ ওর মানসিকতায় ছিল। দৈনিক কাগজ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে রাজনৈতিক গণহত্যায় কেন উৎসাহী হবে? আমাদের চারপাশে ছাপানোর

মতো খবরের তো অভাব নেই। বরং একজন সাম্প্রদায়িক নেতার মৃত্যুতে তার জীবনী প্রকাশ করতে তারা অনেক বেশি উৎসাহী। প্রতিবাদটা ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত কৌশিকের ভাবনায় বোধ হয় সরলীকরণের ছায়া পড়েছিল। এই সরলীকরণটা যে ঠিক নয়, মূল লক্ষ্য ঠিক রেখে একটা বিষয়কে যে অনেকভাবে ভাবা যায়, এটা সম্ভবত কৌশিক আমল দেয়নি। সম্পাদক তখনও বলে যাচ্ছেন—'আসলে আমরা ঘটনাটার মূল সত্য পাঠককে জানাতে চাই। যদিও ব্যাপারটার মধ্যে রাজনীতি আছে, কিন্তু তুমি তাতে মনোযোগী হবে না। রাজনীতি এ ক্ষেত্রে তোমার সাবজেক্ট নয়। তোমার তদন্তের বিষয় গণহত্যা।'

যদি বা কিছু দ্বিধা ছিল, এই কথা থেকে আগের সমস্ত সবল ভাবনার গতিপথ বদলে যায়। এক ঝাঁক প্রশ্ন এলোমেলো ভঙ্গিতে ঘিরে ফেলে কৌশিককে। বিষয়টা যখন রাজনৈতিক গণহত্যা, এবং এটা স্পষ্ট বেশ কিছু চরমপন্থী যুবক এর ফলে মারা গেছে। অথচ রাজনীতিকে নিবন্ধ থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে। অর্থাৎ গণহত্যার যথার্থ কারণটা কী—এই জরুরি প্রশ্নটাই লেখায় উহ্য থেকে যাবে। সমস্ত লেখাটাই কি অসাড়, অর্থহীন হয়ে যাবে না? রাজনৈতিক সূত্রই তো এই গণহত্যার চলচ্চিত্র বা ব্যাকগ্রাউন্ড। কৌশিকের ভাবনা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। একটা অন্তঃসারশূন্য মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যও তা হলে মাধ্যম। আবার সম্পাদকের কথাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। সম্পাদক চাইছিলেন বেশ ঝানু মিডিয়াম্যানের মতো কৌশিক চট করে বুঝে নিক ব্যাপারটা। 'শোন কৌশিক—কোনওরকম সেন্সেশন্ তৈরি করা আমাদের কাগজের উদ্দেশ্য নয়। তৎকালীন সময়ের বিস্তারিত বর্ণনাও নয়। অবশ্য যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার, তাদের নামধাম, ডিটেল লেখায় থাকবে। তোমার মূল লক্ষ্য হবে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের ছবি তোলা। যে দু-একজন বেঁচে আছেন আর মৃত যুবকের বাড়ির লোকজনকে ইন্টারভিউ করবে। অর্থাৎ তারা কীভাবে বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতকে পর্যালোচনা করে, এটাই হবে আমাদের উদ্দেশ্য।'

এক্ষণে কৌশিকের সামনে অনেক কিছুই পরিষ্কার। আগের সেই সামাজিক দায়িত্ব-মানবিকতা ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি মোহগুলো আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। কৌশিক বুঝতে পারছিল একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সূত্র ধরে ও ব্যক্তির সঙ্কটকে ভাবনায় ধরতে চাইছে। আবার এটা পরিষ্কার যে, বর্তমানের সময়ের চাপ এত তীব্র, সামান্য মানবিকতা দিয়ে তাকে বোঝা যাবে না। সমস্যাটা আসলে সামাজিক এবং এই বৃহত্তর পটভূমিকাকে অস্বীকার করে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। অথচ এখানে ওর কী করার আছে? একটা নতুন বোধ কৌশিকের মধ্যে জন্ম নেয়। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, কেন সম্পাদক লেখাটা ছাপাতে উৎসাহী হয়েছেন। সম্পাদকের কথা শুনতে শুনতেই মনে হল, তবে কি পুরোটাই সাজানো? ও সব তদন্ত-টদন্ত ব্যাপারগুলো আসলে আবরণ। মূল কথা হচ্ছে ঘটনাকে মূলধন করে মানুষের উত্তেজনাকে চাগিয়ে তোলা। মুখে অস্বীকার করে আসলে এক ধরনের ভ্রান্ত সেন্সেশন তৈরি করা। না হলে রাজনীতিকে বাদ দিতে হবে কেন? আর লেখাটাকে সম্পাদকের নির্দেশমতো, এই উত্তেজনা বৃদ্ধির কাজের উপযুক্ত হতে হবে। কিন্তু এই উত্তেজনা চাগিয়ে তোলার কারণ কী? কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে লিখলে কাগজের গণতান্ত্রিক ইমেজটা বজায় থাকবে? নাকি উত্তেজনার জন্য কাগজ বেশি করে জনপ্রিয় হবে আর তার ফলে ব্যবসায় উন্নতি হবে?

সম্পাদক হয়তো কৌশিকের মুখচোখের বদল লক্ষ করছিলেন। তিনি হয়তো ভেবে নিলেন কৌশিক নতুন কাজটা নিয়ে খুব ভাবছে। তার মনে হল, এ ক্ষেত্রে কৌশিককে বোধ হয় উৎসাহ দেওয়ার দরকার আছে। 'কৌশিক—এই কাজটা তুমি পারবে। অনেকদিন ধরেই আমি কাজটা ভাবছিলাম। কিন্তু ভালো ছেলে পাচ্ছিলাম না। তবে তোমার বিষয়টা লক্ষ রাখবে। এখন তারা বারো বছর আগের ঘটনাকে কী চোখে দেখেন, খালি এটাই তোমার বিষয়। ধরো, তুমি কোনও বাড়িতে গেছ। বাড়ির বৃদ্ধা তোমাকে অ্যালবাম খুলে একটা ছবি দেখালেন। একজন যুবকের সাধারণ পাসপোর্ট ফটোগ্রাফ, চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল। যুবক ওই বৃদ্ধার ছেলে, গণহত্যায় মারা যায়। ছবিটা লক্ষ করতে করতে হঠাৎ তুমি দেখতে পেলে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা আঁচলে চোখ মুছছেন। এই—এই যে মারাত্মক দৃশ্য, তার যে যন্ত্রণা, এটাই তুমি লেখায় ফুটিয়ে তুলবে। তাদের গোপন ব্যথাকে ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরবে।'

শুনতে শুনতে কৌশিক বেশ সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। কিছু অসংলগ্নও বটে। এখন, এই মুহূর্তে সম্পাদক, তার অফিস-ঘর থেকে বেশ খানিকটা ছিটকে গিয়েছিল। সম্পাদকের কথাগুলো যেন ওকে সম্মোহন করেছে। কৌশিকের সময় লাগে নিজেকে পরিবেশে সংলগ্ন করতে। ততক্ষণে সম্পাদক ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ কথা শেষ। এবার উঠতে হবে। দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসার সময়ও সম্মোহিত ভাবটা পুরোটা কাটেনি। বেশ একটা হৃদয়-বিদারক দৃশ্য ফেঁদেছেন সম্পাদক। এক ধরনের সস্তা রোমান্টিক অনুভূতি। প্রথমদিকের সেই উত্তেজনাটাও এখন নেই। বদলে শরীর বেশ অবশ লাগছে। কেমন একটা অবসাদ, জমাট ক্লান্তি। একবার বমি করার কথাও ভাবে। আসলে কৌশিক, ঘটনার ভেতর যে ঘটনা থাকে, এখানে তা অনেকটা বুঝতে পারছিল। সম্পাদক যেন ওকে বন্দী করে ফেলেছেন। কোনও দিকেই নড়ার উপায় নেই। বন্দী সময়ের কাছে। কিছু নতুন অনুভূতি ওর চেতনার কাগুজে সাদা পৃষ্ঠার ধ্যানকে মুহূর্তে ছিঁড়ে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশে। ওর হাতে কোনও অস্ত্র নেই। তবু ওকে এই অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। ক্রমশ এই পরিবেশ ধীরে ধীরে গ্রাস করছে কৌশিককে।

এমনিতে ও যে আদর্শগতভাবে চরমপন্থী বিপ্লবীদের সমর্থন করে, তাও নয়। তবে এই আদর্শের প্রতি ওর মানসিক ঝোঁক আছে। প্রচুর তাজা প্রাণ ঝরেছে। হয়তো অনেকটাই বিপ্লবী উন্মাদনা। তবু তারা এই কুৎসিত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, এটাই কৌশিককে খুব বেশি নাড়া দেয়। তা ছাড়া, কিছু ছেলে, তারা বর্তমান প্রথাকে মানছে না বলেই যে জঞ্জালের মতো গণ-খুনের সাহায্যে তাদের সরিয়ে দিতে হবে, এটা নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই ব্যাপারটা তো আমাদের রাজনীতির গণতান্ত্রিক ধোঁকাবাজিটাই স্পষ্ট করে। এই অন্যায়টা মানতে পারেনি বলেই, কৌশিক প্রথমে কাজটায় উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন তো বেশ বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তির এখানে কোনও ভূমিকাই নেই। কাগজ কর্তৃপক্ষ যা বলবেন, যেভাবে লিখতে বলবেন, ঠিক সেভাবেই তাঁদের হুকুম পালন করতে হবে। তারা মানুষকে রসগোল্লা খাওয়ানোর ভঙ্গিতে গণহত্যার কাহিনী পরিবেশন করবেন, আর একজন ব্যক্তি তাদের মর্জি মতো তথ্য জোগান দেবে। কৌশিকের হঠাৎ মনে পড়ল, সম্পাদক 'সত্য'কে খোঁজার কথা বলেছিলেন। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা গুলিয়ে ওঠে। এই বিংশ শতাব্দীর শেষে সত্যের চেয়ে বড়ো অসত্য আর কী-ই বা আছে? ইদানীং তো যুদ্ধের সপক্ষেও সত্যের যুক্তি দেখানো হচ্ছে। সত্য এখন মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এইসব ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অন্যায়কে মোকাবিলা করার মতো সমষ্টিগত কোনও মাধ্যম কি আছে? ঠিক এই মুহূর্তে, সমষ্টিগত আন্দোলনের কথা ভাবা কি অর্থহীন, অলীক কল্পনা নয়? আবার ব্যক্তি হিসেবে একজনের কী করার আছে? ওই মিষ্টি মিষ্টি চোখের জলের আবেগসর্বস্ব গল্প ফাঁদতে হবে। সম্পাদকের এই বৃদ্ধার উদাহরণ থেকেই, কাজটা সম্পর্কে কৌশিকের যে বিপ্লবী মোহ ছিল, অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করছি, সেটা অনেকটা কেটে গেছে। অবশ্য এই মোহটা পরে বোঝা গেছে। কৌশিক প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে একটা সচেতন কাজ করতে চলেছে। এখন এই সচেতনতাটা কী হাস্যকর মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, অনেক ছেলে মরেছে ঠিকই। কিন্তু বৃদ্ধা তার ছেলের জন্য কাঁদছেন, তাকে কেন লেখার বিষয় করা হবে? কৌশিকের এই দৃষ্টিভঙ্গি বড়ো আশ্চর্য মনে হয়। বরং শ খানেক যুবককে খুন করা হয়েছে— এই ভয়ানক সত্যের মধ্যে কোথাও কান্নার বুদ্‌বুদ নেই, অন্তত কৌশিকের তাই মনে হয়। আসলে কতজন মারা গেছে এবং কীভাবে, হঠাৎ খুব নির্মোহ ভঙ্গিতে মানুষকে জানানো যায়। যাতে পাঠক তার রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আরও সচেতন হতে পারেন। যেন বুঝতে পারেন, যে কোনওদিন ওই একশজনের তালিকায় তার নামও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অথচ বৃদ্ধার কান্না ছেলের ছবি—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা বেশ জলজ্ব এবং রসালো গপ্পো হয়ে উঠেছে। কৌশিকের বছর তিনেকের মিডিয়া-জগতের অভিজ্ঞতায় এটা বোঝা যায়— প্রকৃতপক্ষে, হাজার হাজার মানুষকে ভাবাবেগে আপ্লুত করার জন্যই ওই বৃদ্ধার চোখের জলকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বৃদ্ধা বা তার ছেলের মৃত্যুকে সমবেদনা জানানোর জন্য নয়।

এ সব ভাবনা সত্ত্বেও, কৌশিক কিন্তু নিজের বন্দিত্বকে অস্বীকার করতে পারছে না। ওর নিজের কিছুই করার নেই। সাংবাদিকতাকে যখন পেশা হিসেবে নিয়েছে, তখন দুম করে কাজটা ছেড়ে দেওয়া ওর পক্ষে

সম্ভব নয়। আবার সম্পাদকের নির্দেশমতো কাজ করার অর্থই হল গলায় শেকল আটকানো। এই বদ্ধ অবস্থা ওর জীবনে প্রথম। এমন কোনও মানুষ কি আছে, যে বলে দিতে পারে এখন কৌশিক কী করবে? হয়তো চটজলদি একটা উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা খুবই হালকা হবে। সমস্যাটা আপাতদৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির মনে হলেও, আসলে তার বীজ আমাদের সামাজিক বুনিয়াদে। এতদিন কৌশিক যে ধরনের কাজ করেছে, সেগুলো ওকে তেমন পরীক্ষায় ফেলেনি। এখন কৌশিক যেন দুটো বিপরীত শিবিরের কেন্দ্রে—এ ক্ষেত্রে একপক্ষকে নির্বাচন করতেই হবে।

কৌশিক প্রথমে ভেবেছিল, কাজটা করবে না। সম্পাদককে অনুরোধ করবে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। কেননা কাজটার আগু-পিছু জেনে ফেলার পর, ওর পক্ষে নিজেকে এখানে জড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু এরপরেই কৌশিক অনুভব করে, এই সিদ্ধান্তের ফলে ওর চেতনায় বিশ্বাসের জমি ক্রমশ ফাটল ধরতে শুরু করেছে। তা হলে কি ও দায়িত্বটা এড়িয়ে যাচ্ছে? অথবা প্রথাসিদ্ধ সাংবাদিকের মতো মন্ত্রীর ফিতে কাটার সংবাদ ছাপিয়ে বিখ্যাত হতে চাইছে? না—ও বুঝতে পারে এখনও ততটা ঝানু হতে পারেনি। এখনও ওকে নিজের অন্তর্লীন সত্তার মুখোমুখি হতে হয়। সেটা এখনও নষ্ট হয়নি। তবে কতদিন টিকিয়ে রাখা যাবে, সেটাই সন্দেহ, এ দেশে যখন ঝানু হওয়াটাই বুদ্ধিমানের পরিচয়।

এ ছাড়া অন্য একটা অনুভূতিও ধাক্কা মারে কৌশিককে। এখনও পর্যন্ত ঘটে যাওয়া যাবতীয় ঘটনা ওর রক্তস্রোতে এক অজানা উন্মাদনার দোলা দেয়। কৌশিক যেন ক্রমশ জেনে যায় গোপন কোনও যুদ্ধের হদিস। আসলে এই তদন্ত একটা ব্যক্তিগত যুদ্ধই, কৌশিক বুঝতে পারে। যুদ্ধটা দ্বিপাক্ষিক। একদিকে নিজের বিরুদ্ধে। কেন কৌশিক কাজটা করতে রাজি হবে না? ও কি দায়িত্ব পালন করতে ভয় পাচ্ছে? সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের ভূমিকাকে অস্বীকার করছে? তবে তো এক ধরনের নৈতিক মৃত্যুই ঘটেছে, বলতে হবে। অন্যদিকে এই ধরনের গণহত্যার খবর প্রকাশের জন্য অন্য কোনও কাগজই রাজি হবে না। এটা কৌশিক ভালোভাবেই জানে, কী দায় পড়েছে তাদের? রাজনৈতিক নেতা অথবা সিনেমা স্টারদের নাচন-কোঁদনের খবর ছাপিয়েই তো বেশ চলে যাচ্ছে। এ যেন পরস্পরের পিঠ চুলকুনির খেলা। তাই এখানে সম্পাদক যখন একবার রাজি হয়েছেন (অন্য অনেক সুস্বাদু খবর চারপাশে থাকতেও, হঠাৎ কেন এই বিশেষ ঘটনার উপর জোর দেওয়া হল, সেটা অবশ্য এখন স্পষ্ট), তখন এই কাগজকেই তো ব্যবহার করা যায়। অন্তত চেষ্টা করা যায়। যখন ছাপানোর মতো কোনও কাগজ নেই (এমনকি বিপ্লবী পার্টিরও) তখন ব্যবসায়ী কাগজে এই ঘটনা লিখব না, এ কথা বলা অর্থহীন। হাজার হাজার মানুষ ব্যবসায়ী কাগজই পড়েন, ছোটোখাটো দু-চারটে সৎ-রাজনৈতিক কাগজ পড়ার সুযোগ তাদের হয় না, এই অবস্থায় তাদের জানানোর জন্য ব্যবসায়ী কাগজকে কি ব্যবহার করা অসম্ভব? কৌশিকের মনে হয়, খুব অল্প পরিমাণে হলেও এটা সম্ভব। আর এটা ভেবেই কৌশিক একটা যুদ্ধের গন্ধ পায়। যদিও এটা জানা আছে ও খুবই দুর্বল; অন্যদিকে শক্তিশালী সংগঠন—তবুও কৌশিক এই যুদ্ধঘোষণার ইঙ্গিতকেই স্বাগত জানায়। এটা কি কমল মজুমদারের ভাষায় "মজ্জাগত মনুষ্যত্বের" জয়? হতেও পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কৌশিকের পক্ষে অন্য কিছু ভাবা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলার পরই, কৌশিক মোটামুটিভাবে একটা কর্মপদ্ধতির খসড়া তৈরি করে । অর্থাৎ কীভাবে তদন্তের কাজে এগোবে। প্রাথমিকভাবে একটা লক্ষ্য সবসময় ছিল, যা ও চিন্তা মারফত আবিষ্কার করেছে। ব্যক্তিগত ছাড়াও এই কাজটার একটা সমষ্টিগত চেহারা আছে। আবার ব্যক্তির ভূমিকাও এখানে কম নয়। তাই ভেবেছিল যে, এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গিই ওর নিবন্ধে থাকবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সমষ্টিগত বোধ—দুটো ভাবনার মিলিত ফসলেই পর্যবেক্ষণকে তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী করা যাবে। কৌশিক ভেবেছিল দুভাবে তদন্তের কাজ শুরু করবে। প্রথমে সরকারি অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক পথ। থানা-পুলিশ, পুরোনো ডায়েরি ইত্যাদির সাহায্যে মৃতদের নামধাম জোগাড় করা যাবে। অন্যদিকে সরাসরি যোগাযোগ করবে মৃত যুবকদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। যাতে হত্যাকাণ্ডের দিনের যথার্থ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া বর্তমানে চরমপন্থীদের কিছু সদস্য এ দিক-ও দিকে ছড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গেও, সম্ভব হলে যোগাযোগ করা যাবে।

মোটামুটিভাবে কাজের একটা ছক তৈরি হওয়ার পরেও, কতকগুলো প্রতিকূল চিন্তা কৌশিকের মাথায় রয়ে গেল। আদৌ কাজটা করা যাবে কি না—এরকম একটা ক্ষীণ সন্দেহ প্রথম থেকেই ছিল। অর্থাৎ যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও, লোকজন কোনও সাহায্য করবে কি না। হয়তো অন্যক্ষেত্রে ভাবনাটা আসত না। কিন্তু এই গণহত্যার সঙ্গে রাজনীতির একটা গভীর যোগাযোগ আছে। একটু তলিয়ে ভাবলেই এটা দেখা যায়। আর রাজনীতি মানেই তো মানুষের কাছে আতঙ্কের বস্তু। আমাদের দেশে রাজনীতি বললেই ছুরি, পিস্তল, পাঞ্জাবির পকেটে বোমা আর ব্যবসাদারের জিপে কিছু মাস্তানের আনাগোনা। এ সবই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলেই এই অবস্থাকে এড়াতে চায়। রাজনীতির আলোচনা, এমনকি বইপত্তর পর্যন্ত বাড়িতে রাখতে সাহসী হয় না অনেকে। এটাই কৌশিকের অভিজ্ঞতা। আর যে গণহত্যার পেছনে পুলিশের প্রত্যক্ষ মদত ছিল, সেই পুলিশই কি কৌশিককে তদন্তের জন্য সাহায্য করবে? এ সব চিন্তার ফলেই কৌশিক সন্দেহটাকে কখনই মুছে ফেলতে পারেনি।

শেষপর্যন্ত কিন্তু কাজটা কৌশিকের পক্ষে করে ফেলা সম্ভব হয়নি। যেহেতু কৌশিক তথা এই গল্পের নায়কের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পাঠকের এক ধরনের সংযোগ বা একাত্মতা ঘটে গেছে, এই সত্যকে স্বীকার করেই কৌশিকের তদন্তকার্য তথা এই গল্পের পরিণতিকে বেশ কিছু আগেই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। কারণ লেখকের মতে, এই ঘটনার পরিণতি কী হতে পারে, এটা অপেক্ষা কীভাবে কৌশিক সেই পরিণতিতে পৌঁছয়, এই তথ্য অনেক বেশি জরুরি। যাবতীয় ঘটনা, যা এখনও পর্যন্ত ঘটমান, কৌশিকের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে এক নিটোল অনুভূতির জন্মদাতা। এবং এই অনুভূতি, প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ ঘোষণার অনুভূতি। ঘোর অন্ধকারকে সঙ্গী করে কৌশিক অন্তত একবার হলেও সময়ের চাপকে মেনে নেয়নি। হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়ার আগে সে একবার অন্তত প্রতিবাদ করেছিল। আমরা তাই এই অসম যুদ্ধের প্রতিনিধি হিসেবে কৌশিককে মনে করি। এই যুদ্ধ থেকে কৌশিক যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে এবং যে প্রক্রিয়ায় করবে, আমরা সকলে এই যুদ্ধ-পরবর্তী অভিজ্ঞতাই গ্রহণ করতে পারি। হতে পারে কৌশিক ব্যর্থ, কিন্তু কিছু কিছু ব্যর্থতা তো জয়কেও ছাপিয়ে যায়। শারীরিকভাবে হয়তো সে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু কৌশিকের অভিজ্ঞতা আমাদের চেতনাকে দ্বিগুণ সমৃদ্ধ করে। এক ভয়ঙ্কর সংযোগহীনতার দিকে আমরা ছুটে চলেছি, ধ্বংস এবং বমনের গহ্বরে, আমরা পড়ছি, ক্রমশ খাদের দিকে। ঠিক এখন আমরা গহ্বরের কোন বিন্দুতে, কৌশিকের অভিজ্ঞতা এই অবস্থানকে জানতে সাহায্য করে।

এই ব্যর্থতার কারণ খুব ধীর প্রক্রিয়ায় কৌশিকের মানসিকতায় জন্মলাভ করে। আমরা এই জরুরি কারণের সন্ধানে কৌশিকের তদন্ত-অভিযানে সঙ্গী। গল্পের বর্তমানে কৌশিক দ্বিধা এবং সন্দেহের শিকার। এই দ্বিধা ক্রমশ বদলে যায় ব্যর্থতায়। কিন্তু এই পরিণতিই তদন্তের শেষ কথা নয়। ঘটনার প্রথম থেকে কৌশিকের চেতনায় অনেক নতুন বোধের জন্ম হয়েছে। এই অর্জিত অভিজ্ঞতাই বা কম কী? কিন্তু কীভাবে কৌশিক এই ব্যর্থ পরিণতিতে উপস্থিত হয়, এই ঘটনাকেই এখন আমরা অনুসরণ করতে পারি।

যে দুভাবে কৌশিক তদন্ত চালাবে ঠিক করেছিল, দুটো পথই সম্পূর্ণ বিপরীত। পুলিশ এবং হত্যাকাণ্ডের নিহত পরিবারের লোকজন—স্বীকৃত ও সরকারি তথ্য এবং এই তথ্যের বাইরে মানুষের আড়ালে রয়ে যাওয়া কিছু গোপন সূত্র—এই দুয়ের যোগাযোগে কোনও একটা জমি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই তদন্তের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষ কৌশিকের যোগ নিয়ে বিশেষ কিছুই ভাবেনি। বা বলা যায় এই ব্যাপারটা কখনওই বিশেষ নজরে পড়েনি। বরং এর উলটোটাই ঘটেছে। কৌশিক ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টার সঙ্গে গভীর একাত্মতায় মগ্ন হয়েছে। এই একাত্মতা সম্ভব হয়েছে, হয়তো বা, এক ধরনের জেদের জন্য। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল, এই অসমান সঙ্ঘাতে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রশ্নটাই একসময় খুব বড়ো হয়ে দেখা দিল। প্রায় এটাই মানুষজনের চোখেমুখে সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসাচিহ্ন তৈরি করে, যেন কৌশিক কোনও বিশেষ অভিসন্ধি নিয়ে এই কাজটা করতে এসেছে। অন্য কাজের সময় এই প্রশ্নটা উঠত না। কিন্তু এখানে যেহেতু দুটো বিপরীত আদর্শের রাজনৈতিক দল রয়েছে, তাই কৌশিক কোনও নির্দিষ্ট দলের (এ ক্ষেত্রে চরমপন্থীদের) সমর্থক, এটাই ভেবে নেওয়া

স্বাভাবিক। ঠিক এই ভুলটাই হচ্ছে। আর এই ভুলের জমিতেই তৈরি হয়ে যায় বিশ্বাসহীনতার বীজ। যে কৌশিক ভীষণ আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে মৃত যুবকদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করে, তারাই কৌশিককে অবিশ্বাস করে। এর কারণ হিসেবে কৌশিক খুঁজে পায় এক আগ্রাসী নিরাপত্তাহীনতা। কিন্তু এটাই কি একমাত্র কারণ? সামাজিক বিষয় নিয়ে দুজন মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানের কোনও পথ কি এখানে খোলা আছে? কৌশিকের মনে হয়, একটি বিশেষ নাটকের শেষ দৃশ্য—একজন পোশাক পবার কথা বললে, অন্যজন খুলে ফেলার কথা ভাবে। দুজনে মিলে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও, তারা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে, কৌশিকের ঝুলিতে এমন প্রমাণও নেই, যার সাহায্যে এই বিশ্বাসহীনতাকে ভুল বলা চলে।

চরমপন্থীদের আন্দোলনও একটা স্তরের পর সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়। এই পরাজয় তাদের মধ্যে জন্ম দেয় মারাত্মক অভিমানের। মানুষ কেন এই আন্দোলনে সর্বতো চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েনি, এটাই তাদের অভিমান। এই অভিমান কৌশিকের তদন্তে শূন্যতা তৈরি করে। এইভাবে গণহত্যা এবং তার অন্তর্গত মানুষজনের সঙ্গে কৌশিকেব দূরত্ব প্রায় কোনও কাহিনীর আদল পেয়ে যায়, যেন বৃত্তের কেন্দ্রে কৌশিক।

কৌশিক প্রথমেই যে থানায় গণহত্যাব নথিপত্র, ডায়েরি জমা ছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আগেই অবশ্য একদিন গিয়ে প্রাথমিক আলাপটা করে আসে। থানাব ভারপ্রাপ্ত অফিসার ওকে বেশ খাতির-যত্ন করে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। একেবারেই অপুলিশ চেহারা। কিন্তু প্রথমদিন ভদ্রলোকের হাতে বিশেষ সময় ছিল না। তিনি মোটামুটি কৌশিকের পরিচয় এবং আসার কারণটা শুনে নেন। একটু হেসে বলেন—'দেখুন, এ ব্যাপারে পুলিশের আপনাকে সাহায্য করা কর্তব্য। তবে আমি ঠিক জানি না যে, আমাদের রেকর্ডে এই গণহত্যার কোনও রিপোর্ট আছে কি না। আপনি বরং অন্য আর এক দিন আসুন। আমি সব দেখেশুনে রাখব।'

অফিসারের সঙ্গে কথা বলে কৌশিক মোটামুটি আশ্বস্ত হয়। যদিও এখনই বোঝা যাচ্ছে না যে, পুলিশ ওকে ঠিক কতখানি সাহায্য করবে, তবু ভদ্রলোকের কথায় কিছুটা আশা করা যায়। কৌশিক প্রায় ভেবেই ফেলেছিল পুলিশ ওকে একেবারেই সাহায্য করবে না। যাই হোক, দ্বিতীয় দিন কৌশিক গিয়ে প্রথমেই দেখা করে সেই অফিসারেব সঙ্গে। ঘরে তিনি এবং অন্য একজন অচেনা ভদ্রলোক বসে আছেন। প্রথমেই কৌশিক একটু অবাক হয়। অফিসার একবার দেখেই ওকে চিনতে পারেন না। কৌশিক নিজেব পরিচয় দিতেই তিনি যেন কিছুটা লজ্জিত হলেন—'দেখুন তো কী ব্যাপার, আপনাকে আসতে বলেছি, অথচ নিজেই ভুলে বসে আছি। হ্যাঁ, বলুন— আর একটা কথা, আপনি ঠিক কোন কাবণে আমাব কাছে এসেছেন, সেটা যদি আর একবার বলেন। বুঝতেই তো পাবছেন—পাঁচবকম কাজে ব্যস্ত থাকি—'

কৌশিক বেশ খানিকটা অবাক হয়। ভদ্রলোক তো ওর সঙ্গে বেশ ভালোই ব্যবহার করছেন। প্রথম থেকেই একটা আন্তরিকতার সুর অফিসারেব কথায়। আসলে পুলিশের কাছে খুব বেশি সহযোগিতা পাবে না, এটা কৌশিক আগেই ভেবে নেয়। তার ফলেই বর্তমানের সঙ্গে ওর আগের ধারণাকে মেলাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তবু নিজেকে স্থির রাখে কৌশিক এবং বেশ আস্তে আস্তে, গুছিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে আবার বিষয়টা অফিসাবকে বলে।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য পুলিশ কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারে? এই আধঘণ্টা কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কৌশিকের মানসিকতায় নানাবকম কৌতূহলের আনাগোনা চলছিল। সমস্ত পবিবেশটাই যেন জমাট বেঁধে আছে। কৌশিক ওর যাবতীয় প্রশ্নকে অন্য পক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে, কিন্তু অন্য পক্ষের নীরবতা যেন পরিবেশের অনুপুঙ্খ সৌন্দর্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। কৌশিকের কথা বলার সময় অফিসার প্রায় কোনও কথাই বলেননি। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন ছাড়া। আর সময়ে সময়ে মুখচোখের শান্ত চেহারাটার বদল হচ্ছিল। কৌশিক ঠিক বুঝতে পারছে না, অফিসার কীভাবে ওর কথার উত্তর দেবেন। ও চুপচাপ মাথাটা অল্প নিচু করে বসে থাকে। একটু হাসি হাসি মুখে অফিসার বলতে শুরু করেন—'আপনি আমার কাছে ঠিক কী ধরনের সাহায্য চান?' একটু ভেবে কৌশিক বলে—'গণহত্যায় কারা কারা মারা গেছে, তাদের

নাম-ধামের রেকর্ড নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে। অর্থাৎ সে দিন ঠিক কতজনকে মারা হয়েছিল, তার একটা রিপোর্ট কি পাওয়া সম্ভব হবে?'

এতক্ষণ কৌশিক ঠিক লক্ষ করেনি। অফিসারের পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি একটা ছোটো খাতায় কীসব লিখছিলেন। কৌশিক ভালোভাবে খেয়াল করেনি। আসলে ভদ্রলোককে খুব গুরুত্বপূর্ণই মনে হয়নি। এখন হঠাৎ মনে হয়, ভদ্রলোক কি ওদের কথাবার্তা লিখে নিচ্ছেন? কিন্তু তার কারণ কী? তবে কি ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে? কিন্তু বিনা কারণে ওকে সন্দেহই বা করা হবে কেন? আবার অফিসার ওব সঙ্গে যেভাবে কথা বলছে, তাতে তো তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকেব দিকে নজব পড়ল, কারণ ভদ্রলোক খাতা রেখে একদৃষ্টে কৌশিককে লক্ষ করছেন। ওঁর হাতে একটা জমকালো সিগারেটেব প্যাকেট। এতই সুন্দর দেখতে প্যাকেটটা যে, কৌশিকের চোখ বারবারই ও দিকে চলে যাচ্ছে। ততক্ষণে অফিসার কথা শুরু করেছেন—'দেখুন, সে দিন যারা মারা যায় এবং পুলিশ যাদের খোঁজ পায়, এমন কয়েকজনেব নাম আমি আপনাকে দিতে পারি। সেটা আমি আপনার জন্যই আমাদের রেকর্ডরুমেব ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বলে দিয়েছি। আপনি কয়েকদিন পরেই সেটা পেয়ে যাবেন। তবে এই নামগুলো আমরা খবরের কাগজে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাব আগে, এখন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন কবার আছে।'

কৌশিক আবাব বেশ আশান্বিত হয। এখনও অবধি মনে হচ্ছে পুলিশ ওকে খানিকটা সাহায্য করতে পাবে। অবশ্য পুবোনো কাগজ থেকে কয়েকটা নাম পাওয়া গেছে। ওই নামগুলো যদি তার বইরে হয, তবেই অনেকটা লাভ। ইতিমধ্যে কৌশিক লক্ষ কবে যে, ঘবের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘটনা শুরু হয়েছে। সমস্ত ঘরটা নিঃস্তব্ধ। এবই মাঝে অফিসারের পাশের ভদ্রলোকের হাতে নতুন একটা সিগারেটেব প্যাকেট কৌশিক দেখতে পায। একই বকম জমকালো। ভদ্রলোক সেটা দু হাতের মধ্যে রেখে ঘোবাচ্ছেন। ফলে প্যাকেটটার চারপাশে একটা রঙিন বর্ণচ্ছটার বৃত্ত তৈবি হয়েছে। অফিসাব এবং সেই ভদ্রলোক একদৃষ্টে চেয়ে আছেন প্যাকেটটাব দিকে। এমনকি অফিসাব কথাও বলছেন ওই দিকে তাকিয়ে। ফলে না চাইলেও বারবার কৌশিকের চোখ চলে যায প্যাকেটটাব দিকে। একটা সম্মোহনী শক্তি যেন ওকে বাধ্য করে প্যাকেটটা দেখতে। কৌশিকও একপলকে তাকিযে থাকে জাদু প্যাকেটটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কৌশিক অনুভব করে ও ক্রমশ হারিযে যাচ্ছে। তলিযে যাচ্ছে কোনও অতল সমুদ্রে। যে প্রচণ্ড সতর্ক মেজাজ নিয়ে ও অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সেটা ক্রমশ ছিঁড়ে জট পাকিযে যাচ্ছে। জমকালো প্যাকেটটা ওর মনঃসংযোগে ধাক্কা মাবে এবং কৌশিক যেন টলতে শুরু করে। সম্ভব প্যাকেটটা ওকে গ্রাস করবে, ওইদিকে তাকিযেই ও সম্মোহিত বোগীব মতো অফিসারের প্রশ্নেব উত্তব দেবে। পুলিশেব যাবতীয কথা মেনে নেবে। হয়তো ওব কাছ থেকে গোপন কোনও অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করা হবে। খুবই নিরীহ একটা সিগারেটের প্যাকেট' কিন্তু এখন সেটা যেন মানুষেব থেকেও শক্তিশালী। হঠাৎ কৌশিকের মনে হয়, এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবেই ওব মনোযোগ নষ্ট করাব জন্য ব্যবহাব করা হচ্ছে? এটা ভেবেই কৌশিক নড়ে-চড়ে সতর্ক হয়ে বসে। যদি এটা ফাঁদ হয, তবে কোনওভাবেই ধরাপড়া চলবে না। জোর করে ও অন্যদিকে মুখ ঘুরিযে থাকে। এরমধ্যেই ঘবেব যে সহজ আবহাওয়াটা ছিল, সেটা প্রায নষ্ট হযে গেছে। একটা জমাট বাতাবরণ তৈরি হযে যায দুপক্ষেব মাঝখানে। অফিসার ভদ্রলোকেবও মুখচোখের খানিকটা বদল হয়েছে। একটা পুলিশি কাঠিন্য এবং সন্দেহেব বিষ চোখে তিনি বলতে থাকেন 'এই ঘটনার তদন্তে আপনার বা কাগজের কী লাভ হবে? যা হয়ে গেছে, সেই অতীতকে খুঁচিয়ে দেখার কোনও অর্থ হয় কি?' কৌশিক বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ে। ভাবনাগুলো সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ভদ্রলোক কথা শুরুই কবেছেন সম্পূর্ণ অন্য স্তব থেকে। ঘটনাটার সঙ্গে কৌশিকেব লাভ-ক্ষতি মিশিয়ে পুরো চেহারাটাই অনাবকম হযে যাচ্ছে। অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্য কৌশিক আবার ওর উদ্দেশ্যটা খুলে বলে—গণহত্যাটা নিশ্চয়ই একটা মারাত্মক অন্যায। এবং একজন সামাজিক প্রাণীর দায়িত্ব হিসাবে ও ঘটনাটার অনুপুঙ্খ মানুষকে জানাতে চায। এর মধ্যে কৌশিকের নিজের কোনও স্বার্থ জড়িয়ে নেই।

অফিসার কিছুক্ষণ সময় নিয়ে, অপরাধীকে জেরা করার চোখে জরিপ করলেন কৌশিককে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এতক্ষণে কথাবার্তার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেছে। ঘরে একটা নিঃস্তব্ধতা। শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা

কৌশিক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। অফিসার বোধ হয় ওকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যই চুপ করে আছেন। কিন্তু তাই বা হবে কেন? ওকে কী সন্দেহ করা হচ্ছে? কোনও শব্দ না থাকায়, এক ধরনের শূন্যতা ক্রমে অধিকার করে ফেলে কৌশিককে। তবু শেষ অবধি শোনা যাক—এই ভঙ্গিতে সতর্কভাবে শুনে যেতে থাকে। আর তখনই ওর কানে আসে অব্যর্থ সেই প্রশ্নটা, যেটা ও প্রথমদিন থেকেই আশা করেছিল—'আপনি কি চরমপন্থী রাজনীতির সদস্য? না হলে এ ব্যাপারে আপনার এত উৎসাহ কেন?' একটু সময়ের মধ্যেই কৌশিক নিশ্চিত হয়, এই প্রশ্নটার মুখোমুখি হতেই হবে। সত্যিই তো! এত কাজ থাকতে হঠাৎ গণহত্যা নিয়েই বা ও উৎসাহী কেন? কৌশিক বেশ বুঝতে পারে, একটা জাল ওর উপর বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জালটা ওকে ক্রমশ পাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচে। একটা অস্ফুট শব্দ আলোড়িত হয়। কৌশিক শুনতে পায় ও বলছে—'না, আমি কোনও বিশেষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই।'

পরমুহূর্তেই কৌশিকের মনে আবার সেই সন্দেহটা শুরু হয়। পুলিশ ওকে আদৌ কোনও সাহায্য করবে তো? তবে এখনই অন্য একটা বিষয়ও মনে উঁকি দিচ্ছে। কোনও সাহায্য না করলেও, পুলিশকে দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু কোনওভাবেই পুলিশের ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না। কেন জানি না, মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, একটা ফাঁদ ওর জন্য সাজানো হয়েছে। তবে এখনও সরাসরি কোনও প্রমাণ কৌশিকের হাতে নেই।

ইতিমধ্যে অফিসার চেয়ার থেকে উঠে সামনের আলমারি খুলে একটা ফাইল এনে টেবিলের উপর রাখলেন। কৌশিক কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না। বেশ অবাক লাগে। ওদের কথাবার্তা তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পরে যে কোনও দিন এসে গণহত্যায় মৃত ব্যক্তিদের নামধামগুলো জেনে গেলেই হবে।

অফিসারের পাশে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি এখনও পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি। এই প্রথম তিনি মুখ খুললেন—'আপনি নিজেই একটু আগে বললেন, আপনি কোনও বিশেষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। কিন্তু আমাদের কাছে অন্য খবর আছে। এই দেখুন', বলেই অফিসারের হাত থেকে নিয়ে একটা কাগজ কৌশিকের চোখের উপর মেলে ধরলেন। কাগজটা একঝলক দেখেই কৌশিক যেন পাথর হতে শুরু করে। ছাত্রজীবনেও কিছুদিনের জন্য চরমপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কোনও বিশেষ কারণে নয়, কলেজের মধ্যে এদেরই সবচেয়ে ইতিবাচক এবং শক্তিশালী মনে হত। মনে হত, এরাই যথার্থভাবে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারে। এইসব সাতপাঁচ ভেবেই ও চরমপন্থী দলের মেম্বারশিপ নেয়। ভদ্রলোকের হাতে ধরা কাগজটা দেখেই কৌশিক চিনতে পারে। চরমপন্থী দলের সদস্য হওয়ার সময় ওকে যে ফর্মে সই করতে হয়, অর্থাৎ এটাই কৌশিকের মেম্বারশিপ ফর্ম বা সদস্যপত্র। কয়েক মুহূর্ত লাগে ব্যাপারটা বুঝে নিতে। তখনই অফিসারের গলা শোনা যায়—'ব্যাপারটা কি আপনি এখনও অস্বীকার করতে চান? কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন—আমাদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ আছে। সুতরাং মিথ্যে কথা বলে নিজের অতীতকে ঢাকার চেষ্টা করবেন না।'

কৌশিকের ইচ্ছে করে দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে যেতে। কিন্তু, একটা আশ্চর্য শক্তি ওকে ক্রমশ স্থবির, জড়পদার্থে পরিণত করে। বছর সাতেক আগের সদস্যপত্র এখানে আসে কী করে? ওর মনে আছে, পার্টির সদস্য করা হত খুবই গোপনে। ফর্ম বাইরে নিয়ে আসার অনুমতি ছিল না। কলেজের বাইরে পার্টির যারা উঁচুপদে ছিলেন, তাদের সামনে ওকে সই করানো হয়েছিল। তারপরই ওরা ফর্মটা নিয়ে নেন এবং পার্টির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য শপথবাক্য পাঠ করান। তখন অনেক বিপ্লবী আবেগ ছিল, মনে হত কিছু একটা করছি বোধ হয়। কিন্তু সেই কাগজ পুলিশের হাতে কী করে পৌঁছয়? কৌশিকের মনে হয়, ওর যাবতীয় প্রতিরোধ বুঝি এবার ভেঙে পড়বে। খোলা বাতাসে একটু নিশ্বাস নেওয়া দরকার। ওর কানে আসে অফিসারের কথা—'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাদের কাছে মিথ্যে বলে কোনও লাভ নেই। তবে পরে যে আপনার সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ ছিল না, এটা আমরা জানি।' হঠাৎ গলাটা একটু নামিয়ে অফিসার আবার শুরু করেন—'আরও একটা ব্যাপার আপনার ভাবার আছে, আপনি গোপন ঘরে বসে পার্টির মেম্বারশিপ নিলেন, আর সেটা কিনা আমাদের ফাইলে এসে জমা হল। মানে আপনার পাশের কমরেডকে কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন? এই দিকটা কি কোনওদিন ভেবেছেন?'

অফিসার এখনও এমনভাবে কথা বলছেন, যেন কিছুই হয়নি। আশ্চর্য নিরীহ ভাব ভদ্রলোকের চোখেমুখে। অথচ কৌশিক এখন যেন ফাঁদে-পড়া হরিণ। ভালোভাবে ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতাও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি পার্টির মধ্যেই এমন কেউ ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। না হলে পুলিশ এটা পায় কী করে? ইতিমধ্যে অফিসার এবং পাশের ভদ্রলোক আবার স্বাভাবিক। সিগারেটের প্যাকেটও আর নেই। কৌশিক সমস্ত ঘটনাটা প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করে। আপাতদৃষ্টিতে অফিসার আগাগোড়াই ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিবেশটা বদলাতে থাকে। কৌশিককে সম্মোহনের চেষ্টা করা হয়। এবং সেই অবস্থা থেকে সতর্ক হওয়া মাত্রই অফিসার শেষ আঘাতটা করেন। আসলে পুরো ঘটনাটাই ওদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখান থেকে আর কি কোনও তথ্য পাওয়া যাবে? একটা মিথ্যে বিষয়কে যেভাবে কৌশিকের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হল, তাতে কৌশিকের পুলিশের কাছে আসার ভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে। কৌশিকের সন্দেহটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে বদলে যায়। ঠিক তখনই কৌশিকের আশ্চর্য একটা জিনিস মনে পড়ে। অফিসার প্রথমে এমন ভাব করেছিলেন, যেন তিনি কৌশিকের দেখা করতে আসার ব্যাপারটা ভুলেই গেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এখন তো মনে হচ্ছে, তারা তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিলেন কৌশিকের জন্য। কিন্তু কৌশিকের নামটা পুলিশ জানল কী করে? তখনই মনে পড়ল, প্রথমদিন অফিসার নোটবুকে কৌশিকের নাম-ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন।

এর মধ্যে অফিসার বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন কৌশিককে অনেকটা বেসামাল করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এবার সরাসরি কিছু বলে দেওয়া দরকার। বেশ নিরুত্তাপ গলায় (কৌশিকের তখন 'মেফিস্টো' ছবির রাষ্ট্রনায়কের কথা মনে হচ্ছিল) তিনি উচ্চারণ করেন—'দেখুন, আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। আপনি বরং দিন কয়েক পরে একবার আসুন। আমি তার মধ্যে ভেবে দেখি আপনাকে কোনও সাহায্য করা যায় কি না। তবে ধরেই রাখুন যে, সাহায্য আপনি পাবেন না। তার কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর নামধামের ব্যাপারে আপনাদের পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করুন না। তারা নিশ্চয়ই আপনাকে ফেরাবে না।' শেষ দিকে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে অফিসারের চোখে।

রাত গভীর হয়, ক্রমশ অন্ধকার জমাট বাঁধে মনে। এরপর কৌশিকের বুঝে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না যে, এখান থেকে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না। শান্ত পায়ে ও অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। পুলিশের সঙ্গে কোথাও একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। তবে প্রথমদিকে কিছুটা বেসামাল হলেও, এখন কৌশিক অনেকটাই স্থির। খুব বেশি হতাশ হওয়ার কোনও অর্থ হয় না। পুলিশ তো এরকম ব্যবহার করতেই পারে। এরকম ভাবনা কৌশিক তো আগেই ভেবেছিল। আবার খানিকটা আশাহত যে হয়নি, তাও কি জোর দিয়ে বলা যায়?

তবে পুলিশের কাছে ব্যর্থ হয়েও কৌশিক কাজের আশাটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে না। শুধু একবার মনে হয়, পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা এবং তার ফলাফলটা সম্পাদককে জানানো দরকার। কারণ পুলিশের তরফ থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া যাবে না, তার ফলে যদি লেখাটার কিছু অদল-বদল করতে হয়—এই ভেবে ও সম্পাদককে পুরো ঘটনাটাই বলে, এমনকি ওর সদস্যপত্রের কথাটাও। তার সঙ্গে যোগ করে যদি কৌশিক পুলিশের দিক থেকে কোনও রকম বিপদে পড়ে, তবে কাগজের তরফ থেকে ওকে বাঁচানোর চেষ্টা কি করা হবে? হয়তো শেষ প্রশ্নটা কথার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার দরকার ছিল না, তবু কাগজ কর্তৃপক্ষের ওর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা জানার জনাই কৌশিক এটা যোগ করে। সম্পাদক একটু ভেবে বলেন—'তুমি যে একসময় বিপ্লবী রাজনীতি করতে, এটা আমি জানতাম না, ফলে সেই কারণে তুমি যদি বিপদে পড়, তবে কাগজ কিছুই করবে না। কারণ সেটা তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব।' কথার মাঝখানেই কৌশিক বলে ওঠে—'কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আমার কাজের দায়িত্বকে কি এ ক্ষেত্রে আলাদা করা সম্ভব?' সম্পাদক যেন একটু বিরক্ত হন—'কেন নয়? তুমি যদি বিপদে পড়, তবে দেখতে হবে পুলিশ কেন তোমাকে ধরল। আমি এটাও বলছি, যদি কাগজের কাজের জন্য তুমি কোনও বিপদে পড়, তবে নিশ্চয়ই কাগজ তোমায় সাহায্য করবে। নিজের স্বার্থেই করবে।'

সম্পাদকের কথার মধ্যেই কৌশিক একটা ফাটল দেখতে পায়। যদিও এখন কোনও সম্ভাবনা নেই, তবুও কৌশিকের বিপদের প্রসঙ্গটা মাথায় আসে। কিন্তু সত্যিই যদি ও ঝামেলায় পড়ে, তবে সেটা কখনই কাগজের পক্ষ থেকে যে কাজটা করছে, তার কারণে হবে না। সেটা হবে ওর ছাত্রজীবনের কিছু কার্যকলাপের সূত্র

ধরে। এবং তখনই কাগজ কর্তৃপক্ষ, সেটা কৌশিকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে এড়িয়ে যাবে। সম্পাদক বোধ হয় তারই ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু তদন্তের একটা দিক, অন্তত কৌশিক যেভাবে করবে ভেবেছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, এবং সে সম্বন্ধে সম্পাদক এখনও কিছু বলেননি। এটা সম্পাদককে বলতেই তিনি কথা শুরু করলেন—'পুলিশ যে আমাদের সাহায্য করবেই না, এটা তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ওরা তোমাকে যেকটা নাম দেবে বলেছে, সেগুলো নিশ্চয়ই সেই সময়ের কাগজে পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মূল উৎস, গণহত্যায় যারা প্রত্যক্ষদর্শী বা আহত হয়েছিল। যাদের হত্যা করা হয়েছিল, তাদের নামধাম সবই তুমি পুরোনো কাগজে পেয়ে যাবে। আর একটা কথা, তুমি যদি সত্যিই একসময় চরমপন্থী রাজনীতি করতে, তবে তাদের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছ না কেন? তুমি কি দায়িত্বটা ঠিক বুঝতে পারছ না?'

কৌশিকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা শুরু হয়। সম্পাদকও ভেবে নিয়েছেন সত্যিই ও একসময় চরমপন্থী রাজনীতি করত আর তদন্তের জন্য তিনি চরমপন্থীদের সাহায্য নিতেও পেছপা নন। তবে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে সম্পাদককে দায়ি করে কোনও লাভ নেই। প্রথম থেকেই তিনি বিষয়টাকে ভাবছেন যেন, একটা ভালো বিষয় এবং তাকে ভিত্তি করে একটা লেখা তৈরি করা যায়, এইভাবে। এবং তার জন্য যা যা করণীয়, তিনি কৌশিককে বলেছেন। কৌশিক সম্পাদকের জীবনের কিছু ঘটনা জানে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সৎ। প্রায় বছর কুড়ি যুক্ত আছেন সাংবাদিকতার জগতে। এই কাগজে আসার আগে তিনি একটা ইংরেজি দৈনিকে কাজ করতেন এবং কোনও একটা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অন্যায়কে মেনে নিতে পারেননি বলে কাজটা ছেড়ে দেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছে করেই পুরো ব্যাপারটাকে বিকৃত করছেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। হয়তো, কৌশিকও সম্পাদকের জায়গায় থাকলে এরকমই করত। কিন্তু একটা বিষয় খুব আশ্চর্যের। সম্পাদক প্রয়োজন হলে চরমপন্থীদেরও সাহায্য নিতে রাজি। কৌশিক একটু থেমে বলে- 'আপনিও বোধ হয় একই ভুল করছেন। ছাত্রজীবনে মাস ছয়েক রাজনীতি করেছি। সেটাও মূলত কলেজের উন্নয়ন ইত্যাদিকে ভিত্তি করে। তবে কিছু কিছু লোককে আমি চিনি, দরকার হলে তাদের সাহায্য নেব।'

--ঠিক আছে। তুমি যেভাবেই হোক কাজটা করো। কাজটা করলে সাংবাদিকতার জীবনেও তোমার পরিচিতি বাড়বে। তবে সতর্ক থাকবে সবসময়। আর সব জায়গায় গিয়েই যে কাগজের নাম বলতে হবে, এমন নয়। অনেক জায়গায় গিয়ে তুমি এমন কোনও ব্যক্তিগত কাজ করছ, এভাবেও কথা বলতে পারো। তাতে তোমারই সুবিধে। অনেকে কাগজ-টাগজ দেখলে মুখ খুলতে চায় না। ঠিক আছে কৌশিক। বেস্ট অব লাক্।'

কথা বলে বেরিয়ে আসার পর কৌশিক একটু ধাঁধায় পড়ে যায়। তিনি যেন কৌশিক সম্বন্ধে একটু চিন্তিত। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলেন, আপাতভাবে তুমি কাগজের হয়ে কাজটা করছ বটে, কিন্তু কোনও সমস্যা হলে কাগজ তোমার সঙ্গে নেই। কৌশিক বুঝতে পারে, সম্পাদক ওর আসল জায়গায় আঘাত করেছেন। অন্য সব সমস্যা নিয়েও আমি কাজটা শেষ করব, অনেক মানুষ পড়বে, কাগজ আমার সঙ্গে আছে—এই ভুলটা সম্পাদকের কথায় অনেকটা ভেঙে গেল। কৌশিকের মনে হয়, ভালোই হল। সম্পাদক ওকে একা কাজটায় ঠেলে দিয়ে বরং ভালোই করলেন। ব্যর্থ হলেও কোনও ক্ষতি নেই। কৌশিক তো জানেই, এই যুদ্ধটা অসম। প্রচণ্ড ইচ্ছে ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র তার হাতে নেই।

তবে পুলিশের কাছে ব্যর্থ হয়েও, গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, যারা সত্যিই গণহত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন মানুষগুলোর উপর। তারা নিশ্চয়ই কৌশিককে ফেরাবে না। অথবা ওর কোনও স্বার্থ আছে, এটা ভেবে বসবে না। সমস্ত ঘটনাটা যেন সকলে জানতে পারে, কীভাবে তাদের বাড়ির তাজা যুবকদের প্রকাশ্য রাস্তায় খুন করা হয়েছে, এ সব তথ্য জোগানে তাদের নিশ্চয়ই বেশি উৎসাহ থাকবে। তাই পুলিশের কাছে ব্যর্থ হয়েও, কৌশিক দুর্দান্ত আশাকে ছাড়তে পারে না। ইতস্তত আশা ও কল্পনার দ্বন্দ্বে কৌশিক ক্রমশ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কৌশিক একদিন সটান গিয়ে দেখা করে অনিল সেনের সঙ্গে। যে অঞ্চলে গণহত্যা চলে, সেই অঞ্চলের বাসিন্দা। অনিল সেখানকার বিখ্যাত সেনবাড়ির ছেলে। বিখ্যাত এই অর্থে, গণহত্যায় এই সেনবাড়িই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রায় দু-তিন ঘণ্টা ধরে বাড়ি-ঘর তছনছ করা হয়।

টাকাপয়সা, সোনাদানা লুঠ হয়। বাড়ির দুজন পুরুষকে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। অনিল এই বাড়ির ছেলে। চরমপন্থীদের সক্রিয় সদস্য ছিল। অনিলকে কিন্তু খুন করা হয়নি। তবে অত্যাচারের প্রতীকস্বরূপ ডানহাতটা কেটে নেওয়া হয়। কৌশিক তখনকার পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়েই অনিলের নামটা পেয়ে যায়।

কৌশিকের পরিচয় শুনেই অনিল বোধ হয় আসার কারণটা আন্দাজ করতে পারে। কিছুটা আশ্চর্যও হয়। এতদিন বাদে একজন তরুণ এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে, অনিল সম্ভবত দ্রুত কিছু আবিষ্কার করতে চায়। বুঝে নিতে চায় কৌশিকের উদ্দেশ্যকে। অনিলকে দেখে কৌশিকও কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করে। বছর তিরিশের তরুণ, মুখে একগাল দাড়ি। প্রাথমিক আলাপের ফাঁকেই কৌশিক নজর করে ডান হাতের দিকে। একটা পাঞ্জাবি শরীরে, ডান হাতের কনুইযেব কাছ বরাবর গুটিয়ে বাঁধা আছে। বাদ বাকি জায়গাটা নিঃস্তব্ধ, শূন্য। বেশ দ্রুতগতিতে কৌশিক উদ্দেশ্যটা বলে যায়। আর বলার ফাঁকেই বুঝতে পারে, একজোড়া সতর্ক সন্দেহ-চোখ একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেকটা সময় কেটে যায়। মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্যটা বলা হয়ে গেছে। তবু কৌশিক একই কথা বারবাব বলতে থাকে। এই মুহূর্তে অনিলের প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে পারছে না কৌশিক। কেমন যেন ছায়া ছায়া অনুভূতি। তাই ও মনেপ্রাণে চাইছিল অনিল কিছু বলুক। অনিলও এটা বুঝে বলতে আরম্ভ করে—'আপনাব বক্তব্য আমি পুরোটাই বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, একটা গণহত্যা এখানে সংগঠিত করা হয় খুব ঠান্ডা মাথায়। উঁচু মহলেব সঙ্গে পরামর্শ করে। আমার নিজের আন্দাজমতো, প্রায় শ দেড়েক ছেলে এই হত্যাকাণ্ডের শিকার। কোনও যথার্থ হিসেব নেই। এমনকি অনেকে বিপ্লবী রাজনীতিও করত না। কিন্তু অন্যান্য গণখুনের সঙ্গে এখানে পার্থক্য আছে। এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি রাজনীতি জড়িত, অন্যগুলোয় নয়।

এত পর্যন্ত বলাব পব অনিল একটু থামে। কৌশিক কথাগুলো শিকারি চিতার মতো কান পেতে শুনছিল। এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, অনিল কী বলতে চায়। আর এই না বোঝাটা ওব মধ্যে একটা উত্তেজনা তৈরি করছে। পাশাপাশি অনিল ওকে সাহায্য করবে কি না, এই অনিশ্চয়তাটাও ছিল। অনিল আবার কিছু বলছে, শুনতে পায় —'কিন্তু আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' কৌশিক আপাদমস্তক লক্ষ করে অনিলকে। 'সাহায্য' শব্দটা যেন দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করছে। অনিল শুধুমাত্র ওকে সাহায্য করবে কেন? অনিলই তো এগিয়ে এসে কৌশিককে যাবতীয় গোপন ঘটনার সন্ধান জানাবে। কৌশিক বলে---'আপনি অবশ্যই সে দিনের ঘটনায় আপনাব নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। যাতে মানুষজন জানতে পারেন যে, কীভাবে এবং কাদের মদতে এই গণহত্যাটা সম্ভব হয়েছিল।' অনিল প্রথমেই কথার কোনও উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ পরে বলে—'আপনাকে তো আগেই বলেছি, পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত কৌশলে করা হয়েছিল। এবং যারা করেছিল, তারা এই কাজের জন্য কয়েকজন স্থানীয় গুণ্ডাকে মাধ্যমে হিসেবে বেছে নেয়। সরাসরি যারা আমাদের বাড়ি লুঠ করেছিল, তারা অনেকেই এই অঞ্চলে থাকে, এমনকি বর্তমানে অনেকে আমাব বন্ধু। পরে জানতে পেরেছি, এই কাজের জন্য তাদের প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে তাদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। সকলেই তারা এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে।'

কৌশিক বুঝতে পারে, অনিল যাদের কথা বলছে, তারা আদৌ আসল অপরাধী নয়, তারা শুধুই মাধ্যম। (এত পর্যন্ত ভাবার পরই কৌশিকের মনে হয়, ও নিজেও তো সম্পাদকের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম। যদিও লেখাটা কৌশিকেরই, তবু দু-একটা শব্দ অদল বদল করে সম্পাদক তাকে এমনভাবে দাঁড় করাবেন, তখন প্রকৃত অর্থে লেখাটা আর কৌশিকের থাকবে না। এইভাবে আমরা সকলেই পুতুল নাচের পুতুল মাত্র, দড়ি ধরে মঞ্চের আড়ালে কেউ আমাদের নাচাচ্ছে?) কিন্তু তাদের যারা কাজে নামিয়েছিল, তাদের সম্বন্ধেই জানা প্রয়োজন। এবং সেটা অনিলের অভিজ্ঞতা থেকেই অনেকটা স্পষ্ট হবে, কৌশিক জানে। তাই ও বলে—'আপনার নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি গণহত্যার কিছু কিছু বিবরণ শুনতে চাই।'

আমি আপনাকে কয়েকটা দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারি। কিন্তু পুরো ঘটনার উপরে একটা পরদা বেছানো আছে। আপনি যদি সেই পরদাটা ছিঁড়ে দিতে পারেন, তবে দেখা যাবে, ভেতরে অনেকগুলো সূক্ষ্ম বিষয় পরস্পর জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে গণহত্যাটা যে কৌশলে সংগঠিত করা হয়। এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে।' চট করে শুনে অনিলের কথাগুলো বেশ জটিল মনে হয়। কৌশিক

ঠিক বুঝতে পারে না, অনিল ওকে সাহায্য করবে কি না। অনিলের কথার মধ্যেই একটা অস্পষ্টতা আছে। কৌশিকের মনের দ্বন্দ্বটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অনিল আবার বলে ওঠে, 'ঠিক কীভাবে আমাদের বাড়িতে লুঠপাট করা হয়েছিল, তার কিছু বিবরণ আপনাকে দিতে পারি। অবশ্য তারও অনেক বিপদ আছে। তবে কাদের প্রত্যক্ষ মদতে এটা করা হয়েছিল, কারা যুক্ত ছিল, সে সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব কি? কেননা আমার কাছে তো এমন কোনও প্রমাণ নেই তাদের বিরুদ্ধে! আমি বা আপনি কি প্রমাণ করতে পারব যে তারাই এই কাজটার পেছনে ছিল? অবশ্য কাগজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারটা প্রমাণ করাও যাবে না।'

কৌশিক এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না, অনিল কী বলতে চায়। এমন হতে পারে, কৌশিকের এই কাজের ব্যাপারে অনিলের কোনও আস্থা নেই, আবার অনিল হয়তো কিছু বলতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু কারণ যাই হোক, সেটা অনিল স্পষ্টভাবে বলছে না। অনিল যেন কিছু একটা গোপন করতে চাইছে। একটা দেয়াল যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে দুজনের মধ্যে। ঠিক তখনই অনিল আবার কথা বলে ওঠে, 'কিন্তু কিছু বলার আগে আমার কয়েকটা বিষয় জানার আছে। প্রথমত সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে রাজনীতি জড়িত, সুতরাং রাজনীতিকেই এই লেখার মেরুদণ্ড করতে হবে। কিন্তু তাহলে কি আপনাদের কাগজ ছাপাবে? আর ছাপালেও এমনভাবে লিখবে, যার ফলে তার একটা মার্কেট ভ্যালু থাকে। তাই নয় কি?' কৌশিক ঘাড় নেড়ে ওকে স্বীকৃতি জানায়। 'হ্যাঁ, একটা মিডিয়া-সংগঠনের পক্ষে সেটা করা খুবই স্বাভাবিক। সম্ভবত এটাই ঘটবে। কিন্তু আপনাকে তো বললামই যে এ ক্ষেত্রে কাগজের সঙ্গে আমার নিজের একটা আদর্শগত বিরোধ আছে। আপনি আমাকে সম্পূর্ণ কাগজের লোক ভেবে নিলেন কী করে?'

কৌশিকের এই স্বীকারোক্তিতে অনিলের মুখে একচিলতে হাসি ফুটে ওঠে। 'আপনার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনার পক্ষে কতখানি এগোনো সম্ভব? যাই হোক, আমি আপনাকে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঘটনাটা ঘটে সালের আগস্ট মাসে। সম্ভবত ২০ আগস্ট। পরপর দু দিন আমার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। ২০ এবং ২১ তারিখ। দু দিনই পঞ্চাশ-ষাট জন ছেলে এবং সঙ্গে প্রচুর পুলিশ ছিল। পুলিশের সাহায্যে আমাদের বাড়িকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়, যাতে কেউ পালাতে না পারে। ছেলেদের হাতে ছিল বন্দুক, পিস্তল, বেশ কিছু বোমা আর পেট্রলের টিন। সময় তখন সন্ধে সাতটা অথবা সাতটা তিরিশ হবে।

কথার মাঝেই কৌশিক বলে—'কিন্তু যারা এসেছিল, আপনি তাদের চিনতে পারেননি?' অনিল একটু থমকে যায়—"আপনাকে তো বললামই যে তারা স্থানীয় ছেলে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে পারি, এই আমার বাড়ি থেকে এগিয়ে কিছুটা গিয়েই দেখবেন একটা বড়ো ক্লাব আছে। নাম 'জাগরণী'। ক্লাবটা একটা বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর। যারা এসেছিল তারা সকলেই ওই ক্লাবের ছেলে। কিন্তু আসল দোষী তারা নয়। আপনি বরং খুঁজে বের করুন, তাদের কারা ব্যবহার করেছিল। যাই হোক, আবার শুরু করি। তা গুণ্ডারা যখন আসে, বাড়িতে তখন অধিকাংশই মহিলা। পুরুষ বলতে ছিলাম আমি এবং আমার দুই দাদা। ওরা বাড়িতে ঢুকেই যাবতীয় জিনিসপত্র নষ্ট করতে শুরু করে। চেয়ার-টেবিল থেকে দেওয়ালের ছবি, এমনকি দরজা-জানলাও। ওদের বোধ হয় মূল লক্ষ্য ছিলাম আমি। মরিয়া হয়ে আমাকে খোঁজার জন্য ওরা সমস্ত বাড়ি তছনছ করতে থাকে।

আমি তখন তিনতলার একটা ঘরে। দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসেছিলাম। জানি, ওরা আমাকেই খুঁজতে এসেছে এবং দরজা বন্ধ করে ওদের আটকানো যাবে না। ইতিমধ্যে দলবেঁধে ওরা তিনতলায় চলে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। আমি দেখলাম, বাঁচার আর কোনও পথই নেই। দরজা ভেঙেই ওরা ঘরে ঢুকবে। নিজেই খুলে দেব কি না ভাবতে ভাবতেই হুড়মুড় করে একদল হিংস্র মানুষ ঢুকে পড়ল ঘরে। ওদের চোখেমুখে কি অমানুষিক উল্লাস। টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চলল একতলার দিকে।'

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পর অনিল একটু থামে। কৌশিক খুব মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ সাময়িক নিঃস্তব্ধতায় ও মুখ তুলে অনিলের দিকে তাকায়। তখনই অনিল বলে—'দেখুন, দেখুন, আমাদের দেশের আসল চেহারাটা। এইসব মানুষকে নিয়ে, এদের জন্যই আমরা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।' কৌশিক বুঝতে

পারে, অনিল রাস্তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলছে। ওরা কথা বলছিল অনিলের বাড়ির সামনে একটা বেদির উপর বসে। ওখান থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। কৌশিক দেখতে পায়, একটা ধর্মীয় শোভাযাত্রা সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত কোনও ধর্মগুরুর জন্মদিন বা ওই জাতীয় কোনও উৎসব। কৌশিক অনিলের কথার কোনও উত্তর দেয় না। বরং ওর সামনে অনিলের বাড়ির সেই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটাই অনেক বেশি পরিষ্কার। এখন ও নতুনভাবে কিছু চিন্তার করতে পারছে না। অনিল তখন বলে—'এই তো বর্তমান পরিস্থিতি। এই অবস্থায় আপনি এককভাবে কী করতে পারেন।'

কৌশিক কিছুটা অস্থির হয়ে ওঠে—'আমরা বোধ হয় মূল বিষয় ছেড়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। আপনি কিন্তু পুরোটা শেষ করেননি।' 'হ্যাঁ, মোটামুটি আমার বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ওরা আমাকে টানতে টানতে একতলায় নিয়ে এল। একতলায় নেমে দেখি, আমার দুই দাদাকে একটা থামে বেঁধে রেখেছে। আমাকে ওরা বোধ হয় কিছু জিজ্ঞেস করছিল। ইতিমধ্যে নীচে আনার সময় ওরা খুব বেশি মারধর করেনি আমায়। আমাকেও বেঁধে দেয় অন্য একটা থামে। তারপরই আমাদের তিনজনের গায়ে পেট্রল ছেটাতে থাকে। আমি তখন বুঝে ফেলেছি ওরা কী করতে চলেছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওদের অনেক কিছু বললাম। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের চারপাশ দিয়ে আগুন, ধোঁয়া। আমি স্পষ্ট দেখলাম, আমার বড়োদা জ্বলন্ত শরীরে দু হাত দিয়ে বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে। এই পর্যন্তই আমার জ্ঞান ছিল। তারপর......। তারপর আমার জ্ঞান হয় হাসপাতালে।'

সমস্ত ঘটনাটাই এত নৃশংস যে, কৌশিক যেন ধীরে ধীরে পাথর হয়ে যায়। কথা বলার ক্ষমতা নেই। এই মুহূর্তে অনিল আর কৌশিক দুজনেই নিঃশব্দ। অনেক পরে কৌশিকই বলে— 'আমার একটা কথা বলার আছে। আপনি কিন্তু পুরো ঘটনাটাই বলেছেন এমনভাবে, যেন কোনও একটা গুণ্ডাবাহিনী আপনার বাড়ি আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। এটা একটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক গণহত্যা। সুতরাং আপনি যদি সরাসরি না বলেন, তবে বিষয়টার কোনও অর্থই থাকে না। আপনি নিশ্চয়ই কারা কারা এই হত্যাকাণ্ডে ছিল, তাদের নামধাম জানেন, সেটা না বললে, আমার পক্ষে এই গণহত্যার আসল কারণকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না।'

— আপনি কিন্তু একই কথা বারবার বলছেন। আপনাকে তো আমি ক্লাবের নাম বলে দিয়েছি। আপনি নিজে গিয়েই খোঁজ করুন না। তবে সে ক্ষেত্রে আপনি অক্ষত থাকবেন কি না. বলা মুশকিল। আর এরা তো আসল অপরাধী নয়। আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি, আমি আপনাকে অনেকটাই বলেছি। বাদবাকিটা আপনি খুঁজে নিন। আমার নিজের দিকটাও তো ভাবতে হবে। দেখুন, এ বিষয় নিয়ে লিখে কী লাভ? লোকজন এখন দারুণভাবে প্যাসিভ, কোনও কিছুতেই তাদের উৎসাহ নেই। এখনকার মানুষেরা সিনেমার পরদায় নায়কের মৃত্যুতে কাঁদে। এই অবস্থায় আপনি একটা লেখা লিখে কী করতে পারেন? বড়ো জোর তারা আপনার লেখা পড়বেন, ব্যাপারটা জানবেন, ব্যস্। আবার যে কে সেই। আর আপনাকে কিছু বললে, যদি আবার গুণ্ডারা আমার বাড়িতে হামলা চালায়, তখন কি আপনি ঠেকাতে পারবেন? আমি জানি, আপনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মানবিকতার খাতিরে এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন। হামলা হলে কিন্তু, সরাসরি বলছি, কিছু মনে করবেন না, আপনার টিকিও দেখতে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া আপনি নিজেই তো স্বীকার করলেন, রাজনীতিকে মেরুদণ্ড করে লিখলে আপনার কাগজ কখনই ছাপাবে না।'

কৌশিক কি অনিলের বাড়িতে আবার হামলার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারে? না বোধ হয়, কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, অনিল ওকে বিশ্বাস করছে না, ভাবছে কাগজের লোক। এখন মোটামুটি বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনিলের কাছ থেকে তেমন কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। কৌশিকের চোখের সামনে একটা কালো পরদা নেমে আসে। গাঢ় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় মনস্তত্ত্বের উর্বর জমি। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনিল যেন ওর অস্তিত্বকে শিকার করেছে। কৌশিক বোধ হয় অনিলের কাছে খুব বেশি আশা করেছিল। আবার আসল অপরাধীদের নামধাম না বলার জন্য অনিল যে কারণগুলো বলছে, তাও কি অস্বীকার করা যায়? আস্তে আস্তে কৌশিক যেন ঘটনার ভেতর অন্তর্লীন কোনও ঘটনার সন্ধান পেয়ে যায়। আসলে পুলিশ এবং অনিলের সঙ্গে ওর দূরত্বটা সমান। না হলে অনিল ওকে বিশ্বাস করছে না কেন? তবে কি কৌশিকের

নিজের অবচেতনে কোনও ফাঁকি আছে? কিন্তু তা হলে তো এই যন্ত্রণাটা বিদ্ধ করত না? অবচেতনে ফাঁকি থাকলে যন্ত্রণাটা কি এমন তীব্র হতে পারে? কৌশিক অন্ধের মতো পথ হাতড়াতে থাকে এই ধোঁয়ার সাম্রাজ্যে।

কৌশিক যেন নিজের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। দিশেহারা ভঙ্গিতে অনিলের হাত ধরে বলে ওঠে—'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই গণখুনের প্রতিবাদে আমার তো কিছু করণীয় থাকতে পারে? সেখানে আপনারা আমকে হেল্প করছেন না কেন? আর মানুষজনের প্যাসিভ হওয়ার কথা বলছেন? আপনারা যখন আন্দোলনে নেমেছিলেন, তখনও মানুষ কম বেশি প্যাসিভ ছিল। তবে আপনারা কেন বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন?'

—আপনি বোধ হয় অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। আমাদের ভুল তো প্রমাণ হয়ে গেছে। মানুষের জন্য আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম, সেই মানুষই আমাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু প্রবলেমটা এখানে অন্য। আসলে আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। একবার একজন আধুনিক বিপ্লবী ফিল্ম-মেকার মে দিবসের মিছিলের মধ্যে ঢুকে শ্যুটিং করতে চেয়েছিলেন। এইভাবেই আপনারা, বুদ্ধিজীবী বা সাংবাদিকেরা চিরকাল রাজনীতিকে আপনাদের শিল্পের তথা কাজের এলিমেন্ট হিসেবে দেখেছেন। আপনার ভুলটা বোধ হয় এখানেই হচ্ছে। একজন ব্যক্তি হিসেবে আপনি এই কাজটা কিছুতেই করতে পারেন না। আপনার আইডেন্টিটি কী?'

—আমার আইডেন্টিটি—আমি একজন সামাজিক প্রাণী। আর সমাজের সদস্য হিসেবে আমার নিশ্চয়ই কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। আমি জৈবিক প্রয়োজনে শুধুমাত্র পতঙ্গের মতো বেঁচে থাকতে চাই না। আমি বুদ্ধিজীবী নই, সাধারণ একজন সাংবাদিক। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে আমি একা তো বন্দুক নিয়ে এই মুহূর্তে রাস্তায় নামতে পারি না। অথচ এই বদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে একটা কিছু করা দরকার. এটা আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। তাই আমি আমার কাজের ক্ষেত্রেই এই দায়িত্ব পালন করতে চাই। এই ভাবনা থেকেই আমি কাজটা হাতে নিয়েছি। বলতে বলতে কৌশিকের প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। 'বিশ্বাস করুন, আমি কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করতে আসিনি। মানুষ হিসেবে আমার তো কিছু করণীয় আছে। আর কিছু না করার অর্থ, চুপ করে বসে থাকা। কিন্তু সেটা মেনে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।'

অনিল আবার হাসতে শুরু করে—'আমি আপনার সততা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন তুলিনি। শুধু বলতে চেয়েছি, আপনি কাজটা একা করতে পারেন না। আসলে সামাজিক দায়িত্বের কোনও ব্যক্তিগত চেহারা নেই। সবটাই সামগ্রিক। তাই সবাই চুপ করে থাকলে আপনি একা কতক্ষণ লড়তে পারেন?'

কৌশিকের কোনও কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। এতক্ষণ একটানা উত্তেজনার পর এখন কেমন অবসন্ন মনে হচ্ছে। ভাষাহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনিলের দিকে। 'কত গুলো সুপারফিসিয়াল ইনফরমেশন ছাড়া আপনাকে কোনও হেল্প করতে পারছি না। আসলে আপনি বোধ হয় অসম কোনও যুদ্ধে নেমেছেন। ধরুন, সমস্ত তথ্য আপনি পেলেন। তা হলেও কি আপনি সত্যকে তুলে ধরতে পারবেন? আপনার কাগজ এই ঘটনাটা নিয়ে শিহরন তৈরি করবে, যাতে পাঠক এর মধ্যে একটা ডিটেকটিভ নভেলের সন্ধান পেয়ে যায়। এখানে কাগজ আপনাকে ইউজ করছে, আপনি না চাইলেও।'

এই কথাটা যে কতখানি সত্যি, সেটা কৌশিকের থেকে ভালো আর কে জানে? তবে কী বা করার আছে। কৌশিকের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে ওঠে। একটা প্রশস্ত হলঘর। শেষপ্রান্তে উঁচু মঞ্চ। মঞ্চের ওপর একজন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। মঞ্চের ঠিক তলায়, প্রথম সারিতে বসে আছেন যাবতীয় রাষ্ট্রনায়ক। তাঁরা গান শুনছেন। ঘরের অন্যান্য অংশ মানুষজনে ভর্তি। হঠাৎ পেছনের সারি থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল—'বন্ধ করো শিল্পের নামে এইসব নাকি সুরে কান্না।' মুহূর্তে সমস্ত ঘর সচকিত। 'কে বলল এই কথা? কার এত সাহস?' দেখা গেল একজন উদ্ধত যুবককে লোকেরা ধরে সামনের দিকে নিয়ে আসছে। এই যুবকই হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। তাকে ধরে রাষ্ট্রের নেতার কাছে নিয়ে আসা হল। খুব মৃদু হেসে রাষ্ট্রনায়ক যুবকের পিঠে হাত রেখে বললেন—'আপনি কেন প্রতিবাদ করেছিলেন, আমি জানি। তবে ওইভাবে আড়াল থেকে প্রতিবাদের কোনও অর্থ নেই। এরপর থেকে আপনি মঞ্চের ওপর উঠে সকলের সামনে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন। তাতে সকলে আপনার কথা শুনতে পাবে। আপনি বরং আমাদের সামনে দাঁড়িয়েই প্রতিবাদ করুন। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি ওই চিৎকারের কথাগুলোই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলুন।'

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল—ওই যুবক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তীব্র স্বরে শিল্পের নামে যাবতীয় কান্নাকে বন্ধ করার কথা বলছেন। আর তার কথার সমর্থনে রাষ্ট্রনায়কেরা ঘন ঘন হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করছেন।

পুরো দৃশ্যটাই কৌশিক যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। কীভাবে যে কোনও প্রতিবাদকে আত্মসাৎ করা যায়, কীভাবে যথার্থ প্রতিবাদকে হাস্যকর করে তোলা যায়—তার প্রত্যক্ষ উদাহরণে কৌশিক নতুন ভাবে কোনও উপলব্ধির সন্ধান পায়। গণহত্যার বিবরণ লিখতে গেলে তাকে কাগজের আশ্রয় নিতেই হবে, ঠিক যেমন প্রতিবাদকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ওই যুবককে মঞ্চের ওপর দাঁড়াতেই হয়।

এইটুকু বাদানুবাদের মধ্যেই কৌশিকের সামনে আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে, ওর তদন্তের দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটাও নষ্ট হতে চলেছে। এর ফলে কাজটা করার আশা একটু একটু করে দূরে চলে যাচ্ছে। শেষবারের মতো তবু অনিলকে বলে—'আপনি নিজে না বললেও, আমাকে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন, যাদের পরিবারের ছেলেরা তখন মারা গিয়েছিল।'

—আপনি কি ভাবছেন, তারা আপনাকে সব বলে দেবে? কেউ আপনাকে কিছুই বলবে না। মুখ খুললেই আবার নতুন করে ঝুঁকি নেওয়া হবে। তাতে কেউ রাজি হবে না।' হঠাৎ কৌশিক বলে, 'আচ্ছা, আমি যদি আপনার বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করি?' অনিল অল্প হেসে ওঠে—'তারা আপনাকে কিছুই বলবে না। উলটে অপমান করতে পারে—এত বছর বাদে এখনও আমাকে প্রায়ই তিরস্কার হজম করতে হয়। আর তারা তো ভুল কিছু বলে না। আসলে এই গণহত্যার বিবরণ মানুষে জানুক অথবা না জানুক, কোনও ব্যাপারেই তারা উৎসাহী নয়—এটাই আমার অভিজ্ঞতা। কিছু মনে করবেন না। আপনি বোধ হয় এখনও কিছুটা কল্পনার রাজ্যে আছেন, নতুবা বুঝতে পারতেন, মাঝখানের এই কটা বছর মানুষজন, বিশেষ করে আন্দোলনে যুক্ত মানুষ কী ভয়ানক বদলে গেছে। এ জন্য তাদের কোনও দোষ নেই। রিয়েলিটি আমাদের সকলকে এভাবে বদলে দিয়েছে। আপনি বোধ হয় এই কঠোর বাস্তবকে ঠিক বুঝতে পারছেন না।'

কৌশিক ভেবেছিল অনিলের কথার কোনও উত্তর দেবে না। শুধুমাত্র আকারে-ইঙ্গিতে কথাবার্তা চালিয়ে যাবে। যে যুদ্ধে কৌশিক নেমেছিল, তার পরিণতি তো এখন বেশ বোঝা গেছে। তবে আর বেশি কথা বলে কী লাভ? এখন কেবল এই ঘটনাটা থেকে কৌশিক কী শিক্ষা নিতে পারে, এটাই দেখার। কিন্তু অনিলের কথার মাঝখানে ও আর চুপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তব খুব কঠোর—অতএব কিছুই করা সম্ভব নয়, এটাই কি মেনে নেওয়া যায়? তাহলে তো নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে হয়। আমি মেনে নিচ্ছি প্রায় সকলেই এই বাস্তববাদের নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু দু-একজনও কি ব্যতিক্রম থাকতে পারে না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু তাদের পক্ষে বেশি কিছু করে ফেলা সম্ভব নয়। যেমন আপনি। কী করতে পারেন দেখুন। তারপর একটু ভেবেই অনিল আবার শুরু করে—'যাক গে। চলুন আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই। সামনেই আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। তার ছেলেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তখন তার বাবা বাধা দিতে গেলে লাঠি দিয়ে ভদ্রলোকের পা ভেঙে দেওয়া হয়। আমি আপনাকে তার বাড়ি নিয়ে যাব। শুধু এটুকু আপনার জন্য করতে পারি। তবে লাভ বোধ হয় বিশেষ কিছুই হবে না।'

কৌশিকের তখন স্রোতের মুখে স্রোতকেই আশ্রয় করার অবস্থা। নতুন করে আর লাভ-ক্ষতির কী আছে? পরিস্থিতিটা এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে। কৌশিকের খানিকটা অবাক লাগে। পুলিশও ওকে বিশ্বাস করল না ভেবে নিল ওর নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য আছে কাজটার পেছনে, আবার অনিলও ওকে সহমর্মী ভাবতে পারল না। তবে দুটো স্তরের প্রকৃতি ও স্বরূপ নিশ্চয়ই আলাদা। নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হচ্ছে। প্রত্যেকেই যখন ব্যক্তিগত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে! একদিকে সন্দেহ, অন্যদিকে কিছুটা অবিশ্বাস, কিছুটা অভিমান, শূন্যতা সেই দুর্গের গাঁথনি। কৌশিক যেন সেই দুর্গগুলো ভাঙতে চেয়েছিল, এটাই ওর অপরাধ।

অনিলের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে, কৌশিকের কোনও চিন্তাই স্পষ্টভাবে কাজ করছে না। কেমন ধূসর চেতনার মানচিত্র, ছায়া-ছায়া অনুভূতি। এদের কাছ থেকে নতুন কোনও সাহায্যই পাওয়া যাবে না। অনিল সম্ভবত সরাসরি কৌশিককে প্রত্যাখান করতে পারছে না। তাই বোধ হয় নিজের দায়িত্বটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। শরীরটা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে, মুখে ক্লান্তির

ছাপ। অনিল পরিচয় করিয়ে দিল, এই বৃদ্ধের ছেলেই গণহত্যার শিকার। বৃদ্ধকে দেখে কৌশিক কিছুটা হতাশ হয়। হয়তো নিজের ছেলেকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন, এই বীরত্বসূচক ইমেজটাই বৃদ্ধ সম্পর্কে কাজ করেছিল। বদলে সাধারণ একজন বৃদ্ধ, কৌশিকের মেলাতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল।

অনিলই কৌশিকের হয়ে আসার কারণটা জানিয়ে দিল। ততক্ষণে ওরা ঘরের মধ্যে বসেছে। নতুন কোনও তথ্যের আশা নেই, এটা মোটামুটি জেনে কৌশিক অপেক্ষা করে বৃদ্ধের কথার জন্য। বৃদ্ধ তখন অনিলের সঙ্গে কথা বলছেন—'দেখো, নতুন করে আর কী বলব। আমার ছেলেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে, আমার চোখের সামনে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনা বাপ হয়ে আমি নিজের চোখে দেখেছি। শুধু আমার ছেলেই কেন, আরও অনেককেই ওরা এভাবে মেরে ফেলেছে। আর সেই গুণ্ডারা এখন বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।'

শুরু হয়েছিল সম্ভবত জিওর্দানো ব্রুনোর ঘটনায়। তারপর আমরা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু জীবন্ত দগ্ধ করার ঘটনার কোনও হেরফের ঘটেনি। একটা তীব্র বিরক্তি ঝরে পড়ে বৃদ্ধের কথায়। কৌশিকের মনে হয়, বৃদ্ধের স্মৃতি এই ঘটনার পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় একেবারেই সায় দিচ্ছে না। বৃদ্ধ তার ছেলের মৃত্যুর ঘটনা বলছেন খুব নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে। কৌশিক বলে—'আপনি কি, কারা কারা আপনার ছেলেকে মেরেছে, তাদের নাম বলতে পারেন?'

—হ্যাঁ, তাদের তো সকলেই চেনে। ওই যে 'জাগরণী' ক্লাব। সকলেই তো ক্লাবের ছেলে। কিন্তু তুমি ভাই প্রমাণ করবে কী করে যে, ওরাই মেরেছে? ওই ক্লাবের সেক্রেটারি খোকন সাহা, সেই তো আমার ছেলের গায়ে পেট্রল ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু কী করার আছে? সে এ অঞ্চলের একজন মাতব্বর, থানার আফিসারের সঙ্গে তার ওঠাবসা।

—কিন্তু আপনি আমার কাছে তার নামধাম বলতে পারেন। আমি এটা কাগজে প্রকাশ করব। লোকে জানবে যে লোকটা আসলে একজন খুনি। কৌশিক সামান্য উত্তেজিত হয়।

—আমি তোমায় নাম বলতে পারি। কিন্তু সেগুলো তুমি নিজের দায়িত্বে লিখবে। লেখার সময় কিন্তু আমার নাম দিও না। আরও অনেক কিছুই আমি জানি। কিন্তু বলতে পারব না। তুমি তো সাংবাদিক। তোমাকে ওরা চেনে না। কিন্তু আমাকে কি ওরা ছেড়ে দেবে? এই তো দেখ অনিলকে। এ তো আমার ছেলের বন্ধু ছিল। বিপ্লবের উন্মাদনায় চার বছর বাড়িঘর, বাবা-মা সকলকে ছেড়ে কাটিয়েছে। কিন্তু তারপর? আজকে যা ক্ষতি তা শুধুই ওর। আসল কাজের হাতটাই নেই। মানুষের জন্যই বিপ্লব। অথচ মানুষ আজকে ওর পাশে কই? আজকে কিন্তু আমার মতো কয়েকজন হতভাগ্য বাবাই শুধু সেই দিনগুলোকে মনে রেখেছে।

কৌশিক প্রায় মুগ্ধের মতো কথাগুলো শোনে। বৃদ্ধের কথায় ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বের একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু বৃদ্ধ কি ভুল কিছু বলছেন? বৃদ্ধের মুখেও আবার একই নিরাপত্তাহীনতার কথা, যা ও শুনেছিল অনিলের মুখে। অনিল এখন ওর পাশে বসে। কৌশিক বলে ওঠে—'তবু আপনার ছেলের হত্যার ঘটনা সকলে জানুক, এটা আপনি চান না?' বলতে বলতেই কৌশিক বুঝতে পারে, ওর গলার উত্তাপ ক্রমশ কমে আসছে।

—চাই, নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু নিজের প্রাণ বিপন্ন করে নয়। আর লিখে কী করবে? পুলিশ কি গুণ্ডাদের ধরতে পারে না? তবে তারা কেন এখনও বেশ নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়? আসলে ভাই, আমরা দুর্বল। ওরা এখন রাজনীতি করে। পকেটে ব্যবসাদারের টাকা। তাই যা করবে, তা-ই মুখ বুজে হজম করতে হবে। তোমাকে একটা ছোটো ঘটনা বলি। বছরখানেক আগে একদল ছেলে আমার কাছে এসেছিল। এই গণহত্যা নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি ছবি করতে চায়। তা আমার কাছে তিন-চারদিন এসেছিল। আমিও তখন কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, নিজের তো গেছেই। আর ভয় কিসের? যা জানি, সব ওদের বলে দেব। এমন সময় একদিন থানা থেকে আমাকে ডেকে পাঠায়। অফিসার আমাকে বলে—'শুনেছি কয়েকজন ছেলে নাকি আপনার কাছে ঘোরাফেরা করছে? তারা নাকি আপনার ছেলের মৃত্যু নিয়ে কীসব তদন্তমূলক ছবি করতে চায়? একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবেন। নইলে আপনার কপালে আরও বিপদ আছে।' এটা শুনেই আমার বেশ ভয় হল। পরে অবশ্য ওই ছবি তোলার দলও আর আসেনি।'

আস্তে আস্তে কৌশিক বলে—'কিন্তু এই সামান্য হুমকিতেই আপনি ভয় পেলেন?' বৃদ্ধ সামান্য হেসে বলেন—'না ভাই, সামান্য হুমকি নয়। আর আমি সামান্য মানুষ। শান্তিতে দিন কাটাতে চাই। বৃদ্ধ বয়সে আর উত্তেজনা সহ্য হয় না। তোমাকে দেখেও আজকে মনে হয়েছিল, যা জানি সব বলে দিই। কিন্তু পরে নিজেকে সামলে নিই। তুমি ভাই আমাকে ভুল বুঝো না। আর কেনই বা লিখবে? আর জানাবেই বা কাকে? লোকজন কি জানে না বলতে চাও? তারা সবই জানে, কিন্তু মুখ খোলে না। কে আর নিজের বিপদকে ডেকে আনতে চায় বলো?'

এরপর নতুন কথা কী আর বলার থাকতে পারে? বৃদ্ধ বরং অনেক সোজাসুজি কথা বলেছেন। আর শেষদিকে কৌশিকের চাপ দিতেও কেমন যেন বাজে লাগছিল। হয়তো সামান্য সাহস করে তিনি কৌশিককে কিছু বললেন। কিন্তু তার ফলে হয়তো তার পুরো সংসারটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে কৌশিক উঠে দাঁড়ায়। অনিল ওর পাশে হাঁটতে থাকে। বৃদ্ধ ওর সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করেছেন বলতে হবে।

কৌশিকের তখন সম্পাদকের ঘরের সেই ছবি দেখানো এবং বৃদ্ধার কান্নার গল্প মনে পড়ছিল। সত্যি, কাচের ঘরের সঙ্গে কী বিশাল তফাত! কান্না তো দূরের কথা, বৃদ্ধের কথাবার্তায় মনে হল, এ ব্যাপারে আদৌ তার কোনও উৎসাহ নেই। এই দীর্ঘ বছরগুলো তাকে কী নির্মমভাবে শিক্ষিত করে দিয়েছে। ভাবতে ভাবতেই একটা হাত এসে পড়ে কাঁধের উপর। অনিলের কথা শোনা যায়—'আমি ভাই এখন চলি। আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না। তবে একটা কথা বলি। আমি কিন্তু আপনার সততার কথা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এই মূলধনে কি আপনি বেশি দূর এগোতে পারবেন?'

সত্যি, কৌশিকের পক্ষে আর এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। অনিল যা বলেছে, সেটা খুবই ঠিক। কৌশিকের মননেও একই অভিজ্ঞতার চিহ্ন। আসলে সে বন্দী, যুদ্ধবন্দী। অনেকদিন আগে যুদ্ধ হয়ে গেছে। তার সঙ্গে যুদ্ধের কোনও সম্পর্ক ছিল না। কৌশিকের মনে পড়ে, সত্তর দশকের সেই আন্দোলনের সময় ওর বয়স ছিল খুবই কম। এগারো-বারো বছর হবে। তখন কিছুই বুঝত না। পরে যখন ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে, তখনই মনে হয়েছে, এই আন্দোলন যেন সময়ের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ। অনেক ভুলভ্রান্তি হয়তো আছে। তবু কিছু মানুষ চলমান জীবনের প্রতিবাদ করেছিল. এই ঘটনাটাই যুদ্ধ হিসেবে ভাবতে ওর ভালো লাগত।

অথচ যুদ্ধ অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে। প্রতিবাদী মানুষের পরাজয় ঘটেছে। এখন জীবন স্থির কোনও দেওয়ালের মতো। উত্থানপতনহীন জড় পদার্থ। হয়তো ভীষণ যুদ্ধের পরে এইরকমই হয়। এতদিন বাদে কৌশিক যেন সেই যুদ্ধের কোনও বন্দী সৈনিক। সময় যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে সকলকে। প্রত্যেকেই বন্দী নিজস্ব দুর্গে!

এখন কৌশিক একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে সমস্ত ঘটনাকে লক্ষ করে মনে মনে হেসে ওঠে। এখন কী করার আছে? প্রথমে সম্পাদকের সঙ্গে কথার সময় বন্দিত্বটা বোঝা যায়। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে শুধু সেখানেই নয়, ও চারপাশ থেকেই জালে আটকা পড়েছে। সম্পাদক ওকে কাগজের বাণিজ্যিক বিস্তারের জন্য ব্যবহার করছেন, আবার অনিল ওকে কাগজের লোক মনে করছে। পুলিশ অফিসারের চোখে ও চরমপন্থী, অন্যদিকে বৃদ্ধের ভাষায় একজন সাংবাদিক। হায়! এই অন্ধ-চক্রে ব্যক্তি-কৌশিকের স্থান কোথায়? কৌশিকের যেন নিশ্বাস আটকে আসে। বিশ্বাসহীনতা ও অসংযোগের তীব্র বিষ যেন ক্রমশ ঘিরে ফেলে ওর শরীর মন। তবে কি একজন মানুষের সত্যি কিছুই করার নেই?

ঠিক এই মুহূর্তে, কৌশিক খুব মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছে রাস্তায়। ওর পক্ষে কাজটা করা এখন আর সম্ভব নয়! এটাই সম্পাদকের কাছে গিয়ে বলতে হবে। প্রাণপণে ও নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করছে! কৌশিকের চারপাশে এখন অজস্র মানুষের স্রোত। সেই স্রোতে বল্গাহীন কৌশিক ভেবে চলেছে . আসলে আক্ষরিক বন্দিত্বের থেকে এই বন্দিত্ব আরও অনেক বেশি মারাত্মক। এই কয়েদখানার পরিধি অনেক বিশাল, প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। কেননা, আমাদের মনে এই মোহটা রয়ে যায় যে, আমরা আসলে বন্দী নই। আমরা চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত। আর এই মোহের ফলেই আমরা, সবসময় নিজেদের বন্দী-অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারি না, বা আরও বেশিভাবে ঢুকে যাই নতুন কোনও বন্দিত্বের মধ্যে।

উজ্জ্বল অন্ধমগ্নতায় কৌশিক ধীরে ধীরে এক নতুন চেতনার জগতে প্রবেশ করে। □

ঈশ্বরের মা উল্লাসিনী

অসিত চক্রবর্তী

ধান হে, হে রাজা আমার
আয় হে আমার ঘরে।
সোঁদরপানা কাঠের পিঁড়ি
পেতেছি দুয়ারে হে,
পেতেছি দুয়ারে॥
—প্রাচীন মুন্ডাগান

তখন শ্রীখোল, করতাল আর ভক্তিভাবময় অঙ্গভঙ্গিসহ চিৎকৃত হরিনাম চলছিল। ধুলো উড়ে যাচ্ছিল শনৈঃ শনৈঃ।

মেঘহীন কটকটে নীল অপরিমিত আকাশ আর শীত ছিল মাথার ওপরে, চারপাশে। তিনটে পা ফেললেই সুগোল দ্যুতিময় সূর্য, ছায়ার ভিতর ছিবছিরে শুখানালা, যেখানে জল কষ্টে বয়ে যায়, তৃণভূমি, সরকারি সাঁকো, হিঞ্চে আর স্থলপদ্মের জঙ্গল এবং বিস্তৃত সুবর্ণকান্তি শস্যখেত ছবির মতো অপেক্ষায় ছিল।

উলুদাসী অর্থাৎ উল্লাসিনী দাস্যা, যে এখন সিদ্ধা মা হয়ে গেছে, লাল টুকটুকে পট্টবস্ত্রটি খ্যাংরাকাঠির মতো অবয়বে জড়িয়ে নবনির্মিত মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়ালে চিৎকৃত হরিনাম শত শত গুণ শক্তিশালী হয়ে গগন ভেদ করে। শ্রীখোল বাদকের হাত দুটো চঞ্চল যন্ত্রবৎ।

জনমণ্ডলী বলে, 'মা—মাগো—।'

উল্লাসিনী দাস্যার চোখ মমতাময়ী গাভীর চোখ হয়ে যায়। সজল, যেন বা মেঘমেদুর। ঠ্যাঙে থরথরানি চাপে, আর তারপরে জ্ঞান হারায় সে।

ভক্তমণ্ডলী চেঁচায়। 'সমাধি হয়েছে'— এমন সেই গর্জনের অর্থ। ধুলো উড়ে যায় শনৈঃ শনৈঃ।

ন্যাড়া অশথ গাছটিকে ঘিরে কয়েকটা হাভেতে চাষা আকাশ আর মাটিকে মেপে নিল তখন। সেই গর্জন এই অশথ গাছটির নিষ্পত্র শাখায় প্রশাখায় ধাক্কা দেয়, আর বাতাসে কিছু ক্ষণিক তনুভবন ও ঘনীভবন পর্যায়ক্রমে ঘটে। গোপাল গোলদার জালিকাটা ছায়ার ভিতরে বসে হাত দুটি জোড় করে। কিন্তু বড়ো হাসি আসে, কুচিন্তা আসে। ভগমানের কারবার কুন শালো বোঝে হে অথবা কখন কাকে দয়া হয় এবং কোনভাবে কোথায় তিনি মূর্তিমান হন তা রহস্য।

পটা মিস্তির একটু খোঁচায়, 'বুড়া গোলদার যি ভাবে ডুবে যেলচো গ। উটো তুমার অভিরেমের বিবি।'

লাবু শুধু বলে, 'আপছুচ।'

তখন আর একটি তীব্র শানানো শব্দতরঙ্গ, তার বর্শামুখ বুঝি তাবৎ হাঁটুভাঙা পৃথিবীর দিকে তাক করা, এই হাঁটুভাঙা স্থানটিতেও, তৃণহীন ঘুটিঙে টিবিতে নিক্ষিপ্ত হয়। আছাড় খায়। হা—আ—আ চিৎকার সদ্য কীর্তনভাঙা নৈঃশব্দ্যকে খানখান করে। সেইসব মেটে, থ্যাবড়া চোখগুলোতে অকস্মাৎ কিছু ভেসে উঠে মিলায়। আবার হা—আ—আ আসে, পড়ে, ফাটে।

এই পাকা ধানে একশত চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। এই আটবিঘে বাকুড়ির পাকা ধানে কেউ কাস্তে দিলে তার সাজা হবে। সোমত্ত দয়িতার মতো এই ধান, কামময়ী যুবতী, এখন চাষার হাত, তার সোহাগ,

পীড়ন কামনা করে, আর এই সত্যটি সরকারি নথিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে না। চাষার হাত, আঙুল, কাস্তে টনটনায়। কালো জোব্বা আর লাল শালুতে মোড়া মহকুমার বিচার আপিসে শউরে চ্যাংড়ারা রাজত্ব করে বলে চাষা এবং পূর্ণবয়স্কা ধানগাছের মধ্যেকার আদিম এই সম্পর্ক সেখানে পাত্তা পায় না; আইন-পুস্তকের খুদে অক্ষরগুলোর ধমকানি জোরালো প্রতিপন্ন হয়। অথচ সেই ধমকানি বা আইনিগর্জন ঝাঁক ঝাঁক টিয়া, মাঠ-চড়ুই, গোলা-পায়রাদের এই খেত থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। একশো চুয়াল্লিশতম ধারাটিকে এই পক্ষিকুল চোখ মটকে অমান্য করে, করেই।

গোপাল গোলদার, চিধর দাস, লাবু সেক আব্দেল, ধানু দাস আর পটা মিস্তিরি আপন আপন মাথার চুল ছেঁড়ে, আর হিসাব কষে ক'টা শীষ টিয়াতে কেটে নিয়েছে কতটা ধান কবুতর বা চড়ুইদের পাকস্থলীতে গেল। সেখান থেকে এরকম একটি হিসাবও সহজ হয় যে, এই ধান ঘরের উঠোনতক পৌঁছুলে ভানা-কোটার পরে ফ্যানসুদ্ধু কটা রাখাল বালকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারত, তাতে করে খাঁরদহ নামক চ্যাটালো বিলের শালুক-ঝাড় পরিত্রাণ পেত ক্ষুৎকাতর সব রাখালিয়া আক্রমণ থেকে। রাঘু বা কেওরা নামক সব চাষাবালক বা বুড়ো-হাবড়া রিটেয়ার্ড কোনও চাষা ওই জলে, শালুক ফলের মায়ায় ওই জল গিলে অক্সিজেনবিহনে মরত না হয়তো।

এইসব হিসাবনিকাশ, জৈবিক টানাপোড়েনের দীর্ঘস্থায়ী পর্বতপ্রতিম সব ভার কয়েকটা প্রাণী, তাদের পরিবার—শিশু, হাঁপটানা বুড়ো ইত্যাদিকে কাতর রাখে। হায় হায় টিয়ে, নায়ে ভারা দিয়ে—মানুষের জেবন লিয়ে দুদ্দাড় পালায় গো—আঁ, দেক দিকিনি জানে জান লিয়ে পালাচে। রঘুশাল ধানের ছড়া, তুষসমেত ধান নির্বিবাদে চাষার চোখের সামনে লুঠতরাজ হতে থাকে। অথচ আশ্বাস থাকা উচিৎ : অ হ্ হ্ বাছারে, ঘন্টু আমার, চন্টু আমার, আমার লয়নের লিধি, কাঁদিস নে বাপ—ধান পেকেচে, ধান পেকেচে ইত্যাদি। কেননা দু মাস আগেও উলু দাস্যা, যার ঘরের লোকটি এই জমির নিড়ুনি শেষ করে মরেছে, যার কোলেকাঁখে চারটি নাবাল শিশু, এই খেতটির কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর কে না জানে, কোনও শস্যখেতের দিকে চোখ রেখে কোনও কৃষকরমণী যদি হাত-পা খামচায়, খড়ি ওঠে—ওঠেই। হাত ও পায়ে তা মরা ফানের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়ায়। কৃষকরমণীর গা থেকে উঠে আসা সেই খড়ি-মৃত্তিকা স্পর্শ করলে কেন যে সেখানে আপনা হতে মা লক্ষ্মীর পা আঁকা হয়ে যাবে না, সেটি পরম বিস্ময়। বরং মজা এই যে তা, সেই সাদা জৈব নুন, ঘাম আর পরিশ্রমের উপজাত বস্তুটি উড়ে এসে, যেমন চিরকাল হয়েছে, কাঁখের কেলেমানিকের বসা দুলদুলে চোখে সেঁদোয়। কেলে মানিকটি ভ্যাঁ করে দিল। উলুদাসী সেটিকে খিদের চ্যাঁচানি সমঝায়,—কেননা জন্মইস্তক এরা কেবল খিদে পেলেই চেঁচায়, অন্যথা চেঁচাবার শক্তি থাকে না—এমনি করেই তিনটে কেলেমানিককে ধেড়ে করেছে সে। অতএব, কেলেমানিকের পোঁটাওলা নাকে জাবড়ে চুমু দেয় উলুদাসী, বলে, দ্যাক্ দ্যাক্ বাছা আমার—লয়নের লিধি আমার, কেমন শিষ ফুলোচে দ্যাক্...কিংবা ধানে থোড় আল্চে রে কেল্টু সোনা—আর দেরি লাই রে...। মাত্র তার কটা দিন আগে অভিরেম তার মর্তের মিশন সমাপ্ত করে দেবতার চরণে ফিরে গেছে। সবাইকে বুড়ো আঙুলের ড্যাঙডেঙে কলা দেখিয়ে, শাগরেদদের কাঁধে চড়ে নাচতে নাচতে : যেল্যাম গ পঞ্চজন, যেল্যাম হে দে-বাবু—হেই মা দিগম্বরী নাচো শ্যামা...। অথচ শেষবারের মতো নিড়ুনি দিয়ে এসে, কাদাপাঁক ঘেঁটে এসে—যা তার জীবন এবং সমস্ত কিছু ছিল— এটুস আটাগোলা শুকনো কচুর গেঁড়ের পাউডার সমেত প্যাঁজ-লঙ্কা দিয়ে সাপটে, গুনে তিনবার হিক্কা তুলে সে থির হল যখন, তখন মনে হয়েছিল মেঝে আঁকড়ে ধরে চেঁচাবে সে ঃ যাব না শালা, যা পারিস করগা—যাব না আমি।

এখনও সাঁজাল বিছানাতে মরদ হাতড়ানোর অভ্যাস যায়নি উলুদাসীর এবং গা-গতরে শোক বিদ্যমান। ফলত ওই সান্ত্বনাটি ক্রমে সজল হয়, এই ভুগুটো তুর বাপ করেচে রে সোনা—সি রাজা আমার কত দুখ পেলচে বাবা রে....। তখন তার মুখময় কেলেমানিকের শিকনি, মড়মড়ি। এবং সবশেষে, এই ধান আমার চাল হবে রে—সি আমার এই চাল ব্যাতে দিতে পেল নাকো রে—হে রাজা,... ক্রমে অশ্রু নেমে আসে। কেলেমানিক পুনরায় ভ্যাঁ করে, আর উলুদাসীর মগজে অভিরেমের মৃত্যুদৃশ্যটি পুনরায় চিরে চিরে ঘনায়।

অথচ সেই দৃশ্যটিতে কোনও উলটোপালটা ব্যাপার ছিল না। হাজার হাজার ক্যাংলা নেংটে যেভাবে যায়, যেখানে যায়, অভিরাম দাসের যাওয়া তেমনি অকিঞ্চিৎকর, তেমনি ভুলে যাওয়ার মতো সামান্য।

তা গমন লয়কো। কেবল যাওয়া।

কেবল একটা এঁটো অ্যালুমিনি থালার মতো ফ্যাকাশে একচিলতে মেঘ সেই গরম টান সময়ে ছায়া রেখেছিল। ডিগডিগে তুলসী গাছটির গোড়ায় পুবমুখো মাথা রেখে শয়ান ছিল অভিরেম। তার ধড়ে জান নেই। জান—উকুন-ছারপোকা থেকে বাঘ-সিংগি অবধি যাঁর বিপুল সাম্রাজ্য, যে শরীল গরম রাখে, চোখে দৃষ্টি দেয়—তিনি, তাহা ওই তিনটি হিক্কাতেই কাহিল। তাই উলুদাসীর বুক চাপড়ানি, চিৎকার, যা সহজেই তারা থেকে উদারায় যাতায়াত করছিল, 'হে রাজা আমার কতি যেলি রে' জাতীয় আক্ষেপ এই ঘটনাটিতে কোনও নতুন মাত্রা আনেনি। মাজা বেঁকিয়ে তীব্র সাইরেনসদৃশ তার হাহাকারের মধ্যেও শববাহকেরা বাঁশ কাটার শব্দ করছিল খটাং খটাং। তিনটে বাঁদুরে বাচ্চা—কেননা উলঙ্গ, অস্নাত আর দাঁতে বুনোফলের বিচি ও খোসা, সাত পাঁচ এবং তিন যাদের বয়স—হাঁদা, ভোঁদা ও নোদা কাতর তলপেটে হাত রেখে উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিড়, উলুদাসীর অবস্থা আর বাপ অভিরেমের মরদেহ পর্যবেক্ষণ করছিল! কেবল নোদার বুড়ো আঙুল মুখে থাকে। সেটি সে চোষে। আর সবই স্থির ছিল পটুয়ার ছবির মতো! কেবল লাবু সেখ আবদেল একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজ মৃত্যুর কথা ভাবে। মৃত্যু এই গোষ্ঠীতে সতত বিচরণশীল এক মেষ; সে দাঁতে তৃণ ওপ্টানোর অবহেলায় এই মনুষ্যকুলকে নিকেশ করে। দে-বাবুর ভটভটির মতো দ্রুত অথচ বিস্ময়করভাবে শব্দহীন তার পদসঞ্চার। শুধু কিছু নির্বোধ অশিক্ষিতা মেয়েমানুযের চিল-চিৎকারই এই ঘটনায় সশব্দ ব্যঞ্জনা আনতে পারে, এনে থাকে। আর কিছুবা মুরুব্বি গাঢ় গলায় বলে, যেলি বাপ! তা যা, আমরাও যেচি—হঁয়ে আল্চে আব।

লাবু তখন সেই বাঁকানো শৃঙ্গবিশিষ্ট লালচোখওলা মেষটিকে দেখতে পাচ্ছে। তার জাগতে তখন শুধু জঙ্গুলে গোরস্থান আর শিয়াল আর টাটকা মড়া খাওয়ার খা-খা আনন্দধ্বনি। লাবু তেমন দূরেই থাকে যেমন দূরে সে বরাবর। সে আব্দেল। হেঁদু আর ভেয়েদেল মাঝামাঝি তার জায়গা। কাছে যাওয়াতে ধর্মের নিষেধ আছে। হলে আর মলে সে কাছে যেতে পায় না। নিয়ম। অথচ অভিরেম বেঁচে থাকলে লাবু আদর করে তার পাছায় দুটো লাথি মারতে পারত, বলতে পারত, চ শালো, তুকে আমগেছ্যের শঁসানে গেঢ়ে আসি। তুর বড়ো বাড় বেড়েছে। দেড়ছিলমে কি তুর বাপের ছেলো লিকিনি!

তার কষ্ট হয়। ভাবে, সাড়ে আট বিঘে বাকুড়ি ভুঁইটো লিজ হাতে-পায়ে লিজে দহেচে অভিরেম। খুদায় মালুম-- হেঁদুরা বলে, কাম পুরা না হ্লি মান্ষে ঘুরে আসে। সে একবার জিবরাইলকে দেখতে পায়, একটা ইসরাফিলকে দেখে; ব্যান্ডপার্টির বাজনদারের মতো দেখতে, হাতে বিশাল চোঙওলা শিঙে আছে। এবার তার চোখের গোড়ায় জল। আর তখন রব উঠল, হরিবোল বলহরি। ভাঙা গলায় কে গাইল, শমন দমন হবে রে, বোল হরিবোল...। লাবুর চোখের জল দাড়ির ভেতর ঘামের মতো কিলবিল করছে।

মড়া যখন পাকারাস্তা ধরে ডাং ড্যাং করে এগোচ্ছে, সতেরো মাইল পুবে যেদিকে পুণ্যতোয় ভাগীরথী প্রবহমানা, তার দিকে অভিরেমের মুণ্ডু শুইয়ে রেখে তখন হঠাৎ 'সোনার তরী' নামক পুরোনো মডেলের হর্তেল বর্ণ ভজ বাসটি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল। আদালত আর পারিবারিক গঙ্গাস্নান সেরে বাবু রামজীবন দে-মশায় ফিরছিলেন। ইনি শ্রীশ্রী শ্রীধরজীউজিঠাকুরের পুণ্য সেবাইত। আজকে তাঁর বাসটি যাত্রী বইছে না। এতে তাঁর ব্যবসায়িক লোকসান হলেও জোতদারি প্রেস্টিজ বাঁচে। ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল আর দে-পরিবারের বউবিটি-বাচ্চাকাচ্চা সমেত প্রায় টৈট্‌ম্বর বাসটি হঠাৎ দাঁড়ায় ও জলদ গম্ভীরে দে-বাবু আঙুল উঁচিয়ে শুধোন, কে গেল রে? নবগ্রহকে কবজা রাখার নয়টি রত্ন-আংটি তাঁর পাঁচটি আঙুলে রোদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।

কিছু টেনশন ছিল।

ওই আট বিঘে বাকুড়ি ভূখণ্ডটুকু কাশিমবাজার-মহারাজ রাজা প্রমদারঞ্জন রায়ের কাছ থেকে দে-বাবুর পিতামহ আইন-মোতাবেক গ্রহণ করেছিলেন। তার পাট্টা কবুলিয়ত সনদ ইত্যাদি যাবতীয় অশ্বডিম্বই আছে।

বহাল তবিয়তে আছে। এবং কথা আছে, যে দে-বাবুদের ঘরে ঘুণ ঢোকে না। যাই হোক, সেটি খুব পুরোনো কেচ্ছা। এবং সবাই জানে, এ-কেচ্ছার ল্যাজাও নেই মুড়োও নেই। লোকে বলে, এ হচ্ছে দ্রৌপদী ঠাকরুনের শাড়ি, টানলে বাড়ে। আড়ালের কেষ্টটি নিশ্চয় ঠাকুর শ্রীশ্রী...। যাই হোক বর্তমানে আইন-মোতাবেক বাবু শ্রীরামজীবন ওই ভূখণ্ডের স্বামী। অতএব আইন মোতাবেক তিনি ইচ্ছা মতো ওই ভূখণ্ডটিকে ধর্ষণ করার বা কিছু না করার অধিকারী।

ইদানীং আবার ভোটে ছোটোলোকদের সরকার কলকাতায় বসেছে। সেই মোহে কিনা ছোটোলোকেরা উল্লসিত। 'গতর/লাঙল যার জমি তার' রবে গগন প্রায় ফাটো-ফাটো হয়েছে।

সাবধানের মার নেই—এটি আপ্ত-কথন। শালা, আছোলা বাঁশটি হড়হড়িয়ে ঢুকে যাবে!

অতএব ১৩৪৪ সন থেকে যারা ফসল রুয়েছে, দে-বাবুদিগের গোলায় তুলেছে, গাঁইগুঁই করেনি, তাদের তলব দিয়েছিলেন তিনি। এবং সেখানেই এই কেচ্ছার নতুন টানটি গাঁথা হয়। শ্রীশ্রী শ্রীধরজীউজিঠাকুরের পুণ্য-অঙ্গনে বসে তিনি বলেছিলেন, ইবার তুরা দেড়ছিলমেতে লাঙল দিবি নে। আঁ, বুজলি কিছু?

ওই সাড়ে আট বিঘে বাকুড়িটির নাম দেড়ছিলমে। লটকনপুর মৌজা, দাগ নং ২২৭। তৌজি নং ৫/৭। খতিয়ান নং ১৭। কথিত আছে, রামজীবন দে-মহাশয়ের স্বর্গত পিতামহ, যিনি ন্যাবাকত্তা নামে পরিচিত ছিলেন, লেবুবিহারী দে কাশিমবাজারের সেজো তরফকে স্বহস্তে প্রস্তুত দেড়ছিলিম গাঁজা খাইয়ে ওই ভূমিখণ্ড বকশিশ পান এবং কালক্রমে জমিদারি ও শ্রীশ্রী শ্রীধরজীউজিঠাকুরের এলাকা পত্তন করেন। অতএব মানসম্ভ্রম সবই ওই ভূখণ্ডে ন্যস্ত। ওটি বড়ো পয়া।

তিনি পুনরায় গোঁফে তা দেন। নাভি থেকে উদগাবের মতো আওয়াজ তুলে বলেন, 'হ বোজলি, ইবার দেড়ছিলমেতে তুরা লাঙল দিবিনে, দিবিনে কো। লে, কিরে কেটে লে ঠাকুরের ছামনে।' এতদঞ্চলে ঠাকুরটি বড়ো প্রতাপশালী এবং প্রভাব বহুদূর ব্যাপ্ত। গোপাল গোলদার, চিধর দাস, লাবু সেক আবদেল, অভিরেম দাস প্রমুখের সামনে ঠাকুরের স্বর্ণকান্তি মুরলী প্রতিভাত হয়। সেটি ওষ্ঠে ছোঁয়ান। যেন এখনই উঠবে স্বর্গীয় ধ্বনি, এমত মুদ্রায় স্থাপিত সেই বাঁশি। গোপাল গোলদাব ভ্যাবলাকান্তের মতো শ্রীশ্রী শ্রীধর ঠাকুরের চোখে চোখ রাখে। লাবু সেক একটি রাম চিমটি দেয় গোলদারের মাজায়। গোপাল গেঁজলা তুলে বলে, বাবু—বাবু—অ—অ—বাবো—হ—এহে...।

—হ হ, হে হে করিস কেনে, লে—উঠ্যায়, চাতালে হাত দে!

বাবুর পোষা আক্কেল মিয়া আবাব লাঠি আফসিয়ে হুকুম করে, 'লে, উঠ্যায়, উঠ্যায়।'

চিধর-অভিরেম-ধানু-লাবু গোপাল কঁ কঁ করে প্রসবকাতরা মুরগির মতো। প্রেমের ঠাকুর বাঁশিটি বাজান যেন।

—লে—উঠ্যায়—আক্কেল গুডুম করে আবার। তারা চিত।

মুরগির জান তাদের। পাকস্থলী অপূর্ণ থাকে বলে ঠিক ঠিক সময়ে সাহস গজায় না। অতএব, আবার উপুড় হয়ে ছাগবৎসেব মতো তারা এগোয়। দৈবচক্ষুতে তখন রামজীবন দে মহাশয়ের শতাধিক হাত, লাখখানেক মগজওলা মাথা আর অসুরসদৃশ গোঁফ দ্যাখে তারা। ভয় খায়।

জন্মাবধি এই মনুষ্যপুঙ্গবেরা ধেড়িয়ে এসেছে। এবং সমস্ত কলজেচোপসানো পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে এদেরই ওপরে। ভয় এদের সম্মোহিত রাখে।

পুটপুটু নেত্রে এরা পরস্পরকে মাপছিল। মুখে বাক্যি ছিল না কারও। মন্দিরের চাতাল, ঠাকুরের গভীর আয়ত চক্ষু টানে।

—তুই কিব্যা, আবদেলের ছা, তু এগুস কুথা? হঃ—রামজীবন আঙুল তুলেছেন।

লাবু থমকায়; কিছু বলতে গিয়ে দেখে—চাতালে বসে আক্কেল মিয়া মিটিমিটি হাসছে। লাবু বলে, হুই—মিয়াছাব।'

সেবাইত আঙুল তুলেই বলেন, 'চোপ।' তিনি কদাপি জোরে কথা বলেন না। ভক্ত মানুষ। তবু তার প্রতিটি উচ্চারণে ধার থাকে, ভার থাকে। এবং তা প্রকৃতই চাষা-ডরানো।

অতএব হেঁদুর বাচ্চারা চাতালে হাত দেয় এবং কিরে কেটে ফেলে নির্দেশমাফিক।

আক্কেল মিয়াছাব আবার গুড়ুম করে, 'লাবু—তু পচ্চিমমুকো দাঁড়ো আল্লা মেহেরবানের কাছে কছম খা।

লাবু দৃশ্যত তাই করে। —আমাকে গোরে লে আল্লা, তুর বাপের কছম...।

তখন সুউচ্চ সেই মন্দিরশীর্ষে স্থাপিত লোহার সুদর্শন চক্রে বাঁধা লাল রেশমি পতাকা উড্ডীন। সেই ছন্দে বিজয়ের গর্ব নিহিত। সুপবন বহিতেছে।

কিন্তু কাড়ান এলে সেই পবন বেমক্কা দিক পালটেছিল।

খিদের টান কপ করে আস্ত মানুষকে গিলে ফেলে, আর যখন উগরে দেয় তখন সে সাধারণ মনিষ্যি থাকে না। তেমন টানের আকাশপাতাল-উথলানো ইঙ্গিত ওই হাঁটুভাঙা লোকেদের, পরিবার পরিজনের গোরে-যাওয়া চোখের ডাঙালে ভাসমান ছিল। স্মৃতি ছিল বিষময় ভাদর-আশিনের স্মৃতি। মানকচু, কলমি, শামুক, গুগলি, মাঠ-কাঁকড়া ইত্যাদির জান্তব অনুষঙ্গসহ সেই স্মৃতি চাবুক কষাচ্ছিল পলকা হাড়-চামড়াগুলিতে। প্রাচীন, টনটনে স্মৃতি।

তুমি শালোরা ঠাকুরের ছামনে কিরে কেটে আল্‌চো। শালোরা নাংলা চাষা। ভুঙে নাঙল দেবা না। হে বাবা চিধর, ধম্মের ঠাকুর—তুমাকে গড় করি হে। ই শালোরা ইবার শঁসানে যাবে! ইরা সবাই মাগি হে, লা-মরদ! ওহে শালোরা, আমগেছ্যের শিয়েল তুদিকে খাবে। তুদের বেনাঝাড়ে জল দিতে কেউ থাকবে লা।

এরকম সব কাতরতা-রাগ-ক্ষোভ-স্বীকারোক্তি এবং যাবতীয় সম্ভব অসম্ভব প্রতিক্রিয়ার মিশেলে শেষতক বজ্রটি উত্তোলিত। ওঠে।

—আমি আবদেলের ছা—তুমাদের ঠাকুরকে দূব হতে ছালাম দিই। আমি যাবো হে....

—লাবু, তু পচ্চিমমুকো....

—থোও গ। আমার মাগ রাস্তায় কাপড় তুলবে—ইর চেঁয়ে—হি খুদা, আমার জানের জান, বেহেস্তের লৌকো—তুমাকে ছালাম; আমি দেড়ছিলমেতে নাঙল দোবো হে।

এইভাবে শ্রীধর-নির্দিষ্ট সুপবন দিকভ্রষ্ট হয়েছিল। জলে-কাদায়-ফালের আঁচড়ে, আশ্লেষে সদ্য ঋতুস্নাতা ধরিত্রী আটটি চাষাব গতবের বলশালী আক্রমণে এবারও বিমর্দিতা হয়। তৃপ্তি পায়। তৃপ্তি দেয়।

খবর শুনে একটি মাত্র তুড়িলাফ দিয়েছিলেন শ্রীযুক্তবাবু রামজীবন দে। অথচ এটি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। খবর আছে, নিজের ওপর কন্ট্রোল লুজ করায় তিনি নিজের ওপরেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, ধিক্! আমার কি ভীমরতি হল?

অবশ্য ত্বরিত সামলে ওঠেন তিনি। আর, আক্কেল মিয়াছাব এবং পাক্কা পাঁচগণ্ডা সাঙ্গোপাঙ্গসহ হাঁকুপাঁকু দৌড়ে মাঠ পেরন, লস্করদিঘি পেরন, দুধিয়ার চঠান ছাড়িয়ে এসে গ্রামটির সীমান্তে তৃপ্তা দেড়ছিলমেকে দেখেন। অন্তরে ডুকরান তিনি। আর বাহ্যত ভান করেন কিছুই হয়নি, বলেন, হিঃ। তারপর লুণ্ঠিত জোতদাবি প্রেস্টিজের প্রতি একগাছি গাঁদার মালা শহিদবেদিতে নিক্ষেপের কায়দায় ছুড়ে দিয়েছিলেন! আক্কেল দেড়ছিলমেতে পোস্টেড হয়। আর, আক্কেল মিয়াছাব সেই মালিকা।

আক্কেলবাহিনী কুক দেয়। বল্লমে সর্ষপ তৈল মর্দন করে। ল্যাঙোট পরিহিত অবস্থায় শারীরিক কসরত অভ্যাস করে। বিড়ি খায়। এইসব দিনভর চলে! দেড়ছিলমের কাদাগোলা জল থিতোয়। তিনদিনে কাকচক্ষু হয়ে যায়। কয়েকটা বোথো ঘাস গর্দান তোলে। সেটি বাতাসে দুলছিল।

পঞ্চম দিনে আকাশে মেঘ। এ কারণে সকালবেলাটি ছানিপড়া চোখের মতো ঘোলা। চারপাশ সুনসান, যেন হাওয়া বাতাসও শিস দিয়ে উঠবে। আর কী গন্ডগোল! সকালবেলা আক্কেল এবং তার বাহিনী দেড়ছিলমের আলে পৌঁছে কুক দিতে ভুলে গেল। দে দৌড়! শ্রীশ্রী শ্রীধর মন্দিরের চূড়ামুখো চোখ রেখে সোজা পিঠটান! কেননা, সাড়ে আট বিঘে মাটি জুড়ে রোগা বিবর্ণ হাজার হাজার লাইন-বন্দি ধান গাছ লেঠেল মরদের মতো বুক চিতিয়ে খাড়া।

'বাঞ্চোতদের শির লে আও', 'তেরে মেরে ডান্ডা করে দাও ঠান্ডা' কিংবা 'ওই পোঁতা ধানে মই চালাও হে'-জাতীয় গর্জন প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাবু বড়ো গুম হয়ে এ খবর শোনেন ও 'জয় জয় বাবা শ্রীধর'

হেঁকে উঠে ধীর গলায় বলেন, 'তু শালোদিকে বুলল্যাম রাতদিন কামাই দিবি নে কো। কাঁড় সাপের জাত—ফাঁক পেলে গলগলিয়ে সেঁদোয়।' তখন মুহূর্তটি বাত্যাতাড়িত। আর জোতদারি প্রেস্টিজ ব্যবসায়বুদ্ধির প্রাবল্যে ভূমিলগ্ন হয়েছে। আহা পুঁতেছে। অবলার জাত। কেষ্টর জীব। আহা রে। পাকুক। পক্ক হোক। তখন সেরেফ হাতটি বুলিয়ে আনলেই—এখন মাটির রস খাক, গাভিন হোক, বিয়োক—তখন না হয় রাতারাতি। থোড় থোড় ধান....হ্ হ্ হ্...।

আশায় বুক বাঁধেন তিনি। অবশ্য গুজব কানে আসে, টেঁটিয়া চাষারা রাতের জ্যোৎস্নায় জমি নিড়েন দিচ্ছে। আশপাশের গাঁয়ের চাষাগুলোন তাতে মদত জোগায়, তারা দল জুটিয়ে মাঠে নামছে। একটু ভড়কান তিনি অবশ্য, যখন শোনেন যে আক্কেল-বাহিনীর দাপট গ্রামাঞ্চল থেকে দ্রুত অপস্রিয়মাণ। তিনি প্রকৃতই চিন্তায় পড়ে যান। আর, গোপাল-ধানু-অভিরেম ইত্যাদিদের উদ্দেশে খিস্তি করেন, 'শালোদের তলহাতে রঁ গজাল্‌চে ইবার...পিঁপিড়ার পাখা হয়...ছাড়ব না হে, তুমাদিগে ছাড়ব না আমি।'

তাই টেনশন ছিল।

তাই 'সোনার তরী'র জানালা থেকে মুণ্ডু গলিয়ে তিনি যখন বলেন, 'কে গেল রে?' কেউ উত্তর দেয় না। মড়া এগোয় ড্যাং ড্যাং করে। রামজীবনবাবুর রত্ন-আংটিসহ ডান হাত, আঙুলগুলি আর আংটির শোভা হর্তেল পটভূমিতে দোল খায়। মড়া ড্যাং ড্যাং করে এগোয়। পিলে ফাটিয়ে চেঁচায় শববাহকেরা, বলহরি হরিবোল।

প্রায় দলছুট হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল লাবু। তার কাঁধে লাঠি। লাঠির ডগায় জংওলা হেরিকেন। তার কটাস দাড়ি বেউলো বাতাসে দোলে। তার একঘেয়ে ভাবনায় মৃত্যুরূপী সেই মেষ, তার পাকানো শিং, দোজখ, বেহেস্ত, লা ইলাহা...রাজেউন প্রভৃতি ছিল। এ শরীর মাটিতে গড়া, আবার মাটিতে ফিরে যায়।

দে-বাবু দলছুট লাবুকে পাকড়াও করেন, শুধোন, 'কে গেল রে—হ লাবু।' লাবু আকাশ দেখে। সে যেন জিকির দিয়ে উঠবে : হ কত্তা, তুমার ঠাকুরের চরণে গড় করি। তুমার দেড়ছিলমে চযে আমরা খাই! তুমাকে ডর লাগে, বাবো। বাবো হে, তুমার আক্কেল মিয়াছাবকে ডরাই। তবে কিনা ধরিত্তির হলো গে বেউশ্যে মিয়ে—যি মরদের বিছেনায় থাকে তার, আর কিনা গায়ে একটুন জোর লাগে।

'ভ্যাঁপ—পোঁ-পোঁ' করে সোনার তরীটি গাঙিয়ে উঠল আর দে-বাবু গাঙিয়ে উঠলেন, 'হ লাবু—কে যায়?'

লাবু সেক আবদেলের হলুদ পিঁচুটি-সাঁটা চোখ বাবুর চোখে আটকে গেছে, জি—অভিরেম।

আদালত ও গঙ্গাফেরত দে মশায় চোখে জল এনে ফেললেন, হরিবোল, হরি হরি বোল: বড়্ডো ভাল্‌মানুষ ছেল গো। তারা, তারা মা গো।'

হর্তেল-বর্ণ বাসটি পেছন দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে; বাবুর হাঁক শোনা যায়, 'শ্রীধর হে জয় বাবা শ্রীধর।'

মাথার ওপরে কাঁটাওলা বাবলাগাছের ছায়া, বাঁ থেকে ডাইনে মাটির বুক ঘষটে চলে গেছে দিগন্তপ্রসারী পিচ রোড। সেখানে খাটুলিটি নামানো। সেখানে অভিরেম শয়ান। শববাহকেরা গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছে। বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। লাবু পৌঁছাতে ঘেমোঠোঁটে গোপাল বলে, 'কী শুদোয় ব্যা?'

লাবু বলে, 'কে যায়? মানে কুন শালো যেল।'

ধানু নিশ্বেস ছাড়ে, 'হ।'

লাবু বলে, 'পেরায় কেঁদে ফেলালে, হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলালে, জিগির দিঁয়ে উঠল, বড়্ডো ভাল্‌মানুষ ছেল গো।'

ধানু-গোপাল ও পটা : তাই লিকিনি, আঁ—ভাল্‌মানুষ ছেল? তুমার ভাল্‌মানুষের লেগে ঝাড়ের বাঁশটি গছাও। বড়্ডো ভাল্‌মানুষ ছেল! উরিঃ শালো অভিরেম, তু শালো শুনে লে কানটো ফাঁক করে। সেবাইত সাটিপিটি দ্যায় রি।

আবার মড়া এগোয়। যে দিকে শ্মশানভূমি, আগুন আর লাঠি যেখানে নৃত্য করে, মানুষকে ছাই বানায়; মানুষকে ছাই বানিয়ে মানুষেরা যেখানে থেকে কাঠ হয়ে ফিরে আসে।

তারপর কয়েকটা দিন সবে কেটেছে। মাথার ওপরে সূর্য জগজগ করছিল। উলুদাসী কেলেমানিকটিকে বুকের খাঁজে পুরে নিয়ে চকচকে চোখে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, 'কাঁদিস নে বাপ, 'কাঁদিস নে বাপ—ধানে থোড় এসেচে রে, ধানে দুধ গিলচে বাপ। বিবিটো মাঠ-কাঁকড়ার খোঁজে লু-ভাসানি মাঠে ঘুরতে গেছে, লাবু আবদেল কাঠকুটোতে আগুন জ্বেলে মেটে আলু সেদ্ধ করছিল আর গুনগুন করে গান গাইছিল—

লদীই হড়পা বান এল।
লদীই হড়পা বান এল, তুর কাপড় যেল ভিজে
অ বিবিজান—লদীই হড়পা বান এল।—

গোপাল গোলদারের ছোটো মেয়ে তিনুর (ত্রিনয়নী) বিয়োনোর বেদনা উঠেছে। গোপাল বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দাই, দেড় সের চাল, দেড়টি টাকা ও একটি ফ্যারানির ভাবনা করছিল। এমন সময় ডিম ডিম ডংকা ডংকা শব্দে বাজনা বাজে। পটা মিস্তিরি পটাং করে উঠে বসে, বউকে বলে, 'বেমলিরে—উরিঃ শালোরা আল্‌চে।' বলেই দৌড়ায়।

ছায়াহীন সেই মাঠ। দিঘির রুখা কাঁকুরে পাড় নিম্নমুখী হয়ে সবুজে হুমড়ে পড়েছে। একটা নিষ্পত্র, ছালচামড়া খোওয়ানো অশথ এই বেতরিবত দৃশ্য দেখে প্রেতের মতো দাঁড়ানো। সে মিটিমিটি হাসছে। দিঘিটি থির।

'দিঘির বিপরীতে দেড়ছিলমে। তারা সেটির চারদিকে ঘুরছিল। তাদের কাঁধে ডঙ্কা, হাতে নিশান। এই ভূমিখণ্ডে জোতদারি প্রেস্টিজ আর ভবিষ্যৎ ন্যস্ত। আক্কেল মিআছাব সদলবলে পেশি দোলায়, লাঠি দোলায়, আর সেই পেশিবহুল ছন্দে বিরতিহীন ডিডিম ডিডিম ডংকা ডংকা শব্দে আদালতের কঠিন ডংকা মাঠে, ফসলে, দিঘিতে, নেংটেদের রক্তে প্রতিধ্বনিত হয়—ডিডিমডিডিম ডংকাডংকা।

আক্কেল লাঠি তোলে, আর গলায় শিরতোলা বাজনদারটি থামে! তক্ষুনি তার থেকে আরও বেশি উঁচু করে গলার শির তুলে দেয় আরও জ্যালজেলে একটা মানুষ। আকাটা দাড়ি আর ফাটা কলারে তাকে মনে হয় কবন্ধ। এরকম অতিশয় সস্তা কায়দায় আদালত ঘোষণা দেয় : দেড়ছিলমে নেংটেদের লয়কো—উটো হাকিমের। যি শালো দেড়ছিলমেতে নামবে, তাকে অমুকচন্দ্র অমুক আইনে অমুকচন্দ্র অমুক শাস্তি...চ শালোরা কোয্‌যাবি চ।

কবন্ধটি কিম্ভূতরকমভাবে হাত পা নাড়াচ্ছিল, চো শালোরা—তুদিকে পগার পার করব। চো—।

সকলই ভাঙাচোরা। আদালত পল্লিটিকে চক্কর দিচ্ছিল। সকল গৃহ, বৃক্ষ কিংবা তরুলতা নগরের সংবাদপত্রে ছাপা ক্লিষ্ট-বাংলার যেন ছবি। সকলই ভাঙাচোরা। আদালত সেই ক্লিষ্ট পল্লিটিতে গু-মুত এড়িয়ে এড়িয়ে চক্কর দিচ্ছিল আর তেমাথায়, চৌমাথায় ঘোষণাটিকে রেখে যাচ্ছিল : অমুকচন্দ্র অমুক আইনে...।

হীনবল চাষাগুলান বড়ো ভেতরলাগ হয়েছে। খুব ভেতরলাগ হয়েছে এরা। চক্ষু ঘোঁচ করে সব দেখছে আর আকাশপাতাল ভাবছে। উলুদাসী শুধু বুকের কাপড় ফেলে সেখানে কিল মারে আর বলে, 'হে রাজা আমার কতি যেলি রে—তুর দেড়ছিলমে হাকিম লিলে রে—তু কেনে নিড়েন দিঁয়ে মরি যেলি রে, হো রাজা...।' তখন সে জলস্তম্ভের মতো পাক দিয়ে দিয়ে দিয়ে ঘুরছিল।

আশপাশের গ্রামগুলিতে, পল্লিসমূহে এই বার্তা রটে যায় ক্রমে। তাদের মগজে ছিল শুধু আরও সেইরকম একটি জ্যোৎস্নালোকিত রাতের ভাবনা। দেড়শোটি কাস্তে পাঁচঘণ্টা শ্রমদান করে তুলে আনবে ধান, সেরকম একটি জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। কিন্তু এখন? সকলে ডরায়। আদালত হচ্ছে ভগবানের মতো। নিরাবয়ব অথচ সর্বত্র বিদ্যমান। দ্বীপান্তর থেকে দীর্ঘতম মেয়াদ তার মুষ্টিতে। আর পুলিশ,—'হে বাবা ঠাকুর চিধর, তুমাকে গড় করি।'

তারপরও দিন কাটে। গোনা গোনা দশ দিন। চাঁদ ক্ষয় হয়ে হয়ে যায়। হাঁটি হাঁটি পা পা ভঙ্গিতে অমাবস্যা এল। শিশির-পাতের শব্দ, দিঘির জল-ছলাৎ আর ঝিঁঝিঁ নাচাং—ঝিঁঝিঁ নাচাং ধ্বনিতে জলরতঙ্গ-পোকার টানা বিরামহীন অর্কেস্ট্রা সেই রজনীটিকে ঘোরা, প্রবলা এক উন্মাদিনীর চেহারা দিয়েছে।

উলুদাসীর খাঁরদহ্ বিলের মতো চ্যাটালো বুকের ওপর কেলেমানিকটি সারারাত্রি ছটফট করে কাঁদে। খিদেয় নয়, যথেষ্ট গিলেছে সে। ডিঙ্গলের ঘেঁট সহযোগে যথেষ্ট খুদের জাউ আর দীর্ঘ সময় ধরে উলুদাসীর মাই চুষেছে। বোঁটা কামড়েছে যেন ছিঁড়ে নেবে। তবু উলু ভাবে, ছেল্যাটোর বড় খিদ্যা গ, বড় খিদ্যা। তাই উলুদাসী মন্ত্রের মতো 'ধানে দুধ এসেচে—ধানে থোড় গিলেচে' সান্ত্বনা দেয় ও সান্ত্বনা পেতে পেতে ঘুমোয়। তবু সে রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ছিঁড়ে গিয়েছিল। ছেল্যাটো কাঁদে কেনে গ।

সকালে ব্যাপারটি অন্যরকম, ভয়াল ও প্রায়-অলৌকিক। কেলেমানিকের মাথার চামড়া ঠেলে এসেছে। উঁচু, কেতরানো। লালা গড়িয়ে আসে পাতলা ফাটা ঠোঁট থেকে। চোখ যেন অস্বাভাবিক; পেতলের পিলসুজের মতো দীপ্যমান। আর কাঁদে না সে। কচি হাড়গোড়ের বুক নির্জীব হাপরের মতো দোলে। টাটকা গজানো একটি বৃহদাকায় অর্বুদকে ঘিরে একটি কালো রেখার রং ক্রমে ঘন হচ্ছে।

উলুদাসী হতভম্ব। ঘন্টু আমার, চন্টু আমার বলে আদরে আপ্লুত টানে ঠোঁটে স্তনবৃন্ত ঠুসে দেয়; মৃত স্বামীর জন্যে একটু শোককাতরা হয়। মানিকের আমার কী হল গ, আঁ—কী হল? হো রাজা আমার কতি যেলি রে—। ঘন্টু একটুক্ষণ পরে হিক্কা তোলে; হাত-পা ছোড়ে। উলু ওঠে। তার শরীর জুড়ে ঘন আলস্য। তবু হাঁদা-ভোঁদা-নোদার সামনে মেটে হাঁড়িটি খুদের জাউসমেত নামিয়ে দিয়ে উলুদাসী মাঠ-কাঁকড়া ও কলমির সন্ধানে বেরয়।

ঘটনাক্রমে. সেই রাত্রিতেই দে-বাবুর শ্রীধর মন্দিরের অন্দরমহল থেকে শ্রীধর-মূর্তির রহস্যজনক অন্তর্ধান ঘটে যায়। কিন্তু প্রভুর সোনার স্নানপাত্র, রুপোর খাট খোওয়া যায় না। ফলে এই অন্তর্ধান হই হই ফেলে। গ্রামবাসীরা বিহ্বল। নানান গবেষণা চলতে থাকে। 'পাপপুরী ত্যজিয়া কি দেব চলি গেলা উল্লসিরা ভক্তের সকাশে'—'নরকাসুর' যাত্রাপালা থেকে এরকম কোটেশন দিয়ে আক্ষেপ করে খ্যাপা শ্যামচাঁদ। সে গ্রাম-দেবতার পূজারি, ন্যালাখ্যাপা। লোকে তাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, তবু সর্বব্যাপারে তার মতামত থাকে। তাব ভাবভঙ্গি এমন যেন সে সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

পরদিন বিকেল নাগাদ রামজীবনের জরুরি তলবে সাত মাইল দূরের থানা আপিস থেকে একজন এ এস-আই ও দুজন কনস্টেবল দেবমূর্তির অন্তর্ধান নিয়ে তদন্তে আসে। গ্রামটিতে জোর তল্লাশি চলে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার মুখে কনস্টেবল ভুখা সিং কারও কাছে শ্যামচাঁদের কোটেশনটি শোনে ও খেনি ডলতে ডলতে জিগ্যেস করে, 'উল্লসিয়া কৌন আছে?'

এইখানে ঘটনাটি মোড় নেয়। উল্লসিয়া থেকে উল্লাসিনী, উলু, কেলেমানিক এবং কেলেমানিকের সদাস্ফীত মাথায় পৌঁছে যাওয়া গেল সহজেই। থানাবাবু ফিল্ড ইনভেস্টিগেশনে আসেন। তাঁর বিজ্ঞ চোখের সামনেই অর্বুদটিকে চক্রাকারে ঘিরে থাকা জাম রং রেখাটির দিকে আঙুল তোলে শ্যামচাঁদ, চিৎকার দেয়, ওই তো ওই শিখী পাখা! চিৎকার দিয়েই তক্ষুনি সে কেলেমানিকের সামনে সাষ্টাঙ্গ। ঘটনাটি পুনর্বার মোড় নিল।

সহজেই এস্টাবলিশড্ হয় যে একরাত্রিতে মাথা ফুলে ওঠা অলৌকিক। উটো আব্ লয়কো। প্রভুর অন্তর্ধান ও নির্যাতিতা উল্লাসিনী দাস্যার সন্তানের এই মাথা ফুলে ওঠা নিশ্চয় নিকট সম্পর্কযুক্ত। অন্ত্যজ এই শিশুকে ন্যালাখ্যাপা শ্যামচাঁদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন সমস্ত ঘটনাটিতে এক মহিমময় ঐশ্বর্য আরোপ করে। শ্যামচাঁদ একজন প্রকৃত ঈশ্বরসন্ধানী প্রাজ্ঞ ভক্ততে আর উলুদাসীর কেলেমানিক বা ঘন্টু বা চন্টু বা লয়নের লিধি শ্রীধরে বা ঈশ্বরে রূপান্তরিত হলে দেড়ছিলমের উত্তাপ থিতোয়। দেড়ছিলেম গরম ছিল, এই ঘটনা অধিকতর গরম। তাপ অধিকতর গরম বস্তু হইতে ঠান্ডা বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়—এই বৈজ্ঞানিক নিরিখ উলটো পায়ে হাঁটছে। দেড়ছিলমের সমস্ত উত্তাপ ঈশ্বরের দিকে ধাবিত!

উল্লাসিনী বিবশা। কেননা, কেলেমানিক এখন সিন্দুর-চন্দনে, ঘৃতকুসুমে অলৌকিক! উলুর চেতন ও অবচেতন ধারণাসমূহে ব্যাপক এক ধাক্কা কার্যকরী হয়ে গেছে। সে বুঝতে বাধ্য হয় যে, তার কেলেমানিক প্রকৃতই শ্রীশ্রী শ্রীধরজীউজিঠাকুর! বিশেষত ওই নামাবলিটি—ওই কাজললেপা দুটি ড্যাবা চোখ—। সে ভুলে যেতে থাকে, কবে এই শিশুকে সে গর্ভে ধরেছিল; গর্ভবাসকালীন সে কেমন করে লাথি কষাত তার পেটে। সে ঈশ্বরের মা—এরকম এক বিশ্বাস তাকে নবতর এক শান্তি দেয়। শান্তির ঘোরের ভিতর ডুবে ডুবে, হেঁজে হেঁজে, কঁকিয়ে কঁকিয়ে সে ঈশ্বরের মা হতে থাকে।

তৃতীয় দিনে উলুদাসী তার খাটো গামছাটি পরে খাঁরদহ বিল থেকে ফিরছিল। স্মৃতিতে ছিল অভিরেম ঘেমো গতরে, ছিল দেড়ছিলমের সবুজ ধানের দৃশ্য, কোঁচড়ে ছিল হাঁদা-ভোঁদা-নোদার মুখ ভেবে তুলে আনা শালুক আর গুগলির রাশ। শ্যামচাঁদ তাকে মাঝপথে থামিয়ে এক রামধমক দেয়। সে এখন এই মঞ্চে হাজির। যেহেতু ইতিমধ্যে পাঁচজন পুণ্যার্থী নরনারীর দূর দূর গ্রাম থেকে হেঁটে কেলেঠাকুর সন্দর্শনে এসেছে কত জল ও কাদা পেরিয়ে, এই খাটো গামছায় শালুক ও গুগলি কোঁচড়ে ঈশ্বরের মা কী করে দেখা দিতে পারে! শ্যামচাঁদের গাঁজা খাওয়া চোখ গুল্লি গুল্লি হয়েছে, তা-তে খুব রাগ ও বিরক্তি।

অতএব, সঙ্কুচিতা হয় উলু। লাউমাচার পিছনে দাঁড়িয়ে শ্যামচাঁদের আনা একটি পাটের শাড়ি পরে নেয়। শালুকতোলা ভিজে চুল পিঠে এলানো ছিল। সে ঈশ্বরের মা।

কেলেমানিককে কোলে নিয়ে সে বসে। জবাফুল, বেলপাতা, বাতাসা, ঘি, গলগল করে ওতলানো ধূপদানি। সে দেখে কেলেমানিকের নাক দিয়ে একটু যেন শিকনি। হাত দিয়ে সে তা মুছে নিতে পারে না। হাতটি অসাড়। তখন তো সে সিদ্ধা মা। ভোঁ ভোঁ শব্দে শঙ্খধনি হল। সমবেত নরনারী 'হে বাবা ঠাকুর' বলে জয়ধ্বনি দিয়েছে। উল্লাসিনীর স্তন চুঁইয়ে তবু ধারা নেমে আসতে চাইছে। সে তাকে রোখে। সে পাষাণ। সে ঈশ্বরের মা।

চাঁচাছোলা উঠোনটি গোবর ছড়ায় লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠল। সিধে আসে, দু-চারটি প্রণামী মুদ্রা আসে। বিধবা উল্লাসিনী চওড়া লালপাড় গরদ প্রণামী পায় মামলাজেতা ভগীরথ সাঁপুই-এর গিন্নির কাছ থেকে। কেলেমানিক পুজো পেতে থাকে শ্যামচাঁদ বাগীশের হাতে। আর দিন দিন স্ফীত হতে থাকে তার মাথা। ক্রমে বুনো ওলের সাইজ পায়। কদাকার-বাঁকাতেয়া। কেলেমানিক কাঁদে না আর। মোটেও কাঁদে না। সে গম্ভীর।

হাঁদা-ভোদা-নোদা এই তিন বালক ক্রমে মাতৃহারা হয়। তারা কিন্তু স্নেহচ্যুত হয়নি। পাইকারি স্নেহ তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। তারাও তো ঈশ্বরের সহোদর। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর মইটি ঠিকঠাক সেঁটে যেতেও তো পারে যদি এই বালকেরা হাত লাগায়!

উল্লাসিনী মায়ের সময়ের বড়ো অভাব। তবু সে কখনও-সখনও অবরে-সবরে শুধোয়, 'ভোঁদা খেঁইচিস?'

—হুঁ।

—হাঁদা, লোতুন পেন্টুল কতি পেলি রে?

—গোবর মোড়ল দিলে যি—হুই যিদিন পুজো দিলে।

এ সবের মধ্যেই এক ফল্গু বয়। বুক থেকে বয়ে আসে উল্লাসিনীর। উলুদাসী প্রকাশিত হয়। উলু!

ঠান্ডা হিম হাওয়া বয়ে যায় সেই গ্রামটিতে। সেই অন্ত্যজ পল্লির সকল ভাঙাচোরা পাঁজর ও কনুইয়ের ফাঁক বেয়ে সেই হাওয়া আকাশজোড়া হৈমন্তিক শস্যক্ষেত্রে নামে। নাচে কেমন এক গাঢ় অপরিচিত এক বর্ণাভা মাঠময়। হাওয়া ছোঁয় আর পুষ্ট হতে থাকে দেড়ছিলমের ধান। মাঠ জুড়ে পরিপূর্ণতার ছায়া নামে। তার ছবি ধরা যায় না। শুধু সেই ধান ছুঁলে গা শিরশির করে. মন আচ্ছন্ন হয়। মাটি, খেত, তাবৎ মেঠো প্রাণিকুল এখন আচ্ছন্নতা নিয়ে বসে আছে। আকাশের আলো খেতের ভেতরে আবছায়া দিয়েছে, নীলচে ফড়িংয়ের ডানায় দীপ্তি। সেই হাওয়া—ঠান্ডা আর হিম—কেমন মায়ায় লেপটে পাখপাখালি ও পোকামাকড়ের সংসারে গান গায় গুনগুন গুনগুন।

লাবু, পটা, চিধর, গোপাল বা ধানু সেই সুবাস, সেই গান, সেই আচ্ছন্নতাবোধে আক্রান্ত। পেট কোলে তারা ঘুরে বেড়ায়। ঘাম নুন মেখে তারা ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় আর মগজে ঝিঁঝি পোকা ডাকে।

হঠাৎ একদিন মরা চোখ তুলে তারা দেখল নাচতে নাচতে একটা শোভাযাত্রা এগোচ্ছে। ধান পাকেনি। এখনও একটি মাস শিশির গিলবে এই ধান। শালোরা কি কাঁচাধানই কেটে লেবে লিকিনি? মাঠ ভেঙে, লস্করদিঘির পাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ডিডিম ডিডিম ডংকা ডংকা শব্দে ঢোলকের উল্লাস বাজছে। আঁ, শালোরা কিরকম দেকদিনি! সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে রামজীবনের কনিষ্ঠপুত্র নিমাইজীবন। সে মট্‌কার ধুতিতে মালকোঁচা মেরেছে। সদ্যস্নাত সে। তার ভেজা চুলে সূর্য। সে মৃদু মৃদু দোলে। আর রায়বেঁশে নাচিয়েদের সঙ্গে দোলে পুরো দলটি, আর বাজে ডিডিম ডিডিম ডংকা ডংকা।

বিশাল এক রহস্য নেংটে-মগজগুলিতে ঘনায়, 'ই তো কাঁচা ধান! তাথে আবার দেড়ছিলেম কিনা হাকিমের!'

লাবু খুব দৌড়ে আসছিল। —'আঁ কী ব্যাপার হে, ব্যাপারখানা কী বুল দিনি?' লাবু একটু একটু করে হাঁপায়। তারপর সে মুখ খুললে বোঝা যায় ঘটনাটি ধান নয়, ঠাকুর!

ভটভটি হাঁকিয়ে সেই যে রামজীবন গেছিলেন শহরে, আদত আর একটি অবিকল শ্রীধরমূর্তি নির্মাণ করাতে; গতকাল ছিল তার পুণ্য অভিষেক। ঢোলক ছিল। বুধুমিয়ার জেলাখ্যাত সানাই ছিল। ফাঁকা মন্দির ধোওয়া হয়েছিল দেড়শত ক্যানেস্তারা গঙ্গাজল দিয়ে। তার জন্যে সোনার তরী একটি খেপও মিস করে।

ঈশ্বরের কী অপার মহিমা! উৎসবে বাড়ি আসা কলেজ-ছাত্র নিমাইজীবন উৎসবের হুড়োহুড়ির ভিতর, কচু-ডোবায়, কলাগাছের আড়ে ঢোঁড়া সাপের কামড় খেয়ে আঁতকে ওঠে। ভয়ে তার গা-গতর হিম, সে অজ্ঞান! আর্তনাদ ওঠে অন্দরমহলে। রামজীবন-গিন্নি সদু (সৌদামিনী) হাহাকার করে মন্দিরে লুটোয়। তার ক্যান্থারাইডিন সুবাসিত চুল সিমেন্ট-ধূসরিত হয়েছে—'হা বাবা চিধর—তুমার সাঁজ জ্বেলেচি আমি; তুমার অন্নপাত্তর গঙ্গাজলে ধুয়িচি বাবা হে—।' সে তোড়ে খিস্তিবৃষ্টি করে পাতকী রামজীবনের দিকে। কেননা, ছেলের ভয়-নীল মুখ দেখে সদুর পাপ ও পুণ্য-বোধ কুদোচ্ছে; দে-বাবু কেন যে চড়া সুদে ঋণ দেয় ও কেন যে চাষার পিছনে কাঠি দিয়ে থাকে! সৌদামিনী নবপ্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের মূর্তিটির সামনে কপাল রক্তাক্ত করে, আর হেঁকুড়ে কাঁদে, 'আমি মাগি জনমদুখি কপালপুড়া গ, ভাতার আমার মনের কতা বুজলে নাকো গ..।

উৎসব ভেস্তে যায়। বেগতিক দেখে ফিরে যায় পুরোহিত, ঢাকি আর ক্যাঙালির দল। ক্যাঙালিদের ঠোঁটে তবু বা কিছু হাসি ছিল। তখনই এই মিছিল বা শোভাযাত্রা আর ঢোলক ও রায়বেঁশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এক জরুরি পরিস্থিতিতে। ঠাকুর চুরি যেতে রামজীবনেরও মনে সুখ নেই। সাহস কমে যাচ্ছে খুব।

অতএব মিছিলটি ডিডিম-ডংকা ডিডিম-ডংকা বাজিয়ে উল্লাসিনীর উঠোনে এসে থামল। জয় জয় ঠাকুর রব ওঠে। রবারের দোলনা থেকে আলগোছে পেড়ে আনা হয় গতরের চেয়ে বড়ো মাথাওলা জ্যান্ত ঈশ্বরকে। খোল, করতাল, শঙ্খধ্বনি এইসবে স্থানীয় বায়ু চুর।

রায়বেঁশে নাচিয়েদের পায়ে সারাদিন দলিত হয় অপরিষ্কার ঝোপঝাড়। পালাতে নৌকাবিলাস করেন প্রভু। নিমাইজীবনের গর্ভধারিণী ফুলো কপালে ডুলি থেকে নেমে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম দিল উল্লাসিনীর চরণে ও আবার হেঁকুড়ে কেঁদে উঠল।

পল্লিটিতে উৎসব চলে। রায়বেঁশের দল রাস্তা ও মোড় পরিভ্রমণ করে আবহাওয়া আরও তাতিয়ে দেয়। শাঁখ বাজে। ক্যাঙালিরা প্রসাদ পায়। মাত্র একটিই দর্ঘটনা ঘটেছিল, ভাববশে সেটিও ঈশ্বরের ছটা পায়। আরতি চলাকালীন শিমুল তুলোর শেয়ানা গদিযুক্ত সিংহাসনে শুয়ে কেলেমানিক, যার ঠোঁট হলদে মেরে গেছে—ফাটা, চক্ষুদ্বয় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো চকচকে—মণিটি সবুজাভ, এবকম ভাবের টাইমে কাপড় নোংরা করে ফেলে। চালু শ্যামচাঁদ গুগ্‌গুল পুড়িয়ে সেই দুর্গন্ধ চাপা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সৌদামিনী বোঝে পূর্ণ ক্ষমা সে এখনও পায়নি। তাই মনে মনে কেলেঠাকুরের জন্যে একটি মন্দিরও মানত করে বসে সে : তুমি ক্ষ্যামা দাও ঠাকুর, তুমাকে মন্দির গড়ে দোব। পাকা মন্দির গড়ে দোব বাবা।

রাত্তিরে বিছানায় এ-খবরটি শুনে সাংঘাতিক খচে যায় সেবাইত রামজীবন। —'এক হিল্লে তিনশো টাকা গেলচে। বাইশ হাত কাপড়ে ল্যাংটো জাত তুমরা। মন্দির কি সগ্‌গো হতে বিষ্টি হয় লিকিনি, আঁ। মেয়েমান্‌ষের ক্যাতায় আগুন। গুয়োর পিন্ডি কেলেঠাকুর। ভাতারের মুখে ত্বরিত হাত চাপা দেয় সৌদামিনী।

বার তিন-চার মৃদু কথা কাটাকাটির পর সদু রামজীবনকে কড়া আলিঙ্গনে বেঁধে চপাচপ চুমু খেতে থাকে, অনাগ্রহী দে-বাবু হার মানেন ও সৌদামিনী বিজয়িনী হয়। বাইশজন রাজমিস্তিরি ও চল্লিশজন জোগাড়ে নাগাড় পরিশ্রম করে কেলেমন্দিরটি হুস করে তুলে দেয়, আর পল্লিটি ভ্যাবাচ্যাকা। নেংটেরা ভাবে, 'দেড়ছিলমের ধান তাদের ভুখা উদরে বুঝি এল! সেবাইত খুব লরম হঁয়েচে, লয়?'

মন্দির গড়া হলে হিড়িকও বাড়ে। নরনারী, ভক্তজন, হুচকে চ্যাংড়া, যুবক-যুবতীতে পয়মাল হতে

থাকে নেংটে-অধ্যুষিত এই জনপদ। মুহুর্মুহু 'জয় ঠাকুর' স্লোগান কার্তিকের আকাশ ভার করে। কেউ কেউ বড়ো গাছে নৌকা বাঁধার মানসে 'মা, মাগো জগত্তারিণী' আওয়াজ ছাড়ে। উত্তেজনা বাড়তেই থাকে, আর অলস মন্থর জীবন স্রোতবতী—যেন ভাদরের কুয়ে, কূলে ভেঙে জনপদ গ্রাস করে নেবে। কাঠকুটো, জীবনের পরিত্যক্ত ছাই-ভস্ম-পাঁক ভেসে যাবে ওই বিপুল প্রবাহে, যেন এরকম বিক্রমশালী, আদিম আর সমৃদ্ধ সেই টান।

তখন প্রকৃতিতে কিন্তু মাত্র একটিই যাত্রা, মাত্র একটিই দিকে। পূর্ণতা থেকে পূর্ণতার প্রতি।

গর্ভের ভেতর জমাট ক্ষীর শক্ত টনকো হয়ে উঠছে। মাঠ-কাঁকড়ার গতরে আসছে তেল—হলুদ পিচ্ছিল সেই চর্বি নখে চেঁছে থাল থাল পান্তাভাত উড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন আসছে চাষাবালকের চোখে। আর হাওয়া। আর নধর গাছ আর ধান। সবুজ ঢেউ হিলসার পেটের মতো ফোলে। আর হাওয়া। আর ধান। আর অনর্গল হাওয়া।

লাবু, ধানু, চিধর এরা এখনও দিশে করতে পারে না। 'কী হচে বাপু আঁ, শালা অভিরেমের বিবি ঠাকরোন হঁয়ে যেল। সেবাইতের চিধর হঁয়ে যেল চুরি আর শালা অভিরেমের কোলেরটা হঁয়ে যেল ভগমান। লে শালা, কিছুই বুঝচিনে বাপু। ই শালোর দেড়ছিলমের ধান হাকিমই কাটবে, না আমরা কাটব, লিকি শালা দে-বাবু কাটবে, কিচুই বুঝচিনে।' তারা বুঝতে পারছে না যে কাস্তে কুটিয়ে নেবে, নাকি এইবারের মতো এই ধান যা দিনে দিনে পেকে উঠছে মাটিতে মিলাবে হাকিমের মর্জিমাফিক। তারা গোল হয়ে বসে বসে বিড়ি ফোঁকে। তাদের চোখ এই হেমন্তেও ম্লান। যেটুকু ভরসা ছিল তা প্রতিদিন মিয়োচ্ছে। আক্কেল মিয়া গাঁ-গঞ্জ ঘুরে ঘুরে বলে বেড়ায়, 'এবারে দেড়ছিলমের ধানে হাত দিলেই দ্বীপান্তর—ধান কুনু শালোর বাপের লয়কো।' তারা আকাশপাতাল ভাবে। সে ভাবনা কোনও ফল আনে না। শুধু ভাবনাকে বাড়ায়। লস্করদিঘির কাঁকুড়ে পাড় এই সব লোকদের থুথু, ঘাম ও ভাবনার ভারে ক্ষয়ে যেতে থাকে। প্রেতমুখী প্রাচীন অশথ বৃক্ষটি এই মহা-রগড় দেখতে থাকে; আর তার ছালচামড়া ঝরে যায় একটু একটু।

তারপর মন্দিরে সে দিন ঘোরতর উৎসব ছিল। সে দিন পূর্ণা অমাবস্যা। রাত্রির মধ্যযামে ঈশ্বরের আবির্ভাবলগ্ন খুব হই হই করে পালন করা হবে, কথা আছে। ধামা-বোঝাই শীতের ফলপাকুড় কাটা হয়েছে। ঝোলা গুড় আছে। আধমন চিঁড়ে ভিজছে সরকারি টিউবওয়েলের কল্যাণে। এই টিউবওয়েলটি এক সদরওলা ও ঈশ্বরের যৌথ উদ্যোগ। প্রকৃতপক্ষে, ওই সদরওলাটি কোনও সরকারি লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর 'ইসুজু' জিপ এবং দারোগাসাব তাঁকে ঘন ঘন 'স্যাঁর—আঁপনি যাঁ বঁলেন স্যাঁর' বলছিল বলে সবাই তাঁকে তাবড় সদরওলা বোঝে। দারোগাটি নস্যখোর এবং ওই সদরওলা আসলে একজন কন্ট্রাকটর-সম্রাট। তাঁর মার্বেলের মতো সাদা বাড়িতে ময়ূর চরে; মন্ত্রী-যন্ত্রীরাও নেমন্তন্ন খেতে এসে মাঝে-সাঝে চরে বেড়ান। এহেন তিনি সস্ত্রীক ঠাকুর দর্শনে এসেছিলেন। এই আজ পাড়াগাঁয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না বলে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর নিদারুণ জলকষ্ট ও মূত্রকষ্ট হয়েছিল। এ-কারণ ঝটিতি শহরে ফিরে জেলার সরকারি কর্তাদের ওই পল্লিতে একটি টিউবওয়েল, আর দুটি কথে পায়খানা ও প্রস্রাবাগার করে দিতে 'রিকোয়েস্ট' করেছিলেন। রিকোয়েস্ট-এর অর্থ—ওহে আমি অমুক বলছি ওটা করো। সে কারণ স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি ফান্ড থেকে তাঁর রিকোয়েস্ট কার্যকরি হয়। জেনানা ও মর্দানা দুটি পায়খানা ও প্রস্রাবাগারই রাখাল বালকদের অপকর্মের ফলে বর্তমানে অব্যবহারযোগ্য। টিউবওয়েলটি জলদান করে, আর কেলেঠাকুরের মহিমা ঘোষিত হয়। আজও কোনও কোনও মানুষ সেই সদরওলা আর এই ঈশ্বরের গুণকীর্তন করছে।

উল্লাসিনী শরীরে গরদের থান জড়িয়ে জাড় কাটাচ্ছিল। কলাটি-মুলোটি খেয়ে তার শরীরে বাড়তি চেকনাই, জাড়বোধ কম, চামড়া মসৃণ। সিদ্ধা মা হয়ে গেছে বলে তার চুলে যথারীতি জট বাঁধে, বড়ো হয়। ঘুপচি মন্দিরটির অভ্যন্তর স্ফীত মাথা ও ল্যাকপেকে বাহুদ্বয়ের ছায়া এখন স্থির। বায়ু বইছে না। ঘৃত প্রদীপের শিখাটি অকম্প। কুশাসনে স্থির উল্লাসিনীর রাত জাগা চোখ দুটিকে লাল দেখাচ্ছে। বাইরে, শালকো রোগাক্রান্ত কয়েশ ফেটে অষ্টপ্রহরের নামকীর্তন চলছে। জাড় কাটাতে গায়কেরা মাঝে-মাঝেই অতিরিক্ত চেঁচায়। নাম তখন তুঙ্গে উঠে পড়ে।

হঠাৎ একসময় সেই মন্দির-অভ্যন্তরে একটা গোঙানি উঠল। পাকা ধানখেতের ভেতর দিয়ে বেগে বয়ে যাওয়া বাতাসের আর্তনাদের মতো—জলের ভেতর শালুকের ডাঁটা ধবে টানলে যে চাপা ঋজু দৃঢ় কোঁ—আ শব্দ উত্থিত হয় সেরকম। গোঙানিটি বাতাসে সহসা ঢেউ এনেছে। উল্লাসিনী চঞ্চলা। কেলেঠাকুর, যে নড়ে না চড়ে না, শুধু খায় আর হাগে, আর মহিমা বিতরণ করে—সে নড়ছে। তার হাত দুটির মুঠো খোলে আর বন্ধ হয়, পা দুটো কাঁপে। মৃদু নবম আলো সেই সঞ্চরমান ছায়াকে মন্দির-গাত্রে প্রক্ষেপ করে। উল্লাসিনীর চোখ ছুঁচে সুতো পরানোর মতো তীক্ষ্ণ। সে সহসা সেই দোলনা সিংহাসনের উপব ঝোঁকে। রবারের দোলনাটি একটু একটু দুলছে। তাকে ঠাকুর দোলাচ্ছে। ঠাকুরের ঠোঁট দুটি ফাঁক। কালচে মাড়ির ডগায় নবোদ্গত কয়টি দাঁত থেকে হাড়ের মতো সাদা আলো আসে। আব চোখেব সবুজ মণিদ্বয় ঘূর্ণায়মান; মুন্ডু বাদে গোটা শরীরটিই ক্রমে ধনুকের মতো বেঁকে যেতে চাইছে।

আবির্ভাব লগ্ন সমাগত। ডিডিম ডিডিম করে ঢোলক বাজছে। এক্ষুনি শাখ বেজে উঠবে বুঝি! পুণ্যার্থী পল্লিজন জাড় কাটাতে ধুনি জ্বেলেছে। সেখান থেকে আগুনের ফুলকি উড়ছে কুটি কুটি। ধুনিব আলোতে দেখা যায় পূজারি শ্যামচাঁদের হাত থেকে গাঁজাব কলকে কোনও পুণ্যার্থীর হাতে চলে গেল।

উল্লাসিনী উথালপাথাল হচ্ছে তখন। তার তীক্ষ্ণ লাল চোখ ফেঁপে আসছে। আর ধীরে, ধীরগতি চলচ্ছবির মতো-- উথালপাথাল তাব ভেতরে আন্তরিক একটি ভাঙচুব চলছে. ফুল ফুটছে।.. 'সহসা সকল ভুলি'---এই শিশুকে সে গর্ভে ধরেছিল. মনে পড়ে—এই শিশু তার স্তনবৃন্তে দংশন-চিহ্ন রেখেছে, মনে পড়ে---এই শিশু তার মৃত স্বামীব ঔরসজাত, মনে পড়ে -সে উল্, মনে পড়ে। সে হুমড়ি খায় সন্তানের শরীরে। শবীরটিতে গরম লোহার তাত। উলুব বক পুড়ে যায়, প্রেমময এক ফল্গুই শুধু সান্ত্বনা দেয উল্‌কে, নদীটি ছলছল করে বইছে। উলুব বুকজুড়ে ঝাঁকা চবিতে তাব কেলেমানিক. তাব যন্ত্. তাব চন্টু, তার নয়নেব নিধি, তাব মাইদুটি ধরেছে। আঃ! সেখানে বিদ্যুতেব শিহবন :

পায়ে পড়ি কানাই তুযাব
চবণে দিলু গড়
দুখের শেকল কেটে দে
মা যশোদা কাঁদে যদি
কেমনে সাব তর
মিছাব শেকল কেটে দে।।

নাঃ, ছেড়ে দে বাপ, ছেড়ে। ই শরীলখান নাশ কর। হ আমার মানিক, আমার লগন-চাঁদা ধন..।

মন্দিরদ্বারে সহসা কি খটো-খটো ধ্বনি! শ্যামচাঁদ ডাকে, 'মা, মাগো ..।'

অতঃপর টিয়াপাখিরা জোটে। কবুতর, মাঠ-চড়ুই প্রভৃতি শস্যলোভী পক্ষিকুল ভিড় করে। পাকাধান মাঠময় হিল্লোলিত হয়। আব কোনও শব্দ থাকে না—কেবল নিজের ভারে নুয়ে পড়া শিষ মাটিতে গা ঘষছে তাব ক্ষীণ শব্দ। সেই শব্দধারা সঙ্গীতের মতো। তা তে মিশে যায় পাখির পাখশাটের শব্দ, পোকামাকড়ের ওড়ার ধ্বনি, আর অবিরল খসখস খসখস —মেঠো ইঁদুরেরা একাগ্রমনে খাদ্য সঞ্চয় করছে। ধান পাকলে ইঁদুরের বত্রিশটে বউ।

ক'টা দিন পরই চাষারা মাঠে নামবে। তখন কাস্তের দাপানি ও দীর্ঘস্থায়ী কচাং কচ্—আং। বাবুরা ছত্রমস্তকে মাঠে আসবেন। বাবুদের কলেজে পড়া ছেলেবা এই মাঠে বিবিধভারতী বাজাবেন—শাবানা আজমি সাক্ষাৎকার দেবেন।

কিন্তু দেড়ছিলমের কী হবে হে? সিখানে আই-—ন জারি আছে। সেখানে নামলে দ্বীপান্তর। সিটো আখুন হাকিমের ভুঙ্।

বেভুল মানুষের মতো পাক খায় কজন। সেই ভূখণ্ড থেকে দূরত্ব বজায় বেখে পাক খায়। তারা তাদেব

কাস্তে কুটোয়নি। তারা পাখি দেখে; পাখিদের ধারালো ভারী ঠোঁটে, আহা, হরিদ্রাভ শস্যমঞ্জরী! 'হা খুদা', লাবু আপন মনে গজরায়, 'গোরে যেলে ই মাটি শালার কুন হারামি ছোঁয়! ই মাটি ই ধান জিন-পিরেত হঁয়ে কুন শালো দখল লেবে হে!'

গোপাল বা চিধর দাস পাক খেতে খেতে পাক খেতে খেতে ক্রোধী, দুঃখী এইসব হয়ে যায়। বলে, হাকিমের নিতের মারি—তুমি ধান বোঝো না হে। তবুও সাহসের ডানা-পাখা কিছুই গজায় না। সবই অচল থাকে। মাঝে মাঝে আক্কেলের কুক শুধু স্মরণ করিয়ে দেয় যে, স-হাকিম আদালত বর্তমান। কিছু ক্যাংলা শিশু বা বালক, যারা বাপ-দাদাব লেজুড় ধরে মাঠে আসে, ধান দেখে ধান ছুঁতে চায়, তারা সেই কুকে ঘনঘন বেহোঁশ।

বাবু রামজীবন হীনজোতি মন্দির-চাতালটিতে বসে সেই কুক শুনতে পান। ভাবেন, আদালতের নির্দেশে অই শস্য উঠে আসবে তার জেলাখ্যাত খামারে। পুলিশি প্রহরায় তাঁর প্রেস্টিজ ও বিষয় যুগপৎ রক্ষা পাবে। এই মানসে তিনি থানাবাবুর গিন্নিকে সরু চাল ও থানাবাবুকে 'ওল্ড মংক' প্রেজেন্ট করেছেন। কোর্টবাবুকে একটি কাশ্মিরি তুষ নজর দেওয়ার ইচ্ছা।

সদরের কলেজে পাঠরত নিমাইজীবন চিঠি দেয় : কোর্টবাবু এসেনসিয়েল। একটু রগচটা, কিন্তু ভাবুক।

রামজীবন ভাবেন, যে ভাবুক তাকে একটি পাকা জামরুলের মতো গিলে ফেলা যাবে।

দুটো দিন কাটে। মাঠ জুড়ে সেরকমই শব্দ থাকে ধান পেকে ওঠার। চাষারা অভিমানী ও হুতাশী হয়। কেলেঠাকুরের মন্দিরে পুজো চলে। উল্লাসিনী মাতা জটা-জুটসমন্বিতা সিদ্ধা মা হয়ে প্রণাম ও প্রণামী গ্রহণ করে। শ্যামচাঁদ গাঁজা খায়। কোনও কিছুরই ব্যত্যয় ঘটে না। কেবল একদা নেশার চূড়ায় আরোহণ করে শ্যামচাঁদ বলেছিল, 'আমি ঈশ্বরের বাপ।' তখন উল্লাসিনী তাকে ঝাঁটা ও লাথি মারার কথা বলেছে।

মেঘহীন কটকটে নীল অপরিমিত আকাশ আর শীত ছিল মাথার ওপরে, চারপাশে। সুগোল দ্যুতিময় সূর্য, ছায়ার ভিতর নালা, তৃণভূমি, সরকারি সাঁকো ছিল। হিঞ্চা ছিল। স্থলপদ্মের জঙ্গল আর বিস্তৃত সুবর্ণকান্তি শস্যখেতে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান ছবির মতো অপেক্ষায় ছিল!

এইরকম পটভূমিতে উল্লাসিনী দাস্যাব সমাধি ঘটেছে। ধুলো উড়ে যাচ্ছে শনৈঃ শনৈঃ। হা—আ—আ চিৎকার দিয়ে হাহাকার করছে পূজারি শ্যামচাঁদ। কেননা সেই মন্দিরে, সেই শিংশপা সিংহাসনে ঈশ্বর হতপ্রাণ।

তার মস্তক বিদীর্ণ হয়েছে। যে-মস্তক ধড়ের দেড়গুণ হয়ে ঈশ্বরত্ব দিয়েছিল এই অন্ত্যজ শিশুকে, তা এখন ফাটা ডালিমের মতো দাঁত বের করা। এরকম ফাট শুধু গ্রীষ্মের রাঢ় মাটিতে মেলে।

ভক্তেরা হতবাক হয়। অবিশ্বাসীরা উল্লসিত। ঘোর কালবেলা বুঝে কীর্তনকারীরা বাদ্যযন্ত্র কোলে-কাঁখে ফেলে দে-দৌড়!

ক্রমে কথা ওঠে, ওই মড়াটি অচ্ছুত। অই মড়ার বাপ একটো বলদা চাষা ছেল। জেতে বাগদি। তায় আবার, উলুদাসী কোথায় কোথায় অভিসারে যেত, তাও প্রকাশিত হয়। অতএব, 'লাবু আবদেলের সঁতে অভিরেমের কীসের পিরীত ছেল হে' প্রশ্নটিও ওঠে। মড়াটি অচ্ছুত থাকে।

সেইদিন ঠাকুরের ভোগের সময় ভক্তজন ভিড় করে না। উঠোনটি মরুভূমিসদৃশ, বালুময় পরিত্যক্ত প্রান্তর হয়ে যায়। নির্বোধ সূর্যশিখা সেই উঠোনে ঝাঁক ঝাঁক কোঁচ হয়ে নামে, যেন এমন জনহীন আর ভৌতিক হয় সেই উঠোন।

কতকাল পরে সেই হুতাশী চাষাগণ এল। তারা ছায়ার মতো নিঃশব্দ। তারা নিঃশব্দে কাজ করে যায়, ফোঁপানি বা অশ্রুকাতরতা নেই। তারা শবদেহ নামাবলিতে রাখে। ঘন্টুর থুতনি চুঁইয়ে কিছু লালা নেমে গেছে। সেই বরাবর কয়েকটা লাল-পিঁপড়ে। একটা হেঁসো-টানা কড়া-পড়া হাত প্রতিটি পিঁপড়েকে খেদায়। শবদেহটি নামাবলিতে জড়ানো হয়ে গেল। একটা 'কৃষ্ণ' এবং একটা 'হরে' তার সমগ্র পেট ঢেকে নেয়। পেটটি এত ক্ষুদ্র আর 'হরে' ও 'কৃষ্ণ' এত বৃহৎ! নামাবলি ছাড়া কোনও কাপড়ও ছিল না। এই ঘরের সবই এখন বড়ো ধর্মাত্মক। এমনকি ডিগডিগে তুলসী গাছটিও পরিচর্যার ফলে স্বাস্থ্যবতী।

কটাস চুল। হাঁ-করা চোখ; সেটির পাতা টানলেও বোজে না। রিগর মর্টিস। গোপাল দেহটিকে আস্তে আস্তে সাজায়, তুমি ঠাকুর ছিল্যা বাপ। কটাস চুল। হাঁ-করা চোখ। প্যাঁকাটির মতো হাত, আর কনুইয়ের কাছে চামড়া জড়ো হয়ে পুঁটলি পাকিয়েছে। আর মাথা। তা-তে বিস্ফোরিত অর্বুদ। অতিকায় কোনও বোয়ালের হাঁ বলে মনে হয় সেই মাথাকে। রক্ত নেই। পানশে লাল মাংস আর দুর্গন্ধ। সবাই ধীর মনে কাজ করে।

ঈশ্বরের তিন সহোদর পেন্টুলে, সিঁথিতে, খাপছাড়া বেমানান হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে। উলুদাসী অসংবৃতা। তার জটার রাশ পিঠময় নির্বিষ ফণাহীন হেলের মতো গড়াগড়ি দেয়। তুলসী গাছের নীচে গোময়লিপ্ত মাড়ুলি স্থানটুকু এটোকাঁটাময় থালা যেন—এমন দ্যুতি-বর্জিত। সেখানে উলুদাসী বসেছে। তার চিবুক, দুই হাঁটু নিবদ্ধ হলে যে স্থান তৈরি হয়, তাতে গা গড়িয়ে বিশ্রাম পাচ্ছে এখন। শববাহকেরা বাঁশ কাটে· খটাং, খটাং।

শ্রীখোল-করতাল ছিল না। মা, মাগো বা জয় জয় ঠাকুর ধ্বনি ছিল না, ভক্তির হুল্লোড, বোম-পটকা, রায়বেঁশ, নৌকাবিলাস কিছুই ছিল না। মৃত কোনও ঈশ্বরের দাম, কে কবে দেখেছে, একটি কানাকড়িব উর্ধ্বে যায়! চাপা বলহরি—হরিবোল ওঠে। লস্কর দিঘিব পাড় ধরে, মাঠ ভেঙে, আলপথে, দুধিয়ার চটান ঘেঁষে মড়া এগোয়। বাতাস আকুল কবা ধান, আর ধানর পোস্না রাখ্‌নি যেন বাতাস তখন সর্বত্র। ট্যাঁ-ট্যাঁ ববে আকাশ মাতাচ্ছে পাখিরা। মড়া এগোয়। কটা হীনবল কর্মহীন চাষাব কাঁধে চেপে ঈশ্বরের অচ্ছুত শবদেহ এই পথে, এইভাবে, শ্মশানে, আমগেছ্যের ঈশান কোণটিতে জায়গা নিতে দ্রুত সুনিশ্চিত গেল!

শোক ছিল। কতদিন থাকে! বাসী ফল চিঁড়ে এইগুলি সঞ্চিত ছিল। কতকাল থাকে ফুবায়। সেই শোকে, অতঃপর ভাঁটা নামে; পলি জমে—ক্ষুধার, লোভের, হা-হা কবা ক্ষুধাব।

অতএব উলুদাসী তার জটাজুট হারায়, চেকনাই শরীর হাবায়। তিনটে সর্বগ্রাসী পেট তাকে ঘেরে। উলুদাসী সন্তানের মা—সন্তানের পেট তাকে ঘেরে।

—অ ভোঁদা বে, খেঁইচিস?

—লা।

—অ হাঁদা—খেঁইচিস?

—লা।

—নোদা—খেঁইচিস?

—লা।

লাল কুঁচফলের মতো এক সূর্য স্বর্ণাভ এক দিগন্তের শেষে গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল। উলু একা, ভয়ঙ্কর একা, সেই দৃশ্যটি দেখল। তার নাকে পাকা ধানের গন্ধ ম ম করছে। বড়িব মতো টিকলো সেই নাক বিস্ময়ে কাঁপছিল তখন। আর, অভিরেম তার হাত-পা এমনকি আদত কাস্তেটি সমেত সেই সূর্যের গায়ে তখন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। উলুদাসী আবিষ্টা। অভিরেম কুটোনো কাস্তেটি ঘোরাতে থাকছে। কাস্তেটি পাক খায়, চক্রাকারে পাক খায়, চকচক করে। সেটি যেন স্বপ্রভ, এরকম জ্বলে। অভিরেম কিছু বলে না; তার ম্লান চোখ, নাবাল পেট এইসব দেখে উলুদাসী বোঝে, অনেক কথাই সে বুঝে যায়। হাতের চোপসানো পেশি দুলিয়ে অতঃপর অভিরেম সেই কাস্তে ছুড়ে দিয়েছে। শনশন শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে এক দিকচক্রবাল থেকে থেকে অন্য দিকচক্রবালে নিক্ষিপ্ত হয় সেই মহাশক্তিধর অলৌকিক কাস্তে। সূর্য ডোবে।

গোধূলির আলোয় ঝাঁক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল। সে দিনের মতো দেড়ছিলমে থেকে উড়ে গেল তারা। উলুদাসী এই দৃশ্যটিও দেখে যে আলোয় আঁধারে দেড়ছিলমের ধান টলটল টলটল। উলুর কোঁচড়ে শালুক ছিল। পরের খেত থেকে সাবড়ে-আনা বেগুন ছিল গোটা দুই। উলু ফেরে।

কদিন থেকেই গোপাল বা চিধর বা পটা সাঁঝবেলায় সেই ফাঁকা নিষ্প্রদীপ মন্দিরটির চাতালে বসছে। বিড়ি টানছে। তিনটে ক্যাংলা বালককে শোলোক বলছে। সেই শোলোকে ক্ষুধা থাকে না। এমনকি ধান, মাঠ,

গাস্তে কিচ্ছু না। রাজা ও রাজকন্যা থাকে। একজন রাজকুমার ও একটি দয়ালু শুকপাখি থাকে। কিন্তু সর্বক্ষণ, সদাই, সবকটা মগজে ধান, কাস্তে আর মাঠ গজগজ গজগজ। টেইম হল লিকিন, টেইম হল?

সাবারাত খিদেয় টান হয়ে পড়ে থাকে উলুদাসী, আব তার বালকেরা। তাদের পেটগুলি চোঁয়ায়। কোলে-কাঁখে, তালগাছের ডগে কাঁদির ন্যায় সেই বালকেরা গরম নিশ্বাস দেয় উলুদাসীর শরীরের সর্বত্র। নোদা একটু একটু কাঁদে। পেটগুলি চোঁয়ায়।

ঠিকমত রাত হলে উলু তার ছেলেপুলেদের ডেকে নিল। —'অ হাঁদা ভোঁদা নোদা—উরিঃ, ওঠ দিনি। মজা হবে, ঘুমোসনি বাপ।' দলবল ছানাপোনা ডানায়-পাখায় আগলে এক বৃহৎ পক্ষী-মার মতো রজনীর এই মধ্যযামে সে যায়। আর হাওযা। উলিঝুলি ত্যানা উড়ে যায়, এত হাওযা! তাদের জাড়বোধ নেই। তারা যায়।

দুধিযার চঠান পেরোতে অকস্মাৎ চোখেব সামনে লাফ দিয়ে উঠল মাঠ, চতুর্থীর জোছনা আর অমৃতময় ধান্যমঞ্জরীতে সেখানে সেকি খেলা! সে কী খেলা!

নাক তুলে পশ্চিম থেকে পুবে, উত্তব থেকে দক্ষিণে পাকা ধানেব গন্ধ শোঁকে উলু। সেই গন্ধ যা দিগন্তব্যাপী, চবাচরব্যাপী, সর্বগ্রাসী, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তা ছুটে ছুটে আসে। নোদার কান্না মুছিযে মাতা উল্লাসিনী তাব পেঁটাসুদ্ধ নাকে জাবড়ে চুমু দিল, 'অ হ্ হ্ বাঁদিসনে বাপ—ঘন্টু আমাব, চন্টু আমাব, কেলেমানিক আমাব—ধান পেকেচে..।'

তখন একসঙ্গে অনেকগুলো শেযাল আনন্দ করে ডেকে উঠেছে। ওরা দেখল মাঠের আড়ে আড়ে, আলগুঁড়িতে, অশথগাছের তলায কিছু ছাযা ছায়া মানুষ। কাক-জ্যোৎস্নামস সেই মাঠ। কিন্নর এসে যেতে পারে নাচের টানে, এমন অক্ষয় ঘ্রাণ সেখানে ছড়ানো। সকলের চোখ তখন সেঁটে গেছে ওই ব্যাকা অকম্প চাঁদে। সেখানে সভা! কুযাশায়, এই চতুর্থীতে—যখন রাত পুইলে পঞ্চমী—ড্যাডা ড্যাং ড্যাং নাকটা ড্যাড্যাং—তখন এই অঘ্রানে ব্যাঁকা চাঁদ সভা বসেছে কেন।

উলুদাসী আকাশ দেখে। চাঁদটিকে দেখে। প্রবল বাযু ও কুযাশাতে সেই চাদ ও আকাশ লেপামোছা মনে হয়। উল্লাসিনী দাসী যেন নবকাসুরেব মা! তাব বগলেব ফাঁক দিযে মাথা তুলে হাঁদা চাদটিকে দেখলে একটি নক্ষত্র বেগে শনশন শব্দে আকাশ কাঁপিযে জ্বলতে জ্বলতে এক দিকচক্রবাল থেকে অন্য দিকচক্রবালে নামল। হাঁদা উলসায, উবি মা বে—উই দ্যাখ, উই দ্যা । নক্ষত্রটি কাস্তেব মতো বেকে ঘুরে নামল।

ড্যাডা ড্যাং ড্যাং—নাকটা ড্যাড্যাং।

উলুদাসী দেখতে পায় ছায়া মানুষগুলি পাহাড়েব মতো হযেছে। বিশাল পা আর বিশাল হাত আব বিশাল পাহাড়ের মতো শবীর। যেন এখনই চাঁদ ছুঁযে ফেলবে ওবা। চাঁদে উজ্জ্বল সভা।

নিকট সভা, দূর জল। দূব সভা, নিকট জল। □

মামিমা

মীনাক্ষী সেন

চিমটে দিয়ে ধরে উনুনের ওপর ফেললে সাদা রুটিগুলো গোল আর বড়ো হয়ে ফুলে ওঠে। সাদা রঙে হালকা বালি রঙের ছোঁয়া লাগে।

—মামিমা, পুড়ে গেলে?

মামিমার হাতে-গড়া রুটির প্রত্যেকটাই সেঁকার সময় গোল হয়ে ফুলে ওঠে। কোনওটাতে পোড়ার এতটুকু দাগ ধরে না।

—পোড়ার একটু দাগ ধরলেই বাপু আমি ফেলে দিই। মামিমা একদিন বলেছিলেন। নন্দিনীর তাই বুক টিপটিপ করে। আজ দু টাকার আটা কিনে এনেছে মামা। তাই দিয়ে তিন-তিনটে মানুষের জন্য রুটি, ফেলে দিলে খাবে কী?

রুটি কিন্তু একটুও পোড়ে না। গোল হয়ে ফুলে-ওঠা হালকা বালি রঙের রুটিতে একটুও কালো দাগ ধরে না।

—খা না একখানা। বলে মামিমা বাটিতে করে রুটি এগিয়ে দিলে নন্দিনী না করতে পারে না।

—চিনি দিই একটু?

নন্দিনী মাথা নেড়ে না বলে। গরম ফুলে ওঠা রুটির হাওয়া বের করে দিতে দিতে সে হাত সরিয়ে নেয়। জিভের উপর রুটির নরম স্বাদ অনুভব করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করে, মামিমার মায়াময় চোখ তার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছে।

কুপির নিবু আলোয় ঘরটাকে প্রায় অন্ধকারই লাগে। আলোর চেয়ে বেশি গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকার আর ছায়া। হাওয়ার হঠাৎ দমকে কখনও কখনও আলোর শিখা এ দিক ও দিক হেলে পড়লে, কেঁপে উঠছে কোনও কোনও ছায়া। জ্বলন্ত উনুনের নীল আলোয় কেবল মামিমার মুখখানা দেখা যায়। আলো ও ছায়ায় আঁকা। দেখা যায়, সাদা চোখের জমির ভেতর নরম উজ্জ্বল চোখের মণি নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে স্নেহে কেমন কোমল হয়ে এসেছে।

—আহা রে, কার মেয়ে, আমার ঘরে ...

সে সচকিত হয়ে ওঠার আগেই মামিমা উনুনে পোড়া কয়লা দিয়ে আগুন চাপা দেয়।

—চল, বারান্দায় বসি গে।

এ সময় কুপি নিবিয়ে বারান্দায় এসে বসলে অনেকখানি কেরোসিন বাঁচে।

অথচ চাঁদের আলোয়-ভরা দাওয়াতে বসে মামিমা যে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন, সে কি কেরোসিনের খরচা বাঁচাতে, নাকি তারা দেখতে, নন্দিনী কখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

জোৎস্নার আলোয় কোলের ওপর হাত দুটো জড়ো করে বসে থাকেন মামিমা। তাঁর গাঢ় সবুজ মোটা তাঁতের শাড়ির আঁচলে বাঁধা অকেজো চাবির গোছা। ছোট্ট, শীর্ণ মধ্যবয়স্ক শরীরে এক তরুণী-মুখের আদল। দেখতে দেখতে নন্দিনীর মন কেমন করে।

—মামিমা, তারা চিনবে?

—তারা? চেনাবি?

যেন শিশুর অকেজো আবদারকে অগ্রাহ্য না করতে পারার করুণায় মামিমা মাথা নেড়ে সায় দিলে নন্দিনী মামিমাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল চেনায়, শুকতারা চেনায়। কালপুরুষ চেনালে মামিমা রিনরিনে মৃদু গলায় হাসেন, 'তোদের মতো যুদ্ধে যাচ্ছে বুঝি!'

নন্দিনী চমকে ওঠে। মামিমা কী জানে এবং কতটা, তা বোঝার জন্য তার দিকে তাকানোর আগেই মামিমা উঠে পড়েন, 'যা, একবার রঞ্জুকে দেখে আয়, আবার চ্যাঁচাবে এখন।'

মুহূর্তের মধ্যে নন্দিনীর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যেতে ইচ্ছে করে না। এই গরমে রঞ্জুকে সারাক্ষণ খালি গায়েই রাখতে হয়। ডান বগলের নীচ থেকে কোমর পর্যন্ত দগদগে ঘা এখনও শুকোয়নি। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে পোড়ার সদ্য শুকনো দাগ। চামড়া কুঁচকিয়ে দলা-পাকানো কাগজের মতো হয়ে গেছে এখানে-ওখানে। ভুরু পুড়ে মুছে গেছে। আগুনের ঝলকানিতে সাদা হয়ে পুড়ে-যাওয়া চোখের পাতার নীচে ভাবলেশহীন অন্ধ চোখ—মাঝে মাঝে বড়ো বীভৎস লাগে। মাঝে মধ্যে তার চেয়েও বীভৎস হয়ে ওঠে রঞ্জুর ভাঙা গলার কান্না আর বিলাপ।

সকাল থেকে তার পেছনেই তো সে লেগে থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে আধঘণ্টা যায় ঘায়ের পরিচর্যায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হয়। তার সঙ্গে রয়েছে চারবেলা খাবার ব্যবস্থা করা— জলটুকুও তো হাতের সামনে এগিয়ে দিতে হয়।

তবু নন্দিনী ঘরের বাইরে পনেরো মিনিট থাকলেই রঞ্জু চিৎকার করে। তক্ষুনি তার জল চাই, অথবা অন্য কিছু। কিসের এত দাবি তার ওপর রঞ্জুর?

কে রঞ্জুকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল কেউ জানে না। বোধ হয় পাড়ার লোকজনই হবে। সঙ্গে যারা ছিল তারা কেউ আর পেছনে ফিরে তাকায়নি। কারণ রঞ্জু ততক্ষণে, তাদের ধারণায় এক মৃত মানুষে পরিণত হয়েছে। নেহাত কার কাছে খবর পেয়ে জিতেন এল।

—নন্দুরে মরে যাবে...পুলিশের হাতে পড়লে তো আর বাঁচবেই না। একবার দেখে আয় গিয়ে, যদি কিছু করার থাকে।

যাকে বলে 'বোম কেস'। তাই পুলিশের নজর পড়েছে, এটা সকলের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। এবং ছেলেদের পুলিশের হাতে পড়ার ভয় ছিল। তার মানে অবশ্য এই নয়, যে, নন্দিনী বা কুমকুমের সে ভয় ছিল না। তবু ছেলেদের ধরা-পড়া এবং পুলিশের গুলির যে-প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এতদিনে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, মেয়েদের বেলায় সম্পর্কটা ততটা সরাসরি নাও হতে পারে এবং এ সব 'কেস'-এ মেয়েদের যাওয়াই কৌশলগতভাবে সম্ভবত নিরাপদ। এ সব ধারণা এক গভীর সংস্কারের মতোই বিরাজমান থাকায় নন্দিনী আর কুমকুমই শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে যায়। প্রাণের টানে জিতেন অবশ্য পেছনে কিন্তু দূরে ছিল, মেয়েরা পুলিশের হাতে পড়ল কি না দেখার জন্য।

কুমকুম না থাকলে নন্দিনী বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। সুস্থ, সবল, সুন্দর এক যুবক বোমার আগুনে পুড়ে কতখানি বীভৎস হয়ে যেতে পারে তা দেখে। কুমকুম সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখত। বিপদে ধৈর্য হারাত না। রঞ্জুর জন্য বিপদের সবটা ঝুঁকি কুমকুম আর সে একসঙ্গে বহন করেছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

সেই কুমকুম পনেরো দিন আগে চলে গেছে মধ্যপ্রদেশে। 'দিদির ছেলেটার বড়ো অসুখ। আমাকে একবার যেতে লিখেছে দিদি।' কুমকুম বলেছিল। নন্দিনী আর কুমকুম দুজনেই জানত যে, কথাটা মিথ্যে।

জিতেনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, ওদের বড়দার মাথায় গোলমাল দেখা দিচ্ছে, দুই ভাইয়ের এই অবস্থা হয়ে যাওয়ার পর কুমকুমকে কোনও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে বাড়ির লোক।

যে-আন্দোলনের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই বলে মনে হচ্ছে, তার জন্য বিপদ মাথায় করে নিত্যদিন জীবনযাপন, অন্ধ, পুড়ে-যাওয়া, ক্রমশ অবুঝ হয়ে-ওঠা এক ছেলেকে নিয়ে দমবন্ধ করে দিনরাত কাটানো,.....চারদিকে মৃত্যু আর হতাশা.....! কুমকুম চলে যাবে বলেই ঠিক করেছিল। তবু যখন বলেছিল—'কদিন পর আবার ফিরে আসব'—তখন তার সে বলায় আর কোনও মিথ্যে ছিল না। যাওয়ার আগে সব মানুষই হয়তো ভাবে, সে আবার ফিরে আসবে।

নন্দিনী জানে, ফিরে আসার ইচ্ছে, আর ফিরে আসা, এক নয়। ছেলেদের নিয়ে অবশ্য অনেক জ্বালা। যাদের পিঠে একবার 'নকশাল' ছাপ লেগেছে সে ছাপ সহজে মুছে ফেলে তারা হারিয়ে যেতে পারে না জনারণ্যে।

কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের কপালে একবার সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারলেই তারা ভিন্ন গোত্রের হয়ে যায়।

কোনও একদিন রাস্তায় সিঁদুর পরা কুমকুমের সঙ্গে তার দেখা হবে—নন্দিনী জানে।

বহুক্ষণ রঞ্জু ডাকেনি কেন, ভাবতে ভাবতে অন্ধকার ঘরে পা দেয় নন্দিনী। তারও কেরোসিন বাঁচানোর সমস্যা আছে। কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনের আলো রঞ্জুর চৌকি পর্যন্ত পৌঁছয়নি—তবু তার ঈষৎ আলো সমস্ত ঘরে ছায়া ও অন্ধকারের যে হরেক রকমের নক্‌শা আঁকছিল, সেখানে রঞ্জুর কোনও চিহ্ন সে দেখতে পায় না।

অন্ধকারে চোখ সয়ে এলেও নন্দিনী দেখে রঞ্জুর বিছানা শূন্য। তার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে।

শিখা বাড়িয়ে দিয়ে হ্যারিকেন দুলিয়ে ঘুরিয়ে সে জানলার কাছে ঘরের একমাত্র ভাঙা চেয়ারটিতে রঞ্জুকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকতে দেখে। বসে থাকার সেই বিধ্বস্ত অসহায় ভঙ্গি নন্দিনীর মনে মমতার উৎস খুলে দেয়। সে রঞ্জুর মাথায় হাত রাখলে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে রঞ্জুর গোটা শরীর।

—দিদি, আমি ভেবেছিলাম, তুমি রাগ করে চলে গেছ, আর কখনও আসবে না। সত্যি তুমি কুমকুমদির মতো আমায় ছেড়ে চলে যাবে দিদি?

এই অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। দেখা যায় না পোড়ার দুরারোগ্য ক্ষত কিংবা রঞ্জুর দৃষ্টিহীন অন্ধ চোখ। কিন্তু শোনা যায়। জোয়ানমদ্দ ছেলেটার পাগল করা কান্না শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে নন্দিনী।

শব্দহীন, অশ্রুহীন কান্নায় তারও বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়, 'ভাই রে তোদের ছেড়ে কোথায় যাব?'

রঞ্জুকে খাইয়ে, তার গা পরিষ্কার করে, মলম লাগিয়ে নন্দিনী বাইরে এসে বসে। মামিমা ততক্ষণে সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে দাওয়ায় ঠোঙা বানাতে বসেছেন। নন্দিনী মামিমার পাশে বসে বসে ঠোঙা বানানো দেখে। মামিমার হাতের কাছে কাগজ এগিয়ে দেয়। বড়ো বড়ো কাগজ মামিমা ক্ষিপ্রহাতে গোল করে ভাঁজ দিয়ে একপাশে আঠা লাগিয়ে জুড়ে দেন। তারপর ঝটাপট নীচের দিকের কাগজে যে কতরকমের ভাঁজ করে আর আঠা লাগিয়ে জোড়েন, তর্জনী দিয়ে বাটি থেকে আঠা তোলেন মামিমা, হাতের তালু দিয়ে চেপে আঠা লাগান। একটা ঠোঙা বানানো শেষ করে এক মুহূর্তেও না থেমে দ্বিতীয় ঠোঙাটি বানানোর কাজে হাত দেন। এত তাড়াতাড়ি কাজ করেন মামিমা যে নন্দিনী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে— একশো ঠোঙা বানালে দু টাকা। মামিমার হাত তাই তুফানের চেয়েও দ্রুত ছোটে।

—মামিমা, আমাকে ঠোঙা বানাতে শেখাবে?

—তুই? ঠোঙা বানাবি?

হাত একটুও না থামিয়ে মামিমা চোখ দিয়ে ত … আদর করেন। নন্দিনীর ইচ্ছে হয়, পেটে চেপে রাখা কথাটা বলে ফেলে।

মামিমার বাড়িতে সে চল্লিশ টাকা ভাড়ার ভাড়াটে। জ্বলন্ত স্টোভ ফেটে পুড়ে যাওয়া ভাইকে নিয়ে রয়েছে এ বাড়িতে। তাদের মা নেই, বাবা ধানবাদে চাকরি করেন—এই পরিচয় দিয়েই তো মামা মামির কাছে তারা এসেছিল। তবু মামি কেন যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলেন?

মামিমা প্রায়ই বলেন, 'আহা কার মেয়ে, আমার ঘরে গো!'

নন্দিনী ভাবে, জিজ্ঞেস করেই ফেলবে মামিমাকে। মামিমা কী জানেন এবং কতটা। তারপর সাতপাঁচ ভেবে চুপ করে যায়। রাত আরও গভীর হলে মামিমা হাতের কাজ গুছিয়ে তুলে বলেন, 'যা শুতে যা, একা একা ভালো না-লাগলে আমার কাছে চলে আসিস। আমি তো পাশেই রইলাম।'

বিনিদ্র রাত গভীর হলে নন্দিনী বেড়ার ওধার থেকে মামিমার ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পায়। মামা নামে শুনতে 'বাড়িওয়ালা'। এক ইটের দেওয়াল আর টিন বা অ্যাসবেসটসের ছাদওয়ালা যে চারখানা ঘরের মামা মালিক, তার ভাড়া থেকে মামার আয় সাকুল্যে একশো চল্লিশ টাকা। এখন নিজেদের বসবাসের ঘর থেকেও একখানা ঘর নন্দিনীদের ভাড়া দেওয়ায় রোজগার দাঁড়িয়েছে একশো আশি টাকা।

কোণের ঘরে কালীতারা মাসি থাকেন, তাঁর স্বামী কোনও গভর্নমেন্ট অফিসে 'ক্লাস ফোর'। তিনি তো মামার তুলনায় রাজা, মাস গেলে কোন্-না সাত আটশো টাকা তাঁর ঘরে আসে।

—দেমাকে তো কালীতারার মাটিতে পা পড়ে না? —মামিমা মুখ গোমড়া করে বলেন।

বলতেই পারেন, কারণ তিনি বাড়িউলি, কিন্তু কালীতারা মাসির মেজাজ দেখলে, কে বাড়িউলি তা ভুল হয়ে যায়। তা তো হবেই, কারণ সব ভাড়াটের সামনে বসেই উদয়াস্ত খাটতে হয় মামিমাকে। ঘরকন্না, রান্নাবান্না সামলিয়ে বাকি সময়টুকু তো যায় ঠোঙা বানাতে বানাতে।

পেশা অবশ্য মামারও একটা আছে। নিজেকে তিনি জমি আর বাড়ির দালাল বলে থাকেন। রোজ সকালে, মামিমার নিজের হাতে ধপ্‌ধপে সাদা করে কাচা পুরনো জীর্ণ ধুতি ও লম্বা শার্ট ইস্তিরির ভাঁজ ভেঙে পরে তেল-জ্যাবজেবে ভেজা চুল পাট করে আঁচড়ে, কালো লম্বা ছাতি বগলে 'কাজে' বের হন মামা। কিন্তু জমির দালালি করে মামা একটি পয়সাও আয় করেছেন, এমন তো কখনও দেখেনি নন্দিনী।

তবু মামিমার ক্লান্তিভরা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ বাতাসে ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সে মামার অস্বস্তিতে ভরা গলা-খাঁকারি শুনতে পায়। সে জানে এরপর শুরু হবে সেই পরিচিত কথোপকথন। দু মাস ধরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল।

—শুনছ নাকি? মামা স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় ডাক দিলে মামিমা প্রতিরাতে যেন বা নতুন ভালোবাসার লজ্জা নিয়ে মৃদুতর কণ্ঠে জবাব দেন।

—কী বলছ?

—ওই তালবাগানের ধারের জমিটার কথা বলছিলাম,

—হুঁ।

—পার্টিকে প্রায় ধরিয়ে ফেলেছি জমিটা

—আচ্ছা।

—তা নয়তো কি বলছি? এটা হয়ে গেলে একখেপেই ধর গিয়ে দু তিন হাজার..

—তাই নাকি গো?

—তা ছাড়া অতুলবাবুর জমিটার দিকেও খদ্দেরের নজর আছে..

—আচ্ছা?

—দেখো বাসু, আর দু এক বছর কষ্ট করো। এত দিন তো করলেই। এরপর দেখবে, এই সব জমি, ভি আই পি রোডের ধারের এই সব জমি দু চার বছর পর সোনার চেয়েও দামি হবে। কত খদ্দের আমার পেছনে ঘুরবে তখন। বুঝলে বাসু, তখন আর সময় পাব না। তখন যে পয়সা রোজগার হবে, সে তুমি ভাবতেই পারবে না। বুঝলে তো?

—তাই নাকি গো? তা অতদিন আমি বাঁচব তো?

—কি যে বলো, তার ঠিক নেই। বাঁচবে তো বটেই, কিন্তু অত পয়সা দিয়ে তখন কী করবে বাসু?

—আমি তো গরিবের ঝি, গরিবের বউ, বেশি পয়সা দিয়ে কী করতে হয়, তা কেমন করে জানব?

মামিমার যেন বা কিছু অভিমান ভরে গলা ভারী হয়ে আসে। মামা, তখন সেই মধ্যরাতে মামিমার মানভঞ্জন শুরু করলে নন্দিনী লজ্জা পেয়ে কান সরিয়ে নেয়।

সে এতদিনে বুঝেছে, মামিমার চেয়ে বেশি করে কেউ জানে না যে, মামা কোনওদিনও এক পয়সা রোজগার করেননি, করতে পারবেনও না। কিছু কিছু লোক ইস্তিরি করা পাটভাঙা জীর্ণ ধুতি শার্ট পরে ছাতা বগলে পাড়ার চায়ের দোকানে বসে নানান রকম সারগর্ভ আলাপ-আলোচনা করার জন্যই জন্মায়। পয়সা

রোজগার করার পন্থাপদ্ধতিগুলো তারা কোনওদিনই ঠিক আয়ত্ত করে উঠতে পারে না, যদিও স্বপ্নে তারা যে-কোনও সময় পৃথিবীর ধনীতম ব্যক্তিও হয়ে যেতে পারে। মামা এদেরই দলে।

এ সব জেনেও মামিমা কেন মামাকে কখনও কোনও রূঢ় কথা বলেন না? কেন এত মমতায় মামার বড়োলোক হয়ে যাওয়ার স্বপ্নে উৎসাহ জোগান!

দারিদ্র থেকেই আসে মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাঁটি। এমনটাই চিরকাল শুনে আসছে নন্দিনী। আর সেটা তো স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু মামিমার সামনে সব তত্ত্বধারণা কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবন যদি মামাকে সুযোগ দিত, তবে লেখাপড়া শিখে মামা দারুণ 'একটা কিছু' হতে পারতেন হয়তো।

তবু এই বঞ্চনার দুঃখেও মামা নষ্ট হননি, ভ্রষ্টও নয়। মামার মতো নিখাদ ভালোমানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। মামিমার এই বিশ্বাসই কি ভালোবাসা হয়ে এত রাস্তা হেঁটে এল মামার সঙ্গে?

আঠারো বছরের নন্দিনী জীবনের এতসব গভীর জটিলতা বুঝে ও না-বুঝে জিতেনের কথা ভাবে। কে জানে জেলে বসে এখন জিতেন কি করছে, কেমন আছে! ভাবতে ভাবতে চোখের কোণে মস্ত দুই জলের ফোঁটা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নন্দিনী।

পরদিন দুপুরে কালীতারা মাসির গলাও যখন ঘুমের কারণে চুপ হয়ে গেছে, ঠোঙা বানাতে বানাতে মামিমা নন্দিনীকে বলেন, 'বুঝলি রে ভাগনি, সুবীরের বুঝি আর পড়া হবে না।'

—হবে না! আর্তনাদ করে ওঠে নন্দিনী।

—কেন হবে না মামিমা? ও মামিমা।

মামিমার বালিকার মতো শীর্ণ মুখে চিন্তা ও দুঃখের ভাঁজ একাকার হয়ে যায়। ক্লাস এইটের অনেক খরচ। যত উঁচু ক্লাসে উঠবে, খরচ ততই বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু একশো আশি টাকা বাড়িভাড়া আর ঠোঙা বানানোর রোজগারে তিনটে প্রাণীর খাওয়া-দাওয়া, তারপরেও সুবীরকে পড়ানো, এত সব কি সম্ভব? এ সব বুঝেও নন্দিনীর মন মানতে চায় না। সম্ভব-অসম্ভব নানান উপায় চিন্তা করে সে। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকা বাড়িয়ে দিলে হয় না? কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? তিনশো টাকা দেয় জয়দা, বহু কষ্ট করেই। তাই সম্বল। রঞ্জুর ঘায়ে লাগানোর জন্য রোজ দু টিউব দামি মলম লাগে। তার ওপর অন্য ওষুধপত্রও আছে। দুধটা-ছানাটাও তো দিতে হয়। পোড়ার রোগীর পুষ্টিকর খাবার দরকার। এর মধ্যেই আবার এত ছেলের নিত্য আসা-যাওয়া, তাদের খাওয়া খরচ।

প্রথম দিকে সে আর কুমকুম একা একাই থাকত, রঞ্জুকে নিয়ে। বোমায় পোড়া যুবক ছেলে—পাড়ার কে কখন নজর করবে, পুলিশের কানে খবর যায়, বিপদ ঘটে, তাই কেউ এ দিকে আসত না। এখন মাস দুই নিরাপদে কেটে যাওয়ার পর নিত্য দুপুরে ঘর ভরে যায়।

ভি আই পি রোডের উপর, ব্যস্ততম মোড়ের মাথায় বাড়ি, কার কখন নজরে পড়ে, এখানে তাই বেশি লোকজনের ভিড় না জমানোই উচিত, অন্তত রঞ্জুর নিরাপত্তার কথা ভেবেও—নন্দিনীর এ সব কোনও সাবধানবাণীই এখন ওদের আটকাতে পারে না।

একবেলার পেটভরা ভাত, একরাত্তিরের নিশ্চিন্ত ঘুমের জন্য পুলিশের গুলি আর জেলখানার ভয় মাথার ওপর নিয়ে পাগলের মতো ঘুরছে সেইসব ছেলে, জলের মধ্যে মাছের মতো জনগণের গভীরে যাদের নিশ্চিন্ত বিচরণ করার কথা ছিল।

—তুই হতাশা ছড়াচ্ছিস, তোর মধ্যে সংশোধনবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। মামা-মামি কি জনগণ নয়?

—তো?

—মামা-মামি তো সবই বুঝছেন, তোর কথা শুনলেই তো বোঝা যায়। তবু তো তারা আমাদের থাকতে দিচ্ছেন, এত ভালোবাসছেন...

—হুঁ।

—হুঁ কী? তাই বলছি। হতাশা ছড়াস না। পঁচাত্তর সালের মধ্যে গণফৌজ 'মার্চ' করছে পশ্চিমবঙ্গে। বলে গোঁফের ফাঁকে হেঁ-হেঁ করে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে তোলে গণেশ।

যে হাসিতে একদিন স্বপ্নের আবেশ দেখত, সে হাসি আজকাল কেমন নির্বোধের হাসি বলে মনে হয়। মাথা থেকে শরীরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া বিরক্তিকে দমন করে উঠে যেতে যেতে নন্দিনী বলে, জনগণের সঙ্গে একাত্মতা বাড়ানোর জন্য আজ আবার মামিমার ঘরেই খেতে বসিস না যেন। কোনওমতে এক টাকার আটা এনেছেন মামা। একজন বাড়তি লোক খেলে, মামাকেও আজ উপোস দিতে হবে।

—তুই যে দেখছি খুব...হ্যাঁ, আমি কি চামার নাকি? গজগজ করতে থাকে গণেশ। নন্দিনীর বিরক্তি মিলিয়ে গিয়ে একটু হাসি পায়। গণেশটাব একটু খিদে বেশি। ভাগের ভাগ করতে করতে যেটুকু খাবার নন্দিনীর ভাগে জোটে তাতে বেচারার পেট প্রায়ই ভরে না। পাশের এঘর-ওঘরে তাই একটু খাবারের সন্ধানে গিয়ে বসে। সবাই ওকে খাওয়াতে ভালোবাসে। মামিমাও। তবু এ নিয়ে খোঁটা গণেশের অসহ্য ঠেকে।

একদিন সকালে উঠে মামিমার দাওয়াতে ছড়ানো বর্ণচ্ছটা দেখে নন্দিনীর চোখে ধাঁধা লাগে। সাদা, বাদামি, নীল, লাল হরেকরকমের রঙের ভিড় দাওয়া জুড়ে।

—ও মামিমা, এ সব কী?

—আয়, বলছি, মুখ ধুয়ে আয়।

মুখ ধুয়ে এসে নন্দিনী দেখে মামিমাদের পুকুর ধারের একচালাটার ভাড়াটে নেপালি দারোয়ানেব মেয়ে নাইনি দাওয়ায় এসে বসেছে। মামি গুড় দিয়ে বানানো কালো চায়ে দুমুঠো মুড়ি ফেলে দুটো হাতল ভাঙা কাপ দুজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসেন :

—পাঞ্জাবিদের পাগড়ি সেলাই হবে এ সব কাপড় দিয়ে।

—সেটা আবার কী মামিমা?

—কী আবার, পাঞ্জাবিদের পাগড়ি। এতে ভালো পয়সা রে ভাগনি। ঠোঙার চেয়ে লাভ থাকবে অনেক বেশি।

—ঠোঙা বানাবে না?

—তাও চলবে, এটার ফাঁকে ফাঁকে।

মামিমা চা পর্ব শেষ করেই কাজে বসেন। নন্দিনী বসে বসে দেখে। অ-আ-ক-খ লিখতে শেখেনি মামিমাব যে শীর্ণ আঙুল, তার শ্রমনৈপুণ্যে সে অভিভূত হতে থাকে। সে তো এতদিন দেখেও ঠোঙায় আঠা লাগাতেই শিখতে পারল না ঠিকমত। মামিমা কী করে এমন সহজ নৈপুণ্যে পাগড়ির কাপড়ে সেলাই দিচ্ছে, এই প্রথম দিনই!

—আর কত কী করবে মামিমা, বলতো দেখি নন্দুদিদি? অবাঙালি টানে চমৎকার বাংলায় কথাগুলো বলে নাইনি তাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারে একটা।

—তাই তো দেখছি রে নাইনি। মামিমা, সুবীরের পড়া.......

—সে হবে, চালিয়ে নেব, সেই জন্যই তো এ কাজটা।

নন্দিনীর হঠাৎ হাসি পায়। কালীদা শুনতে পেলে এক্ষুনি হয়তো বা তার তীক্ষ্ণ চোখে ফুটিয়ে তুলত বিদ্রূপ। সিগারেটের ধোঁয়ার অন্ধকার থেকে মুখ বের করে বলত : যে যত পড়ে, সে তত মূর্খ হয়, চেয়ারম্যানের এই যে শিক্ষা শ্রদ্ধেয় নেতা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, তা কি ভুলে যাচ্ছ, কমরেড? নইলে সুবীর বুর্জোয়া শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারল কি না, তা নিয়ে এত ব্যস্ত হলে কেন? পার্টির বিপ্লবী লাইনে তুমি আস্থা হারাচ্ছ। তোমার অধঃপতন হচ্ছে কমরেড নন্দু।

—আপনার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক। এই কথা বলে হয়তো বা তর্ক জুড়ত নন্দিনী। কালীদা তবু কখনও মেনে নিতেন না। কালীদার মুখে সব সময় সিগারেট আর মৃদু হাসি। ধীর ও শান্তভাবে সবাইকে সবকিছু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন কালীদা, কখনও ধৈর্য হারান না। তবে কারও বিরুদ্ধতাকে মেনেও নেন না। কোনওরকম বিরোধিতা শুনলেই শ্রদ্ধেয় নেতার লাইনের বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে—এই ধারণায় কালীদার মাথার দু পাশের রগ ফুটে উঠে দপদপ করতে থাকে।

তবু অধঃপতন। হবেও বা' কিন্তু তারা যে যুদ্ধে বেরিয়েছে, মামিমা যে বলেন। যারা যুদ্ধ করছে, তারা সুবীরের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মামিমার যে-যুদ্ধ, তার উত্তেজনার আঁচ নিজের শরীর-মনে অনুভব

না-করে পারে না। নন্দিনী জানে, শুধু সে নয়, গণেশদের গায়েও আজকাল এই উত্তেজনার আঁচ লেগেছে। গণেশ আজকাল হঠাৎ দিনদুপুরে এসে সুবীরকে বাড়িতে দেখলে জিজ্ঞেস করে, 'কী রে, ইস্কুলে যাসনি?'

—ও মামিমা, নন্দুদিদির যে তাজ্জব লেগে গেল গো তোমার কাণ্ড দেখে। কেমন হাঁ-করে আছে দেখ একবার। উচ্ছল নাইনি হেসে গড়িয়ে পড়লে নন্দিনীর সংবিৎ ফিরে আসে।

ঠোঙা বানানো আর পাঞ্জাবিদের পাগড়ি সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ওড়নায় জরি ও চুমকি বসানোর কাজ নিয়ে যে দিন এল মামিমা, ঠিক তার সাতদিন পরে, একদিন সন্ধেবেলা মামার সঙ্গে সেই ছেলেটি এল। ভাঙা-চোরা শীর্ণ চেহারা, চোখের নীচে কালি পড়া, ঈষৎ খুঁড়িয়ে হেঁটে ছেলেটি যখন এসে দাঁড়াল, তার আগেই ওড়নায় চুমকি বসানোর কাজটা কিন্তু অনেকটাই শিখে ফেলেছিল নন্দিনী।

—দিদি, সটকে যান, রুগী নিয়ে.........

—মানে?

—মামুদের কাছে খবর হয়ে গেছে, আমরাও রেডি......

—আপনি?

—ও-ই.......বোঝেনই তো.........হেঁ.......হেঁ........

—তো খবর দিতে এলেন?

—হেঁ..... হেঁ.......কাকুকে রেসপেক্ট করি। কাকু ফেঁসে যাক চাই না, তা ছাড়া...........

অন্ধকারে ছেলেটার চোখ ধক্‌ধক্ করে, আমি তো আপনাদেরই লোক দিদি, মেরে পুলিশ খোঁড়া করে দিল তো নকশাল বলেই। মাইরি বলছি দিদি, আপনাদের জেনুইন সাপোর্টার ছিলাম আমি। কিন্তু গরিবের ছেলে, বাড়িতে থাকতে না পারলে থাকব কোথায়? ছেড়ে দেওয়ার'পর খোঁড়া পা নিয়ে ঘরেই থাকতাম। তিনবার পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। বাবা ঘটিবাটি বেচে জামিন করাল। তার ওপর কী বাম প্যাঁদানি পুলিশের জানেনই তো, এখন শালা খোঁড়া হয়ে হাঁটি, বেজন্মাগুলোর সঙ্গে বসে থাকি। আর যা যা করি......থাকগে। পুলিশ এখন ভালোবাসে। কাল মামুদের সঙ্গে ওরাও আসবে। সবাই ভাবছে অনেক আর্মস আছে আপনাদের, তাই জোর ফাইট দেবেন অ্যাটাক হলে, সেজন্য একটু প্রিপারেশন চলছে। দুজন মামু বাড়ির সামনে চব্বিশ ঘন্টার জন্য ফিট আছে। নজর রাখছে.......প্লিজ দিদি, সটকে যান।

এ সব বলে চলে যেতে যেতেও ফিরে আসে ছেলেটা। তার কালিপড়া চোখের কোলে, মুখে, কপালে ও গোটা শরীরে অসংখ্য রেখার অস্বাভাবিক ভাঙচুর পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে আবার ভাঙা গলায় বলে, 'প্লিজ দিদি চলে যান, কাল ওদের সঙ্গে আমিও আসব কিন্তু ... ...'

ছেলেটা চলে গেল, ঘরে ঢুকে নন্দিনী দেখে দশটি মাথা ঘরের ভেতর উৎকর্ণ হয়ে বসে। তাদের তক্ষুনি চলে যেতে বলে নন্দিনী। ওরা অবশ্য কেউ যেতে রাজি হতে চায় না। রঞ্জুর জন্য তারা সেই মুহূর্তে জান লড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

—তোরা জান লড়ালে রঞ্জুর জানও বাঁচবে না, তোরাও মারা পড়বি। আমিই রঞ্জুকে বাচাব, তোরা সরে যা।

এ কথার পর ঘর ফাঁকা হয়ে যায় ধীরে ধীরে। সবার শেষে যায় অনির্বাণ। ঈষৎ ইতস্তত করতে করতে। হতভম্ব রঞ্জুর অন্ধ চোখ উৎকণ্ঠায় ঠেলে বেরিয়ে আসবে মনে হয়। অসহায় হাত বাতাসে হাতড়াতে হাতড়াতে সে শুধু প্রশ্ন করে, 'এখন দিদি? এখন?'

তখন মামিমা এসে তার চার ফুট চার ইঞ্চি লম্বা শীর্ণ শরীর দিয়ে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি নন্দিনীকে আবৃত করে দাঁড়ান। দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'তোরা আমার কাছেই থাক ভাগনি। আমি থাকতে কেউ তোদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

—তা হয় না মামিমা। তুমি ওদের জানো না। আমি জানি। মামার কোনও ক্ষতি আমি হতে দিতে পারি না। তা ছাড়া সুবীরের বয়সও তো তেরো-চোদ্দো হলো.........

তাকে আবৃত করে রাখা মামিমার শরীর অজানা ভয়ের তাড়নায় কেঁপে উঠেছে টের পেতে পেতে নন্দিনী শুধু ভাবে যে, তার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বাবার পায়ের ছটা হাড় যদি পুলিশ ভাঙতে পারে, তবে মামার মতো দরিদ্র পরিচয়হীন মানুষকে কী করতে পারে ওরা। আরও মনে পড়ে—বাপি, স্বপন আর গোরাকে পুলিশ যখন গুলি করে, তখন বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে ছিল ওদের বয়স।

মামা বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হয়ে পায়চারি করছিলেন। নন্দিনী ধীরে ধীরে মামিমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'মামি, এ ঘরের রান্নার সব জিনিসপত্র তোমার রান্নাঘরে নিয়ে যাও। সুবীর, তোর পড়ার টেবিল আর বইপত্তর সব এ ঘরে এনে, ঘরের চৌকি দুটোকে এক করে দে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি রঞ্জুকে নিয়ে। সুনীলদা একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন? নাইনিদের ঘরের আশপাশে কোথাও গাড়িটা দাঁড় করাবেন। মামা, যেই আসুক, বলবেন, এ ঘর আপনাদের বসবাসের জন্য। এখানে কেউ, কোনওদিন ছিল না। আমার মনে হয় পাড়ার ছেলেরা আপনার পক্ষেই থাকবে, আপনাকে সবাই ভালোবাসে, আমি জানি।'

অন্য ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এসে সবাই জড়ো হয়েছিল আশপাশে। চলে আসার সময় কালীতারা মাসি পর্যন্ত চোখ ছলছল করে চেয়ে আছে দেখে নন্দিনী স্বস্তি পায়। না, ওদের কথা বলে দিয়ে কেউ বিপদে ফেলবে না মামা-মামিমাকে।

প্রথমে অন্ধকারে গা ঢেকে নাইনিদের বাড়ি। সেখান থেকে নাইনিদের বারান্দা ও ছোট্ট আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে ভি আই পি রোডের যে অংশটায় তারা পৌঁছল সেখানে সুনীলদা তার চেনা এক ট্যাক্সি ডেকে এনেছিল। রঞ্জুকে নিয়ে কোনওমতে তার ভেতরে ঢুকতেই কোনও এক তরুণী কণ্ঠস্বর গাড়ি ছেড়ে দিতে বলে। আঁতকে উঠে নন্দিনী পাশে নাইনিকে দেখতে পায়। —'আমার মেজদিদির বাড়ি চলো গো একন, চারপাঁচ দিন থাকতে পারবে, তারপর দেখে বুঝে যা হয় একটা......', নাইনি নিচুস্বরে বলে। ধাবমান গাড়ির ভেতর হু হু করে ঢোকে ভি আই পি রোডের সতেজ হাওয়া। নাইনির কাঁধের ওপর মাথা রেখে শরীর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে এমনভাবে ভেঙে পড়ে নন্দিনী যে, বাতাসে তার আভাস পেয়ে রঞ্জু পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ও দিদি, কিচ্ছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নন্দিনীর মনে পড়ে, পুড়ে যাওয়ার আগে একা রঞ্জুই বুক টান করে দাঁড়ালে নির্ভয় বোধ করত একটা গোটা তল্লাট।

নাইনির দিদির বাড়ি থেকে আবার হাসপাতাল। সেখানে চোখ অপারেশনের পর ব্যান্ডেজ খোলার দিন প্রথমে ডাক্তারের এক আঙুল স্পষ্ট দেখতে পেল রঞ্জু।........ তারপর দুই-তিন, এমনকি পাঁচ আঙুলও।

সে উল্লাস থিতিয়ে এলে ডাক্তারের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে খাট থেকে নেমে তাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল রঞ্জু। তিনি রঞ্জুকে মাঝপথে বাধা দিলেন, 'এখন নিচু হোয়ো না, চোখের ক্ষতি হবে। যে দিন নিচু হতে পারবে, বরং দিদিকে প্রণাম কোরো। আমি জানি, ও তোমার সহোদরা নয়। যদি হত, তা হলে এত ঝুঁকি ও নিতে পারত না। এত করতও না হয়তো। দিস ইজ, সামথিং এল্‌স হুইচ আই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড......... .

—ডাক্তারবাবু.........। নন্দিনী কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একটা চিরকুট স্বহস্তে লিখে তিনি নন্দিনীর হাতে দেন। বলেন, 'এ ছেলেটি প্লাস্টিক সার্জেন। নিউ, বাট প্রমিসিং— বগল আর হাত যে বুকের সঙ্গে জুড়ে গেছে, সেটা ছাড়িয়ে দেবে, কোনও পয়সা নেবে না।'

—ডাক্তারবাবু, আপনি তো আমাদের চেনেনও না। আপনিও তো কম ঝুঁকি নিলেন না আমাদের জন্য। এত নামকরা ডাক্তার আপনি, ওয়ান অব দি টপস।

—এ সব কিছু নয়। দিস ইজ মাই ডিউটি। আর আমাকে আবার কে কী বলবে? আই অ্যাম নট্ বাউন্ড টু নো হোয়াট মাই পেশেন্ট ইজ। মাই ডিউটি ইজ টু কিওর হিম, অ্যান্ড দ্যাটস্ অল।

নন্দিনীও এবার নিচু হয়ে ডাক্তারকে প্রণাম করতে গেলে তিনি নন্দিনীরও হাত চেপে ধরেন, 'আরে না, না, প্রণাম কোরো না। আমি শুধু বুঝতে চাইছি, দ্যাট ইউ আর এ পার্ট অব আওয়ার নেকস্ট জেনারেশন, কিন্তু কী তোমাদের এমন সাহসী করে তুলল? আমার বাড়ি কোথায় জানো? আমি তোমাদের অনেক ছেলেকে মরতে দেখেছি।' নন্দিনীর হাত ছেড়ে ডাক্তারবাবু নন্দিনীর মাথায় হাত রাখেন, 'বেঁচে থাকো।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে নন্দিনীর বুকের ভেতরটা ফাঁকা লাগে। সে কি সাহসী? সে কি ভীরু? সে বোঝে না। শুধু বোঝে সে, কী এক সময়, কী এক আবেগ, কী এক স্বপ্ন! মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি। মুক্তি মানে পেটভরা ভাত, মুক্তি মানে মাথার উপর ছাদ, পরনের কাপড়। মুক্তি মানে স্বাধীনতা। কাজের দোকানে কিছু টাকা বাকি পড়ে যাওয়ায় একদিন মামিমাকে মারতে এসেছিল দোকানের মালিক.......এ লড়াই ইজ্জতের লড়াই......সবই কি ব্যর্থ হল? ব্যর্থ কি হয়?

হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সরা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে ওষুধ আর পথ্য জোগাড় করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন রঞ্জুকে নন্দিনী গিয়ে পৌঁছনোর আগে। পুলিশের হাত এড়িয়ে রঞ্জুকে নিয়ে নন্দিনী চলে আসতে পেরেছিল তাঁদেরই জন্য। জয়দা নিজে আধপেটা খেয়েও রঞ্জুর চিকিৎসা পথ্যের সব খরচ জুগিয়ে গেল। তারপর মামিমা, নাইনি। মামা, সুনীলদা, নাইনির দিদি জামাইবাবু, কালীতারা মাসি পর্যন্ত।

এত ভালোবাসা........এত সম্ভাবনা..........

ও দিদি? তুমি যে কী না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কী ভাবো? এসো রাস্তা পার হবে... .এখনও তো গাঁইয়া ভূতের মতো রাস্তা পার হতে ভয় পাও......। রঞ্জু আজ তার হাত ধরে বলে। সে আজ রাস্তা পার করে দেবে।

নন্দিনীর বুকের ভেতর বিরামহীন একঘেয়ে বৃষ্টির পর রোদ্দুর ওঠে। সব যদি ব্যর্থও হয় তবু একটি জীবন রক্ষা পেল, একজন অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেল, শুধু এইটুকু নিয়েই কি কাটানো যায় না বাকি জীবন?

প্লাস্টিক সার্জারি করে হাতটা স্বাভাবিকভাবে নাড়তে পারার পর রঞ্জুকে নিরাপদ এক আশ্রয়ে যে দিন পৌঁছে দিল, ঠিক তার দিন দশেক পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেল নন্দিনী।

নন্দিনী পরে জেনেছিল, খবরটা পেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছে রঞ্জু। তিন দিন নন্দিনী মামাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল শিয়ালদা কোর্টে। পুলিশের বেষ্টনী ডিঙিয়ে মামা কোনওদিনই তার কাছে পৌঁছতে পারেনি। কেবল একদিন গাড়িতে ওঠার সময় মামাকে এক মিনিটের জন্য কাছে পেয়েছিল সে।

—মামিমা তোমার জন্য রোজ কাঁদে ভাগনি। রুটি বানাতে বসলেই চোখ দিয়ে জল পড়ে। মামিমার বানানো রুটি তুমি কত ভালোবাসতে! তাড়াতাড়ি বাড়ি এস ভাগ্নি।

মামার গলা বুজে আসা দেখতে-দেখতে গাড়ি ছেড়ে দিলে, সে শুধু বলতে পেরেছিল 'মামা, কষ্ট করে আর এসো না।'

আসলে, ভয় পুলিশকে। পুলিশ শুধু সন্দেহ বোঝে, গ্রেপ্তার বোঝে, নির্যাতন বোঝে। ভালোবাসা তো তারা বোঝে না! ওরা যদি মামাকে নির্যাতন করতে চায়......।

সাড়ে চার বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নন্দিনী দেখল, পৃথিবী এক ভিন্ন গ্রহে পরিণত হয়েছে। সেখানে শান্তিজলের ছিটে ছিল, ভাঙনের মর্মভেদী শব্দ ছিল, এমনকি নন্দিনীর জন্য মালাও ছিল। কিন্তু প্রিয়জনের হৃদয় ছাড়া অন্য কোথাও রক্তের দাগ ছিল না। আর ছিল না সেই জায়গা, যেখান থেকে নন্দিনীকে ধরে নিয়ে গেছিল পুলিশ।

কাউকে চিনতে পারছিল না নন্দিনী। চেনা সেই পৃথিবীকে অচেনা লাগছিল, এমনকি সহোদরের মুখও। কুয়াশায় পথ খুঁজতে খুঁজতে সে দেখল, বহুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়ে গৃহস্থ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে গৃহস্থ হওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে স্কুল শিক্ষক জিতেন। রঞ্জু এলাকায় ফিরে গিয়ে পনেরো পাওয়ারের চশমা পরে কয়লার দোকানে কয়লা মাপছে।

বোমা আর পাইপগানের অধীত বিদ্যা কাজে লাগিয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চললে শর্টকাটে বড়োলোক হতে পারবে এবং রঞ্জুর সঙ্গে অতীতের সব শত্রুতা তারা ভুলে যাবে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক পার্টি প্রস্তাব দিয়েছিল। সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে রঞ্জু এখন কয়লা মেপেই সুখী। ওরাও রঞ্জুকে আর ঘাঁটায়নি তারপর।

গণেশ অবশ্য আগের চেয়েও বেশি জোরে ঘোষণা করছিল, পশ্চিমবঙ্গে গণফৌজ 'মার্চ' করবেই। তবে সে 'মার্চে'র সালটা এখন বদলে গেছে, আর গোঁফ রাখে না বলেই হয়তো তার হাসিকে এখন নির্বোধতর

মনে হয়। এমনকি সেখানে এক অচেনা ধূর্ততার ছাপ দেখে ছাঁৎ করে ওঠে নন্দিনীর বুক। একমাত্র অনির্বাণ বলেছিল—'যদি অনেক ভুলও হয়, কিংবা সবই ভুল তবু প্রথম থেকে হলেও শুরু তো করতে হবে আবার, থামা কি সম্ভব?'

—হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আর পারব না। বলে অনির্বাণকেও ফিরিয়ে দেয় নন্দিনী।

কেবল মামিমার বাড়িতে গিয়ে নন্দিনী দেখল, সব ঠিক আগের মতোই রয়েছে। সেই চার ঘর, দুই উঠোন—মায় নাইনিদের একচালাটা পর্যন্ত। শুধু নাইনি সুনীলদাকে বিয়ে করে তার ঘরনি হয়েছে। তার হাসিতে নন্দিনীর প্রতি সেই পুরনো অভ্যর্থনা ছিল। মামারও খুশির অন্ত ছিল না নন্দিনীকে দেখে। আর আশীর্বাদভরা স্নেহের হাত বারবার স্পর্শ করছিল নন্দিনীর মাথা। সুবীর তার হাত ধরে আনন্দে উচ্চিংড়ের মতো লাফাচ্ছিল।

কেবল, যে-মানবীর আকর্ষণ তাকে টেনে এনেছে এ বাড়িতে, তিনি বসেছিলেন উচ্ছ্বাসহীন, স্তব্ধ এক শোকগাথা হয়ে।

মামা আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন নন্দিনীকে। বললেন, 'মাথাটা কেমন হয়ে গেছে ভাগনি। তুমি যেন মনে দুঃখ পেও না ওর ব্যবহারে।

—কবে থেকে মামা? কবে থেকে?

মামা চুপ করে থাকে। সে কি আর কেউ জানে? সে খবর কি কেউ রাখে? কত দীর্ঘনিশ্বাস বুকের ভেতর জমিয়ে রাখতে রাখতে মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়—কত হাজার ঠোঙায় আঠা মাখালে একসময় থেমে যায় হাত—কোন্ স্বপ্ন ভেঙে গেলে কথা বলতে ভুলে যায় মানুষ—সে খবর কেই বা রাখতে পারে!

—ও মামিমা, আমি নন্দু, আমাকে চিনতে পার না?

—ও মা, তোকে চিনব না? তোকে কি ভুলতে পারি? যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে কথাগুলো বলেই আবার অতল ঘুমে তলিয়ে গেলেন মামিমা।

—ও মামিমা, খিদে পেয়েছে যে! নন্দিনী বলল। এ কথা শুনে মামিমা উঠে রান্না করলেন। সেই পাতলা মসুর ডাল। আলুভাজা। মামা একটা ডিম নিয়ে এলে ডিমভাজাও হল। সুবীরকে নিয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে খাওয়া-দাওয়া, গল্প এইভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে এলে মামিমা রুটিও বানালেন। সেই আগের মতোই সুন্দর গোল হয়ে ফুলে ওঠা রুটিতে পোড়ার একটি দাগও ধরল না।

—সুবীর, মামিমা পাগল হয়নি রে! মামিমা আর পারে না রে।

—জানি দিদি, তাই তো অন্য সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। এখন ঠোঙা বানিয়ে ক পয়সা দিদি? দুটো টিউশানি করে আমি তার ডবল পয়সা রোজগার করি।

এক চান্সে দ্বিতীয় বিভাগের হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে সুবীর কলেজে পড়তে পড়তেই শ্রম ও পুঁথিগত বিদ্যার মূলাভেদ খেয়াল করতে পেরেছে বটে, কিন্তু সারা জীবনের শ্রমের মূল্যে গড়া সুবীরের এই সাফল্য মামিমার মনকে এখন স্পর্শ করতে পারছে কি না বুঝতে বুঝতে রাত কাবার করে ফেলে নন্দিনী।

বাড়ি ফেরার জন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাওয়ার নীচে নন্দিনী পা দেওয়ার আগেই নির্বাক বিষণ্ণ মামিমা এই প্রথম নিজে থেকে কথা বলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই যে চার বছর জেল খাটলি, তা তোদের সে সবের কী হল?

কেঁপে উঠে বুঝেও অবুঝ হয়ে নন্দিনী মামিমাকে প্রশ্ন করে, "কী সবের? মামিমা?"

সুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে, এমন নৈঃশব্দ্যের ভেতর হ্যারিকেনের ম্লান আলোর অন্ধকারে তার প্রশ্ন তার কাছেই ফিরে এলে মামিমা আবারও জিজ্ঞেস করেন, 'সেই যে বলতি, সব মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচবে! তা তোদের সে সব হবে না?

পুলিশের ঘুষি, লাথি আর লাঠির বাড়ি-খাওয়া তার মতো মেয়ের চোখে জল মোটেই মানায় না জেনেও, নন্দিনী মামিমার কোলে মাথা রেখে কাঁদে। অনেকক্ষণ পর মামিমাই তার মাথায় হাত রাখেন, 'যা এখন বাড়ি যা। রাত অনেক হল।' তবু মামিমার হাত মুঠোর মধ্যে ধরে রেখে সে অনুভব করে অনন্ত শ্রমে রুক্ষ

আর শীর্ণ শিরা-ওঠা বয়সহীন এক হাতের স্পর্শ। মামিমার কোলে শুয়ে-শুয়ে সে দেখে দ্বাদশীর ক্ষয়া চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, আজও যুদ্ধে যাচ্ছে কালপুরুষ।।

বছর তিনেক পর সুবীর বি কম পাস করে যায়। মামা বলেছিলেন সেকেন্ড হয়েছে সুবীর। অবাক হয়ে সুবীরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নন্দিনী টের পায়, সেকেন্ড নয়, সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাস করেছে সে। নাম সই আর চিঠি লিখতে পারা, মামার কাছে দুটো শব্দের কোনও তফাত নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু মামিমার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যে লেখাপড়া শেখা, বি কম পাস করেও সে লেখাপড়ার অর্থ চাকরি পাওয়া নয়, ঘরে পয়সা আসাও নয়, বরং তার অর্থ শিক্ষিত বেকারের দলে নাম লিখিয়ে সুবীরের হাসিভরা মুখে অন্ধকারের ছায়াপাত। অথচ দু-বেলা দু-মুঠো ভাত খাবার জন্যও তো পয়সার দরকার! পয়সার দরকার মামিমার চিকিৎসার জন্যও—এসব চিন্তা ও দুশ্চিন্তায় শীর্ণ হতে হতে কোঁচকানো ধুতি শার্ট পরে মামা একদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। তারপর থেকে একরকম পাগলই হয়ে গেলেন মামিমা।

মামার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কেবল চাকরি খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হয়ে টিউশনির চাপে নিজের যৌবনকে হারিয়ে ফেলার আগেই সুবীর আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধান পায়। সে প্রদীপ মামা মামিমার কাছেই পড়েছিল। কেবল তারা তা ব্যবহার করেননি কোনওদিন। করতে জানতেনও না। এখন বাণিজ্যবিদ্যার স্নাতক হয়ে সুবীর সে প্রদীপের ব্যাবহার বুঝে নেয়।

ভি আই পি রোডের ওপর এক সদাব্যস্ত মোড়ের মাথায় মামার পুকুরসহ ছ কাঠা জমির চার কাঠা প্রমোটারের হাতে তুলে দিয়ে সুবীর নিজের জন্যও দু কাঠা জমি রেখেছে। তার মায়ের বড়ো শখ ছিল নিজের ছোট্ট পাকা বাড়ি বানানোর। তাই ভবিষ্যতে কখনও ওই জমিতে বাড়ি তুলবে বলে ভেবে রেখেছে সুবীর। চার কাঠা জমি প্রমোটারকে দিয়ে সুবীর এক হাজার স্কোয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছে, সঙ্গে পেয়েছে বেশ কিছু টাকা ও একটি দোকান।

দোকানের নাম মামার নামে রেখেছে সুবীর। কাগজের দোকান থেকে কাগজ আনতে গিয়ে প্রায়ই অপমানিত হতেন মামিমা। সে কথা মনে রেখে নিজেই কাগজের এক হোলসেলের দোকান দিয়েছে সে। তার কাগজের দোকান এখন খুব ভালো চলছে।

সচ্ছল হয়েও মাকে অযত্ন বা অবজ্ঞা করতে শেখেনি সে। জেলে বা পাগলাগারদেও পাঠায়নি। মায়ের সে যথাসাধ্য চিকিৎসা করে তবে একটি বউ ঘরে নিয়ে আসার জন্য সে যে ব্যাকুলতা অনুভব করে আজকাল তা যৌবনের প্রয়োজনে, না ঘর বাঁধার স্বপ্নে, নাকি মাকে সেবাযত্ন করার জন্য এক রমণী হস্তের প্রয়োজনের কথা ভেবে—সেটা মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলে সুবীর। তবু নিজের সন্তানকেও এখন আর ঠিকমত চিনতে পারেন না মামিমা।

তারপর চলে গেছে বহুদিন। মামিমার কাছে আর যাওয়া হয়নি। তবু কখনও ভি আই পি রোড ধরে যেতে হলে সুবীরের 'অখিলচন্দ্র পেপার হাউস' আর মামার জমিতে তৈরি বহুতল অট্টালিকার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে নন্দিনী। ভাবে একদিন নামবে, নিশ্চয়ই নামবে—গিয়ে দেখে আসবে মামিমাকে। এতদিনে ঠিকই সেরে উঠেছেন মামিমা। এই মহিলার ক্লান্তিহীন কর্মব্যস্ত হাতেই তো একদিন হার-না-মানা চিরপ্রবহমান সেই জীবনযুদ্ধ চিনিয়েছিল নন্দিনীকে।

আর কখনও কখনও প্রবাসে ঝিঁঝি আর শেয়ালের উল্লাসধ্বনিভরা একলা নির্জন রাতে ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে এলে বাইশ বছরের ওপার থেকে এসে নন্দিনীর চল্লিশ ছুঁই ছুঁই চুলে হাত রেখে স্নেহভরা চোখে চেয়ে থাকেন সেই মহিলা, কোনও এক আলো নেভানো রাতে যাকে কালপুরুষ চিনিয়েছিল নন্দিনী। □

নামকরণের ইতিকথা

মোহিত রায়

নামকরণের ঝক্কি কি কম?

তাও আবার তিন মেয়ের পর এক ছেলে। ছেলের বাবার নামে যদিও পালিশ নেই—শ্রীখগেন্দ্র সেন - তবু এক ছেলের নাম দেওয়া কি সোজা ব্যাপার!

দেশ থেকে ছেলের ঠাকুমা পোস্টকার্ড পাঠালেন—'শ্রী ভগবানের অশেষ কৃপায় তোমাব পুত্র সন্তান হইয়াছে। অতএব ছেলের নাম রাখিবা বিষ্ণুপদ। ভগবানেব পদ সেবাই যেন তাব লক্ষ্য হয়। . .'

সবচেয়ে বড়ো দিদির বয়স এগাবো। সুতরাং তারও একটা পছন্দ আছে। ভায়ের নাম দেওয়ার অধিকার ছাড়তে সে রাজি নয়, যদিও তার জানা নামেব সীমানা এখনও বাড়েনি। সে তার স্কুলের বন্ধুর নাম— মলয় সুপারিশ করল। তাই ভাগ্যি ভালো ছোটো বোন দুটি নামমাহাত্ম্য সম্পর্কে এখনও উদাসীন।

ছেলের মায়েরও শখ আছে। সে স্বামীর কাছে কথাটা পাড়ল—ওগো আমাদের মলার (ছেলেব বর্তমান নাম) নাম দিও স্বদেশ। অবশ্য এর পেছনে ইতিহাস আছে। হৈমবতী একদা যার খুব প্রিয়পাত্রী ছিল সেই ছোঁড়ার নাম স্বদেশ। হৈমবতী বোধ হয় এখনও তা ভোলেনি।

তবু সুপ্রিম কোর্টে কারও আপিলই টিকল না। খগেনবাবু তাঁব এক বন্ধুব সাহায্য নিয়ে ছেলেব নাম ঠিক করলেন। অন্নপ্রাশনের দিন নাম হল—পৃথ্বীরাজ।

এবার ঘরের কথায় আসা যাক। খগেনবাবুব মধ্যবিত্তের সংসার। খুব একটা অভাব নেই। তবে প্রাচুর্যও নেই। পৃথ্বীরাজ বড়ো হতে থাকল। কিন্তু সময়েব স্বাক্ষব সবকিছুব উপরেই পড়ে।

পৃথ্বীরাজ তার ব্যতিক্রম নয়। ঘরে মা মনাই ডাকে। বাবা তাঁর নিজেব দেওয়া নামেব দেমাক ছাড়তে বোধ হয় নারাজ। তাই প্রথমে পৃথ্বীরাজই ডাকতেন—এখন ডাকেন রাজা।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের রাজত্ব গেল বন্ধুমহলে। বন্ধুরা তাকে ডাকে পৃথ্বী এবং এই নামেই আজকাল সে সুপরিচিত। ছেলে হিসেবে পৃথ্বীরাজ ভালোই। পড়াশুনোয় ভালো, পাড়াতেও তাব সুনাম আছে। এবং মেয়েমহলেও পৃথ্বীরাজের নাম ইদানীং আলোচিত হয়।

অতএব নাম পালটাল। চৈতালি পৃথ্বীরাজকে ডাকে পৃথু বলে, চিঠিতে তাই লেখে। পৃথ্বীরাজও চৈতালিকে কিছু একটা ডাকে তা জানার আপাতত কোনও দরকাব নেই।

কিন্তু এহেন পৃথ্বীরাজের উপর খগেনবাবু আজকাল চটেছেন। কাবণ ছেলেকে আর বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। তিনি জেনে গেছেন রাজা আজকাল রাজনীতি শুরু করেছে। রাজা ঠিকমতো বাড়ি ফেরে না, পড়ার বইয়ের চাইতে অন্য বইয়ে মন বেশি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অভিযোগ। এই যে রাজার উপব তাঁর এত বিশ্বাস, তা আর তিনি রাখতে পারছেন না। বাড়িতে রাজার সিংহাসন টলল। খগেনবাবু সে দিন রাতে ছেলেকে বললেন, 'উল্লুক! রাস্কেল। কলেজের পড়া নেই? খালি টো টো করে ঘোবা।'

ছেলের নতুন নাম হল খগেনবাবুর মুখে। তারপরের ঘটনা আকছার ঘটছে আজকাল। পৃথ্বীরাজ একদিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেপাত্তা। পাড়ার লোকেব শ্রদ্ধা-ভীতি সে আগেই আকর্ষণ করেছিল, এবার তার নামে নতুন খবর যোগ হল পৃথ্বী গ্রামে চলে গেছে, চাষিদের হয়ে লড়তে।

এখন আব স্বতন্ত্র পৃথ্বীকে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। হাজার লড়াকু মানুষেব সে একজন। তবু একদিন খবর

এল—কৃষকের ফসল রক্ষার সংগ্রামে শহিদ হয়েছে সে। পৃথ্বীরাজ আজ তাদের একজন—যাদের মৃত্যু হিমালয়ের চেয়েও ভারী।

কয়েকদিন পর, ওর পাড়ায় এক লুকোনো জায়গায় ছোট্ট সভা বসে রাতে। পৃথ্বীর নামে এক শহিদ বেদি হবে, তার চাঁদাও মোটামুটি তোলা হয়েছে জনসাধারণের কাছ থেকে। কিন্তু শহিদ বেদিতে লেখা থাকবে কী? শুধু পৃথ্বীরাজ নয়, তার মহান জীবনের স্মারক হিসেবে কি শ্রীযুক্ত নামের আগে নতুন কিছু যোগ হবে না?

পৃথ্বীর সেই নতুন নামের খোঁজে এই সভা। নিপীড়িত মানুষের জন্য গ্রামেগঞ্জে যে মহাকাব্য তৈরি হচ্ছে, তার চরিত্রের এক নতুন নাম খুঁজছে তার সহযোদ্ধারা। বিষ্ণুপদ—মলয়—স্বদেশের কবরের উপর নতুন ফুল ফোটার অপেক্ষায়—কী নাম রাখবে তুমি পাঠক?

আমি রাখব—কমরেড! □

মৃত্যুহীন

সনৎ বসু

বটগাছের মাথা থেকে নেমে এল সুখন। ক্যানেস্তারাটা কাঠিসুদ্ধ ঝুলিয়ে রাখল গাছের ডালে। রাতে ভীষণ ধকল গেছে। কাল সারাদিন সুখনের কেটেছে অধীর ব্যস্ততায়। টাঙ্গি, বল্লম, লাঠি জোগাড় করা। বিষমাখানো তিরগুলো গাছের কোটরে, ঝোপেব ভিতর লুকিয়ে রাখা। কত কাজ! আগের রাতেও মাধো সিংয়ের লোক এসেছিল। ওদের ছোড়া তিরে দু চারটে ঘায়েল হতেই পালিয়েছে লেজ তুলে।

ধানের রং কাঁচা হলুদ। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে শীতের মিঠে রোদ। উত্তরের পাহাড় থেকে উড়ে আসছে হিম-হাওয়া। সোহাগে ধানের গাছ শরীর দোলায়। হঠাৎ উছলে উঠে লুটোপুটি খায় মুখিয়ার ছোটোমেয়ে মাংলির মতন। সুখন প্রাণভরে দেখে। ওদের রক্তে বোনা ধান। ওদের মেহনতের ফসল। সুখন হাঁটে। খেতের এ ধার ও ধার। গত সালেও খেতের জমিন রাঙা হয়েছে গনশা আর ডুমরির খুনে। তবু ধান ওরা পায়নি। এ-সালে তার জবাব দিতে হবে। সুখন হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'হুঁশিয়ার'। বুধু মাস্টার বলে গেছে, 'খুব সাবধান, ওরা যে কোনও সময় হানা দেবে।'

সূর্য ডুবতেই চারদিক অন্ধকার। হিমের রাজত্ব। সুখনের আর ঘর যাওয়া হল না। মাস্টার খেতের দায়িত্ব দিয়ে গেছে ওর ওপর। সাঁঝ নামতেই তিন ভাঁড় হাড়িয়া খেয়ে নিয়েছে সুখন। রঘুয়া, বাবুলাল, কাল্লু, শিবু সবাই গিলেছে। শীত তবু দশ হাত বিস্তার করে ওদের ওপর চেপে বসতে চায়। আগুন জ্বালানো বারণ। তাতে শত্রুর সুবিধে। অন্ধকার চিরে ওদের সতর্ক চোখ মাঠ পেরিয়ে এ ধার সে ধার ঘোরে। টিলার ওপর উঠে দাঁড়ায় সুখন। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে কী যেন দেখবার চেষ্টা করে। বুধু মাস্টার বলেছে, 'ধান না পেলে ওরা সব জ্বালিয়ে দেবে আক্রোশে। একবার আগুন লাগলে সব শেষ। খুব হুঁশিয়ার।'

'হুঁশিয়ার'......'হুঁশিয়ার'.........সিংহের চাপা গর্জনের মতো সুখনের কণ্ঠস্বর সাথিদের হৃৎপিণ্ডে কাঁপন তোলে। 'জান দিব। ধান না।'। ডিঙাপাড়ার মরদরা এবার মাধো সিংকে বুঝিয়ে দেবে কলিজার জোর কার বেশি। ওদের সাথে হাত মেলাবে পাহাড়িখোলা, জংলাবাড়ি, খারুয়া, পাদানটোলি, রুখাটোলি—আরও পাঁচ গাঁয়ের মানুষ। রক্তে বোনা ধান রক্ত ঢেলেই নিয়ে যেতে হবে ঘর। কিন্তু বুধু মাস্টার? বুধু মাস্টার গ্রাম ছাড়ল পাঁচদিন আগে। গাছের মাথার আস্তানার দিকে হাঁটে সুখন। যাওয়ার আগের দিন মুখিয়ার ঘরে ওদের সবাইকে ডাকল মাস্টার। বলল, 'তিনদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। মাঠের ধান সামলে রাখিস।' মঙ্গলা আর পোহাতুকে নিয়ে গেছে মাস্টার। জরুরি কাম বেলডুবি কোলিয়ারি। মঙ্গলা আর পোহাতুর ফেরার কথা দু দিন পরেই। কেউ ফিরল নাই। সামনে লড়াইয়ের দিন। হাজার চিন্তার ভেলায় ভাসতে ভাসতে এক সময় সুখন তলিয়ে যায় অতলান্ত ঘুমের সমুদ্রে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। সুখনের কানের কাছে হঠাৎ জেগে ওঠে বুধু মাস্টারের গলা, 'সুখন সর্দার....।' ঘুমের পাহাড় টলে যায়। তাড়াতাড়ি মাচার ওপর উঠে বসে সুখন। আশপাশে তাকায়। নাঃ। কেউ কোথাও নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় স্নান করছে চারিদিক। ঝিঁঝির একটানা গানের দোলায় ধানগাছের মাথাগুলো মাতালের মতো দুলছে। সুখন চোখ মেলে দেয় বহুদূর। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট্ট টিংলু নদী। গলানো রুপোর মতো চিক চিক করে জল। স্বপ্নাবিষ্টের মতো চেয়ে থাকে সুখন। হঠাৎ ওর চোখ দুটো বড়ো হয়ে যায়। কুঁচকে আসে ভ্রূ। মুহূর্তে একেবারে মগডালে চড়ে বসে। এবার দেখতে পায় স্পষ্ট। প্রথমে একটা। তার পিছনে এক-দুই-তিন-চার পাঁচটা। দলবেঁধে নেমে আসছে নীচের দিকে। নিমেষে নিজের জায়গায় ফিরে আসে

সুখন। গাছের ডালে বাঁধা ক্যানেস্তাবাটা খুলে নেয়। পাগলের মতো কাঠির ঘা মারতে থাকে। পাতালের নিস্তব্ধ গহ্বর থেকে যেন সহসা বেরিয়ে আসে একটা দৈত্য। ড্যাংডারা.......ড্যাংডারা.......ডুমাডুমা.......ড্যাংডারা......। সঙ্গে মুখের বীভৎস আওয়াজ। পূর্ব পশ্চিম কোণের পাহারাদাররাও একযোগে বাজিয়ে চলে টিন, ড্রাম, ক্যানেস্তারা। সমস্ত এলাকাটা যেন আদিম মানুষের হিংস্র চিৎকারে ফিরে যায় প্রস্তর যুগে। পাহাড়ের ঢালে থমকে দাঁড়ায় হাতির পাল। শুঁড়গুলো তুলে ধরে মাথার ওপর। কানগুলো কুলোর মতো খুলে যায়। তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে অদৃশ্য হতে থাকে পাহাড়ি জঙ্গলের দিকে।

গাছের ডালে বসে সব দেখে সুখন। মুখে ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি। নীচে নেমে বিপদ কেটে যাওয়ার সঙ্কেত জানায়। ক্যানেস্তারাগুলো থামতে থামতে এক সময় চুপ হয়ে যায়। পুবের আকাশ তখন সূর্যের আলোয় রক্তাক্ত হওয়ার সময় গুনছে।

ভোরের হাওয়া। সুখনের চোখ ঢুলুঢুলু। কাল বাদে পরশু ধান কাটা। বুধু মাস্টার আজ ঠিকই আসবে। মাঝ রাতে মুখিয়ার দাওয়ায় মিটিন। দুপুরে বুধু মাস্টারের ঘর যাওয়ার কথা আছে সুখনের। পুনিয়া মাইজি সুখনকে খুব ভালোবাসে। ওদের দুজনকে একসাথ দেখলে সুখন বুকে সাহস পায়। রক্ত চাঙা হয়ে ওঠে। পুনিয়া মাইজি এই দু সালের ভিতর গ্রামের মেয়েদের চোখ খুলে দিয়েছে।

সুখন তাড়াতাড়ি হাঁটে। খুব খিদা লেগেছে। মঙ্গলা ঘর নাই। হয়তো মাস্টার ওকে অন্য কাম দিয়েছে। বুধু মাস্টারের কথা ভাবে সুখন। রাতের আঁধারে ওরা সে দিন মুখিয়ার ঘরে এসে উঠল। জানাজানি হতেই গ্রামের লোকে খেপে গেল মুখিয়ার ওপর। শহরের দিকুরা গাঁয়ে থাকলে ঝামেলা ফিরে, ওদের ভুল ভাঙতে দেরি হল না। এক মাসের মধ্যেই নতুন বাবু হয়ে গেল সবার বুধু মাস্টার।

মঙ্গলার মুখেই ওর কথাটা শোনা। সেবার মঙ্গলা গিয়েছিল মাস্টারের সাথে বহুত দূরের খনিতে। সেখানে কুলি বস্তিতে গায়ের মেয়ে কুপনির সাথে দেখা। মাধো সিং খুন করিয়েছিল ওর মরদ টুনু ওঁরাওকে। রাগে দুঃখে পেটের ধান্দায় কুপনি গ্রাম ছেড়েছিল পাচ সাল আগে। বুধু মাস্টারকে দেখে আদাব জানিয়েছিল কুপনি। মঙ্গলা তা দেখে দারুণ অবাক। কুপনি বলল, 'ও তো সাধন বাবু। কুলি লাইনের নেতা ছিল। ও বাবুর জন্যই খাদের নীচে চাপা পড়া দশটা লাশ গায়েব করতে পারেনি মালিকের লোক। উলটে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। জেনানাদের নোকরি দিয়েছিল। শেষে পুলিশের তাড়া খেয়ে বাবু পালাল। মালিকের সুবিধা হল। এখন আবার আগের মতন জুলুম করে। ফায়দা উঠায়।'

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুখন এগোয়। দশটা গাঁয়ের লোক এবার জোট বেঁধেছে। বুধু মাস্টার নেতা। জান কবুল করতে হবে। তবেই জিত। লড়াইয়ের কথা ভাবলেই রক্ত নেচে ওঠে। কানে বাজে হাজার লোকের উল্লাসের শব্দ। ডুমাডুমা ড্যাংডারা.......ডুমাডুমা ড্যাংডারা...... । পাহাড়ের জঙ্গলে পলায়মান হাতির পাল।

মাঠ ছেড়ে বাশবনের ভিতর দিয়ে পা চালায় সুখন।

চারদিক ফরসা হয়ে এল। বাঁশঝাড়ের মাথায় পাখিদের কিচিরমিচির। পায়ের নীচে শুকনো পাতায় মড মড়। বাঁয়ে একটু তফাতে করালির ডোবা। মুখিয়া বলেছে ডোবায় করালি নামে এক ডাইন থাকত। অনেক অনেক সাল আগে। মুখিয়ার ঠাকুরদা দেখেছে। ডোবার কিনার জুড়ে মানুষ সমান উঁচু ঝোপঝাড়। ঝোপের আনাচে কানাচে অন্ধকার। শিস দিতে দিতে হাঁটে সুখন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ঝোপের ধারে ঘাসের জমিতে দাঁড়িয়ে দুটো শিয়াল। কী একটা নিয়ে কামড়াকামড়ি করে। কাছে যেতেই শিয়াল দুটো দুড়দাড় করে পালায়। আবছা আলো-আঁধারির মধ্যেও সুখন স্পষ্ট দেখতে পায় একটা শরীর। সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে। মেয়েমানুষ। নাক-মুখ থ্যাতলানো। ডোবার দিকে চোখ যায়। ঘন কুয়াশা। কুণ্ডলী পাকিয়ে সাদা ধোঁয়া উঠছে ওপরে। সুখনের বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। শরীরটা টানতে টানতে নিমেষে এনে ফেলে হাঁটা পথের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গেই ও পাথর হয়ে যায়। ওর সামনে মঙ্গলার নাঙ্গা শরীর। পায়ের খানিকটা অংশ খুবলানো। কমলা রঙা শাড়ির ফাঁস গলায়। এই শাড়িটা পরেই মঙ্গলা গিয়েছিল বুধু মাস্টারের সাথ। সুখনের রক্তে কয়েকশো ডিনামাইটের বিস্ফোরণ। হাত-পা কাঁপে থরথর। চোখ দিয়ে ঠিকরোয় আগুন। উলঙ্গ শরীরটা কাঁধে তুলে ছোটে গাঁয়ের দিকে।

সুখনের গলার আওয়াজে চালা ছেড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ। উদ্‌ভ্রান্ত সুখন ছুটে যায় মুখিয়ার কাছে। একটা আগুনের হলকা যেন ডিঙ্গাপাড়ার প্রতিটি হৃৎপিণ্ডকে গ্রাস করে নেয় মুহূর্তের ভিতর। টাঙ্গি, হাঁসুয়া, বল্লম, তিরধনুক নিয়ে আহত সিংহের মতো গর্জায় গাঁয়ের লোকেরা।

চাদরে গা-মাথা মুড়ে পাহাড় ডিঙিয়ে গাঁয়ে ফিরছিল ক্লান্ত বুদ্ধদেব। সঙ্গে চারজন সশস্ত্র প্রহরী। কাল রাত থেকে জ্বর। সমস্ত শরীর বিষ ব্যথা। মাথা ভার। ডিঙাপাড়া এখনও মাইল দুয়েক। বাস স্ট্যান্ডে আরেকটু হলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হত। সঙ্গী মহাদেব মুর্মু সাদা পোশাকের টিকটিকিটাকে চিনতে পেরেই তাড়াতাড়ি বুদ্ধদেবকে রিকশায় তুলে পালিয়ে এসেছে। মোটামুটি সব ব্যবস্থা পাকা। অন্যান্য গ্রামেও শেষ নির্দেশ পৌঁছে গেছে। বাধা আসবেই। জমির ধান কেড়ে নিতে মরিয়া হয়ে ছুটে আসবে ওরা। সঙ্গে আসবে ভাড়াটে গুন্ডা আর পুলিশ। চাষিরাও এবার তৈরি। পালটা মারে হটে যেতে বাধ্য হবে জোতদার আর তার দালালরা। বুদ্ধদেবের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসে। পরমুহূর্তেই ও অন্যমনস্ক। পূর্ণিমা কেমন আছে কে জানে। কতবার বলেছে রোগটার চিকিৎসা করাতে কলকাতায় গিয়ে। পূর্ণিমা কিছুতেই রাজি হয়নি। এই সময়ে চলে গেলে গাঁয়ের মেয়েদের মনোবলে চিড় ধরতে পারে। পূর্ণিমার জন্য ওর গর্ব হয়। কলেজ জীবনের সেই উন্মাদনাময় দিনগুলির কথা মনে পড়ে।

পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে আসানসোলের কোলিয়ারি এলাকায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বুদ্ধদেব। পূর্ণিমাও পিছিয়ে থাকেনি। বাড়ির সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধদেবের সাথে জীবনকে বেঁধেছিল।

বুদ্ধদেবের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল সেই রাতটা। বর্ধমানের এক অখ্যাত গ্রাম। ওদের বিয়ের দিন সঙ্গী দুজন কমরেড আর গ্রামের মানুষ। রাত বাড়তে সবাই একে একে চলে গেল। জীর্ণ চালায় শুধু ওরা দুজনে। চালের ফুটো দিয়ে চাঁদের মিষ্টি আলো ঝরে পড়েছিল খড়ের বিছানায়। সারারাত ওরা ঘুমোয়নি। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছিল। মুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন। শোষণ বঞ্চনাহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন।

পরদিন অনেক বেলায় ওদের ঘুম ভেঙেছিল।

মনসাডাঙার বিল আড়াআড়ি পার হয়ে কাঁচা রাস্তায় এসে ওঠে বুদ্ধদেব। দু পাশে নিচু জমিতে পাকা ধানের ঢেউ। মাঠের পর মাঠ ঢেকে গেছে সোনালি ধানে। এবার সব ধান যাবে চাষিদের ডেরায়। ভাবতে ভাবতে হাঁটে বুদ্ধদেব। হঠাৎ ওর সঙ্গী প্রহরীরা দাঁড়িয়ে পড়ে। ইশারায় বুদ্ধদেবকেও থামতে বলে। একজন তরতর করে উঠে যায় রাস্তার পাশের তালগাছের মাথায়। দূরে কী যেন লক্ষ করে স্থিরনিশ্চিন্ত হয়ে নেমে আসে তাড়াতাড়ি। বুদ্ধদেবের কানে কী যেন বলে। ওরা গাঁয়ের দিকে ছুটতে থাকে।

বাঁশঝাড়টা পেরোতেই মিছিলটা দেখতে পায় বুদ্ধদেব। বিপদ আঁচ করে চেঁচিয়ে ওঠে দূর থেকে। সশস্ত্র মিছিল থমকে দাঁড়ায়। বুদ্ধদেব ছুটে যায় ওদের মধ্যে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে আসে সুখন। উশকোখুশকো চুল। চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল। 'মাস্টার, মঙ্গলারে খুন করল মাধো সিং। মঙ্গলার ইজ্জত নিল মাধো সিং।' সুখন পাগলের মতো বুক চাপড়ায়। বুদ্ধদেবকে টানতে টানতে নিয়ে আসে মুখিয়ার উঠোনে। মঙ্গলার বীভৎস শরীরে একপলক দৃষ্টি বুলিয়েই বুদ্ধদেব ঘুরে দাঁড়ায়। পোহাতু কোথায়? মঙ্গলার সাথে পোহাতুও ছিল। বুদ্ধদেবের প্রশ্নের উত্তর দেয় না কেউ। সুখন বিকট চিৎকার করে ওঠে, 'পোহাতু উ-উ-উ।'

বুদ্ধদেব অনুশোচনায় ছটফট করে। জংলাবাড়ির মলিনবাবুর কাছে চিঠিটা পৌঁছে দিয়েই গাঁয়ে ফেরার কথা ছিল মঙ্গলা আর পোহাতুর। ওদের বারবার বলে দিয়েছিল পাহাড়ের দিক দিয়ে গাঁয়ে ঢুকতে। অত্যধিক সাহসের জন্যই মরল ওরা। বুদ্ধদেব মাথা তোলে। 'প্রতিশোধ নিতে হবে কমরেড। চরম প্রতিশোধ। এখন শুধু ধৈর্যের পরীক্ষা। অস্ত্র রেখে আগে এসো মঙ্গলার সৎকার করি।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আদেশ পালন করে প্রতিটি মানুষ। সাঁঝ নামতেই জড়ো হয় পাহাড়ের কোলে। নদীর কিনারে। জঙ্গলের শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরি হয় চিতা। অন্ধকারে লকলক করে ওঠে আগুন। চিতা ঘিরে অধীর মৌনতায় বসে থাকে গ্রামের মানুষ।

মাঝ রাত। মুখিয়ার দাওয়ায় উপস্থিত পঞ্চাশ জোড়া চোখ। ফিস ফাস। হিস হিস। সাপের ফণার মতো

হিংস্র আক্রোশে ফুঁসতে থাকে কালো মানুষগুলো। বুদ্ধদেব প্রয়োজনীয় নির্দেশ পৌঁছে দেয় প্রত্যেকের কানে। লড়াইয়ের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে শেষ আলোচনা সেরে নেয়।

ভোর। পাহাড়ের মাথায় প্রভাতী সূর্যের আলো। কুয়াশার মায়াজাল কাটিয়ে রোদের উঁকিঝুঁকি। গ্রামজীবনে আরেকটা নিস্তরঙ্গ দিনের শুরু। নৈমিত্তিক কাজ। নদী থেকে জল আনা। পাহাড়ের ঢালে গোরু ছাগল চরানো। জঙ্গলে কাঠ কাটা। খেতের কাজ। সূর্য একসময়ে ঢলে পড়ে নদীপাড়ের গাছগাছালির মাথায়। সমস্ত দিনটা পূর্ণিমা, ভামিনী, সুখন, রঘুয়া, কাল্লুরা কাটিয়ে দেয় ন্যস্ত দায়িত্বের বোঝাপড়ায়। চালায় শুয়ে জ্বরে কাঁপতে থাকে বুদ্ধদেব।

অন্ধকার নামতেই শুরু হয় প্রস্তুতি। গাঁয়ের দুটো মুখ আগলে দাঁড়ায় দুটো দল। বাকিরা চুপি চুপি জড় হয়ে খেতে। তিরন্দাজরা খেতের চারপাশের বট, অশত্থ, শিমুল গাছে পজিশন নেয়। সুখনের কাঁধে হাত রেখে সব ঘুরে দেখে বুদ্ধদেব। সুখন ছাড়া তার অসুস্থতার খবর কেউ জানে না। আজ দুপুরের খবর, বাইরের লোক এনেছে মাধো সিং। ওরা কি টের পেয়ে গেছে। পেলেও আর পিছোনোর উপায় নেই। দশ গাঁয়ে ধান কাটা একই রাতে। জোতদাররা যে যার খেত সামলাতেই ব্যস্ত থাকবে। কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। সব দিক দেখে নিয়ে সুখন গোপন সঙ্কেত পাঠায় গাছের মাথায় অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে। ওখান থেকে উত্তর আসা মাত্রই শুরু হয় কাজ।

ঝপ্ ঝপ্.. ......ঝপ্ ঝপ্...........কাস্তের ঘায়ে নুয়ে পড়ছে ধানগাছগুলো। একদল শুধু কাস্তে চালিয়ে এগোয়। চটপট তা চালান হয়ে যায় গাঁয়ের পিছন দিকের গোপন ডেরায়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ এগোতে থাকে। নিখুঁত যন্ত্রের মতো। খেতের মাঝে দাঁড়িয়ে সুখন ক্রমাগত তাড়া দিয়ে যায়। কাপড়ে জড়ানো স্টেনটা বগলে নিয়ে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব। শত্রুর আক্রমণের একমাত্র সবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

হঠাৎ দূরে জেগে ওঠে কীসের আলো। ধীরে ধীরে আলোটা এগিয়ে আসতে থাকে। কখনও গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। সুখন ছুটে আসে বুদ্ধদেবের কাছে। বুদ্ধদেবের কথামত বিপদের সঙ্কেত পাঠায় গাছের মাথায় পাহারাদারদের। গাছে গাছে সেই সঙ্কেত পৌঁছোয় গ্রামে। পূর্ণিমার নেতৃত্বে তিরধনুক হাতে তৈরি থাকে সবাই।

মশাল হাতে ছুটে আসে মাধো সিংয়ের গুণ্ডারা। একেবারে গাঁয়ের মুখে। এলোপাতাড়ি গুলির শব্দ। প্রমাদ গোনে সুখন। অর্ধেক মাঠ বাকি। চাষিরা হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই দেখা যায় অন্য দৃশ্য। মশালগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। সমস্ত নীরবতাকে খান খান করে জেগে ওঠে মানুষের আহত চিৎকার। গ্রামরক্ষীদের মরণপণ প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে না পেরে ওরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

সুখন আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'জল্‌দি ভাইসব। আরও জল্‌দি।'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এগিয়ে আসে ওরা। নতুন কৌশলে। ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দেয়। ওদের তির আর গুলিতে খেতের ওপর লুটিয়ে পড়ে ডোপনা, লুদরি আর মাধুয়া। বিপদ বুঝে গাছ থেকে লাফিয়ে নামে পাহারাদাররা। তির, বল্লম, টাঙ্গি হাতে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু শত্রুরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। গুলিতে মারা পড়ে আর কয়েকজন। চাষিরা ধান কাটা ছেড়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে ভাড়াটে দালাল আর তার সাকরেদরা।

হঠাৎ টিলার দিক থেকে শত্রুদের লক্ষ করে ছুটে যায় ঝাঁক ঝাঁক আগুনের টুকরো। ফট্........ফট্........ফটা ফট......মুহূর্তে চিৎকার স্তব্ধ। মরণ আর্তনাদ ভেসে আসে অন্ধকারে। ওরা আবার পালায়।

সাব্বাস মাস্টার! সাব্বাস!

সুখনরা দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জমিতে। নতুন উদ্দীপনায় বাকি কাজ শেষ করতে থাকে। জমির পর জমি ফাঁকা করে সুখনরা থমকে দাঁড়ায় পশ্চিম কোণে ডোবার ধারটায়। প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টিতে ঘায়েল হয় আরও চারজন। পায়ের কাছে গড়াগড়ি খায় যন্ত্রণায়। সুখনের গম্ভীর মুখ। বুধু মাস্টারের আদেশ, ধান কাটা বন্ধ রেখে অন্য দিকে তাকানো চলবে না। লড়াইয়ে নামলে দু-পাঁচজনকে জান দিতে হবে। সুখনের হঠাৎ খেয়াল হয় এই জমির ধানটুকু আটকে রেখে ওরা আজকের লড়াইয়ে সান্ত্বনা পেতে চায়। ওদের মনোবলে চিড় ধরাতে চায়। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ও তিরন্দাজদের তির ছুড়তে বলে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে।

'মরদ কেউ আছিস তো আয় আমার সাথ।' ওর কণ্ঠস্বরে কী এক জাদু। মৃত্যুভয় ভুলে ওকে অনুসরণ করে কুড়ি-বাইশজন। বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতেই ওরা বিস্ময়ে লক্ষ করে টিলার ওপর থেকে শত্রুদের দিকে আবার শুরু হয়ে গেছে গুলিবর্ষণ। ফলে এ দিকে লক্ষ করে আসা সমস্ত গোলাগুলি আছড়ে পড়ে টিলার ওপর। এই সুযোগে বাকি কাজ হাসিল করে নেয় ওরা। আহতদের নিয়ে সরে পড়ে জঙ্গলের ডেরার দিকে।

তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে বুক। ঠান্ডায় অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা। তবু ট্রিগারে চেপে আছে আঙুল। গুলি শুধু গুলি। ওরা বোধ হয় আর ছুড়ছে না। হেরে গেল? হাসতে চেষ্টা করে বুদ্ধদেব। হাতঘড়িতে সময়টা দেখবার চেষ্টা করে। চোখের সামনে একরাশ অন্ধকার। অন্ধকারে ভেসে ওঠে সারি সারি মুখ। বঞ্চিত। ক্ষুধার্ত।

ভোর। আকাশ নীল। মৃদুমন্দ হাওয়া। রাতের ভয়ঙ্করতা ভুলে চরাচর এখন শান্ত। সমাহিত। চুপ নেই জঙ্গলের ডেরায় কালো মানুষগুলো। চুপ নেই ডিঙাপাড়ার পাহারাদার পুরুষ আর মেয়েরা। চোখেমুখে নতুন দীপ্তি। এক অনাস্বাদিত উত্তেজনা। সহযোদ্ধা হারানোর মূক বেদনা। মারের মুখে হটে গেছে জোতদারের দালালরা। জমির সমস্ত ধান ওদের হেফাজতে। এই সালে কেউ ভুখা মরবে না। মাধো সিংয়ের গোলামি করতে যাবে না।

মাঠ থেকে এখনও দু একজন ফিরছে। লড়াইয়ের সময় এ দিক-সে-দিক ছিটকে গিয়েছিল। বিজয়ের আনন্দে সুখন আত্মহারা। সাথিদের বুকে জড়িয়ে ধরে। অভিনন্দন জানায়।

বেলা বাড়ে। শীতের চাদর সরিয়ে রৌদ্রের মলাট ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত এলাকায়। সবাই ফেরে। ফেরে না বুধু মাস্টার। গাঁ থেকে খবর দিয়েছে পুনিয়া মাইজি। মাস্টার ঘর যায় নাই। সুখনের কপালে চিন্তার রেখা। কুথা গেল মাস্টার? ওদের হাতে ধরা পড়ে নাই তো? চিন্তাটা মাথায় আসতেই সুখন হাঁটতে থাকে খেতের দিকে। বল্লম হাতে ওর পিছন পিছন যায় কয়েকজন। দূর থেকে চোখে পড়ে টিলা। শেষ রাতে ওখান থেকেই লড়াই দিচ্ছিল মাস্টার।

টিলার নীচে এসে দাঁড়ায় সুখন। নীচ থেকে টিলার ওপরটা দেখা যায়। ফাঁকা। সুখনের মনে অন্ধকার। মাস্টার নিশ্চয়ই চলে গেছে অন্য গাঁয়ে। লড়াইয়ের নতুন জমি বানাতে। কিন্তু এখন যে কত কাম বাকি। মাধো সিং সহজে ছাড়বে নাই। আরও লড়াই দিতে হবে। অন্যমনস্ক সুখন খাঁজ ধরে ওপরে উঠতে থাকে। টিলার ঢালে ঝোপঝাড়। জংলা ফুলের গাছ। পশ্চিমকোণে এসে দাঁড়াতেই চমকে ওঠে! বুধু মাস্টার। কাঁটা ঝোপে আটকে আছে শরীর। মুখভর্তি রক্ত। খোলা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি নেমে আসে সুখন। কাঁটা ছাড়িয়ে কোলের ওপর তুলে ধরে দেহটা। শক্ত কাঠ। সারা শরীর বুলেটে ঝাঁঝরা।

মুহূর্তে খবর ছুটে যায় বাতাসে। কাঁদতে কাঁদতে বাহিরে বেরিয়ে আসে ডিঙাপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা। অন্যান্য গ্রাম থেকেও পিল পিল করে আসতে থাকে মানুষের স্রোত।

মাঠ থেকে বুদ্ধদেবের মৃতদেহ কাঁধে এক সময় গাঁয়ে ফেরে সুখনরা। সযত্নে শুইয়ে দেয় মুখিয়ার উঠোনে। চাটাইয়ের ওপর। গাঁয়ের লোক চোখের জলে তাদের প্রিয় বুধুমাস্টারকে শেষ দেখা দেখে। লছমির কাঁধে ভর দিয়ে ধীর পায়ে স্বামীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় পূর্ণিমা। নির্বাক, নিস্পন্দ। সুখন এগিয়ে আসে। গভীর কৃতজ্ঞতায় জড়িয়ে ধরে পূর্ণিমার শীর্ণ হাত দুটো। মনে পড়ে মাস্টারের কত কথা। ....'সর্দার, লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তৈরি হবে নেতা.......।'

অথচ লড়াইয়ের শুরুতেই বুধু মাস্টার চলে গেল।

সুখন তৎপর হয়ে ওঠে। 'জোয়ান মরদ সব যে যার কামে যা। জলদি।'

বৃদ্ধ মুখিয়ার ওপর আপাতত মাস্টারের দায়িত্ব দিয়ে সুখন ছুটে যায় দলের মধ্যে।

অনেক কাজ বাকি। প্রথম কাজ অর্জিত ফসলের সুরক্ষা, দ্বিতীয় কাজ গ্রামের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। তৃতীয় কাজ........

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই সুখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এতদিন সে ছিল এক গাঁয়ের সর্দার, এখন তাকে দশ গাঁয়ের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বুধু মাস্টারের মৃত্যুকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবে না সুখন। □

জনৈক অনিরুদ্ধ

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ—গতকাল রাত আটটা নাগাদ জন দুই পুলিশ অফিসার-সহ কয়েকজন কনস্টেবল কর্তৃক অনিরুদ্ধ নামে জনৈক যুবককে ভর্তির জন্য.........হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে—সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের ঘাড়ে ও পিঠের কাছে আঘাতের চিহ্ন ছিল, তবু মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

এরপর মৃতের চেহারা, জামাকাপড়ের রং ও আনুমানিক বয়স ইত্যাদি সংবলিত একটি ছোটোখাটো বর্ণনা যোগ করা হয়েছে এবং সবশেষে আরও জানানো হয়েছে—গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাওয়া খবরে প্রকাশ মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য তখনও পর্যন্ত কেউ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করেননি। ময়না তদন্তের পর শনাক্তকরণের জন্য আজ সকাল থেকে মৃতদেহ মর্গে রাখা থাকবে।........

সংবাদপত্রের মাধ্যমে খবরটি ছড়িয়ে পড়ার অল্প পরেই, শহরের কোনও একটি অল্পখ্যাত পাড়ার সরু গলির ভিতর আধপুরনো একটা বাড়ির সামনে প্রথম যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম হল, তা হচ্ছে—জনকয়েক লোকের একটি ছোটোখাটো জটলা। তাদের প্রায় সকলেই মাঝবয়সী গৃহস্থ—পাড়ার প্রতিবেশী—সকালে কাগজ পড়েই তারা প্রথম খবরটি জেনেছে, তারপর বাজার যাওয়ার জন্যে রাস্তায় বেরতেই—থম মারা একটা বাতাস......ইতস্তত ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব..........দু—একটা চেনামুখের দর্শন—জন্তুর চোয়ালের মতোই জটলাটা যেন তাদের গিলে ফেলেছে হাঁ করে। ইচ্ছে না থাকলেও এই জটলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কিছুটা সময় ব্যয় না করে যেন তাদের উপায় নেই, আর জড়িয়ে পড়ার পরও পরস্পরের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বিনিময় ছাড়া যেন তাদের আর কোনও ভূমিকাই থাকে না।

সকালে কাগজ পড়ে তারা জেনেছে যে অনিরুদ্ধ নামে একটি ছেলে মারা গেছে। এই বাড়িতে অনিরুদ্ধ নামে প্রায় ওই বয়সেরই একটি ছেলে রয়ে আছে—তাও তারা জানে। কিন্তু সেই ছেলেটাই যে কাল রাত থেকে বাড়ি ফিরে না এসে নিজেকে এমন একটা জোরালো সন্দেহের বিষয় করে তুলে থাকতে পারে—তা তারা জানবে কেমন করে।

'তা হলে কি ওই ছেলেটাই' হঠাৎ করে ধস নেমে যাওয়ার মতো প্রশ্নটা মনের ভেতর ধড়াস করে উঠতেই—সকলে যেন বিরাট একটা নাড়া খায় আর সেই নাড়া খাওয়ার শক্তিটাই এমন একটা ঠ্যালা মারে ভেতর থেকে, দল বেঁধে গাদাগাদি করে বাড়িটার ভেতর হঠাৎ ঢুকে না পড়ে তাদের যেন আর উপায় থাকে না; আর ঢুকে পড়ার পরই প্রথম প্রশ্নটার অনুকরণে আরও কয়েকটা প্রশ্ন—আগুন নিভিয়ে ফেলার পরও পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মতো—গজিয়ে উঠতে থাকে দমকে দমকে :

—ছেলেটা কাল কোথায় গিয়েছিল—কেউ জানে কি?

—কাল যখন বাড়ি থেকে বেরোয়—কিছুই কি বলে যায়নি?

এবং তারপর—গলাটাকে ফ্যাসফ্যাঁস করে জিভ দিয়ে মুখের তালু ভিজিয়ে টেনে টেনে শ্বাস নেওয়ার মতো :

—ছেলেটা কি কিছু করত-টরত?

কিন্তু না। এতগুলো প্রশ্নের কোনওটারই জবাব পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেটা কেউই জানে না। কাল যখন সে বাড়ি থেকে বেরয়—কই না, কিছু বলে যায়নি তো! কোথায় যাচ্ছে—কখন ফিরবে, কিছুই না। আর ছেলে কী করত না করত—বাপ-মা হয়েছে বলে, খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে বলেই সেটা অমনি জেনে রাখতে হবে—এমন দাবি কি আর করা চলে আজকাল?

কথাগুলোকে নিয়ে কোনও প্রতিবাদ থাকতে পারে না। ফলে ভেতর থেকে ঠ্যালা খাওয়ার মতো জোরালো একটা তাগিদ নিয়ে যারা একসময় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর—নিজেদের বোবা বানিয়ে ফেলে তারা এখন ড্যাবড্যাবে চোখ করে চেয়ে থাকে আর অদ্ভুত চুপ-মারা একটা ভাব ক্রমেই যেন ডেলা পাকায় তাদের ভেতরটায়।

এর ফলে অবশ্য একটা উপকার হয়। ঘরের একবারে কোণটিতে ঘাড় গুঁজে বসে সেই তখন থেকে যে একজন একটানা ফুঁপিয়ে যাচ্ছে এটা যেন এতক্ষণ কারও নজরেই পড়েনি। এখন যেহেতু আর কোনও শব্দ নেই, নিছক চাপা ফোঁপানির হলেও সেই শব্দটাই হঠাৎ জোরালো হয়ে উঠে এমন একটা ঘা লাগায় স্নায়ুর ওপর, সে দিকে মুখ না ফিরিয়ে এবার যেন আর উপায় থাকে না। একজন প্রায় ধমক দেওয়ার মতো করেই বলে, 'কী আশ্চর্য, আপনি কাঁদছেন কেন? আগে উনি ঘুরে আসুন—' হঠাৎ ঝাঁক করে শুরু করে ফেলেই মাঝপথে তাকে থামতে হয়। যদিও এ কুণ্ঠার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ সত্যি সত্যিই এখন থেকে ওই মহিলাটির কান্না শুরু করে দেওয়ার মানে নিজের পুত্রহীনা হওয়ার সকরুণ ভাগ্যটিকে একরকম জোর করেই যেন ঘাড়ের ওপর টেনে নেওয়া। কারণ মর্গের ঠান্ডা টেবিলের ওপর কাল রাত থেকে চিত হয়ে শুয়ে যে ছেলেটি অপেক্ষা করে আছে—প্রিয়জনের দ্বারা শনাক্ত হওয়ার জন্য—সেই ছেলেটিই যে তার দশ মাস গর্ভে-ধরা সন্তান—তা কিন্তু মোটেই প্রমাণিত হয়নি। এবং সে হিসাবে কেন সে এখন খামোখা কাঁদবে, কিংবা কেঁদে ফেললেও কেন সেই কান্নার কারণকে মনে করা হবে না—নিছক উদ্বেগ আর উত্তেজনা ছাড়া কিছুই না?

সব কটা গলা তাই একজোট হয়ে গিয়ে আবার গমগম করে ওঠে : আপনি যান। গিয়ে একবার দেখে তো আসুন— কিন্তু গমগমে গলাগুলো এবারও যেন হঠাৎ নালী ছিঁড়ে মাঝপথে সব শব্দ হারিয়ে ফেলে কারণ, দেখে আসার পর, আশঙ্কাই যদি সত্যি হয়, তা হলে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসাবে ওই মহিলাটিকে ডাক ছেড়ে কাঁদবার একটি ছাড়পত্র দিয়ে ফেলা যেতে পারে; কিন্তু তারপর—

না। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কারওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সেইসব প্রতিবেশীর—চরিত্রের দিক দিয়ে যারা নির্দোষ নিষ্পাপ বর্ণহীন—মনের মধ্যে ধোঁয়া-ধুলো আর কুয়াশার মতো সন্দেহ অস্বস্তি আর দ্বিধা নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে, অথচ যেহেতু তারা সকলেই মানুষ—সামাজিক ও লৌকিক জীব—তাই একেবারে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে না গিয়ে, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একটি জটলা তৈরি করে নিচু গলায় দু'একটি কথা বিনিময় ছাড়া— আর কোনও ভূমিকাই থাকে না। নিষ্প্রাণ মড়ার মতো মাঝখানে চৌকাঠ শুধু শীর্ণ সীমান্তরেখা হয়ে শুয়ে থাকে। আর ঘরের ভেতর.....সে অন্য চেহারা.....

সবাই নির্বাক—একজন শুধু ফোঁপাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনও নাটক নেই। তাই ঘরের ভেতরের আবহাওয়া—যদি বা সামান্য ভারী হয়ে উঠে থাকে—তা মোটেই বেদনার বাষ্পে নয়। বাইরে নিস্পৃহ আকাশে যদিও মাঝে মাঝে মেঘলা ভাব, ঘরের ভেতর বিজলি আলো থাকার দরুন—সেটা ক্ষতি করতে পারছিল না বিশেষ। অদ্ভুত ম্যাটমেটে হলদে আলো ঝুলে পড়া বাল্‌বের—চট করে বোঝাই যায় না আলো আছে, কিন্তু অনেকক্ষণ কোনও একটা জিনিসের দিকে চেয়ে থাকলেই খুলির মধ্যে ঝিম ধরে—তখন বোঝা যায়—বাইরে একটা বিরাট আলোর দুনিয়া পড়ে আছে, আর তার তুলনায় ঘরের ভেতরটা রোগীর মুখের মতো আঁধার!

—তুই একবার যাবি?

—আমি?

বাপ কথাটা বলেছিল বড়ছেলেকে। কোনও আদেশ নয়, অনুরোধ, শুধু একটা কথা। অথচ সঙ্গে সঙ্গে ছেলে সেটাকে এমনই একটা জিজ্ঞাসা বানিয়ে ফেলল—বাপের মনে হল, সে যেন বড়ো বোকা হয়ে গেছে।

—একা না যাস্, অন্তত স্বপন-বিল্টু ওদের নিয়ে—

ছেলে হাঁ করে চেয়ে রইল। বাপও যেন লজ্জা পেয়ে চুপ করল।

অজান্তে হঠাৎ দুটো নাম উঠে পড়ায়—সকলেরই যেন হঠাৎ একবার মনে পড়ে গেল—এটা একটা সম্পূর্ণ মানুষের পাড়া—যেখানে দু-একটি তরুণ ছেলে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক এবং এ ব্যাপারে তাদের ভূমিকা দাবি করাটা খুব অন্যায় নয়।

ওরা বোধ হয় যেতে চাইবে না।

কেন?

একটা রিস্ক—বলেই ছেলে চমকে বাপের দিকে তাকাল। ঠাসা বাতাসে থমথম করছিল তার নিজের গলাটা—চোখের চামড়া ফাঁক করে দেখল—সাদা জমির ভেতর ফ্যাকফ্যাকে কালো তারা। দুটি চোখ—তার দিকে স্থির হয়ে আছে। সে আদেশ না দিলে যেন পলকই পড়বে না।

—রিস্ক? .... তুই জানতিস কিছু?

আমি কী জানব? ভেজা কাগজের মতো ছেলের গলাটা ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যাচ্ছিল। বাবা ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে, চিৎকার করে বলল, 'আমি কী জানব? আমি কোত্থেকে জানব?'.....সে হাঁফাচ্ছিল.........টানের দমকে কথা আটকে যেতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাপ একটা নিশ্বাস ফেলল : যাবে না, না? জানতাম। ছেঁড়া গেঞ্জির ভেতর দিয়ে ছেলে দেখল বাপের গলার হাড্ডি, আর ঘরের সব কটা মানুষের ওপর চালসে চোখ দুটোকে একবার ঘুমিয়ে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে যেতে বাপের মনে হল।—তার ছেলেটা বড় একা ছিল। ভীষণ একা।.....

রাস্তার ওপর দৃশ্যটা প্রায় সেই রকমই। যান্ত্রিক কারসাজিতে একই ছবি যেন বারে বারে ঘুরে ফিরে আসে। ছোটোখাটো একটি জটলা..........দু-একটি নিচু স্বরের কথা........কোনও একটি কৌতূহলী মুখ..... ...হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়া, আর তার পরেই.....

—কী হয়েছে ভাই এখানে? ....একটা ছেলে মারা গেছে.........মারা গেছে? হ্যাঁ। কাগজে দেখেননি? ..... ওহ! এই বাড়ির. .....না, এখনও ঠিক জানা যায়নি..... ..কারণটা কী ভাই......মরল কেন?...

এরপরই হঠাৎ সবটা যেন হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে তাকায়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ফলে আপ্রাণ চেষ্টা করেও রোধ করা যায় না অবাঞ্ছিত একটা ধোঁয়াটে ভাব, ঠিক যেমন এড়ানো যায় না প্রশ্নটাও।

—আশ্চর্য! এই ছেলেটা শেষ পর্যন্ত –। কেন সে মরেছে এটা যেন সবারই জানা, কিন্তু এই ছেলেটাই যে সেভাবে মরতে পারে এটাই যেন একমাত্র ধাঁধা।

—ছেলেটা কী করত জানেন? কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড আছে? এ প্রশ্নটা একবার ছেলের বাপের কাছেও করা হয়েছিল—কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং এখন দ্বিতীয়বার এই কথাটা তোলার পেছনে যে একটা বজ্জাতি আছে সেটা সকলেই বোঝে এবং কেউ যে কোনও জবাব দেবে না—নিঃশব্দে এই সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ করে নিতেও বেশি দেরি হয় না। ফলে, আরও কয়েকটি মুহূর্ত চুপ মারা একটি অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠতে থাকে।

—অনেকদিন দেখতে পাইনি? অসুখ-টসুখ করেছিল নাকি?

—না, না। এই সে দিনও আমার বাড়িতে...... আমার ছেলের কাছে তো প্রায়ই—

কথাটা যেন লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল উটের মতো। গুটিয়ে নিতে না নিতেই সব কটা চোখ একসঙ্গে ঘুরে গিয়ে ভদ্রলোককে চমৎকারভাবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল।

—আপনার ছেলের বন্ধু ছিল বুঝি?

—নাঃ, বন্ধু ঠিক নয়।

—তবে যে বললেন, প্রায়ই আসত।

সব কটা চোখ গোল হয়ে বেড় দিয়ে ঘিরে রাখে। ভদ্রলোকের মগজের ভেতর ঝিমঝিম করে—মুখটা সাদাটে দেখায়। আরও খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকার পর দৃষ্টিগুলো ঘুরে গেলেও, সেই ভাবটা যেন কাটতে চায় না।

এখন রোদ নেই আকাশে, আবার বিশুদ্ধ মেঘলাও না। মোবিলে জড়ানো ন্যাকড়ার মতো এখানে ওখানে মেঘ আটকে আছে খাপছা খাপছা—মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড স্বচ্ছ আকাশ। পুরোপুরি মেঘলা হয়ে গেলে আবহাওয়াটা আরও বেশি থমথমে হয়ে পড়তে পারে; আর সেটা বুঝে নিয়েই যেন নিস্পৃহ আকাশের এই উদার হস্তক্ষেপ—মেঘ হটিয়ে বিরাট পাখির ডানার মতো মাঝে মাঝে ঝুপ করে মাটি ছুঁয়ে যাওয়া রোদ।

জিরজিরে পুরনো ডানার মতো মুখগুলো নিয়ে সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নিজেরা কথা বলতে ভয় পায়। আর পাছে কোনও কথা উঠে পড়ে—সে ভয়ে কাউকে কিছু শুধোতেও পারে না সাহস করে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই হাড় থেকে মাংস-মজ্জা আলাদা হয়ে যাওয়ার মতো অসুস্থতায়—সেই লোকটার ঘাড়টা কুঁজো হয়ে যায় আব বুকের মধ্যে গুমগুম শব্দ শুনতে শুনতে সে ভাবে : ও আমার ছেলের বন্ধু—ওকে আমি ছোটোবেলা থেকে দেখেছি—অথচ আমি কি জানতুম যে.......আমি তো আমার ছেলেকেও রোজ দেখি. কিন্তু আমি কি ওকে চিনি. ....ভেতরের হাড়পাঁজরগুলো ক্রমশই যেন গুঁড়িয়ে যায়—অথচ ওপর থেকে তা বোঝাব উপায় নেই।

অসুস্থ ছায়া ঘবের ভেতর—হলদেটে আলোর মাঝখানে খুব একচোট রোদ উঠে যাওয়ার আলোটাকে চেনা যাচ্ছিল না। এখন যেহেতু তেমন রোদ নেই, আবার নিবিড় ঘন আঁধারও না—হঠাৎ যেন ঠাওর হয়ে যায়—ঘরের আলোটা নেহাতই কম—টিমটিমে! ছায়াটা অসুস্থ ম্যাড়মেড়ে।

—তুই কিছু বলবি?

বড়োছেলে একবাব উঠে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কথাব জবাব দেওয়াব আগেই, অমনি যেন কলকল কবে উঠল ছোটোবোনের গলাটা, 'যাও না দাদা। গিয়ে দেখে এসো একবাব।' বড়োছেলে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছিল। যেন সে কিছু বলবে না, কিছু করবে না—সেটা জানান দিতেই। কিন্তু চটপটে ছোটোবোনকে ঠেকাস কে। 'তুমি কেন তখন থেকে কাঁদছ মা? দাদা আগে ঘুবে আসুক না—' বলে মাকে শাসন করতে গিয়ে নিজেই সে কেঁদে ফেলল ফ্যাঁচ কবে। আর—

চোখের তারা না সবিয়ে বড়োছেলে দেখল, বাবা একবার চশমাটা মুছে নিচ্ছে, ছোটোবোন শাড়িব আঁচলটিকে কাযদা করে গুঁজে দিয়েছে মুখের মধ্যে—এমনকি যে কান্নাটা এতক্ষণ রযে রযে ফোঁপাচ্ছিল, সেটাও যেন হঠাৎ ডুকরে ঝেঁপে এল এখন।

বড়োছেলের ঘাড়টা কাঁধ থেকে ঝুলে পড়ল। নিজের ভূমিকাটাকে তার হঠাৎ যেন বড় বেশি জবরি মনে হতে লাগল। কাঁদার জন্যে তখন থেকে কড়কড় করতে থাকা এই চোখগুলো যাতে কাঁদতে পাবে ডাক ছেড়ে—সে ব্যবস্থাটা সবার জন্যে করে দেওয়ার দায়িত্বটা যেন বড় ছেলেরই। ঘাড় নিচু রেখেও সে যেন টের পেয়ে যাচ্ছিল— সবকটা চোখ এখন শুধু একটিমাত্র কথা খসার অপেক্ষায় স্থির হয়ে আছে তার দিকে। বড়োছেলের মনে হল, তার কপালের রগদুটো ক্রমশ সবুজ হয়ে ফুলে উঠছে। আর একটুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলেই যেন লাফিয়ে ছিঁড়ে পডবে। বড়োছেলে ভাবল, সে কি দু কানে আঙুল পুরে দেবে? এক ধাক্কায় ছোটবোনকে সরিয়ে ছুটে পালাবে এই ঘর থেকে? নাকি সামনেব দেযালে ঠুকে আছাড় মেবে ফাটিয়ে ফেলবে তার খুলিসুদ্ধ মাথাটাকে?

বাপ এসে ছেলের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'যা। একবাব দেখে আয়। না-ও তো হতে পারে।'

—কিন্তু যদি হয়। ঘড়ঘড়ে গলায় কথাটাকে বলে ফেলেই ঘাড় তুলে বড়োছেলে অদ্ভুতভাবে বাপের দিকে চেয়ে রইল।........

এখন মোটামুটি বেলা। বাড়িটার সামনে তেমন ভিড় নেই আর। হঠাৎ যেন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এখন থেকে কারওর ভয় পাওয়ার, কি অস্বস্তি বোধ করার, কি দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ এখনও পর্যন্ত কিছুই প্রমাণিত হয়নি। আর ভাগ্য যদি অনুকূল হয়, এই ছেলেটিই যদি সে না হয়, তা হলে তো আর কোনও চিন্তা থাকে না। তখন প্রাণ খুলে কথা বলা যায় নির্দ্বিধায়—নিজের ছেলেকে নিয়ে বজায় রাখতে হয় না কোনও গোপনতা—ভয় পেতে হয় না নিজেকে। পারস্পরিক মেশামেশিটা তা হলে কতই সুস্থ আব নির্ভয় হতে পারে।

তাই, যতক্ষণ কিছুই না প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন নেই। আর সে হিসাবে রাস্তার ওপর জটলা করে খামোকা সময় নষ্ট করারও কোনও মানে হয়। ভিড়টা তাই ক্রমেই হালকা হয়ে আসতে লাগল।

মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে এখন রোদ ফুটেছে খুব। মাঝে মাঝে দু-একজন—যারা এইমাত্র খবর পেয়েছে—যেতে যেতে—ঠিক এই জায়গাটিতে চলার গতিটাকে একটু কমিয়ে দিয়ে বাড়িটাকে একবার দেখে যাচ্ছে। এতকাল ধরে বাড়িটা যে পেটের মধ্যে এমন একটা কিছু পুরে রেখেছিল—তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। তাই সব ছেড়ে দিয়ে ইট-পাথরের পুরনো বাড়িটাই যেন এখন একমাত্র রহস্য।

বাড়িটার থেকে একটু এগিয়ে রাস্তাটা নিজেই বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে একটা গলির ভেতর। সেই বাঁকের মুখে উঁচু একটা ঢিবির ওপব বসে একটা ছেলে চুপচাপ সিগারেট টেনে যাচ্ছিল মুখ নিচু করে, হঠাৎ ঘাড় তুলেই আর একজনকে দেখতে পেয়ে সে হাত নেড়ে ডাকল কাছে। তারপর দুজনে সেই ঢিবিটার ওপর পা মুড়ে বসে চুপ করে রইল কয়েকটি মুহূর্ত।

—চল যাবি একবার?

—কোথায়?

—মর্গে। দেখে আসি সত্যি কি না!

দ্বিতীয়জন কোনও কথা বলল না। প্রথমজন সিগারেটটাকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। তার হাত থেকে সেটাকে নিয়ে প্রথমে খুব জোরে, তারপর একটু সময় নিয়ে টানতে লাগল মৃদু মৃদু।

—ওর বাড়ি থেকে কেউ এখনও যায়নি, না?

—না, ওর বাবা বোধ হয় যাবে। চল আমরাও একসঙ্গে চলে যাই। বলে স্বপন মুখ তুলে চাইতেই বিল্টু ধড়ফড় করে বলে উঠল, আমি পারব না রে। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

স্বপন চেয়ে রইল। বিল্টু হাঁফাচ্ছিল। সিগারেটটা টান মেরে ফেলে দিয়ে, বড় বড় কয়েকটা শ্বাস টেনে বলল, 'তুই ভেবে দ্যাখ, এখনও প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে একবার করে মুখটা দেখিয়ে আসতে হয়। এ অবস্থায়--'

--তুই ভয় পাচ্ছিস?

বিল্টু গলাটাকে মুষড়ে বলল, 'পাচ্ছি। কেন, তুই পাস না?' দমটা যেন আটকে পাথর হয়েছিল। আলগা করে দিতেই এবার ঝাঁপিয়ে এল কথাগুলো, 'এতক্ষণ হয়ে গেল ওর বাড়ি থেকে কেউ যায়নি কেন? ওর দাদা যেতে চাইছে না কেন? বাবলু-তপু ওরাই তো একবারও এল না কেন? তুই-ই বা তখন থেকে কী করছিস?.......পায়, সকলেই ভয় পায়.........আর আমার একার বেলাই দোষ?.........

বড়োছেলে মাথাটা নিচু করেই বসে ছিল। তবু ওপর থেকে তার শক্ত চোয়াল চিনে নেওয়া যায়। দাঁতে দাঁত চেপে গালের হাড় দুটো টান করে যেন সে নিজেকে কঠিন করে রেখেছে।

বাবা একবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা হলে আমিই যাই।'

—তুমি? মা-বোনের গলাটা হঠাৎ যেন চামড়া চিরে অনুনাদের মতো একসঙ্গে বেজে উঠল।

—হ্যাঁ। আর দেরি না করে ঘুরেই আসি।

—তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ফোঁপানির শব্দে ঠাসা হয়েও গলাটা কাঁপছিল না।

—তুমি? কী বলছ মা। বোনের গলাটা যেন বাতাসটা কুপিয়ে দিল একবার।

অথচ বাবার গলাটা অদ্ভুত মিহি আর ভরাট, 'না, না তুমি গিয়ে কী করবে? আমি আগে দেখে আসি।'

—তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাবা।

—না খুকু, তুই যাস না।

বড়োছেলের আর সহ্য হচ্ছিল না। হ্যাঁচকা টানে শরীরটাকে সিধে করে ফেলে কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'তোমরা থাকো, আমি ঘুরে আসছি।' বলেই সে খুব দ্রুত শার্টটাকে টেনে নিতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে সবাই যেন একসঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

মা বলল, 'তুই যাস না। খোকা, আমার কথা শোন্।'

বাবা বলল, 'না, না, তুই থাক্।'

বোন বলল, 'তুমি যেও না লক্ষ্মীটি।'

বড়োছেলের মনে হল, তার বুকের ভেতর থেকে হাড়-পাঁজরগুলো ক্রমশ আলগা হয়ে খসে যাচ্ছে.........সে

যেন বড়ো ফাঁপা-হালকা হয়ে যাচ্ছে.........ওরা কি ভাবছে আমি ভয় পাই? ওরা কি আমাকে দয়া দেখাচ্ছে? বড়োছেলে একবার চোয়াল ফাঁক করে চিৎকার করে উঠতে চাইল.......অথচ শুকনো খটখটে হাড়ের খাঁচার ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো—তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ফ্যাস্‌ফেসে স্বর—মিয়োনো ধরা-ধরা, 'কেন, আমি গেলে কী হয়েছে? তোমরা বারণ করছ কেন?'

বাবা এগিয়ে একদম কাছাকাছি চলে আসায়, ছেলে যেন অনেকদিন বাদে বাপের মুখটা এত কাছে থেকে দেখল—আর সেটা সে কতই রেখাময়—বিচিত্র ভাবের ছাপ-টানা—এটা যেন সে আজই প্রথম জানতে পারল।

—তোর যাওয়াটা ঠিক নয়, আমি ভেবে দেখলুম।

বাপের হাতটা ছেলের কাঁধ ছুঁয়ে ছিল। একটা ঝটকা মেরে খসিয়ে দিয়ে সরাসরি পিঠের হাড় চিত করে উঠে দাঁড়িয়ে, বড়োছেলে এবার সরাসরি চাইল বাপের মুখের দিকে।

—তা হলে তুমি জানতে?

—কী জানতাম?

—তুমি নিশ্চয়ই জানতে, ও কী করে! তা নইলে তুমি আমাকে পাঠাতে ভয় পাচ্ছ কেন?

বাবা বলল, 'আমার কথাটাকে তুই ওভাবে নিচ্ছিস কেন? ভয় কি তুইও পাচ্ছিস না?'

ছেলে চোয়ালটা বেঁকিয়ে স্বরটাকে দুমড়ে বলল, 'পাচ্ছি। কেন পাব না? আমার নামে, এমনিতেই একটা স্পট আছে। তারপর আজ যদি এটা প্রমাণিত হয়—আমার চাকরি পাওয়ার অবস্থাটা কী হবে—ভেবে দেখেছ.....হ্যাঁ, আমি ভয় পাচ্ছি.......কিন্তু সেটা কার জন্যে......আমি কি আমার একার জন্যে চাকরি করতে যাচ্ছি?.......'

ছেলের গলাটা ধড়ফড় করছিল। সে থামতেই, ঘাড়টা নিচু করে বাপ একবার মাথাটা দোলালো আলতো করে :

কিন্তু আমি কী করতে পারতাম? তোরা সব ব্যাপারে আমাকে দোষ দিস.......কিন্তু এটা কি আমার দোষ? বাইফোকাল-চশমার আড়ালে সাদা জমির ভেতর ফ্যাকফেকে কালো তারা—চালসে দুটো চোখের দিকে চেয়ে—সবকটা মানুষ যেন একসঙ্গে পাথর হয়ে গেল আর সেই পাথরের মূর্তির মতো মুখগুলোর দিকে চেয়ে পঞ্চান্ন বছরের পোড়খাওয়া জীবনে সে যেন এই প্রথম জানতে পারল—তার ছেলেটা বড়ো একা ছিল। ভীষণ একা।.....

ছেলেটা বড়ো একা ছিল। আমি বাপ—আমিও ওকে চিনতুম না। বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই ছেলেটার বাবার এ কথা বারবার মনে হল। আর একা ছিল বলেই যেন, কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি তার এই বে-ফয়দা মরে যাওয়াটার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর সেই জন্যেই যেন শনাক্তকরণের আজ এত প্রয়োজন। সে লম্বা ঘরখানার ভেতর দমবন্ধ হয়ে-আসা আবহাওয়ায় কুৎসিত গন্ধের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে সে শুয়ে আছে নির্লিপ্তের মতো—দরজা ঠেলে ঢুকে, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখে, তারপর ডুকরে উঠে আছাড় পিছাড় খেয়ে কেউ একজন তাকে প্রিয়জন বলে শনাক্ত করে না ফেললে যেন তার সমাজবদ্ধ হওয়ার স্বীকৃতিই মিলবে না।

কিন্তু তারপরও—শনাক্ত হয়ে যাওয়ার পরও সে কি অচেনা অপরিচিতই রয়ে যাবে না? এ কথা যতবার মনে আসে—ফোঁপানি ভুলে বুকটায় যেন একটায় ছ্যাঁ করার ভাব হয়। নেয়ে-খেয়ে দিব্যি জলজ্যান্ত সে বেরিয়েছিল বাড়ির থেকে। তখন মুখখানা দেখে তার মার কি একবারও মনে হয়েছিল যে সেইদিন রাত্রিতেই, এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে ছেলে? ছেলের জ্বর হলে, চিরটা কাল, ছেলের আগে মা-ই সেটা নজর করেছে স্রেফ মুখটা দেখেই! অথচ সেই মুখটা—আঁতুড়ঘরে বুকের কাছে চেপে প্রথম স্তন চিনিয়ে দেওয়ার সময় থেকে যেটা গাঁথা হয়ে আছে মনের ভেতর—সেটা কি আজ এতই পালটে গেল—যে এতটুকু আঁচ পর্যন্ত পাওয়া গেল না তার থেকে। ভাবনাগুলো মনের মধ্যে ফেনায়......ফেনাটা জমে জমে ভেতর থেকে ঠ্যালা দেয়..........ফোঁপানিটা তখন আবার ঝাঁপিয়ে আসে। ছোটোবোন ড্যাবড্যাব করে চায়। আর দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বড়োছেলে শুধু ভাবে—ও কি এতই আলাদা ছিল আমাদের থেকে—আমি কি সত্যি ভয় পেয়েছিলাম ওকে?.........

ভিজে পাঞ্জাবি গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। সুযোগ পেলেই ভিড়ের ফাঁক গলে ঝাঁপিয়ে আসে বাতাস। একটা ঝিমঝিমে ভাব তখন ক্রমশ আচ্ছন্ন করে বাপকে। বাস থেকে নামা পর্যন্ত বজায় থাকে সেই আচ্ছন্ন ভাবটা, নিজের মধ্যে তলিয়ে থাকা নিঃসঙ্গ মানুষের যেমন থাকে। অথচ গেট পেরিয়ে ঢুকে, হাসপাতাল সংলগ্ন মর্গের কাছে আসতে না আসতেই, সমান করে টানা, পুরু ঘাসের জমিটায় পা দিতে না দিতেই—চটকা লেগে মগজের ভেতর ঠিক যেন তড়িৎ লাফিয়ে ওঠে।

লোকটা বোকার মতো চোখ করে চারদিক তাকায়। চামড়ার সঙ্গে লেপটানো ভিজে পাঞ্জাবি—গলার হাড্ডি ঠেলে উঠেছে, চোয়ালের হাড়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম.........। আয়নার কারসাজিতে একটা বস্তু থেকে যেমন হাজারটা প্রতিবিম্ব তৈরি করে ফেলা যায়, ঠিক তেমনি কোনও কায়দায়, এক ছাঁদে এক আদলে গড়া জন আট দশ বাপ ঠিক একই রকম মুখ করে.......একইভাবে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুড়তে থাকে।

ধাঁধাটা যেন কিছুতেই ফরসা হতে চায় না। মাথার ভেতরটা ক্রমশ গুলিয়ে যায়। চোখের সামনে সব কিছু ঘুরপাক খেতে থাকে........প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে তাকায়—আর একই রকম ধাঁধা লেগে গিয়ে প্রত্যেকের মাথাব মধ্যেই যেন গোলমাল হয়ে যায়।

—আপনি ভেতরে গিয়েছিলেন? কাছাকাছি একজনকে একলা পেয়েই লোকটা যেন কাতরভাবে আঁকড়ে ধরে।

—নাহ্! যাব।

—আপনার ছেলে?

—সেটা জানতেই তো এসেছি।

লোকটা কেমন বোকার মুখ করে হাসে আর এ লোকটা যেন মনের কথা বলতে ভয় পায়। আপনার ছেলের নামও কি অনিরুদ্ধ? সেও কি কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি। এই এতগুলো লোকের প্রত্যেকের ছেলের নামই কি. ... তারা কি কেউই কাল রাত্তিরে ....নুড়ি পাথরের মতো কথাগুলো বক্তের মধ্যে আছাড় খায়। অথচ কিছুতেই বেরিয়ে আসতে না পেরে ভেতবটায় ঠেলাঠেলি করে। খানিক পরে দরজা হাট করে খুলে, এতগুলো লোককে দেখেই কাউই মেবের বাবু বিচ্ছিরি ব্যাজার হয়ে যান · আপনারা সব লাইন করে দাঁড়ান তো। একদম চেল্লাচেল্লি নয়। বলাব সঙ্গে সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে একজনের ঘামের সঙ্গে আর একজনের ঘাম মিশিয়ে সুন্দর সুসংহত একটা লাইন তৈরি হয়ে যায়। এইবাব কাজ শুরু হবে। নিয়মাবলি এইরূপ · দরজাব একটি পাল্লা খোলা থাকবে। একজন করে ভেতরে ঢুকবে—তিন মিনিট সময় বরাদ্দ। তার মধ্যে দেখে তাকে চিনে নিতে হবে ....ঠান্ডা টেবিলের ওপর চিত হয়ে শুয়ে মুচকি হাসিতে যে ছেলেটা মুখ ফাঁক করে আছে শনাক্তকরণের এই খেলা দেখার জন্যে সেই ছেলেটাই তার যে ছেলেটা কাল রাত্তিরে বাড়ি ফিরে আসেনি, সে কি না?

কেউ কোনও কথা বলে না। মাথার ওপর সেই একই সূর্যটাকে খাড়া রেখে, পরস্পরের শরীরের ঘেমো গন্ধ নাকে নিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে সকলে একইভাবে রোদের মধ্যে পুড়তে থাকে। সবাই চুপচাপ। সকলের চোখই ঠা ঠা শুকনো। কারণ এখন থেকে কান্না শুরু করে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। অবস্থা এখন অনেক ঘোরালো। প্রত্যেকেই প্রথমে একবার করে ভাবে—তার ছেলেটা বড়ো একা ছিল। অথচ পলকের মধ্যেই চোখের সামনে এতগুলো অনিরুদ্ধের বাপকে দেখে—মাথার মধ্যে ধাঁধা লেগে যায়।

আপাতত এইটুকুই শুধু প্রমাণিত যে, বাপ মার চোখের সামনে দিয়ে জলজ্যান্ত বাড়ির বার হয়েও—রাত্তিরে বাড়ি ফিরে না এসে—পরের দিকে সকালে মর্গের ঠান্ডা টেবিলের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকার মতো অনিরুদ্ধরা সংখ্যায় একা নয়। সে হিসেবে, পুরো ব্যবস্থাটাই এখন দাঁড়িয়ে যায়, সেই অনেক অনিরুদ্ধের মাঝখান থেকে ঘটনাচক্রে মৃত জনৈক এক অনিরুদ্ধকে খুঁজে নেওয়ার নিছক একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। □

চাঁদ ও স্বৈরিণী

গৌতম ঘোষদস্তিদার

অলীক ময়ূর

একটা মিহি বাতাস উড়ে আসছিল নদীর দিক থেকে। শরীরে একটু শীত শীত ভাব টের পাচ্ছিলেন কৃষ্ণরূপ। সবে পুজো গেল। এবার ধীরে-সুস্থে শীত নামবে। রুক্ষ মাটি ক্রমশ ঠান্ডা হবে। গ্রীষ্মের দাহ এখানে যেমন তীব্র, শীতও পড়ে তেমন জাঁকিয়ে। এবার বৃষ্টিও হয়েছে বেশ। নদীর লাল-জল এখনও বেশ গভীর, স্রোতস্বিনী। এরপর ক্রমে নিথর হতে থাকবে জল। নদীর বুকে বালি জমবে।

আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। ঝকঝকে নীল আকাশে বিক্ষিপ্ত সাদা মেঘ। বাগানের চারদিকে নিবিড় সবুজ গাছগাছালি। আশ্রমের এক কোণে হাঁস-মুরগির খাঁচায় ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে পাখিগুলি। একটু এগিয়ে ময়ূরের খাঁচার সামনে সামান্য দাঁড়ালেন কৃষ্ণরূপ। একাকী ময়ূরটি তাব দিকে গ্রীবা তুলে তাকাল। স্বপ্না-মা কোথা থেকে দুটো ময়ূরের ডিম এনেছিল। মুরগির তাপে ডিম ফুটে বেরিয়েছিল ময়ূরশিশুটি। একটি ডিম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরম স্নেহে আর যত্নে তাকে বড়ো করে তুলেছিল স্বপ্না-মা। ময়ূরের নাম রেখেছিল কুহু। শুনে তিনি হেসেছিলেন। স্বপ্না-মা বলেছিল, 'কী হয়েছে—ময়ূবের নাম কুহু হতে পারে না? খুব পারে। তা ছাড়া, ও তো আর প্রকৃত ময়ূর নয়, অলীক ময়ূর। ওর জন্মাবার কথা ছিল নাকি।' সে-কথা মনে হতেই স্মিত হাসলেন কৃষ্ণরূপ। তাঁর মতো গৌরবর্ণ শিশুর নাম তাঁর মা কেন তবে কৃষ্ণরূপ রেখেছিলেন। সবকিছুর যথাযথ মানে হয় না।

কী মানে হয়, তাঁব এরকম অদ্ভুত জীবনযাপনের। শহরে যাবতীয় সুখসমৃদ্ধি-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে তিনি যে একদিন হুট করে এ রকম প্রত্যন্ত গ্রামে এসে একটু একটু করে একটি আস্ত আশ্রম বানিয়ে ফেলবেন, তা কি নিয়তিনির্দিষ্ট ছিল নাকি। ছাত্রজীবনে তিনি বামপন্থী আন্দোলন করেছেন, অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘ কুড়ি বছর, বিদেশে গেছেন—তারপর একদিন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে আসবেন এই বানপ্রস্থে, তা কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন কখনও!

আলো এখনও ভালো করে ফোটেনি। একটু পরেই সমস্ত আশ্রম জেগে উঠবে নিমেষে। এখানে সবই ঘড়ি ধরে চলে। তিনি আজ একটু আগেই উঠে পড়েছেন। ময়ূরটির দিকে তাকিযে স্বপ্না-মা ব কথা মনে পড়ে গেল কৃষ্ণরূপের। সে জাগেনি এখনও।

ঘুম কেন ভেঙে গেল তাঁর! এ কী দেখলেন তিনি স্বপ্নে। ছি, ছি! তাঁর অবচেতনে কি তা হলে এভাবে অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে! স্বপ্নে তিনি স্পষ্টই দেখেছেন স্বপ্না-মাকে! নদীর চড়ায় বেড়াতে বেড়াতে একেবারে শ্মশান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন তাঁরা। কৃষ্ণরূপ দেখলেন, একটি মস্ত গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে বালির উপর। অতটা পথ হেঁটে তিনি সামান্য ক্লান্ত-বোধ করছিলেন।

—এসো, এখানে একটু বসি। স্বপ্নে তিনি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন নিজের কণ্ঠস্বর।

—আপনি বসুন। খুব স্তিমিত কণ্ঠে স্বপ্না-মা বলল। তার ভঙ্গিতে যেন সামান্য ব্রীড়া।

তিনি বসলেন। স্বপ্না, সামান্য দ্বিধার মধ্যে, তাঁর পায়ের কাছে বালির উপর হাঁটু মুড়ে হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে বসল। বসে বালির উপর আঙুল দিয়ে এলোমেলো দাগ কাটতে থাকল। নদীর উপর ঝুঁকে ছিল একখণ্ড নির্নিমেষ মেঘ। কৃষ্ণরূপ দেখলেন, নদীর জলে পড়েছে তার ছায়া। জলবিম্বিত সেই নির্জন মেঘের দিকে তাকিয়ে তাঁর হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ লাগল। খুবই ফাঁকা, শূন্য বোধ হল বুকের ভিতরে। আর, মেঘ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে স্বপ্নার দিকে তাকাতেই কেমন আমূল কেঁপে উঠলেন তিনি। তাঁর মনে হল, যেন এই প্রথম

দেখলেন তিনি স্বপ্নাকে। মনে হল, যেন এক স্বর্গভ্রষ্টা দেবী বসে আছে তাঁর সামনে। তাঁর চারপাশে ধু ধু বালিয়াড়ি আর অনন্ত শূন্যতা। চারদিকে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে চরাচর, সময়। কান পাতলে নির্জনতার গভীর শব্দ যেন শোনা যায় খুব স্পষ্ট।

হাওয়া ছিল সামান্য। স্বপ্নার নীল রঙের শাড়ি আঁচল উড়ে যাচ্ছিল সেই নির্জনতা আর নৈঃশব্দ্যের দিকে। হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে পাথরপ্রতিমার মতো বসে আছে সে যেন একেবারে অনন্তকাল ধরে। কৃষ্ণরূপ, এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে, অপলক তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তার শ্যামল মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, পৃথিবীতে এখনও তার কিছু প্রাপ্তি বাকি রয়ে গেছে! হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে বসে আছে স্বপ্না। তার সারা শরীরে যেন এক অপার্থিব মায়া, বিষণ্ণতা মেঘের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। খুবই আকুল লাগল কৃষ্ণরূপের।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন স্বপ্নার দিকে। তার সামনে গিয়ে বসলেন নতজানু হয়ে। তারপর খুবই মায়ায় স্বপ্নার গভীর চুলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন তাঁর আচ্ছন্ন আঙুলগুলি। একটু কি কেঁপে উঠল স্বপ্না! মুখ ফেরাল তাব দিকে। তিনি লক্ষ করলেন, স্বপ্নার স্ফুরিত ঠোঁট দুটি কাঁপছে তিরতির করে, জলের মতো। তার সুদূর চোখদুটিতে কী গভীর মায়া। কৃষ্ণরূপ দেখলেন, আদিগন্ত-শূন্য চরাচরের মাঝখানে কেবল অনন্তকালের দুই মানব-মানবী। যেন, পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নেই। মাথার উপর স্থির মেঘ, নদীও থমকে গেছে তাদের দেখে।

স্বপ্না মুখ তুলে অনিমেষ তাকাল তাঁর দিকে। তিনি পলকে দুই অঞ্জলিতে তুলে ধরলেন স্বপ্নার শ্যামল মুখটি। চোখের পাতা কি সামান্য ভারী হয়ে উঠল স্বপ্নার! কোনও বিস্ময়চিহ্ন দেখলেন না কৃষ্ণরূপ সেই চোখে-মুখে। তিনি তখন খুব ধীরে তাঁর আগুনের মতো ঠোঁট দুটি নামিয়ে আনতে গেলেন স্বপ্নার কম্পিত অধরোষ্ঠের উপব। আর, ঠিক তখনই, শূন্য চরাচরে কোথা থেকে উড়ে এল স্বপ্নার অলীক ময়ূরটি! তার উড়ন্ত ডানায় ঝড়ের শব্দ টের পেলেন কৃষ্ণরূপ। চরাচর কাঁপিয়ে ডেকে উঠল সে কর্কশ স্বরে। তার সেই তীব্র কেকায় খানখান হয়ে ভেঙে গেল গভীর নির্জনতা। তিনি চমকে সরে এলেন। একটি হাত তুলে আড়াল করতে গেলেন নিজেকে। আর ময়ূরটি, স্বপ্নাব সেই অলীক ময়ূরটি, উড়তে উড়তে, তাব তীক্ষ্ণ ঠোঁট দুটি আচম্বিত ঢুকিয়ে দিল তাঁর চোখের ভিতর। আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। নিমেষে তাঁর চোখ বেয়ে অঝোর কান্নার মতো গড়িয়ে এল গাঢ় রক্তধারা। বালির উপর পড়ে যেতে যেতে তিনি একচোখে দেখলেন, স্বপ্না বসে রয়েছে একই ভঙ্গিমায়। আর, ময়ূরটি দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাঁর উপর।

ঘুম ভেঙে যেতে কেমন বিহ্বল লাগল কৃষ্ণরূপের। এই শীতেও তাঁর শরীরে বিনবিন করে ফুটে উঠেছে অনর্গল ঘাম। তীব্র জলপিপাসা বোধ হল। কেমন আচ্ছন্ন লাগছিল নিজেকে। পরিপাশ টের পেতে সময় লাগল কিছুটা। তারপর উঠলেন তিনি। জল খেলেন ' ঘড়ি দেখলেন। বাইরে এখনও সম্পূর্ণ আলো ফোটেনি। তিনি নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বেরুবার সময় দেখলেন, উলটোদিকে, স্বপ্নার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ।

খুবই অস্থির লাগছিল কৃষ্ণরূপের। ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে একটি শীতল স্রোত প্রবাহিত হল, তিনি টের পেলেন। মনে হল, ময়ূরটির হিংস্র ঠোঁটে তখনও লেগে রয়েছে তাঁর চোখেব করুণ রক্ত। সেই অসহ্য সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে, এই আবছায়ার সকালে তাঁর কেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

—কী হল, এত ভোরে উঠে পড়েছেন! গায়ে চাদর জড়াননি! হিম পড়ছে—ঠান্ডা লেগে যাবে তো!

আচ্ছন্নতা থেকে ফিরে কৃষ্ণরূপ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন স্বপ্নার দিকে। তার পরনে স্বপ্নে-দেখা সেই টকটকে নীল শাড়িটিই, আটপৌরে ধরনে পরা। চুল খোলা, চোখে-মুখে গভীর ঘুমের তৃপ্তি লেগে রয়েছে তার। এখনও চোখে-মুখে জলের ছোঁয়া লাগেনি। দরজা খুলে সোজা চলে এসেছে বাগানে। হয়তো, কুয়োতলায়ই যাচ্ছিল, তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে এখানে।

আশ্রমে স্বপ্নাই সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠে। কুয়োতলায় যাওয়ার আগে তাঁর দরজার টোকা দেয়। তারপর ক্রমশ একে একে জেগে ওঠে সকলে। আজ বেশ কবছর এরকমই চলছে। স্বপ্না কালেভদ্রে কলকাতায় গেলে তখন অন্যরকম। তিনি অন্যমনস্কতার মধ্যেই স্বপ্নার দিকে তাকালেন। স্বপ্নার আলুলায়িত দীর্ঘ কেশ

আর এলোমেলো নীল-শাড়ি, সব মিলে তার গোটা অস্তিত্বই যে কৃষ্ণরূপকে খুব পীড়িত করছে, স্পষ্ট টের পেলেন তিনি।

—না, এখনও তেমন ঠান্ডা পড়েনি। আমার কিছু হবে না। খুবই স্তিমিত স্বরে, যেন কিছু বলতে হয় বলেই, কোনওরকমে বললেন কৃষ্ণরূপ। খুবই সঙ্কুচিত লাগছিল নিজেকে।

—না, কিছু হবে না! বেশ ঠান্ডা আছে, আমি ঘর থেকে চাদরটা এনে দিই। স্বপ্না বলল।

— না, না, দরকার নেই। এই পাঞ্জাবিটা তো বেশ মোটা। আমার সত্যি ঠান্ডা লাগছে না। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। তিনি বললেন।

—আজ তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল। শরীর ঠিক আছে তো! রাতে ঘুম হয়েছিল?

—এমনিই। তুমি এমন করছ যেন আমি একটা অথর্ব মানুষ! ঘুম ভেঙে গেলে আমার আর অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। তুমি ভেব না।

—না, আমার ভাবার কী!

খুব মৃদুস্বরে বলল স্বপ্না। তারপর মুখ নিচু করে হাত দিয়ে চুলগুলো জড়াতে লাগল সে। তার বলার ভঙ্গিতে সামান্য অভিমান টের পেলেন কৃষ্ণরূপ। তিনি স্বপ্নার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। পরিবেশের কুয়াশা কাটাতে তিনি প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন। অন্যরকম মেঘ জমছিল তার ভিতরেও।

—তোমার কুহু দেখতে-দেখতে কত বড়ো হয়ে গেল, না? এই তো সে দিন জন্মাল। এবার বর্ষায় নাকি তোমাদের সামনে পেখম তুলে নেচেছিল। শীতল সে দিন বলছিল। আচ্ছা, ওকে তুমি ডাকতে শুনেছ কখনও?

—শুনেছি। বর্ষাকালে আপনি যখন এক সপ্তাহের জন্য কলকাতায় গেলেন, তখনই একদিন পেখম মেলেছিল কুহু। নেচেছিল। ও নাচছিল. আর ওই ছড়ানো পেখম থেকে খসে পড়ছিল একটা একটা রঙিন পালক। দেখে এত খারাপ লাগছিল আমার! আপনি ফিরে এলে আমি সে সব বলেছিলাম আপনাকে। আপনার মনে নেই।

—তাই তো! আমার সত্যিই মনে ছিল না। আজকাল অনেককিছুই ভালো মনে রাখতে পারি না। [illegible] হচ্ছে এবার!

—ঠান্ডাও লাগছে!

স্বপ্নার বলার ভঙ্গিতে তিনি হেসে ফেললেন। স্বপ্নাও হাসল। হেসে আর দাঁড়াল না। [illegible] দিকে। সেই চলে যাওয়ার দিকে সামান্য তাকিয়ে থাকলেন কৃষ্ণরূপ। [illegible] ভিতরের [illegible]

দেখতে দেখতে অনেকগুলি বছর কেটে গেল এখানে। পঁয়ষট্টি সালে পাকাপাকিভাবে শহর [illegible] চলে আসেন তিনি, একা। [illegible] মহারাজের সূত্রে এখানে ক্ষীণ যাতায়াত ছিল [illegible]। খোঁজখবর করে খুবই অল্প দামে [illegible] অনেকটা জমি কিনে ফেলেন তিনি। ভেবেছিলে[illegible] মতো বানাবেন। [illegible]

তারপর হুট করে সব [illegible]। অলকা হঠাৎ চারদিনের দুর্বোধ্য জ্বরে মারা যাওয়ার প[illegible] খুবই অর্থহীন অসম্পূর্ণ [illegible] জীবন। কলেজ থেকে, সারাদিনের পরিশ্রমের পর [illegible] বাড়ি ফেরার কোনও [illegible] টের পেতেন না তিনি। অলকার সঙ্গে তার যে খুব গভীর সম্পর্ক ছি[illegible] তা নয়। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অলকাকে প্রায়শ অবহেলাই করেছেন তিনি। অলকা মারা যেতে শূন্যতা [illegible] পান কৃষ্ণরূপ। আনন্দ তখন হস্টেলে চলে গেছে। মা মারা যাওয়ার পর কলকাতায় খুব কমই আসত [illegible] তার সামনে তখন নতুন, প্রসারিত পৃথিবী। বাড়ির কথা মনেও পড়ত না আনন্দর। মনে আছে, তিনি তখন গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে বইটা সবে লিখতে শুরু করেছেন। সে সময় বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে খুব ঘুরছিলেন। এখানেও এসেছিলেন। অলকার অসুখের খবর পাননি তিনি। কলকাতায় ফিরে, তিনদিন পর, তার মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলেন কৃষ্ণরূপ।

কাজের মেয়েটির টেলিফোন পেয়ে ছুটে এসেছিলেন অলকার দিদি-জামাইবাবু। তাঁরাই আনন্দকে খবর দিয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপ কোথায় আছেন, আন্দাজ করতে পারেননি কেউ। আনন্দ মাকে দাহ করে এসেছিল আত্মীয়স্বজন আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে। কৃষ্ণরূপ হিসেব করে দেখেছিলেন, অলকা যে দিন মারা যায়, তিনি সে

দিন রঘুনাথপুর থেকে আরও পাঁচ মাইল ভিতরের দিকে একটি গ্রামের সেচ-ব্যবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। ফিরে, মুখ-হাত ধুয়ে, সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছিলেন। একবারও মনে পড়েনি অলকার কথা। একেবারে নিঃশব্দে এবং একা চলে গেল অলকা। ফিরে এসে, শুনে, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শোকের চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা আর অনুশোচনা বোধ হয়েছিল তাঁর। কেমন মুহ্যমান লেগেছিল। এত সহজে চলে যায় একটা রক্তমাংসের মানুষ! পুড়ে ছাই হয়ে যায়!

তাঁর কেমন মনে হয়েছিল, মৃত্যুর আগে অলকা নিশ্চিত ভেবেছিল, যে কোনও মুহূর্তে কৃষ্ণরূপ ফিরে এসে মাথায় হাত রাখবেন তার। আর সে ভালো হয়ে যাবে। কৃষ্ণরূপের মনে হয়েছিল, অলকার মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ি। তিনি সেভাবে মনোযোগ দেননি তার প্রতি। মানুষের জীবনও যেন গাছের মতো—পরিচর্যা দরকার হয় তারও নানারকম। মনোযোগের অভাবে শুকিয়ে যায়, মরে যায়। এসব ভেবে কেমন উথালপাথাল লাগত কৃষ্ণরূপের।

আর, সেই প্রথম, তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, আনন্দরূপের চোখে ঝলসে উঠছে তীব্র ঘৃণা, তাঁর প্রতি। সে, স্পষ্টতই, তার মায়ের মৃত্যুর জন্য তাঁকে দায়ি করেছিল। দুজনের মধ্যে কোনও কথা হয়নি, তবু কৃষ্ণরূপ টের পেতেন সেই অবিনশ্বর ঘৃণা! ক্রমশই বাড়তে থাকে সেই ঘৃণা, বাড়ে ব্যবধান। সেই আনন্দকে দেখে তাঁর তখন ভয় করত কেমন। শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলে আনন্দ হস্টেলে ফিরে যায়। আর, তারপর, তাদের দুজনের সম্পর্কটা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। মাসের প্রথমে টাকা পাঠানো আর দুলাইন চিঠি লিখতেন তিনি নিয়মমাফিক, অভ্যাসে। আনন্দ কখনও চিঠি লিখত না তাঁকে। বছরে এক-দুবার বাড়িতে এলেও সে কৃষ্ণরূপকে এড়িয়েই থাকত। তিনিও আনন্দর মুখোমুখি হতে কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

তখনই পাকাপাকিভাবে এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন কৃষ্ণরূপ। চাকরিটা ছেড়ে দেন। বন্ধু ও সহকর্মীরা ভাবতেও পারেননি। তিনি নিজেও কি ভাবতে পেরেছিলেন!

কৃষ্ণরূপ সেভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না কখনও। তিনি এখানে এসেছিলেন নির্জনতায় দিন কাটাবেন বলে। অথচ, ক্রমশ, ওই ঈশ্বরভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে, খুবই অগোচরে, একটু একটু করে। অলকার মৃত্যু আর আনন্দর প্রচ্ছন্ন ঘৃণা তাঁকে ক্রমশ একা ও নিরাশ্রয় করে তুলেছিল। শহরের গতি ও উদ্দামতা তাঁর কেমন অসহনীয় লাগত। এখানে এসে নির্জনতা আর প্রকৃতির মধ্যে এক ধরনের আশ্রয় খুঁজে পান কৃষ্ণরূপ; সামান্য জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকেন ক্রমশ। মাঝে-মাঝে কলকাতার জন্য, ফেলে আসা জীবনটার জন্য হু হু করে উঠত ভিতরে ভিতরে। রামানন্দ মহারাজ তাঁকে গীতা পড়তে বলেছিলেন। তাঁর আশ্রমে নিয়মিত যেতেন কৃষ্ণরূপ। ভক্তি নয়, সৌম্যদর্শন মানুষটির গভীরতা ও দীপ্তি তাঁকে খুব টানত।

তিনি আবার লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেরে ওঠেননি। সবটাই খুব কেতাবি, অর্থহীন মনে হত। ক্রমশ এখানকার সাধারণ, শ্লথ জীবনযাপনে এক ধরনের অভ্যাস ও ভালোলাগা তৈরি হয়ে যায় তাঁর। সন্ধেটা কেটে যেত রামানন্দ মহারাজের আশ্রমে। পরে, তাঁকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি।

রামানন্দ মহারাজের ভক্তি তাঁর মধ্যে খুব একটা সঞ্চারিত না হলেও, এই অসীম নির্জনতা আর এখানকার সাধারণ গরিবগুরবো মানুষগুলির আগ্রহ আর সমর্পণই যেন তাঁকে দিব্য সাধক বানিয়ে দিল। এইভাবেই, দেখতে দেখতে, কেটে গেল কত গুলি বছর। ভাবলে এখনও অবাকই লাগে কৃষ্ণরূপের। একটু একটু করে গড়ে ওঠে এই 'অলকাশ্রম'। তিনি একটি কমিউনিটি সেন্টারের মতো কিছু গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পরিবর্তে তা একটি ধর্মীয় আকার পেয়ে গেল—যেন নিজের নিয়মেই। কৃষ্ণরূপ নিজেও বুঝেছিলেন, ধর্মীয় আচ্ছাদন এখনও কতটা সুপ্রয়োজনীয়। আর, তাতেই মানুষজন এগিয়ে এসেছিল তাঁর দিকে। অবশ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের টানও ছিল। সাধারণ মানুষ ভালোবাসা বুঝে নেয় ঠিকঠাক। এখন তো চাষ, গোরু, পোলট্রি আর পুকুরের মাছ থেকে আশ্রমের খরচ ভালোই চলে যায়। জনা-কুড়ি মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন খারাপ চলে না। তবু, এখনও ওই মন্দির আর আশ্রমকে কৃষ্ণরূপের কেমন এক ভঙ্গুর আড়াল মনে হয়।

সন্ধ্যা নামতে না-না- নামতেই স্তব্ধ হয়ে আসে এখানকার জীবনযাত্রা। ঝুপ করে অন্ধকারে ডুবে যায় এই প্রত্যন্ত গ্রাম। অবশ্য, গত বছর থেকে আলো জ্বলছে এই আশ্রমে, গোবর গ্যাসে। কৃষ্ণরূপের পুরোনো বন্ধুরা প্রায়ই আসেন কেউ-না-কেউ, সপরিবার। গত বছর সমীরণ এসে এখানে সাতদিন ছিলেন। তিনিই

এই আলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন। অবশ্য বেশিক্ষণ জ্বালানো যায় না। গ্যাস ফুরিয়ে আসে। আলোজ্বলা সময়টায় লম্বা বারান্দায় স্বপ্না-মা তাঁর পাঠশালা খুলে বসে।

স্বপ্নার কথা ভাবলেও খুবই অবাক লাগে কৃষ্ণরূপের। একদিন ভোরের ট্রেনে দুবরাজপুরে নেমে রিকশা নিয়ে অতটা পথ পেরিয়ে সে একাই চলে আসে আশ্রমে। তার আগে, বিয়ের পর প্রদীপের সঙ্গে একবারই এসেছিল এখানে। স্বপ্না তাঁর ছাত্রী ছিল। খুবই ভালো ছাত্রী। বিয়ে করে পিএইচ ডি করা ছেড়ে দেয় দুম করে। শুনে তিনি বিষম দুঃখ পেয়েছিলেন।

সেই সকালবেলা, হঠাৎ, একেবারে ভূমিকাহীন, একা স্বপ্নাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন কৃষ্ণরূপ। আর, তাঁর অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্না কাঁধের ভারী ব্যাগটা নামাতে নামাতে বলেছিল, এখানে থাকতে এলাম। কৃষ্ণরূপ কিছুটা বিমূঢ়ভাবে তাকে দেখছিলেন। স্বপ্না খুবই সাবলীল এবং স্পষ্টভাবে বলেছিল, 'প্রদীপ ডিভোর্স চেয়েছে, আমি দিয়ে দেব বলেছি। আপাতত আমার থাকার মতো কোনও জায়গা নেই। কলকাতায় থাকতে ভালো লাগবে না আর আমার। আপনার কথা. রঘুনাথপুরের কথা খুব মনে হল। আপনি আমায় ফিরিয়ে দেবেন?'

বাক্যরহিত হয়ে তিনি অপলক দেখছিলেন স্বপ্নাকে। তার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হাত দুটিও আভরণহীন। নিচু হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। আর তিনি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই থাকলেন।

সেই থেকে গেল স্বপ্না। তার কোনও দ্বিধা ছিল না। তবু সামান্য মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁদের। দূর সম্পর্কের আত্মীয়া বলে স্বপ্নার পরিচয় দিতে হয়েছিল এখানে। স্বপ্না নিজেই অবশ্য সকলের সঙ্গে ব্যবহারে নিজেকে বিশ্বাস্য এবং গ্রহণীয় করে তুলেছিল। কৃষ্ণরূপও ক্রমশ স্বপ্নার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এখন তো আশ্রমের যাবতীয় কাজকর্ম সে-ই চালায়। এখানে সকলেই তাকে 'স্বপ্না-মা' বলে ডাকে, কৃষ্ণরূপও।

পুরোনো কথা খুবই মনে পড়ে যাচ্ছিল কৃষ্ণরূপের। ঘুরতে ঘুরতে আশ্রমের পুকুরপাড়ে গিয়ে বেদির উপর একটু বসলেন তিনি। ক্রমে আলো ফুটছে। দূর থেকে তিনি দেখলেন, স্বপ্না কুয়ো থেকে জল তুলে ফুলগাছগুলিতে জল দিচ্ছে ঝাঁঝরি করে। অর্থাৎ, দিন শুরু হয়ে গেছে তার। দূরবর্তী স্বপ্নাকে দেখে তাঁর গলার কাছে কেমন বাষ্প জমছিল। এরকম দৃশ্যের মধ্যে রোজই তাকে দেখেন কৃষ্ণরূপ। অথচ আজ সব কেমন অন্যরকম লাগছিল। পাপবোধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল এক ধরনের হাহাকারের বোধ। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

আর, অদ্ভুত, তখনই খাঁচার ভিতর থেকে ময়ূরটি ডেকে উঠল স্বপ্নে-শোনা সেই তীক্ষ্ণ স্বরে। স্বপ্নাও চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে দিকে তাকাল। দূর থেকে, গোপনে, স্বপ্নার সেই আশ্চর্য গ্রীবাভঙ্গি দেখে, বুকের ভিতর এক গভীর মায়া ছড়িয়ে গেল কৃষ্ণরূপের। তিনি মনস্থির করে ফেললেন।

সকালের আগন্তুক

স্বপ্না এখনও ভেবে পায় না, এই পাণ্ডব বর্জিত গ্রাম, তার মানুষজন, সর্বোপরি কৃষ্ণরূপের সঙ্গে সে কী করে জড়িয়ে পড়ল এভাবে। প্রদীপের সঙ্গে যখন তিক্ততা বাড়ছিল ক্রমশই—তার প্রতি সমস্ত আকর্ষণ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল প্রদীপের, প্রদীপ ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছিল ইলোরার দিকে একেবারে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে—তখনই ঠিক করে ফেলে, প্রদীপকে মুক্তিই দেবে সে। সে সময়ই একদিন সন্ধেবেলা একা বাড়িতে বুককেস গোছাতেই গিয়ে কৃষ্ণরূপের 'ইকনমি অব দ্য পভার্টি' বইটি হাতে পায় স্বপ্না। বইটা বের করে আঁচল দিয়ে ঝেড়ে সে মলাট ওলটায়। ফ্লাই-লিফে সুন্দর হাতের লেখায় লেখা উপহারলিপি : টু স্বপ্না, উইথ লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন, কৃষ্ণরূপ চট্টোপাধ্যায়। অপলক সে-দিকে তাকিয়ে থাকে স্বপ্না।

সে গোপন করবে না, কৃষ্ণরূপের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ টের পেত কলেজে। তাঁর ফরসা, লম্বা, সুগঠিত চেহারা, ভরাট কণ্ঠস্বর, গভীর পাণ্ডিত্য, আর আত্মমগ্ন চরিত্রের প্রতি এক ধরনের টান অনুভব করেছে স্বপ্না বরাবর। ছলছুতোয় এগিয়ে যেতে চেয়েছে তাঁর দিকে। কিন্তু উদাসীন কৃষ্ণরূপ স্বপ্নার সেসব চাপা আকুলতা লক্ষ্যই করেননি কখনও। স্বপ্নার তখন কতই বা বয়েস!

প্রদীপের সঙ্গে দেখা হয় ইউনিভারসিটিতে। স্বপ্নার কেমন মনে হয়েছিল, প্রদীপের তাকে দরকার। সে

বিয়ের পর পড়াশোনা ছেড়ে দেয় একেবারে। তার চাকরি করায়ও আপত্তি ছিল প্রদীপের। স্বপ্নাও মেনে নেয় সে সব। তখন মনে হত, টান। এখন সে-সব কথা ভাবলে হাসিই পায় স্বপ্নার।

সেই সন্ধেবেলা কৃষ্ণরূপের বইটা হাতে পেয়ে সে যে কী করে অত উন্মনা হয়ে গিয়েছিল! রাত জেগে শেষ করে ফেলে বইটা। আগেও পড়েছে। এবার পড়তে গিয়ে মুদ্রিত শব্দে সে যেন সেই হারানো আবেগকেই ছুঁতে চাইছিল আকুল আঙুলে। আর তখনই স্বপ্না ঠিক করে ফেলে, কৃষ্ণরূপের কাছেই চলে যাবে। তার আর দ্বিধা থাকে না কোনও।

এখানে এসে মানিয়ে নিতে স্বপ্নার যে একেবারে অসুবিধে হয়নি, তা নয়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, সে পেরেছে। গ্রামের সকলে তাকে মেনে নিয়েছে। অনেক পুরোনো অভ্যাস পালটে ফেলতে হয়েছে। প্রদীপের কথা, ফেলে-আসা জীবনের কথা সে আর ভাবে না। একটু একটু করে সে ক্রমশ নিজের কাছেও হয়ে উঠেছে এক দিব্য সাধিকাই। যেন, নিজেকে সে-ও এখন সকলের মতো 'স্বপ্না-মা' বলে ডাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে!

তার নামের সঙ্গে 'মা' শব্দটি জুড়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণরূপই। তিনি বলেছিলেন, এখানে বসবাসই হবে তোমার কঠিন সাধনা। আমাকে এরা বিশ্বাস করে। কিন্তু, আমি জানি, সেইসব অর্জিত বিশ্বাস ভেঙে যেতেও বেশি সময় লাগবে না। আমি তোমাকে মনে প্রাণে মা বলে ভাবতে চেষ্টা করব। তুমি আমার সেই চেষ্টা কখনও ভেঙে দিয়ো না!

অসহ্য লাগত স্বপ্নার ওই মা-ডাক, কৃষ্ণরূপের মুখে। কতদিন ভেবেছে, নির্জনতায় কখনও ভেঙে দেবে কৃষ্ণরূপের ওই আত্মপীড়নের সাধনা! তাঁর প্রশস্ত, রোমশ বুকে মুখ রেখে কাঁদবে আজীবনের সঞ্চিত কান্না। পারেনি, কিছুতেই পারেনি তেমন। কৃষ্ণরূপকে কেমন পাথরের মতো মনে হয়েছে তার।

অথচ, সে বার যখন স্বপ্নার খুব জ্বর হল, পাথরের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন টের পেয়েছিল সে। হঠাৎই রাতের দিকে জ্বরটা বেড়ে যায় হু হু করে। সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ লাগছিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথায়। আমল দেয়নি স্বপ্না। সারাদিনের ধকলের পর সন্ধেবেলা আর পারেনি সে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে পড়েছিল।

রাখালের কাছেই খবরটা পান কৃষ্ণরূপ। আশ্রমের কাজের লোকেরা সন্ধ্যার ঝোঁকে এ দিক-ও দিক যায়। শুধু রাখাল ছিল রান্নাঘরে। স্বপ্নার মনে আছে, সেই প্রথম কৃষ্ণরূপ তার ঘরে আসেন। চোখ বুজে, কপালের উপর হাত-চাপা দিয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে স্বপ্না। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন কৃষ্ণরূপ। অন্ধকারেই আন্দাজে স্বপ্নার কপালের উপর হাত রাখলেন। কৃষ্ণরূপের হাতটা পড়ল স্বপ্নার হাতের উপর। স্বপ্না কি কেঁপে উঠেছিল সামান্য। আচ্ছন্নতার মধ্যেই আঁকড়ে ধরেছিল কৃষ্ণরূপের হাতটি। কয়েক মুহূর্ত। তারপরই নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, কপাল থেকে স্বপ্নার হাতটা সরিয়ে, নিজের হাতটা স্বপ্নার কপালে রেখে তার শরীরের তাপ অনুভব করেছিলেন তিনি। স্বপ্নার গালে ও গলায় হাত ছুঁইয়ে তাপাঙ্ক অনুভব করতে করতে খুব মৃদু স্বরে বলেছিলেন, এ কী, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তুমি আমায় বলোনি, স্বপ্না!

স্বপ্নার মনে আছে, আশ্রমে সেই প্রথম কৃষ্ণরূপ তাকে শুধু 'স্বপ্না' বলে ডেকেছিলেন। সে অস্ফুটে বলেছিল, আপনি ব্যস্ত হবেন না। ইনফ্লুয়েঞ্জা-মতন, কালই সেরে যাবে।

কৃষ্ণরূপ অল্প ঝুঁকে পড়েছিলেন তার উপর। অন্ধকারে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, তাঁর নিশ্বাসের শব্দ ও গন্ধ অবিকল টের পেয়েছিল স্বপ্না। নিচু হয়ে তার চুলের গভীরে, কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। স্বপ্নার বেশ মনে আছে, কৃষ্ণরূপের হাত কাঁপছিল। আর, তার ওই আচ্ছন্ন শরীর কাঁপিয়ে যেন এক তীব্রতর জলোচ্ছ্বাস দ্রুত ছুটে আসছিল তীরের দিকে। তা জ্বর যেন বেড়ে যাচ্ছিল আরও। স্বপ্নার খুব ইচ্ছে করছিল, দু হাতে কৃষ্ণরূপের গলা জড়িয়ে তাঁর মুখটা নামিয়ে আনে নিজের বুকের উপর।

পর মুহূর্তেই স্বপ্নার কপাল থেকে হাতটা তুলে নেন কৃষ্ণরূপ। সোজা হয়ে দাঁড়ান। একপলক, অন্ধকারেই দেখেন তাকে। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। তারপরই আলো জ্বলে ওঠে স্বপ্নার ঘরে। রাখালকে সঙ্গে নিয়ে এ ঘরে আসেন কৃষ্ণরূপ। রাখালের হাতে দুধের গ্লাস, কৃষ্ণরূপের হাতে ওষুধের পুরিয়া।

—নাও, ওষুধটা খেয়ে নাও। তারপর দুধটা। কৃষ্ণরূপ বলেন।

—না, না, এ কী! আপনার জন্যই দুধটুকু রাখা ছিল। স্বপ্না কোনওরকমে বলে।

—কথা বোলো না।

স্বপ্না উঠে বসে। স্তিমিত আলোয় তাকায় কৃষ্ণরূপের দিকে। তাঁর চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। বুকের ভিতর কেমন শিরশির করে ওঠে স্বপ্নার। কৃষ্ণরূপের হাত থেকে ওষুধটা নিয়ে খেয়ে নেয়। পাশের টেবিলের উপর দুধের গ্লাসটা রেখে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দেয় রাখাল। তারপর বেরিয়ে যায়।

কৃষ্ণরূপ দুধের গ্লাসটা এগিয়ে দেন তার দিকে। দুধ খেতে স্বপ্নার একটুও ভালো লাগে না। তবু প্রায় এক ঢোকে সবটা দুধ খেয়ে নেয় সে। আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। কৃষ্ণরূপ তাকিয়ে আছেন তার দিকে। স্বপ্না মুখ নিচু করে আঙুলে আঁচল জড়ায় অনাবশ্যক। দু জনের মাঝখানে জমে ওঠে অখণ্ড নীরবতা। কোথায় দূরে, একটা পাখি ডাকে, অচেনা।

তারপর কৃষ্ণরূপই বলেন, 'আশ্রমে কেউ নেই আজ। মেলায় গেছে। আমি রাখালকে বললাম ওর বউকে নিয়ে আসতে। সে রাতে থাকবে তোমার কাছে।'

স্বপ্না নতমুখী থেকেই বলে, 'কোনও দরকার ছিল না। সামান্য জ্বর, এমনিই সেরে যাবে। আপনি অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন!'

—সেটা আমি বুঝব। ডাক্তারিটা আমি একটু শিখেছি। আজ জ্বর না নামলে কাল সকালে বিকাশকে খবর দিতে হবে। কৃষ্ণরূপ বলেন।

—আপনার খুব দয়া, না? স্বপ্নার ঠোঁটে দুরন্ত হাসি ফোটে।

কৃষ্ণরূপ চকিতে তাকান তার দিকে। অভিমানে থমথম করছে স্বপ্নার মুখ। তিনি দু আঙুলে চিবুকটা তুলে ধরেন তার। স্বপ্না চোখ তুলে চায়।

—দয়া। অস্ফুটে উচ্চারণ করেন তিনি। স্বপ্না তুমি আমায় দুর্বল করে দিয়ো না। কেমন ভেঙে-পড়া মানুষের মতো শোনায় কৃষ্ণরূপের কথাগুলি।

—আপনি দায়িত্ব-কর্তব্য ছাড়া আর কিছু জানেন না, না? আপনি, আমাকে—আপনি কি কিছুই বোঝেন না! এলোমেলো হয়ে যায় স্বপ্নার কথাগুলি।

—স্বপ্না, এরকম কোরো না। অসুস্থ শরীর। জ্বর বেড়ে যাবে আরও। বলে তার বিছানায় বসে কপালে হাত দিয়ে আবারও তাপ পরীক্ষা করেন কৃষ্ণরূপ।

—তুমি শুয়ে পড়ো। জ্বর বাড়ছে। আমি থার্মোমিটার আনছি। কপালে জলপট্টি দিতে পারলে ভালো হত। ছেঁড়া কাপড়টাপড় আছে কিছু? কৃষ্ণরূপ হঠাৎই খুব ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ান।

—রাখালের বউ আসুক—সে-ই সব করবে। পাশ দিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলে স্বপ্না। কৃষ্ণরূপ স্বপ্নার পায়ের কাছ থেকে চাদরটা নিয়ে তার গায়ের উপর বিছিয়ে দেন আলতো করে। জানলাটা বন্ধ করে দেন।

—অসুখে আমার এখন খুব ভয় করে, স্বপ্না। মাত্র চারদিনের জ্বরে অলকা চলে গিয়েছিল। আমার জন্য। গলা কেঁপে যায় কৃষ্ণরূপের।

—ও রকম করবেন না! আমার কিছু হবে না। সামান্য জ্বর কারও হয় না নাকি। স্বপ্না কৃষ্ণরূপের দিকে ফেরে।

—তোমার তো কখনও হয়নি, এই তিন বছরে।

—আপনি যান। রাতে খেয়ে নেবেন ঠিকমতো।

জ্বরটা বেড়ে যেতে থাকে হু হু করে। প্রবল শীত লাগে স্বপ্নার। কৃষ্ণরূপ রাখালের বউকে তার কপালে জলপট্টি দিতে বলেন। আর নিজে আধঘণ্টা অন্তর স্বপ্নার মুখে থার্মোমিটার দিয়ে তাপ পরীক্ষা করেন। ঘোরের মধ্যে যখনই চোখ মেলেছে স্বপ্না, টের পেয়েছে, জেগেই আছেন কৃষ্ণরূপ। বারান্দায় পায়চারি করছেন, দাঁড়াচ্ছেন খোলা দরজার সামনে।

ভোররাতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। স্বপ্না উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখেছিল, কৃষ্ণরূপ বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন কখন। সে নিঃশব্দে, পাশে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে দেখে। শক্ত প্রকৃতির মানুষটির মধ্যে এত মায়া, তার জন্য ভাবতেই একটা অদ্ভুত ভালোলাগার আবেশে বুক ভরে ওঠে যেন। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে প্রদীপের মধ্যে সে কখনও এ রকম আকুলতা টের পায়নি তার জন্য। ভোরের

আবছায়ায় কৃষ্ণরূপের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে স্বপ্না। তার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে মিশে যায় বাতাস ও কুয়াশায়, সে টের পায়। এই মানুষটাকে সে যে সেই বয়ঃসন্ধিতেই নিজের মতো করে ভেবেছিল, তা তো তিনি কোনওদিনই জানবেন না! এত বছর পর সেই পুরনো, বালি-চাপা আবেগের জন্য স্বপ্নার বুক কেঁপে ওঠে, কান্না পায়।

স্বপ্নার ইচ্ছে হল, কৃষ্ণরূপকে একটু ছোঁয়। তাঁর চুলে হাত ডুবিয়ে দেয়। তাঁকে জাগায়। কিন্তু সেসব কিছুই করল না সে। বাথরুম ঘুরে ঘর থেকে একটা চাদর বের করে কৃষ্ণরূপের গায়ে বিছিয়ে দিল সতর্ক হাতে। আবছায়া মাঠের দিকে তাকাল। তারপর আর ঘুম এল না তার।

গাছে জল দিতে দিতে স্বপ্না গেটের শব্দ পেয়ে মুখ তুলতেই দেখল, মুখে-মাথায় চাদর জড়ানো একটি ছায়ামূর্তি গেট খুলে ঢুকছে। তার কাঁধে একটা ব্যাগের আভাস টের পেল সে দূর থেকে। অপরিচিত আগন্তুককে পরিপূর্ণ যুবক বলেই মনে হল তার। স্বপ্না অপেক্ষা করল। এ দিক-ও দিক তাকিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে যুবকটি এগিয়ে এল তার দিকে। মাথা থেকে চাদরটা সরিয়ে স্পষ্ট তাকাল তার দিকে। সুঠাম, ঋজু, লম্বা, গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখের যুবকটিকে দেখে এই নির্জন শীতের সকালে অহেতুক কেমন ভয় পেল সে। যেন কেঁপে উঠল এক অজানা আশঙ্কায়।

—আমার নাম আনন্দ, আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায়। আপনি নিশ্চয়ই স্বপ্না, আমার বাবার সাধনসঙ্গিনী। যুবকটি খুবই অনায়াসে বলল। বলে হাসল। তার সেই হাসিতে বিদ্রূপ, রাগ, ঘৃণা ঝলসে উঠতে দেখল স্বপ্না। অপমানে রিরি করে উঠল গোটা শরীর।

আনন্দ! কৃষ্ণরূপের ছেলে! বহুকাল ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই কৃষ্ণরূপের। এতদিন কোথায় ছিল সে। কেন ফিরে এল হঠাৎ! এই স্পষ্ট যুবকের সামনে দাঁড়িয়ে কী করবে সে, স্থির করতে পারল না স্বপ্না।

—কী হল, আপনি কি ভয় পেলেন নাকি! আনন্দ হাসতে হাসতেই বলে। আমার ভিতরে যাওয়ার দরকার। কৃষ্ণরূপ মহারাজ আছেন তো আশ্রমে?

—না না, ভয় পাব কেন, আসুন। স্বপ্না কোনওরকমে বলে।

—চলুন। আনন্দ তাকে অনুসরণ করে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত স্বপ্নার পাশাপাশি এসে যায় আনন্দ। স্বপ্নার মনে হয়, একজন ঘাতক তাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার হাঁটু কাঁপছিল।

ক'দিন আগে আশ্রমের দেওয়ালে উগ্রপন্থীরা মাও সে তুঙের ছবি এঁকে রেখে গিয়েছিল। দেওয়ালের লেখায় প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মবাজ কৃষ্ণরূপকে খতম করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। দেখে স্বপ্না আতঙ্কে থরথর করে কেঁপেছিল। আর, কৃষ্ণরূপ দেওয়ালের লেখা পড়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'দেখেছ, ছেলেগুলো ঠিকঠাক বানান শেখেনি এখনও।' কৃষ্ণরূপ সন্দেহ করতেন, আনন্দ ওদের দলে যোগ দিয়েছে। এখানে সকলে জানে, কৃষ্ণরূপই বলেছেন, আনন্দ দিল্লিতে চাকরি করে। স্বপ্না জানে, ছেলের জন্য ভিতরে ভিতরে ভয়ে, আশঙ্কায় কীরকম কাঁটা হয়ে থাকেন কৃষ্ণরূপ! তা হলে, এতদিন পর, আনন্দ কি ফিরে এল কৃষ্ণরূপকে খুন করবে বলে! দলই কি সে দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠাল তাকে। কৃষ্ণরূপ সে দিন বলছিলেন, কোথায় যেন একজন নকশাল-যুবক তার পুলিশ-অফিসার-বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে, কাগজে দিয়েছিল খবরটা।

—আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কেন? নীরবতা ভেঙে স্বপ্না জিজ্ঞেস করে।

—ভয় নেই, আপনাদের সাধের নন্দনকানন ধ্বংস করতে নয়। আনন্দ বলে। ইস্, বাগানে আবার ময়ূরও পুষেছেন দেখছি। হরিণ নেই, হরিণ-শাবক! থাকলে খুব মানাত কিন্তু!

—আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন। স্বপ্না নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না।

—আরে, আরে, আপনি রেগে যাচ্ছেন নাকি। আমি একটু মজা করছিলাম। আনন্দ হাসতে হাসতেই বলে।

—আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু এইমাত্র আলাপ হল। স্বপ্না নিজের গলার ঝাঁজ টের পেল।

—আমার বাবার সঙ্গে কতদিন আছেন আপনি? আনন্দ নির্বিকার।

—ভদ্রভাবে কথা বলুন! স্বপ্নার বাঁধ ভেঙে যায়।

—যাহ্ বাবা! অভদ্রতার কী দেখলেন! জাস্ট অ্যান কোয়ারি! আনন্দ হাসে।

—যাঁর কাছে এসেছেন তাঁর কাছ থেকেই সব জেনে নেবেন। স্বপ্না নিভন্ত গলায় বলে।

—আপনার বিষয়েও? গলা নামায় আনন্দ।

স্বপ্না আর কোনও কথা বলে না। যেন, হাল ছেড়ে দেয়। তার আর কথা বলতে ভালো লাগছিল না। পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। হঠাৎ কী মনে হতে স্বপ্না আঁচলটা গায়ে জড়ায়। গোপন চোখে একবার দেখে আনন্দকে। কৃষ্ণরূপের ছেলে বলে চেনা যায়। আনন্দর চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ, অন্ধকার। তার চেয়ে সামান্য ছোটোই হবে সম্ভবত। এ কি সত্যিই কোনও অস্থির ঘাতক! কেমন শীত করছিল স্বপ্নার। আনন্দ প্রথম থেকেই অপমান করছে তাকে, তার প্রতি চাপা ঘৃণা ও আক্রোশও গোপন রাখেনি সে। অথচ, স্বপ্না লক্ষ করল, আনন্দকে অস্বীকার করতে পারছে না সে। খুব খারাপও লাগছে না তাকে।

স্বপ্না নিরুত্তর হাঁটে। কৃষ্ণরূপ কি বাগান ঘুরে তাঁর ঘরে চলে গেছেন! আশ্রম জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। মুরগির খাঁচায় খাবার দিচ্ছে রাখাল। কুয়োয় জল তুলছে কমলা। এরপব গোয়ালঘর পরিষ্কার করে জাবনা দেবে। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণরূপের ধ্যানে বসার সময় হল। মন্দিরের দরজা খোলা হয়নি এখনও। দ্রুত পা চালাল স্বপ্না।

—আপনাকে আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে! একই গলায় আনন্দ বলে। স্বপ্নার হাসি পায়।

—ধন্যবাদ। স্বপ্না হাসে না।

—শুনেছি, আপনি এখানে মাতৃরূপা। কৃষ্ণরূপ মহারাজও নাকি আপনাকে স্বপ্না-মা বলে ডাকেন!

—আপনি অনেক খবর রাখেন দেখছি!

—রাখতে হয়! তবে, আমার দ্বারা কিন্তু ও সব ভণ্ডামি হবে না। দিদিফিদিও ডাকতে পারব না আমি!

—বেশ তো, নাম ধরেই ডাকবেন!

—থ্যাঙ্কয়ু। অবশ্য যদি দরকার হয়!

হাঁটতে হাঁটতে তারা কৃষ্ণরূপেব ঘবের সামনে পৌঁছে যায়। বারান্দায় উঠে স্বপ্না টোকা দেয় কৃষ্ণরূপের দরজায়।

কৃষ্ণরূপ ভিতর থেকে বলেন, 'এসো।'

স্বপ্না বলে, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

—কে? বলে কৃষ্ণরূপ বাইরে বেরিয়ে আসেন। আর, বেরিয়েই সামনে আনন্দকে দেখে, মুহূর্তে, কীরকম প্রস্তরীভূত হয়ে যান তিনি, স্বপ্না দেখে।

অবিশ্বাসীর হাহাকার

ঝোঁকের মাথায় এখানে না এলেই ভালো হত। কত বছর পর কৃষ্ণরূপের সঙ্গে তার দেখা হল, হিসেব করতে পারে না আনন্দ। জলে-জঙ্গলে, লোকালয়ের বাইরে কেবল একটা স্বপ্ন আর তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে কীভাবে ফুৎকারে ভেসে গেল দিনগুলি! তাদের এইসব লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের কতখানি কী উপকার হয়েছে, হবে—এখনও বুঝে উঠতে পারে না সে। তরাইয়ের সেই গোপন জীবন, ত্রাস আর উৎকণ্ঠার দিনগুলি-রাতগুলি, তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো পালিয়ে বেড়ানো, অন্তত দুজন মানুষকে নিজের হাতে নির্বিকার মেরে ফেলা—এ সবে বিপ্লব কতখানি ত্বরান্বিত হল! সাধারণ মানুষজন তো কই এখনও এগিয়ে এল না তাদের দিকে! তরাইয়ের কৃষকেরা কিছুটা সংগঠিত, প্রণোদিত হয়েছিল ঠিকই, বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়ার দিকেও কিছুটা সাড়া জেগেছে, বিহার বা অন্ধ্রপ্রদেশে লড়াই চলছে- -কিন্তু গোটা দেশের তুলনায় তা কতটুকু! এ রকম চোরাগোপ্তা দু-একটা খুন করে সংগঠিত ব্যবস্থাকে কতটুকু আতঙ্কিত করা যায়! আনন্দর কেবলই মনে হয়, শ্রমিক-কৃষকদের আগে থেকে সংগঠিত না করে, এ ভাবে তথাকথিত বিপ্লবের ডাক দেওয়ার মধ্যে কোথায় একটা বড়ো ফাঁক থেকে যায়! মানুষকে তৈরি করা দবকার ছিল। তা সেভাবে হয়নি বলেই মানুষ

তো এখনও আসলে তাদের ভয়ই পায়। আজিজুলদাকে আনন্দ একদিন এ সব বলেছিল। কোনও জবাব দেননি তিনি। অন্ধকারে আরও কঠিন হয়ে গিয়েছিল তাঁর রুগ্‌ণ মুখটা।

সে তবে কেন জড়িয়েছিল ওই মন্ত্রে! সেভাবে কারণ তো ছিল না কিছু! মা মারা যাওয়ার পর এক ধরনেব শূন্যতায় আক্রান্ত হয়েছিল আনন্দ। নির্জনে, সামান্য অসুখে, একা একাই মরে গেল মা! ভাবতেই নিজের উপর, কৃষ্ণরূপের উপর একটা অসহ্য আক্রোশ জমে উঠেছিল ভিতরে ভিতরে। মায়ের সঙ্গেই যতটুকু যা সম্পর্ক ছিল আনন্দর। কৃষ্ণরূপ থাকতেন তাঁর পাণ্ডিত্যের ঘেরাটোপে। মাকে তিনি কখনও সেভাবে গুরুত্ব দেননি। মা-ও নিজেকে গোপন রাখতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর, ওইভাবে, অলকা যে ক্রমশ পৌঁছে গিয়েছিল তীব্র রক্তশূন্যতায়, ঘুণ বাসা বেঁধেছিল তার শরীরে ও মনে, তা টেরই পাননি কৃষ্ণরূপ। পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর অহঙ্কার। মায়ের অশিক্ষাকে যেন ঘৃণাই করতেন তিনি। উপেক্ষা করতেন তাকে। বিরক্তবোধ করতেন তার সাংসারিক স্বভাবে। মাকে গঠন করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না তাঁর। আর, এইভাবে চলতে চলতে, মা-ও আড়াল খুঁজে নেয় নিজের মতো। কৃষ্ণরূপ সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যেতে থাকেন আরও যশাকাঙ্ক্ষার দিকে।

শ্মশানে মায়ের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে শোক নয়, দুঃখ নয়—এক ধরনের তীব্র ক্রোধে ক্রমশই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল আনন্দর। মার সামান্য শরীরটা যখন সকলে ধরে সাজানো চিতার উপর তুলে দিল, মায়ের শরীর থেকে একে একে খুলে নেওয়া হল সব আবরণ, বুকের উপর চাপানো হল আরও ভারীভারী কাঠের টুকরো—সে তখন প্রাণপণে ধরে রেখেছিল নিজেকে। মার আলতা-পরানো পাদুটি, সিঁদুরমাখা কাগজের মতো আবছা মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিল সে। তার চোখ শুকিয়ে গিয়েছিল। রাগে থরথর করে কাঁপছিল তার তরুণ শরীর।

আর, তারপর, যখন চারদিক অন্ধকার করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এ দিকে-ও দিকে আলো জ্বলে উঠছে একটি-দুটি করে, তখন কে-যেন তার হাতে ধরিয়ে দিল একগোছা জ্বলন্ত পাটকাঠি আর সে আলগোছে তিনবার চেপে ধরল মায়ের স্মিত হাসি-মাখা ঠোঁট দুটির উপর, তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি আনন্দ। ভেঙে পড়েছিল আকুল কান্নায়। তার মনে হয়েছিল, মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ি সে-ও। সে-ও কখনও সেভাবে তাকিয়ে দেখেনি মায়ের দিকে। মায়ের ঠোঁট দুটি যে অত পাতলা, মায়ের চোখের পাতা যে অত নিবিড়—তা যেন আজই প্রথম লক্ষ করল আনন্দ।

কৃষ্ণরূপ ফিরে এসে তার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি, কোনও সান্ত্বনা দেননি তাকে। সারাদিন দোতলায় নিজের ঘরেই থাকতেন। আনন্দ যে ওইসব বিচ্যুয়ালে খুব একটা বিশ্বাসী, তা নয়। কিন্তু, তখন বড়োমাসি যা যা করতে বলেছেন, সে নীরবে করেছে। কথা বলতেই ভালো লাগত না যেন। তার মনে হয়েছিল, মার জন্য, মার স্মৃতির জন্য তার এতটুকু করা দরকার

বড়োমাসি তাকে বলেছিলেন, তোর বাবা-মার বিয়েটাই ভুল ছিল। তোর বাবা কোনওদিনই অলকাকে ভালোবাসেনি। দায়িত্ব-কর্তব্য সব করে গেছে, ঠিকই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অলকার কোনও ভূমিকাই ছিল না তাঁর কাছে। অলকা সবটাই মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। মেনে নিয়েছে। সয়েছে অবহেলা আর অপমান।

স্বপ্নার কথাও কী যেন বলেছিলেন তখন বড়োমাসি! আজ আর সবটা মনে নেই আনন্দর। আবছা মনে পড়ে, স্বপ্নাকে তাদের বাড়িতে সে কখনও সখনও দেখেছে। বড়োমাসি বলেছিলেন, ওই মেয়েটা এলে তোর বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের মধ্যে কী যে দেখেছিল তোর বাবা!

বড়োমাসির সব কথা আনন্দ যে খুব মন দিয়ে শুনত, বা বিশ্বাস করত, তা নয়। একদিকে বাবার প্রতি তার একটা আকর্ষণও ছিল। তিনি অন্য সকলের মতো নন, আলাদা। তাঁকে নিয়ে চাপা অহঙ্কারও ছিল আনন্দর। আর, সাধারণ মানুষেরা যে তা খুব একটা পছন্দ করে না, তাঁদের টেনে নামাতে চায় নিজের দিকে, নীচে—তা ভালোই বুঝত সে।

হস্টেলে ফিরেও খুবই অস্থির লাগত আনন্দর। কৃষ্ণরূপের টাকা আর চিঠি যেত একেবারে নিয়মমাফিক, মাসের প্রথম সপ্তাহেই। চিঠি মানে মাপা তিন-লাইন : টাকা পাঠালাম। আশা করি ভালো আছ। ভালো থেকো। কৃষ্ণরূপ চট্টোপাধ্যায়। ওই সংক্ষিপ্ত, ধারাবাহিক, বিরক্তির বাক্যগুলিতে চোখ রেখে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠত

আনন্দব। মনে হত, নিজেব সম্পূর্ণ নামটি সুন্দব হাতেব লেখায লিখে একধবনেব আত্মতৃপ্তি বোধ কবতেন তিনি। সংক্ষিপ্ত তিনটি বাক্যে তিনি আসলে নিজেকেই জাহিব কবতে চাইতেন। অন্তত, সেখানে তাব জন্য বিন্দুমাত্র টান বা উদ্বেগ কিছুই থাকত না—আনন্দ ভালোই বুঝত।

হস্টেলেই, ওই অবস্থায, বিকাশদা তাকে ধবে। বিকাশদা তাকে মানুষেব মুক্তিব কথা বোঝায। বৃন্দদেব অর্থনীতিব আলোচনাগুলি যে আসলে পুঁজিবাদেবই সহাযক, এ তাকে পাখি পড়া কবে বুঝিযেছিল বিকাশদা

বিকাশদাব সঙ্গেই সে তবাইযেব দিকে গিযেছিল। বিকাশদাই তাব হাতে প্রথম অস্ত্র তুলে দেয—একটা লম্বা, সরু পাইপগান। তবাই অঞ্চলেব গোপন সংগঠন, কমবেডদেব মনোবল, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ডেডিকেশন তাকে খুব টেনেছিল। মনে হযেছিল, এবাব একটা কিছু হবে। পালটে যাবে দেশটা। সকলে খেতে-পবতে পাবে। আসলে, আনন্দ এখন বোঝে, সে ওইভাবে ভুলতে চেযেছিল নিজস্ব শূন্যতা, একাকিত্ব।

চা-বাগানেব সেই ম্যানেজাবকে যে দিন সে অনাযাসে খুন কবে, সে দিনই বুঝেছিল, আলাদা হযে গেল তাব জীবনেব গতি ও নিযতি। আনন্দব মনে আছে চা বাগানেব ঝুপসি অন্ধকাবে সে দিন সন্ধে থেকেই লুকিযে বসেছিল সে অরুণাদি আব সুব্রত। অরুণাদিব আসাব কথা ছিল না। সে এসেছিল একবকম জোব কবেই— আনন্দব জন্য। নির্দেশ ছিল, কাজটি কবতে হবে আনন্দকেই। সেই প্রথম ঘাতকেব ভূমিকা আনন্দব

ক্রমশ অন্ধকাব হযে আসছিল চাবদিক। কোনও কথা বলেনি ওবা ওই দীর্ঘ সময। সিগাবেট ধবাতে গেলে আনন্দ, অরুণাদি বাধা দিযেছে। সময যেন ওৎ পেতে অপেক্ষা কবছিল। থমথম কবছিল চবাচব। আব [illegible] সামান্য মেঘ ছিল। খবব ছিল, ঠিক আটটায মানুষটা ফিববে শিলিগুড়ি থেকে জিপে। বাগানেব বাইবেই নামতে হবে তাকে। ভিতবে জিপ ঢুকবে না। বাকি পথটা হেঁটেই আসতে হবে তাকে বাংলো পর্যন্ত, একা। সশস্ত্র নেপালি দাবোযানটাকে নিযে ড্রাইভাব ফিবে যাবে। লোকটাব ব্রিফকেসে থাকবে [illegible] টাকা। [illegible] আগ্নেযাস্ত্র—দুই-ই তাদেব চাই। ওই সংক্ষিপ্ত সমযটুকুই কাজে লাগাতে হবে তাদেব।

দূবে জিপেব আলো ও গর্জন টেব পাওযা গেল ঠিক সমযে। অরুণাদি [illegible] ফিসফিস কবে বলল, গেট বেডি, আনন্দ। এই লোকটা মবালে [illegible] ভাবো। কথাগুলিব ঠিক মানে বোঝেনি আনন্দ। অন্ধকাবে [illegible] উঠে দাঁড়াল সে। আব [illegible] মানুষটি যখন হেঁটে এল একেবাবে নাগালেব মধ্যে, [illegible] সে ঝাঁপ দিল [illegible] একেবাবে হিংস্র বাঘেব মতো, জাপটে ধবল মানুষটিব গলা একেবাবে [illegible], আব [illegible] মানুষটি কিছু বোঝাব আগেই বিদ্যুতেব মতো [illegible] তাব পেটেব ঠিক মাঝখানে [illegible] লাগল আনন্দব হাতে। [illegible] বক্তমাখা আঙুলগুলি চটচট কবে উঠল। [illegible] ড্রামেব আওযাজ টেব পেল সে। [illegible] তাব চোখেব সামনে। [illegible] সে মুঠোয-ধবে-থাকা ছুবিটা এক ঝটকায তুলে আনল তাব শবীব থেকে। তাবপব তেমন [illegible] সেই বক্তমাখা ছুবিটি আলগো হাতে [illegible] লোকটিব [illegible]। আনন্দ টেব পেল, গবম বক্ত ছিটকে এসে লাগল তাব চোখে মুখে। ততক্ষণে অরুণাদি ছুটে এসে দাঁড়িয়ে [illegible] ভাবী ব্রিফকেসটা সুব্রত খুলে নিযেছে পিস্তলটা। আব তাবপব [illegible] কবে মানুষটিকে শুইযে দিযেছে মাটিতে একেবাবে নিঃশব্দে, অরুণাদিবা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ঝোপেব আডালে, দূবে।

অন্ধকাবে এক মুহূর্তে আনন্দ দেখল শাযিত মানুষটিব থবথব [illegible] মতো পা [illegible] তাব। ঝোপেব আডালে অপেক্ষা কবছিল অরুণাদিবা। সেই অবধি কোনওবকমে পৌঁছে সে আব নিজেকে বইতে পাবছিল না যেন। তাব পা দুটো ভাবী হযে আসছিল, ঝিমঝিম কবছিল মাথা। [illegible] সে টেব পেল, অরুণাদি অন্ধকাবেই তাকে ধবল। ধবে, তাব ভাবসাম্যহীন শবীবটা হঠাৎই চেপে ধবল নিজেব শবীবে। আঁচল দিযে অন্ধকাবেই মুছিযে দিল মুখে লেগে থাকা বক্তেব দাগ, ঘাম। আব অরুণাদিব

ঘন আলিঙ্গনের মধ্যে নিজের নিঃশেষিত শরীরটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে দিতে তার বুকের কোমলে ঘুমের গন্ধ পেল আনন্দ।

——আনন্দ' খুব অনুচ্চ স্বরে তাকে ডাকে অরুণাদি। মনে হয়, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ভেসে আসে সেই ডাক। আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়, চল।

আনন্দর সারা শরীরে তখন ঘুম নামছে। সে তখন নিজের মুখটা ডুবিয়ে দেয় অরুণাদির বুকের গভীরে। অরুণাদি দু হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে। তার সারা শরীরে ঘাস, বুনো লতাপাতার আকুল গন্ধ টের পায় আনন্দ। সুব্রত ততক্ষণে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেছে অনেকটা। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর, তখনই, আনন্দ টের পায়, সে যেন খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো, লোহার মতো প্রবল হাতে, জড়িয়ে ধরেছে অরুণাদির নগ্ন কোমর। আর অন্ধকারে, অন্ধকারের মতো ফিসফিস করে অরুণাদি বলে, 'মুখ তোল আনন্দ, চল্, পালাও'

সে মুখ তুলে অন্ধকারেই খুঁজে পায় অরুণাদির অবাধ্য ঠোঁট দুটি। যেভাবে কয়েক মুহূর্ত আগে সেই অচেনা মানুষটির কণ্ঠনালিতে সে চেপে ধরেছিল সেই রক্তাক্ত ইস্পাত, সেভাবেই নিজের বয়সের মতো ঠোঁট দুটি আচমকা বসিয়ে দেয় অরুণাদির ঠোঁটের উপর। যেন, দাঁত বসে যায় সামান্য। অরুণাদি ওই মৃত মানুষটির মতোই সামান্য ছটফট করে ছাড়িয়ে নিতে যায় নিজেকে। সে আরও তীব্রভাবে চেপে ধরে অরুণাদির উত্তপ্ত ঠোঁট দুটি। যেন তার শরীরে জল জঙ্গল সরিয়ে খুঁজে নিতে চায় কোনও গোপন হ্রদ। এভাবে আর কোনও নারীকে জানেনি আনন্দ। সে টের পায়, গভীর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে লাইট হাউসের মতো তার শরীর জেগে উঠছে ক্রমশ। আর অরুণাদির উন্মুখ ঠোঁট দুটি আশ্লেষে শুষে নিতে নিতে হঠাৎই তার শরীরে উষ্ণ রক্তের গন্ধ টের পায় আনন্দ। তার শরীর দুলতে থাকে আচ্ছন্ন নৌকোর মতো। গা গুলিয়ে ওঠে। সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। হড়হড় করে বমি করে ফেলে। তার শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে যায়। অন্ধকার আরও জমাট হয়ে আসে চারদিকে। পড়ে যাওয়ার আগে সে দেখে অরুণাদি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে গভীর অন্ধকারের দিকে। আর সুব্রত ওর দিকে এগিয়ে আসছে অন্ধকার পেরিয়ে দ্রুততর।

তারপর আরও কিছুদিন আনন্দকে চলে যেতে হয় হাজারিবাগের দিকে। সেখানেই সে পরে একদিন [illegible] খবর পায়। সেই চা বাগান থেকে [illegible] সুদ্ধ নাকি ওরা অন্য কোনওদিকে চলে যায় অরুণাদি। আর তারপর, আনন্দ যখনই অরুণাদির কথা ভেবেছে, তার শরীরে পাক দিয়ে উঠেছে গভীর অন্ধকার বিবমিষা। বারবার সে ওইভাবেই চিনেছিল। অরুণাদির কথা ভাবলেই আনন্দ তারপর ওই উষ্ণ চটচটে রক্তের গন্ধ অবিকল টের পেয়েছে।

মেয়েদের কাছে সে আর স্বাভাবিক হতে পারেনি। মেয়েদের কথা ভাবতে গেলে এখনও তার সেই [illegible] স্বপ্নার সঙ্গে কি কোনও মিল আছে অরুণাদির? আনন্দর চেয়ে সামান্য বড়ো হবে সে। ওই মেয়েটাকে [illegible] চলেছে। অথচ, মাস সাতেক [illegible] স্বপ্না থাকছে সে [illegible] হয়ে গেছে। যেন, তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আনন্দ স্বপ্নাকে জানিয়েছে [illegible] দুটি চোখে। শুনতে শুনতে গভীর বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছে তার চোখে দেখেছে আনন্দ।

কীভাবে যে কেটে গেছে সময়, টেরও পায়নি আনন্দ। কতবার যে মরতে মরতে বেঁচে গেছে সে। নিজের হাতে মেরেছে আরও একজনকেও। সেই পুলিশ অফিসারটির দিকে ঠিক সময়ে গুলি না চালালে, লোকটিই শেষ করে দিত তাকে। যেন সুতোর উপর ঝুলে ছিল তার সেইসব বেঁচে থাকা, মৃত্যু।

না, আনন্দ আর ভাবতে চায় না সে সব। দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় সেইসব ঝোড়ো দিনগুলিকে। দল ভেঙে গেছে অনেক টুকরোয়। কে কোথায় ছিটকে গেছে, জানে না আর। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো এ দিক-ও দিক ঘুরে বেড়িয়েছে সে দীর্ঘদিন। হাজারিবাগ থেকে ফিরে ঝাড়গ্রামের দিকে বেশ কিছুদিন ছিল লুকিয়ে। এখানে আসবে, ভাবেনি সে। তবু যেন একটা ঘোরের মধ্যে অসুস্থ শরীরে, চলে এল ঠিক। এখানকার পুলিশ তাকে সে ভাবে জানে না। তবু এখনও এইসব ছোটো জায়গায় অচেনা মুখ দেখলেই মানুষ ফিরে তাকায়। খুব অস্বস্তি হয় আনন্দর। আশ্রমের বাইরে খুব একটা বের হয় না আনন্দ। স্বপ্না রটিয়ে দিয়েছে, সে অসুস্থ, কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার দিল্লিতে ফিরে যাবে। মুশকিল হল, ভৌমিকবাবুরা যখন তাকে দিল্লির কথা জিজ্ঞেস করেন, সে জুতসই গল্প বানাতে পারে না সেই অচেনা শহরটা সম্পর্কে। স্বপ্না তখন সামাল

দেয়। পরে হাসতে হাসতে বলে, একটু মিথ্যে বানাতে পারো না! বিপ্লবী! পুলিশ ধরলে তো সব হুড়মুড়িয়ে বলে দেবে! শুনে আনন্দও হাসে। কতকাল পর যে হাসি আসে তার মুখে!

কৃষ্ণরূপ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোথায় ছিলে তুমি, এতদিন?'

তাঁর সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বরে সামান্য বিচলিত হয়েছিল আনন্দ। তবু সরাসরি তাকাল তাঁর চোখের দিকে। বলল, 'এই পৃথিবীতেই ছিলাম। অন্য কোনও গ্রহে যাইনি। কেন, আপনি আমাকে খুঁজেছিলেন নাকি!' সে একটু বিদ্রূপ মেশাতে চাইল উচ্চারণে।

—কী করলে? কৃষ্ণরূপের পরের প্রশ্ন।

—বলার মতো কিছু না। তবে পালিয়ে যাইনি।

—তুমি কী আমাকে মিন করতে চাইছ?

—আপনার যদি তেমন মনে হয়, তা হলে আমি নাচার!

—পরিষ্কার করে বলো।

—আমি কিছুই বলতে চাই না। আপনি নিজেই সব জানেন।

—তুমি এতদিন পর এখানে এলে কেন?

—এখনও ঠিক জানি না। মনে হয়, আপনার কীর্তিকলাপ একবার দেখতে।

—কী দেখলে?

—আপনার ব্যর্থতা—জাস্ট রিডিকুলাস!

—মানে!

—মানে নেই কোনও!

—আমি তোমাকে এখানে থাকতে না-ও দিতে পারি। পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি।

—পারেন, কিন্তু পারবেন না! আপনার ডিগনিটি আমি জানি।

—তুমি মানুষ খুন করেছ?

—তাতে কী! আপনিও আমার মাকে মেরে ফেলেছিলেন!

—কী!

—হ্যাঁ, সম্ভবত ওই মেয়েটার জন্য!

—ভদ্রভাবে কথা বলো, আনন্দ! তোমার জন্য লজ্জা হয় আমার।

—চেঁচাবেন না। লজ্জা আমারও হয়—আপনার জন্য!

—তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও!

—না। আমি ক-দিন এখানে থাকতে চাই।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা বলছিল তারা। স্বপ্না বাগানেই ছিল। হঠাৎই এসে পড়েছিল সে দিকে। আনন্দকে বলেছিল, 'আপনি এ-দিকে আসুন। বাথরুমে জল দিয়েছি। হাত মুখ ধুয়ে চেঞ্জ করে নিন।'

তারপর স্বপ্না এসেছিল তার ঘরে, খাবার নিয়ে। আনন্দর তখন মনে হয়, তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। যেন কতদিন কিছু খায়নি সে। স্বপ্নাকে ভ্রূক্ষেপ না করে মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছিল আনন্দ।

এক নিশ্বাসে খাবার শেষ করে জল খেয়ে মুখ তুলতেই আনন্দ দেখে, তার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আছে স্বপ্না। সে মুখ তুলতেই চোখে চোখ পড়ে দু জনের। স্বপ্নার গভীর চোখ দুটির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে আনন্দ হঠাৎই যেন বুকের মধ্যে এক গভীর ভাঙনের শব্দ টের পায়। তার মনে হয়, কয়েক হাজার বছর ঘুমোয়নি সে। স্বপ্নার ছড়ানো চুল, শ্যামল মুখ, নির্জন দুটি বাহু, বুকের পরিপূর্ণ ঢেউ দুটির দিকে তাকিয়ে চকিতে এক আশ্চর্য আচ্ছন্নতা টের পায় সে। আর, অদ্ভুত যে, তার তখন ঘুণাক্ষরেও মনে পড়ে না অরুণাদির কথা। রক্তে তীব্র গন্ধ তাড়া করে আসে না তার দিকে। স্বপ্নার অস্তিত্ব, নীরবতা ছোট্ট ঘরটিতে তখন যেন এক অলৌকিক স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছিল।

অথচ, স্বপ্নাকে তো ঘৃণাই করতে চেয়েছিল সে। তাকে সন্দেহ করতে চেয়েছিল। অথচ, ওই বিষণ্ন চোখ দুটি তাকে কী করে মুহূর্তে ভরে দিল গভীরতর মায়ায়! সে তাকিয়েই রইল। চোখ নামিয়ে নিল স্বপ্না।

দেখতে দেখতে কেটে গেল এক সপ্তাহ। আশ্রম এবং চারপাশের সকলের মধ্যেই স্বপ্না এবং কৃষ্ণরূপ সম্পর্কে এক ধরনের গভীর শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ করেছে আনন্দ। তা হলে এভাবেও হয়। এক ধুধু মাঠের মধ্যে, লোকালয়ের চেয়ে অনেক দূরে, এক নির্জন আবাসে দুটি অনাত্মীয় নারী-পুরুষ কাটিয়ে দিল একেবারে কলঙ্কহীন, সন্দেহহীন দীর্ঘ জীবন— ভাবলে কেমন অবাকই লাগে আনন্দর। সে খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করতে চেয়েছে দুজনকে—বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায়নি।

অস্বাভাবিকই বা ভাবছে কেন সে। দুজন পরিপূর্ণ নারী-পুরুষের মধ্যে এই নির্জনতায় পারস্পরিক আকর্ষণ তো স্বাভাবিকই। শরীরই ডেকে নেবে শরীরকে। নাকি বয়সের ব্যবধানই বাধ্যত দূরবর্তী করে রেখেছে তাদের! নাকি লোকভয় এড়াতে পারেনি তারা! তা হলে বড়োমাসি কি ভুল বলেছিল, বানিয়ে বলেছিল! ভাবতে গেলে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায় আনন্দর, জট পাকিয়ে যায়, যন্ত্রণা হতে থাকে কোথায় যেন!

স্বপ্না তাকে বলেছে নিজের কথা, প্রদীপের কথা। আনন্দ দেখেছে, স্বপ্নার মধ্যে একটা অদ্ভুত সাবলীলতা আছে। সে খুবই অনায়াসে পরিবেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে। আনন্দর ভাবলে হাসিই পায়, সে-ও কেমন বশীভূত হয়ে পড়ছে স্বপ্নার সরল স্বাভাবিকতায়।

স্বপ্না তাকে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি তোমার বাবার উপর এত রাগ পুষে রেখেছ কেন, আনন্দ?

- তিনি আমার মায়েব মৃত্যুর জন্য দায়ি! আনন্দ বলেছে।

—তোমার মায়ের মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা। স্বপ্না খুবই সপ্রতিভ।

—বিনা চিকিৎসায় আমার মা মরে গিয়েছিলেন!

—সেই দায়িত্ব তুমি নিজেও কি এড়াতে পারো?

—আমি! চমকে উঠেছে আনন্দ।

—তোমার মায়ের একাকিত্ব তুমি সময়ে টের পাওনি!

—আমার তখন বয়েস কম। আমার কিছুই করবার ছিল না। আমি কলকাতায়ই পড়তে চেয়েছিলাম। কৃষ্ণরূপ আমাকে নিজের ইচ্ছায় হস্টেলে পাঠিয়েছিলেন। হয়তো তাতে তোমারও ইন্ধন ছিল।

-ছিঃ, আনন্দ! আমি কি এতটাই খারাপ।

—আমি জানি না।

—তুমি কিছুই জানো না! তোমার মা ইনসেনট্রিক হয়ে পড়েছিলেন। তোমার বাবার মতো মানুষকে অযথা সন্দেহ করতেন! তোমার বাবা চেষ্টা করেছিলেন!

—তুমি ওই লোকটাব সব জানো, না?

—তুমি এভাবে কথা বললে আমার কষ্ট হয়, আনন্দ! তোমাকে মানায় না!

—এসব নাটুকেপনা, ন্যাকামি ঘৃণা করি আমি। আই হেট অল দিস!

—আমি জানি, আনন্দ, তুমি চারপাশের সবকিছুকেই ঘৃণা করো। বাবাকে ঘৃণা করো, আমাকে ঘৃণা করো— হয়তো নিজেকেও ঘৃণা করো! এত ঘৃণা, এত রাগ নিয়ে বাঁচা যায় না, আনন্দ!

—আমি সত্যকে ঘৃণা করি না। তার মুখোমুখি হতে চাই!

—সত্য! বইয়ের কথা, আনন্দ! স্বপ্না ম্লান হাসে। তুমি তো সত্যকে জানতে গিয়েছিলে! সমাজকে সুন্দব করার জন্য হত্যাকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছিলে। শেষপর্যন্ত, দুজন জলজ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলার পর, তুমি জানলে, সেই সত্যের অনেকটাই ছিল মিথ্যা! আর, তা জেনে ফেলে, তুমি এখন পারবে তোমার সেই চরম ভুলগুলি সংশোধন করে নিতে? পারবে, আনন্দ, সেই মানুস দুটিকে ফের বাঁচিয়ে তুলতে? পারবে?

—আমি চেষ্টা করেছিলাম। আমি পালিয়ে যাইনি।

—তুমি, কৃষ্ণরূপ পালিয়ে এসেছ। সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ!

—ভুল। যদি বলি, আমরা নতুন সত্য খুঁজতে এসেছিলাম!

—আমি বলি, আসলে পালিয়েছিলে তুমিই! ব্যক্তিগত সত্য থেকে পালিয়ে, নিজেকে, নিজেদেব এড়াতে চেয়েছিলে!

—আমি তোমাদের মতো কুয়োর মধ্যে বাঁচতে চাইনি। একটা গভীর সামাজিক সত্যকে জানতে গিয়েছিলাম তাতে ঝুঁকি ছিল। যখন তখন মরে যেতে পারতাম আমি। ব্যর্থতা বড়ো কথা নয়, চেষ্টা তো করেছিলাম।

—সামাজিক সত্যের চেয়ে ব্যক্তির সত্য অনেক বেশি জটিল, আনন্দ। তা কেবল সাদা আর কালো দিয়ে ধরা যায় না। সেখানে কালো সাদার মাঝখানে থাকে আরও অনেক গভীর ধূসর স্তর। সে সব বাইরের চোখে দেখা যায় না। বোঝা যায় না সে সব রক্তপাতের তাৎপর্য।

—তুমি এখানে এসেছিলে কেন?

—তুমি আসলে কী জানতে চাও—তোমার বাবার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক—তাই তো?

আনন্দ মুখ নিচু করে কোনও কথা খুঁজে পায় না যেন। আর এইভাবে তাদের মাঝখানে জমে ওঠে অখণ্ড নীরবতা। স্বপ্না চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে আনন্দের দিকে। খাটে বসে আছে আনন্দ। তার খুব কাছে এসে দাঁড়ায় স্বপ্না। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে। তারপর আনন্দর রুক্ষ চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়। আনন্দ স্বপ্নার শরীর থেকে চন্দন, ফুল, ধূপধুনোর গন্ধ পায়।

—মানুষকে সন্দেহ করা খুব সহজ, আনন্দ। বিশ্বাস করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। সন্দেহ করো, দেখবে তা অহরহ বিদ্ধ করে। বিশ্বাসে শান্তি থাকে। তুমি একটু স্থির হও, আনন্দ। আর, তুমি কি ভেবেছিলে তুমি কি যে শেষ সত্য জেনে নেবে? তা হয় না। সত্যের খুব সামান্যই ছুঁতে পারি আমরা। আমরা তো খুবই সাধারণ।

- তুমি কি ইলেকট্রা?

আচমকা বলে ফেলে আনন্দ। চমকে ওঠে স্বপ্না। তারপর ম্লান হাসে।

- জানি না, আমি জানি না আনন্দ। তুমি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। আমায় ক্ষমা করো, তুমি, প্লিজ।

বলতে-না বলতেই দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে স্বপ্না।

আর, সে দিকে তাকিয়ে, নিজের ভিতরে এক ধরনের হাহাকার টের পায় আনন্দ।

চাঁদ ও স্বৈরিণী

কৃষ্ণরূপ সদরে গেছেন দুপুরের দিকে। সঙ্গে নাথানও। আশ্রমের কোনো কাজ, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, ইত্যাদির খুঁটিনাটি মিটিয়ে আজ আর ফিরবেন না তিনি। লাহিড়িবাবুর বাড়িতেই থেকে যাবেন। ফিরবেন একেবারে সকালের বাসে। সন্ধেবেলা মন্দিরের পাট চুকিয়ে ছেলেমেয়েরা চলে গেল, স্বপ্না অন্ধকার ঘরে শুয়ে ছিল। মাথাটা কেমন টিপটিপ করছে যেন নেশা। মনটা কেমন বিস্বাদ লাগছিল যেন। ধিক্কার দিচ্ছিল নিজেকে।

কোথায় ছিল তার এত কান্না! ছি ছি! সে তো এত ভঙ্গুর নয় কোনওদিন। আনন্দ ... ভাবল ... এত কথাই বা বলতে গিয়েছিল কেন সে আনন্দর সঙ্গে। আনন্দর মনে এক ধরনের তীব্র অভিমান আর আক্রোশ লক্ষ করেছিল স্বপ্না। কৃষ্ণরূপ তাঁর নিজের কথা, আনন্দর কথা, অলকার কথা খুব কমই বলেছেন তাকে। বস্তুত, তাদের মধ্যে কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা কতটুকুই বা হয়, কথা বলার অবকাশই হয় না, সারাদিন কেটে যায় উনকোটি কাজে। কৃষ্ণরূপের কাছে নানা মানুষজন আসে, কাউকে ওষুধবিষুধ দেওয়া, কারও জমিজমার বিবাদ নিষ্পত্তি করা, কারও মেয়ের বিয়ের পরামর্শ দেওয়া, কার ঘরে বাচ্চা হলে তার বিশেষ খোঁজ রাখা—এই ছোট্ট গ্রামটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তাঁর নখদর্পণে। স্বপ্নার কাছে মেয়ে বউরা আসে। সে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনে। মানুষের যে কত বিচিত্র রকমের সমস্যা, দুঃখ—তা তো আগে টের পায়নি স্বপ্না। তার কাছে সে সবের কোনও স্থির সমাধান নেই। সে শুধু শোনে। মানুষ নিজের কথা অন্যকে শুনিয়েও যেন কিছুটা ভরসা পায়। স্বপ্নার মাঝে মধ্যে মনে হয়, তার নিজের কি বলার মতো তেমন কোনও কথা নেই। কাকে সে বলতে পারে নিজের সে সব গভীরতর, একান্ত কথাগুলি।

কৃষ্ণরূপের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে তার। তাদের দুজনের চারপাশে রয়েছে একটা সামাজিক ঘেরাটোপ সম্পর্কের আড়াল। এভাবেই তারা কাটিয়ে দিল এতগুলি বছর। তবু চারপাশে ফিসফাস করেনি কি কেউ।

কথা উঠেছে আনাচেকানাচে। কিন্তু সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, ছড়ায়নি। দুজনের ব্যক্তিত্ব, আচরণ বশীভূত করেছে দুর্বলতর মানুষগুলিকে।

অথচ, স্বপ্না তো স্থির জানে, সেই কোন বয়স থেকে সে কৃষ্ণরূপের ব্যক্তিত্ব, বৈদগ্ধ্য আর নির্লিপ্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। প্রদীপকে সে যে অত সহজেই ছেড়ে আসতে পেরেছিল, তাতে কি কৃষ্ণরূপের প্রতি এক ধরনের অস্পষ্ট আকর্ষণ ইন্ধন জোগায়নি! মন ও পারিপার্শ্বিকের ভাঙাচোরা সময়ে কেন কেবল কৃষ্ণরূপের কথাই মনে হয়েছিল তার! সে নিশ্চিত ছিল, কৃষ্ণরূপ তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। নির্জনতার প্রতিও আকর্ষণ জন্মেছিল এখন স্বপ্নার।

খুব গোপনে সে যে শরীরের কথাও ভাবেনি, তা নয়। অস্বীকার করবে না স্বপ্না, একান্তে কৃষ্ণরূপের কথা ভেবে গভীরতর বাসনায় আক্রান্ত হয়েছে সে। গোপনে তার ফরসা, চওড়া, রোমশ বুকে মাথা রেখেছে। কল্পনায় কৃষ্ণরূপের কাছে সম্পূর্ণ উন্মোচিতা হয়েছে সে। তাতে লজ্জাবোধ করেনি সে বিন্দুমাত্র।

একদিনই স্বপ্নার অত কাছে এসেছিলেন কৃষ্ণরূপ। সেই জ্বরের ঘোরে তার মাথায়, গালে, গলায় তার স্পর্শ তীব্রভাবে অনুভব করেছিল সে। মনে হয়েছিল, কৃষ্ণরূপের ঝুঁকে পড়া মুখটা নামিয়ে আনে সে তার বুকের মধ্যে। সে চেয়েছিল, কৃষ্ণরূপ তাকে চুম্বন করুন। তাকে গ্রহণ করার জন্য স্বপ্নার অবদমিত শরীর, রোমকূপ যেন উন্মুখ হয়েছিল। অন্তরের জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছিল সে।

শয়নকক্ষের নির্জনতায়, নিজের পরিপূর্ণ নগ্নতার মুখোমুখি হয়ে, নিজের ভরাট স্তনদুটির উপর হাত রেখে, কৃষ্ণরূপের কথা ভেবেছে কখনও স্বপ্না। দীর্ঘ, ঋজু সেই শরীরটি দুলে উঠেছে চোখের সামনে। প্রদীপের কথাও মনে পড়েছে তার। স্বপ্না দেখেছে, গোটা শরীরের তুলনায় তার বুক দুটি আশ্চর্যরকম ফরসা। প্রদীপের একটা বিচিত্র স্বভাব ছিল। তার নগ্ন বুক দুটির সমগ্র সে তীব্র ঠোঁটে শোষণ করত। ব্যথা পেত সে। আকণ্ঠ চুম্বনে অসংখ্য গোল গোল প্রবালের মতো লাল দাগ ফুটে উঠত তার শঙ্খের মতো সাদা বুক দুটিতে। সেই রক্তিম দাগগুলি দেখতে ভালোবাসত প্রদীপ।

সে একদিন স্বপ্নে দেখেছিল তার নির্জন বুক দুটি থেকে অঝোরে ঝরছে বতের ঘন আঠার মতো সাদা, নিবিড় দুধ আর, কৃষ্ণরূপ শিশুর মতো আকণ্ঠ পান করছেন সেই ফল্গুধারা। ঘুমের মধ্যে কৃষ্ণরূপের ঠোঁট ও জিভের [illegible] ও স্পর্শ স্পষ্ট টের পেয়েছিল স্বপ্না। ঘুম ভেঙে গেলে টের পেয়েছিল, সম্পূর্ণ ভিজে গেছে সে।

সেরাতের পর কতদিন যে কৃষ্ণরূপের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি সে। কেমন মুহ্যমান লাগত নিজেকে। সাতদিনের জন্য চলে গিয়েছিল কলকাতায়, মায়ের কাছে। ভেবেছিল, আর ফিরবে না। ওই মানুষটা কি পাথর দিয়ে তৈরি! সমাজ আর লোকলজ্জা ছাড়া আর কিছু কি বোঝে না লোকটা! বড়ো অপমানিত মনে হত নিজেকে। সাতদিন বাড়ির বাইরে বের হয়নি। এক ধরনের আচ্ছন্নতা গ্রাস করেছিল তাকে। নিজেকেই কেমন যেন অচেনা মনে হত। আটদিনের দিন খুব ভোরে উঠে গুছিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। ফিরে এসেছিল। না এসে পারেনি। মনে হয়েছিল, শরীরের বাইরেও কিছু থেকে যায়। দেখা যায় না, তবু থাকে, থাকে গোপনেই।

এই যে আনন্দ এল, অত হিংস্রতা ওর বুকের মধ্যে, নিজেকেই চেনে না, অথচ কী ঘেন্না করে অন্যদের -- তাকে শান্ত করার জন্য সে কেন অত উদগ্রীব। স্বপ্নাকেও তো ঘৃণা করে সে। কিছুই তেমন জানে না তার সম্পর্কে, অথচ কত গুলি কল্পিত ধারণার উপর নির্ভর করে কেমন সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে! সন্দেহ, অবিশ্বাস পুষে রেখেছে নিজের মধ্যে।

কষ্ট হয়, আনন্দর কথা ভাবলে কষ্টটা তিরতির করে কাঁপে বুকের মধ্যে। অত যে অন্ধ রাগ ভিতরে, আঘাত করতে চায় প্রতিনিয়ত, অথচ সে দিন যখন তার চুলের ভিতর গভীর মায়ায় হাত ডুবিয়ে দিয়েছিল স্বপ্না তখন নিমেষে কেমন শান্ত হয়ে গিয়েছিল আনন্দ। সে তখন আর পারল না, এতদিনের জমানো কান্না হু হু করে বেরিয়ে এল সমস্ত পাথর ফাটিয়ে, একটুও রোধ করার চেষ্টা করল না, তখন যে আনন্দর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল বিষাদ, অসহায়তা—তা তো ভুল দেখেনি স্বপ্না! সে উঠে এসে তার পিঠে হাত রেখেছিল। তার সেই স্পর্শের অনুভূতিটুকু চিনতে চিনতে, ক্রমশ নিজের ভিতর ছড়াতে দিতে দিতে, স্বপ্না টের পেয়েছিল, আনন্দর ভিতরটা এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি। তার স্পর্শে এক ধরনের নিষ্পাপ আবেগ টের পেয়েছিল

স্বপ্না। তাই সে যখন বলেছিল কেঁদো না! এ সব কান্নাকাটিফাটি আমার একদম ভাল্লাগে না—তখন আরও, আরও কান্না উঠে আসছিল যেন তার ভিতর থেকে।

খুব ভয়ও করে আনন্দর জন্য। আনন্দর হাতে লেগে আছে রক্তের দাগ, মানুষ খুন করেছে সে—যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর, যখন বিশ্বাস না-করে উপায়ও থাকে না কোনও—তখন আনন্দর জন্য ভয় করে, ভয় করে খুব। যদি টের পেয়ে যায় সকলে, যদি ধরে নিয়ে যায় তাকে—তা হলে! আনন্দ কি আর কখনও স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারবে না। কী যে হয়ে যাচ্ছে চারপাশে, ভাবলে ভয়ে হিম হয়ে আসে বুক। অথচ, তার তো কিছুই করার নেই। সেই অসহায়তাই স্বপ্নাকে আরও গভীর বিষাদের দিকে নিয়ে যায়।

অথচ, কদিন আগেও তো তার কাছে আনন্দর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। কৃষ্ণরূপ সেভাবে রাজি ছিলেন না আনন্দকে আশ্রমে থাকতে দিতে। স্বপ্না বলেছিল, 'তা হয় না।' তিনি বলেছিলেন, 'পুলিশ একদিন জানতে পারবেই। তখনকার কথা ভাবতে পারো তুমি!' স্বপ্না বলেছিল, 'তবু আমরা ওকে আবারও বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারি না!' কৃষ্ণরূপ আর কিছু বলেননি। তবে তাঁর উদ্বেগটা স্বপ্না টের পায়। কদিন ধরেই নিশ্চিন্তে ধ্যান করতে পারছেন না তিনি, স্বপ্না লক্ষ করেছে।

সন্ধ্যা নামতে না নামতেই ঘোর অন্ধকারে ঢেকে যায় চারদিক। উন্মুক্ত মাঠের উপর উড়তে থাকে এলোমেলো হাওয়া। অন্ধকারে, দূরে জোনাকির মতো ফুটে থাকে ছড়ানো আলোর বিন্দু, লোকালয়। নৈঃশব্দ্য ভেঙে ভেসে আসে দূরের মন্দির বা আশ্রমগুলি থেকে নামগানের রেশ, কখনও শববাহকেরা হরিধ্বনি দিতে দিতে চলে যায় নদীর দিকে, শ্মশানে। আশ্রমের চারপাশের নির্জনতা থম মেরে থাকে। সারাদিনের ব্যস্ততা সন্ধ্যার আড়ালে কোথায় হারিয়ে যায়। স্বপ্নার বুকের উপর চেপে বসে সেই অখণ্ড নৈঃশব্দ্য, একাকিত্ব। কেমন পাগল পাগল লাগে ভিতরটা!

—কী হল, ভর সন্ধেবেলা অন্ধকারে ভূতের মতো শুয়ে আছ কেন?

চমকে বাস্তবে ফেরে স্বপ্না। মুখের উপর এসে পড়ে টর্চের তীব্র আলো। সে চোখে হাত চাপা দেয়। হুড়মুড়িয়ে উঠে বসে। আনন্দ তখনও টর্চটা জ্বালিয়ে রেখেছে। হাসছে।

—আহ্, কী হচ্ছে কী, চোখে লাগছে। স্বপ্না বলে।

—কী হবে, কিছুই না, ভূত তাড়াচ্ছি! আনন্দ হাসে।

—আলোটা নেভাও তো!

বলে অন্ধকারেই নিজেকে গুছিয়ে নেয় স্বপ্না। সে টের পায়, যেন এক ধরনের মৃদু খুশি ছড়িয়ে যাচ্ছে তার ভিতরে ভিতরে। যেন, তার স্বরূপ জানে না সে নিজেও।

আনন্দ আলোটা নেভায়। বিছানা থেকে নামতে নামতে স্বপ্না জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলে?

—ধুস্! কোথায় যাব! আনন্দ বলে। 'যাওয়ার কোনও জায়গা আছে নাকি এখানে! কী করে যে এই অন্ধকারে থাকো তোমরা!'

স্বপ্না আলো জ্বালায়। দপদপ করতে থাকে কেরোসিনের বাতিটা। কুঁজো থেকে জল নিয়ে খায়। ইচ্ছে হয় বলে, এতদিন কি আলোর কেন্দ্রেই ছিলে! বলে না। স্বপ্না পুরনো কথা তুলতে চায় না আর। অহেতুক জিজ্ঞেস করে, 'জল খাবে?'

—না। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দাও তো! তোমাদের কুয়োর জলে খুব খিদে পায়!

—বিকেলে রাখালের বউ মুড়ি দেয়নি তোমাকে, বলে দিয়েছিলাম যে! তোমাকে দেখতে পাইনি। মাথাটা খুব ধরেছিল, শুয়ে পড়েছিলাম!

—দিয়েছিল, আমি খাইনি।

—কেন, খাওনি কেন?

—ধুস! মুড়ি খেতে আমার ভালো লাগে না! কেমন সময় নষ্ট মনে হয়।

—এ আবার কী কথা! স্বপ্না হাসে। তা হলে কী খাবে, বলো!

—জানি না, যা আছে তা-ই দাও!

—আছে তো মুড়িই। ডিম ভেজে দেব?

—তুমি খাবে?

—না। তুমি খাও। সন্ধেবেলা কিছুই খাই না আমি। দুপুরে ভাত খেতেই যা বেলা হয়!

—সাধিকাদের খিদে-তৃষ্ণা এমনিতেই কম। অল বোগাস!

—কী?

—তোমাদের এইসব আশ্রমটাশ্রম—এইসব ভণ্ডামি।

—আবার ওই কথা! স্বপ্না চোখ পাকায়। বোসো তুমি, আসছি।

—ডিম ভাজতে হবে না। আনন্দ চেঁচিয়ে বলে।

চানাচুর, বাদাম, তেল, পেঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে বড়ো বাটিতে অনেকটা মুড়ি মেখে এনেছে স্বপ্না। বিছানার উপরই রাখল। আনন্দ বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল। বাটিটা রেখে, তা থেকে একমুঠো নিজে নিয়ে আনন্দকে বলল, 'খাও।'

আনন্দ খেতে খেতে বলে, সেই মুড়িই খাওয়ালে! অবশ্য রাখালের বউ এ ভাবে দিত না!

—এ ভাবেই দিত! কী আবার আহামরি দেখলে!

—তোমার হাতের ছোঁয়া আছে।

—আহা, মরে যাই! বাজে বোকো না, খাও।

আনন্দ কোনও কথা বলে না। চুপচাপ খায়। মাঝে-মধ্যে হাত বাড়িয়ে স্বপ্নাও একটু-আধটু নেয। একবার লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে চোখ বড়ো বড়ো করে ঠোঁট সরু করে সি-সি শব্দ করে আনন্দ। স্বপ্না খিলখিল করে হাসে।

একটু পরে চা করে নিয়ে আসে স্বপ্না। দুজনে মুখোমুখি বসে খায়। লণ্ঠনটা দপদপ করে কাঁপছিল। কৃষ্ণরূপ নেই বলে আজ গ্যাসের আলো জ্বালায়নি স্বপ্না। সে দিকে তাকিয়ে থেকেই আনন্দ জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মহারাজ আজ ফিরবেন না?

—না। আজ ব্যাঙ্কের কাজ হয়ে গেলে কাল সকালেই ফিরে আসবেন। নইলে দুপুরের বাসে।

—বেশ আছ তোমরা! আচ্ছা, তোমাদের চলে কী করে?

—ওই, চলে যায়!

—মহারাজ কি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে?

—পুরাণ-ইতিহাস নিয়ে কী-সব পড়াশোনা করছেন ইদানীং। আমি ঠিক জানি না।

—তুমি?

—আমি আবার কী করব! এইসব নিয়েই দিন কেটে যায়। সময়ই পাই না। ইচ্ছেও করে না।

—এক্সপ্লয়টেশন! তোমাকে সেবাদাসী করে রেখেছে লোকটা!

—ছিঃ, আনন্দ, ওইভাবে বলে না। কাউকে সম্মান করতে না পারো, অসম্মান করার অধিকারও নেই তোমার! মানুষটার কিছুই জানো না তুমি!

—জানতে চাইও না! তোমাকে হিপ্নোটাইজ করে রেখেছে। তুমি বোকা বুঝতে পারো না! নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছ! ভালগার!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তা-ই—হয়েছে? সবসময় ঝগড়া কোরো না তো! খুব বাজে স্বভাব তোমার!

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অন্যমনস্কতার মধ্যে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আনন্দ। স্বপ্না সেদিকে তাকিয়ে চোখ পাকায়, 'উঁহু, এখানে নয়, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ আনন্দ।'

—ধুস! এখন তো কেউ নেই—কে দেখছে। চা খেয়ে সিগারেট না খাওয়ার কোনও মানে হয়! সে আগুন জ্বালতে যায়।

—না! তুমি আমার কথা শুনবে না আনন্দ! এটা আশ্রমের নিয়ম।

—তোমাদের নিয়ম আমি মানব কেন! এ সব ফালতু নিয়ম মানতে বয়ে গেছে আমার। আমি কালই চলে যাব!

—এতকিছু ছেড়েছ, ওইটুকু ছাড়তে পারো না—আমার জন্য।

—তুমি আমার কে, যে তোমায় মান্য করব আমি।

–তুমি বড্ড ঝগড়া করো আনন্দ—একটু ভালো করে কথা বলতে পারো না?

—আমি কিছু বললে তুমি শুনবে?

– হ্যাঁ।

—হ্যাঁ—যা বলব?

—বললাম তো, হ্যাঁ!

—কী বলব, না জেনেই 'হ্যাঁ' বলছ?

—বলছি তো।

—চলো, একটু নদীর দিকে যাই। যাবে?

—চলো। বাইরে গিয়ে সিগারেট খাবে তো!

আনন্দ ধরা পড়ে-যাওয়া মুখে হাসে। হাসে স্বপ্নাও। বাটি, চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে যেতে যেতে স্বপ্না বলে, 'ঘর থেকে একটা চাদর বা সোয়েটার নিয়ে নাও, কনকনে ঠান্ডা নদীর পাড়ে।'

আজ, কতদিন পর নিজেকে কেমন নির্ভার মনে হল স্বপ্নার! একটা অজানা খুশি বাতাসের মতো বয়ে গেল নিজের মধ্যে, টের পেল স্বপ্না।

নদীর উপর হালকা কুয়াশা। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে আদিগন্ত জল আর তার স্তব্ধতা। বালির উপর জ্যোৎস্না পড়ে চকচক করছে চারপাশ। গেরুয়া জলের উপর ভেসে যাচ্ছে আধ খাওয়া চাঁদ। সে-দিকে তাকিয়ে স্বপ্নার মনে হল, তা হলে সত্যিই কি নষ্ট হয়ে গেল, ফুরিয়ে এল তার ভাবনাটা! বেঁচে থাকার কোনও খড়কুটোই কি অবশিষ্ট নেই তার!

সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে হালকা বাতাস বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে আনন্দ। আবছা আলোয় তার সিল্যুয়েটের মতো শরীরটা দেখতে দেখতে কৃষ্ণরূপের কথা মনে হল স্বপ্নার। চেহারায় অনেকটাই মিল আছে দুজনের। তার মনে হল, যেন আনন্দ নয়, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ কৃষ্ণরূপ, যেন প্রায় তার সমবয়সী হয়ে গিয়েছেন তিনি।

হঠাৎই এগিয়ে এল আনন্দ একেবারে তার মুখোমুখি। অন্যমনস্কতার মধ্যেই তার দিকে তাকাল স্বপ্না, অপলক। ধপধপে জ্যোৎস্নায় সে দেখল, আনন্দর চোখে অপার মুগ্ধতা, ঠোঁটের উপর লেগে আছে একটা আবছা হাসি। আর, তার সারা শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সাদা, অপার্থিব মায়াময় এক গভীর জ্যোৎস্না। সে দিকে তাকিয়ে তার কেমন গা ছমছম করে উঠল। গোপনে কেঁপে উঠল ঠোঁট দুটি। আর, তখনই, তার দিকে আরও এগিয়ে এল আনন্দ, অবিকল ঘাতকের মতো—ক দিন আগে যেভাবে এক শান্ত সকালবেলা, আশ্রমের গেট খুলে, এগিয়ে এসেছিল তার দিকে।

– স্বপ্না। যেন স্বপ্নেরই মধ্যে শুনল সে আনন্দর ডাক। আনন্দ, না কৃষ্ণরূপ। বুক কেঁপে উঠল স্বপ্নার।

—উঁ? যেন ঘোর থেকে সাড়া দিল স্বপ্না।

সে দেখল, যেন চাঁদ আরও ঝুঁকে এসেছে তাদের মাথার কাছে। গোপন চোখে তাকিয়ে দেখল স্বপ্না, আনন্দর পেটের কাছে এখনও উঁচু হয়ে রয়েছে সামান্য। জামার উপরেও বোঝা যায় লুকোনো অস্ত্রের আভাস। একটু আগে তার ঘরে আনন্দ যখন জামাটা সামান্য তুলে প্যান্টের পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজছিল, তখনই সে চকিতে লক্ষ করেছিল ওই কালো, অস্পষ্ট ধাতব। আর, তাতেই সে হুট করে আনন্দর সঙ্গে নদীর পাড়ে আসতে রাজি হয়ে যায়।

আনন্দ চকিতে স্বপ্নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর দুটি হাত রাখে। স্পষ্ট করে তাকায় তার দিকে।

—আনন্দ আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব—দেবে? স্বপ্না বলে।

—আমার কাছে! কী! আনন্দ সামান্য বিস্মিত যেন।

—তোমার লুকোনো অস্ত্রটা। খুবই ঠাণ্ডা শোনায় স্বপ্নার স্বর।

সে আচমকা আনন্দর জামার উপর হাত রাখে। চেপে ধরে অস্ত্রটা।

—কী বলছ কী! গুলি ভরা আছে। আনন্দ সতর্ক হয়। ছিটকে সরে যায়।

—দাও, আমাকে দাও! দেবে না!

—তুমি কী করবে। পাগলামি কোরো না, স্বপ্না।

—আমার দরকার!

—মানে!

—কোনও মানে নেই! তুমি আমার কথা শুনবে না, আনন্দ!

স্বপ্না একটু একটু করে এগোতে থাকে আনন্দর দিকে। আনন্দ পিছোতে থাকে নদীর দিকে। সে চকিতে রিভলভার বের করে আনে হাতে। হাত উঁচু করে বলে, 'আর এগিয়ো না স্বপ্না, প্লিজ, এটা হাতে এলে আমার ভিতরে কী সব হয়ে যায়। তোমার পায়ে পড়ি স্বপ্না!

আর্তনাদের মতো শোনায় আনন্দর গলা। শব্দগুলি ভেঙেচুরে, বিকৃত হয়ে ছড়িয়ে যায় বাতাসে। দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দ। তার পা নদীর জল ছোঁয়।

স্বপ্না এগিয়ে আসে। খুব শান্তভাবে অস্ত্রটা আনন্দর হাত থেকে নিয়ে হঠাৎই সজোরে ছুড়ে দেয় জলের দিকে, দূরে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আনন্দ। ঝুপ করে একটা শব্দ হয় জলে। গোল হয়ে ছড়িয়ে যায় জল। স্বপ্না স্পষ্ট দেখে।

—এ কী করলে তুমি! ভেঙে যায় আনন্দ।

—ঠিকই করেছি। সন্দেহ আর প্রতিহিংসা নিয়ে বাঁচা যায়না, আনন্দ।

—তোমার ভয় করছে না। এই নির্জন জ্যোৎস্নায় আমি যদি তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলি! যদি রেপ করি। দেহটা ফেলে দিই জলে! ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যাবে তোমার অহিংস দেহটা—টেরও পাবে না কেউ।

—তুমি যদি চাও, তা হলে তা-ই করো। আমি বাধা দেব না। তুমি তো আমায় বাধা দাওনি।

স্বপ্না আরও এগিয়ে আসে আনন্দর দিকে। একেবারে মুখোমুখি। দু জনের মাঝখানে নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর কিছু নেই। অন্য কিছু নেই।

—কই, মারো, মারো আমাকে। প্রতিহিংসা, ঘৃণা চরিতার্থ করো। আমি তোমার বাবার সাধনসঙ্গিনী, শয্যাসঙ্গিনী, ব্যভিচারণী। মারো আমাকে!

—আমার যে ওই অস্ত্রটা ছাড়া আর কিছু নেই স্বপ্না। ওই সামান্য অস্ত্রটার জোরেই আমি এতকাল বেঁচে ছিলাম। এবার আমি কী নিয়ে বাঁচব, স্বপ্না! কেন তুমি আমাকে এভাবে নিরস্ত্র করে দিলে!

স্বপ্না দেখে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ কৃষ্ণরূপ। আরও এক-পা এগিয়ে আচমকা দু হাতে আনন্দর ভাঙাচোরা মুখটা ধরে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরে নিজের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দুটি। উষ্ণ জিভটা ঢুকিয়ে দেয় আনন্দর মুখের ভিতর। আনন্দ, সামান্য হতচকিত, জড়িয়ে ধরে স্বপ্নার কোমর। নিজের ঠোঁট ছাড়িয়ে নিয়ে তার চোখে, মুখে, গালে, কপালে, গলায়, বুকের কাছে পাগলের মতো অঝোরে চুম্বন করে, করতেই থাকে। তারপর নিমেষে আঁচল সরিয়ে, তার ভরাট বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। ফিসফিস করে বলে, 'তুমি থাকবে, থাকবে আমার সঙ্গে, আমাকে ছেড়ে যাবে না, স্বপ্না!'

স্বপ্না টের পায়, আনন্দর চোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রুধারা চুঁইয়ে যাচ্ছে তার ব্লাউজের ভিতর দিয়ে বুকের একবারে গভীরে। সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আনন্দকে। যেন, নরম মাটিতে মুখ ডুবে যায় আনন্দর।

আর তখনই আধ-খাওয়া চাঁদটা নির্জনতা পেরিয়ে লাফ মারে জলের ভিতর। স্বপ্নার মনে হয়, জল পেরিয়ে ওই সোনালি চাঁদ এখনই উঠে আসবে তীরে। যেন, সব জানে সে। সে যেন এখনই তার আলুলায়িত চুলে মুঠি ধরে বলবে, স্বৈরিণী! স্বৈরিণী!

ভয়ে চোখ বুজে ফেলে স্বপ্না। □

সাদা রুমাল

স্বপন সেন

আকরা স্টেশনে নেমেই কেঁপে উঠল সমস্ত শরীরটা। ছেলে তিনটেও একটু দূরত্বে তার ওপর নজর রেখে ট্রেন থেকে নামল। কী এক চাপা অস্বস্তি শরীরকে ঘিরে দানা বাঁধতে লাগল। ট্রেনের মধ্যেই এই অস্বস্তির শুরু। তখন থেকে সে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কালীঘাট স্টেশনে ট্রেনে উঠতেই তিনটে ছেলে তাকে দেখে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল 'বিজন না?' কথাটা শুনেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে গিয়ে পড়েছিল সে। তারপর থেকেই এই অস্বস্তি। তাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাই এই অস্বস্তির কারণ। ছেলে তিনটের থেকে একটু দূরত্বে সরে গিয়ে একটা সিটে বসে এড়াতে চাইছিল তিনজোড়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। ট্রেনে ভিড় ছিল না। তাই ছেলে তিনটের চোখের আড়াল করতে পারেনি নিজেকে। সাধারণত সে এই অল্প সময়ের জার্নিতে সিটে বসে না। কামরার গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু ছেলে তিনটে গেটের কাছে ছিল, তাই ভেতর দিকে সরে এসে নিজেকে এই দৃষ্টির বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিল সে। অস্বস্তি কাটাবার এবং নিজেকে আড়াল করার অভিপ্রায়ে পাশের ভদ্রলোকের থেকে খবরের কাগজটা চেয়ে নিয়ে তাতে চোখ রাখতে চেষ্টা করছিল। উত্তেজনায় মনেই ছিল না তার নিজের কাঁধেই একটা ঝোলা ব্যাগ আর তাতে মনোযোগী হওয়ার মতো বেশ কয়েকটা বই আছে। কিন্তু সে কাগজেও মনোযোগী হতে পারছিল না। যে সন্দেহ আর উত্তেজনা ভেতরে ভেতরে দানা বাঁধছিল তা মুছে ফেলার তাগিদে সে আড়চোখে ছেলে তিনটের দিকে তাকায়। তিনজোড়া শ্যেন দৃষ্টি তার দিকে। সমস্ত রক্ত হিম হয়ে নেমে যায় পায়ের চেটোয়। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজে চোখ রাখে। কিন্তু কাগজের আড়াল ভেদ করেও সে যেন তিনজোড়া চোখ দেখতে পায়। থিরথির উত্তেজনায় কাগজের কালো অক্ষরগুলো লাল মিছিল হয়ে হাঁটতে থাকে। 'কৃষ্ণনগরে উগ্রপন্থী সঙ্ঘর্ষে দুজন নিহত।' বাঁ দিকেব হেডলাইনটা পড়েই চোখ সরিয়ে নেয় কাগজের ডান দিকে। 'ভবানীপুরে ট্রাফিক পুলিশ খুন।' চোখ সরে যায় নীচের দিকে। 'বসিরহাটে পুকুর পাড়ে পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার।' সমস্ত কাগজ থেকে লাল রক্ত ঝরে পড়ে। কোথাও চোখ রাখার জায়গা নেই। সে উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে।

চোখ খুলে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ছেলে তিনটে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। আগে যে জায়গায় তারা দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তার সিট ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না। তাই সে এই সিটে বসেছে। অথচ এখন ছেলেগুলো এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে তার সম্পূর্ণ অবয়ব মাপা যায়। তিনজোড়া চোখ সেইভাবে তার অবয়বকে মাপছিল। কাগজের ওপরে যে উত্তেজনা হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছিল, তাকে সে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না। একই কাগজে বিভিন্ন দিনের খবরের টুকরো অংশ ভেসে আসছিল। 'কলকাতায় সান্ধ্য-আইনজারি।' 'পশ্চিমবঙ্গে মিলিটারি নামানো হল।' 'যদুগড়ায় পুলিশের সঙ্গে নকশালপন্থীদের যুদ্ধ। বাস ধৃত।' কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। নিজের সন্দেহকে অতিক্রম করতে না পেরে আড়চোখে তাকায় ছেলেগুলোর দিকে। ছেলেগুলোর দৃষ্টি দেখে তার মনে হয় তারা নিশ্চিত যে সেই বিজন। তাদের দৃষ্টিতে সেই অভিব্যক্তি। যতবারই সে এই ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে ততবারই সে ছেলেগুলোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে। তারা দেখছে কি না। তাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটেছে কি না। আর এই দৃষ্টিতে সে স্বস্তি পায়নি। নিজেকে অসহায় মনে হয়েছে। সময়ের মধ্যেই বোধ হয় এই অস্বস্তির বীজ,

সন্দেহের বীজ দানা বেঁধে আছে। সে দু-একবার ভাবার চেষ্টা করল, না এলেই হত। এ সময় কোনও মানুষই নিজের পরিচিত গণ্ডির বাইরে বেরতে চায় না।

ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে ঘড়ির দোলকের মতো উত্তেজনাটা দুলতে থাকে। তার বাঁদিকে কামরার দেওয়ালের ওপব দিকে নজর পড়ে। লাল কালিতে লেখা ছোটো ছোটো পোস্টার। 'কৃষি বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।' 'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।' ভুল বানান চোখে পড়ে। চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্যত্র। ডানদিকে কামরার দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে দ্রুত হাতে লেখা বড়ো বড়ো হরফে 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন।' সে আবার চোখ বন্ধ করে। বসির বকরিদে নেমন্তন্ন করতে সে উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, যাব। কিন্তু এখন তার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেছে। স্টেশনে ট্রেন ঢোকাব সঙ্গে সঙ্গে যত ট্রেনের গতি কমতে থাকে একটা ভাবনা তার মনের মধ্যে দৃঢ় হতে থাকে, এই স্টেশনে নেমে যাবে। কিন্তু স্টেশনে ট্রেন থামলে সে কিছুতেই সিট ছেড়ে নড়তে পারে না। লক্ষ পড়ে স্টেশনের দেওয়ালে। আলকাতরা দিয়ে লেখা 'শ্রেণীশত্রু খতম করুন'। ....'খতম অভিযান চলছে'। কেউ যেন তাকে সিটের সঙ্গে আটকে রেখে দেয়। একটা ভয় শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে থাকে। সমস্ত জামাটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে ওঠে। শিশ্নোদেশটা শিরশির করে। প্যান্টের ওই জায়গাটা ভিজে ভিজে লাগে। অনুভবে বুঝতে পারে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না প্যান্টটা ঘামে ভিজেছে না গড়িয়ে গড়িয়ে পেচ্ছাপ পড়েছে। সমস্ত স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু সে তো বিজন নয়। কয়েকবার ভাবতে চেষ্টা করেছে। তবে এ অস্বস্তি কেন তার? সে নিজেকে যত দৃঢ় করতে চেষ্টা করে, এই ভাবনাকে, অস্বস্তিকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, ততই এই ভাবনার মধ্যে ডুবে যায়। কিন্তু বিজন কে? কোন পাটির ছেলে? সে কিছুই জানে না। এই ছেলেগুলোই বা কোন পার্টির? বিজনকে সে জানেই না। অথচ মনে হয় বিজনের পরিচয় জানা থাকলে সুবিধে হত। অন্তত এই ছেলেগুলোর পরিচয়।

না, সে কিছুই জানে না। সমস্ত চিন্তাই কেমন জট পাকিয়ে একটা বৃত্তকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। স্নায়ুগুলো স্থবির, নিশ্চল পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছে। সে তো চিরদিনই দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকতে চেয়েছে। তবু রাজনীতি সময়েব বুকে যে সন্ত্রাস, যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বাইরে সেও বোধ হয় বাঁচতে পারবে না। এখন তাব মনে হচ্ছে রাজনীতি করলে তার নিজের একটা পরিচয় থাকত। দু-একজনের নাম বলতে পারত এদের কাছে। কিন্তু এরা কোন পার্টির? সেটা না জানলে নাম বলেই বা কী লাভ? বিপক্ষ দলের কারও নাম হলে! আর কোনও বাঁচা থাকবে না। সে রাজনীতি করে না এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না এই রাজনীতির আবহাওয়ায়। তবে সে বুঝতে পারে বিজন এদের বিপক্ষ দলের ছেলে। এরা কি বিজনকে খুঁজছে! আর তার সঙ্গে বিজনের কোথাও মিল আছে। সেটা তার অবয়বে! এ কথা ভাবতেই সমস্ত রক্ত হিম হয়ে যায়। উত্তেজনায় শরীরটা থরথর করে বার দুই কেঁপে ওঠে। সমস্ত শরীরটা এমনভাবে ঘেমে ওঠে, দেখে মনে হয় সদ্য স্নান করে উঠেছে। এবার সত্যিই ফোঁটা ফোঁটা পেচ্ছাপ চুঁইয়ে পড়ে প্যান্টে। সে রুমাল বের করে মুখেব ওপর চেপে ধরে জোরে জোরে ঘষতে থাকে। কপালের বাঁদিকে কাটা দাগটার ওপর রুমাল দিয়ে ঘষে। বিজনের কপালেও কি এরকম কাটা দাগ আছে? জায়গাটা জ্বালা করতে থাকে। বিজনেব সমস্ত মিল মুখ থেকে তুলে ফেলতে চায় যেন। সে মনে মনে বিজনের সঙ্গে এই অবয়বগত মিলের জন্যে অদৃষ্টকে দোষারোপ করে। মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে এক অব্যক্ত গোঙানি। পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? এই প্রশ্নে সে নিজের সচেতনা ফিরে পেয়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখে। চারপাশের চোখেমুখেই যেন এক সন্দেহের ছায়া ধরা পড়ে তার চোখে। অনেকগুলো দৃষ্টি তার শরীরের ওপর। সে আরও অস্বস্তি বোধ করে।

আব একবার আড় চোখে তাকায় তিনজোড়া চোখের দিকে। কখনওই তাদের দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না। তিনজোড়া চোখ থেকে প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে পড়ে তার শরীরে। শ্রেণীশত্রুকে তারা শনাক্ত

করতে পেরেছে। তাদের চোখেমুখে সেই দৃঢ়তা। সে এই দৃষ্টির বাইরে যেতে চায়। ভদ্রলোকের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না। সিট ছেড়ে কামরার বিপরীত দিকের গেটে উঠে গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। মনে হয় এক্ষুনি পড়ে যাবে। দরজার হাতলটা দু হাতে শক্ত করে ধরে। শরতের জলসিক্ত বাতাস ট্রেনের দরজা দিয়ে তার চোখেমুখে এসে লাগে। হাওয়ার সংস্পর্শে তার অস্বস্তি কাটতে থাকে। সে ভাবতে চেষ্টা করে। রাজনীতির বাইরে থেকে তার বারবারই মনে হয়েছে দেশজুড়ে একটা পরিবর্তন আসছে। সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির ওপরে, মানুষ দেশ-কালের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় হবে অতীতের সমস্ত ইতিহাসের বুকে। পরিবর্তন সেও আশা করেছিল, তাই মাঝে মাঝে তার রাজনীতিহীন মধ্যবিত্ততাকে দোষারোপ করেছে। অথচ আজ যে রাজনীতির চেহারা প্রত্যক্ষ করছে তা শুধু পাঁক আর কাদা ঘেঁটে কতকগুলো সন্দেহের বুদ্‌বুদ বুকে নিয়ে আরও পাঁকের গভীরে ডুবে যাওয়া। এ কোন আদর্শবাদ? যেখানে দলগুলো মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে মানুষকেই নিয়ে যাচ্ছে আরও ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিতে। এ সব ভাবতে ভাবতে সে উন্মুক্ত আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তার বাঁ দিকে কামরার ভেতরে তাকাল। তিনটে ছেলেই সরে এসেছে অন্য দিকের দরজা থেকে তার বাঁ দিকের দরজায়। এবং তারই সমান্তরালে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ রাখছে। আবার সে নার্ভাস হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের স্বাভাবিকতা উবে যায় কর্পূরের মতো। সমস্ত স্নায়ু দ্রুত শিথিল হতে থাকে। নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। শক্ত করে দরজার হাতলটা আবার চেপে ধরে। জামাটা আবার ভিজে ওঠে এই হাওয়ার মধ্যে। এমনিতে সে খুব শক্ত মনের মানুষ। নিজেকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করে। দুর্বল হলে চলবে না, সে ভাবতে থাকে। আর সে লক্ষ করেছে, যখনই নিজে দৃঢ় হয় অন্য পক্ষেব মুখগুলো কেমন রক্তহীন হয়ে পড়ে। আগে ভেবেছিল অন্য কোনও স্টেশনে নেমে পড়বে। কিন্তু সেখানে নামলে যদি ছেলেগুলো ধরে তবে তার পরিচয় দেওয়ার বা বলার মতো কিছু থাকবে না। তাই সে স্থির করে আকরা স্টেশনেই নামবে। সেখানে নেমে সে অন্তত বসিরের নাম করতে পাববে। বলতে পারবে এখানে আসার উদ্দেশ্য। কিন্তু বসির কোন দলের? বসির কোনও দলের নয় তাই সে জানে। অথচ বসির যদি গোপনে কোনও পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকে? আর তা যদি এদের বিপক্ষ দল হয়? বসির কলেজে কোনও পার্টি করে না। তা হলে কি বসিবের পার্টির কোনও গণসংগঠন নেই? তাই বসির কলেজে পার্টি করে না? গোপন সংগঠনে যুক্ত? বসিবের ওপর রাগ হয়। কিন্তু সেও তা কলেজে কোনও পার্টি করে না। তা হলে কি অন্য মানুষ ধরে নেবে সেও কোনও গোপন সংগঠনে যুক্ত? অবশ্য যারা গোপন সংগঠনে যুক্ত, তারা বলে, তারা কোনও রাজনীতি কবে না। এ অবস্থায় সে যদি বলে সে রাজনীতি করে না তা হলেও তার রেহাই নেই। এ সব ভাবতে ভাবতেই তার মনে হয় এই ট্রেনটা যদি কোথাও না থামে, যদি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে, তবে সে বেঁচে যাবে। সে আজ মানুষের সঙ্গ খুঁজছে মানুষেরই হাত থেকে বাঁচার জন্যে।

আকরা স্টেশন আসছে। ট্রেনের গতি যত মন্থর হয় তার হৃদস্পন্দন তত দ্রুত হতে থাকে। এত দ্রুতমাত্রায় স্পন্দন অনুভূত হয় যে, মনে হচ্ছে যে কোনও সময় থেমে যাবে। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যায়। কিন্তু নেমে সে কোন পথে যাবে? সে পথ কোন দলের? তা যদি বিজনের বিপক্ষ দলের এক্তিয়ারে হয়? কিংবা বসিরের বাড়ি, যদি বিজনের দলের এক্তিয়ারে হয়? প্রতিটি এলাকাই কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক একটা দ্বীপের মতো। সে কোথায় যাবে? কোন পথে? তার যাওয়ার কোনও পথ নেই। কোনও জায়গা নেই। তবু আকরা স্টেশনে ট্রেন থামতে সে নিজেকে দৃঢ় করে নেমে পড়ে।

দুই

ওরা তিনজনও আকরা স্টেশনে নামল, একটু দূরত্ব থেকে নজর রেখে। কেননা তারা নিশ্চিত যে বিজনের ব্যাগে রিভলভার আছে। বিজন বিনা অস্ত্রে নিজের এলাকায় ঢুকছে. এ তারা বিশ্বাসই করে না। এ ছাড়া বিজনের ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে তিনজনেই ওয়াকিবহাল। আর বিজনের সাহস সম্পর্কে তাদের যে ভীতি ছিল

তা দৃঢ় হল। কেননা তারা ভেবেছিল, বিজন তাদের ট্রেনে দেখে আর এলাকায় ঢুকবে না। অন্য কোনও স্টেশনে নেমে যাবে। তাদের দলের কোনও পরিচিত সেন্টারে। এর পরের স্টেশন নুঙ্গি বিজনদের দলের এলাকা। তারা জানত বিজন তার মাকে দেখতে আসবে। বিজনের মা যে মরণাপন্ন এ খবর তাদের কাছে দিন পাঁচেক আগে পৌঁছতে, তারা নিশ্চিত ছিল যে বিজন এলাকায় ঢুকবে। তারা ওত পেতে ছিল। অথচ সুযোগ এত সহজে হাতে আসতেই তারা কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। কেননা বিজনের এত সাহসের পেছনে নিশ্চিত দুরভিসন্ধি আছে। নিশ্চয়ই বিজনের কাছে এমন কোনও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আছে বা অন্য কিছু, যার বলে বিজন এতটা সাহসী। ওর সঙ্গে অন্য কেউ নেই তো?

এই প্রশ্ন ট্রেনের মধ্যেই অতীনের মনে উঁকি দিতে সে জিজ্ঞেস করেছিল শ্যামলকে। না হলে বিজন কোন সাহসে ট্রেনের পথে আসে? স্টেশন এলাকা তাদের, এটা তো বিজনের অজানা নয়। বিজনদের দলের ছেলেরা বাস রাস্তা ব্যবহার করে। তবে বিজন বাসে না এসে ট্রেনে, স্টেশন পথে এলাকায় ঢুকছে কেন? এ সংশয় এখনও তাদের মন থেকে দূর হয়নি। স্টেশন এলাকা না ছাড়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের সমাধান হবে না। তাই তারা সন্তর্পণে চারদিকে নজর রাখে। আর ঘটনাটা এতটাই আকস্মিক, এতটাই চিন্তা বহির্ভূত যে, বিজন কালীঘাট স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে ট্রেনে লাফ দিয়ে উঠতেই, বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদের মতো শব্দ করে উঠেছিল অসিত, 'বিজন না?' ট্রেনের গতির সঙ্গে তাদের মনে আরও একটা সংশয় দানা বাঁধছিল, বিজন কি তাদের গতিবিধি জানে? তাই ঠিক এই কামরাতেই উঠল, আর তাদের দেখতে পেয়েও নামল না। অন্য কামরায় বিজনের দলের আরও ছেলে আছে।

এই প্রশ্ন তাদের মনে উঁকি দিতে তারা ট্রেনেই ঠিক করেছিল, বিজন যদি অন্য কোনও স্টেশনে নামে, তারা নামবে না। কেননা বিজনকে একা ভেবে তারা বিজনের কোনও চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়তে নারাজ ছিল। তারা জানত বিজনকে ছ মাস এলাকাছাড়া করার প্রতিশোধ সে নেবেই। তাই কি আজ বিজন ট্রেন পথেই এসেছে? এক ঢিলে দু পাখি মারার মতলব? নাকি বিজনের মা অসুস্থ এ কথা কৌশলে রটিয়ে দিয়েছে? আর সেই ফাঁদে তারাই কি পা রেখেছে? তারাও সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে। তবু তাদের একটাই ভরসা এটা তাদের এলাকা। এই এলাকার ওপর দিয়েই বিজনকে নিজের এলাকায় যেতে হবে। তাই তারা ভীত, সন্তর্পণে হলেও শিকার হাতছাড়া করতে নারাজ। কেননা বিজনের মতো সাহসী আর সংগঠক ছেলেকে এলাকায় থাকতে দেওয়ার অর্থ নিজেদের দলীয় সংগঠনকে শেষ করে দেওয়া। বিজন যখন এলাকায় ছিল তাদের দলীয় সংগঠনের অবস্থা খুবই নড়বড়ে ছিল। তারপর বিজনকে এলাকা ছাড়া করতে তাদের সংগঠন বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় বিজনকে এলাকায় ঢুকতে দিয়ে নিজেদের দলীয় সংগঠনকে বেহাল করে দিলে পার্টির ওপরতলায় তারা অযোগ্য প্রমাণিত হবে। আর কোনওদিনই তারা পার্টির মধ্যে ভালো অবস্থানে যেতে পারবে না। এতে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। দলীয় সংগঠন বাড়াতে পেরেছে এটা দেখিয়ে পার্টির ওপরতলা থেকে তারা যে সুযোগ পাচ্ছে তাও হাতছাড়া হবে। তা ছাড়া ওদের সংগঠন বাড়তে দেওয়ার অর্থ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া, মানুষের শান্তি বিপন্ন করে তোলা। যে সময় তাদের দল ক্ষমতা কায়েম করতে চলেছে, সে সময় মানুষের শান্তি বিপন্ন হলে তা তাদের দলেরই অক্ষমতা বলে ধরে নেবে মানুষ। আর সারা পৃথিবী জুড়ে যখন শান্তির কথা বলা হচ্ছে, তখন এদের সন্ত্রাস সৃষ্টিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাই যে করেই হোক বিজনকে সরাতেই হবে। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে ভয়, সংশয়, দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। বিশেষত তাদের দেখেও, বিজনের আকরা স্টেশনে দৃঢ় পদক্ষেপে নামা দেখে। এর আগে তারা ট্রেনের মধ্যে দেখেছে এক ভয়ার্ত ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখ। যদিও প্রথম দেখার পরই সে অনেকক্ষণ কাগজের আড়ালে নিজেকে গোপন রেখেছিল। এবং মাঝে মাঝে কাগজের ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাদের দিকে তাকানোতে, তারা যেন বিজনের কোনও অভিসন্ধির ইঙ্গিত পায়। আর তাদের মনে ভয় সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। তবু যে কোনও মূল্যেই হোক শ্রেণীশত্রুকে খতম করতেই হবে।

তিন

সে নিজেকে দৃঢ় করল। মনে মনে ভাবল সাহসীরাই জয়ী হয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কথাটা সে উচ্চারণ করল। পৃথিবী সাহসীদের উপভোগের জন্যেই। এই কথা ভেবে ট্রেনের মধ্যের সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে চেষ্টা করল। সমস্ত ভয় মন থেকে দূর করে দিতে বদ্ধপরিকর হল। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে গেছে যে এ সম্পর্কে সমস্ত অনুভূতিই লোপ পাচ্ছে তার। মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যেন সে পেয়ে গেছে। তাই এখন কীভাবে বাঁচা যায় সেই চেষ্টাতেই নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল। তাড়া করে কোণঠাসা করা পশু যেমন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিপক্ষের আক্রমণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেও তেমনিভাবে প্রস্তুত হতে লাগল।

সে প্রথমেই তার পরিকল্পনা স্থির করল। ভেবেছিল স্টেশনে নামা মানুষজনের মধ্যে মিশে অন্য রাস্তায় চলে যাবে। কিন্তু কোন রাস্তায় গেলে সে নিজেকে নিরাপদ করতে পারবে তা তার জানা নেই। তাই স্থির করল বসিরের বাড়ির দিকেই যাবে। এর আগেও সে বসিরের বাড়িতে এসেছে। কিন্তু তখন পরিস্থিতি এত জটিল ছিল না। তার ভয় বসিরের বাড়ির রাস্তায় একটা বিশাল নির্জন পুকুর পাড় ধরে হাঁটতে হয়। তারপর একটা ধুধু মাঠ। অনেকটা রাস্তা। কিন্তু অন্য রাস্তায় গেলেও যে এমন নির্জন জায়গা নেই তা সে জানে না। কেননা এখানে বসিরের বাড়ি ছাড়া আর কোনও জায়গা তার চেনা নেই। তা ছাড়া স্টেশনে যে অল্প দু চারজন মানুষ নামল তাদের মধ্যে মিশে তিনজনের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব নয়।

বেলা বারোটার সময় স্টেশন চত্বরটা কেমন থমথমে, ফাঁকা। চারদিকে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি যেন। সে একবার আড়চোখে তাকিয়ে তিনজোড়া পায়ের গতি বুঝে নিল। তারপর তার গতিপথ পরিবর্তন করে ডানদিকে স্টেশনের ওপরেই জলের ট্যাঙ্কের কাছে গেল। মুখে চোখে জল দিয়ে একটু সুস্থতা বোধ করল। আর কল থেকে নিচু হয়ে জল খাওয়ার সময় তিনজনকে দেখে নিল। তারা তিনজন বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। সে ভাবল তাদের মধ্যের এই দূরত্বকে কাজে লাগাতে হবে। জল খেয়ে ছেলেগুলোর দিকে আড়চোখে লক্ষ রেখেই রুমাল বার করার জন্য ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল আর সেই সঙ্গেই তার চোখে একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনটে ছেলেই নিজেদের ঘনত্ব থেকে দূরে ছিটকে পজিশন নিল। প্রথমটা ঘাবড়ে গেছিল সে। তারপর বুঝতে পারল তার ব্যাগকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখছে। ব্যাগে রাখল রুমালটা। ভাবল পেচ্ছাপ করে আসবে। কিন্তু সে যে দিকে যাবে তার বিপরীত দিকে পেচ্ছাপখানা। তা ছাড়া জায়গাটা নির্জন। তাই আর গেল না। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দ্রুত পায়ে স্টেশন অতিক্রম করতে লাগল। একবার পেছনে তাকিয়ে জরিপ করে নিল তাদের মধ্যের ব্যবধান। একবার ভাবল পরবর্তী ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাবে। দাঁড়িয়ে স্টেশনে টাঙানো সময় সংক্রান্ত বোর্ডটা দেখল। কিন্তু পরের শেয়ালদাগামী ট্রেন আসতে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি। এতক্ষণ প্রায় নির্জন স্টেশনে একা কাটানো নিরাপদ নয় ভেবে আবার হাঁটা শুরু করল। তারপর স্টেশন অতিক্রম করে বাঁক নিল ডানদিকে বসিরের বাড়ির উদ্দেশে। আর হাঁটতে হাঁটতে তার মনে যে সব প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল তার কোনও সমাধানের রাস্তাই তার আয়ত্তের মধ্যে নেই। তবু প্রশ্নগুলোই মাথায় ভিড় করছিল। বিজন কে? সে কি খেটে খাওয়া মানুষের শত্রু? সে কি মেহনতি শ্রেণীর শত্রু? অভিজাত শ্রেণী বা শাসক শ্রেণীর দালাল? পুলিশের গুপ্তচর? সে কি তা হলে শ্রেণীশত্রু? মেহনতি মানুষের বিপক্ষে? প্রতিবিপ্লবী? সমস্ত অনড় নিশ্চল সমাধানহীন মাথার মধ্যে জাগতে থাকে। আর এরা? এরা মেহনতি মানুষের পক্ষে? বিপ্লবের সহায়ক শক্তি?

নিজের অবস্থানকে সে বিজনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ের নির্জন জায়গাটায় এসে পড়ে। বুকটা শব্দে কেঁপে ওঠে। যে কোনও মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়বে। একবার পেছন ঘুরে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনজোড়া পা থেমে যায়। যে কোনও সময় আক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়বে পেছন থেকে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না তাদের হাতে কোনও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আছে কি না। যদি না থাকে তবে সে হয়তো বেঁচে যাবে। কেননা, পেছনের তিনজনের মুভমেন্টে বুঝতে পারে, এরা কাছে এসে আক্রমণ করবে না। বিজন

কি এদের থেকে সাহসে, বুদ্ধি-চাতুর্যে অনেক বেশি ক্ষিপ্র? সে দ্রুত হাঁটতে থাকে। সমস্ত শরীরটা ঘামে জবজবে হয়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্তে ভয় এবং সাহস, মৃত্যু এবং জীবন পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। পারদের মতো দ্রুত একদিক থেকে অন্যদিকে সঞ্চারিত হয়। সে ভাবে আমরা কি আমাদের শত্রু হয়ে থাকব? আমরা নিজেরা পরস্পরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বাঁচব?

পুকুর পার হয়ে সে ফাঁকা মাঠের ওপর এসে পড়ে। কয়েকটা নারকেল গাছ মাঠের মধ্যে ইতস্তত। তবে তার যাওয়ার পথে খুব কাছাকাছি কয়েকটা নারকেল গাছ। এই গাছগুলো পার হওয়ার মধ্যে তাকে যে করেই হোক বাঁচতে হবে। তাদের চমকে দিয়ে বোঝার আগেই মাঠটা দৌড়ে পার হয়ে যেতে হবে। হঠাৎ তার মনে একটা চিন্তা খেলে যায়। এদের হাতে নিশ্চিত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই। থাকলে এতক্ষণ তাকে পেছন থেকে অনেকবার আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছে, সে সুযোগ হাতছাড়া করত না। তাই সে যেতে যেতে দ্রুত তার পথ পরিবর্তন করে ডানদিকে দৌড়ে গিয়ে একটা নারকেল গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে চিৎকার করে, হ্যান্ডস আপ। আর ক্ষণিকের উত্তেজনায়, ভয়ে রুমাল সমেত মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে। নারকেল গাছের আড়াল থেকে সাদা রুমালটা রিভলভারের মতো ধরা থাকে। আর তিনটে রিভলভাব খুব কাছ থেকে একযোগে গর্জন করে ওঠে। এতক্ষণের প্রাণদায়ী সাদা রুমালটা লাল হয়ে হাত থেকে মাটিতে খসে পড়ে। নারকেল গাছের মাথা থেকে এক ঝাঁক শালিক গুলির শব্দে কিচ্ কিচ্ করে উড়ে যায়। □

চৌকিদার

অনিল ঘড়াই

ঝড়ের পরে ধরণীর যেমন মুখ হয় তেমন মুখ করে বসেছিল সনাতন। তার বয়স এখন পাঁচের ঘরে কিন্তু পেটা শরীরটা দেখে মনে হয় সে বুঝি চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। আগে সে লেঠেল দলের সর্দার ছিল এখন সাত নং অঞ্চলের চৌকিদার। গাঁয়ের লোকে তাকে ডাকে 'সনা চৌকিদার'। ফি-রাত তার উজগারা যায়, যার জন্য পেটটা তার কাছে একটা সমস্যা। রাত উজগারা শরীরের জন্য ভালো নয়, এ কথা সনাতন জানে। শুধু পেটের দায়ে, তার পেটটা যে বিগড়ে গিয়েছে এই ভেবে এখন তার দুঃখ হয়। ওই পেটের জন্য তার চুল পাকল অসময়ে, এখন দাড়িতে যেন কাশফুলের পাপড়ি ছড়ানো, মাথায় লম্বা চুলগুলোর মাঝে মাঝেই রুপোর কুঁচি। তার একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, কিন্তু সেই ঠাঁই আগলাবার কেউ নেই! সুষমা তার বউয়ের নাম। সে ছিল ভরাট গতরের, ভরা নদীর মতো মেয়েমানুষ। ফি-রাতে সনাতন ঘরের বাইরে থাকুক, এটা তার কাম্য ছিল না। একলা রাতে, ফাঁকা বিছানায় বউটার তাই মন ধরল না। সে ফাটা শিমুলতুলোর মতো পালিয়ে গেল পরপুরুষের হাত ধরে। যাওয়ার আগে বিশু নামের তিন বছরের একটি পুত্রসন্তান রেখে গেল। সেই বিশু এখন বিশ্বনাথ,—কলেজে পড়ে, গাঁয়ের দিকে তার ঝোঁক বরাবরের কম। মাঝে-মধ্যে শহর থেকে চিঠি আসে—সেই চিঠি হল সনাতনের আশ্রয়, বুক বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ঠেকুয়া। বিশু সাধারণ দশ-পাঁচটা ছেলের মতো নয়, সে গ্রামের ইস্কুল থেকে খুব উঁচু নাম্বার পেয়ে সরকারি কলেজে বিনা পয়সায় পড়ছে। তার স্মৃতিশক্তি নাকি বটের আঠা, মগজে যা ঢোকে তা আর সিলিপ কেটে বেরিয়ে আসে না। বুদ্ধিতে সে একটা চতুর চিয়ামাছ, হাজারটা ছেলের মধ্যে তাকে যে কেউ আলাদাভাবে চিনে নেবে। মোটামুটি সুখ বলতে যা বোঝায় তা সনাতনের ছিল। সুষমা পালিয়ে যাওয়ার পর সেই সুখের পুঁইডগাটি কেউ যেন ধারপাত্তিতে কেটে নেয়। সেই থমকে দাঁড়ানো সুখের ফ্যাকড়া হল বিশু, ডগাছেদন পুঁইগাছটার বাড়তি ট্যাক। সেই ট্যাকটি এখন বিচ্ছিন্ন হতে চায়—যার জন্য সনাতনের সুখ নেই।

থানার বড়োবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাকে, ধমকে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার নামে কমপ্লেন আছে, রাতে নাকি তুমি ঘুমাও?'

কথাটা শুনেই কানে আঙুল দিয়েছিল সনাতন, তার মনে হয়েছিল কেউ যেন গরম সরষের তেল জোর জবরদস্তি ঢেলে দিয়েছে কানে। এমন অপবাদ শোনার আগে তার যদি মরণ হত, তাতেও তার কোনও দুঃখ নেই। বড়োবাবুকে সে বোঝাতে পারেনি। তিনি কড়া ধাতের মানুষ, একবার যা মগজে ঢোকায় তা চট করে ঝেড়ে-মুছে স্বাভাবিক করতে পারে না। সনাতন তাই ঘাড় নিচু করে ছ্যাঁচা মন নিয়ে ফিরে এল। এমনিতে কদিন থেকে মনটা তার খারাপ। বিশুর চিঠি আসেনি তা প্রায় মাস তিনেক হল। ছেলেটা দুকলম লিখতেও আজকাল ভুলে যায়। গাঁয়ে আসতেও অরুচি। আর গাঁয়ে এলেও সে ঘর থেকে কোনওদিন বেরয় না, তার চাপা স্বভাবটা গুমোট মেঘের মতো। কিছুতেই বোঝা যায় না মতি-গতি। সনাতন কিছু শুধলে 'হ্যাঁ', 'হুঁ' দিয়ে সেরে দেয়। বাপ-বেটায় তেমন সুখের কোনও বাক্যালাপ হয় না, যে যার মতো মুখ ঝুঁকিয়ে বসে থাকে। তখন অভিমানে বাসী পাউরুটির মতো স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায় সনাতনের বুকটা। নিজস্ব কষ্টের কথা সে ছেলের কাছে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না। গুমরানো জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে সে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে যায়। বিশু তার অন্তর্গত নীল দুঃখটাকে কিছুতেই ছুঁতে পারে না। বাঁপ-বেটার মাঝে ব্যবধানের খালটা নীরবে স্রোতহীন বয়ে যায়।

হলধরবাবু পঞ্চায়েতের মাথা। ৭ নং অঞ্চলের তিনিই হলেন বন্দুকওয়ালা মানুষ। তার দোতলা কোঠা দালান,

আমবাগান আর শ' বিঘার কাছাকাছি জমিন। রোদ ওঠার আগে তার সাথে একবার দেখা করার দরকার। লাল চায়ে চুমুক দিয়ে চমকে উঠল সনাতন। অবিকল রক্তের মতো দেখাচ্ছিল চা'টা। রোজই খায় কিন্তু আজকের ভাবনাটা তাকে বড়ো অস্থির করে তোলে। দূরের দিকে তাকিয়ে কেমন উদাস হয়ে যায় সে। বিশুর মুখটা ঘাই দেয় মনের কোণে। ছেলেটাকে টানা তিনমাস দেখেনি সে। কেমন আছে, কোথায় আছে, সে খবরও সে এখন জানে না। তবে শুনেছে, বিশু এখন আর হোস্টেলে থাকে না। তার বন্ধু মাধব এসে খবর দিয়েছে, বিশু এখন হোস্টেল ছাড়া। তার পেছনে শহরের পুলিশ। বিশু নাকি উগ্র রাজনীতিতে মেতেছে।

মাধবের কথা একদম উড়িয়ে দিতে পারেনি সনাতন। বিশুকে সে কোনওদিন চিনতে পারেনি, ছেলেটার চাপা স্বভাব শুকনো বারুদঘরের মতো। যে কোনও সময়েই বিপদের আশঙ্কা।

পুরো চাটা খেতে পারল না সনাতন, গ্লাসটা ধুয়ে এনে হেঁশেলঘরে রেখে দিল। কদিন থেকেই মনটা বড়ো কু গাইছে। বউয়ের কথা সে কদাচিৎ ভাবে। কিন্তু ছেলে তার নয়নের মণি, কলিজার টুকরা। দিনরাত্রির চিন্তার খোরাক। তার জন্য মন চটালে সে মনকে পোষ মানানো বড়ো দায়। কাল রাতভর সে দু চোখের পাতা এক করেনি। প্রথম রাতে 'ডাক' দিয়ে সে ইচ্ছে করলেই শুতে পারত। কিন্তু শোয়নি। মাথাটা ভার হয়েছিল অনেকক্ষণ থেকে, আর বুকটাতেও চাপা অস্বস্তি বোধ হয়েছিল তার। লাঠিটা দুহাতে আঁকড়ে সে তলিয়ে গিয়েছিল গভীর চিন্তায়! সুষমা এখন যাত্রাদলের ড্যান্সার। একটা বাস কন্ডাক্টরের সাথে সে আবার নতুন সংসার পেতেছে। একদিন গোরুর হাটের সামনে দেখা হয়েছিল সুষমার সাথে। দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিল সনাতন। কিন্তু সুষমাই তাকে চিনতে পেরেও কথা বলল না! ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল। তার দুচোখের কোণে কালি পড়েছে, সুখের একফোঁটা চিহ্ন নেই সেই চোখে। তড়িৎ জলছবির মতো সুষমার মুখটা রাতের আঁধারে বিদ্যুৎ দাগের মতো মনের কোণে খেলে বেড়ায়। বিশু ভুল করেও তার মায়ের প্রসঙ্গ তোলে না। সুষমা তার কাছে বিষগাছ, শুকিয়ে যাওয়া নদী। বড়োজোর একটা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। তেতো সম্পর্কের ভাবর কাটলে মুখটাই বিস্বাদে ভরে যায়। একটা মানুষ কতগুলো দীর্ঘনিশ্বাসের জনক হতে পারে? সনাতনের ঘুম আসেনি, তরল আঁধারে দীর্ঘশ্বাস ঢেলে দিয়ে সে আবার লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এই লাঠিই তার শক্তি, এত বছরের সঙ্গী, কর্তব্যের জাদুদণ্ড। কেউ না জানুক, এই লাঠি জানে সে কোনওদিন কাজে ফাঁকি দেয়নি। ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে নেই। যারা ফাঁকি দেয় তাদের অনেককেই সে ফাঁকে পড়ে হাবুডুবু খেতে দেখেছে। জীবন তার কাছে তুলসীমঞ্চ, নাম-সংকীর্তনের সুরমূর্ছনা। সেখানে সনাতন গোবরজলের ছিটে, তার বেশি কিছু নয়। তার জীবনে যে সংযম আছে সেই সংযম দিয়ে সে সবাইকে বাঁধতে চায়। কানুখুড়ো আগে চোর ছিল, ফি-রাতে তার সাথে দেখা হত বটতলায়। ঘুরঘুট্টি আঁধারে দাঁড়িয়ে সে গায়ে-হাত-পায়ে চুপচুপিয়ে তেল মাখত। তার হাতে থাকত সিঁদকাঠি। চোখাচোখি হলে সে কেমন ফ্যাকাশে হেসে বলত, 'সনাদা, মনে কিছু করোনি। আমি চোর, তুমি চৌকিদার। দুজনের ধর্ম আলাদা আলাদা। তুমি যে পথে যাবে আমি সেই পথে যাবোনি। মাথায় মাথা ঠেকে গেলে দুজনের মাথাই আঁবের মতো ফুলবে। আঁধারে চোর, চৌকিদার সবহি যে সমান!

সেই ছ্যাচোড় কানুখুড়ো এখন হাটে আলু বেচে। তার সিঁদকাঠি এখন পুকুরের পাঁকের তলায়। সনাতনকে কানুখুড়ো এখন গুরু বলে মানে। দেখা হলে বিনয়ে গদ্গদ হেসে বলে, 'সনাদা গো, তুমি হলে পরশপাথর। আমি আগে জংধরা লোহা ছিলাম। তুমার ছোঁয়ায় এসে আমি এখন সোনা হয়েচি। তা ভগবান তুমার ভালো করুক, আমার এই কামনা।

লাঠিটা হাতে নিয়ে বাইরে আসে সনাতন। রাতজাগা শরীর ম্যাজম্যাজ করে, অলসতায় ডুবে থাকে দুচোখ। তবু, রোদের মধ্যে ধাঁধিয়ে যায় ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি, তাকাতেও কষ্ট হয়। রাতভর জেগে থাকলে শরীর একটু আরাম চায়। থিতু হতে চায় বিছানায়। কিন্তু সনাতনের হাতে সময় কম, তাকে যেতে হবে পঞ্চায়েত অফিসে—হলধরবাবুর নির্দেশ সে তো অবেহলা করতে পারে না! কাঁচা পথটা পেরিয়ে এসে সে বড়ো রাস্তার বাঁ ধারের পাকুড় তলাটায় থামে। ততক্ষণে ঘামে ভিজে গিয়েছে পুরো পিঠটা, কপাল ছাপিয়ে অনর্গল ধারা নামছে ঘামের। ক'দিন থেকে গরমে তিষ্টুতে পারছে না মানুষ, শুকিয়ে যাওয়া গাছের মতো মানুষের অবস্থা এখন শোচনীয়। বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে কৃষিজীবী মানুষ, বৃষ্টি না হলে

ধানমাঠে তাদের কোনও কেরামতি নেই! অথচ, এখন বৈশাখের শেষ, মাটি ফেটে চৌচির তবু, আকাশে কোনও দয়া-মায়ার চিহ্ন নেই।

সনাতন সড়ক পথে না গিয়ে সোজা কাঁচা পথটাতেই নেমে আসে প্রতিদিনের মতো, উদ্দেশ্য ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া যাবে। গাঁয়ের মাঝখানে মাধবদের বাড়ি, সেখানে গেলে বিশুটার একটা খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই দ্রুত হাঁটছিল সে। শরীরের অলসতা আর রাত্রি জাগরণের বিষস্পর্শটুকু ঝেড়ে ফেলে সে যেন একটা চাঙ্গা মানুষ। কিছুটা আসতেই দেখা হল বেণুবাবুর সাথে। শুকনো মুখে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, কোথায় চল্লে এমন হন্তদন্ত হয়ে?'

সনাতন থামল, মুখের ঘাম মুছে বলল, 'হলধরবাবু ডেকে পাঠিয়েছে, তাই যাচ্ছি দেখা করতে। তা বাবু, মনটা আমার ক'দিন থিকে ভালো নেই। ছেলেটার কথা ঘুরে ফিরে শুধু মনে আসে। কী যে করব কিছু বুঝে উঠতে পারছি না!'

—একবার যাও গিয়ে দেখা করে আসো।

'বেণুবাবুর কথায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সনাতন। শুকনো ঢোক গিলে বলল, 'যেতে তো মন চায় বাবু, কিন্তু যাওয়া মানে তো খরচের ঝামেলা। দুপিঠ বাসভাড়া এখন বিশ টাকা। খায়খরচ সব মিলিয়ে ত্রিশ টাকার ধাক্কা। তা, বাবু এত টাকা কোথায় পাব এই আক্রাগণ্ডার দিনে? তাই, ইচ্ছে থাকলেও চুপ করে আছি, দেখি চিঠি আসে কি না!'

বেণুবাবু সজ্জন মানুষ। সনাতনের দুঃখে তিনি নীরব থাকবেন কী করে? তাই অভয় দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়িও না। ভগবান আছেন, সব ঠিক করে দেবেন। তবে খুব যদি তোমার মন টানে তা হলে একবার ঘুরে আসো। টাকা যা লাগে আমি তোমাকে দেব।'

সনাতন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে বেণুবাবুর কথায়। এই মানুষটার কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অথচ, দুর্দিনে এই মানুষটার পাশে সে দাঁড়াতে পারেনি। হলধরবাবু তাকে দাঁড়াতে দেয়নি। নিঃসন্তান বেণুবাবুর জায়গা-জমিন যা আছে তাতে পেটের ভাতের জোগাড়টা তার হয়ে যায়। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটা তবু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তার ছিল কালো রঙের একটা ষাঁড়। দেশ এবং দশের হিতে সেই ষাঁড়টাকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন ভোলা মহেশ্বরের নামে উৎসর্গ করে। সেই কালো ষাঁড় এখন গ্রামের ত্রাস। সবার আতঙ্কের কারণ। সে ফসল নষ্ট করে, বউ-ঝিদের তাড়িয়ে নিয়ে একেবারে দম হালকা করে ছেড়ে দেয়। খানা-খন্দের উপর তার নজর পড়লে, সেখান থেকে তাকে কেউ বিরত করতে পারে না। ষাঁড়টা একটা মানুষের সমান বুদ্ধি রাখে। সে বেণুবাবুর কোনও অনিষ্ট করে না। তার যত রাগ গ্রামের অসৎ মানুষগুলোর উপর হলধরবাবুর বড়ো মেয়ে একবার কলেজে যাবে। ষাঁড়টা তার লাল ওড়না দেখে তাড়িয়ে নিয়ে গেল মাইলটাক পথ। মেয়েটা শেষে কাশফুল ঝোপের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। তার লাল ওড়না হাওয়ায় উড়ে একেবারে ধানখেতে। কালো ষাঁড়টা সেই ওড়নার পিছনে ছুটতে ছুটতে হাজির হল ধানখেতে। শ্যালো মাঠের সবাইকে সে হেনস্থা করে ছাড়ল, শুধু মানুষ নয়—তোলা জলের ফসলও নষ্ট হল তার পায়ের চাপে, সব একেবারে লন্ডভন্ড করে ক্ষিপ্র মেজাজে ষাঁড়টা হারিয়ে গেল বাঁধের পথে। ফসল নষ্ট হওয়াটা বড়ো কথা নয়। হলধরবাবুর আদুরি কন্যার ঠ্যাং ভেঙেছে, তার পায়ে এখন প্লাস্টার, দুবেলা গ্রামের ডাক্তার তাকে দেখে যায়। হলধরবাবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে আমচুর শুকনো। তাকে দেখলে হাজার শত্রুরও কষ্ট হয়। বেণুবাবু নির্দোষ। তবু বাবুর যত রাগ বেণুবাবুর উপর। একদিন দুপুরবেলায় হলধরবাবু বেণুবাবুকে মুখে যা-না আসে তাই বলে গালাগাল দিলেন। হুঁশিয়ার করে বললেন, 'তোমার ষাঁড়, তুমি সামলাবে। অমন মারকুটে ষাঁড় আমি বাপু জীবনে দেখিনি। ওকে তুমি বাগে আনো, না হলে গাঁয়ের শান্তি বিঘ্ন হচ্ছে। আমি পঞ্চায়েত, ঠুটো জগন্নাথ হয়ে এ সব অনাচার দেখতে পারি না?'

ঠাকুরের নামে দাগা দেওয়া ষাঁড়, তার বিচরণ সর্বত্র। তাকে বেঁধে রাখলে রশি ছিঁড়ে পালায়। তার জন্য খোঁয়াড়েও জায়গা নেই। খোঁয়াড়ের মালিক জিভ কেটে বলে, 'ব্যবসার জন্যি ধরম দিতে পারবনি। বাবার ষাঁড়, তারে এটকে রাখব—এমন ছাতি আমার কি হয়েছে কর্তা?'

হলধরবাবু দাঁতে দাঁতে ঘষে বলছেন, 'বাবার ষাঁড় তা আমি মানি। কিন্তু বাবার ষাঁড় বলেই দোষ করেও

পার পেয়ে যাবে—এমন তো হতে পারে না। দোষ করলে দোষীর যদি শাস্তি হয়, তা হলে ষাঁড়েরও শাস্তি হবে। এতো জানা কথা।'

অঞ্চল প্রধানের কথা শুনে চমকে উঠেছে গ্রামবাসী। ধর্মে আঘাত, এটা কেউ মানতে নারাজ। তাদের মধ্যে বোদ্ধা, সবজান্তা একজন বলল, 'হেঁদুরা গোরুকে মা ভগবতী জ্ঞানে—মানে, হেঁদুরের ঘরে মা ভগবতীর পূজা হয়। ওই খ্যাপা ষাঁড়কে তা হলে রোখা যাবে কী করে? যা বাড় বেড়েছে, ওর একমাত্র সাজা হল মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যুই পারে ওর গতিকে রোধ করে দিতে।' কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কার বুকের ছাতি আকাশের মতো চওড়া? সবাই কুতকুতে চোখে একে অন্যের দিকে তাকাল। তারপর, সবাই হেরে গিয়ে হলধরবাবুর মুখের দিকে চাতক চোখে তাকাল। তিনিই হলেন একমাত্র উদ্ধারকর্তা, বিপদহরণ প্রভু। মানুষের এই ধারণা নিছক অমূলক নয়। হলধরবাবুর দশটা হাল। একটা বন্দুক। গাঁয়ের উনিই তো একমাত্র বন্দুকওয়ালা মানুষ! বন্দুকের কাছে কালো ষাঁড় কিছু নয়, ঝড়ের মুখে বাঁশপাতা উড়ে যাওয়ার মতন। সবাই ছেঁকে ধরল তাকে। গলা বাড়িয়ে বলল, 'ষাঁড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে আপনার। অতএব, আপনার হাতেই ওর মৃত্যু হওয়া উচিত। তার উপর আপনার বন্দুক আছে, গুড়ুম করে একবার ট্রিগার টিপলেই কালো ষাঁড়ের খেল খতম।

বাহাদুরির কথা, তবু ভয়ে চুপসে গেলেন হলধরবাবু। গলায় তার থুতু আটকে গেল, চোখের ডিম কেঁপে উঠল মুহূর্তে। বন্দুক তার আছে, কিন্তু সেই বন্দুক দিয়ে তিনি গো-হত্যা করবেন? এটা ভাবাও এক ধরনের পাপ। আজকাল হিন্দুরা গো-মাংস খায়, গো-নিধন করে—তিনি কি সেই দলের হিন্দু! তোবা, তোবা! তার গাঁয়ে মানচিত্রের নদীর মতো পৈতে, নাম-জপ-তপ না করে তিনি শাক অন্নও মুখে তোলেন না, চৈতন্যদেবের মন্দিরে চাঁদা দেন বার্ষিক একশো এক টাকা। বৃষ্টি না হলে তার গোবর লেপা উঠোনে ভক্ত হরিদাসরা অষ্টপ্রহর খোলকরতাল বাজিয়ে বাবা তারকনাথের সুরে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গায়। এহেন পুরুষ, মহাপুরুষ তুল্য—তিনি করবেন গো হত্যা? অতএব, সভা পণ্ড। ডেকে আনা হল—সনাতন চৌকিদারকে। ধমক দিয়ে তার পিলে চমকে দিয়ে বলা হল, 'তুমি হলে গাঁয়ের চৌকিদার! মানে গাঁয়ের রক্ষক। এই যদি তোমার গাঁকে রক্ষা করার নমুনা হয়, তা হলে তোমার ওই সরকারি উর্দি খুলে ফেল। তুমি এগারো হাত কাপড়ে কাচা মেরে ঘুরে বেড়াও, তোমাকে মানাবেও ভালো!' ঠাট্টা নয়তো যেন শানানো চাকু। কথা শুনে দরদরিয়ে ঘেমে গিয়েছিল সনাতন। হলধরবাবু তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'ষাঁড়ের মাথা চাই। নাহলে তোমার মাথা আমি ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে দেব। কথাটা মনে রেখো। ভদ্রলোকদের কথা বাসী হলে মদ হয়ে যায়।

কথাটা মনে রেখেছিল সনাতন, কিন্তু কালো ষাঁড়টার উপর সেই থেকে তার বিশেষ একটা টান জন্ম নেয়। অমন তেজিয়াল ষাঁড় সে জীবনে দেখেনি। কালো ষাঁড়টা যখন বাঁধের উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে চলে যায় তখন বজ্রপাতের শব্দে চমকে ওঠে রাতের বাতাস। প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ঘন ঘন। সেই পাথর ফাটানো ডাকে অনেকেরই কলজে শুকিয়ে খসখসিয়া ডুমুর পাতার দশা হয়। তাকে যে রাত-বেরাতে সনাতন চোখে দেখেনি তা নয়। দেখা মাত্রই চোখ নামিয়ে সুড়সুড় করে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে ষাঁড়টা। তখন তার চোখে কোনও রাগ নেই, প্রতিহিংসার বুদ্‌বুদ নেই, একেবারে ঘাসে মুখ লাগিয়ে চরে বেড়ানো এঁড়ে বকনাগুলোর মতন। তাকে দেখে মায়া জন্মেছে সনাতনের, হাতের বল্লম হাতেই ধরা, হিংস্র হয়ে উঠে বল্লমটা তাক করে ছুড়ে দিতে পারেনি! হলধরবাবুর মেয়েটা কষ্ট পায়, এই গরমে তার প্লাস্টারের ভেতরে ছারপোকার চাষবাস, মেয়েটা দিনরাত শুধু ছারপোকার কামড়ে চেল্লায়। তার চেঁচানি শুনে সনাতনকে আবার ডেকে পাঠান হলধরবাবু! সর্বসমক্ষে বলেন, 'তুমি কেমন চৌকিদার যে একটা ষাঁড়কে ধরতে পারলে না? এমন যদি তোমার বাহাদুরি হয় তা হলে চোর ধরবে কী করে? চোর যে তোমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবে?'

সনাতন চিবিয়ে চিবিয়ে হাসে, 'চোর ধরা কি যার তার কাজ? তার জন্য পাস করা সব দারোগা আছে। আমি তো মামুলি একটা চৌকিদার। আমার কাজ গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ার করা। প্রহরে-প্রহরে ডাক দিয়ে তাদের জাগিয়ে দেওয়া।'

—মুখে বড় ভাষা ফুটেছে তোমার। হলধরবাবুর রাগটা আর চাপা তাকে না, সনাতনও জেদে টং টং।

বলল, 'এ সব কাজ আমার দ্বারা হবেনি। কালো ষাঁড় আমার কোনও ক্ষতি করেনি, তাকে আমি ভালি দিয়ে চোট মারতে পারবোনি। চৌকিদারি করি বলেই আমি ধবম খুইয়ে বসিনি।'

কালো ষাঁড়টাকে দিনেরবেলায় কেউ দেখতে পায় না। রাত হলেই তার যত দৌরাত্ম্য। সে ফসল যত খায়, তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে। সে একদিন পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে নেদে আসল। ফেরার সময় পঞ্চায়েতের সাইনবোর্ডটা গুঁতিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। হলধরবাবু, গোচনার গন্ধে নাক টিপে ধরে বললেন, 'এ অনাচার আর সহ্য হয় না।' সনাতনকে বলল, এ ক্ষুনি যাও, বেণুবাবুকে ডেকে আনো। ও শালা ভেবেছেটো কী? এবার কি ষাঁড় লেলিয়ে আমাদের ইলেকশনে হারাবে। ওটি হতে দিচ্ছি না, তার আগেই কিছু একটা ব্যবস্থা করব।'

বেণুবাবু ভিন্ন পার্টির লোক। হলধরবাবুর সাথে তার মতাদর্শ মেলে না। ষাঁড়ের ব্যাপারে তিনি উদাসীন। চেপে ধরলে বলেন, 'বাবার নামে ছেড়ে দিয়েছি বাবাই সামলাবে। আমাকে শুধু-মুধু বিরক্ত করে কী লাভ? আমি ছাপোষা মানুষ, ও সব ষাঁড়রাজনীতি বুঝিনে!'

—না বোঝে না, শালা ঘুঘু! মনে মনে জ্বলে ওঠেন হলধরবাবু। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সেই মনের কথা কখনও বাইরে প্রকাশ পায় না। চাপা অম্বলের মতো শুধু ঢেকুর ওঠে ঘন ঘন।

মাধবের সাথে দেখা হতেই সে বলল, 'কাকা, তোমার বিশের মতিগতি আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সে এবার পরীক্ষায় বসল না। আমি তাকে বাড়ি আসার কথা বলতেই সে রেগে গেল। বলল, গাঁয়ে গেলে আমার রক্ত ফোটে। ওখানকার জল-হাওয়ায় এত অন্যায়-অবিচার—যা চোখে দেখে চুপ করে থাকা কঠিন। আমার হট-টেম্পার, তাই ভাবছি, ছুটিতে আর গ্রামে যাব না। তা ছাড়া, পার্টির অনেক কাজ পেন্ডিং পড়ে আছে—সেগুলো কমপ্লিট না করে বাড়ি যাব কী করে? তোমাব কথা শুধাতেই, সে হাসল। বলল, বাবা তো ভালোই আছে। যতদিন হলধরবাবু থাকবে ততদিন বাবাও ভালো থাকবে। তার কথায় বড়ো রাগ গো। সে একটা খ্যাপা ষাঁড়েব মতন। আমি তো তাব চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পাবি না, ভয়ে মরি।

মাধবের কথা শুনে সনাতনের চোখ-মুখ যেন প্রচণ্ড খরদাহে ঝলসে গেল। বিষাদ বেদনায় ভরে গেল তার বুক। বুক থেকে তীব্র কাঁপুনিটা ছড়িয়ে পড়ল শরীরের সবখানে। ছেলেটা যে এমনভাবে পর হয়ে যাবে—এটা তার স্বপ্নের বাইরে ছিল। যে আশায় সে এতদিন বুক বেঁধে ছিল তা যেন ঝুরঝুরে বালির মতো খসে খসে পড়ছে নীরবে। মাধবের সহজ সরল মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা তার গুমরে উঠছে বিশুর জন্য। মাধব আর বিশু বলতে গেলে একদম পিঠাপিঠি। এক ইস্কুল থেকে পাস করে তারা শহরে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনের যে ভরাডুবি হবে—এটা অপ্রত্যাশিত।

মাধব সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'মন খারাপ কোরো না কাকা। তোমার বিশু রাজনীতি করলেও তার নীতি বড়ো পরিষ্কার। তার দ্বাবা কত ছেলের যে উপকার হয়েছে—সে তোমাকে কী বলব! সে এখন সকলেরই প্রিয়পাত্র। কলেজে তার কোনও শত্রু নেই।

ছেলে ভুলানো কথায় মন ভোলে না সনাতনের। খেয়ে না খেয়ে, হাজার কষ্ট স্বীকার করে ছেলেকে মানুষ করে তুলেছে রাজনীতি করার জন্য নয়। যার বাবার প্রতিটি রাত বিনিদ্র কাটে পেটের তাড়নায় তার এই বিলাসিতা-রোগ সাজে না। রাজনীতি গরিবের ঘোড়াবোগ, সনাতন এই জ্ঞানে এতদিন এড়িয়ে এসেছে গ্রাম্যরাজনীতিকে। দুবেলা যার পেটে ভাত জোটে না, সে করবে রাজনীতি? ভোটের সময় ভোট দিতেও তার অনীহা। ভোট দিয়ে তার কী হয়? সে আরও গরিব হয়ে যায়, তার খড়ের ঘরে খড় পচে সূর্যের আলো খেলা করে ঘরের ভেতর। বাবু বদল বা চেয়ার বদল তার কাছে এক ধরনের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। যে রাজনীতি দেশ ও দশের মঙ্গল চায় না সেই জঘন্য নীতির উপর থুতু ফেলে সনাতন।

থানার বড়োবাবু তাকে বলেছিল, চৌকিদারের চোখ হবে শকুনের, কান হবে কুত্তার। বুদ্ধিতে সে একটা শেয়ালের চেয়েও কম হবে না। যে হাতে তুমি লাঠি ধরো সে হাতে থাকবে অসুরের শক্তি। তা যদি না থাকে, তা হলে ছেড়ে দাও কাজ, আমি অন্য লোকের ব্যবস্থা করি।'

বড়োবাবুর কথায় ভীত চোখ তুলে তাকিয়েছিল সনাতন। তারপর, সে কিছুটা সাহসী গলায় বলেছিল,

'বাবু, আজ অব্দি আমার কাজের কোনও বদনাম নেই। এ থানায় প্রায় দশটা বড়োবাবু আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তারা প্রত্যেকেই আমার কাজে খুশি হয়ে বকশিশ দিয়েছে। কোনও বাবু আবার সার্টিপিট লিখে দিয়েছে, দেখতে চান তো কাল এনে দেখাব।'

—সার্টিফিকেট দেখার কোনও দরকার নেই। কাজে-কর্মে তুমি যদি এত হুঁশিয়ার তা হলে গ্রামের দেওয়ালগুলো কারা কালো করছে ধরে দাও না। বড়োবাবুর চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া, ওই কালো কালো শব্দগুলোর জন্য কত দিন থেকে তার নিদ্রা বিঘ্নিত। সনাতন প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে সে বুঝতে পারে। কে-বা কারা গ্রামের দেওয়ালগুলো ভরিয়ে দিয়েছে স্লোগানে। ইস্কুলের সাদা বিল্ডিংটায় মানুষের মাথাব ছাপ। রক্ত গরম করা বুলিতেই স্কুলের দেওয়াল এখন ভর্তি। জিপ নিয়ে সব দেখে গিয়েছে ওসি। হলধরবাবু কোঁচা দুলিয়ে বানান করে করে পড়েছে সব স্লোগান। সে দিনও সনাতন তাদের পিছনে। দেওয়ালের লিখন মানুষকে এমন পালটে দেয়, ভয়ে পাংশু করে দেয়—তা ওদের মুখের দিকে না তাকালে বোঝা যেত না। হলধরবাবুর ভীত-সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দারোগাবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'কালো ষাঁড়ের সাথে একটা উট্‌কো ঝামেলা এসে জুটল। জানেন মশাই, কাল আমার এক কলিগের পেটে ছুরি মেরেছে টাউনে। সে বেচারি বাজার করতে গিয়েছিল। একদম সকালবেলা, রাস্তায় গিজগিজ করছিল লোক। চৌরাস্তার মুখে হঠাৎ মোটর সাইকেল এসে থামল। সেখান থেকে নেমে এল দুজন। তাদের হাতে ভোজালি। নিঃশব্দে সেই ভোজালি চালিয়ে দিল পেটে। সে বেচারি ওখানেই শেষ হয়ে গেল। ভাবুন তো, কী জঘন্য কাণ্ডকারখানা! এইভাবে যদি পুলিশের গায়ে হাত পড়ে, তা হলে দেশ যে অরাজকতায় ভরে যাবে। জানেন মশাই, এ সব হল পলিটিক্যাল মার্ডার। যে দল করিয়েছে তাদের আমরা খুঁজছি, ধরতে পারলে পিটিয়ে একেবারে ছাতু করে দেব। তারপর দেওয়ালের লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় পেয়ে বলেছেন, 'এ লক্ষণ ভালো বুঝছি না। একদম সূচনাতেই দাবিয়ে দেওয়া উচিত। না হলে পরে এরাই আপনার ঘাড়ে চেপে বসবে। তা হলধরবাবু, দেওয়াল লিখনের ব্যাপারে কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?

—এ সব বেণুবাবুর কাজ। রাগে ফুঁসে উঠলেন হলধরবাবু, 'মানুষটা সুবিধার নয়। বড়ো প্যাঁচালো। পাঁকালমাছ দেখেছেন, ওর স্বভাব হল সেই পাঁকাল মাছের মতো। কাদায় থেকেও গায়ে কাদা লাগাবে না। ওর কথায় তো এখন গাঁয়ে দশ-পাঁচটা ছোকরা ওঠা-বসা করে।'

এরপর থানার গাড়ি সোজা চলে যায় বেণুবাবুব ঘরে। বেণুবাবুর অবর্তমানে তার বই-পত্তর, চিঠি, ডাইরি সবকিছু থানায় নিয়ে চলে যান দারোগাবাবু। তার স্ত্রী বাধা দিলেও কোনও ফল হয় না।

এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে হলধরবাবু একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন। তিনি তার দোনলা বন্দুক দিয়ে দুটো নিরীহ হনুমানের প্রাণ কেড়ে নিলেন। তাদের অপরাধ—তারা আমগাছের ডাল ভেঙেছে, জ্যৈষ্ঠমাসের ডাসা আমগুলো তারা যত না খেয়েছে, নষ্ট করেছে তারও বেশি। অতএব, চালাও গুলি! দুটো গুলিবিদ্ধ হনুমানের মৃতদেহ ঘিরে সেই নির্জন আমবাগানে তার সঙ্গীসাথিরা এ ডালে সে ডালে ঘোরাঘুরি করল পাগলের মতো। হলধরবাবু বন্দুক নিয়ে সদর্পে চলে যেতেই একদল হনুমান গাছ থেকে নেমে এল মাটিতে; নিহত, গুলিবিদ্ধ হনুমান দুটোকে ঘিরে তাদের শোকবিলাপ সাধারণ মানুষের চোখেও জল এনেছিল। তারা হলধরবাবুর এই নির্দয়তাকে ভালো চোখে দেখল না। সৎকারেব জন্য ডাকা হল সনাতল চৌকিদারকে, সর্ব অনুষ্ঠানে সে বিল্বপত্র কিংবা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। হনুমান দুটোর পায়ে গোরুর দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নীচের ভাগাড়টাতে ফেলে এল সনাতন। হলধরবাবু তাকে দুটো টাকা বকশিশ দিলেন চা খেতে। সেদিন চা খেতে গিয়ে চায়ের কাপে আবার রক্ত দেখল সনাতন।

বেণুবাবুকে থানা থেকে ছেড়ে দিয়েছে, তিনি বেকসুর। হলধরবাবুর পা এখন মাটিতে পড়ে না, প্লাস্টার কাটার পরে তার মেয়ে এখন দিব্যি হেঁটে-চলে ঘুরে বেড়ায়। এই আনন্দে তিনি মশগুল। কালো ষাঁড়ের আতঙ্ক এখন গ্রাম থেকে মেলায়নি। ষাঁড়টা রাতেব অন্ধকারে মিশে থাকে, তাণ্ডবপর্ব সমাপ্ত কবে গা ঢাকা দেয়। সনাতন তাকে কায়দা করেও ধরতে পারেনি। ফাঁসজাল ছিঁড়ে ষাঁড়টা পালিয়ে গেল নিপুণ চতুরতায়। তাকে কেউ আটকে রাখতে পারল না। আবার মিটিং বসল গাঁয়ে। হলধরবাবু সভাপতি। সেই মিটিংয়ে ঠিক

হল, ষাঁড়টাকে মারা হবে খুঁচিয়ে। যদি কোনও কারণে পশুটাকে ধরা যায় তা হলে শিক গরম করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে তার চোখে। না হলে বিষাক্ত বল্লম ছুড়ে ঘায়েল করা হবে তাকে।

মানুষের মগজের কাছে সামান্য একটা পশুর বাহাদুরি সাজে না। কালু সেখ, যার দেড়বিঘা উচ্চফলনশীল ধান তছনছ করেছিল ষাঁড়টা—তার ছুড়ে দেওয়া বল্লমটা একেবারে মাথায় গিয়ে লাগে ষাঁড়টার। প্রচণ্ড চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে মাটি নিল দুরন্ত স্বভাবের ষাঁড়টা। তার কাতরানি, গোঙানি শুনে রাতের আঁধারে ধুতির খুঁটে চোখ মুছে নেয় সনাতন। বাবুরা তার কোনও নিষেধই শুনল না।

মাধব বলেছিল ষাঁড়টার স্বভাব অবিকল বিশুর মতন। দিনের বেলায় যার কাছে গেলে সমালোচনার ঝড় ওঠে, রাতের অন্ধকারে চুপিসাড়ে, তার কাছে যেতে কোনও বাধা নেই। হলধরবাবু দুবেলা সেই মৃতপ্রায় ষাঁড়টাকে দেখে যান এবং বেণুবাবুর পিন্ডি চটকে ছাড়েন! দাগা দেওয়া ষাঁড় মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এমন খবর বেণুবাবুর কানেও পৌঁছেছে। তিনি নিরুপায়, হাত-পা বাঁধা। ব্লকের ভেটেনারি সার্জেনের কাছে তিনি হাতজোড় করে বলেছিলেন, ডাক্তারবাবু, 'ষাঁড়টাকে আপনি বাঁচান। একটা নিরীহ জীব এভাবে চোখের সামনে মারা যাবে—এটা চোখে দেখাও পাপ। যা টাকা লাগে আমি দেব, আপনি শুধু চিকিৎসার দায়িত্ব নিন।'

ভেটেনারি সার্জেনের মন গলেছিল বেণুবাবুর কথায়। তিনি ওষুধ, ইন্‌জেকশন সব ব্যাগে করে নিয়ে যথাসময়ে এলেন। কিন্তু তাকে চিকিৎসা করার সুযোগ দেওয়া হল না। হলধরবাবু পথ আগলে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আপনার দরদ দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু ষাঁড়টার কাছে আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। পুরো গ্রামের স্বার্থ যেখানে জড়িয়ে, সেখানে আপনার জোর খাটানো উচিত নয়। আপনি ফিরে যান।

ভেটেনারি সার্জেন ফিরে গেলেন, ষাঁড়টা মৃত্যুর সাথে লড়ছিল। সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার সুঁচালো শিং দুটো ভেঙে দিয়েছে কালু সেখ। মাথার ঘাটার আয়তন বাড়ছে দিন দিন। সাতদিনেই তার তাজা শরীরটা রোদে ফেলে রাখা লাউডগা। হাড়গুলো জেগে উঠেছে চামড়া ভেদ করে। গোবরে জড়াজড়ি শরীরটার দিকে এখন আর কেউ ঘেন্নায় তাকায় না। চামএঁটুলি আর ডাঁশমাছিতে ছেয়ে ফেলেছে তার পুরো দেহ। চোখে একগাদা পিচুটি নিয়ে ষাঁড়টা পঞ্চায়েত অফিসের পেছনে লালা ঝরায়, মৃত্যুর প্রহর গোনে।

বেণুবাবু একদিন রাতের অন্ধকাবে সনাতনের ঘরে এলেন। তার এক মুখ দাড়ি, চোয়াল বসা মুখটায় দুশ্চিন্তার বাদলছায়া। সনাতন খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে গাঁ-চৌকির জন্য বেরচ্ছিল। বেণুবাবুকে দেখে সে সভয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বাবু, এত রাতে?'

বেণুবাবু তার উদ্‌ভ্রান্ত চোখ তুলে তাকাল। কীভাবে প্রস্তাবটা দেবেন, এই ভাবনায় উতলা হচ্ছিল মনটা। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, বড়ো বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি সনাতন। আমি জানি, একমাত্র তুমিই পারো আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।'

সঙ্কোচজনিত জড়তায় ইতস্তত করে উঠল সনাতন। সভয়ে শুধাল, 'বলুন বাবু, আমি কী করতে পারি!'

বেণুবাবু আরও ঘনিষ্ঠভাবে সরে আসলেন সনাতনের পাশে। চাপা গলায় বললেন, 'তোমার বউদি আজ কঁদিন থেকে দাঁতে জলও কাটেনি। দাগা দেওয়া ষাঁড়টার জন্য সে দিন-রাত্রি কাঁদছে। বলছে, সন্তান না খেলে মা কি কোনওদিন খেতে পারে গো? তাই তোমার কাছে এসেছিলাম এই খোলগুঁড়ো আর ফ্যানজলটা তুমি যদি একটু কষ্ট করে পৌঁছে দিতে। আমি খবর পেয়েছি, ষাঁড়টা আজ নিয়ে সাতদিন হল কিছু খায়নি। সমানে নাকি তাব চোখ দিয়ে জল ঝরছে! আমাদের ছেলে-পুলে নেই, ওই ষাঁড়টাই আমাদের সন্তানের মতো! এখন তোমার বউদি দুয়ারে বসে মাথার চুল ছেঁড়ে আর কাঁদে। বলে, দামড়াটাকে বলদ না করিয়ে ষাঁড় করিয়েই ভুল করেছি। এ ভুলের কোনও ক্ষমা নেই গো! বেণুবাবু কথা শেষ করে চোখের কোণটা মুছে নিলেন। ধরা গলায় বললেন, 'ও আমাদের সন্তানতুল্য. ওর কষ্ট আমিও সহ্য করতে পারছি না। চোখের আড়ালে গিয়ে যদি মরত তা হলে আমাদের এত কষ্ট থাকত না। জীব মাত্রই তো মরণ আছে, তা আমরা খুব সহজভাবে মেনে নিতাম।'

অনেকক্ষণ দম ধরে থেকে সনাতন তীক্ষ্ণ চোখে বেণুবাবুর মুখের দিকে তাকাল, 'বাবু, গরিবের একটা পরামর্শ আছে, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—'

বেণুবাবুর সম্মতি পেয়ে সনাতন বলল, 'কালো ষাঁড়টাকে রাতের আঁধারে আম গাঁ ছাড়া করে দিয়ে আসি। এখান থেকে দুক্রোশ দূরে আমার কুটুম-ঘর। সেখানে ওকে রেখে এলে চিকিৎসার কোনও কমি হবে না। আমার মামু সেখানকার কবিরেজ। তার চিকিৎসায় ষাঁড়টা বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

রাত এক প্রহর শেষ হয়েছে তবু জ্যোৎস্না ফোটেনি পথে। কালো ষাঁড়ের গলায় পাকানো রশা। সনাতন পুত্রস্নেহে ডাকছিল, 'আয় বাপ, আর একটু আয়। এই তো এসে গেলাম। হ্যাঁ দেখ, ওই টেঁরেব তেঁতুল গাছটা, তারপর থানা—তারপর, এট্টা মাঠ পেরলেই আমার কুটুম-ঘর রে! বাপরে, আর এট্টু, আর এট্টু জোরে হাঁট্।

ষাঁড়টার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না, হাঁটু মুড়ে পড়ে যাচ্ছিল যেখানে সেখানে। ফ্যানজল আর খোলগুঁড়ায় শরীরে তার তাগত ফেরেনি। ঘা মাথাটায় চিনচিনে একটা ব্যথা হয়। মুখ নামালেই রস চুযায়। তাজা রক্তের ধারাটা গড়িয়ে নামে কান বরাবর। এখন দুকানে শব্দ তুলে কিছুটা আরাম পায় সে। রাত বলেই মাছির উৎপাত নেই, শুধু জোলো মশাগুলো মাথাব উপর পাতলা ডানার স্পর্শ দিয়ে ওড়ে। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সনাতন বলে, 'ব্যাটা আমার, একটু জোরে পা চালা। আলো ফুটলে সবাই আমার ছাল ছাড়িয়ে হাতে দেবে। তুই কি চাস বাপ, আমি তোর জন্যি মুখে কালি মেখে ঘুরে বেড়াই।

ষাঁড়টা থলথলে পা ফেলে জোরে জোরে হাঁটছিল। বাঁচার নেশায় সে-ও যেন মরিয়া। সনাতন হাঁটছিল পিচ সড়কের নামলা জমি দিয়ে। পিচ রাস্তায় চেনাজানা লোকের সাথে দেখা হয়ে গেলে বিপদ। কার মনে কী আছে বলা তো যায় না! পাঁচমিশেলি জঙ্গল সড়কেব দু ধারে। নামলা ভুঁইয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পথের লোকজন দেখা যায় না। শুধু জোনাক পোকার মিটির মিটির আলোগুলো ছাড়া পৃথিবীতে যেন কোনও আলো নেই। শব্দহীন পৃথিবীতে শুধু দুটো প্রাণের স্পন্দন। কালো ষাঁড়টা ছুটতে গিয়ে বুনো লতায় পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে। সনাতন মুখ দিয়ে দুঃখজনক শব্দ করে বসে পড়েছে তার পাশে। গলচর্মে আদরের হাত বুলিযে সে বলল, 'উঠ্ বাপ, আর দেরি করা ঠিক নয়।'—সামনে ভাগাড়, তার বিশ হাত দূরে ষাঁড়টাকে শুযে পড়তে দেখে সে ভয় পাওয়া চোখে সড়কের ধাবের নিমগাছটাব দিকে তাকাল।

হেডলাইটের তীব্র আলো ফেলে এগিযে আসছিল একটা জিপ। তার যান্ত্রিক শব্দে রাতেব নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান। শকুনগুলোও অত রাতে নিমডাল ছেড়ে ঝুপঝুপ করে নেমে পড়ল মাটিতে। আকাশে তখন মহিষবর্ণ মেঘের যাতায়াত। পোক্‌রা তারাও দেখা যায় না। সনাতন মাটি লেপটে শুয়ে পড়ে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকল জিপ গাড়িটার দিকে। থানার গাড়িটাকে তার চিনতে কোনও ভুল হল না। জিপটা নিমতলায় ব্রেক কষে দাঁড়াল। খুব ব্যস্ত পায়ে নেমে এল চার পাঁচজন সেপাই। তারা শকুনগুলোকে দেখে ভয় পেয়ে শুধাল, 'বডিটা কি এখানেই ফেলব?'

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করো।

রিভলভার হাতে যুদ্ধকালীন মেজাজে দাঁড়িয়েছিলেন থানার ও সি। চারজন সেপাই একটা লাশকে তোল্লা করে নামিয়ে আনল নীচে। দুজন হাত ধরেছে, দুজন পা। তখনও টুপটুপিয়ে তাজা রক্ত ঝরছিল ঘাসে। ও সি একটা সিগারেট ধরিয়ে খিস্তি দিয়ে বললেন, শালা, দেওয়াল লিখবি, সংগ্রাম করবি—নে, এবার ভাগাড়ে পচ!' সেপাই চারটে পিচ সড়ক থেকে তোল্লা করে নামলা জমিতে ছুড়ে ফেলে দিল লাশটা। তারপর, চোখেব পলকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল থানায়।

সনাতন দেশলাই জ্বেলে দেখল বিশুর গুলিবিদ্ধ নীরব স্পন্দনহীন শরীরটা মাত্র হাত চারেক দূরে পড়ে আছে অবহেলায়। তোল্লা করে ছুড়ে দেওয়াতে নাক মুখ দিয়ে গলগলিয়ে নেমে আসছিল রক্তধারা! তাতে ভিজে যাচ্ছিল ঘাসমাটি। রক্তগন্ধে উন্মনা, পাগলপ্রায় সনাতন বিশুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিমেষে। তারপর মৃত পুত্রকে আঁকড়ে বিলাপ লহরীতে লহরীতে অস্থির করে তুলল রাতের বাতাস। সর্বস্ব হারিয়ে যাওয়ার বেদনায় ডুকরে কেঁদে উঠল সনাতন, 'বিশুরে, বাপ আমার একব্বার তুই কথা বল!'

দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভোর নেমে এল। আর শকুনগুলো নিমডাল কাঁপিয়ে উড়ে এল ভাগাড়ে। তাদের চোখে-মুখে এমনকী ধারালো ঠোঁটে ক্ষুধার আবেদন। দুখানা মৃতদেহের মাঝখানে লাঠি হাতে টানটান শরীরে দাঁড়িয়ে থাকল সনাতন। কাক-শকুনের সাথে লড়তে তার আজ এক ফোঁটাও ভয় নেই। সে নিজে মরবে কিন্তু দখল দেবে না লাশের। □

অ্যাকশন

মৃণাল চক্রবর্তী

প্রশাসন একটু মনোযোগী হলে যখন-তখন রাজনৈতিক পালাবদল না হলে এতদিনে নেহাত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষীতেই তিনবার ফাঁসি হয়ে যেত বিল্টুর। কিন্তু হয়নি—কারণ কোনও অজানা কারণে শান্তিরক্ষকেরা একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যেত, প্রত্যক্ষদর্শীদের বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যেত। সেই অজানা কারণ—অর্থাৎ মন্ত্রী এবং আমলাদের সঙ্গে বিল্টুর যোগসূত্র খুঁজে বের করা যায়নি। কবা হয়নি বলাই ঠিক হবে।

উনিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম প্রশাসনিক ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে বিল্টুকে—সে চিন্তায় আছে।

বিরুদ্ধদলের গুন্ডাদের আক্রমণ নিয়ে চিন্তা করে না বিল্টু—পাত্তাই দেয় না। বহু অতীতের কথা বাদ দিলেও এই গত দু-মাসেই তার মারাত্মক আকৃতির কালো বুলেটে চড়ে যেতে যেতে সে তিনবার গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেছে। দুবার পঞ্চাননতলায়, একবার গাঙ্গুলিবাগানে। এ সবই ল্যাংড়া বিশুর কাজ—তার পার্টির কাজ—বিল্টু জানত। যারা গুলি ছুড়েছিল তাদের মধ্যে দুজনকে ধরা হয় এবং ট্রেন আসার ঠিক আগেই লাইনে ফেলে দেওয়া হয়। অন্যজন বেপাত্তা। বিল্টুর দলের ছেলেরা ('পার্টি'র নয়, পার্টি ওদের স্বীকার করে না) অন্য দুজনকেও খুঁজছে—পেয়ে যাবে।

ল্যাংড়া বিশুকে সে নিজেই দুবার চপার চালিয়েছিল। একবার তার পেটটা ফালা ফালা করে দিয়েছিল। কিন্তু দিন পনেরো পরেই তাকে মদনের দোকানে চা খেতে দেখে চমকে উঠেছিল বিল্টু—ভূত নাকি? সে ভয় পেয়েছিল।

হ্যাঁ, ভূতকে ভয় পেতে হয়—মানুষকে নয়। বহু দিন ধরে ছুরি, রিভলভার, পেটো চালাতে অভ্যস্ত বিল্টু জানে যে যারা তাকে খুন করতে চায়, তারা আসলে অন্যদের—কোনও দলের জন্য কাজ করে। তাদের বোঝা যায়, খুঁজে বের করা যায়, ভেবে দেখা যায় তাদের খুঁটি কত শক্ত—তারপর তাদের সরিয়ে দেওয়া, বা সাময়িকভাবে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করা যায়। পরে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখেই।

কিন্তু ভূত এবং ভগবানে খুব বিশ্বাসী বিল্টু। তার বাড়িতে সবরকম পুজো হয়। ইদানীং অনেকতল বাড়ির প্রোমোটার হয়ে বিস্তর টাকা করে এক 'গুরু'-রও শিষ্য হয়েছে বিল্টু। শ্যামলালের মতো গুরু নয়। শ্যামলাল তাকে শিখিয়েছিল কীভাবে নিঃশব্দে খুন করে পালাতে হয়। তার মদতেই বিল্টু জীবনের প্রথম খুন করে। তখন সে ওয়াগন লুট করত।

এ গুরু অন্য জাতের। এর মূল অস্ত্র ধর্ম। সবার জন্যেই তিনি 'আবির্ভূত' হয়েছেন এমন শোনা গেলেও তাঁর শিষ্যরা প্রধানত উচ্চ-আয় শ্রেণীর। সাধারণ শিষ্যরা—অর্থাৎ যারা গুরু এবং আশ্রম-কল্যাণে বছরে বড়োজোর হাজার খানেক টাকা দিয়ে উঠতে পারে—তারা ব্যক্তিগতভাবে গুরুর সান্নিধ্য বেশি পায় না। বিল্টু পায়। সে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে আশ্রমকে। বিল্টুর বুকের লকেটে গুরুর ছবি ঝুলছে। তার বহু খুনখারাবি, 'অ্যাকশন' (খুন নয়)—ইত্যাদি উত্তেজক সময়ে গুরু দুলতে থাকেন। তাব গড়িয়ার বাড়িতে বাইরের ঘরে বিভিন্ন বেখাপ্পা কিন্তু দামি জিনিসপত্রে ভর্তি শো-কেসের মাথায় তার মৃত বাবা-মার বেলমালা লাগানো বিবর্ণ ছবির পাশে রয়েছে গুরুদেবের শান্ত-স্থির-বয়স্ক সিনেমা-অভিনেতার মতো ছবিটি। বিলটুর স্ত্রী—তার দুর্দিনের সঙ্গিনী এবং একমাত্র স্বীকৃত স্ত্রী—ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানোর আগে গুরুদেবের ছবিতেও মালা পরায়।

অনেকটা জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়ি বিল্টুর। বউ বছর-দুয়েক হল চুল কেটে ফেলেছে, মাঝে-মধ্যেই

মার্কেটিংয়ে যায়, ছেলেমেয়েরা কলকাতার ভয়ঙ্কর এক ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে। বেশিরভাগ সহপাঠী/পাঠিনীর মতোই তাদের বাড়িতে আধুনিক টেকনোলজির সম্ভার—টেপ ডেক, রঙিন টিভি, ভিসিআর- - এ সব আর কী। তাদের বন্ধুরা যখন জিগ্যেস করে 'অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইওর ড্যাড ডু? —ওরা উত্তর দেয়, সম্ভবত বিল্টুর 'জায়ান্ট কনস্ট্রাকশনস' দোকানটির কথা মাথায় রেখেই—'বিজনেস'।

স্কুলের 'গার্ডিয়ানস মিট'-এ বিল্টুর নাম মিস্টার বিমলেন্দু দাস, পাড়ার ভদ্রলোকদের কাছেও তাই।

বিল্টুর বেশ টাকা হয়েছে। তার হিংস্রতম স্বপ্নেও একসময় বিল্টু এরকম স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতে পারত না। ছয়ের দশকের শেষে এবং সাতের প্রথমে সে ওয়াগন ভাঙত। বাবা মারা গিয়েছিল রাস্তা পার হতে গিয়ে। ছোটো একটা দোকানের কর্মচারী মিনমিনে চেহারার বেঁটেখাটো লোকটিকে বিল্টু পছন্দ করত না বিশেষত ও যখন তার মাকে মারত। লোকটা মারা যেতে ফুর্তিতে ফেটে পড়ে বিল্টু এবং তখনকার সবচেয়ে লোভনীয় সমাজবিরোধী কাজে যোগ দেয় শ্যামলালের অধীনে। মালগাড়ি থেকে লাইনের ওপারে জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলতে হত। এক সন্ধের মজুরি পনেরো টাকা। ধরা পড়লে ঝুঁকি নিজের।

বিল্টু ধরা পড়েনি, কিন্তু এত অল্প টাকায় তার চলছিল না। সে অন্য রাস্তা দেখছিল।

রাস্তা পাওয়া গেল। সে সময়েই রোগা এবং রাগি কিছু শিক্ষিত ছেলেমেয়ের আবির্ভাব হয়েছিল এ দেশে। তারা খুনখারাবি করত ঠিকই, কিন্তু টাকার জন্য নয়। ওইসব খুনখারাবির সমর্থনে তারা অদ্ভুত সব কথা বলত যা বিল্টুর বোধগম্য হত না। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল 'শ্রেণীশত্রু'।

কথাটার মধ্যে একটা ঝাঝ ছিল —বিল্টুর ভালো লাগত। সে একটু অন্য মানে করে নিয়েছিল কথাটার যাকে খুন করা হবে, সেই শ্রেণীশত্রু।

কাজটা ভালো লাগত বিল্টুর। টাকাও মন্দ ছিল না। ওইসব গরিব, ইংরেজি জানা, দুর্বোধ্য ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা কী করে টাকা জোগাড় করত - বিল্টুর জানা ছিল না। উনিশ বছর বয়স থেকেই সে কৌতূহল গিলে নিতে শিখেছিল।

পরে বিল্টু জানতে পারে যাদের সঙ্গে সে 'কাজ' করছে, তাদের মধ্যে সত্যিকারের ভালো লোকের সংখ্যা কমে গিয়ে সমাজবিরোধীরা ঢুকে পড়ছে—নিরাপত্তার খাতিরে। যারা লক আপে মারা যাচ্ছে, যেসব মেয়েদের শরীরের নরম জায়গায় সিগারেটের ছ্যাকা দেওয়া হচ্ছে, যে ছেলেদের বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছে মাথায়— যারা জেল থেকে কোনও রকমে বেরিয়ে আবার পার্টির কাজ শুরু করছে—বিল্টু বুঝল— তারাই সাচ্চা লোক। যারা মার খাচ্ছে না, তারা আসলে পেশাদার।

এতে অবশ্য তার মধ্যে কোনও নৈতিক দায় জাগল না। সে পার্টি ছাড়ার তাল করতে লাগল।

ক্রমাগত স্কুল মাস্টার এবং অশক্ত চেহারার পুলিশ কনস্টেবল - অর্থাৎ কিনা শ্রেণীশত্রু —মারতে মারতে ক্লান্ত হচ্ছিল সে। সারা দেশ জুড়ে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছিল তার খবর বিল্টু রাখত না। ইতিমধ্যে তার মা মারা গিয়েছিল এবং বোন এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল। স্বাধীন বিল্টু তার উপার্জনের টাকায় ফুর্তিতে ছিল।

কিন্তু ক্রমশ টাকার জোগান কমতে লাগল। সোনাগাছির বিনয় তাকে শাসক দলের আশ্রয় নিতে বলল। বিনয় একটু আধটু পড়াশোনা করেছিল, বিস্তর খবর রাখত। একদিন তাকে এক পাঁইট 'বাংলা' খাইয়ে বিল্টু সেই সময়ের শাসক দলের নাম এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় জেনে নেয়। এক যুবনেতার সঙ্গে দেখা করে এবং 'শেল্টার' পায়। এখানে টাকা বেশি—কিন্তু কাজ একই।

সে তার একসময়ের সহকর্মী এবং কর্মকর্তাদের খুন করতে থাকে। সে সময় থেকেই এই লাভজনক ব্যবসায়ে সচেতন বিল্টু বিভিন্ন দলের উত্থান-পতন সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে আরম্ভ করে।

তখন তার সহকর্মীদের মধ্যে উজ্জ্বল ছিল বিশু। তখনও সে 'ল্যাংড়া' হয়নি। কিছুদিন পরে বোমার আঘাতে ডান পা খুইয়ে সে ওই খেতাব পায়।

কিন্তু সে সব অতীত। এখন বিল্টু চিন্তায় আছে। জানুয়ারির শেষ বিকেলে সে তার দুর্দান্ত মোটরবাইক থেকে নামে পৌরপ্রধানের বাড়ির সামনে। শনিবার সন্ধে—এখন মিহির রায়কে পাওয়া যাবে।

মিহির বাইরের ঘরেই বসেছিলেন। দুবছরের মধ্যেই তাঁর শরীরে অল্প মেদ কমেছে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের এককালীন শিক্ষক এখন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক নেতা। তাঁর চারদিকে পার্টির দু-তিনজন সদস্য বসে ছিল। প্রত্যেকেই বিল্টুকে চেনে। একসময় দেখা হলেই হাসত, এখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যেই কথা চালাতে লাগল।

বিল্টু গ্রাহ্য করল না, উলটোদিকের সোফায় মিহিরের মুখোমুখি বসল।

মিহির তাকালেন, নাটকীয় মুহূর্তে রাশভারী কোনও চরিত্র যেমন চোখ তুলে গম্ভীরভাবে তাকায়। ব্যাপারটা বিল্টু বুঝল, হাসল সে।

—মিহিরদা, আপনার সঙ্গে কটা কথা ছিল।

—বলো। তেমন নাটকীয় গাম্ভীর্য।

—ওদের সামনে বলব না। হাসিমুখেই বলল বিল্টু।

মিহির কিছু বলার আগেই অত্যন্ত উপেক্ষার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ওরা। আমরা একটু পরে আসছি—বলে বিল্টুর দিকে না তাকিয়েই চলে গেল।

ঘরে নিস্তব্ধতা। বিল্টু বুঝল তাকেই কথা শুরু করতে হবে।

—খুব হাঙ্গামা করা হচ্ছে আমার সঙ্গে!

মিহির আবার চোখ তুলে তাকালেন।

—করছে পার্টির লোকেরাই—পাড়ায় যারা কাজ করে। আপনি তো চেনেন ওদের, বারণ করে দেবেন।

—তুমি কি শাসাচ্ছ আমাকে?

—কী আশ্চর্য! সত্যি অবাক হল বিল্টু! 'শাসাতে যাওয়ার ফ্যাকড়া করব কেন? ওগুলো তো দুধের বাচ্চা। এখনও কলজেয় যা আছে তাতে ছ-টাকে টিপে মারতে পারি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওদের পেছনে বড়ো কোনও খুঁটি আছে।'

আবার চুপ মিহির।

—এ-লাইনে বিশ বচ্ছর হল মিহিরদা! তা ছাড়া ঢের ইমানদার লোক আছে আমার, মাইরি বলছি। ঢাকুরিয়ার মনেশ সাহাকে আমার বদলি লোক করার চেষ্টা চলছে খুব। আমার সঙ্গে পার্টির ছেলেরা কথাই বলে না। তার ওপর..........

সিগারেট ধরাল বিল্টু। আরও আরাম করে পা ছড়িয়ে বসল।

..........তার ওপর কাল সন্ধেবেলা একটা কিচাইন হয়েছে। মনেশের ছেলেরা আমার ছেলেদের সঙ্গে লড়তে এসেছিল। আমার ছেলেরা—মাইরি বলছি মিহিরদা—একশো টাকা পেলে একটা লাশ নামাবে। আমি না আটকালে মনেশের কলেজে পড়া দুধের বাচ্চাগুলো মারা পড়ত।

সেই গাম্ভীর্য আস্তে আস্তে খসে পড়ছে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ইতিহাস শিক্ষকের চেহারা বেরিয়ে পড়ছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু বিল্টু নির্বিকার—যেন পুরোনো অ্যাসিডিটির কথা বলছে।

—এটাও ঝামেলা নয়। কিন্তু কাল থানায় আমার নামে এফ আই আর হয়েছে। এই প্রথম। পুলিশ আমায় খুঁজতে এসেছিল। কথাবার্তা বলে চলে গেছে। চা খেয়েছে। আর......। সে যাক গে, এ সব কারা করাচ্ছে মিহিরদা?

—শোনো বিল্টু, তোমায় কয়েকটা কথা বলার আছে।

ইতিহাসের শিক্ষক তার সামনের ভয়ঙ্কর মানুষটির কাছে অসহায়তা তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে আরও ধরা পড়ছেন।

—কদিন ধরেই তোমার নামে কিছু অভিযোগ আসছে আমাদের কাছে। তোমার এই প্রোমোটারের কাজকর্ম অনেকেরই পছন্দ নয়। কলকাতায় খুব গন্ডগোল হচ্ছে—জানো বোধ হয়। অনেকে জানতে চাইছে কী করে তুমি এত কন্ট্রাক্ট পাচ্ছ। কোত্থেকে আসছে এত জমি। কে বা কারা ইনভেস্ট করছে।

বিল্টু সিগারেট খাচ্ছে। নিঃশব্দে।

......তোমার আগের জীবন সম্বন্ধে অনেকেই খোঁজখবর নিচ্ছে। গত দু-বছরে তুমি পার্টির কোনও সভা-সমাবেশেও যাওনি.....।

একটু দম নিলেন মিহির। কী যে অস্বস্তি হয় এভাবে কথা বলতে। এরকম একটা লোক........

........তুমি পার্টি মেম্বার। মেম্বারশিপ পাওয়া সহজ কথা নয়। বিশেষত তুমি........ইয়ে..........তুমি যে-ফিল্ডে কাজ করেছ, তাতে..........

থামতে বাধ্য হলেন তিনি। বিলটু শব্দ করেই হাসছিল।

—মাইরি, পারেনও আপনারা! তো থাকগে—এবার আমি দু-চারটে কথা বলি—অ্যাঁ? গত দুবছরে পার্টির কোনও মিটিংয়ে আমি যাইনি—ঠিক। কিন্তু ফান্ডে টাকা দিয়েছি কত? হিসেব আছে আপনার? এই দেখুন না, আমার আগের কাজকর্ম নিয়ে এত হুজ্জুতে আছেন আপনারা, এর ওপর প্রত্যেকটা পার্টি মিটিংয়ে আমায় দেখা গেলে আপনাদের ভালো লাগত! তাই তো ঘাঁতেঘোঁতে বুঝিয়েছিলেন এক সময়। আর আমি কোন ফিল্ডে কাজ করছি মিহিরদা? সোদপুরে গত ইলেকশনে চারটে লোক মরেছিল, কে মেরেছিল মিহিরদা? কসবা রিগিংয়ে কে ছিল?

আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। কিন্তু এভাবেই যাদবপুরে দুটো জমি পেয়েছি আমি, বাড়ি তুলেছি টালিগঞ্জ, গড়িয়ায়। অথচ মুখোমুখি কথা হয়নি। তো আজ গন্ডগোলটা কোথায় হচ্ছে দাদা?

লোকে খোজখবর নিচ্ছে তো আমি কী করব? আমি বড়োজোর দু-চারজনকে নামিয়ে দিতে পারি, যদি বলেন। কিন্তু প্রোটেকশন পাব—আগের মতো। থানা-পুলিশের ঝুটঝামেলা বহোত খিঁচ লাগিয়েছে মাইরি। আপনি প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করুন—আমি পার্টি মেম্বার।

দম নিলেন মিহির। এবার সেই মারাত্মক কথাটা বলতে হবে। সেই দমবন্ধ করে দেওয়ার মতো কথাটা........

—আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। একটা চিঠি এসেছে। পার্টি হাইকমান্ড জানাচ্ছেন যে—

উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে বিল্টু। মুখের কোণে পাতলা হাসিটা লেগে।

—ওই ছকটা আমি জানি—মার দিব্বি! কালীঘাটের তপু এখন জেলে, ঘাড়ে ছ-টা কেস। তাকে ঝেড়ে ফেলার ঠিক একমাস আগে পার্টি এক্সপেল করে দিয়েছিল আন্টি-পার্টি কাজকর্মের জন্য। আমি জানি—মাইরি।

সিগারেটটা জোরে অ্যাশট্রেতে দাবাল বিল্টু। ওর শক্ত আঙুলে তিনটে আংটি, গলায় বাবাজি, ওই হাসি........সবকিছুই এত রিপালসিভ, আবার—ভয়ও করে!

– আমি যখন পার্টির কাজে আমার ফিল্ডে নামি তখন আপনি আন্ডারগ্রাউন্ডে। বেলেঘাটায় আপনাকে প্রথম দেখি। আমি আপনাদের পাঁচজনের গার্ড ছিলাম। আপনাদের খাবার পৌঁছে দিত বেণু, আমি ওর সঙ্গে যেতাম। কোনও গোপন মিটিং থাকলে আপনাদের পাঁচজনকে আমি নিয়ে যেতাম। মাইরি বলছি, টাকার জন্য। ও সব নীতি-ফিতি কোনওদিনও বুঝিনি। এটা আমার তিন নম্বর পার্টি। আমি যখন এ-পার্টিতে আসি, তখন আপনারা জানতেন আমি কোত্থেকে আসছি। কিন্তু চুপ করে ছিলেন। এত ভার-ভারিক্কিও ছিল না আপনার—মানে আপনাদের। ইছাপুরে মিটিংয়ে পর ছ-টা রুটি আপনি, আমি আর রথীনদা ভাগ করে খেয়েছিলাম। রথীনদা তো এখন আবার এম এল এ হয়েছে- অ্যাঁ! সে ভালো কথা। কিন্তু আমায়ও তো করে খেতে হবে, না কি?

—তখন আমাদের উপায় ছিল না। কিন্তু আমাদের চরিত্র ছিল, একটা উদ্দেশ্য ছিল।

—উদ্দেশ্য আমারও ছিল। তবে চরিত্র—না ছিল না! থাকলে আপনারা কি আর এত চট করে গদি পেতেন? অ্যাঁ......হ্যা, হ্যা......

যেন একটা দারুণ ঠাট্টা করছে, এমন করে হাসল বিল্টু এবং সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে গেল।

.....শুনুন মিহিরদা, কাল মনেশের একটা ছেলেকে আমি একটু বেশি চটকেছি, কয়েকটা কথা বের করার জন্য। অনেকদিন ধরেই পার্টির বাচ্চা-বুড়ো সবার হাবভাব একটু কেমন কেমন লাগছিল। তার ওপর এরকম সোজা অ্যাকশন! তো ছেলেটা সব বলেছে। শুনলাম আপনারা নাকি আরও কয়েকটা কেসে পরে ফাঁসাবেন আমাকে। যেমন ধরুনগে রেপ। কিন্তু মায়ের দিব্বি গালছি, রেপ কোনওদিনও করিনি আমি। ও শালা

ছ্যাচোড়ের কাজ, আর ভদ্রলোকের! আমার শালা ঘরে-বাইরে বউ.........। যাকগে, ও সব নিয়ে কিন্তু জলঘোলা করবেন না দাদা। ও সব খুব গন্ডগোলের ব্যাপার!

—কী সব বলছ তুমি!

প্রায় তুতলে চেঁচালেন মিহির। এই রাগ এবং উত্তেজনায় তাঁকে প্রায় শিশুর মতো দেখাল।

—বলছি আমায় ঘাঁটাবেন না! বিল্টু গম্ভীর।

বেশ একটা ঠান্ডাগোছের ভাব ফোটানোর চেষ্টা করলেন মিহির। পরে বুঝলেন, তিনি ভুল করেছিলেন।

—তোমার বউ-বাচ্চা আছে বিল্টু।

—তো কী হয়েছে! ওরা মরবে!......

আবার সেই ঠান্ডা হাসি ফিরে এল বিল্টুর মুখে।

.......মাইরি বলছি মিহিরদা—আমি খালি নিজে বাঁচতে চাই। বাকি সব শালা ভোগে যাক! তবে ব্যাটাছেলে বলে কথা। ওদের গায়ে কেউ চিমটি কাটলেও আমি সে শালার হাত কেটে নেব।.....

উঠে দাঁড়াল বিল্টু।

......কোনও লাভ নেই। আপনারা মাইরি বুঝবেন না। আমি হাত বাড়ালেই শেল্টার পাব। পাঁচ বছর আগে হলে এখানে আসতামই না। কাল রাতেই মনেশকে কোপাতাম, তার পরে অন্য পার্টিতে যেতাম। তবে কিনা এখন বয়স হয়েছে—সে জোশ আর নেই। তা ছাড়া আপনারাও পাওয়ারে আছেন—আমার সুবিধে হয়। কিন্তু লাভ কী? আপনারা কিছুই বোঝেন না। সে যাক গে—এবার কটা কাজের কথা বলি—মন দিয়ে শুনুন। এক, বারো ঘণ্টার মধ্যে এফ আই আর তুলে নিন। দুই, পার্টিকে সব বুঝিয়ে চিঠিটা ফেরত পাঠান, এরকম চিঠি যেন আর না দেয়। তিন, ঢাকুরিয়ার ওই মনেশখোকা আর ওর বাচ্চাদের বলুন দূরে থাকতে—নয়তো শিগগিরই সরু হয়ে যাবে। আমার ছেলেরা রেগে আছে। আর সবশেষে একটা কথা বলছি দাদা—একদম বিটুইন কথা—আমায় হটাতে চাইলে প্রফেশনাল লাগান। তবে তাতেই বা কী লাভ বলুন—আরও একজন তো বাড়বেই। একটা মনের কথা বলি মিহিরদা, গড়িয়া অঞ্চলে আমার গায়ে একটা টোকা লাগলে পাড়ার লোকেরা আপনাদের চামচেগুলোকে ছেড়ে দেবে না। গত সাত বছর, যদ্দিন আমি আছি, ওখানে একটা ছিনতাই হয়নি—আগে রোজ হত। ওখানে মেয়েরা রাত বারোটায় একা বাড়ি ফিরতে পাবে। আপনারা তো ভোটার ছাড়া কিছু ভাবেন না দাদা—তিন-চার হাজার ভোটার কমলে, আর আমি শহিদ হলে কি খুব সুবিধে হবে দাদা?—যাকগে, আমি চলি।

—কী করবে তুমি এখন?

ভীত এবং উত্তেজিত মিহির পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বিল্টু দাঁড়াল। অল্প হেসে বলল, 'প্রায় পনেরো বছর আগে বরানগরের একটা বাড়িতে মাধবদা, এখন মিনিস্টার, আমায় বুঝিয়েছিল কোনটা খুন আর কোনটা অ্যাকশন। আমরা যেটা করি সেটা নাকি অ্যাকশন—খুন নয়। শালা বেড়ে মজা! মারছি, লোকটা মরছে—কিন্তু একটা নাকি খুন, আর অন্যটা অ্যাকশন!'

খুব সমঝদারের ভঙ্গিতে হাসল বিল্টু। তারপর গম্ভীর গলায় বলল—দু দিন দেখব। যদি সিধা খবর না পাই তো অ্যাকশনে নামব : এবার আমার নিজের অ্যাকশন!

বাইরে শুধুই চিন্তিত কিন্তু ভেতরে কম্পমান মিহিরকে ঘরে রেখে বেরিয়ে এল বিল্টু। মেন গেটের কাছে ছেলেগুলো ফিসফিস করছে। সিগারেট খেতে খেতে বেরিয়ে যেতে যেতে খুব অমায়িকভাবে তাদের বলল বিল্টু—ভেতরে যাও, মিহিরদার খুব দরকার তোমাদের।

ওরা একটু অবাক হল। কিন্তু চলেও গেল ভেতরে।

শীতের রাত। জ্যাকেটের জিপ টেনে নিল বিল্টু। আর যমদূতের মতো বাইরে কিক করতে লাগল। গাঁক গাঁক করতে লাগল যন্ত্রটা। মাথায় হেলমেট চড়িয়ে অভ্যস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে চারদিকে মেপে নিল বিল্টু : না, কোনও বিশেষ ছায়া বা গন্ধ নেই। ভেতরের পকেটের ভারী জিনিসটা স্পর্শ করল সে। বাইক চালাতে লাগল। হাসল আত্মবিশ্বাসে : হ্যাঁঃ অ্যাকশন, কোনটা যে শালা কার অ্যাকশন! □

দৃষ্টিপাত

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

লাস্ট ট্রেন লেট করছে। সন্ন্যাসীও দেখে দেখে ওর ঠেকে ঝাঁপে কাঠি করে দিয়েছে। আমি কিন্তু লাস্ট ট্রেন না দেখে যাব না। সন্ন্যাসীর আজ অনেকটা মাল বেঁচে গেছে, দোকান বন্ধ করার আগে আমায় জোরজার দু পাঁইট খাইয়ে দিল।

সেই থেকে আমি উল্লু হয়ে গেছি। নিজের রিকশা, প্রথমে ড্রাইভারের সিটে ছিলাম, দক্ষিণ দিক থেকে একটা হাওয়া চালু হল। নেশাটা কিক্ মারল। প্যাসেঞ্জারের সিটে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ ট্রেন নেই, লাইন ধারে ঝিঁঝির গান, অন্ধকারে জোনাকির নাচ। সেই গান-নাচ নেশাটাকে আরও চারিয়ে দিল, পাদানিতে শুয়ে পড়লাম। তারপর কখন যে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেছি, টেরই পাইনি। একটা চোখ মাটিতে চাপা। ওটা ঘুমচ্ছে। অন্যটা সোজা চালিয়ে দিয়েছি আপ সিগন্যালের দিকে। লাল বলটা সেই থেকে পড়ে আছে, ওঠার নাম নেই। শালা আটকে গেল নাকি মালটা।

তখন আমি মাল-ফাল খেতাম না। দিনে ফুটবল খেলি, রাতে রিকশা টানি। মা বড়োদার কাছে, জামশেদপুরে। বড়োদা ওখানকার বড়ো অফিসের পিওন। ক্লাস এইটটা যখন কিছুতেই পাশ করতে পারলাম না, তখন এটা ওটা কাজ করতাম আর ফুটবল খেলতাম। লোকে বলত, কৃশানু হব। খুচখাচ রোজগারে সংসার চলত না, শেষমেশ রিকশা ধরলাম। আমাদের বংশে আমিই প্রথম রিকশাওলা। বাবার ফটোটা বুকে চেপে মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বড়োছেলের কাছে চলে গেল। ভালোই হল, আমারও রিকশা চালানোর লজ্জাটা কেটে গেল। আজকের মতোই এক রাতে লাস্ট ট্রেনের প্যাসঞ্জার ধরব বলে বসে আছি। এদের কাছে যেমন ইচ্ছে দাও মারা যায়। স্ট্যান্ডে অন্য কোনও রিকশা নেই। চারপাশ সুনসান। হঠাৎই চোখে পড়ল ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা মেয়ে নেমে আসছে, হাঁটাচলায় ভদ্রঘরের ছাপ। সুইসাইডের ধান্দা নাকি? তবে মেয়েটা লাইন-ফাইন টপকে রিকশা স্ট্যান্ডের দিকেই আসছে। সুইসাইড করাটা বোধ হয় সাহসে কুলোয়নি। কিন্তু এত রাত্তিরে বাড়ি ফিরে গেলে, বাড়ির লোক কি ছেড়ে কথা বলবে। সে যাই হোক, আপাতত আমার রিকশাতেই ওকে যেতে হবে। রিকশায় বসে বসে ভাবছি, কোথায় যাবে, কত হাঁকব....তখন দেখি আমার রিকশার দিকে না তাকিয়েই মেয়েটা চলে যাচ্ছে। মেয়েটা বিয়ে হওয়া। এই রাত্তিরে একা একা চলল কোথায়? মাথার গণ্ডগোল আছে নাকি? এই যে হেঁটে যাচ্ছে, এরপর যদি প্রাণকৃষ্ণ স্ট্রিট ধরে তা হলে তো প্রতিমা হয়ে যাবে। ওখানকার ছেলেরা রাতে ক্লাব ঘরে ব্লু দেখে। রিকশার মুখ ঘুরিয়ে বউটার পাশাপাশি গেলাম। —কোথায় যাবেন বউদি? দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চোখ তুলে তাকাল। ল্যাম্পপোস্টের ঝিমনো আলোতেও কী মুখ দেখলাম। যেন ভাসানের আগে মা দুর্গা। --আমার কাছে তো পয়সা নেই। —যাবেন কোথায়? —আমার হাজব্যান্ড এখনও বাড়ি ফেরেনি, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।

কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম, —স্বামী ফেরেনি বলে আপনি মাঝরাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। বাড়িতে আর কেউ নেই?

—না। আমরা স্বামী-স্ত্রীই থাকি।

বললাম, নিন উঠে পড়ুন, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। পুরুষমানুষ কাজে-কম্মে কোথাও ফেঁসে যেতেই পারে, সকাল অবধি ওয়েট করা উচিত। তারপর না হয় থানা-পুলিশ করা যাবে। বউটা রিকশায় উঠে এল।

—বাড়ি কোথায়?

—পুরোহিত পাড়া।

রিকশা ছুটছে সাঁ সাঁ। বেশিরভাগ রাস্তায় আলো নেই। ল্যাম্পপোস্টগুলো অন্ধ ভিখারির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তবে সে দিন চাঁদ উঠেছিল ফটফটে। নাগের মাঠের কাছে এসে পড়েছি, হঠাৎ বউটা বলল, একটু আস্তে করবে ভাই। অবাক হলাম। গাড়ি থামিয়ে বললাম, কী হল? —মাঠটায় একবার দেখলে হত। —কী দেখবেন? —যদি এখানে থাকে! আমি সিওর হলাম, বউটার মাথায় সত্যিই ছিট আছে। এত রাতে এই মাঠে কেউ থাকে। বললাম, আপনার স্বামী এখানে কী করতে আসবে? —না মানে, উনি মাঝে-মধ্যে একটু নেশা-টেশা করেন তো......একদিন বলছিলেন নাগের মাঠের কথা।

পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। বউটার স্বামী তার মানে স্ট্যাম্প মারা মাতাল। একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, মাতালদের বউগুলো সব সময়ই সুন্দর দেখতে হয়। কিরকম দুঃখ মেশানো সুন্দর। বললাম, আপনি রিকশাতেই বসে থাকুন। আমি দেখে আসছি। বারপোস্টের তলা দিয়ে গলে এলাম। এ মাঠে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। চাঁদের আলোয় মাঠের আবছা চুনের দাগও দেখা যাচ্ছে। কেন কী জানি হঠাৎ খুব ডজ, ড্রিবলিং করতে ইচ্ছে হল। ফাঁকা মাঠে আমি একা প্লেয়ার আর একটাই দর্শক, রিকশায় বসে থাকা বউটা। যাক এ সব ভেবে লাভ নেই, এখন মেন কাজ ওর মাতাল স্বামীকে খুঁজে বার করা। উত্তর দিকের বারপোস্টের পেছনে নাগের পুকুর। মাতাল যখন, ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্যে পুকুরের আশপাশে থাকবেই। হ্যাঁ যা ভেবেছি তাই। ভাঙাঘাটে একটা বডি চিত হয়ে পড়ে আছে। কাছে গেলাম। ও বাবাঃ এ তো আমাদের মাতাল মাস্টার। চোখ বুজে হাঁ করে চাঁদের আলো খাচ্ছে। স্টেশন রোডে সব্বাই একে চেনে। সন্ন্যাসীর পার্মানেন্ট খদ্দের। এর তিন কুলে কেউ আছে বলে তো শুনিনি। এ নিশ্চয়ই বউটার স্বামী নয়। মাল খেয়ে খেয়ে লোকটা লাস্ট সিনে চলে গেছে। মাস্টারকে ছেড়ে ফিরে এলাম। বউটি রিকশা থেকে বলল, কাউকে দেখলে? বললাম, হ্যাঁ একটা লোক পড়ে আছে, আমাদের চেনা, মাতাল মাস্টার।

বউটি রিকশা থেকে নেমে এল। তারপর সোজা হন হন করে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। আমিও পিছু নিলাম। —চললেন কোথায়? চাঁদের মাঠে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বউদি বলল, তোমরা যাঁকে মাতাল মাস্টার বলো, উনিই আমার স্বামী।

সে দিন অলকেশদা আর বউদিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম। মাতাল মাস্টারের যে সুন্দর একটা নাম আছে, জানতামই না। ঘর থেকে বউদি টাকা এনে দিয়েছিল। নিইনি। সে দিনই জানলাম অলকেশদার হাঁটা চলা, কথা বলা মাস্টারের মতো হলেও অলকেশদা কোনও দিনই মাস্টার ছিল না। টুকটাক চাকরি করত আর প্রায়ই চাকরিগুলো চলে যেত।

এই রে চোখটা বুজে গেছে। আবার চোখটা খুলি, কী ভারী! ওই তো লাল বলটা উঠে হলুদ হয়ে গেছে। তার মানে ট্রেনটা ক্যানসেল হয়নি। মাস্টারের পাড়ার ছেলেরা ফিরবে। ওদের নিয়েই ফিরব। ছেলেগুলোর থেকে একটা ব্যাপার আমায় জানতেই হবে। কিন্তু, নেশা তো রগে চড়ে আছে, রিকশা টানতে পারব তো? কে বলবে এই আমি ছ'মাস আগেও মালের গন্ধে বমি করে ফেলতাম। এখন ঘটির মতো লটে গেছি। অলকেশদাকে মাল ছাড়াতে গিয়ে, নিজেই মাতাল হয়ে গেলাম। হেভি জ্ঞানী লোক, এদের সঙ্গে কি টক্কর নেওয়া যায়? সে দিন যখন পুকুর পাড় থেকে অলকেশদাকে কাঁধে টাঙিয়ে ফিরছিলাম, কী একটা কথা বিড় বিড় করছিল। কান পাতলাম। একটা কথাই বার বার বলছে, মরে গেছে তো। আবার কেন জ্বালাচ্ছিস? মরে গেছে...আমি বউদিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী বলছে? বউদি বলল, ও কিছু না। নেশার ঘোরে উলটোপালটা বকছে।

পরের দিন স্ট্যান্ডে গাড়ি লাগিয়ে বসে আছি, হঠাৎ দেখি মাতাল মাস্টার একগাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে দিন একদম ফিটবাবু। দাড়ি কামিয়েছে, পরিষ্কার পাজামা-পাঞ্জাবি। এসেই আমার পিঠ চাপড়ে বলল গুড মর্নিং বিলু। কিরে ঠিক বলেছি না নামটা। ঘাড় হেলোলাম। —রাইট আউট খেলিস না? লজ্জা পেলাম। মাতাল হলে কি হবে, সব খোঁজ রাখে। লোকে বলে মাস্টার নাকি একসময় এ অঞ্চলের

আলো করা ছেলে ছিল। সে দিন সকালে মাস্টারের গায়ে সেই আলোর পড়ন্ত আভা দেখেছিলাম। —আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি তোর নেমন্তন্ন। কাল ঘাট থেকে আমায় খাটে তুলেছিস, তোর বউদি খুব প্লিজড। আসবি কিন্তু.......বলে, মাস্টার বড়ো বড়ো পা ফেলে উধাও হয়ে গেল। যেন কত কাজ আছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল, এ কীরকম ফ্যাচাং করে গেল মাস্টার। ভদ্দরলোকের বাড়ি, একটা জামাকাপড়ও কাচা নেই। ভুলে গেলাম নেমন্তন্ন। সে দিন এ দিক-ও দিক প্রচুর ভাড়া খাটলাম। দুপুরের দিকে চিনচিনে খিদের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বউদির মুখ। আমার জন্যে অনেকদিন পর কেউ খাবার নিয়ে বসে আছে। এই ঘেমো হাত-পা নিয়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। রোজকার মতো নেড়ার হোটেলেই গাড়ি লাগিয়ে দিলাম। হাত মুখ ধুয়ে সবে টেবিলে বসতে যাচ্ছি, দেখি উলটোদিকে মাস্টার বসে মিটিমিটি হাসছে, —কিরে, তোর নেমন্তন্নের কী হল?

আমি তো অবাক, —আপনি এখানে!

—আমি জানি তুই রোজ এই হোটেলেই খাস, লজ্জায় আমার বাড়ি যেতে পারবি না তা'ও জানতাম। তাই এখানেই বসে আছি, চল চল।

কী আর করি যেতেই হল। মাস্টার রিকশায় বসেছে, আমি চালাচ্ছি। মাস্টার ইতিমধ্যে কোথাও একটু মৌতাত করে নিয়েছে। মুকেশের একটা হিট গান ধরেছে। গলাটা দারুণ।

গত রাতে অন্ধকারে বুঝতে পারিনি মাস্টারের বাড়িটা এ রকম পোড়ো বাড়ির মতো। দিনের আলোয় দেখলাম, বাড়ির ছাল, চামড়া খসে পড়েছে। তবে সামনে একটা বাগান আছে। বাগান আগাছায় ভর্তি, আগাছার গাছেও দু-একটা ফুল উঁকি মারছে। বউদি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার; তোমাদের এত দেরি হল যে!

মাস্টার বলল, তোমার দেওর যে খুব লাজুক গো। হোটেলে খেতে বসে গিয়েছিল। ওখান থেকে ধরে নিয়ে এলাম।

আমার তো প্রেস্টিজ পাংচার। দেখি বউদি হাসছে। হাসি দেখেই বোঝা যায়, বউদি বি-এ পাস....বি এ পাস যখন, পার্টির লোকেরা বউদিকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে। মাস্টার মারা যাওয়ার পর এখানকার জেতা পার্টি স্বীকার করেছে, মাস্টার তাদের লোক ছিল। বডি নিয়ে মিছিলও হয়েছে। বউদি মিছিলে ছিল, আমিও ছিলাম। শুধু মাস্টারের চোখ দুটো ছিল না। মাস্টার লিখিয়ে গিয়েছিল, মারা যাওয়ার পর তার চোখ দুটো যেন কোনও অন্ধ মানুষকে দেওয়া হয়। বউদি মাস্টারের ইচ্ছে পূরণ করেছে। স্ট্যাব হওয়া মাস্টারের বডিটা প্ল্যাটফর্মে কলকে গাছের নীচে পড়েছিল। পুলিশ ঘিরে ছিল বডি। টুপ টাপ কলকে ফুল পড়ছিল মাস্টারের চোখে-মুখে। দৌড়তে দৌড়তে বউদি এল। বউদির শাড়িতে, চুলেতে, চোখেতে কোথাও কোনও কান্না নেই, শুধু হাহাকার আছে। বউদি মাস্টারের মাথার কাছে বসে একটা কথাই বারবার বলতে লাগল, এক্ষুনি আই ব্যাঙ্কে খবর দিন, ও চোখ দিতে চেয়েছিল। দেরি করলে চোখটাও মরে যাবে।....মিছিল যখন অন্ধ মাস্টারকে ম্যাটাডরে নিয়ে চলেছে, তখনই কলকাতার হাসপাতালে মাস্টারের চোখ দুটো আর এক মানুষের চোখে জেগে উঠছে। মাস্টারের পাড়ার ছেলেরা লোকটাকে দেখতে গেছে। ওদের কাছেই খবর পাওয়া যাবে, চোখ দুটো বেঁচে আছে কি না। সিগনাল অনেকক্ষণ হলুদ হয়ে গেছে। গাড়ি আসছে না। আমিও সোজা হতে পারছি না। খালি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী কি আজকাল মালে কিছু মেশাচ্ছে? প্রথম যে দিন নেমন্তন্ন খেতে মাস্টারের ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম ঘরটা কীরকম ফাঁকা ফাঁকা। যেন ঘরের হার্ট, কিডনি, ফুসফুস সব খুবলে নেওয়া হয়েছে। পরে জেনেছিলাম মাস্টার সব বিক্রি করে মাল খেয়ে নিয়েছে। সে দিন মেনু এমন কিছু ছিল না, মাছের ঝোলে ধনেপাতা ছিল। নেড়ার হোটেলে থাকে না। অনেকটা ভাত খেয়ে নিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর বউদি যখন হাতে মৌরি দিচ্ছিল, তখন চুপি চুপি বললাম, মদ ছাড়ানোর একটা ঠাকুরের ওষুধ আমার জানা আছে। তবে অলকেশদাকে না জানিয়ে খাওয়াতে হবে। আমি এনে দেব। বউদি বলল, দিও। আমি তো হেরে গেছি, তোমার ভালোবাসায় যদি কিছু হয়।

তারপরও মাস্টারকে দু-একবার বেহেড অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। ধীরে ধীরে ওষুধের কারণে কিনা জানি না মাস্টারের নেশা করা একটু কমে গেল। দিনের বেশির-ভাগ সময় ধোপদুরস্ত, তবে সন্ধে নামলেই

আমার রিকশার কাছে চলে আসত, —চল গুরু দু পাঁইট মেরে আসি। আমি বললাম, আপনি যান না। আমি তো খই না, আমাকে টানছেন কেন? মাস্টার বলত, তুই আমার রেগুলেটার, আমার রেডিমেড সন্তান। তুই থাকলে খাওয়াটা কন্ট্রোলে থাকে। যেতেই হত। ঠেকে তো শুধু মুখে বসে থাকা যায় না, আমারও অল্প অল্প অভ্যেস হতে লাগল। মাস্টারের নেশা লেগে গেলেই, ঠেক থেকে তুলে আনতাম। মাস্টার তখন প্রচুর বকবক করত। কটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলত, দেখিস বিলু আমি ঠিক ফিরবই, কেউ আটকাতে পারবে না। অবাক হতাম। লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও বলছে ফিরবেই! আর ওই কথাটা তো মন্ত্রের মতো বিড় বিড় করেই যেত, মরে গেছে তো, আবার চালাচ্ছিস কেন? মরে গেছে...

এক সকালে সুস্থ মুডে মাস্টারকে ধরলাম, আচ্ছা মাস্টার তোমার নেশা হয়ে গেলে নানান আট ভাট বকো, সব কথা বুঝতে পারি না। তবে একটা কথা প্রায়ই বলো, মরে গেছে তো, আবার চালাচ্ছিস কেন?.....কে মরে গেছে মাস্টার, কারা চালাচ্ছে? মাস্টার মিটি মিটি হাসতে লাগল, বলল, ওরা কিছুতেই সিওর হতে পারছিল না। তিনজন কিনা। এক সঙ্গে তিনজনকে মেরে ফেলা চাট্টিখানি কথা। ....ব্যাস্ তারপরই মাস্টার চুপ। আর কিছু বলানো যায়নি।

একদিন ইয়ং স্টারের সঙ্গে খেলা। হাফটাইমের আগেই আমাদের দু গোল ভরে দিয়েছে। হাফটাইমেই দম বেরিয়ে গেছে, মাঠে বসে হাঁফাচ্ছি। মাস্টার খেলা দেখতে এসেছে। ইদানীং আমার একটা খেলাও মিস করে না। তো সে দিন মাস্টার কাছের কাছে এসে বলল, কিলিং ইনস্টিংক্ট মানে জানিস? বললাম, না। তবে তুমি যখন লোড থাকো, মাঝে মধ্যে বলো শুনেছি।— তোর মধ্যে কিলিং ইনস্টিংক্ট আছে। সেটা কী?— সেটা আসল খুনিদের মধ্যে থাকে।

মাঠ থেকে তড়াং করে উঠে দাড়ালাম। কী সব উলটোপালটা বকছে। এর ফাঁকে নেশা করে এল নাকি? মাস্টারও উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে বলল, মানুষ খুনের কথা বলছি না। অপোনেন্ট টিমকে খেলে খুন করে ফেল। লাগা তিনটে গোল। তুই পারবি। তোর মধ্যে খুনির সহজাত প্রবণতা আছে। কিলিং ইনস্টিংক্ট এমন একটা জিনিস, যদি বিপক্ষকে খুন করতে না পারো, তা হলে নিজেকেই খুন করে বসবে এই আমার মতো!

সে দিন মাস্টারের কথায় কী ছিল জানি না, সবটা বুঝিনি ভালো করে। তবে তিন গোল নয়, আমি দু গোল করে ম্যাচ ড্র করে দিলাম। মাস্টার সাইড লাইন থেকে সারাক্ষণ আমায় তাতিয়ে গেল। ক্লাবের ছেলেরা বলল, আমি নাকি ডোপ করেছিলাম। মাতাল মাস্টার হাফটাইমে আমায় কিছু খাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু মাস্টার যে আমার কী দিয়েছে, সে আমিই জানি। তারপর থেকেই আমি খুনিদের মতো স্মার্ট হয়ে গেলাম। যেমন হিন্দি সিনেমায় দেখেছি। অথচ মাস্টার যখন খুন হল আমি পালালাম ..মাস্টার কেন খুন হল, কারা খুন করল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। মাস্টার মারা যাওয়ার আগের কয়েকটা ঘটনার কথা আমি খুব ভাবছি। ওই ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে খুনের রহস্য। এমনিতেই কিছুদিন যাবৎ মাস্টার এ দিক-ও দিক হুজ্জুত করে বেড়াচ্ছিল। সবাই জানে হাসপাতালের ওষুধ পাচার হয়ে যায়। মাস্টার একদিন সুপারকে তেড়ে গালাগাল দিয়ে এল। থানাতেও মাঝে মধ্যে ঝগড়া করতে চলে যেত। আরও নানা জায়গা থেকে খবর আসত হুজ্জুতের। এই হয়তো কোনও কলেজে গিয়ে বক্তৃতা মারছে, ছাত্রদের নিয়ে চিত্রা সিনেমা হলের নুন শো বন্ধ করে দিচ্ছে। আরও কত কী, আমার সময় হত না সব জায়গায় মাস্টারের সঙ্গে যাওয়ার। আমার বাবা তো মাস্টারের বাবার মতো টাকা রেখে যায়নি। যদিও মাস্টারের বাবা টাকা, বাড়ি সব বউদির নামে করে গেছে। তিনি ভালই চিনতেন নিজের ছেলেকে।

মাস্টার যে দিন স্ট্যাব হল, তার চার দিন আগে বিকেলে আমি আর মাস্টার গিয়েছিলাম রিষড়ায়। মাস্টারই নিয়ে গিয়েছিল। রিষড়ার দিল্লি রোডের পাশে এক ধাবার পেছনে চাটাই বেড়ার অফিস ঘর মতো। মাস্টার ঘরটায় ঢুকে গেল। আমাকে বলে গেল, বাইরে থাক। আমি বাইরে থাকলাম। কান থাকল ভেতরে। বউদি বলেছে, মাস্টারকে চোখে চোখে রাখতে। ভেতরের কথা অল্প অল্প বাইরে আসছে। জনা, তোরা নাকি বিহার বর্ডার দিয়ে মাল আনাচ্ছিস? এটা মাস্টারের গলা। তোমার কী দরকার, তোমরা তো কবেই ফিনিশ।

লোকটার গলা। আমাকে একটা মাল দিতে পারবি? দাম দিতে পারব না। এখন হেভি দাম চলছে। আগের সে দিন আর নেই। সে জানি। আমরা তো পনেরো টাকার পাইপগানে হাত পাকিয়েছিলাম। আমি কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচশো জোগাড় করেছি: একটা ছোটোখাটো মাল দে। তোমার মাথা খারাপ অলকেশদা। ওই টাকায় এখন পিস্তলের খাপও হয় না। তারপর লোকটা চাপা গলায় আসল দামটা বলল। শুনতে পেলাম না। আচমকা শুনতে পেলাম মাস্টারের গলা, গলায় হুমকি, জন্য ভালো মুখে চাইতে এসেছিলাম, পছন্দ হল না। পরের বার অন্যরকমভাবে আসব।

মাস্টার বেরিয়ে আসছে চাটাইয়ের ঘর থেকে। আমি অবাক হয়ে দেখছি মাস্টারকে, একদম পালটে গেছে দেখতে! এখানে বন্দুক কিনতে এসেছে। আমায় আগে কিছু বলেনি। লোকটাকে একদম বোঝা যায় না। মাস্টার তুমি বন্দুক নিয়ে কী করবে? কোনও উত্তর না দিয়ে মাস্টার হাঁটতে থাকে। আমরা দিল্লি রোডে এসে উঠলাম। বড়ো বড়ো ট্রাক চলে যাচ্ছে, দূরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আমি আবার বললাম, বন্দুক দিয়ে কী হবে মাস্টার? মাস্টার বলল, এই যে এতগুলো ট্রাক যাচ্ছে, এর মধ্যে কোনও কোনও ট্রাকে গরু, মোষ, পাঁঠা যাচ্ছে, দেখেছিস? হ্যাঁ দেখেছি। ওই ট্রাকগুলোর মধ্যে বন্দুক পাচার হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে, শহরে অস্ত্রগুলো ঢুকে যাচ্ছে। বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে গ্রাম, শহর। কেউ কিচ্ছু জানে না। নিয়মিত ছিনতাই, ডাকাতি খুন হয়ে চলেছে। কেউ খেয়ালই করছে না এত অস্ত্র আসছে কোথা থেকে। দিব্বি বাজার দোকান চলছে, নিয়ন জ্বলছে......যদি একদিন বড়ো রকম কিছু হয়ে যায়.....অবস্থা খুব খারাপ বুঝলি বিলু। এ সময় নিজেদের কাছে একটা পিস্তল রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমি বললাম, আমার জন্যেও একটা জোগাড় করো অলকেশদা। দূরে একটা পাঁঠা ভর্তি ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়েছে, বোধ হয় ব্রেকডাউন। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় পাঁঠার চোখগুলো কী করুণ লাগছে, পাঁঠাগুলো সব বধ হতে যাচ্ছে। পাঁঠাগুলো জানে না ওদের পায়ের কাছেই হয়তো এ কে ফর্টিসেভেন পড়ে আছে।

তার পরের দিন দুপুরবেলা বউদি খেতে ডেকেছিল। গিয়ে দেখি, ও মা অনেক লোক এসেছে। মাস্টারের জন্মদিন নাকি? পরে বুঝলাম, না সেরকম কিছু না। এরা সব মাস্টারের পুরনো বন্ধু। কেউ থাকে বাঁকুড়া, কেউ মেদিনীপুর, বর্ধমান, আরও সব দূরে দূরে। মাস্টার সবাইকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে, ওরা কী সব বড়ো বড়ো আলোচনা করছিল। মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। খাওয়া সেরে বউদির কাছে মৌরি নিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় মাস্টার বলল, বিলু আজ সন্ধে সাতটার সময় একবার আসিস তো, সুদেবদার কাছে যাব। আমি আচ্ছা বলে বেরিয়ে এলাম। মাস্টারের আবার সুদেববাবুর সঙ্গে কী দরকার? সুদেববাবু পার্টির সব থেকে পুরোনো লোক। বয়স হয়েছে। মাস্টার ইদানীং সবার সঙ্গে যে রকম ঝগড়াঝাঁটি করছে, সে রকম যদি সুদেববাবুর সঙ্গে করে ফেলে বুড়োটা হার্টফেল করে যাবে। শালা কী ওষুধ যে এনে দিলাম, মদ খাওয়া কমে আসছে তো গুণ্ডামি বেড়ে যাচ্ছে।.....

ওই তো লাস্ট ট্রেন ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে। উঠে বসার চেষ্টা করছি, পারছি না। ফুল ডাউন। ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলতেই হবে। অলকেশদার চোখ যে পেল, সে কোথায় থাকে? চোখগুলোকে একবার দেখতে যেতে হবে। আবার চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। পাঁচ ছটা ছেলে লাইন ডিঙিয়ে এ দিকেই আসছে।......

সুদেববাবুর বাড়ি যাওয়ার আগে মাস্টার চার পেগ চড়িয়ে নিয়েছিল। পা একটু টলমল। ওই অবস্থায় ঢুকে গেল সুদেববাবুর বিশাল বাড়িতে। আমি বসলাম বাইরে, রিকশায়। ঘণ্টাখানেক বাদে মাস্টার বেরিয়ে এল। রাগে কাঁপছে, চিৎকার করে কী সব বলছে। সুদেববাবু শান্ত করার চেষ্টা করছে। ওদের কথাবার্তার কিছুটা এখনও আমার মনে আছে। মাতালের মতো চেঁচিয়ে মাস্টার বলছে, কেন ওরা মরবে? আমরা সবাই দিব্বি বেঁচে আছি। চারদিকে কত আলো, দোকান-বাজার.....জানেন সুদেবদা, আমি যখন হুটতে পুটতে গিয়ে দীপককে বললাম, এদের মারিস না, যাদের মারার কথা, তারা রুট পালটেছে......মাস্টারের কথার মাঝে সুদেববাবু বলে চলেছেন, আস্তে অলকেশ, আস্তে কথা বলো। কে কার কথা শোনে। মাস্টার তখন টঙে। সুদেববাবুর কোনও কথাই তুলছে না। নিজে নিজেই বলে চলেছে : দীপকরা আমার কথা শুনল না। তিনজনকে গুলি করার পরও ড্যাগার চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি বার বার বললাম, মরে গেছে তো, আবার চালাচ্ছিস

কেন? লাশ তিনটে নাগের পুকুরের ধারে এনে, ইট দিয়ে বাঁধতে লাগল। এত দিনে সেই লাশগুলো ভেসে উঠেছে সুদেবদা, চারদিকে গন্ধ ছাড়ছে, আপনি পাচ্ছেন না? ....সেই দীপককে আপনারা চাকরি দিয়েছেন, বউ-বাচ্চা নিয়ে দীপক নিক্কো পার্ক যায়, সায়েন্স সিটি যায়, চিড়িয়াখানা......এই সময় সুদেববাবু কাঁপতে শুরু করল। কথা বলছে মাস্টার, কাশছে সুদেববাবু। ও সব সিনেমার ঢপ আমার জানা আছে। সিনেমার বুড়োগুলো ছেলের কাছে হেরে গেলেই বুকে হাত দিয়ে কাশতে শুরু করে দেয়। সুদেববাবু সেম অ্যাকটিং দিচ্ছে। আমি মাস্টারকে টেনে রিকশায় তুলে নিলাম।

রাত তখন দশটা সাড়ে দশটা হবে। আমি আর মাস্টার সন্ন্যাসীর ঠেক থেকে উঠে, প্ল্যাটফর্মের শেষে ঢালুতে বসে আছি হাওয়া লাগাতে। হাওয়া বলতে গাছপালার হাওয়া নয়, মেল ট্রেনের হাওয়া। ট্রেনগুলো হিল্লি-দিল্লি চলে যায়, মাস্টার বলে, ওই হাওয়ায় নাকি ভাল কিক লাগে। তো সে দিন আপ কাঠগোদাম মেল চলে যাওয়ার পর, প্ল্যাটফর্মে ভর্তি ধুলোয় ধুলো, ওই ধুলোর মধ্যে থেকে ছ-সাতজন বেরিয়ে এল। ওদের নাক-মুখ কাপড়ে বাঁধা, হাতে ছোরা-বন্দুক। নেশায় নুয়ে যাওয়া মাথাটা তুলে মাস্টার বলল, বিলু পালা......কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি পালাতে লাগলাম। পালাতে পালাতে শুনেছিলাম মাস্টার বলছে, মরেই গেছি তো, আবার মারছিস কেন?

মনে হচ্ছে ভোর হয়েছে। ভোরের গন্ধ পাচ্ছি। ছেলেগুলো কখন চলে গেছে টেরই পাইনি। মাস্টারের চোখজোড়ার কী হল কে জানে। মাস্টারের খুনি কারা, অত সামনে থেকে দেখেও আমি বুঝতে পারিনি। কাপড়ে মুখ ঢাকা ছিল। বাকি যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, সেটুকু দেখে মেলাতে গেলে, এ অঞ্চলের অনেকের সঙ্গেই মিলে যাবে। চোখটা যে পেল, সে তো খুনিদের চিনিয়ে দিতে পারবে না। যে বলটা দিয়ে আমি গোল করি সেই তো আমায় চেনে না। .....চোখে আলো পড়েছে। চোখ খুলে আসছে। লাইন ধারেই পড়ে আছি। লাইন চলে যাচ্ছে। পৃথিবী পেরিয়ে। লাইনের পিঠ লাল হয়ে উঠছে, আরে ওই তো দূরে দু লাইনের মাঝে মাস্টারের লাল চোখ উঠে আসছে। আমি উঠে বসি। গুড মর্নিং মাস্টার। আর একটা চোখ সন্ধেবেলায় উঠবে, শান্ত সাদা। □

বিপ্লবীর সোনারুপো

রবিশংকর বল

কোনও কোনওদিন ইচ্ছে না থাকলেও ভোরবেলাতেই ঘুম থেকে উঠতে হয়। শুধুমাত্র গাছটার জন্য। বাসন্তী প্রায় রোজই বলে, 'একদিন ভোরবেলা জল না পেলে এটা মরবে না।' নিলয়ও তা জানে। তবু তাকে ছটা বাজলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেই হয়। যেন দরজায় তৃষ্ণার্ত কোনও পথিক দাঁড়িয়ে রয়েছে যার জন্য এমনই ব্যস্ততা নিলয়ের। দরজা খুলে সে গ্রিলে ঘেরা একফালি বারান্দাটুকুতে এসে দাঁড়াবে। বারান্দার এককোণে টব-বন্দী গাছটা ছোটো ছোটো লাল ফুল আব সবুজ পাতার বিন্যাসে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমে নিলয় এভাবে দেখে রোজ গাছটাকে; বাস্তবিক গাছ, ফুল—এ সবের প্রতি এমন প্রণয় তার আগে কখনও ছিল না। কিন্তু ইদানীং কীরকম একটা টান তৈরি হয়েছে যেন। এরকম প্রাকৃতিক সবুজের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি আরাম পায়। নিজের রোগজর্জর শরীবটাকে কিছুক্ষণের জন্য এমন সুস্থ সবল মনে হয় যে সামনের ওই ঘাসে ছাওয়া খোলা জায়গাটায় জগিং করার সাধ জাগে মনে। মাঝেমধ্যে যখন সে বাইরে বেরয় তখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাছপালা, ঘাস—জীবনের এইসব রূপগুলির ঘ্রাণ নিতে চায়। বাসন্তী একদিন হেসে বলেছিল, 'তুমি কি এখানে একটা গ্রিন পার্টি খুলবে নাকি?' 'এনলাইটেনমেন্ট থেকে মানুষ মানুষ করে এত হারানো হয়েছে যে এইসব জীবনগুলিকে দেখতেই আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। হিউম্যানিজমের এই হচ্ছে প্রধান বর্বরতা', বলেছিল নিলয়।

আজও সে রোজকার মতো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গাছটাকে দেখে। মাস-দুয়েক হল গাছটা এসেছে এখানে। এক শনিবারের বিকেলে বাসন্তীর সঙ্গে বাজারে গিয়ে গাছটা কিনে এনেছিল নিলয়। এখানকার সুসলি বাজারে একটু ভিতর দিকের গ্রাম থেকে বিভিন্ন গাছগাছালির চারা বা কলমও নিয়ে আসে চাষিরা। সে রকমই এক চাষির কাছে গাছটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নিলয। লাল রঙের ছোটো ছোটো ফুল। বাসন্তী সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল। এগিয়ে গিয়ে দরদাম করে গাছটা কিনে ফেলেছিল। নিলয তখনও কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। বাসন্তীই এসে তার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল ছোটোখাটো গাছটা। শিশুর সারল্যভরা গলায় বলেছিল, 'রোজ ভোরবেলা জল দিতে পারবে?' নিলয় মুখ টিপে হেসে মাথা নেড়েছিল।

—বেশ। তা হলে তোমার একটা কাজ তো হল। এবার থেকে আর কিন্তু বোলো না যে তোমার কোনও কাজ নেই।

বাস্তবিক, সারাদিনে এই ভোরবেলাটুকুতেই নিলয়ের যা ব্যস্ততা। অর্থাৎ তার একমাত্র কাজের সময়। নয়নতারা গাছটায় জল দেওয়া।

আজ সে কিছুক্ষণ একইভাবে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আচ্ছা গাছটার বয়স কত? তার বয়স গত মাসে বেয়াল্লিশ পেরিয়ে গেল। ভারতের মানুষের গড় লাইফ এক্সপেকটেন্সি চুয়ান্ন বছর। তার মানে ইতিমধ্যে কিছু না ঘটলে আরও অন্তত বারো বছর তাকে বেঁচে থাকতে হবে। বেশিও হতে পারে। জীবন-মৃত্যু নিয়ে এরকম ভাবনাও তার নতুন। আগে, অর্থাৎ কয়েকমাস আগে পর্যন্ত, জেলে থাকতেও এভাবে সে ভাবেনি। আচ্ছা, আর কয়েক বছর পরে কি সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'মা', 'মায়ের চরণ' এইসব আউড়াতে শুরু করবে? নিলয়ের বন্ধুবান্ধবেরা কেউ কেউ একে মানিকবাবুর চেতনাবিভ্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু নিলয়ের এখন মনে হয় এত সহজে সবকিছু কি ব্যাখ্যা করা সম্ভব? ধরাবাঁধা, কমনসেন্স যুক্তির বাইরে যা কিছু তাকে কি এভাবে চেতনাবিভ্রম বলে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব? জেল থেকে

বাড়িতে ফেরার পর আবার সে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' পড়েছিল। বইয়ের শেষে সূর্যাস্তহীন শশী ডাক্তারকে তার মানসিক হাসপাতালে বন্দী মানিকবাবুর মতোই মনে হয়। কিন্তু এই বাড়িতে, বাসন্তী বুবুনদের পাশাপাশি থেকেও কি তাকে ঘিরে একটা অ্যাসাইলামের পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে না? না, বাসন্তী তাকে পাগল হিসেবে প্রতিপন্ন করে না। তবু অ্যাসাইলামের আবহাওয়াটা গড়ে উঠছে এবং নিলয়ের মাঝে মাঝে মনে হয়, এর নির্মাতা সে নিজেই। কিন্তু এখন গাছটাকে জল দেওয়া প্রয়োজন। নিলয় বাড়ির ভিতর দিকে পা বাড়ায়।

গাছে জল দেওয়া শেষ হলে রোজকার মতো আজও বেতের গোল চেয়ারটা নিয়ে বারান্দায় এসে বসে নিলয়। এখনও মফস্‌সলের দিকে ভোরবেলা হালকা হিমের আমেজ ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। পাতলা চাদরটা তাই গায়ে জড়িয়ে নেয় নিলয়। ডাক্তারেরও পরামর্শ আছে। কেননা তার বুকের অবস্থা ভালো নয়। ভালো হওয়ার আশাও নেই কোনওদিন, সে জানে। বস্তুতপক্ষে এই পৃথিবীতে তার শরীরটার এখন যতটুকু উপযোগিতা তা কেবলমাত্র ডাক্তারদের জন্য। বিভিন্নরকম শারীরিক অত্যাচার থেকে শুরু করে চিকিৎসার নামে নানা বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে কীভাবে তাকে শেষ করে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই চলেছে এতগুলো বছর জেলখানায় বা বন্দী অবস্থায় হাসপাতালের বেড়ে। দিকে দিকে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, মেট্রো রেল, পপ-জিনসের আধুনিকতার মধ্যেও ভারতের শাসকশ্রেণীর মধ্যযুগীয় চরিত্র এতটুকু বদলায়নি। অবশ্য সারা পৃথিবীতেই মানুষের নানাবিধ প্রগতির পাশাপাশি গণহত্যাও বৈধ। এর মধ্যেই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেল সে। বন্ধুদের চেষ্টায়, জনমতের চাপে, খবরের কাগজের লেখালিখিতে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল সরকার। শেষের দিকে হাসপাতালের বেডেই বন্দী ছিল সে। ছাড়া পাওয়ার দিন বাসন্তী আর বুবুনের হাত ধরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আনন্দে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। নিলয়কে ঘিরে তখন অজস্র পুরোনো বন্ধুবান্ধব, বিভিন্ন বয়সী তরুণ ছেলেমেয়ে। খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার লেন্স। একজন সাংবাদিক, তার পরিচিত, এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এবার কী করবেন?'

—বিশ্রাম। কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

—রাজনীতি?

নিলয়ের ইচ্ছে হয়েছিল সজোরে এক ঘুঁষি মারে সাংবাদিকটির মুখে। বহুদিন ধরেই খবরের কাগজগুলো তাকে নিয়ে বেশ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কীই বা করার আছে? এ ছাড়া তো তার মুক্তিও সম্ভব ছিল না। কী বলবে সে, ভেবে পাচ্ছিল না। বাসন্তীই বাঁচিয়ে দেয়, 'আজ ওঁকে ছেড়ে দিন। পরে একদিন বাড়িতে আসুন না।'

সত্যি সত্যিই সে এবার বিশ্রাম নিতে চায়। রোগজর্জর শরীর নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো বাসন্তী আর বুবুনদের পাশাপাশি নিরিবিলি থাকতে চায়। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো সংসারী হয়ে। এবার সে বাসন্তীকে একেবারে কাছ থেকে বুঝতে চায়। দৈনন্দিন সাংসারিক কথাবার্তা, বাসন্তীর শরীরের গন্ধ, সবকিছুর সঙ্গে মিলেমিশে। ছাড়া পাওয়ার দিন বাড়ি ফিরে সকলে চলে যাওয়ার পর দু হাতে বাসন্তীর কোমর আঁকড়ে তার গলায় মুখ রেখেছিল নিলয়। 'আঃ ছাড়ো', বাসন্তী ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। নিলয়ের মনে হয়েছিল, এতদিনে এইসব অভিব্যক্তি যেন বাসন্তীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাইরে চলে গেছে। শরীরের ব্যাপারে বাসন্তী তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

রান্নাঘরের দিক থেকে স্টোভ ধরানোর আওয়াজ জানিয়ে দেয়, বাসন্তী উঠে পড়েছে। নিলয়ের সঙ্গে বারান্দায় একসঙ্গে বসে চা খেয়ে স্কুলে যাবে বাসন্তী। স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে সাড়ে বারোটা-একটা বাজে। বাসন্তীর অনুপস্থিতির এই সময়টুকুতে কিছু করতে পারে না নিলয়। এমনকি বইপত্র বা কাগজ পড়াও নয়। বুবুনের সঙ্গে কিছুক্ষণ অবশ্য খুনসুটি চালায়। কিন্তু বুবুনেরও তো দশটায় স্কুলে যাওয়ার সময়। কেউ না এলে বেশিরভাগ দিনই বাসন্তী না ফেরা পর্যন্ত নিলয় মনুর মা-র সঙ্গে কথা বলে সময় কাটায়। এরকমটা আগে তো ছিল না। একা একা এখন আর বেশিক্ষণ থাকতে পারে না নিলয়। এমনকি একমনে কোন বই পড়ার সময়েও বাসন্তীর উপস্থিতি জরুরি হয়ে ওঠে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কত দুর্বলতাই না বাড়ে, নিলয় ভাবে। কিন্তু তাই কি? আসলে একাকিত্বটা তার কাছে এখন একটা দমচাপা ভয়ের মতো। একা হলেই

ভাঙাচোরা, ক্ষতবিক্ষত শরীরটা ধ্বংসস্তূপের মতো আগ্রাসী হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে হয়, এই ঘর, চারপাশের নানাবিধ বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মতো কোনও অবলম্বন নেই তার। জেলের সেলে, হাসপাতালের অবরুদ্ধ বেডে শরীরটা যখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে পৌঁছচ্ছিল, তখন থেকেই এই অবলম্বনহীনতার শুরু। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে যেন একটা আইডিয়া মাত্র। তার জীবনের ইতিহাস মানে একটা আইডিয়ার ইতিহাস। লোকের কথায়, আত্মত্যাগের ইতিহাস। নিলয় এক গহীনতার মধ্যে ডুবতে ডুবতে অনুভব করে, এই শব্দটি, 'আত্মত্যাগ', যা মানুষের বেঁচে থাকার এক নৈতিক মাত্রা, একে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে তার ভিতরে জন্ম নিচ্ছে অনেক প্রশ্নের অস্বস্তি, যা এখনও সে ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না, কিন্তু নিলয় নামে এক বিপ্লবীর আত্মত্যাগকে সে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

—এই নাও। পিঠের উপর বাসন্তীর হাতের স্পর্শে সে মুখ তুলে তাকায়। বাসন্তীর অন্য হাতে ধরা প্লেটসুদ্ধ চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে নেয় নিলয়। এবার বাসন্তী আবার ভিতরে যাবে। তারপর নিজের চায়ের কাপ নিয়ে তার পাশে এসে বসবে। দৈনন্দিন এই অভ্যাসের মধ্যে সকালবেলা বাসন্তীর অন্তরঙ্গ উপস্থিতির তাৎপর্য যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ দিনই দুজনে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোনও কথা আর হয়ে ওঠে না। অথচ বাসন্তীকে সে কতকগুলি প্রশ্ন করতে চায়।

—আজ বিকেলে সমরবাবু আসবেন, মনে আছে?

—হুঁ। নিলয় বাসন্তীর দিকে তাকায়। উজ্জ্বল কাঁচা হলুদের মতো রং ছিল বাসন্তীর। এখন তাতে তামাটে আভা। খসখসে মুখের চামড়ায় এখন অজস্র রেখার গোপন ইতিহাস। 'আচ্ছা ওরা কাগজে কলাম কেন ছাপতে চান বলে মনে হয় তোমার?'

—চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে অনেকেই আগ্রহী।

কেন?

বাসন্তী হেসে ওঠে। 'বাবাঃ, তুমি মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বলো যেন কিছুই বোঝো না।'

—সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না বাসন্তী। আমার মতামত জানবার বা জানানোর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এ-দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তোমার একটা ভূমিকা তো আছে।

কথাটা বলতে গিয়ে বাসন্তীর চাপা উদ্দীপনা টের পায় নিলয়। সে হেসে বলে 'বলো, ছিল। কিন্তু এখন তো আর আমি কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িত নই।'

—কিন্তু তোমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা—এ সবকিছুর তো একটা মূল্য রয়েছেই।

নিলয় মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে। সে বুঝতে পারে, তার জীবনেতিহাসের একটা ধারাবাহিকতা সকলেই তৈরি করে নিতে চাইছে। এক সময় সেও তো তৈরি করতে চেয়েছে। যেন শৈশব থেকে সবকিছুই এক লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে—নিলয় নামে এক বিপ্লবীর জন্ম। কিন্তু এখন তার মনে হয় ধারাবাহিকতা যদিও বা থাকে, তা কখনও অবিচ্ছিন্ন ছিল না। ছিল অনেক ছেদ, আকস্মিকতা, বৈপরীত্য, নানা ধরনের কণ্ঠস্বর, যেগুলি স্পষ্টত প্রকাশ পায়নি কখনও অথবা সে এগুলির মুখোমুখি হতে চায়নি। হাসপাতালের বেডে নিজের ধ্বংসস্তূপপ্রায় শরীরটার মুখোমুখি প্রতিনিয়ত শুয়ে থেকে প্রত্ন উপাদানের পর্যায়ে চলে যাওয়া প্রশ্নগুলিই উঠে আসতে থাকে একের পর এক। প্রথমে সে খুব নির্দিষ্টভাবে প্রশ্নগুলিকে শনাক্ত করতে পারেনি। হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়েই চারপাশের দমবন্ধ স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়াটার আঁচ সে পেয়েছিল। প্রগতির নামে সবকিছুই মেনে নিচ্ছে মানুষ। সব হত্যা, ধর্ষণ, সাংস্কৃতিক পিছু হটা—যাবতীয় স্থিতাবস্থাকে জোরদার করা হচ্ছে প্রগতির নামেই। এর বিরুদ্ধে তাঁর অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সে খুঁজে পাচ্ছে না। প্রশ্নগুলো মাথায় জাগতে শুরু করেছিল এরকম অস্বস্তির মধ্য দিয়ে। ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরে বুবুনের সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই প্রশ্নগুলি নির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে। ছেলে আসার পরই বাবা নিজেকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। কে বলেছিল কথাটা? অনেকদিন আগে কারও মুখে শুনেছিল। প্রত্যক্ষভাবে বুবুনের মুখোমুখি হওয়ার পর থেকেই কথাটা বার বার ফিরে আসতে থাকে।

—কী ভাবছ? বাসন্তীর কণ্ঠস্বরে সে হতভম্বের মতো মুখ তুলে তাকায়।

কী ভাবছিলে?

—আচ্ছা বাসন্তী, আমি যদি আমার কথাগুলো বলি তা হলে ওরা ছাপতে পারবে? কথাগুলো অর্ধোচ্চারিত, ভাঙা ভাঙা বেরিয়ে আসে।

বাঃ, তোমার নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, ব্যাখ্যাই তো ওঁরা চান।

—কিন্তু আমি যদি বলি, এই বেঁচে থাকাকে ঘিরে আমার কোনও আশা নেই?

—তার মানে?

আমি যদি বলি একজন বিপ্লবীর কাছে সোনারুপোর চেয়েও মারাত্মক এই দীর্ঘ আত্মত্যাগের ইতিহাস?

—তার মানে?

আমি যদি বলি, প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, এই ডাইকটমি নির্ভর যে-কোনও সমাজ-রাজনৈতিক ভাষ্য ক্ষমতাকে আরও কঠিন, নিশ্ছিদ্র করে তোলে?'

তার মানে?

আমি যদি বলি, আমার এতদিনকার ইতিহাস আসলে বিপ্লবকে হত্যা করার ইতিহাস?

—এগুলো কী বলছ তুমি? বাসন্তী নিলয়ের দুই হাত চেপে ধরে। ঘোর লাগা চোখে নিলয় তাকিয়ে থাকে বাসন্তীর দিকে। বাসন্তী ধীরে ধীরে বলে, 'তুমি কী খুব হতাশ হয়ে পড়েছ?'

না।

এই লেখার নাম অন্ধকারের ভাষ্য। আমি কারও জন্য এটা লিখছি না। ভবিষ্যতের কোনও পাঠকের জন্যও নয়। এমনকি বাসন্তীকে পড়াব না আমি এই লেখা। এই লেখার শিরোনামের নীচে বা লেখার শেষে কোনও লেখকের স্বাক্ষর থাকবে না। বাস্তবিক এই লেখা আমি নিজের জন্যও লিখছি না। এখানে আমাকে আমি নির্মাণ করব। পৃথিবীতে খুব কম লেখা আছে যা আসলে নিজেকে নির্মাণ করা। কেননা সব সময়েই লেখার কোনও গ্রাহকের কথা ভাবা হয়েছে যার জন্য কেউ লেখে। স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপসের বীজটি থাকে এখানেই। তখন থেকেই লেখক পরিণত হন একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ার বিশেষ্য হিসেবে। যেমনভাবে কেউ কেউ হন হাসির লেখক, কেউ সিরিয়াস লেখক, কেউ হতাশার লেখক, কেউ বা দার্শনিক লেখক। আমি আশাবাদী বা হতাশাগ্রস্ত—বাসন্তী আমাকে এর মধ্যে কোনও একটি ধারণার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে। কিন্তু এই দুটি শব্দের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আমরা কি চিন্তা করেছি? এই পৃথিবী এগিয়ে যাবে, চারপাশের জীবন এগিয়ে যাবে—এই বিশ্বাসের নামই তো আশাবাদ। মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, প্রগতির উপর বিশ্বাস রাখাই তো আশাবাদ। আর হতাশা ঠিক এর বিপরীত। কিন্তু পৃথিবী, মানুষের জীবন কীভাবে এগোবে? মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, প্রগতি কীভাবে এগোবে? উত্তর পাওয়া যাবে একটাই, ইতিহাসের নিয়মে। কিন্তু ইতিহাসের নিয়মটা কী? যা কিছু এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না তাকে অন্ধকারের দিকে, বিস্মৃতির ভিতরে পিষে মারা? অন্যদিকে হতাশার দর্শনও আসলে আশা সম্পর্কিত এই ধারণাকে বাস্তাবায়িত করতে না পারার হতাশা। কিন্তু আমি চাই সেইসব প্রশ্ন তোলা হোক যারা এই আশা-হতাশার বিরুদ্ধে তর্জনী তুলেছিল। কীভাবে এই আশাবাদ বা হতাশার দর্শন গড়ে উঠেছিল? কীভাবে তা ফেলে দিয়েছিল মানুষকে আত্মত্যাগের দিকে? কীভাবে মানুষ ভুলে গিয়েছিল ইতিহাসকে প্রশ্ন করতে?

বাড়িতে ফেরার পর বুবুনকে যত দেখেছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সামনের মাসে ও চোদ্দো পড়বে। নিজের লেখাপড়া, স্কুল, বিকেলে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা, খেলার খবর—এর বাইরে কিছুতেই আগ্রহ নেই ওর। নিজের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা কে কী খেয়েছি, তাও কখনও জানতে চায় না বুবুন। সবাই বলবে বুবুন স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু আমি জানি, এরকম মানুষের কোনও আত্মিক সত্তা নেই। বাসন্তীকে বুবুনের কথা বলায় ও একদিন বলেছিল, 'আমিও আশ্চর্য হয়ে যাই। ছোটোবেলা থেকে তোমার কথা শুনেছে,

আমাকে দেখেছে কীভাবে কষ্ট করে দিনগুলো চালিয়েছি, আমাদের বন্ধুদের দেখেছে। অথচ ও এমন আত্মকেন্দ্রিক হল কীভাবে?' আমার পুরোনো কমরেড অনিরুদ্ধর সঙ্গেও এ-নিয়ে কথা হয়েছিল একদিন। ও প্রশ্নটার একটা চটজলদি সমাধান দিয়েছিল অবশ্য। অনিরুদ্ধ বলেছিল, 'আমাদেব এই বাম সরকার সব আন্দোলন, বিরোধী চেতনাকেই ভোঁতা করে দিতে চাইছে। প্রগতির নামে তথাকথিত ভালো এবং স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার দর্শন চালু করেছে এরা। এখানে প্রশ্ন তোলা মানেই পার্টি বিরোধী হওয়া। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই স্থিতাবস্থা। এর মধ্যে বুবুনদের সামনে আদর্শ কোথায় যা ওদের উদ্দীপ্ত করবে?' সে দিন অনিরুদ্ধর কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল সে। আমি তো অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি, বিপ্লবের মহান আদর্শের জন্য লড়েছি, জেলে পচেছি, আমি কেন বুবুনের আদর্শ হতে পারিনি? এ প্রশ্ন অনিরুদ্ধকে করা বোকামি। কেননা এর উত্তরও তার জানা। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কোনও পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু আমার কাছে প্রশ্নটা অন্যত্র। এই স্বাভাবিকতার দর্শন গড়ে উঠল কীভাবে? কীভাবে মানুষ তা গ্রহণ করল? এই প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে বুবুনদের বোঝা যাবে না। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ছাপ মেরে বুবুনদের আমরা কেবলই দূরে সরিয়ে দিতে চাইব।

বিপ্লবী কে? আমি, নিলয় সেন, ভারতের একটি বিশেষ কালখণ্ডের মানুষ। আর বিপ্লবী নিলয় সেন? এক বিমূর্তায়ন। আমি জানি, 'বিপ্লবী' অভিধার বিমূর্ততাকে আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া আজ কষ্টকর। তা হলে নিলয় সেনের পুরো ইতিহাসটাকে অন্যভাবে দেখবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই নতুন ইতিহাসে এমন অনেক উপাদানই ব্যবহার করতে হয় যার ফলস্বরূপ বিপ্লবী নিলয় সেন ধসে যেতে পারে। বিপ্লবী নিলয় সেন কে? এমন একজন (১) যে নিজের কথা ভাবেনি, (২) সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষের কথা ভেবেছিল, (৩) অন্যরকম এক পৃথিবীর জন্য লড়াই করেছিল। তিনটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোথাও 'নিলয় সেন কে?' এই প্রশ্নটি নেই। কেন সে নিজের কথা ভাবেনি? কেন সে সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছিল? কেন সে অন্যরকম পৃথিবীর জন্য লড়াই করেছিল?

আজ বিকেলে অনুপ আসার পর আমি ঘুমিয়ে আছি ভেবে বাসন্তী ডাকেনি। কী এক জড়তা বিছানার ভিতরে আমাকে পাথর করে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল, একমাত্র ওই নয়নতারা গাছটিকে স্পর্শ করলে আমি আবার প্রাণ ফিরে পাব। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, বাসন্তী অনুপকে বলছে, 'ওর মধ্যে একটা গণ্ডগোল তৈরি হয়েছে জানো। মানে, মাথাটা বোধ হয় ঠিকমত কাজ করছে না। এতদিন যা করেছে সবকিছুকেই ওর ভুল বলে মনে হয়। একধরনের ইনস্যানিটি গ্রো করছে। আমি যা করেছি তার সবকিছুকেই ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া—এত সরল লজিকের পিছনে আমি দৌড়চ্ছি না। কিন্তু আমি জানতে চাই, কেন ওই কাজগুলো আমি করেছিলাম? আমি জানি, এই একটা প্রশ্নই মানুষকে, অন্যদের চোখে, পাগলামোর দিগন্তের দিক নিয়ে যায়। জীবনের একটা পর্ব পেরিয়ে এসে, অন্য এক পর্বে, মানুষ তার আগের কাজকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে পারে। এই সমাজে সেটা মেনে নেওয়া হয় যে সমাজ স্বীকারোক্তিকে ব্যবহার করতে পারে স্থিতাবস্থার স্বার্থে। আর একবার এই সমাজ ভালো হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু যার কাছে ক্রিয়ার ভুল বা ঠিকের প্রসঙ্গটা অবান্তর, যে প্রশ্ন করতে চায়, কেন ওই কাজগুলো আমি করেছিলাম, তার সামনে এতদিন ধরে গড়ে ওঠা ইতিহাসের স্থাপত্য নিমেষেই পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে।

বিজ্ঞানের উন্নতি আর সভ্যতার প্রগতি যখন সমার্থক হয়, রাজনীতি তখন মানুষের নৈতিক মাত্রা থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য। এটাই আধুনিক পৃথিবীর গতিপথ। এই রাজনীতি, আধুনিক সময় যাকে সবসময় 'আমি'-র বিপরীতে এক 'অপর' হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, তার জন্য আমাদের সবসময়ই প্রয়োজন হয়েছে ইউটোপিয়ার। আমরা ভেবেছি এমন এক সমাজের কথা সেখানে মানুষ তার মানবত্বে উত্তীর্ণ হবে। কী সেই সমাজ? মানবত্বের স্বরূপটা কী? অর্থনৈতিকভাবে সেই ভবিষ্যৎ সমাজের একটা চেহারা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে।

কিন্তু সমাজ মানে শুধু অর্থনৈতিক কাঠামো নয়। রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, চিনের ঘটনাবলি সমাজের অর্থনীতি-কেন্দ্রিক সংজ্ঞাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। আর মানবত্বের স্বরূপ আমরা জানি না। সম্ভবত তা নেইও। কেননা মানবত্ব এই আধুনিক সময়ের ধারণা যে সময় এই ইউটোপিয়া ছাড়া নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারত না। সে সময়ের প্রয়োজন ছিল 'বিপ্লবী' নামের এমন এক বিমূর্ত সত্তা যে তার জীবন ও চিন্তার নৈতিক যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি, যে বিপ্লবী একের পর এক মতবাদ আর ইউটোপিয়াকে সম্বল করে আত্মত্যাগের দিকে এগিয়ে গেছে। যে বিপ্লবী প্রশ্ন করেনি, এই সময়ে তার বেঁচে থাকার নৈতিক মাত্রা কী?

বুবুনদের স্বার্থকেন্দ্রিকতার শুরু কি এই 'বিপ্লবী'র আত্মত্যাগ? এমন এক শুরু যেখানে ইতিহাসকে প্রশ্ন করার কোনও দায় নেই, শুধু আছে এই ইউটোপিয়ার কর্মশালা।

নিলয় মাথা নিচু করে বসে থাকে।

দৈনিক 'সমকালীন'-এর সম্পাদক সমর বাগচি বলে যাচ্ছিলেন, 'আপনার কাছ থেকে আমাদের আশা কিন্তু এখনও ফুরোয়নি নিলয়দা। আজকের তরুণ ছেলেমেয়েদের কাছে আপনি একটা দিশা। তাদের কাছে আপনার লেখা, আপনার সমাজ বিশ্লেষণ যাতে পৌঁছে যায়—এখন যদি ইচ্ছে না হয় বাদ দিন। আমি এখনই জোর করছি না। হ্যাঁ আমি জানি এই চারপাশটা, রাজনীতিবিমুখতা—এক অদ্ভুত স্বাভাবিকতা—আপনি হয়তো সহ্য করতে পারছেন না। আপনার কষ্ট আমরা বুঝতে পারি। বাসন্তীদিও বলছিলেন, দিনে দিনে আপনি খুব আপসেট হয়ে পড়ছেন। তবু আপনার মতো মানুষকেই তো এর মধ্যে কাজ করতে হবে। ও হ্যাঁ, বাসন্তীদিকে বলছিলাম, আপনারা কিছুদিন পাহাড়ে বা সমুদ্রের কাছে ঘুরে আসুন। শরীরটাও ভালো লাগবে, মনটাও—'

শব্দগুলির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে একসময় সে শুধু অনুভব করতে পারে এক নীরবতা। কী বলবে সে? এই কথাগুলো তার কাছে অর্থহীন? এরা তাকে অসুস্থ ভাবতে শুরু করেছে। তাই পাহাড়ে বা সমুদ্রে বেড়োতে যাওয়ার আহ্বান। এলোমেলো শব্দগুলি কানে আসছে—সমর বাগচি এখনও বলে যাচ্ছে—কিন্তু নিজের ভিতরে ডুবে গিয়ে কিছু ভাবতেও ইচ্ছে করছে না তার। শুধু মনে পড়ে, বাসন্তী স্কুল থেকে ফিরে আসার পর তারা দুজন রোজ টেবিলে খেতে বসে......এতদিন একা থাকার দৈনন্দিনের কত গল্প বলে যায় বাসন্তী......শুনতে শুনতে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়.........আর তখন বাসন্তী তার মুখে ভাতের গ্রাস তুলে দেয়, কত মজা করে, হাসে......এখন এগুলোকে কেন এত মূল্যবান মনে হয়? কীরকম এক প্রলাপের মতো জড়ানো গলায় সে বলে, 'কী নিয়ে এখন লিখতে হবে আমাকে?' এরপর সে শুধু শুনতে পায় সমর বাগচির উচ্ছলতা, হাসি আর একটি শব্দবন্ধ, 'আমি জানতাম.......আমি জানতাম.. ...।' □

লেখক-পরিচিতি

(বর্ণানুক্রমিক)

অজিত মুখোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯২৯। মেদিনীপুরের গড়বেতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ তেত্রিশ বছর (১-৩ খণ্ড)।

অমর মিত্র
জন্ম ঃ ১৯৫১। বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মাঠ ভাঙে কালপুরুষ, দানপত্র, আসনবনি, সমাবেশ, ভি. আই. পি. রোড, অমর মিত্রের ছোটগল্প, সুবর্ণরেখা, আলোকবর্ষ ইত্যাদি।

অমল রায়
জন্ম ঃ ১৯৫০। আড়িয়াদহে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বারাব্বাস, রাজকাহিনী, মরুকারা ও অসংখ্য নাটকের রচয়িতা।

অমলেন্দু চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯৩৪। কলকাতায়।
পেশা ঃ শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন, অবিরত চেনামুখ, আকালের সন্ধানে, মাধব সুন্দরী ইত্যাদি।

অনিল ঘড়াই
জন্ম ঃ ১৯৫৭। বিহারে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কাক, পরীযান, জার্মানের মা, লু, আকাশ মাটির খেলা, জলচুকণী, আগুন, জ্ঞানবৃক্ষের ফল, অনিল ঘড়াইয়ের গল্প, গর্ভ দাও, কামকুঠিয়া, তিন ভুবনের গল্প, ভারতবর্ষ ইত্যাদি।

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯৪৪। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সূর্যসঙ্কেত, কালবোশেখীর কবিতা, এ গান যেখানে সত্য ইত্যাদি।

অলক সান্যাল
জন্ম ঃ ১৯৪৮। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ নদীর কাছাকাছি, সময়ের বারান্দা ইত্যাদি।

অসিত চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯৫৪। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ঈশ্বরের মা উল্লাসিনী।

অসীম ত্রিবেদী
জন্ম ঃ ১৯৫০। উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্রীকৃষ্ণপুরে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ অবেলার গল্প, বর্ণ পরিচয় ইত্যাদি।

অসীম রায়
জন্ম ঃ ১৯২৭। বাংলাদেশের বরিশালে।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গোপাল দেব, দেশদ্রোহী, শব্দের খাঁচায়, একদা ট্রেনে, অসীম রায়ের গল্প, অসীম রায়ের ছোটগল্প ইত্যাদি।

একলব্য ঘোষ
জন্ম ঃ ১৯৪৭। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।

কমল চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯৪৬। জামশেদপুরে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ আমার পাপ, প্রচ্ছদ, চার নম্বর ফার্নেস চার্জড, জল, মিথ্যেকথা ইত্যাদি।

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯৫২। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ললিত সাঁতরার সম্পত্তি লুঠ, মন্ত্রে মুখ যন্ত্রণায় পা ইত্যাদি।

কিন্নর রায়
জন্ম ঃ ১৯৫৩। কলকাতার চেতলায়।
পেশা ঃ সাহিত্যচর্চা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ রথযাত্রা, প্রকৃতিপাঠ, যক্ষ, মেঘপাতাল, ধর্মসংকট, কুরোশাওনা ভিজে যাচ্ছে, এন্টারটেইনমেন্ট আওয়ার, অরূপকথা, যে লেখার সিরিয়াল হয় না, সংঘর্ষ, কিন্নর রায়ের ছোটগল্প, অন্য ধারার গল্প ইত্যাদি।

কৃষ্ণ চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯২৭।
পেশা ঃ অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মহাযুদ্ধের পর, অমানবিক, যে মাটি সোনা হবে, জন্মভূমি, পা টা নামিয়ে বসুন, চোরাবালি, সীমান্ত পেরিয়ে ইত্যাদি।

গৌতম ঘোষদস্তিদার
জন্ম ঃ ১৯৫৫। কলকাতায়।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মধ্যবর্তী শূন্যতা, পাপকথা, অপেক্ষার দিনরাত, দুঃখের মতো বিকেল, মেঠো ইঁদুরের চোখ ইত্যাদি।

গৌর বৈরাগী
জন্ম ঃ ১৯৪৭, চন্দননগরে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গৌর বৈরাগীর গল্প, টাটুর স্বপ্নের দেশ ইত্যাদি।

চিত্ত ঘোষাল
জন্ম ঃ ১৯৩৩। অসমে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গল্পসংগ্রহ, ক্ষুধা ও অন্যান্য গল্প, ঘোড়সওয়ার, স্বদেশাশ্রম, নায়কের মতো, নির্বাচিত গল্প (প্রথম খণ্ড), ওরা চারজন ইত্যাদি।

জগন্নাথ প্রামাণিক
জন্ম ঃ ১৯৫০। মেদিনীপুরে।
পেশা ঃ লেখালেখি ও প্রকাশনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শিলাবতীর তীরে তীরে, নষ্ট চাঁদ, উড়োকাক, কাঁচের ঘর, চিত্তচরিত্র, পৃথিবীর উল্টোমুখে, শামুক ও অন্যান্য গল্প ইত্যাদি।

জয়ন্ত জোয়ারদার
জন্ম ঃ ১৯৫৩। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ভূতনি দিয়ারা, এভাবেই এগোয়, একজন সি. আর. পি. এবং একটি নকশাল ভূত ইত্যাদি।

জীবন সরকার
জন্ম ঃ ১৯৪১। বাংলাদেশের ঢাকায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কাছিম, চালি, জীবন. জীবন সরকারের নির্বাচিত গল্প, সেজানের দিনরাত্রি, পায়ের শব্দ, নদীর নামে নাম ইত্যাদি।

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ
জন্ম ঃ ১৯৩৬। বাংলাদেশের ময়মনসিংহে।
পেশা ঃ শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ জ্যোৎস্নাময় ঘোষের গল্প, বৃত্ত ইত্যাদি।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ
জন্ম ঃ ১৯২২। পূর্ব বাংলায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ চালতির চালচিত্র, রামপুরের রূপকথা, মদনপুরের মধ্যদিন, পাঁচ দশকের গল্প, প্রতিপক্ষ ইত্যাদি।

তপোবিজয় ঘোষ
জন্ম ঃ ১৯৩৭। কলকাতায়।
পেশা ঃ অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কালচেতনার গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড), সামনে লড়াই ইত্যাদি।

তিমিরবরণ সিংহ
জন্ম ঃ ১৯৪৮। আড়িয়াদহে।

সেন্ট্রাল জেলে এই নকশাল নেতাকে পুলিশ বীভৎসভাবে পিটিয়ে হত্যা করে।

তৃষিত বর্মন
জন্ম ঃ ১৯৪৬। সিঙ্গুরে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ প্রতিপক্ষ, প্রত্যাবর্তন, তুরুপের তাস (যন্ত্রস্থ)।

দিব্যেন্দু পালিত
জন্ম ঃ ১৯৩৯। বিহারের ভাগলপুরে।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি, সিন্ধুবারোয়াঁ, ভেবেছিলাম প্রণয় চিহ্ন, সম্পর্ক ইত্যাদি।

দীপঙ্কর দাস
জন্ম ঃ ১৯৪৮। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ দীপঙ্কর দাসের গল্প, সাঁকো, একজন্মের ঋণ, ভগ্নস্তূপ, সাদা বেলকুঁড়ি, লৌহনগর, মরুজ্যোৎস্না, বাড়িঘর ইত্যাদি।

দেবেশ রায়
জন্ম ঃ ১৯৩৬। পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে।
পেশা ঃ অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ দেবেশ রায় গল্পসমগ্র (১-৪ খণ্ড), দেবেশ রায়ের গল্প, দুই দশক, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, যযাতি ইত্যাদি।

দুলেন্দ্র ভৌমিক
জন্ম ঃ ১৯৪৪। বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। বর্তমান নিবাস ২৪ পরগণার বহড়ায়।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সুখ দুঃখের ছবি, বধ্যভূমি, উলুখাগড়া ইত্যাদি।

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯২৭। বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ শ্রেষ্ঠ গল্প।

নবারুণ ভট্টাচার্য
জন্ম ঃ ১৯৪৮। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ হালাল ঝান্ডা, হারবার্ট ইত্যাদি।

নির্মল চট্টোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯৩৪। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।

প্রদীপ মিত্র
জন্ম ঃ ১৯৫৩। বর্ধমানে।
পেশা ঃ অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ এই দেশ এই সময়, অদ্বৈত দাস কহে (যন্ত্রস্থ)।

প্রলয় সেন
জন্ম ঃ ১৯৩৪। কলকাতায়।
পেশা ঃ অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ তালপাতার বাঁশি, পটভূমি, দাম্পত্য বিষয়ক, সীমানা ছাড়িয়ে ইত্যাদি।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯৫৩। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।

বারিদবরণ চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯৪৪। বনগাঁয়।
পেশা ঃ অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ আগুনের পাখি ও অন্যান্য গল্প, কালাহাণ্ডি কভারেজ, উর্বী, তাপ উত্তাপ, খানাতল্লাশি ইত্যাদি।

বিমল কর
জন্ম ঃ ১৯২১। উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বিমল করের বাছাই গল্প, বিমল করের গল্প সংগ্রহ, পঞ্চাশটি গল্প, খড়কুটো, অসময় ইত্যাদি।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
জন্ম ঃ ১৯৫২। মেদিনীপুরে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ গ্রামনগরের গল্প, পানপাত্র মুখ, সাদ্দামের জন্য বাঙ্কার কাবর জন্য ডাকিয়া, আঁধিগাঁয়ে আলো, ধ্বংসকালীন গান ইত্যাদি।

ব্রজেন মজুমদার
জন্ম ঃ ১৯৩০। পূর্ব বাংলায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ খোদহাটির ভোর, দোতালির গল্প ইত্যাদি।

ভগীরথ মিশ্র
জন্ম ঃ ১৯৪৭। মেদিনীপুরে।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প, নোনারণ বাদিগর, নির্বাচিত গল্প, অন্তর্গত নীলস্রোত, আড়কাঠি, মৃগয়া (১-৪ খণ্ড), জানগুরু, চারণভূমি, কাকচরিত্র ইত্যাদি।

মণি মুখোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯৩৯। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ দখল ও অন্যান্য গল্প, চেনা মানুষের গল্প ইত্যাদি।

মনোজ দাস
জন্ম : ১৯৪৮। উত্তর ২৪ পরগণার বরুণহাটে।
পেশা : চাকরি।

মহাশ্বেতা দেবী
জন্ম : ১৯২৬। বাংলাদেশের ঢাকায়।
পেশা : সাহিত্যচর্চা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : হাজার চুরাশির মা, অরণ্যের অধিকার, স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প, নৈঋতে মেঘ, শ্রেষ্ঠগল্প, নটী, ঝাঁসির রানী, চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প ইত্যাদি।

মানবেন্দ্র পাল
জন্ম : ১৯২৬। বর্ধমানের কালনায়।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কাজের পৃথিবী, কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতী, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি, পৃথিবীর কাছে, প্রহর শেষে প্রহরী, রূপসী ইত্যাদি।

মিহির আচার্য
জন্ম : ১৯২৭। বাংলাদেশের দিনাজপুরে।
পেশা : শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : নীলচোখ, গল্পসংগ্রহ, আজ কাল পরশু, নির্বাচিত গল্প, ধূসর পদাতিক, দ্বিরাগমন, অনিকেতা, গল্পসমগ্র (১ ও ২), সম্রাটের মুখ, অপরাহ্নের নদী ইত্যাদি।

মিহির সেন
জন্ম : ১৯২৭। বাংলাদেশের বরিশালে।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শেষ তিনদিন, কাগজের দেয়াল, প্রবেশ নিষেধ, ইশারা, লেনিনের মা, লোক হাসানো লোকটি, আরো একজন, স্বর্গ মর্ত্য-সংলাপ ইত্যাদি।

মিহির ভট্টাচার্য
জন্ম : ১৯৪৪। বাংলাদেশের ফরিদপুরে।
পেশা : সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পালান পার্বতীর উপাখ্যান, সৌদামিনীর মরণকাল, দাবার চাল ইত্যাদি।

মীনাক্ষী সেন
জন্ম : ১৯৫৪। কলকাতায়।
পেশা : অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : জেলের ভেতর জেল।

মোহিত রায়
জন্ম : ১৯৫৪। নৈহাটিতে।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মহাদেব নায়েক ও অন্যান্য গল্প, একটি অবধারিত মৃত্যুর ধারা-বিবরণী ইত্যাদি।

মৃণাল চক্রবর্তী
জন্ম : ১৯৫৮। কলকাতায়।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : টেলিফোনে রাত আটটা, পাহাড়ী গর্জ ইত্যাদি।

মৃণাল চৌধুরী
জন্ম : ১৯২৭। পূর্ব বাংলায়।
পেশা : শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : জনকগণ, রৌদ্রদীপ্ত ইত্যাদি।

রবিশঙ্কর বল
জন্ম : ১৯৪৮। কলকাতায়।
পেশা : সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : দারুনিরঞ্জন, জীবন অন্যত্রে, স্বপ্নযুগ, রবিশঙ্কর বলের গল্প, নীল দরজা লাল ঘর, আর্তোর শেষ অভিনয়, সংলাপের মধ্যবর্তী এই নীরবতা ইত্যাদি।

রাম রায়
জন্ম : ১৯৩৮। হুগলির চুঁচুড়ায়।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : একচক্রা নগরে।

শংকর বসু
জন্ম : ১৯৪৮। কলকাতায়।
পেশা : সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বাদার গল্প, অংশগ্রহণ, অন্য কলকাতা, বাংলার মুখ, অকালবোধন ও অন্যান্য গল্প, কমুনিস ইত্যাদি।

শংকর সেনগুপ্ত
জন্ম : ১৯৪১। কুমিল্লায়।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বোকা বুড়োর ছেলেরা, বিপন্ন বিস্ময় ইত্যাদি।

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়
জন্ম : ১৯৪০। কলকাতায়।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : তরাইয়ের মা, প্রধানমন্ত্রী নিহত হয়েছেন, যখন একা ইত্যাদি।

শৈবাল মিত্র
জন্ম : ১৯৪৩। কলকাতায়।
পেশা : অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : আতর আলির রাজসজ্জা, অজ্ঞাতবাস, দেওয়ালের লিখন, মাঘ নিশীথের কোকিল, অগ্নির উপাখ্যান, মহৎ রাত্রির ভালোবাসা, উড়ান, নির্বাচিত গল্প, রসাতল, আনন্দের দিন, মা বলিয়া ডাক ইত্যাদি।

সনৎ বসু
জন্ম : ১৯৫৪। বর্ধমানে।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : যুদ্ধ, শহিদের মা, হাঙর, মুখোশের মুখ, জেগে ওঠো শুদ্ধ বিবেক ইত্যাদি।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম : ১৯৫৪। কলকাতায়।
পেশা : শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : উটপাখি, অন্য জীবন, স্বদেশ কথা ও অন্যান্য গল্প, শরীরিণী ও কয়েকটি গল্প ইত্যাদি।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
জন্ম : ১৯৩৩। হাওড়াতে।
পেশা : সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চাশটি গল্প, বিজনে রক্ত মাংস, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি, রিক্তের যাত্রায় জাগো, সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য, প্রিয়তমা, একক প্রদর্শনী ইত্যাদি।

সমরেশ বসু
জন্ম : ১৯২৪। বাংলাদেশের ঢাকায়।
পেশা : সাহিত্যচর্চা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : নয়নপুরের মাটি, উত্তরঙ্গ, কালকূট নামে শাম্ব, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, সমরেশ বসুর বাছাই গল্প, সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি।

সমীরকান্তি বিশ্বাস
জন্ম : ১৯৪১। কলকাতায়।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : এখন এইরকম।

সাধন চট্টোপাধ্যায়
জন্ম : ১৯৪৪। বাংলাদেশে।
পেশা : শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মনোনয়ন, মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন, পক্ষবিপক্ষ, গহীন গাঙ, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড), দুই ঠিকানা, পিতৃভূমি, উদ্যোগপর্ব, নির্বাচিত গল্প, নাগপাশ, অগ্নিদগ্ধ, বেলা অবেলার কুশীলব ইত্যাদি।

সিদ্ধার্থ ঘোষ
জন্ম : ১৯৪৭। কলকাতায়।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কলকাতা নীলকণ্ঠ, অসম্ভবের গল্প, তৃতীয় নয়ন ইত্যাদি।

সিদ্ধার্থ সাহা
জন্ম : ১৯৪৫। কলকাতায়।
পেশা : চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সীমান্তের ওপারে, রাইটার্স, লিটিল ম্যাগ, কাগজের নৌকা, ছোট বকুলপুরের যাত্রী ও অন্যান্য ইত্যাদি।

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
জন্ম : ১৯২৪। হুগলির উত্তরপাড়ায়।
পেশা : ফটোগ্রাফি।

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য
জন্ম : ১৯৩৭। বাংলাদেশের ময়মনসিংহে।
পেশা : শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : আকালের ঈশ্বরগঞ্জ ও অন্যান্য গল্প লেনিন অপেরার অর্কেস্ট্রা, কালী প্রসঙ্গে কালী পরিকল্পনা, দিন আসছে, জলদেবতা ও উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য, সাদা দিন কালো দিন ইত্যাদি।

সুদর্শন সেনশর্মা
জন্ম : ১৯৫১। অশোকনগরে।
পেশা : চিকিৎসক।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : চিত্রকরের ডানহাত, ভালোবাসার ডালপালা, মধ্যদিনের গান ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
জন্ম ঃ ১৯৩৪। বাংলাদেশের ফরিদপুরে।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ অর্জুন, আত্মপ্রকাশ, শ্রেষ্ঠগল্প, সেই সময় (১ম ও ২য় খণ্ড), প্রথম আলো (১ম ও ২য় খণ্ড), স্বনির্বাচিত একশো গল্প, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ (১-৬ খণ্ডে), পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি।

সুনীল দাশ
জন্ম ঃ ১৯৪৩। কলকাতায়।
পেশা ঃ অধ্যাপনা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ স্বরচিত প্রতিবিম্ব, বাতের সূর্যমূর্তি, একদিন সূর্য, দেওয়াল আর নেই, কালমধুমাস, যুবরাজ, এখানে অরণ্য, অস্ত্রপর্ব ইত্যাদি।

সুবিমল মিশ্র
জন্ম ঃ ১৯৪৩। মেদিনীপুরে।
পেশা ঃ শিক্ষকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ হারান মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি, আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারতো, তেজস্ক্রিয় আবর্জনা, দু-তিনটে বাচ্চা ছেলে লেবেল ক্রসিং বরাবর ছুটোছুটি করছে, বাব্বি, আর পাইপগান এতো গরম হয়ে যায় যে এর ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে, নাঙ্গা হাড় জেগে উঠছে, বং যখন সতর্কীকরণের চিহ্ন, ভাইটো পাঁঠার ইস্টু, যে বাতাসে বুনো হাঁসের ঝাঁক ভেসে যায় ইত্যাদি।

সুব্রত নিয়োগী
জন্ম ঃ ১৯৪৩। বিহারের ঝরিয়ায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সুখের অপর নাম, আজ বুধবার, সেই মৃগনাভি, রেড পনি, রতির গোপন প্রেমিক ইত্যাদি।

সুযশ ভট্টাচার্য
জন্ম ঃ ১৯৪৯। আড়িয়াদহে।
পেশা ঃ শিক্ষকতা।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
জন্ম ঃ ১৯৩৪। বরানগরের কাশীপুরে।
পেশা ঃ চলচ্চিত্র নির্মাতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বিদ্ধ কর, কুরুক্ষেত্র, পরিচয়, দিনরাত্রি, একই সমুদ্র ইত্যাদি।

স্বপন চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯৪৫। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।

স্বপন সেন
জন্ম ঃ ১৯৫৫। কলকাতায়।
পেশা ঃ সাংবাদিকতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ প্রত্নভূমিতে কুচকাওয়াজ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯৫২। কলকাতায়।
পেশা ঃ আকাশবাণীতে কর্মরত।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ ভূমিসূত্র, অষ্টচরণ কোলোহাট্ট, জার্সি গোরুর উল্টো বোচ্চা, ভিডিও ভগবান নকুলদানা, চতুষ্পাঠী, নবমপর্ব, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প ইত্যাদি।

স্বর্ণ মিত্র
জন্ম ঃ ১৯৪৭। বাংলাদেশের পাবনায়।
পেশা ঃ চলচ্চিত্র-নির্মাতা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ প্রসব, দেবশিশু ও অন্যান্য গল্প ইত্যাদি।

হীরালাল চক্রবর্তী
জন্ম ঃ ১৯৪২। কলকাতায়।
পেশা ঃ চাকরি।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পাথের ছবি।